বহির্ভূত কোনও বিষয় পত্রিকায় লিখিত হই-তেছে, তখন যেন দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা জানান, এবং যে প্রণালীতে লেখা হইতেছে, তৎ-সম্বন্ধে যাহাতে উন্নতি হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে বিষয়েও পরামর্শ দেন। বালকবালিকাদিগের সকলের মনের গতি সমান নহে, সুতরাং একই উপদেশ যে সকলের পক্ষে সমান কার্য্যকর হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। অভিভাবকগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রদ্বারা আমাদিগকে আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্র বিষয়ে জানান, তাহা হইলে আমরা বিশেষ বিশেষ চরিত্রের উপযোগী গল্পময় প্রস্তাব সকলেরও অবতারণা করিতে পারি।

বালকবালিকাদিগের নিকটেও আমাদের একটী নিবেদন আছে; তাঁহারা যদি তাঁহাদের যখন যে কোন বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান, তাহাহইলে আমরা প্রত্যেক বিষয়ে যতদূর সম্ভব সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে বালকবালিকাদিগের উপ-কার হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের নিকট আরও একটী কথা এই যে তাঁহাদের রচনাশক্তি এবং চিন্তাশক্তি বাড়াইবার জন্য আগামী মাস হইতে এই পত্রিকার মধ্যে খানিকটা স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন। একটী দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী পরিষ্কার হইয়া যাইবে; মনে করুন, চাষার ছেলেদিগের লেখাপড়া শিক্ষা করা উচিত কি না, এই বিষয়ে আলোচনা হইল। একজন লিখিলেন ...া হওয়া উচিত' এবং কেন উচিত তাহা লিখি-...পরের মাসে অপর কেহ তাহা উচিত নয় ...খাইলেন;—এইরূপে আলোচনা ...শেষে যথেষ্ট আলোচনা হইলে প্রকাশিত হইল।

...আর অধিক বলিবার নাই। ...ফল ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া আমরা যথাসাধ্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; এখন পত্রি-কার জীবন এবং উন্নতি পাঠকপাঠিকাদিগের স্নেহ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

ভীমের কপাল।

১ম অধ্যায়।

একদিন শরৎকালের সন্ধ্যাবেলা দৌলতপুরের বাজারে দুটী বালক বসিয়া কি আলাপ করিতেছিল! আকাশে একটুকুও মেঘ দেখা যাই-তেছে না;—পরিষ্কার চাঁদ আকাশে উঠিয়া কেমন করিয়া নিকটবর্ত্তী নদীর জলে ছুটিয়া ছুটিয়া খেলা করিতেছে, মাঝিরা কেমন করিয়া স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া কেহ বা রান্না করিতেছে, কেহ বা গলা কাঁপাইয়া গান করিতেছে, দুটী বালক দোকা-নের বারাণ্ডায় বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল, আর আলাপ করিতেছিল। এই দুটী বালকের মধ্যে এক জনের বয়স ১৭, নাম বিপিন, আর একজনের বয়স ১৫, নাম ভীমেন্দ্র। বিপিন ও ভীমেতে শিশু-কাল হইতেই বেশ ভাব—সর্ব্বদা একসঙ্গে বেড়ায়; কিন্তু দুই জনের চরিত্রে অত্যন্ত ভেদ। বিপিন স্থির, শান্ত, বিনয়ী; ভীমে নামে যেমন কাজেও তেমনি,—একগুঁয়ে, গোঁয়ার, উদ্ধত। এইরূপে দুই প্রকৃতির লোক হইলেও ইহাদের মধ্যে বেশ বন্ধুতা ছিল, ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে আরও একটু ভিন্নতা ছিল—বিপিনের বাড়ী বাখর-গঞ্জ, ভীমের বাড়ী কলিকাতা। কলিকাতার ছেলেরা যে প্রকার পূর্ব্বদেশের ছেলেদের ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাতে ভীম ও বিপিনের ভাল-বাসার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়। ভীম কখনও বিপিনকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া ঘৃণা করে নাই—ঘৃণা করা দূরে থাকুক, 'বাঙ্গাল' বলিয়া

তাহার মনে কিছু মাত্র বিরক্তির ভাবও উদয় হয় নাই। কলিকাতার ছেলেরা যেমন পূর্ব্বদেশের ছেলেদের দেখিলে তাহাদের তিন পুরুষের দোষের কথা বলিয়া নিজেদের যে সব ভাল, তাহাই ঠিক করিয়া বসেন—ভীম গোঁয়ার হইলে কি হয়, তাহার এ দোষ ছিল না।

সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত গরম হওয়াতে ভীমেন্দ্র ও বিপিন দুজনে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধারে আসিয়া বসিয়াছিল এবং নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিল। আজ হঠাৎ "পশ্চিমের ছেলেরা ভাল না পূবের ছেলেরা ভাল," এই বিষয়ে কথা উঠিল। কথা উঠিবার সূচনা এই ;—বিপিন ও ভীমেন্দ্র কলিকাতায় পড়িত—দুজনেই হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়িত, বিপিন এন্ট্রান্স্ ক্লাশে ও ভীমেন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে। উভয়েরই মামার বাড়ী দৌলতপুরের নিকট। পূজার ছুটিতে দুজনে মামার বাড়ী যাইবে, ঠিক করিয়া তাহারা হেদো দীঘির কাছে কি কি জিনিশ ক্রয় করিতে আসিল ; এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা বড় ঘরে অনেক লোক জমিয়াছে। তাহারাও ব্যাপারটা কি দেখিতে গেল। গিয়া দেখিল জনৈক সুবিখ্যাত বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন। তাহারা শুনিতে পাইল তিনি বলিতেছেন যে পূর্ব্বদেশের ছেলেদের স্বাভাবিক বুদ্ধি কম, আর পশ্চিম দেশের ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান হয়। ভীমেন্দ্র একেত কলিকাতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিত না, তাহাতে এই বক্তৃতা শুনিয়া আর "বাঙ্গালদের দেশে" যাইতে চাহিল না, কিন্তু বিপিনের সম্বন্ধে তাহার ভালবাসা ইহাতে কমিল না। অবশেষে তাহার মাতার কথায় সে মামার বাড়ীতে গেল বটে, কিন্তু 'বাঙ্গালদের' উপর যেটুকু ভালবাসা ছিল,—বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া তাহার অর্দ্ধেকও রহিল না। আজ নদীর ধারে বসিয়া বিপিন বলিতেছিল—"দেখ, এই সময়ে সকলে একেবারে চুপ করিয়া রহিয়াছে—সন্ধ্যাবেলা পৃথিবী যেন বোবা হইয়া গিয়াছে ; এমন সময় যদি কেহ চীৎকার করিয়া, বক্তৃতার দ্বারা আমাদের দুঃখের কথা আমাদের বলিয়া দেয়, তবে কেমন হয় ?" ভীমেন্দ্র বলিল "—বাবুর মত বক্তা হ'লে তবে হয় ; তিনি ভাই, কি চমৎকার বক্তৃতা করেন !"

বিপিন।—তিনি বক্তৃতা করেন বেশ, কিন্তু তিনি বাঙ্গালদের ঘৃণা করেন এটা বড় দুঃখের বিষয়।

ভীমেন্দ্র।—উচিত কথা বল্লেইতো ঘৃণা করা হল,—না ? বাঙ্গালদের মধ্যে রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, বিদ্যাসাগর এদের মত একটা লোক দেখাও ত। বিপিন এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিল "ঈশ্বরের রাজ্যে যেখানে লোক যায় না সেখানেও ত সুন্দর ফুল ফোটে ; সমুদ্রের তলায় কত মনিমানিকা পড়ে থাকে, কে তাদের খোঁজ রাখে ? তা ভাই, পশ্চিমে লোকই বল আর বাঙ্গালই বল, ঈশ্বর সকলকেই বড় লোক কর্‌তে পারেন।" এইরূপ ক[illegible]বার্ত্তার পর, আকাশে মেঘ উঠিতেছে, দেখিয়া তাহারা নদীতীর হইতে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। তৃতীয়ার চাঁদ পৃথিবীকে অন্ধকারে পূরিয়া ঐ বড় অশ্বত্থ গাছের আড়ালে লুকাইতেছিল, এমন সময় তাহারা গৃহে গেল।

বিপিন ও ভীমেন্দ্র উভয়ের মাতুল দুর্গাদাস ঘোষ মহাশয় একজন সেকেলে হিন্দু। বাড়ীতে দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে বিলক্ষণ দশ টাকা [illegible] হয়—কিন্তু সে ব্যয় অপব্যয় নহে। দরিদ্র[illegible] দান করিতেই প্রায় তাহার অর্দ্ধেক [illegible] রার্দ্ধের কিয়দংশ নিঃস্ব আত্মীয়[illegible] বলিতেছি দের কাপড়, খেলনা প্রভৃতিতে [illegible] লোক[illegible] কিয়দংশ আমোদ ও পূজার উপ[illegible] হইত। দুর্গা-পূজার আর তিন [illegible]

আছে, সুতরাং সেই বৃহৎ বাড়ীটী আলোক দ্বারা সুন্দর সজ্জিত। কর্ত্তা বাহিরে বসিয়া দুই এক জন সমবয়স্ক লোকের সহিত উৎসবের বন্দোবস্ত করিতেছেন—কাহাকে কোন্ কার্য্যের ভার দিবেন—কে কোন্ কার্য্য সুবিধামত নির্ব্বাহ করিতে পারিবে—কোন্ সময় কোন্ জিনিশ সংগ্রহ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় ঠিক করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। পাশে দুই এক জন খোসামুদে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসিয়া'বাবু বড় ভক্ত,''বাবু বড় হিসেবী লোক,' 'আশীর্ব্বাদ করি' এই রকমের নানা কথা বলিয়া কর্ত্তাকে খোসামোদ করিতেছে। দুর্গাদাস বাবু সে দিকে মন না দিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন। এমন সময় বিপিন ও ভীমেন্দ্র বাড়ীতে আসিল। ভাগিনেয়দ্বয়কে দেখিয়া দুর্গাদাস বাবু বলিলেন "তোমরা কোথায় ছিলে? পূজার সময় তোমাদের দুজনের উপর একটা কাজের ভার রইল—তোমরা গরিবদের খাওয়া তাদারক করিবে।" উভয়ে আহ্লাদে স্বীকৃত হইয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। মাতুলানী আহার প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছিলেন, আসিবা মাত্র উভয়কে ডাকিয়া বসাইলেন, এবং 'এটা খাও,' 'ওটা খাও', 'আর একটু দি', 'আর একটু খাও', ইত্যাদি কথা বলিয়া পরিতোষ-মত আহার করাইলেন। কিন্তু যখন খাওয়া শেষ হয় হয়, তখন ভীমেন্দ্রের এক বিপদ উপস্থিত হইল—ভীমেন্দ্র দেখিল থালার এক পাশে লম্বা এক গাছা চুল রহিয়াছে। দেখিয়াই ভীমেন্দ্র রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। 'ওয়াক' 'ওয়াক' করিয়া খাবার বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়া ভীমেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে প্রথমে মামীকে, শেষে ...দের দেশ'কে গালাগালি দিতে ...পাঠিকাদিগকে বলা আবশ্যক ...নিশকে বড় ঘৃণা করিত—পাতে ...এর ভিতরে চুল। ভীমেন্দ্র চটিয়া বলিল "আমি এখনই এ দেশ ছেড়ে চলে যাব, পঞ্চাশ দিন বলিছি, আমি ভাতে চুল থাক্‌লে খেতে পারি না, তবুও চুল?" মামী বিস্তর বুঝাইলেন,—কর্ত্তা গোলমাল শুনিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন—কারণ জানিয়া ভীমেন্দ্রকে বলিলেন "বাবা! না দেখে পড়েছে, অত রাগ করনা, লক্ষ্মী বাবা আমার!" ভীমেন্দ্র রাগে হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। আকাশ এতক্ষণ মেঘে ঢাকা ছিল—অল্প অল্প বৃষ্টি আসিল। সে খারাপ সময় পশু পাখী পর্য্যন্ত খোলা যায়গায় বাহির হয় না; কিন্তু পোনের বৎসরের বালক ভীমেন্দ্র রাগের ভরে ঐ বৃষ্টি মাথায় করিয়া মামার বাড়ী ছাড়িল। ক্রমশঃ—

(margin fragments: পা হ, পাে, সখা, শযে, প্রক, মার, ফল)

আঃ ছেড়ে দাও না!

আঃ ছেড়ে দেও না, কুকুরচন্দ্র! মায়ের কাছে যাই!
এখন কি আর খেলা কর'বার সময় আছে, ভাই?
দেখ্‌ছ না কি হাঁড়ি হাতে, চাল ধোওয়া রয়ে তাতে,
মা বলেছেন নিয়ে যেতে, 'চাকর বাকর' নাই।
কাজটা সেরে ফিরে এলে, তখন তোমায় আমায় মিলে
মনের সুখে ক'রব খেলা যত ভেবে পাই।

কাজ ফেলে না ক'রব খেলা, ছেড়ে দাওনা হলো বেলা!
আগে কাজ কি আগে খেলা, জান্‌তে আমি চাই!

সতীশ এবং তাহার সঙ্গী।

সতীশ তাহার পিতার একমাত্র ছেলে, তাহাতে আবার সতীশের মা ছিলেন না, এইজন্য সতীশের পিতা সতীশকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সতীশ যখন যাহা চাহিত তাহাই পাইত। কিন্তু 'আদুরে' ছেলেরা সচরাচর যেমন খারাপ হইয়া যায়, সতীশ সেরূপ হয় নাই। সতীশ যখন যাহা চাহিত, তাহাই পাইত বটে, কিন্তু পিতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে কোন দ্রব্য লইত না। কোন দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা হইলে সতীশ ছুটিয়া পিতার নিকট আসিত এবং কহিত 'বাবা, আমাকে ঐ দ্রব্যটী ক্রয় করিয়া দিবে কি?' যদি পিতা বলিতেন 'হাঁ' তাহা হইলে সতীশের আহ্লাদের সীমা থাকিত না, কিন্তু যদি তিনি বুঝাইয়া দিতেন যে উহা ক্রয় করা উচিত নয়, তাহা হইলে বালক সতীশ মনে মনে ভাবিত 'আমার পিতা যখন ঐ দ্রব্যটী আমাকে দিতে চাহিতেছেন না, তখন আমি উটী লইব না, কেননা, তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইবেন।' সতীশের এই সুবুদ্ধিতেই সতীশ খারাপ হইয়া যায় নাই। সতীশের পিতা সমস্ত দিন তাঁহার কর্ম্মের স্থানে থাকিতেন, সুতরাং সে সময় সতীশকে বাড়ীতে একাকী থাকিতে হইত। এই সমস্ত সময় সতীশ কি করিত তাহা বলিতেছি।

সতীশের একটী সুন্দর কুকুর ছিল। সতীশ যেখানে যাইত কুকুরটী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সহিত বেড়াইতে বা খেলা করিতে সতীশের পিতা সতীশকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কুকুরটীই সতীশের বন্ধু ও খেলার সঙ্গী ছিল। সতীশ যখন পোষাক পরিয়া চাকা লইয়া খেলা করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইত, কুকুরটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিত এবং পরিশ্রম হইলে সতীশ যখন বাড়ীর সম্মুখে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বসিত, তাহার সঙ্গীও নিকটে আসিয়া বসিত। বস্তুতঃ 'ভুলো' সতীশকে যেমন ভালবাসিত, দুটী ছোট ছেলে পরস্পরকে ওরূপ ভালবাসে কিনা সন্দেহ। কখন কখন সতীশ নিদ্রিত হইয়া পড়িত;—তখন ভুলোই তাহার বালিশ। ঐ দেখ কুকুরের পিঠের উপর মাথা রাখিয়া সতীশ কেমন ঘুমাইয়া আছে!

এক দিন সতীশ এইরূপে নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সতীশ শুনিতে পাইল সম্মুখের বনের অন্য দিক হইতে এক এক বার 'মিউ' 'মিউ' শব্দ হইতেছে, আবার তাহার পরেই ভয়ানক হাসির শব্দ আসিতেছে। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বালকের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। প্রভুর উৎসাহ দেখিয়া ভুলো 'ঘেউ' 'ঘেউ' শব্দ করিতে করিতে অগ্রে ছুটিল। বনের অপর পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড দীঘি। সতীশ এবং তাহার সঙ্গী দুজনে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল পাড়ার দু তিন জন দুষ্ট বালক একটী রোগা বিড়ালশাবককে জলে ফেলিয়া দিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিড়ালটী যত প্রাণের ভয়ে 'মিউ' 'মিউ' করিতেছে, ছেলেগুলি ততই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া প্রস্তর চা[illegible]ইতেছে। সতীশের মনটী বড় ভাল—[illegible] তাহার ক্লেশ হইল; এমন দেখিলে কা[illegible] হয়? দেখিবা মাত্র সতীশ ভুলে[illegible] ইঙ্গিত করিল। ভুলো চ[illegible] পড়িয়া বিড়ালশাবককে তীরে [illegible] শের পায়ের নিকটে তাহাকে [illegible]

চাহিয়া আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল। সুবুদ্ধি বালক শীঘ্র বিড়ালটীকে তুলিয়া লইয়া গা মুছাইয়া দিল, এবং তাহাকে বাড়ীর দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। যে দুটী তিনটী বালকের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই,—যখন দেখিল সতীশ বিড়াল লইয়া বাড়ী যায়, তখন এক জন সম্মুখে আসিয়া বলিল "ওগো বাবু, বড় যে আমাদের বাচ্ছা লইয়া ঘরে যাইতেছ! সাহস কি ?" যে বালক এই কথা বলিতেছিল, তাহার হাতে এক গাছা লাঠি এবং তাহার গায়ে সতীশের অপেক্ষা বল অনেক অধিক। কিন্তু সতীশ তাহাতে ভয় পাইল না। সতীশ জানিত যাহারা বালক তাহাদের গায়ে বল থাকিলেও না। এই জন্য সে সাহস করিয়া 'মাদের বিড়াল নহে, তোমরা রতে গিয়াছিলে, তখন আর হিত কি সম্বন্ধ ?" বালক লাঠি লিল "আমাদের বিড়াল আমরা মারি আর যাহাই করি, তাহাতে তোমার কি ? এখন ও কথা থাক্, বিড়ালছানা রাখ, নতুবা এই লাঠির দ্বারা তোমার মাথা চিরিয়া দিব।" সতীশ আরও সাহসের সহিত বলিল "আমার মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিলেও পাইবে না। তোমাদের গায়ে বেশী বল আছে বলিয়া কি মনে ভাব যে যতক্ষণ আমি অজ্ঞান হইয়া না পড়িতেছি, ততক্ষণ এই নির্দ্দোষী বিড়ালছানাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে দিব ?"—দুষ্ট বালকের হাতের লাঠি সতীশের মাথায় পড়িল। এক ঘা খাইয়াও সতীশ দণ্ডায়মান। কিন্তু সতীশকে আর একঘা মারিতে হইল না। ভুলো এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল. কিন্তু যখন দেখিল তাহার প্রভুকে একটা বালক শাস্তি দিতেছে, তখন ভুলোর তাহা সহ্য হইল না। বাঘের মত লাফাইয়া উঠিয়া ভুলো সেই দুর্ব্বুদ্ধি বালকের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল এবং নখের আঘাতে তাহার হাত ও পা খানিকটা চিরিয়া দিল। অন্যান্য বালকগণ তাহাদের সঙ্গীর এই দুর্দ্দশা

দেখিয়া 'বাপরে! বাঘ! খেয়েছেরে!' এই কথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সতীশ অতি কষ্টে ভুলোকে থামাইয়া গৃহে ফিরিল। সেই অবধি সেই দুরন্ত বালকেরা আর পশুর প্রতি অত্যাচার করিত না। বিড়াল-শাবককে সঙ্গে লইয়া সতীশ ঘরে আসিল। আগুনে সেকিয়া খানিকটা গরম দুগ্ধ খাইতে দিয়া সতীশ বিড়াল-ছানাকে প্রাণে বাঁচাইল, এবং সেই দিন তাহার পিতা কর্ম্ম-স্থান হইতে আসিলে, তাঁহাকে এই সকল ঘটনার কথা বলিল। তাহার পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন 'বেশ কার্য্য করিয়াছ;'— ইহাতেই সতীশ মাথার বেদনা ভুলিয়া গেল, এবং সমস্ত কষ্টের ফল লাভ করিল। সেই দিন অবধি সতীশের দুটী সঙ্গী হইল—'ভুলো' কুকুর এবং 'হারুমণি' বিড়াল।

ঊষা।

উঠ, উঠ, ছোট বোন! পোহাইল রাতি;
কতকাল রবে আর পড়িয়া শয্যায়!
ওই দেখ ডালে ডালে ফুল কত জাতি
বাগান করেছে আলো বিমল শোভায়।

ওই শোন পাখীগণ ধরিয়াছে গান,
টুপ্ টাপ্ জলবিন্দু যেন তাল ধরে;
আলোকে শিশিরজল হীরক-সমান
শোভা পায়; ঝুপ্ ঝুপ্ পড়ে বায়ু-ভরে।

গুণ্ গুণ্ রব তুলি শ্রমী মধুকর,
মধু আশে ঘুরিতেছে বাগান-মাঝার
চলি ফিরি পরিশ্রমে না হয় কাতর—
মধু যুঠে, ছুটে ছুটে ফিরে অনিবার।

চেয়ে দেখ জলাশয়ে ছোট মাছ কত
লেজ নেড়ে উচু নীচু ছুটিয়া বেড়ায়;
জল নাড়ে, খেলা করে, যার সাধ যত;
প্রভাতের কাজে সবে শরীর লাগায়।

ওই দেখ মাঠে বসি, ছাড়িয়া গোপাল
গাছতলে, কুতূহলে রাখাল বসিয়া
করে গান, সুখী-প্রাণ; সম্মুখে জাঙ্গাল
ভয় নাই কোন গরু যাবে হারাইয়া।

ছুটিয়া মায়ের কাছে, চলিছে বাছুর
মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে পলাইয়া যায়;
মেষের শাবক মাকে দেখিয়া সুদূর
'ভ্যাভ্যা' রবে দুধপানে মার পানে ধায়।

ওঠ বোন কতকাল রবে ঘুমাইয়ে,
পৃথিবীর সব জীব জাগিয়া উঠেছে;
এ সময়ে কোন্ লাজে থাকিবে পড়িয়ে!
ওঠ ওঠ! রাঙ্গা রবি ওই প্রকাশিছে!

এমন সাধের দিবা কাটিলে নিদ্রায়,
কিবা কাজ হ'বে বোন তাই ভাবি মনে;
ওঠ! ওঠ! ছিছি একি! দিন বহি যায়!
নিজ কাজে রত হও পরম যতনে।

গাভী মেষ আদি যত সবাই চেতনে,
পশু তারা তবু সবে নিজ কাজে রত!
তুমি তবে বল বোন্! বলনা কেমনে
কাটাইছ কাল, আহা! নির্ব্বোধের মত?

যাহার করুণা বলে এদিন পাইলে,
সুখেতে কাটিছ দিবা যাঁহার কৃপা—
রজনীতে যাঁর কৃপা গুণেতে
আঁখি মেলি, ভক্তি-ভাবে প
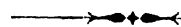
বিলাতের পত্র।

ক্রীষ্টাল প্যালেস বা স্ফটিকপ্রাসাদ-পরিদর্শন।*

প্রভাতকালের সুন্দর সূর্য্যকিরণে সিডেনহাম নামক পল্লীস্থ স্ফটিক-প্রাসাদ পরিদর্শন করা বড়ই আনন্দকর। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বালিকা এই স্ফটিক-প্রাসাদে আসিলে সকলেরই আনন্দ হয়। ইংরাজী ১৮৫৪ সালে এই প্রাসাদটী প্রস্তুত করা হয়। প্রাসাদটী দেশবিদেশের নানারূপ দ্রব্য রক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়; চারিদিকে নানারূপ দেখিবার জিনিশ আছে। মধ্যস্থলে আজকাল নানারূপ খেলানা ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি ও ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রাসাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গন অর্থাৎ উঠান; কোন কোন অঙ্গনে পূর্ব্বকালের বাড়ীর মতন দ্রব্যাদি সাজান। প্রাচীনকালে ভূমিকম্প হইয়া ইটালীদেশে পম্পিয়াই নগর মাটীর মধ্যে বসিয়া যায়; সম্প্রতি তাহার মধ্য হইতে একটী ভদ্র-লোকের বাড়ী বাহির হইয়াছে, তাহার আকৃতি এবং দ্রব্যাদি যেরূপ, এই স্ফটিকপ্রাসাদের একটী অঙ্গন সেইরূপ সাজান। দেয়ালে নানারূপ সুন্দর বর্ণে ফুল, পক্ষী, ও কুঞ্জবন অঙ্কিত রহিয়াছে; কুঞ্জ-বনের মধ্য হইতে ছোট ছোট পরী উকি মারি-তেছে। মধ্যস্থলে একটী সুন্দর শীতল জলের ফোয়ারা,—তাহার চারিদিকে ছোট ছোট ঘর; [illegible] পূর্ব্বকালের শয়নঘরের মত।

প[illegible] একটী অঙ্গনের নাম মিসর-অঙ্গন। [illegible]থা[illegible]লে প্রাচীন মিসর-দেশের আশ্চর্য্য শি[illegible]ত্রিত রহিয়াছে; দেয়ালের এক প্রক[illegible]সরীদিগের চিত্র-লিপি (অর্থাৎ ছবির দ্বারা তাহারা যেরূপ লিখিত, সেইরূপ) অঙ্কিত। যদিও দেয়ালগুলি চূণ এবং বালির দ্বারা প্রস্তুত, তথাপি সে গুলিকে দেখিতে ঠিক প্রাচীন কালের প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় (প্রাচীন কালের প্রস্তরের নির্ম্মিত দেয়ালের কিছু অংশ লণ্ডনের বড় যাদুঘরে আছে)। মিসর-অঙ্গনে স্ফিঙ্ক্‌স্ নামক সুবৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর নিনেভা-অঙ্গন। অঙ্গনের দ্বারে চূণ এবং বালির দ্বারা নির্ম্মিত, নানা বর্ণে চিত্রিত, ডানাযুক্ত, দুটী বৃহৎ সিংহ। প্রাচীন নিনেভা-নামক নগরের * কোন মন্দিরের দ্বারে যেরূপ দুটী সিংহ থাকিত, ইহা তাহারই অনুকরণ। নিনেভা-অঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরেই গ্রীক এবং রোমীয় অঙ্গন। এই দুটী অঙ্গনের মধ্যে প্রাচীনকালের সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তির ছাঁচ সকল রহিয়াছে। সেগুলি এত সুন্দর যে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিল্পীরাও ইহার ন্যায় সুন্দর, মনোহর কোন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

কয়েকটী অঙ্গনের নাম চিত্রশালিকা-অঙ্গন। এখানে ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্থান হইতে আনীত নানারূপ পরমসুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের একটী সুন্দর ধর্ম্মালয়ের দ্বার, মাইকেল এঞ্জেলো নামক বিখ্যাত শিল্পীর নির্ম্মিত প্রাচীন কালের ধর্ম্ম-ঋষি মুষার মূর্ত্তি, ফরাশীদেশের রাজ-ধানী পারিস নগর ও ইটালী দেশের পরম সুন্দর ফ্লোরেন্স সহর হইতে আনীত নানারূপ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, এখানে এই সকল দ্রব্য দেখিলে মন মোহিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও এত রকমের জিনিশ রহি-য়াছে যাহার বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না।

স্ফটিক-প্রাসাদের একপার্শ্বে একটী সুন্দর

* [illegible] কাচ এবং লৌহ-দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া [illegible]ফ[illegible]াদ' হইয়াছে। স, স।

* আরবদেশের উত্তরে এবং পারস্যদেশের পশ্চিমে এই নামে পূর্ব্বে একটী সহর ছিল। আজকাল সে সহরের প্রায় কিছুই নাই। কেবল টাইগ্রিস নদীর তীরে মোসল নামক নগরের নিকটে কতকগুলি ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখাযায়। স, স।

কাচনির্ম্মিত ঝরণা আছে। সেই ঝরণার চারিদিকের জলে নানারূপ স্বর্ণ এবং রৌপ্যময় মৎস্য খেলিয়া বেড়াইতেছে, এবং জলের চারিদিকে স্তরে স্তরে পরম মনোরম ফুল সকল সাজান রহিয়াছে। প্রাসাদের অপর পার্শ্বে আর একটী মারবেল পাথরের নির্ম্মিত ফোয়ারা; কিন্তু সেটী কাচনির্ম্মিত ঝরণাটীর ন্যায় সুন্দর নহে। এই ফোয়ারার সম্মুখে কতকগুলি বড় 'মজার' টেয়া পাখী বাঁধা রহিয়াছে। তাহারা সুন্দর কথা কয়, এবং যদি তাহাদিগের প্রতি স্নেহ এবং আদর না দেখাও, তাহা হইলে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে। নিকটে [পিঞ্জরে কতকগুলি বানর এবং অন্যান্য অনেকগুলি পশু দেখা যায়। একবার আগুণ লাগিয়া এই ভাগের খানিকটা স্থান পুড়িয়া যাওয়াতে একটী বৃহৎ বানর এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্য ও প্রাসাদের কিয়দংশ নষ্ট হয়। তদবধি প্রাসাদটী কিছু ছোট হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে গ্রীষ্মকালে পরম সুন্দর নানারূপ ফুল ফুটিয়া মন হরণ করে; মধ্যে মধ্যে চারিদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি সকল মাথা তুলিয়া আরও সৌন্দর্য্য বাড়ায়। চারিদিকে ফোয়ারা, জলপ্রপাত প্রভৃতি যখন জল ছড়াইতে থাকে, এবং তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যখন রামধনুর শোভা দেখা যায়, তখনকার সে সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলে, পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে যে সকল বড় জন্তু ছিল, তাহাদের অনুকরণ অর্থাৎ সেইরূপ আকারের জন্তু দেখা যায়। এই সকল জন্তু আজকালকার সকল জন্তু অপেক্ষা বৃহৎ; এমন কি হস্তীও তত বৃহৎ নহে। সে আকারের কোনও জন্তু আজকাল দেখা যায় না। এই ভাগটী নানারূপ গাছপালাতে সাজান; মধ্যে মধ্যে বিদেশ হইতে আনীত সুন্দর সুন্দর চারা গাছও রোপিত হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি ইংলণ্ডের দারুণ শীতে সচরাচর বাঁচে না।

প্রাসাদের একটী প্রধান আকর্ষণের জিনিশ মনোহর বাদ্য। সাধারণতঃ প্রত্যেক দিন এবং শীতকালের শনিবারে রমণীয় ঐকতান বাদ্য হয়। কেহ পিয়ানো বাজায়, কেহ গান গায়, এইরূপে খুব আনন্দে সময় কাটে।

প্রাসাদের মধ্যে কখন কখন পোষা পাখী দেখান হয়। তখন নানা স্থানের নানারূপ মোরগ মুরগী, এবং পায়রা আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সময় প্রাসাদের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত কেবল এই দৃশ্য; বৃহৎ খাঁচায় দলে দলে পাখী,—পাখার ঝট্‌পটে এবং কোঁ কোঁ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। বৎসরের মধ্যে একবার কুকুর-প্রদর্শনী মেলা হয়; তখন সুবৃহৎ (Mastiff) মাষ্টিফ্ কুকুর হইতে ইন্দুরের ন্যায় ছোট (Terrier) টেরিয়ার কুকুর পর্য্যন্ত সব রকমের কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। কখনওবা 'বিড়াল প্রদর্শনী' হয়; তখন প্রাসাদের কোন কোন বৃহৎ অঙ্গন বিড়ালে পূর্ণ হইয়া যায়।

স্ফটিক-প্রাসাদ লণ্ডন নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে স্থিত। ঘোড়ার গাড়ী বা রেলওয়ে, দুই উপায়েই তথায় যাওয়া যায়। রেলওয়েতে যাওয়া সুবিধা বলিয়া অনেকে রেলেই যাতায়াত করিয়া থাকেন। উৎসব বা কোন মেলা উপলক্ষে দলে দলে যাত্রী লইয়া লণ্ডন হইতে রেলের গাড়ী সকল সিডেনহাম পল্লীতে আইসে, এবং এত লোকের জনতা হয় যে সন্ধ্যাকালে সহরে ফিরিয়া যাইবার সময় গাড়ীতে স্থান পাওয়া কষ্টকর হইয়া উ

(অনুবাদিত)

কুম'

মহাত্মা হেয়ার সাহেব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গার গোলদীঘিতে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে অনেক বালক বেড়াইতে গিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই গোলদীঘির দক্ষিণ পার্শ্বে অদ্যকার চিত্রের ন্যায় খানিকটা স্থান নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। কিন্তু উহা কি, এবং কিসের জন্য গোলদীঘির মধ্যে আসিল, ইহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যে সকল বালক একটু বড় তাঁহারা জানেন উটী হেয়ার সাহেবের গোর। কিন্তু তাঁহারাও বোধ হয় জানেন না অথবা জানিতে চেষ্টা করেন নাই যে গোরের উপরের গোলাকার থামের গায়ে কি লেখা আছে। আমরা প্রথমতঃ তাহাই জানাইতেছি;—

"এই গোর-স্থানের মধ্যে ডেবিড হেয়ারের শরীর রহিয়াছে; এই স্থানটী তাঁহার বাঙ্গালী ছাত্র এবং বন্ধুদিগের দ্বারা নির্ম্মিত। হেয়ার সাহেবের জন্মভূমি স্কটলণ্ডে; তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই সহরে আগমন করেন, এবং ঘড়ি নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে পরিশ্রম ও সৎচরিত্রের গুণে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে পরলোকগত হন। অল্পকালের জন্য এই দেশে আসিয়া তিনি পরদেশকেই নিজের দেশ করিয়া লন, থা· জীবিত ছিলেন সমস্ত সময় শ ত অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও প্র ঙ্গালীদিগের শিক্ষা এবং সার ন্নতি, এই একমাত্র প্রধান কল এবং প্রিয় উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় করেন; এই কার্য্যে শারীরিক ক্লেশ, অর্থ, বা বাচনিক উপদেশ, তিনি কিছুই বাকী রাখেন নাই। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী সন্তানের ন্যায় তাঁহাকে ভালবাসা ও ভক্তি দিয়াছে এবং আজ তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাকে পিতৃতুল্য প্রিয়তম এবং স্বার্থশূন্য বন্ধু বলিয়া খেদ করিতেছে।"

যাঁহারা সদা সর্ব্বদা গোলদীঘিতে বেড়াইয়া বেড়ান তাঁহারা হয়ত এ কথাগুলি দেখিয়াও দেখেন না। হেয়ার সাহেব কে ছিলেন, কিসের জন্য তিনি বাঙ্গালীদিগের পিতৃ-তুল্য, এ সকল কথা জানিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, এই জন্য আমরা হেয়ার সাহেবের কথা কিছু কিছু লিখিব। তবে সর্ব্বপ্রথমে এই বলিয়া রাখি যে আমরা এখন যে ইংরাজী শিক্ষা পাইতেছি এই ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হেয়ার সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে করেন।

যখন হেয়ার সাহেব এ দেশে প্রথম আইসেন তখন আমাদের দেশের লোকের বড় দুরবস্থা ছিল। হেয়ার সাহেব দেখিলেন এই দুরবস্থা দূর করিতে হইলে এই দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজী লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

তখন রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধু দেশের উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়কে ইংরাজী স্কুল করিতে পরামর্শ দেন। ইংরাজী শিক্ষা দিলে দেশের উপকার হইবে, এ কথা মহাত্মা রামমোহন স্বীকার করেন বটে, কিন্তু নানা কারণে হেয়ার সাহেবকে ভালরূপ সাহায্য করেন নাই। তখন হেয়ার সাহেব নিরাশ না হইয়া সেই সময়কার হাইকোর্টের প্রধান বিচার-

পতি সার্ হাইড্ ঈষ্ট্ সাহেবের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলেন। সার্ হাইড্ এই প্রস্তাবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা হিন্দু-সমাজের প্রধান প্রধান লোকের মত জানিলেন; যখন শুনিতে পাইলেন ইংরাজী শিক্ষা করিতে অনেকেরই মত আছে, তখন হিন্দুকালেজ স্থাপিত হইল (১৮১৬ খৃষ্টাব্দ)। সে আজ প্রায় ৬৬ বৎসর পূর্ব্বকার কথা। হেয়ার সাহেব যদিও নিজে শিক্ষক ছিলেন না তথাপি তিনি এত অধিক সময় স্কুলের বালকদিগের সহিত থাকিতেন, যে বালকেরা শিক্ষক অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক চিনিত।

হিন্দুকালেজের স্থাপনার পর হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে দুটী সভা হয়, একটীর নাম স্কুল সোসাইটী, অপরটীর নাম স্কুল-বুক সোসাইটী। যে সকল বালক সঙ্গতি-অভাবে লেখাপড়া শিখিতে পারে না, তাহাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া, যে সকল দেশীয় পাঠশালা সাহায্য-অভাবে ভালরূপ চলে না, তাহাদিগকে সাহায্য করা এবং বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, অথচ দরিদ্র কতকগুলি বালকের কালেজের বেতন দ্বারা সহায়তা করা, প্রধানতঃ এই সকল কার্য্যের জন্য স্কুল সোসাইটীর জন্ম হয়। এই সভার উদ্যোগে অনেক গুলি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে চাঁপাতলা স্কুল এবং ঠনঠনিয়া স্কুল বিখ্যাত। এই দুটী স্কুল নানা কারণে কিছু কাল পরে একত্র মিশিয়া 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল' এই নাম ধারণ করে, এবং আজ কাল 'হেয়ার স্কুল' এই নামে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল-বুক সোসাইটীর উদ্যোগে অনেক গুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা পড়িবার পুস্তক প্রস্তুত হয়। এই সভাটী আজিও আছে।

হেয়ার সাহেব নাম কিনিবার ইচ্ছা করি[illegible] না। তিনি সর্ব্বদা বালকদিগের সন্ধান ল[illegible] স্কুলে দেখা না পাইলে তাহা[illegible] যাইতেন, এবং কখন তাহাদি[illegible] করিয়া, কখন মিষ্ট তিরস্কার যাহাতে ভাল হয় তাহার চেষ্টা ক[illegible]

ঘড়িনির্ম্মাণ-ব্যবসায়ে হেয়া[illegible]

টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া দেশে গেলে, তিনি মহাসুখে কাল কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু এ দেশের বালকদিগের প্রতি তাঁহার কেমনই একটু মায়া জন্মিয়া গেল যে আর তাহাদিগের উপকারের চেষ্টা না করিয়া যাইতে পারিলেন না। হেয়ার সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল সত্য ঘটনার কথা শুনা যায়, তাহা বলিলে হয়ত অনেকে মিথ্যা গল্প বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু তাহার এক তিলও মিথ্যা বা অতিরিক্ত বলা নহে। আমাদের এখানে আর অধিক স্থান নাই। সুতরাং সংক্ষেপে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের কথা বলিয়া অন্য বারে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প বলিব।

হেয়ার সাহেব বালকদিগকে এত ভাল বাসিতেন যে তাহাদের পীড়া হইলে অনেক সময় তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। বাড়ীর মেয়েরা হেয়ার সাহেবকে দেখিয়া লজ্জা করিতেন না। বরং ছেলের পীড়া হইলে যদি সাহেব দেখিতে আসিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাবনা অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত। বিছানার নিকটে হেয়ার সাহেব বসিয়া ঔষধ খাওয়াইতেছেন, অন্যদিকে বাড়ীর মেয়েরা বসিয়া আছেন,—এরূপ ঘটনা অনেক সময় ঘটিয়াছে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ৬৭ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে দয়ার সাগর বাঙ্গালীর 'পিতৃতুল্য বন্ধু' হেয়ার সাহেবের প্রাণ যায়। তাঁহার পীড়ার সম্বাদ সকলে পাইতে না পাইতে তাঁহার মৃত্যু হইল। সে দিন ভয়ানক [illegible]হইতেছিল। কিন্তু হেয়ার সাহেবের নিকট [illegible]র পাইয়াছে, তাহারা বৃষ্টি মানিবে [illegible]জিয়া দলে দলে বাঙ্গালী হেয়ার [illegible]রীরের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়া[illegible]র পরম প্রিয় বন্ধুকে জন্মের শোধ [illegible]ত লাগিল। সাহেব দিগের গোরস্থানে হেয়ার সাহেবকে গোর দেওয়া হয় নাই; যে স্থানে মহাত্মা হেয়ার বাঙ্গালীদিগের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন, সেই স্থানের নিকটে, এবং যে বাঙ্গালীদিগের উন্নতির জন্য হেয়ারের প্রাণ গেল, তাহাদেরই মধ্যে হেয়ার সাহেবের শরীর মৃত্তিকার নীচে পোতা হইল।

উপকারীর প্রতি কে না কৃতজ্ঞ হয়? যাঁহার নিকট আমাদের জাতি বিশেষ উপকার পাইয়াছে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাম আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে চিরকাল গাঁথা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

মেয়েরা আমাদের কে?

পাঠিকাগণ! পুরুষদিগের সহিত আপনাদের কি সম্পর্ক, তাহাই এই প্রস্তাবে বলিব।

অতি বাল্যকালে আমার মাতার মৃত্যু হয়; তখন মা কি ধন, তাহা জানিতাম না। আমার স্বভাব অত্যন্ত দুরন্ত এবং অবাধ্য ছিল।—এই অবাধ্যতাতে যে আমার মাতার ভয়ানক ক্লেশ হইত, তাহা আমার ছোট বুদ্ধিতে আসিত না। আমি মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াইতাম, এবং আবশ্যক হইলে কোন দ্রব্যের জন্য মায়ের প্রতি অত্যাচার করিতাম। মাতা যখন মৃত্যুশয্যায় পড়িলেন, তখন, আমি নির্ব্বোধ! মার স্নেহ বুঝিলাম না—ভাবিলাম "পীড়া হইয়াছে, তাহাতো ভালই; এখন নিরাপদে যেখানে সেখানে বেড়াইতে পারিব।" অসহ্য যন্ত্রণায় মাতার মৃত্যু হইল; এক দিন মাতার কাছে বসিয়া পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ করিলাম না; যে রাত্রিতে মাতা চলিয়া-গেলেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে—

অবোধ আমি—ছুটিয়া বাড়ীর সম্মুখের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে গেলাম।

অনেক দিন গেল। সকলেই ছুটিয়া মায়ের কাছে যায়—আমি কার কাছে যাইব? কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই। অবশেষে এক দিন আমার মাতার কথা মনে পড়িয়া গেল। বড় হইলাম—লেখা-পড়া শিখিয়া বুদ্ধি একটুকু পরিষ্কার হইল,—তখন একদিন পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার মাতার চরিত্রের গুণে অনেকেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদেরই এক জন আমাকে নিকটে পাইয়া আমার মাতার ভালবাসার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন "তোমার মাতা তোমাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা কি তুমি জান? যখন তিনি মরিতে বসিয়াছেন, তখন আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন 'আমি চলিলাম। আমার ছেলেটী রহিল, উহাকে দেখিও। ও গোঁয়ার, যদি তোমাদিগের বালকবালিকাকে প্রহার করে—আমার অনুরোধ উহাকে কিছু বলিও না। আমি ভগবানকে ডাকিয়াছি, তিনি উহাকে নিশ্চয়ই সুমতি দিবেন। যতদিন সে দিন না আসে ততদিন দয়া করে এ অভাগিনীর অনুরোধ মনে করিয়া সব সহ্য করিও;' এই কথা বলিতে বলিতে মাতার চক্ষু-দিয়া জল পড়িতে লাগিল।" আমি যখন এই কথা-গুলি শুনিলাম, তখন আমার প্রাণ ধরিয়া কে যেন নাড়িয়া দিল। সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া একস্থানে বসিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিলাম এবং ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিলাম "হে জগদীশ! এইতো তুমি সুমতি দিয়াছ, এখন আর আমি গোঁয়ার নহি; কিন্তু মাতো দেখিতে আসিলেন না, মায়ের প্রতিতো সদয় ব্যবহার করিতে পারিলাম না।"

মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া যে মাতা নিজের জ্বালা ভুলিয়া প্রাণের টানে সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি স্ত্রীলোক। বালকবালিকা-গণ! এখন হয়ত বুঝিতেছ না, 'মা কেমন স্ত্রীলোক,' কিন্তু যে দিন মা থাকিবেন না, যে দিন পরের মাকে মা বলিয়া ডাকিতে চাহিবে, যে দিন বড় হইয়া নানারূপ জ্বালা যন্ত্রণায় পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিবে, তখন জানিবে মা থাকিলে কি হইত, এবং নাই যে তাহাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছে!

আবার, যখন ছোট ভগিনীর প্রতি অত্যাচার করিতাম, তখনকার কথা মনে হইলেও ভয়ানক ক্লেশ হয়। সে ভগিনীর সহিত এখন আর দেখা হয় না, কারণ তাহার বাড়ী আর আমার বাড়ী এখন আর এক নহে। দুই বৎসরে যদি দুদিন দেখা হইল,তাহা হইলেই যথেষ্ট। বাল্যকালে যাহার সহিত মাতৃস্তন্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছি, আজ তাহার দিকে মন টানিতেছে; কিন্তু আর উপায় কি? ভাবিতেছি যত দিন ভগিনীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছি ততদিন যদি তাহাকে ভাল বাসিতাম তাহা হইলে আজ এত ক্লেশ হইত না। আজ তাহার নিজের একটী সংসার হইয়াছে, অথচ আমাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল। এ স্নেহের টান, এ ভালবাসা ভগিনী ভিন্ন আর কাহার হইবে? এমন ভগিনীও স্ত্রীলোক।

আমাদের মাতা স্ত্রীলোক, ভগিনী স্ত্রীলোক এবং অধিক ভাল বাসিবার লোক যাঁহারা সকলেই স্ত্রীলোক। কাহারও পিতামহী, কাহারও ধাত্রী (ধাইমা বা বুড় ঝি) এইরূপ সকলেরই স্নেহের আধার স্ত্রী-লোক। এইরূপ ভাল-বাসা পুরুষের হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য সহজেই বুঝা যায় যে জগদীশ্বর স্ত্রীলোককে দয়াতে, ভালবাসাতে পূর্ণ করিয়া এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং তিনি যেন এই বলিয় ছেন "হে আমার কন্যাগণ! তো যাও, এবং মাতা হইয়া, ভগি হইয়া, ধাত্রী হইয়া, কঠিন পুর ইয়া দিয়া সংসারকে স্বর্গ করিয় সংসারকে স্বর্গ করাই স্ত্রীলো

যেন পাঠিকাদিগের স্মরণ থাকে। পাঠকদিগকেও বলি তাঁহারা যেন অনর্থক আপন আপন ভগিনী-দিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে না যান, যাহাতে বালিকাদিগের উন্নতি হয়, যাহাতে তাঁহারা নিজের শক্তি বুঝিয়া নিজের উন্নতি করিতে পারেন, সুশিক্ষিতা হইতে পারেন, পাঠকগণ যেন সে বিষয়ে মনোযোগী হন।

বৃষ্টি।

মরা কি জান, বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে?" শিক্ষকের এই কথা শুনিয়া ৭ বৎসরের বালক মণিমোহন বলিয়া উঠিল "আমি জানি। হাতীরা সমুদ্র হইতে শুঁড়ে করিয়া জল তুলিয়া আকাশের উপর হইতে ছড়াইয়া দেয়, তাহাতেই বৃষ্টি হয়।"

শিক্ষক হাসিয়া বলিলেন "মণি! তোমাকে এ কথা কে শিখাইল? ভাল, হাতীগুলি কিরূপ বলিতে পার?"

মণি। মেঘের মত গায়ের রং—ঠাকুরমা বলিয়াছেন।

হরি, মতি, কেশব, সুরেন্দ্র সকলেই মণির কথায় হাসিয়া উঠিল। শিক্ষক তাহাদিগকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, কেশব! তুমি বল দেখি বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে?"

কেশব বলিল "মেঘ হইতে।"

শিক্ষক। মেঘ কি? মেঘই বা কোথা হইতে পড়ে?

[illegible] জানি না।

[illegible] আমি জানি। সমুদ্র হইতে মেঘ

[illegible]

[illegible] মার অনেকটা ঠিক বলা হই-

[illegible] আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। প্রথমতঃ একটী বিষয় তোমরা বোধ হয় জান। বল দেখি সোলা জলে ভাসে কেন?

মতি। সোলা জলের অপেক্ষা হাল্‌কা, এই জন্য।

হরি। সে দিন ভৈরব ঢুলীদের বাড়ীর কাছে আমরা খেলা করিতে গিয়াছিলাম; তখন দেখিলাম তাহাদের শিমুলগাছ হইতে ফল ফাটিয়া তুলা বাহির হইতেছে। তাহার কতকটা নীচে পড়িয়া গেল, আর কতকটা সরু সরু হইয়া বাতাসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

মণি। আমি দেখিয়াছি। সেগুলি অতি সুন্দর।

হরি। তুলাগুলি যে বাতাসে ভাসিতেছিল, সেও তাহা হইলে এই কারণে যে তুলার সরু সরু খণ্ডগুলি বাতাস অপেক্ষা হাল্‌কা?

শিক্ষক। হাঁ—অনেকটা তাই বটে। আচ্ছা, এখন যাহা বলি, মনোযোগ করিয়া শুন। ভয়ানক রৌদ্রের সময় পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায়, তাহা জান। ভাল, এ জল কোথায় যায় জান?

সুরেন্দ্র। মাটীতে বসিয়া যায়।

শিক্ষক। খানিকটা মাটীতে বসিয়া যায় বটে, কিন্তু সমস্তটা যায় না। বাকীটা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।

মণি। বাষ্প কি?

শিক্ষক। বাষ্প বাতাসেরই মত; তবে বাষ্প কখন কখন দেখা যায়।

যেমন খুব ঠাণ্ডা করিলে অনেক জলের মত জিনিশ বরফ হইয়া যায়, তেমনি খুব গরম করিলে অনেক জিনিশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যখন ভয়ানক রৌদ্র হয়, তখন সমুদ্র, নদী, পুকুর প্রভৃতি হইতে রৌদ্রের তেজে অনেক বাষ্প উঠে।

যদি এক খণ্ড সোলা লইয়া জলের তলায় ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে কি সোলার খণ্ডটা সেই খানেই থাকে?

মণি। না, না! লাফাইয়া উপরে উঠে।

শিক্ষক। বেশ, মণি! এই জন্যই রৌদ্রের তেজে যখনই সমুদ্র, প্রভৃতি হইতে বাষ্প উঠিল, অমনি হাল্‌কা বলিয়া বাষ্প লাফাইয়া বাতাসের উপরের দিকে চলিয়া গেল। এখন বুঝিয়াছ?

কেশব। আপনি বলিলেন বাষ্প প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু মেঘত দেখা যায়! তবেত বাষ্প আর মেঘ এক জিনিশ নয়।

শিক্ষক। বুঝাইয়া দিতেছি। জল হইতে গরমেতে যদি বাষ্প হয়, তাহা হইলে সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে অবশ্য জল হইবে।

সকলে। হাঁ।

শিক্ষক। তোমরা বোধ হয় জান পাহাড়ে দেশ বড় ঠাণ্ডা।

মতি। আমি জানি। বাবা দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন, আমাদের এখানে যখন গরম, তখন সেখানে লেপ গায়ে দিতে হয়।

শিক্ষক। পাহাড়ে দেশ খুব উচ্চ বলিয়া তথায় শীত অধিক। উচ্চ যায়গা না হইলেই যে শীত হইবে না, তাহা বলিতেছি না; তবে মোটা মুটি জানিয়া রাখিয়া দাও, যে উচ্চ যায়গায় শীত খুব বেশী। কেন উচ্চ যায়গায় শীত বেশী হয় তাহা জানিবার এখন প্রয়োজন নাই। তবেই বুঝিতে পার, বাষ্প উপরে গিয়া খুব ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে।

সকলে। বুঝিয়াছি।

শিক্ষক। এই ঠাণ্ডায় পড়িয়া বাষ্প জল হইয়া যায়, কিন্তু সেই জলবিন্দু এত ছোট ছোট যে অনায়াসে বাতাসের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। আমরা আকাশে যে মেঘ দেখিতে পাই, সে এই জলবিন্দু। মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় না; মেঘ খুব গাঢ় না হইলে বৃষ্টি হইতে পারেনা; তাহার পর, বাতাসে মেঘকে তাড়াইয়া অন্য দেশে লইয়া যায়, তাহাও বৃষ্টি না হইবার কারণ। যাহা হউক, যখন এই ছোট ছোট জল বিন্দু বাতাসের তাড়ায় এক সঙ্গে মিশিয়া ভারী হয়, তখনই ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া, ঝম্ ঝম্ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। বুঝিয়াছ?

আজ এই পর্য্যন্ত। অন্য একদিন এইরূপ অন্য কোন বিষয়ে গল্প করা যাইবে। এখন বাড়ী যাও।

ছেলেরা শিক্ষক মহাশয়ের নিকট বৃষ্টির বিষয়ে গল্প শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইল। মনে মনে ভাবিল বাড়ীতে গিয়া এই বিষয়ে সকলকে গল্প করিব।

কেশব বলিল "মেঝকাকীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইয়া দিব।"

মণি বলিল "পুঁটীকে শিখাইয়া দিব।"

মতি বলিল "মার কাছে গিয়া এই গল্প বলিব।"

হরি বলিল "রামার কেবল খেলা! আচ্ছা, আজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে।"

সুরেন্দ্র বলিল "বৃষ্টির দিনে এই সকল কথা সকলকে মনে করিয়া দিব।" এইরূপ বলিয়া, হাসিতে হাসিতে, গোলমাল করিতে করিতে, মাষ্টার মহাশয়কে গুড্‌বাই, সার (Good bye, Sir) বলিয়া নমস্কার করিয়া ছেলেরা বাড়ীর দিকে ছুটিল।

ধাঁধাঁ।

১। নাক হাতে করিয়া যায় কে?

২।—।—।—।—খাইতে মিষ্ট। প্রত্যেক ড্যাসের যায়গায় একটী মাত্র অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ বসাইতে পারিবে। বলত কি জিনিশ?

৩। এরূপ ভাবে কতকগুলি কথা স্থাপিত করা যায়, যে লম্বার দিকে, চওড়ার দিকে—যে দিকে পড়িবে, একই কথা হইবে। যথা:—

অ—তু—ল
| | |
তু—মি—ও
| | |
ল—ও—না

এখানে লম্বা এবং চওড়ার প্র
লম্বা এবং চওড়ার দ্বিতীয় ছত্র 'তুমি

ঘেঁওড়ার তৃতীয় ছত্র 'লগুনা'। সমস্তটা এক সঙ্গে লইলে 'অতুল, তুমিও, লণ্ডনা' এই কথাগুলি হইল। এইরূপে 'মদন' এবং 'প্রমদা' এই দুটী কথার দ্বারা এইরূপ চতুষ্কোণী দ্বিভাগ পদ রচনা কর দেখি।

৪। রামের বয়স যত, সরলার বয়স তত; রাখালের বয়স তাহার দ্বিগুণ; নবীনের বয়স রাখালের অর্দ্ধেক, চপলার বয়স নবীনের অর্দ্ধেক; লাবণ্যলতার বয়স চপলার অর্দ্ধেক। রাখালের বয়স যদি ছ কুড়ির পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়, তবে কাহার বয়স কত?

৫। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথাস্থানে বসাইয়া, তাহাতে কাহার নাম হয়, বাহির কর:—

নাম বিশেষ পরিচয়।

লক্ষামোদহরমনর্কাতন—ছেলেদের জন্য কতকগুলি পুস্তক লিখেছেন; মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে যখন কেহই প্রথমে মেয়ে দিতে সাহসী হন নাই, তখন ইনিই প্রথমে আপনার মেয়েকে স্কুলে দিয়া জাতিচ্যুত হন, এবং অন্য সকলের মেয়ে দিবার পথ পরিষ্কার করে দেন।

শত্রচন্দ্ররচমেমি—কোনও এদেশীয় লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটে নাই, বড় লাট রিপন বাহাদুরের অনুগ্রহে ইঁহার সেই প্রধানতম পদ লাভ হইয়াছিল।

৬। একমাত্র চক্ষু মোর তাতে জ্যোতি নাই;
অথচ তাতেই মম কার্য্য হয়, ভাই;
মুখ মোর তীক্ষ্ণ অতি,
... স্তু থাকি দিবা রাতি,
শ...র তার জীবিকা যোগাই।
প্র...ছ থাকি বালিকার,
...রে কার্য্য করি তার;
...দের কাজে আমিই সহায়।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। আগামী মার্চ মাসের পরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন বিদেশবাসী হইলে তাঁহাদের পক্ষে পত্রিকার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵১০ মাত্র।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে, আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সম্বাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি, সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল, বা কার্য্য সম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। কলিকাতা, বুধবার, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩। দ্বিতীয় সংখ্যা।

সম্পাদকের নিবেদন।

যাঁহারা 'সখা'র গ্রাহক এবং বন্ধু, তাঁহারা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে এই এক মাসের মধ্যেই 'সখা'র গ্রাহক সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। আমরা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট শুনিলাম প্রায় প্রত্যহই নূতন গ্রাহকের নাম আসিতেছে, এবং অনেক স্থান হইতে উৎসাহপূর্ণ, উপদেশপূর্ণ পত্রাদি পাওয়া যাইতেছে। 'সখা'র অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এইরূপ উৎসাহ সকলে দিতেছেন, ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। আমরা সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যতদূর সম্ভব উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

কয়েকটী কথা এই খানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমাদিগকে কেহ কেহ কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন; তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর এই খানে দিতেছি, আশা করি তাহাতে অন্যান্য অনেকের কাজ হইবে।

১। 'সখা'তে বিবিধ সংবাদ নাই কেন? তাহার উত্তর স্থানের অভাব। আমরা স্থান হইলেই বিবিধ সংবাদ দিতে পারি।

২। ভীমের কপাল যেরূপ গল্প এই ভাবের গল্প অধিক থাকিবে কিনা?—যদিও এইরূপ ইংরাজী কাগজে এরূপ গল্প অনেক থাকে, তথাপি আমরা নানা কারণে এরূপ গল্প অধিক দিতে পারিব না।

৩। নানারূপ খেলার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই কেন? নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপায় প্রভৃতি শিখাইয়া দেওয়া হয় নাই কেন? এইরূপ প্রশ্ন কয়েকজন করিয়াছেন, তাহারও উত্তর স্থানাভাব।

৪। 'সখা'র ভাষাটী আরও সহজ করা হইবে কিনা? এইরূপ প্রশ্ন অনেকে করিয়াছেন। 'সখা'র লেখক ও লেখিকাদিগকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করা হইয়াছে; এরূপ আশা করা যায় যে অল্প কালের মধ্যেই 'সখা'র ভাষা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িবে। তবে 'ভীমের কপাল' প্রভৃতি গল্পের ভাষা খুব সহজ না হইলেও চলে, কেননা গল্প পাইলে [illegible] শক্ত ভাষা বুঝিয়া পড়িবে। [illegible]

আমাদের যাহা বলিবার ছিল [illegible] বলিতেছি [illegible] যাছে। 'সখা'র উপকারী বন্ধু [illegible] উৎসাহ, উপদেশ প্রভৃতির [illegible] আমরা শেষ করিতেছি।
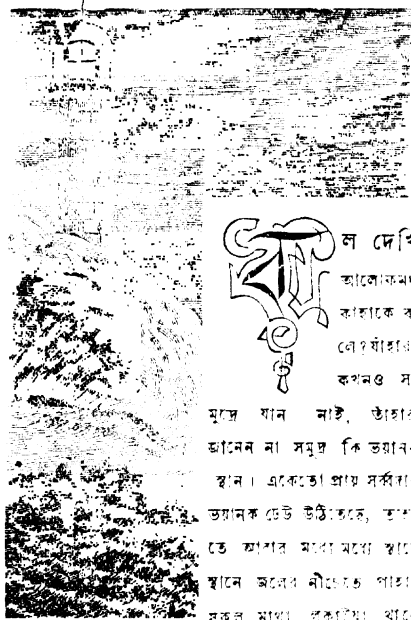
আলোক-মঞ্চ।

বল দেখি আলোকমঞ্চ কাহাকে বলে? যাঁহারা কখনও সমুদ্রে যান নাই, তাঁহারা জানেন না সমুদ্র কি ভয়ানক স্থান। একেতো প্রায় সর্ব্বদাই ভয়ানক ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে জলের নীচেতে পাহাড় সকল মাথা লুকাইয়া থাকে। ইহাতে জাহাজগুলিকে যে কত সময় কত বিপদে পড়িতে হয়, তাহার সীমা নাই। যদি রাত্রিতে এই সকল পাহাড়ের নিকটে কোনরূপ আলোকের বন্দোবস্ত না থাকে, তাহা হইলে জাহাজের কি ভয়ানক বিপদ হইবার সম্ভাবনা, তাহা বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পার। অন্ধকারে জাহাজ বেগে [illegible] আসিতেছে, কোথাও কোন গোল নাই, হঠাৎ একটা পাহাড়ে লাগিয়া জাহাজখানি চুরমার হইয়া গেল, তখন কত লোকের প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা, ভাব দেখি? এইরূপ ভয়ানক বিপদ যত দূর সম্ভব নিবারণ করিবার জন্য পৃথিবীর অনেক স্থানে পাহাড়ের উপরে [illegible] নিয়ম করা হইয়াছে [illegible] একটা আলোকমঞ্চ। [illegible] সকল পাহাড়ই যে সমুদ্র-জলের নীচে লুকাইয়া থাকে তাহা [illegible] একটী উপরে মাথা তুলিয়াও থাকে, কিন্তু জোয়া[illegible] সে গুলিও খানিকটা ডুবিয়া যায়। সমু[illegible] এই সকল পাহাড়ের উপরে শক্ত করিয়া প্র[illegible] তাহার উপরে আলো দিবার বন্দোবস্ত [illegible] নিকটে এক জন রক্ষক বসিয়া থাকে। তাহাকে পরিবারের সহিত এইখানে থাকিতে হয়; সন্ধ্যা হইবামাত্র রক্ষক মঞ্চের উপরে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেয়। এই আলোক অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং দূরে যে সকল জাহাজ আসিতেছে, তাহারা এই আলোক দেখিয়াই সতর্ক হয়। কেবল যে লুকান পাহাড়ের উপরেই আলোক দিবার নিয়ম করা হইয়াছে তাহা নহে; সমুদ্রের [illegible] যে সকল স্থানে কিছুমাত্র বিপদের সম্ভাবনা, সেইখানেই রাত্রিতে আলোক দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের গঙ্গানদী যেখানে সাগরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহার নিকটেই এক স্থানে একটী আলোকমঞ্চ আছে, কিন্তু সেটী পাহাড়ের উপরে নহে। এইরূপ আলোকমঞ্চ তোমার আমার কাজে লাগে না, কেননা আমরা সমুদ্রে যাওয়া দূরে থাকুক, বাড়ী ছাড়িয়া [illegible] নড়িতে চাহি না; কিন্তু [illegible] সমুদ্রে [illegible] ফিরিতে হয়, সেই সকল জাহাজের নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তাহারা এই আলোকমঞ্চ দেখিয়া সুখী কিনা? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি, যে তিনি মনুষ্যকে এমন সুবুদ্ধি দিয়াছেন, এবং মানুষের নিকটে [illegible] যে নাবিকদিগের প্রাণ বাঁচাইবার এমন সুন্দর উপায় করা হইয়াছে।"

কিন্তু সমুদ্রের [illegible] সকল পাহাড়, [illegible] যে আলোকমঞ্চ প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে, তাহা নহে। অনেক পাহাড় নাই; যে সকল স্থান [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] এইরূপ একটী পাহাড়ের স্থানে এক জন বিধবা জেলেনী বাস করিতেন। [illegible] জন্য ছোট ছোট [illegible] কিন্তু একটী [illegible] তিনি দেখিলেন রাত্রিতে অনেক জাহাজ পাহাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, এবং তাহাতে বড় বিপদ হয়, অথচ সেখানে একটীও আলোকমঞ্চ নাই। বিধবা জেলেনী মনে মনে ভাবিলেন যে 'যদি আমার জানালায় একটা আলো সমস্ত রাত্রি রাখা যায়, তাহা হইলেও তো কাজ চলে।' কিন্তু তেলের পয়সা কোথায় পাইবেন, এই নূতন ভাবনা তাঁহার উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিশ্রমে যে রোজগার হয়, তাহাতে তেলের পয়সা যোটে না, সুতরাং তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন কিছু বেশী পরিশ্রম করিয়া তেলের পয়সা পুরাইবেন। যে প্রতিজ্ঞা সেই কাজ; ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হইল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু জানালায় আলোক দেখিয়া অনেক জাহাজ যে বাঁচিয়া গেল, এই আহ্লাদে বিধবার কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে

হইত না। তিনি প্রতি দিন বাতি দিতেন, এক দিনও জানালায় আলো দিতে ভুলেন নাই।

আমরা আলোকমঞ্চ সম্বন্ধে আর একটী গল্প বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। একবার এক আলোকমঞ্চের রক্ষক কোন কাজে সমুদ্রের পারে নগরে গিয়াছিল। তাহার অল্প-বয়সের একটী মেয়ে ঘরে ছিল। সন্ধ্যা হইল, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির উৎপাতে রক্ষক পার হইয়া আসিতে পারিল না। এ দিকে আলো দিবার সময় হইল, অন্ধকারে এখনি দলে দলে জাহাজ আসিয়া পাহাড়ে ঠেকিয়া যাইবে—তবেই তো সর্ব্বনাশ! বালিকা অনেক উঠিল কিন্তু প্রদীপের সলিতা অবধি পৌঁছিতে পারিল না। তখন সে [illegible] খানি, শুকনো উপর উপর সাজাইয়া তাহার উপরে উঠিল—অল্পবয়স্ক বালিকাটী কি সুবুদ্ধি—এবং সেখানেই সহজে আলো জ্বালিয়া দিল। পিতা পরে বাড়ী আসিয়া সকল শুনিয়া খুসি হইলেন এবং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। বালিকা যদি বুদ্ধি করিয়া আলো জ্বালিয়া না দিত, তাহা হইলে কি হইত ভাব দেখি!

আলোকমঞ্চ হইতে একটী বড় ভাল উপদেশ পাই। সমুদ্রে চলিতে চলিতে যদি আলোকমঞ্চ না থাকিত তাহা হইলে যেমন অনেক জাহাজ নষ্ট হইত, সেইরূপ মানুষের জীবনে যদি একটী জিনিস না থাকে, যাহাকে দেখিয়া সে চলিবে, তাহা হইলে মানুষ নিশ্চয়ই বিপদে পড়ে। সে জিনিসটী ধর্ম্ম। ধর্ম্মের দিকে যদি মানুষ লক্ষ করিয়া চলে, তাহা হইলে তাহার বিপদ কে ঘটায়? আর যে ধর্ম্মকে চিনিয়া, ধর্ম্মকে লক্ষ রাখিয়া চলে, তাহার বিপদ হয় না। যদি জাহাজের লোক আলোকমঞ্চের আলোক থাকা সত্ত্বেও বিপদে পড়ে তবে সে দোষ তাহাদের লোকদিগের, আলোকের নহে; তেমনি যদি ধর্ম্ম থাকিতেও তাহাকে না দেখিয়া চলিয়া মানুষ বিপদে পড়ে, তবে সে দোষ কাহার? বালকবালিকাগণ! সাবধান! বড় হইতেছ, সমুদ্রের মধ্যের পাহাড়ের ন্যায় অনেক বিপদ-আপদ আসিবে, কিন্তু যদি ধর্ম্মকে দেখিয়া, ধর্ম্মকে সহায় করিয়া চল, তবে কিসের ভয়?

হেয়ার সাহেবের গল্প।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াও হেয়ার সাহেব এদেশের এত উপকার করিয়া গেলেন, আর আমরা নিজের দেশে থাকিয়াও দেশের কোন উপকার করিতে পারিনা কেন? ইহার কারণ এই যে হেয়ার সাহেবের চরিত্রে এমন সকল গুণ ছিল যাহা আমাদিগের নাই। মহাত্মা হেয়ার সকলকেই ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার হৃদয় দয়াতে পূর্ণ ছিল। এই ভালবাসা ও এই দয়াতেই বাঙ্গালী তাঁহার বশ ছিল। আমরা হেয়ার সাহেবের যে সকল গল্প পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি, তাহার গুটি কয়েক বলিলে আমাদের কথা বুঝা যাইবে।

১। হেয়ার সাহেব পীড়িত বালকদিগের বাড়ীতে যাইতেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার পাল্কীতে ডাক্তারের মত প্রায় সমস্ত ঔষধ থাকিত। কেবল পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন তাহা নহে; যাহাতে পীড়া না হইতে পারে তাহার জন্যও চেষ্টা করিতেন। হেয়ার সাহেব জানিতেন বালকদিগের অনেক পীড়াই অপরিষ্কার শরীরে থাকার জন্য হইয়া থাকে; এই জন্য তিনি প্রতি দিন তাঁহার স্কুল ছুটি হইবার পর এক খানা গামছা হাতে করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এবং বালকেরা বাড়ী যাইবার সময় এক এক করিয়া প্রত্যেকের গায়ের ধূলি মুছাইয়া দিতেন এবং ঘষিয়া দেখিতেন গায়ে ময়লা আছে কিনা। রাত্রি জাগিয়া যাত্রা ইত্যাদি শুনিলে শরীর, মন, দুয়েরই অপকার হইতে পারে, এই জন্য মহাত্মা হেয়ার কোথাও যাত্রা হইতেছে শুনিলে চুপি চুপি সেখানে গিয়া পরিচিত ছেলেদের ধরিয়া আনিতেন। এই ভালবাসাতেই ছেলেরা তাঁহার বশীভূত ছিল; এবং হেয়ার সাহেবের দিকে এই ভালবাসার টান ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীর ছেলেরা তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা করিতে পারিয়াছে। যে বাড়ীতে হেয়ার সাহেব থাকিতেন, তাহা যেন বাঙ্গালীর [illegible] মত হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে [illegible] লীর ছেলে, হেয়ার সাহেবের [illegible] করিয়া ফিরিত—তাহাদের উৎ[illegible] সাহেবের কিছু মাত্র কষ্ট হইত ন[illegible]

২। হেয়ার সাহেবের অসাধারণ দয়া ছিল। যদি শুনিতে পাইলেন কোন দরিদ্র বালক সঙ্গতি-অভাবে লেখা পড়া শিখিতে পারিতেছেনা, তাহা হইলে অমনি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া অথবা তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার কিরূপ অবস্থা সেই বিষয়ে সম্বাদ লইতেন। যদি প্রকাশ পাইল যে বালকের অবস্থা ভাল নহে, তাহা হইলে হেয়ার সাহেবের দয়া উপস্থিত হইল, তিনি সেই বালকের বিদ্যালয়ের বেতন এবং পুস্তক প্রভৃতি যোগাইতে থাকিলেন। একবার আমাদের কার্য্যালয়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী বিধবা তাঁহার ছেলেকে লইয়া বাস করিতেন। বিধবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করেন কিন্তু টাকা নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বদা দুঃখ করিতেন। অবশেষে এক দিন তিনি তাঁহার ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া ঠনঠনিয়ার স্কুলে উপস্থিত হইলেন। হেয়ার সাহেব বিধবার অবস্থা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু যে শ্রেণীতে বালকটী পড়িতে পারে তাহাতে আর স্থান নাই বলিয়া বিধবার পুত্রকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে পারিলেন না। বিধবাটী তাঁহার ছেলেকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেলেন। হেয়ার সাহেব এই ক্রন্দন দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইলেন, এবং এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে বিধবার বিষয়ে ভালরূপ জানিবার জন্য সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিধবা স্ত্রী-লোকটী শুনিতে পাইলেন হেয়ার সাহেব আসিয়াছেন; তখন তিনি ছেলেটীকে লইয়া সাহেবের নিকট আসিলেন। সাহেবের দিকে চাহিয়া তাঁহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইতে লাগিল, কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই দয়ার সাগর হেয়ার এই ব্যাপার দেখিয়া এতই ব্যথিত হইয়াছিলেন যে কেবল পুত্রটীকে ভর্ত্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, ও তাহার মাতার খরচের জন্যও নিজের টাকা হইতে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

৩। বালকদিগের চরিত্রের দিকে মহাত্মা হেয়ারের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। পরস্পরের প্রতি কুৎসিত কথা ব্যবহার করিলে হেয়ার সাহেব বড়ই বিরক্ত হইতেন। যে সকল বালক কুৎসিত কথা ব্যবহার করিত, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে শিক্ষকদিগকে বলিতেন, এবং সকল বালককে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেন। একবার একটী বড় লোকের ছেলে অপর একটী বালকের সহিত চটাচটি করিয়া তাহার নামে অতি কুৎসিত একটী পদ্য লিখে; এবং সেইটী ছাপাইয়া প্রায় রাত্রি এক টার সময় একবয়স্ক কয়েক জন বালকের সাহায্যে পটলডাঙ্গার স্কুলে (যাহা এখন 'হেয়ার স্কুল' এই নাম পাইয়াছে, তথায়) দেয়ালে মারিয়া দিতে আইসে। হেয়ার সাহেব কোন উপায়ে এই বড় লোকের ছেলের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিরপরাধী বালকের পাছে নিন্দা হয়, এই জন্য সেই ভয়ানক রাত্রিতে তিনি স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কখন সেই ছেলেগুলি আসিবে তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন। বৃষ্টি হইতেছিল, তাহাতে সাহেবের সমস্ত শরীর ভিজিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার চক্ষু নাই। একটী অসচ্চরিত্র বালককে খারাপ কাজ করিতে না দেওয়া এবং একটী সৎ বালকের নামে মিথ্যা দুর্নাম হইতে না দেওয়া, এই দুই প্রয়োজনে হেয়ার সাহেব রাত্রিতে স্কুলে আসিলেন, এবং চুপি চুপি এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে যখন সেই দুষ্ট 'বড় লোকের ছেলে' তাহার কুৎসিত পদ্যের কাগজ খানা দেয়ালে মারিয়া দিতে যাইতেছিল, তখন হেয়ার সাহেব জলে ভিজিয়া ভূতের মত সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবকে দেখিয়া সকলেরই চক্ষু স্থির—দৌড়িয়া কে কোন দিকে পলাইবে তাহার স্থিরতা রহিল না!

হেয়ার সাহেবের দয়া ছোট, বড়, আপনার, পর, চিনিত না। যে দয়ার উপযুক্ত সেই দয়া পাইয়াছে, যে উৎসাহের উপযুক্ত, সেই উৎসাহ পাইয়াছে হেয়ারের কাছে গিয়া কেহ মুখ শুষ্ক করিয়া ঘরে ফিরে নাই।

৪। আহারের বিষয়ে হেয়ার সাহেব প্রায় হিন্দু ঋষিদিগের মত ছিলেন। মদ মাংস ভাল বাসিতেন না; গোদুগ্ধ, নারিকেল দুগ্ধ এবং ফল মূল, ইহাই তাঁহার প্রধান খাদ্য ছিল। অথচ তাঁহার গায়ে বিলক্ষণ বল ছিল। যাঁহারা বলেন সর্ব্বদা মাংস না খাইলে শরীরে বল হয় না, তাঁহারা ইহাতে বোধ হয় কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। তাঁহার বলের দুটী দৃষ্টান্ত দিব। একবার একটী সাহেবের সহিত 'জিদ' করিয়া হেয়ার সাহেব বারাকপুরে (কলিকাতা হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরে) হাটিয়া যান, এবং বিশ্রাম না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন; ইহাতে তাঁহার বিশেষ কিছুই ক্লেশ হয় নাই। অন্য কেহ হয়ত এইরূপে ক্রমাগত ১৪ ক্রোশ পথ চলিলে দুদিন পায়ের বেদনায় পড়িয়া থাকিত, কিন্তু হেয়ার সাহেবের সবল শরীরে ইহাতে কোন অসুবিধা হয় নাই। আর একবার একজন মাতাল জাহাজী গোরা পটলডাঙ্গা স্কুলে আসিয়া ভয়ানক উপদ্রব করে; এক জন ধনীর ছেলের গাড়ী রাস্তায় ছিল, লাঠি দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং সহিস্ কোচোয়ানকে মারিতে যায়। স্কুলের দ্বারবান অসুবিধা দেখিয়া ঘরে লুকাইল। মাতাল গোরা গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া এক দিকে চলিয়া যায়, এমন সময় হেয়ার সাহেবের পাল্‌কী দেখা দিল। দ্বারবানের নিকট ব্যাপার কি জানিতে পারিয়া, হেয়ার সাহেব সেই মাতালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন, এবং ১০ মিনিটের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া পুলীশে দিলেন।

হেয়ার সাহেবের সম্বন্ধে আমরা অনেক গল্প শুনিয়াছি এবং পড়িয়াছি, কিন্তু আর অধিক বলিবার স্থান আমাদের নাই। একটী কথা বলিয়া আমরা শেষ করিব। হেয়ার সাহেব আমাদিগের জন্য যে এত চেষ্টা করিয়া গেলেন, আমরা তাহার কি শোধ দিলাম? যদি তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত হয়, তবে তাঁহার ছবি প্রস্তুত করিয়া ঘরে রাখিলেই কি হইবে? অথবা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্কুল কালেজের সম্মুখে রাখিলেই চলিবে? যদি বাস্তবিক তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চাই, তাহা হইলে তিনি যেরূপ সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র হইতে বলিয়া গিয়াছেন আইস সেইরূপ হই।

ভীমের কপাল।

১ম অধ্যায়।

১১—সালের দুর্গা-বিসর্জ্জনের দিন যদি কেহ মধুডাঙ্গা ও গোপালপুরের মধ্যের রাস্তায় বেলা সাড়ে সাতটার সময় উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন এক স্থানে কি একটা জিনিশ দেখিবার জন্য ছোট বড় পুরুষ মেয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াইয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল—কাহারও মুখেই কথা নাই। অবশেষে একজন বলিয়া উঠিল, "ছোট বাবু, মিছে চেষ্টা; ছেলেটী বোধ হয় মারা পড়েছে।" যাঁহাকে এ কথা বলা হইল তিনি ভিড়ের মধ্যে বসিয়া একটী অজ্ঞান বালকের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—সেই অজ্ঞান বালকের মস্তক তাঁহার ক্রোড়ে; চক্ষে জল; বালকের এই দুরবস্থা দেখিয়া তিনি হাউ হাউ করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে ঔষধ সেবন করাইতেছেন। আমরা বলিতেছি বান বাবুটী কে? ইনি গোপালপুর নিবাসী সুজনখালীর মিত্রদের ছোট ছেলে দয়াল মিত্র, বয়স ১৮ বৎসর মাত্র।

কালেজে পড়িতেন বটে কিন্তু হোমিওপেথী ঔষধে বড় বিশ্বাস; তাই সুযোগ পাইলেই হোমিওপেথী ঔষধ লইয়া গরিব দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। দীনদয়াল বাবু পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছেন, এখনও যান নাই। গ্রামস্থ পরিচিত বৃদ্ধের এই কথাগুলি দীনদয়াল বাবুর হৃদয়ে বড় আঘাত করিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দুটী তিনটী ঔষধ সেবন করাইলেন, তথাপি বালকের চৈতন্য নাই। আহা, কি দয়া! পরের ছেলে রাস্তায় পড়িয়া আছে শুনিয়া দীনদয়াল শত কাজ ফেলিয়া ঔষধের বাক্স লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং আরোগ্য করিতে পারিতেছেন না 'আহা, কি হবে' এই ভাবিয়া কাঁদিয়া অস্থির! পাঠকপাঠিকাগণ, যাহার সহিত পরিচয় নাই, তাহার কষ্ট দেখিলে কি তোমাদের এইরূপ দয়া হয়?

হঠাৎ এ কি? এই যে সকলে 'ওই চোক খুলেছে' বলিয়া চীৎকার করিল?—দীনদয়াল বাবুর ঔষধ ও সেবার গুণে বালক চক্ষু মেলিল। "বিপিন, এখানেও তুমি আমার সঙ্গে এসেছ" বলিয়া বালক চারিদিকে চাহিল। পাঠকপাঠিকা! চিনিয়াছ বালকটী কে? এই আমাদের সেই ভীমেন্দ্র। কিন্তু ভীমেন্দ্রকে আর চেনা যায় না। চোখ কোটরগত—মুখ হল্‌দে বর্ণ, শরীর হাড়সার বলিলেও হয়। ভীমেন্দ্র এখানে কি প্রকারে আসিল, তাহা ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে বলা যাইবে। চৈতন্য হইবার পূর্ব্বে ভীমেন্দ্র স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন চারিদিক হইতে তাঁহাকে সাপে আক্রমণ করিয়াছে—সাপগুলি তাহার পায়ের মধ্যে, পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে, টানিলেও বাহির হয় না তখন সে চীৎকার করিয়া ডাকিল 'বিপিন!' স্বপ্নে

স্ব বিপিন আসিয়াছে, তাহার মস্তক
বসিয়াছে; অমনি সর্পগুলি বিপিনকে
ইয়া গেল। তখন সে আহ্লাদিত
উঠিল "এখানেও তুমি আমার সঙ্গে এসেছ?' দীনদয়াল বলিলেন "আমি বিপিন নই। তুমি কে? আচ্ছা থাক, এখন তোমাকে বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছে; আমাদের বাড়ীতে চল সুস্থ হইলে সকল শুনিব।" —পালকী প্রস্তুত ছিল। দীনদয়ালের ইঙ্গিতে বেহারারা ভীমেন্দ্রকে তুলিয়া সুজনখালীর দিকে লইয়া চলিল। দীনদয়াল পাল্কীর পাশে হাঁটিয়া চলিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভীমেন্দ্র বাহির হইল, কাহারও কথা শুনিল না; বৃষ্টির জলের সঙ্গে চক্ষের জল মিশাইয়া ভীমেন্দ্র ছুটিল। অন্ধকার; মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া অন্ধকারকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিতেছে, তখন ভীমেন্দ্র রাস্তায়। কি ভয়ানক রাগ! এ রাগে কাহার ক্ষতি ভীমেন্দ্র তাহা বুঝিল না। মাতুলালয় ছাড়িয়া কতক দূরে গেলে ভীমেন্দ্র দেখিতে পাইল সম্মুখে একখানি কুড়ে ঘর। ভীমেন্দ্র অনেক বৃষ্টিতে ভিজিয়া এই কুড়ে ঘরে আশ্রয় লইল। ভীমেন্দ্র জানিত না, এই কুড়ে ঘর কাহার জানিলে হয়ত ঢুকিত না। সেই গ্রামে এই ঘরখানি 'শাকিনার ঘর' বলিয়া বিখ্যাত— এক পাগল সেই ঘরে থাকিত, গ্রামবাসীরা ভয়ে কেহই সন্ধ্যার পরে ঐ ঘরে যাইত না। ভীমেন্দ্র সেইখানে আশ্রয় লইল। ভীমেন্দ্র ভাবিতেছিল "কেন, পরমেশ্বর এ হতভাগা বাঙ্গালদের দেশে এসেছিলাম— এত কষ্টও কপালে ছিল। বিধাতার মনে এতও ছিল।" ভীমেন্দ্র! ভীমেন্দ্র! সাবধান তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিন্দা করিও না; নিজের দুর্ব্বুদ্ধির ফলভোগ করিয়া, ভগবানের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছ? মূর্খ তুমি!

ভীমেন্দ্র নিজের মনে বকিতে লাগিল—"এমন

তেছে, এমন সময় 'ধূলিপড়া' দিলেই অর্থাৎ মন্ত্র পড়িয়া ধূলি নিক্ষেপ করিলেই সাপ অমনি মাথা নামায়, ইহা বোধ হয় দেখিয়াছ। মূর্খ লোকেরা বলে ইহা মন্ত্রের গুণ। তোমাদিগকে এই মন্ত্রটী শিখাইয়া দিতেছি, কিন্তু সাবধান কাহাকেও বলিয়া দিওনা! ধূলো খুব সুন্দর রকমে গুড়ো করিয়া বলিবে "হে সাপ, আমাদের চক্ষের উপরে যেমন চক্ষের পাতা আছে, ঈশ্বর তোমাকে সেরূপ দেন নাই; আর আমাদের চক্ষু দু[illegible] বলিতেছি দুই পাশে, তোমার চক্ষু দুটী সেরূপ[illegible] লো[illegible] প্রায় মাথার উপরে ভগবান দিয়াছে[illegible] ধূলি নিক্ষেপ করিলেই তাহ[illegible]

তোমাকে কাণা করিয়া দিবে—এবং কাজেই তোমাকে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া মাটীর উপরে জড়শড় হইয়া পড়িতে হইবে। তোমার এইরূপ গঠন এবং ধূলিনিক্ষেপের এই ফল জানিয়া, এই ধূলি নিক্ষেপ করিলাম—সহজবুদ্ধির দোহাই তুমি এখনই কাণা হইয়া যাও।—এই বলিয়া ধূলি নিক্ষেপ করিলেই সাপের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

এইত গেল সাপ-খেলার কথা। তাহার পর সাপের স্বভাবের কথা কিছু বলা উচিত। সর্পজাতি স্বভাবতঃ অতিশয় নিষ্ঠুর। অকারণে অথবা সামান্য কারণে সকলকেই দংশন করে। সকল সাপের দংশনে মানুষ মরেনা। যাহাদের বিষ নাই, তাহারা দংশন করিলে সামান্য জ্বালা ভিন্ন আর কিছুই হয় না, কিন্তু বিষাক্ত সাপের মত ভয়ানক শত্রু মানুষের আর নাই। বনে না গেলেই বাঘের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নদীতে না গেলেই কুমীরের ভয় থাকেনা, কিন্তু এমন স্থান কোথায় যেখানে সর্প যাইতে পারেনা? এই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কয়েকটী উপায় বলা পারে।—যেখানে সাপের ভয়, সেই সকল স্থানে যাইতে হইলে একটা আলো লইতে পারিলে তো ভালই, অন্ততঃ একগাছা লাঠি লইয়া খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে যাইবে। শীতের সাপে প্রায় কামড়ায় না। গ্রীষ্মের দিনে এই সতর্কতা অবলম্বন করিলে চলিতে পারে। যদি নিকটে সর্প থাকে, তাহাহইলে শব্দ শুনিয়া চলিয়া যায়। বাসগৃহের মধ্যে যদি ইন্দুর অধিক থাকে, তাহা হইলে সর্প আসিতে পারে, তাহা মনে রাখিও কারণ সর্প ইন্দুরকে 'ফলার' করিতে বড় ভাল বাসে। সাহাতে সর্প না আসিতে পারে তজ্জন্য একটী [illegible]লম্বন করিতে একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার [illegible]াছেন; সে উপায়টী এই—আজ কাল [illegible]ক পল্লিতেই ডাক্তারী ঔষধ পাওয়া [illegible]পল্লি হইতে কিছু কার্ব্বলিক য়্যাসিড আনিবে। তাহার পর টুকরা টুকরা করিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া কার্ব্বলিক য়্যাসিডে ভিজাইতে হইবে। অতঃপর যে সকল স্থান দিয়া সর্পের আসিবার সম্ভাবনা, অথবা যে সকল স্থানে সর্পের থাকিবার সম্ভাবনা, এইরূপ প্রত্যেক গর্ত্তের মুখে ভিজান বস্ত্র এক এক খণ্ড রাখিয়া দিবে। কিন্তু সাবধান হইবে যেন ভিজাইবার সময় কার্ব্বলিক য়্যাসিড হাতে না লাগে, তাহা হইলে ফোস্কা হইতে পারে।

বালকবালিকাদিগের মধ্যে অনেককে এই সর্পের মত বলিয়া মনে হয়। অনেক বালক বালিকা সামান্য কারণে, মাতার প্রতি, ছোট ভাইভগিনী-দিগের প্রতি, দাস দাসীর প্রতি ফোঁস করিয়া উঠিয়া থাকেন। এই মন্দ অভ্যাসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রত্যেকেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়া, ভাল-বাসা, প্রভৃতি মনের ভাব দিয়া সর্প অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দিয়াছেন। এখন, আমরা যদি সেই দয়া, সেই ভালবাসা সকলকে না দেখাই, এবং একটুতেই জ্বলিয়া উঠি, তাহা হইলে পরমেশ্বরকে অপমান করা হয়। পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ সাপের মত চরিত্র কাহারও আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যদি কাহারও থাকে, তিনি সত্বর আপন স্বভাব ভাল করিয়া যথার্থ মানুষ হউন।

(ক) রত্নাকরের মুক্তি-লাভ।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের এই ভারতবর্ষের এক বনে রত্নাকর নামে এক ডাকাত বাস করিত। রত্নাকর ব্রাহ্মণের ছেলে অথচ বাপ মায়ের অযত্নে অথবা নিজের দোষে কিছু মাত্র লেখা পড়া শেখে নাই। 'দশকর্ম্মান্বিত' বামণের ছেলেরা যেরূপ মন্ত্র তন্ত্র পড়াইয়া দু দশ

টাকা ঘরে আনে, মূর্খ রত্নাকরের বোধ হয় ততটুকু বিদ্যাও হয় নাই। এদিকে বাড়ীতে পোষ্য অনেকগুলি, তাহাদের না খাইতে দিলে চলে না; এইরূপ অবস্থায় রত্নাকরকে বাধ্য হইয়া এই ভয়ানক নিষ্ঠুর কাজে যাইতে হইয়াছিল। রত্নাকর যে বনে 'আড্ডা' করিয়াছিল তাহার মধ্য দিয়া একটি রাস্তা গিয়াছে; এখান দিয়া প্রত্যহই অনেক লোক যাতায়াত করে। রত্নাকর কাহাকেও ছাড়ে না; ছোট বড়, ছেলে বুড়ো, পুরুষ মেয়ে, যাহাকে পায়, রত্নাকর মারিয়া কাপড় ও পয়সা লয়। এইরূপে অনেক দিন রত্নাকর সেই বনে থাকিয়া দিনপাত করিতেছিল; এমন সময়ে এক দিন ব্রহ্মা ও নারদ ঋষি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রাচীন হইয়াছেন, দেখিয়া রত্নাকরের কঠিন মনে একটুকুও দয়ার উদয় হইল না। সে লোহার মত হাতে লোহার মুগুর তুলিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে গেল। ব্রহ্মা বলিলেন "বাপু! তুমি কে? কেন আমাদের মার্‌বে?" রত্নাকর উত্তর করিল "আমি এই বনে থাকি, নাম রত্নাকর; এই পথ দিয়া যে লোক জন যায় তাদের মেরে পয়সা রোজগার করে দিন চালাই—তোমরা আমার হাতে পড়েছ, তোমাদের রক্ষা থাক্‌বে না।" ব্রহ্মা বলিলেন "বাপু,রত্নাকর! তুমি যে রোজ রোজ এই পাপ কর এই সব কার জন্য কর? তোমার এ পাপের ভাগী কি কেউ হবে? তোমার কে আছে? তাদের জিজ্ঞাসা করে এসতো।" রত্নাকর মনে ভাবিল "বুড়ো ব্রাহ্মণ দুটো কি চালাক! এই বলে হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌ছে! কিন্তু রত্নাকর শর্ম্মার কাছে ওসব ফিকির খাট্‌বে না।" পরে বলিল "ওগো, তোমাদের ওসব চালাকি রেখে দাও। রত্নাকর শর্ম্মা তোমাদের মত ঢের লোক দেখেছে। আমি এখন বাড়ীতে খবর জান্‌তে যাব; আর তোমরা এ দিকে মার্‌ টেনে দৌড়—হুট্! ওসব কি আর আমি বুঝিনে?"

ব্রহ্মা বলিলেন "বাপু! আমরা বুড়ো মানুষ, কবে মরে যাই, এখন অধর্ম্ম কর্‌বো? তা বাপু, তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, আমাদের এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাও!" তখন রত্নাকরের মনে একটু ভয় হইল, ভাবিল "তবে কি সত্যই আমার পাপের ভাগী কেউ নাই? না, এমন হবে না! যাদের জন্য পাপ করি, তারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগী হবে। আজ না জানি, কি হয়।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুজনকে গাছে বাঁধিয়া, এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে রত্নাকর ঘরে গেল।

রত্নাকর ঘরে গিয়াই আপনার বৃদ্ধ পিতার নিকট গেল, এবং জিজ্ঞাসা করিল "পিতা, আমি যে আপনাদিগের জন্য ও আমার নিজের জন্য এই পাপ করিতেছি, ইহার জন্য কি আমি একা দায়ী হইব, না আপনিও দায়ী আছেন?" পিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "বাঃ! আমি কেন দায়ী হব? তুমি যত দিন বালক ছিলে, গায়ের রক্ত জল ক'রে তোমাকে মানুষ করিয়াছি; এখন তুমি মানুষ হয়ে আমাদিগকে প্রাচীন বয়সে পালন করবে, এই ত নিয়ম। তা, এখন কি উপায়ে টাকা উপার্জ্জন কর, তা আমি কি জানি?" রত্নাকর কোনও কথা না বলিয়া মায়ের নিকট গেল। মাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও পিতার ন্যায় উত্তর করিলেন। তখন রত্নাকর নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল; স্ত্রী রত্নাকরের আসিবার কথা জানিয়া বলিলেন "তুমি যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছ, তখন আমাকে পালন করিতে তুমি বাধ্য, কি উপায়ে তুমি টাকা আন, তাহা আমি শুনিতে চাই না। যদি অসৎ পথ বোধ হয়, ছাড়িয়া দিয়া সৎপথে যাও; আমাকে ভরণ পোষণ করি[illegible] বলিতেছি তোমাকে অসৎ কাজ করিতে আমি [illegible]প লো[illegible] নাই, তবে কেন আমি তোমার [illegible] হইব?" স্ত্রীর এই কথায় রত্নাকরের [illegible]

ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবে কি এত বৎসর ধরিয়া রত্নাকর যে সমস্ত পাপ করিয়াছে, তাহার কেহ ভাগী হইবে না? রত্নাকর ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এতদিন আশা ছিল যে যাহাদের জন্য পাপ করিতেছে তাহারা নিশ্চয়ই পাপের কিছু কিছু অংশ লইবে, কিন্তু এখন যখন সে আশা রহিল না, যখন পিতা, মাতা, স্ত্রী সকলেই এক বাক্যে সমস্ত পাপের বোঝা রত্নাকরের ঘাড়ে ফেলিয়া দিলেন, রত্নাকর বুঝিল, পাপের বোঝা কি ভয়ানক। আর সে গৃহে থাকিতে পারিল না; ভবিষ্যতে পাপের ইচ্ছা ত গেলই, কিন্তু যাহা হইয়াছে, কিসে তাহা হইতে উদ্ধার হইবে, এই ভাবনায় রত্নাকরের শরীরের রক্ত শুকাইয়া যাইতে লাগিল। অস্থির হইয়া রত্নাকর গৃহ হইতে বাহির হইল, এবং 'কি হইবে' এই ভাবিতে ভাবিতে যেখানে বৃক্ষডালে ব্রহ্মা ও নারদ বাঁধা ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল। রত্নাকর অবিলম্বে তাঁহাদের বন্ধন খুলিয়া দিল, এবং সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার সদ্গতির কি হইবে তাহার পরামর্শ চাহিল। ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন "বাপু! তখনই বলিয়াছিলাম, তা বিশ্বাস কর নাই। এখন দেখিলেত? যাহউক তুমি এক কর্ম্ম কর। পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া অতি সহজ কাজ। যিনি পাপীর রক্ষাকর্ত্তা ভগবান, পাপ যাঁহাকে দেখিলে পলায়ন করে, সেই দয়াময়ের চরণ সার করিয়া তাঁহাকে ভক্তির সহিত সরল প্রাণে ডাক, কোনও পাপ থাকিবেনা।" রত্নাকরের আশা হইল, কিন্তু যে জিহ্বা জীবনে কখনও ধর্ম্মের কথা বলে নাই, কোনও মিষ্ট কথা উচ্চারণ করে নাই, সেই পাপময় ... ঈশ্বরের নাম আসিল না। তখন ব্রহ্মা ... ভাবিয়া, অনেক উপায়ে রত্নাকরকে ... শিক্ষা দিলেন, ঈশ্বরের ভালবাসা ও ... কথা বলিলেন; এবং কিরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, তাহা বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রত্নাকর ব্রহ্মার নিকট যে অমূল্য উপদেশ লাভ করিলেন, তাহাতেই তিনি মহামুনি হইয়া গেলেন। এই উপদেশ রত্নাকর জীবনে কখন বিস্মৃত হন নাই। ব্রহ্মার কথা অনুসারে রত্নাকর ঘোর তপস্যা অর্থাৎ একমনে ঈশ্বরের নাম করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি ঈশ্বরের নামে এত মজিয়া গেলেন যে আহার নিদ্রার দিকে মন রহিল না, বাহিরের জ্ঞান বন্ধ হইয়া গেল: তাঁহার শরীর পৃথিবীতে, কিন্তু প্রাণ ঈশ্বরেতে ডুবিয়া রহিল। রামায়ণে উল্লেখ দেখা যায় যে রত্নাকর তপস্যা করিতে করিতে উইপোকা তাঁহার শরীরের চারিদিকে মাটীর ঢিবি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মাংস চর্ম্ম খাইয়া নিঃশেষ করিয়াছিল। অনেক দিন পরে ব্রহ্মা রত্নাকরের কুশল জানিতে আসিয়া দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড উইঢিবির মধ্য হইতে ভগবানের নামের শব্দ হইতেছে। তিনি উইঢিবি পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্য হইতে রত্নাকরকে বাহির করিলেন, এবং বল্মীক অর্থাৎ উইঢিবি হইতে বাহির করিলেন বলিয়া রত্নাকরকে বাল্মীকি নাম দিলেন। বাল্মীকি ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে রামায়ণ রচনা করিয়া জগতে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। পাঠকপাঠিকা! রামায়ণে বাল্মীকির সম্বন্ধে অনেক অতিরিক্ত লেখা হইয়া থাকিলেও বাল্মীকির জীবন হইতে কি এই শিক্ষা পাইতেছি না যে যে ব্যক্তি সহস্র পাপে পাপী হইয়াও একপ্রাণে ভগবানের চরণকে সার বলিয়া ধরে তাহার পাপ থাকেনা? মাঘ মাসের কুয়াসা গাঢ় হইলেও সূর্য্যের কিরণে কত ক্ষণ থাকিতে পারে? তেমনি পাপের অন্ধকার পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ জগদীশ্বরের সম্মুখে থাকিতে পারেনা। তাই বলিতেছি, যদি পাপ করিয়া ভবিষ্যতের দুঃখ হইতে বাঁচিতে এবং পাপের হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাল্মীকির ন্যায়

হতভাগা দেশও থাকে? কেন আমার মামার বাড়ী এ দেশে হ'ল। কি অসভ্য, এক মুঠো ক'রে ভুল খায়—ভাতের মধ্যে চুল? চুলোয় যাক্। এইবার যদি মরি তবুও—" হঠাৎ কে গাইল:—

"কে জানে কার কপাল পোড়ে ঝড় বাদলে ঘুরে ঘুরে
ছিষ্টি নষ্ট করে যত দুষ্টমতি যমের চরে।

আমার বাগান, আমার বাড়ী
আমার ঘোড়া আমার গাড়ী,
ভবের হাটের তাড়াতাড়ি,
দম্ভ দেখে প্রাণ শিহরে।
কোথা এল, কোথা যাবে,
এ ভবে কজন তা ভাবে,
অন্তিমে সব ধাক্কা খাবে,
ভবের নৌকায় যেতে পারে।"

ভীমেন্দ্র চুপ করিয়া শুনিল। এইবার তাহার ভয় হইল; দেখিল এক পাগল কুঁড়ে ঘরের দিকে আসিতেছে। ভীমেন্দ্র উঠিয়া ঘরের কোণে গেল। পাগল ঢুকিয়াই ভীমেন্দ্রকে দেখিতে পাইল এবং বলিল 'বাবা চোর, আমার কাছে পরশু দিন এস,—সে দিন আমার শ্রাদ্ধ হবে, অনেক গরিব দুঃখীকে খাবার দিব; খাবার জন্যে দলে দলে লোক আসবে; এখন কি করতে আগমন প্রভু যদুনাথ?' ভীমেন্দ্র ভয়েতে কাঁপিতেছিল; বৃষ্টিতে বাহির হওয়া ও কাঁপিবার একটি কারণ। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল "তুমি যেই হও, আমি চোর নই।" পাগল উত্তর করিল 'চোর নও, তবে কাঁপছ কেন? এ কি সত্যি যুগ, যে তুমি যা বল্‌বে তাই মেনে নিতে হবে—কিন্তু, পুকুরের মধ্যে পড়্‌লে মাছে খেয়ে ফেলে দেবে, বেহালার কৃষ্ণধন ঘোষের মার মতন—কাঁপেন থর থর—তার কি?" ভীমেন্দ্র কোন কথা না বলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পাগল ধরিবার চেষ্টা করিল না, কেবল হাসিয়া বলিল "ওরে ইন্দুর, পাগলের ধন নষ্ট করা সিঙ্গির দাঁত নইলে হয় না, একি তামাসা না কি?"

পাগলের বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি এক জন ধনী বণিক ছিলেন কৃষ্ণধন ঘোষ নামে তাঁহার একজন সহযোগী ছিল। কৃষ্ণধনই সমস্ত কার্য করিত পাগল এক এক বার দেখিয়া অবশিষ্ট সময় দান ধ্যানে কাটাইতেন। কৃষ্ণধন সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিবার আশায় মাতার পরামর্শানুসারে সহকারীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দেয়। তদবধি তিনি পাগল।

ভীমেন্দ্র যখন বাহির হইল তখন ঝড় বৃষ্টি একটু কমিয়াছিল। কিন্তু তাহার মনে এত ভয় হইয়াছিল, যে সেই রাত্রিতে অধিক দূরে যাইতে সাহস হইল না—খানিক দূরে গিয়া একটা বট গাছের উপর রাত্রি কাটাইবার জন্য তাহাতে উঠিয়া বসিল। উঠিতে কত কষ্ট হইল, বুক, হাত, ছিঁড়িয়া গেল; ভীমেন্দ্র অগ্রাহ্য করিয়া উঠিয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমে বটগাছের একটা ডাল এরূপ ভাবে বেঁকান ছিল যে তাহার উপর বসিয়া ভীমেন্দ্রর পড়িয়া যাইবার কোনও ভয় রহিল না। তখন সে সেই খানেই নিদ্রিত হইল।

রাত্রি প্রভাত হইল। পাখীগুলি অনেকক্ষণ ঝড় বৃষ্টিতে কাতর রব করিয়াছিল সম্প্রতি সূর্যের তাম্রবর্ণ আলোক দেখিয়া আনন্দে গান করিতে লাগিল। ভীমেন্দ্র জাগরিত হইয়া চক্ষু মেলিল কিন্তু উঠিয়া দেখিল সমস্ত শরীর বেদনাতে পূর্ণ। গাছ হইতে নামিয়া ভীমেন্দ্র পথ চলিতে লাগিল; কিন্তু বালক রাগ করিয়া কতদূর চলিতে পারে। যে স্থানে ভীমেন্দ্র উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিকটেই একটি নদী, নাম বেগবতী। ভীমেন্দ্র মনে ভাবিল এই নদী পার না হইতে পারিলে মাতুলালয় হইতে লোক আসিবে। ... বলিতেছি পার হইবার জন্য বসিয়া রহিল—...প লোক... ওপারে ছিল। ভীমেন্দ্র বসিয়া ভাবি... "আজ কোথায় যাই? এখান থে..."

কত দূর! কি করে যাই? তাইতো. রাগ না কর্‌লেও হত। যাক্‌ ওসব আর ভেবে কি হবে—যদি ফিরে যাই, আবার সেই কষ্ট, আবার সেই রকম কাণ-জ্বালানে কথা! আর যাই বা কোন মুখে? মামা এমন ভাল বাসেন তাঁর হাত ছাড়িয়ে যখন চলে এসেছি, তখন আবার কি বলে তাঁর কাছে গিয়ে একটু থাকবার যায়গা ভিক্ষা চাহিব?" এইরূপে ভীমেন্দ্র নিজের মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু মন সহজে বুঝিতে চাহিল না। কে যেন মনের ভিতর ডাকিয়া বলিতে লাগিল "ভীমেন্দ্র,—তোমার এ ব্যবহারে তোমার মামার বাড়ীর সকলে মনে ক্লেশ পাইতেছেন—তোমাদের বাড়ী যখন সংবাদ যাইবে তখন তোমার বিধবা মা কষ্ট পাইবেন। আর ঈশ্বর তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন।" ভীমেন্দ্র শুনিয়াও শুনিল না বুঝিয়াও বুঝিল না. ক্ষেয়া নৌকা ঘাটে আসিয়াছিল. অন্যমনস্ক ভাবে তাহাতে গিয়া উঠিল। পাটনী পার করিয়া সকলের কাছে পয়সা চাহিল। সকলেই পয়সা দিল. ভীমেন্দ্র পয়সা কোথায় পাইবে? পাটনী জিজ্ঞাসা করিল তোমার পয়সা কই?'

ভীমেন্দ্র। আমার পয়সা নাই। আর এখানে যে পয়সা লাগে তা আমি জানিতাম না।

পাটনী। -তিলকরাম পাটনী সকলের কাছেই একটা করিয়া পার করিবার পয়সা লয়!—এখন তুমি পয়সাটী ফেলে যেখানে খুসী সেখানে যাও।

ভীমেন্দ্র কিছু রাগান্বিত হইয়া বলিল "আমার কাছে পয়সা নাই বল্‌ছি—তবুও পয়সা দাও? এ জামাটা নিলে যদি হয়, তবে নিতে পার। আমার কাছে পয়সা নাই বল্‌ছি আমি কি মিথ্যা ... অবিশ্বাস করছো. ভারী ছোট ... পাটনী সহজে ছাড়িবার লোক নয়, চড়াইয়া বলিল 'কি? পয়সা দেবেনা ...ছোট লোক? তোমার জামা নিয়ে কে গোলে পড়বে বাপু? আমি ও সব বুঝি না। এখন যদি মঙ্গল চাও যেখান থেকে পার পয়সা এনে দাও; নইলে—" পাটনী আর অধিক বলিল না—যা হউক, সমুদায় কথা বলা শেষ না হইলেও চারিধারের লোক সকলেই তাহার মুষ্টি বদ্ধ দেখিয়া মতলব বুঝিতে পারিল।—ভীমেন্দ্র রাগে কাঁপিতে লাগিল কিন্তু হঠাৎ কিছুই বলিল না। একজন সদয় দর্শক বলিল "তিলকরাম. দেখ্‌ছো ছেলে মানুষ পয়সা সঙ্গে নাই ওকে ছেড়ে দাও।"—পাটনী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল—বলিল "ওর পয়সাটী তুমিই দাওনা কেন—যদি এত দয়া হয়ে থাকে?" তিলকরাম এই কথা বলিয়া ক্ষেয়া নৌকা ঘাটে বাঁধিল এবং ভীমের দুই হাত খুব জোরে ধরিয়া জমীদারের কাছারীতে লইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)
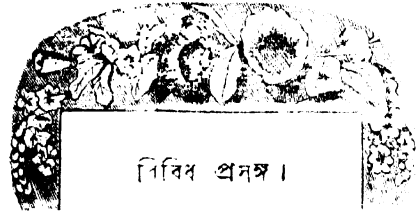
পরীক্ষার ফল।—এবার এণ্ট্রান্স ও এলে পরীক্ষার ফল বড় ভাল হয় নাই; প্রথমটীতে ১৪০৮ জন এবং দ্বিতীয়টীতে ৪৪৩ মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় চারিটী ইংরাজ কন্যা এবং দুটী মাত্র বাঙ্গালীর কন্যা, সব শুদ্ধ ছয়টী মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এলে পরীক্ষায় মহিলা এক জনও উত্তীর্ণ হন নাই। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এবার দুটি মহিলা বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বালক ও যুবকদিগের ন্যায় বালিকা ও মহিলাগন যত অধিক লেখা পড়ার চর্চা করিবেন, ততই দেশের মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

আমার সাধের বিড়াল—২৭ পৃষ্ঠা।

গো-দুগ্ধ।—পৃথিবীর প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ স্থির করিয়াছেন যে গোদুগ্ধই মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম খাদ্য। শরীর ভাল রাখিতে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, গোদুগ্ধে সে সমস্ত দ্রব্যই রহিয়াছে। যাঁহাদিগকে অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, গোদুগ্ধ তাঁহাদের একমাত্র খাদ্য হওয়া উচিত। যাঁহারা মাংস ভাল বাসেন তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে গোদুগ্ধ মাংসের অপেক্ষা কোনমতে কম পুষ্টিকর নহে।

ভয়ানক মৃত্যু।—আমরা শুনিলাম কিছুকাল হইল আমেরিকাতে একজন লোকের বড় ভয়ানক মৃত্যু ঘটিয়াছে। একজন লোক তথাকার একটী গাছের রস পান করিয়াছিল, সে গাছের রস তৃষ্ণার সময় খাইলে জলের কার্য্য করে। খানিকক্ষণ পরে একটা শুঁড়ির দোকানে গিয়া খানিকটা মদও খায়। তখন তাহার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল এবং এই যন্ত্রণাতেই সে মরিয়া গেল। ডাক্তারেরা পেট চিরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহার নাড়ি ভুঁড়ি রবারে জড়াইয়া গিয়াছে। মদের সহিত সেই গাছের রস মিশিলে যে জমিয়া রবারের মত হইয়া যায়, বোধ হয় লোকটীর তাহা জানা ছিল [illegible]লিতেছি হউক মদ খাইয়াই লোকটীর মৃত্যু হ[illegible]প লোক[illegible] হইবে। কি সাধে যে লোকে মদ [illegible] আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না [illegible]

কুকুর-নাশ।—আমরা সে দিন কলিকাতার একটী বড় রাস্তায় এক ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি। কতকগুলি 'ধাঙ্গড়' প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘূরিয়া বেড়ায়, এবং দেশী কুকুর দেখিলে তাহার মাথায় লাঠি মারে। এই ভয়ানক ঘা খাইয়া যখন কুকুরটি ছটফট্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়, তখন এই ধাঙ্গড়েরা ধারাল ছুরি দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া লয়। আমরা শুনিলাম তাহারা এই জন্য পুরস্কার পায়। সে দিন এইরূপ একটী কাণ্ড দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার কথা লিখিতেও ক্লেশ বোধ হয় বলিয়া কিছুই লিখিব না। শুনিলাম এই কুকুরগুলি ক্ষেপিয়া গিয়া মানুষকে কামড়ায়, এই জন্য ইহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার নিয়ম করা হইয়াছে। তবে যে সকল কুকুরের গলায় শিকলির দাগ, 'কালার' বা অন্য কোন চিহ্ন আছে (যাহাতে তাহাদিগকে কোন বাড়ীর কুকুর বলিয়া চেনা যায়) তাহাদিগকে মারা হয় না। ইহাতে আমরা এই বুঝি যে যে কুকুরের বাড়ী ঘর নাই তাহাকেই মারা হয়। রৌদ্রে বৃষ্টিতে ঘূরিয়া, আহার অভাবে খারাব জিনিশ খাইয়া এই সকল কুকুর ক্ষেপিয়া যায়। আহা! যে কুকুরকে পরমেশ্বর মানুষের সঙ্গী করিয়া, মানুষের এত বাধ্য, এত অনুগত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে এইরূপে মরিতে দেখিলে কাহার না কষ্ট হয়? আমাদের পাঠকগণ কি দয়া করিয়া এক এক জন পাড়ার এক একটী কুকুরকে একটু স্থান দিয়া, একমুষ্টি খাবার দিয়া, তাহার গলায় একটা ফিতা পরাইয়া দিতে পারেন না? তাহা হইলেইতো বেচারা কুকুরগুলি [illegible]! গবর্ণমেন্টকেও বলি যে দুর্ভাগা যদি মারিতেই হয়, তাহা হইলে কি চক্ষের আড়ালে, কসাইখানা কি অন্য [illegible] গিয়া মারিলে হয় না?

নৈতিক বিদ্যালয়।—প্রায় তিন বৎসর হইল কলিকাতায় একটী নৈতিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক রবিবার সিটীস্কুলের বাড়ীতে বেলা ৪টার সময় এই বিদ্যালয়টী বসিয়া থাকে। বালকদিগকে ভাল ভাল উপদেশ দেওয়া এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। আমরা জানি এই খানে বালকদিগকে সুন্দর সুন্দর পদ্য মুখস্থ করান হয় এবং যাঁহারা গান গাহিতে জানেন তাঁহাদিগকে সুন্দর সুন্দর গান শেখান হয়। যে সকল বালক এই বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপন আপন পিতামাতাকে বলিয়া এখানে আসিলেই তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে। ৪৫ নং বেনেটোলা লেনে বাবু শশিভূষণ বসু অথবা সিটীস্কুলে বাবু প্রমদাচরণ সেনের নিকট আসিলেই এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানা যাইতে পারে। আমরা আশা করি প্রত্যেক অভিভাবকই আপন আপন বালককে এই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। আমরা ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাঠকদিগকে বলিব।

মুক্তি-ফৌজ।—'ফৌজ' এই নাম শুনিলেই আমাদিগের ভয় হয়, মারামারি কাটাকাটির কথা মনে পড়িয়া যায়; কিন্তু 'মুক্তিফৌজ' নামে যে একদল ইংরাজ সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে মারামারির নাম গন্ধও নাই। যদি তাঁহাদের কোনরূপ যুদ্ধ করিবার থাকে, তবে তাহা পাপের সহিত, অসৎ চরিত্রের সহিত। এই দলের সাহেব বিবিরা হিন্দুস্থানীদিগের মত পোষাক পরেন, এবং দেশের সকল স্থানে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। প্রায় ১৭।১৮বৎসর হইল উইলিয়ম বুথ্ নামক একজন সাহেব এই দল স্থাপন করেন; সেই অবধি ইহাঁরা যে ইংলণ্ডের কত উপকার করিয়াছেন বলিয়া উঠা যায় না।

আমরা কয়েকদিন ইহাঁদিগের উপদেশ শুনিতে গিয়াছি। ইহাঁদের দলের কর্ত্তা টকার সাহেবের স্ত্রী বিবি টকার অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। ওরূপ ভাবের সহিত বক্তৃতা করা আমরা অতি অল্পই শুনিয়াছি। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ লজ্জা এবং ভয় অধিক, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন হাজার হাজার পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মের কথা বলিলেন! পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে কয়জন এরূপ সৎকার্য্যে সাহস দেখাইতে পারেন?

ব রিবন বা নীলফিতাধারী সৈনা দল।—ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে 'নীলফিতাধারী সৈনাদল' এই নামে একদল লোক আছেন; তাঁহারা নিজে মদ্যপান করেন না, এবং যত দূর সম্ভব আর কাহাকেও মদ্যপান করিতে দেন না, ইহাই তাঁহাদিগের কার্য্য। এই দলের চিহ্ন নীল ফিতা। ইংলণ্ডে এই সৈনাদলের দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছে; সম্প্রতি কয়েক জন ইংরাজের উদ্যোগে আমাদের দেশে এইরূপ একটী দল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যে এই সম্বন্ধে দুটী সভা হইয়া গিয়াছে, তাহার শেষেরটীতে আমরা উপস্থিত ছিলাম। কয়েক জন সাহেব এবং আমাদের দেশের দুটী প্রধান লোক এই উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। আমরা দেখিলাম বক্তৃতার পর আমাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া নীলফিতা লইয়াছেন। আমাদিগকে এই সম্বন্ধে ইহার পর অনেক বলিতে হইবে, সুতরাং এখন আর অধিক কিছু বলিব না। এইরূপ সভা গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হইলে মঙ্গল।

আমার সাধের বিড়াল!

সাধের বিড়াল মম আয় কোলে আয়!
'মিউ' 'মিউ' ডাক ছেড়ে মহাসুখে উঠে পড়ে,
ধীরে ধীরে লেজ নেড়ে আয় পায় পায়!
দেখিয়ে শরীর তব নয়ন জুড়ায়।

তোরে ভালবেসে মনে সুখ হয় কত!
এ ঘরের লোক হয়ে, থাক্ 'দলবল' লয়ে—
'ছেলেপিলে' ডেকে আন্, আছে তোর যত—
বেড়া ছুটে, খেলা কর্ নিজ মন মত।

কেমন শরীর আহা ধব্ ধব্ করে,
কাল কাল মিশি তায়, মরি কিবা শোভা পায়!
চিকণ কেশের শোভা কি বাহার ধরে।
কোমল চরণ যেন আরামের তরে!

বড় ভালবাসি তোরে সাধের বিড়াল!
কাছে এলে কোলে করি কত সুখ, হয় মরি!
তোমারি কারণে দূরে ইঁদুরের পাল।
দুধ দিয়ে তাই তোরে পুষি চিরকাল।

কিন্তু বড় দুঃখ মনে, লোকে দেয় গালি
"বিড়াল লোভীর শেষ, নাহি বোঝে কাল দেশ,
আপন উদর সার—এই ভাবে খালি!
খোদাও এমন জীবে মুখে দিয়ে কালী"

বোবা তুমি আহা মরি! নহিলে এখন
দাঁড়াইয়া, উচ্চস্বরে ডাক দিতে নারী নরে—
করিতে তোমার এই কলঙ্ক ভঞ্জন।
হেন অপবাদ কেবা সহে অকারণ!

আমি জানি এ দুর্নাম কি হেতু তোমার।
মানুষের অত্যাচারে মর তুমি অনাহারে,
ক্ষুধার বেলায় তাই না থাকে বিচার!
কেন মিথ্যা নিন্দা তবে হয় বারে বার?

উদর ভরিয়া খেতে দেয় কত জনা? [illegible]লিতেছি
কষ্ট দেয় ঘরে পুরি, তাই তুমি কর [illegible]প লোক[illegible]
পেটের জালায় দোষী! তবে এ গ[illegible]
কেন দেয় সবে মিলে? কেন এ [illegible]

আমার মতন সবে ওহে শিশুগণ !
যত্নকর বিড়ালেরে—দেখ সে কি চুরি করে ?
ভাল বাসে কি না বাসে আত্মীয় মতন !
কে কোথা রতন লভে বিনা সুযতন ?

আমারি বিড়াল তুমি আমারি রহিবে—
উঠিয়া আমারি কোলে—ঘুমাইবে ঘুম পেলে
ভয় পেলে পাশে আসি ছুটে লুকাইবে
আমারি ঘরেতে সুখে জীবন যাপিবে।

মাছি।

বিলেও বুঝিতে পার কি, এটী একটী মাছি ? অনুবীক্ষণ নামে এক রূপ যন্ত্র আছে তাহার তলায় ছোট জিনিশও খুব বড় দেখায়; সেই যন্ত্রের তলায় মাছিকে যেরূপ দেখায় ছবিটি সেইরূপে আঁকা হইয়াছে। মাছির নাম শুনিয়া অনেকে হয়ত মনে মনে বলিতেছেন "মাছি তো মাছি; দুর্গন্ধ ময়লা যায়গায় থাকে, দেখিলে ঘৃণা হয়। ভিন্ ভিন্ করিয়া আসিয়া গায় বসে, বার বার হাত যোড় করে, আর মুখ হইতে শুঁড়ের মত একটা কি বাহির করিয়া চাটিতে থাকে। ছি !"

মাছিগুলিকে কেহ দেখিতে পারে না; সকলেই দূর দূর করে। যেখানে ময়লা যত বেশী সেখানে মাছি তত বেশী; মাছি গুলি যেন পরিষ্কার যায়গায় থাকাটাকে পাপ মনে করে। কিন্তু এক একটা অপরিষ্কার ছেলে মাছির চেয়েও খারাপ। তবে ভাই, মাছিগুলিকে তোমারা এত ঘৃণা করিবে কেন ? ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ক্ষমতা [illegible]ও দেখিতে পাই।

[illegible]দকে চাহিয়া দেখিলে দেখিবে যে [illegible]র দুই স্থান খুব সরু। শরীরটি তিন [illegible] প্রথম ভাগে মাথা, তার পর বুক, পা, পাখা ইত্যাদি, শেষ উদর। বুকে পা; কেমন তামাসা! তোমার আমার মুখ দাঁতে ভরা, কিন্তু মাছির মুখে দাঁত নাই। দাঁতের আবশ্যকও নাই। যে খানে যে টুকু রস, তাহাই মাছির আহার, মাছি শক্ত জিনিশ খায় না। শক্ত কিছু খাইতে হইলে আগে তাহা মুখের লাল দিয়া গলাইয়া নেয়। মুখে শুঁড়ের মতন যাহা দেখিয়াছ, তাহা রস টানিবার যন্ত্র। এক একটা মাছির যত গুলি চোখ হাজার জনের চোখ একত্র করিলে তত গুলি হয় না। আপাততঃ দুটী চোখ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ইহার প্রত্যেকটী বড় বড় শত চক্ষু একত্র করিয়া হইয়াছে। অণুবীক্ষণে দেখিতে পারিলে মৌচাকের মত দেখিতে। আহার খুঁজিতে মাছিকে অনেক বার ধুলা বালির মধ্যে যাইতে হয়, এজন্য ঈশ্বর দয়া করিয়া চক্ষের উপর এক খানি আবরণ দিয়া দিয়াছেন।

মাছির পায়ের অগ্রভাগে ছোট ছোট দুইটী আঙ্গুলের মত বাহির হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটীর পাশ দিয়া একটী নখ। এই নখের চারিদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতগুলি পদার্থ আছে, দেখিতে লোমের ন্যায়। কত পণ্ডিত কত কথা বলিলেন কিন্তু মাছির পায়ের এই সমস্ত জিনিশ দিয়া কি হয় তাহা আজিও ঠিক হইল না। মাছিগুলি ইচ্ছা মত যেখানে সেখানে বসিয়া থাকিতে পারে, আমাদের মত গড়াইয়া পড়িয়া যায় না। অনেকে বলেন মাছির পায়ের আঙ্গুল দুটি ইহার কারণ। মাছি যে জিনিশের উপর বসে, তাহার পায়ের আঙ্গুল গুলি তাহাতে জোঁকের মত চুমুক দিয়া লাগিয়া থাকে। আর কেহ কেহ বলেন যে আঙ্গুল দুটি ছোট ছোট দুটি থলে; তাহার ভিতরে এক প্রকার আঠা আছে, তাহাতে মাছির পা সমস্ত জিনিশের উপর লাগিয়া থাকিতে পারে। আর এক দলের পণ্ডিতেরা ইহার কিছুই বলেন না। তাঁহাদের মতে নখের চারিধারে লোমের মত যাহা আছে, তাহাই
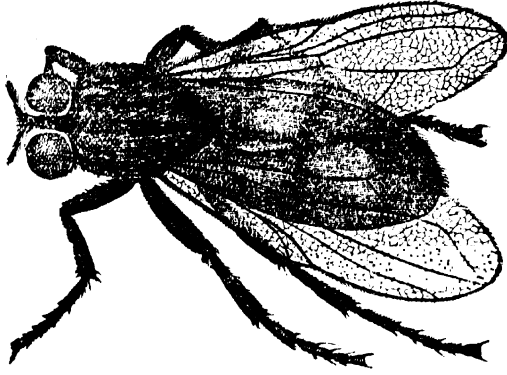
মাছির যেখানে সেখানে বসিয়া থকিবার কারণ। মাছির ঠ্যাঙ্গে অনেক গুলি লোম রহিয়াছে, তাহা দ্বারা গা আচড়াইয়া পরিষ্কার রাখে। অপরিষ্কার যায়গায় থাকে বলিয়া নিজে অপরিষ্কার নয়।

মাছির পাখা অতি হাল্কা অথচ খুব শক্ত। এরূপ পদার্থ আর নাই বলিলেও অপরাধ হয় না। পাখার মধ্যে যে সকল শিরার মত রহিয়াছে, সে গুলি ফাপা। নিশ্বাস তুলিবার সময় তাহাদের মধ্যে বাতাস যায়। ফলতঃ পাখাগুলির দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হয়। মাছি উড়িবার সময় যে শব্দ শুনা যায় সে তাহার পাখার। পাখা গুলি এক সেকেণ্ডে প্রায় ৭০০ বার কাঁপে; ইহাতে এই শব্দ হয়।

মাছির নিকট আমরা কি কি শিক্ষা করিতে পারি তাহার সম্বন্ধে এক সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমরা মাছির কথা শেষ করিব।

মাছি ক্ষুদ্র জীব তথাপি তাহার শরীরে যে সকল আশ্চয্য জিনিশ রহিয়াছে তোমার আমার শরীরে তাহা অপেক্ষা অধিক নাই।

না ভাবিয়া কাজ করার বড় বিপদ। মাছিগুলি খাইবার কিছু দেখিলে বুদ্ধিহীন হইয়া যায়; দুধের বাটিতে যত মাছি উড়িয়া পড়িয়াছে, তাহার কয়টা উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছ?

একটুকু অনিষ্টে দশ জনের ক্ষতি হয়। মাছি দুধের বাটিতে পড়িয়া মরিল; ক্ষুধা তো তাহার গেলই না; তুমিও দুধ টুকু খাইতে পারিলে না।

সামান্য পাপে ও মহা অনিষ্ট হয়। মাছি অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিশ; কিন্তু একটী মাছি পড়িয়া মহামূল্য ঔষধ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

বাবুগিরি।

স্বর্ণ বড় ভাল মেয়ে—আমাদের এক ক্লাশে পড়িত! সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিলামনা। সকলেই বলিত "স্বর্ণ বেশ মেয়েটী! বাবুগিরি কাহাকে বলে তাহা জানে না; যা দাও তাই খায়, যা পায় তাই পরে—বেশ!" আর আমার কথা উঠিলেই পাড়ার গৃহিণীরা নাক মুখ সিট্‌কে বলিতেন "প্রতিভার সকলি আশ্চয্য—পরিষ্কার কাপড় নইলে পরা হয় না। কোনও যায়গার বসিতে বলিলে চারিদিকে মিট্‌মিট্‌ করে তাকান হয়—বেছে বেছে জিনিশ খাওয়া হয়—ছিঃ!" স্বর্ণকে সকলে ভাল বাসিতেন, তাহাতে আমার দুঃখ [illegible]লিতেছি কিন্তু কেন তাহাকে ভালবাসা হইত, [illegible] লোকে বুঝিতে পারি নাই। বাবুগিরি স্বর্ণের [illegible] তাহা আমি জানিনা, তবে স্বর্ণকে [illegible]

ষ্কার কাপড় পরিতে দেখি নাই। বাড়ীতে, স্কুলে, নিমন্ত্রণের যায়গায়, সকল যায়গাতেই নোংরা কাপড় দেখিয়া স্বর্ণকে চিনিয়া লওয়া যাইত। আর গরিব প্রতিভার অপরাধের মধ্যে পরিষ্কার থাকিত, যাহা খাইলে অসুখ হইতে পারে, তাহা খাইত না, এই জন্য পাড়ার গৃহিণীরা ভারী বিরক্ত ছিলেন,—এখনও বিরক্ত আছেন কি জানি না। পরিষ্কার থাকাই কি বাবুগিরি? নোংরা থাকাই কি ভাল মানুষের লক্ষণ? আমি সর্ব্বদা পরিষ্কার কাপড় পরিতাম—কাপড় অপরিষ্কার হইলে নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া লইতাম—খারাব জিনিশ খাইলে অসুখ হইবে বলিয়া লোকের অনুরোধে উপরোধেও খারাব জিনিশ খাই নাই, এই অপরাধে আমাকে সকলে গালাগালি দিতেন, আর স্বর্ণ কুড়েমি করিয়া নিজের কাপড় নোংরা করিয়া রাখিত, আর পেটুকের মত কাঁচা কুল, কাঁচা কলাই, তেতুল, আর ছাইপাঁশ খাইয়া অসুখ করিয়া বসিত, তখন সকলে তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া দুঃখ করিতেন। "প্রতিভা বাবু, স্বর্ণ ভাল" এই কথা সকলেরই মুখে শুনা যাইত। স্বর্ণ অপরিষ্কার শরীর লইয়া ভুগিয়া ভুগিয়া আজও সারা হইতেছে, আর আমার শরীর আজও বেশ সুস্থ। তবুও আমি লোকের নিকট বাবু, বড়লোক, জেঁকো এই সকল নাম পাইয়াছি। পরিষ্কার থাকিয়া শরীর ভাল রাখিলেই কি বাবুগিরি করা হয়? দোহাই পাঠক-পাঠিকাগণের! তোমরাই বিচার কর।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

আমরা এবার নানা স্থান হইতে নানারূপ পত্র, ...দি পাইয়াছি। ইহার মধ্যে কতগুলি ...লিয়া এবং কতগুলি স্থানাভাব বলিয়া ...ইল না। এক খানি পত্র এইবার ...।

'নাক হাতে করিয়া যায় কে?' এই প্রশ্নের কতকগুলি বড় আশ্চর্য্য উত্তর পাওয়া গিয়াছে! কেহ বলেন শর্দ্দিওয়ালা লোক! কেহ বলেন বুড়ো ধার্ম্মিক ভট্টাচার্য্য! কেহ বলেন যেখানে বড় দুর্গন্ধ!!

প্রাপ্ত।

[আমরা একটী বালকের নিকট হইতে নিম্ন-লিখিত পত্র খানি পাইয়াছি। সখা পাঠ করিয়া কোন বালক অহ্লাদিত হইয়া আমাদিগকে এরূপ পত্র লিখিবেন, আমরা তাহা ভাবি নাই এই জন্য আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। এস্থলে বলা উচিত যে পত্রের ভাষা অনেক যায়গায় বদলাইয়া দেওয়া গিয়াছে।]

বালকবালিকাদিগের প্রতি।

প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ! আমার স্নেহ ও বন্ধুভাব গ্রহণ কর। মনে আজ বড় আনন্দ হইতেছে তাই প্রিয় 'সখা'র সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের নিকটে আসিলাম, তোমরা কি বুঝিতে পার কেন এ আনন্দ?

রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য্যকে দেখিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকার চলিয়া গেল, অল্প অল্প বাতাস জানালা দিয়া বহিতে লাগিল, পাখীগুলি দলে দলে গান করিতে করিতে আকাশে উড়িল; পাতায় পাতায় ঢাকা গোলাপ কলি গুলি অল্পে অল্পে ফুটিয়া যেন উকি মারিতে লাগিল। সকলেই আনন্দ করিতেছে। আমারও ইচ্ছা হইতেছে আজ সকলকে গিয়া ডাকিয়া বলি "ভাই ভগ্নীগণ! উঠ! কেন আনন্দ করি দেখ! ঐ দেখ আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া 'সখা' আজ একমাস পরে আবার দেখা দিতেছেন। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য উপদেশ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দোষ

আমোদ যোগাইবার মতন সঙ্গী যে কেহ ছিলনা ; প্রিয় 'সখা' যে সেই দুর্দ্দশা দূর করিতে বাহির হই য়াছিলেন ; ওই দেখ একমাস পরে তিনি আবার দেখা দিলেন। আমাদের মঙ্গলই তাঁহার লক্ষ্য, এই জন্যই তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ; তবুও কি তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিবে না ?

প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ ! বন্ধুকে কি ভালবাসনা ? যাহাকে ভালবাস তাহাকে কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, যে প্রিয় 'সখা' সকল সময় তোমাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে অযত্ন করিবে না। আশা করি প্রতি মাসে তোমরা তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিবে। আজ মনের আনন্দে তোমাদিগকে মনের আশা জানাইলাম ; আশায় বঞ্চিত না হইলে বড়ই সুখী হইব।

শ্রী :—

বালক বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক।

নীতি-কুসুম প্রথম ভাগ। শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। ভবনাথ বাবু রয়েল রিডার প্রভৃতি পুস্তক এবং প্রোগ্রেস প্রভৃতি পত্রিকা হইতে অতি সুন্দর সুন্দর অনেক গল্প সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে দিয়াছেন, গল্পগুলি উপদেশে পোরা ; এই জন্য এই পুস্তক খানি সকল বালক বালিকারই পড়া উচিত। পুস্তকের মূল্যও খুব কম,—তিন আনা মাত্র।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

'সখা' পত্রিকা দেশ মধ্যে যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার জন্য সমুদায় স্থলেই এজেন্টের প্রয়োজন। এজেন্টগণ উপযুক্ত রূপ অর্থ পাইতে পারিবেন। যাহাতে সমুদায় শ্রেণীর বালকবালিকাদিগের মধ্যে পত্রিকা খানি প্রচলিত হয় এই জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। যাঁহাদিগের এইরূপ সৎকার্য্যে উদ্যোগ ও উৎসাহ আছে, তাঁহারা 'সখা' কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।

'সখা' কার্য্যালয়
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট } ার্য্যাধ্যক্ষ।
কলিকাতা।

ধাধাঁ।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। হাতী। ২। ব-া-ত-া-স-া। ৩।

```
ম—দ—ন অথবা ম—দ—ন
|   |   |      |   |   |
দ—ম—ন      দ—শ—ম
ন—ন—দ      ন—ম—স্
```

দ্বিতীয় পংক্তির 'দমন' এই কথাটীর স্থানে দহন' 'দলন' 'দর্শন' এই কথাগুলিও বসান যায়।

```
প্র—ম—দা
|    :    |
ম—দ—ন
দা—ন—ব
```

৪। রাখাল ২৪ ; রাম ১২ ; সরলা ১২ ; নবীন ১২ ; চপলা ৬ ; লাবণ্যলতা ৩।

৫। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ; রমেশচন্দ্র মিত্র; ৬। ছুঁচ।

নূতন।

১। কোন্ নিরাকার ফুল সাকার হলে লেবু হয় ?

২। এমন চারিটী কথা কি যাহা[illegible] বলিতেছি [illegible] অক্ষর এক সঙ্গে লইলে একটী নগরের [illegible]প [illegible] এবং শেষের অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে [illegible] কথাগুলির বিশেষ পরিচয় এই— [illegible]

১ম কথাটীর অর্থ   হাতীর শাবক
২য় ... ...   কালীকলমের কাজ
৩য় ... ...   তোপ
৪র্থ ... .   চুরটের কাছাকাছি।

৬। 'সুশীল' এবং 'তরলা' এই দুটী কথা দ্বারা পূর্ব্ববারের ন্যায় চতুষ্কোণী দ্বিভাগ পদ রচনা কর দেখি?

৪। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথা স্থানে বসাইয়া তাহাতে কি নাম হয় বাহির কর :—

নাম	বিশেষ পরিচয়
অমৃতাবিষারিকা	এই দোষে মানুষ পড়্‌লে তাকে পদে পদে বিপদে পড়্‌তে হয়; তাতো হবেই! বিবেচনা না করে কাজ ক'র্‌লে বিপদ কে রাখে!
মালমদকেক্তনধুইসুদ	ইনি অনেকগুলি খুব সুন্দর কবিতা লিখেছেন। কেহ কেহ ইহাঁকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি, কেউ বা অতি নীচ রকমের কবি বলিয়া থাকেন। যাহা হউক যখন ইনি মরিয়া গিয়াছেন, তখন লোকের প্রশংসা বা নিন্দা ইহাঁর কি করিবে? অতি গরিবভাবে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

...য় দড়ি গোল গা। পেটের মধ্যে হাত পা।
সঙ্গে রাখে। মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে।
নড়েনা। এটা কি তা বলনা?

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। আগামী মার্চ মাসের পরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন বিদেশবাসী হইলে তাঁহাদের পক্ষে পত্রিকার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵১০ মাত্র।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সম্বাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি, সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

... শ্রীগিরিশচন্দ্র ... দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম ভাগ। ১লা মার্চ্চ ১৮৮৩, বৃহস্পতিবার। ৩য় সংখ্যা।

কার্য্যাধ্যক্ষের বিজ্ঞাপন।

মফস্বলের বন্ধুদিগকে সবিনয়ে জানান যাইতেছে যে আগামী মাস হইতে 'সখা'র বার্ষিক মূল্য তাঁহাদের পক্ষে ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। যাঁহারা এখনও গ্রাহক হ'ন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মাসের মধ্যেই গ্রাহক হইলে ভাল হয়।

রামায়ণের উপদেশ।

আমাদের পাঠক ও পাঠিকাগণের মধ্যে বোধ হয় কেহই সংস্কৃত রামায়ণ পড়েন নাই; অনেকে হয়ত কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণও পড়েন নাই, অথচ অনেকেরই রামায়ণের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। আমাকে মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি বালকের নিকট রামায়ণের গল্প বলিতে হইত, তাহাতেই দেখিয়াছি ছোট ছেলেরা রামায়ণের গল্প বড় ভালবাসেন। তাই আজ ইচ্ছা করিয়াছি রামায়ণ পাঠে কি উপদেশ পাওয়া যায় তাহা লিখিব। রামায়ণের গল্প পড়িতে যেমন সুন্দর, রামায়ণের উপদেশও সেইরূপ সুন্দর। কিন্তু অনেক স্থানে গল্প এত বাড়াইয়া লেখা যে কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা, তাহা ঠিক করিয়া উঠা কষ্টকর। সূর্য্য পৃথিবী হইতে কতগুণে বড়, তাহা তোমরা সকলেই জান, অথচ হনুমান এই সূর্য্যকে বগলে পুরিল। ইহাও কি সম্ভব হয়? এইরূপ আরও অনেক অসম্ভব গল্প আছে। যাহা হউক, সে সকল কথা লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। রামায়ণে কি উপদেশ পাওয়া যায়, আমরা সেইটী দেখিব। রামায়ণের কথা শেষ হইলে যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে মহাভারতের কথাও বলিব; কিন্তু এখন তোমাদের আশা দিয়া কাজ নাই। এই উপদেশগুলি মনে রাখিলে রামায়ণ পড়িতে আরাম বোধ হইবে, আর এখন পড়িতে গেলে অনেক স্থলে মিথ্যা বাজে গল্প দেখিবে। তোমরা বোধ হয় জান, রামায়ণ যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম বাল্মীকি মুনি। প্রথমে তাঁহার কথা বলিয়া আরম্ভ করিতেছি। রামায়ণের উপদেশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। যে ডাকাত ছিল সে কিরূপে মুনি হইল, তাহা জানিয়া যদি উপদেশ লাভ করিতে [illegible] বলিতেছি হইলে স্থানান্তরে 'রত্নাকরের মুক্তি [illegible] প লো[illegible] প্রস্তাবটী মনোযোগের সহিত পড়িও।

সর্প।

বাপরে! কি ভয়ানক সাপ! মহিষ বেচারার প্রাণ এবার আর বাঁচে না। এত বড় সাপ কি তোমরা কখনও দেখিয়াছ? আমি বাল্যকালে এক দিন শুনিয়াছিলাম যে আমাদের পাশের বাটীতে সাপুড়িয়ারা সাপ খেলিতে আসিয়াছে; অমনি ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটা ঝাঁকা দুজনে বহিয়া লইয়া আসিতেছে। খানিকক্ষণ পরে ঝাঁকাটা খুলিয়া দিলে সর্প মহাশয় বাহির হইলেন। উঠানের চওড়ার দিকে তাঁহার শরীরটী প্রায় এপাশ ওপাশ হইয়া গেল। বোধ হয় সর্প মহাশয়ের শরীর ৫।৬ হাত হইবে। আর একদিন পাড়ায় এক বাটীতে গণ্ডগোল হইতেছিল, শুনিয়া সেখানে দৌড়িয়া গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ানক। সেই বাড়ীর এক ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড সাপ কুণ্ডলি করিয়া পড়িয়াছিল; অস্পষ্ট আলোতে তাহাকে সাপ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে নাই। আমাদের সমবয়স্ক একটী বালক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সাপটীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু সে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারিল না; সে মনে করিল কাঁঠালের ভুতুড়ি (তখন কাঁঠালের সময়) পড়িয়া রহিয়াছে। বালক তাহা লইয়া আসিতে গেল, কিন্তু হাত দিবা মাত্র তেলপারা ঠেকিল, এবং সর্প বাবু নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই পাড়াময় সম্বাদ ছড়াইয়া পড়িল, 'উত্তরের বাড়ীতে প্রকাণ্ড একটা সাপ আসিয়াছে।' কোথা হইতে আসিল, কেহই তাহা জানে না। [illegible]ক, সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। [illegible]দ্রা যাইবার অসুবিধা দেখিয়া ঘর [illegible] হইলেন—তাঁহার সমস্ত শরীর প্রায় [illegible] উদর পূর্ণ করিয়া পান খাইতে খাইতে ফলারে ব্রাহ্মণেরা যেমন বিকাল বেলা ধীরে ধীরে বাড়ী যায়, সাপটীও সেইরূপ ধীরে ধীরে আপনার স্থানে যাইতে লাগিল। কিন্তু সাপকে কে কোথায় দয়া করিয়া থাকে? সাবোল, লাঠি, বল্লম, যে যাহা পাইল, তাহা লইয়া সকলে মার্ মার্ শব্দে সর্পের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। 'মা মনসার প্রিয় ভৃত্য' এক বন হইতে অন্য বনে আশ্রয় লইয়াও কোন মতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রাণ গেল; আমরা মহা আহ্লাদে সর্পকে দাহন করিয়া ঘরে ফিরিলাম। এই যে দুইবার দুটী প্রকাণ্ড সর্প দেখিয়াছি, তাহার কোনটাই বোধ হয় আমাদের অদ্যকার চিত্রিত সর্পের ন্যায় বৃহৎ বা ভয়ানক হইবে না। দেখিয়াছ, কি ভয়ানক তেজ! এই জাতীয় সর্প পাহাড়ে ও জলাময় বৃহৎ জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পের একটী অভ্যাস এই যে ইহারা রৌদ্র না পাইলে থাকিতে পারে না; এই জন্য শীতপ্রধান দেশে অধিক সর্প দেখিতে পাওয়া যা[illegible]

তোমরা বোধ হয় সকলে সাপ-খেলা দেখিয়াছ। কেমন করিয়া সাপ ধরে তাহা জান কি? সাপুড়িয়ারা যখন শুনিতে পায় অমুক স্থানে সাপ আছে, তখন তাহারা বাঁশী লইয়া সেইখানে যায়। সাপ বাদ্য শুনিতে বড় ভাল বাসে, এই জন্য তুবড়ির শব্দ শুনিতে পাইলে মাথা তুলিয়া সেই দিকে আইসে। চতুর সাপুড়িয়া সুযোগ বুঝিয়া সাপের গলা টিপিয়া ধরে এবং বিষের থলি ছিঁড়িয়া ও বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনার ঝাঁকায় পোরে। এইরূপে এত তেজীয়ান যে সাপ তাহাকেও লোভে পড়িয়া মরিতে হয়। অনেকে মনে করে সাপুড়িয়ারা মন্ত্রের দ্বারা সাপকে বশ করে, কিন্তু তাহা ভুল। সাপ খেলিবার সময় বাঁশী বাজায় দেখিয়াছ? যদি কিছু থাকে, তবে সেই এক মন্ত্র। তাহার পর, সাপ ফণা তুলিয়া বাঁশীর শব্দে নাচি-

দয়াময়ের চরণ সরল মনে ধারণ কর। দেখিবে, তোমার মনে বল হইবে, আশা হইবে, এবং তুমি সমস্ত বিপদাপদের হস্ত ছাড়িয়া ধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।

ভীমের কপাল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বল্লভগঞ্জের জমীদারী কাছারী জমীদারের বাড়ীর বাহিরে খোলা মাঠের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড আট-চালা ঘরে হয়। জমীদার রামজীবন বাবু প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে কাছারী করিয়া থাকেন—দুঃখী প্রজাদিগের দুঃখের কথা শুনেন, ও যাহাতে তাহাদের দুঃখ না থাকে তাহার জন্য ব্যবস্থা করেন। প্রজাদিগকে তিনি নিজের ছেলেদের মত ভাল-বাসিতেন, এবং তাহাদের জন্য রাস্তা ঘাট, হাসপাতাল, ইস্কুল করিয়া তাহাদের সকলরূপ সুবিধা করিয়া দিতেন। প্রজারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। কাহারও কোন বিপদ হইলে তাঁহারই কাছে ছুটিয়া আসিত, তাঁহারই পরামর্শ লইয়া কাজ করিত। ফলতঃ রামজীবন বাবু যে বল্লভগঞ্জের জমীদার, তাহা তাঁহার ভাব-গতিকে বুঝিবার যো ছিল না; পোষাক সামান্য-রূপ—সর্ব্বদা প্রজাদের বাড়ীতে গিয়া কখনও বা মাটীতে বসিয়া আছেন, কখনও বা গরিব প্রজার কাদা-মাখান ছেলেগুলি কোলে পিঠে করিতেছেন, এরূপ দেখিলে কাহার সাধ্য বুঝিয়া লয় তিনি জমীদার। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে কখন কখন বলিয়াছেন 'এরূপ করিলে মান থাকিবে না'। রামজীবন বাবু হাঁসিয়া বলিতেন "প্রজার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা করিলে যদি মান যায়, যাক্। যাহার অবস্থা খারাপ তাহার সহিত মিশিলেই যে মান যায়, তাহা নহে।"

তিলকরাম ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া টানিতে টানিতে এই জমীদারের কাছারীতে লইয়া গেল। তখন বেলা ১০টা। রামজীবন বাবু এই কতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন—তিনটার পূর্ব্বে বাহির হইবেন না, সুতরাং ভীমেন্দ্রকে দেওয়ানজি মহাশয়ের হাতে পড়িতে হইল। দেওয়ানজি মহাশয় একটী ছোট খাট নবাব, কিন্তু বাবুর জ্বালায় কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। সকল প্রজাই বাবুর কাছে আইসে, তাঁহাকে কেহই গ্রাহ্য করে না, এ দুঃখ দেওানজি মহাশয়ের অনেক দিন হইতে ছিল। এখন একজনকে হাতে পাইয়া নিজের তেজ কত তাহা দেখাইবার ইচ্ছা করি-লেন। তিলকরাম দেওয়ানজি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া ভীমেন্দ্রের সকল কথা কহিল। দেও-য়ানজি মহাশয় গোঁপে হাত দিয়া, চোক ঘূরাইয়া বলিলেন 'বটে? কেন তুমি পয়সা দাও নাই?' ভীমেন্দ্র বলিল "আমার পয়সা ছিল না, তাই দিই নাই; আমার ঠকাবার ইচ্ছা ছিল না।" দেও-য়ানজি রাগিয়া বলিলেন "খুব বাচাল ছেলেতো? পয়সা ছিল না, তবে পার হতে এসেছিলে কোন্ বুদ্ধিতে?" ভীমেন্দ্র কি উত্তর করিতে যাইতে-ছিল; দেওয়ানজি মহাশয় বাধা দিয়া বলি-লেন "এ জমীদারের কাছারী, তা হিসাব নাই! মুখে মুখে উত্তর? কোই হ্যায়?" দুজন বেহারা যোড়হাত করিয়া সেখানে দাঁড়াইল। দেও-য়ানজি হুকুম দিলেন "রাস্তার ধারের ছোট ঘরে পূরে চাবি বন্ধ করে দাও।" একজন ভদ্রলোক দেওয়ানজির কানে কানে বলিলেন 'কর্ত্তা শুন্‌লে কি বল্‌বেন?' দেওয়ানজি ষাঁড়ের মত [illegible] বলিতেছি ইয়া বলিলেন 'আমার হুকুম। লে যাও' [illegible]প লোক[illegible] বেহারা ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া চলি[illegible] বার গোঁয়ার ভীমেন্দ্র দুঃখ কি তা[illegible]

বাড়ীর সুখের কথা, মাতুল মাতুলানীর স্নেহ, বিপিনের প্রাণের ভালবাসা, সকলি এক সঙ্গে ভীমেন্দ্রের মনে পড়িল। দুঃখেতে কষ্টেতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল—সে প্রাণ খুলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বেহারাদের পাহাড়ের মন, তাহাতে ভিজিল না; তাহারা ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

দেওয়ানজি মহাশয় যে ছোটঘরের কথা বলিলেন, তাহার কথা একটু বলা আবশ্যক। রামজীবন বাবুর পিতা বড় অত্যাচারী ছিলেন, তিনি যাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তাহাকে এইঘরে পুরিয়া রাখিতেন। ঘরটী ইন্দুর ছুঁচো, আরশুলাতে পরিপূর্ণ। এই ঘরে লইয়া গিয়া নিষ্ঠুর বেহারা ভীমেন্দ্রকে বন্ধ করিল। ভীমেন্দ্রের ক্রন্দন বাতাসেই মিশিয়া গেল! এখন ভীমেন্দ্র বুঝিল অনর্থক রাগ করার ফল কি? ভীমেন্দ্র বালক বটে, তথাপি তাহার মনে হইতেছিল "কেন রাগ করিলাম? কেন সামান্য কারণে এত বিরক্ত হইলাম? কেন মাতুলের মিষ্ট কথা শুনিলাম না? বিপিন না জানি আমার কথা ভাবিয়া কত ক্লেশ পাইতেছে? যখন আমার মা একথা শুনিবেন, তখন তাঁর কতকষ্ট হইবে?" ভাবিতে ভাবিতে চক্ষের জলে ভীমের বুক ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভীমেন্দ্র অচেতন হইয়া পড়িল। দ্বিপ্রহর বেলা—ভীমেন্দ্র তখনও আহার করে নাই, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে। ভীমেন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। যখন জ্ঞান হইল, তখন শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল; জমীদার রামজীবন বাবুর হুকুম লইয়া একজন [illegible] উপস্থিত হইয়া বলিল "তুমি যাইতে পার। [illegible]াড়িয়া দিতে বাবু হুকুম দিয়াছেন।" [illegible] কোথায় যাইবে? এদিকে অসহ্য ক্ষুধা ওদিকে অসহ্য শরীরবেদনা—ভীমেন্দ্র কোথায় যাইবে? ভিক্ষা করিলে আহার যোঠে বটে, কিন্তু ভীমেন্দ্র ভদ্রলোকের ছেলে কি বলে ভিক্ষা করে? অবশেষে ক্ষুধা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক ময়রাদোকানের কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিল। দোকানের মধ্যে একটী বালক বসিয়া খাবার খাইতেছিল, সে ভীমেন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া তাহার যত খাবার ছিল, সকলি ভীমেন্দ্রকে দিল। ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় এই দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেও ভুলিয়া গেল; খাবার খাইবার সময় ভীমেন্দ্রের চক্ষে জল আসিয়াছিল, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীমেন্দ্র অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে আর ও পাঁচ দিন কখন কোন চাষার বাটীতে, কখন কোন ময়রার দোকানে, কখন বা পেটের জ্বালায় জোর করিয়া যৎসামান্য আহার যোগাড় করিয়া ভীমেন্দ্র নবমীর দিন রাত্রিতে গোপালপুরের রাস্তায় উপস্থিত হইল, কিন্তু কতক দূরে গিয়া ভীমেন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল, গলা শুকাইয়া কথা বন্ধ হইয়া গেল। ভীমেন্দ্র মৃতের ন্যায় মাটীতে পড়িয়া গেল—তাহার চৈতন্য রহিল না। প্রাতে রাস্তার লোকে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য সেইখানে যুটিল। অল্প সময়ের মধ্যে চারি দিকের গ্রামে এই খবর ছড়াইয়া পড়িল। সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ীতে এ খবর গেল। দীনদয়াল বাবু তাড়াতাড়ি কতকগুলি ঔষধ লইয়া, একটা পাল্কী সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর কি হইয়াছে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ অবগত আছেন। ক্রমশঃ—

ক্ষুদ্র জিনিশ।

অনেকের অভ্যাস আছে ক্ষুদ্র জিনিশ দেখিলে আর তাহা গ্রাহ্য করিতে চান না। একটী পয়সা বাজে খরচ, একটী ঘণ্টা মিথ্যা গল্প করা, একটু অল্প স্বাস্থ্য নষ্ট করা, এ সকল বিষয়ে কাহারও কাহারও মনোযোগ একেবারেই নাই। 'এসব সামান্য বিষয়' এই বলিয়া অনেকে এই সকল বিষয়ে সাবধান হইতে চান না। কোন খারাপ কাজের সম্বন্ধে যেমন, ভাল কাজের সম্বন্ধেও সেইরূপ,—'সামান্য কাজ, এর জন্য আর কি?' এই কথাই অনেকে বলেন। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীতে বড় লোক হইয়াছেন, যদি একবার তাঁহাদের জীবনের কথা পড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, কোন জিনিশ সামান্য বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন না। এক জন বড় লোককে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'আপনি কিরূপে এই সুনাম লাভ করিলেন?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "আমি কোন জিনিশকেই সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করি নাই।"

যদি কেহ ১৬ বৎসর বয়স হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যহ একটী করিয়া পয়সা বাজে খরচ করে, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় হিসাব করিলে সে দেখিতে পাইবে যে তাহার প্রায় দুই শত টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে যে সময় কাজ কর্ম্মের শক্তি থাকিবে না, সে সময় এতগুলি টাকা হাতে থাকিলে কত কাজ হইত। আট বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হইলে শেষে দেখা যে প্রায় দুই বৎসর সময় নষ্ট হইয়াছে। এইতো গেল অপব্যয়ের কথা। তাহার পর শিক্ষা সম্বন্ধেও কিছু বলা উচিত। অনেকে সামান্য সামান্য বিষয় হইতে কিছুই শিখিবার জিনিশ পান না, কিন্তু জ্ঞানী লোকদিগকে এই কথা বলিলে তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন "সে কি? চোখ্ কাণ খোলা থাকিতেইতো চারিদিক হইতে শিক্ষা পাওয়া যায়!" চক্ষু কর্ণ সকলেরই আছে, কিন্তু এক জন তাহার ব্যবহার জানেন বলিয়া বড় লোক, আর তুমি আমি চোখ কাণ বোঝার মত বহিয়া লইয়া বেড়াই মাত্র, কাজে লাগাই না, এই জন্যই আমরা মূর্খ। ফল পাকিলেই গাছ হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়, ইহাতো সকলেই দেখিয়াছি, কিন্তু নিউটন সাহেব বুঝিলেন, পৃথিবী ফলকে টানে, তাই ফল পড়ে। জল গরম করিবার সময় হাঁড়ির মুখে কাপড় চাপা দিলে, জলের ধুঁয়া অর্থাৎ বাষ্প কাপড়টাকে ঠেলিয়া দেয়, তাহাতে কাপড়টা কাঁপে, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি এবং জানি, কিন্তু মহাত্মা জেম্‌স্ ওয়াট্ তাহা দেখিয়া স্থির করেন বাষ্পের 'গায়ে' জোর আছে, তাহাতেই কাপড় নড়ে এবং এই হইতেই রেলের গাড়ী প্রভৃতি ধূম কলের সৃষ্টি হইল। তোমরা বোধ হয় জান বিলাতে টেম্‌স্ নদীর নীচে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড সুরঙ্গ-পথ আছে। ব্রুনেল নামে এক জন সাহেব ১৮২৫ হইতে ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত খাটিয়া অর্থাৎ ১৮ বৎসরে এই কাজটী শেষ করেন। কিসে তাঁহার এ কার্য্যের সুবিধা হইল, তাহা কি জান? তিনি এক দিন দেখিলেন একটী ছোট পোকা এক খণ্ড কাষ্ঠের মধ্য দিয়া গর্ত্ত করিয়া যাইতেছে। পোকাটী কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাষ্ঠের মধ্যে খিলান করিয়া এক প্রকার বার্নিশ লাগাইয়া যাইতে লাগিল, ব্রুনেল সাহেব তাহা বেশ করিয়া দেখিলেন, এবং [illegible] বিষয় 'সামান্য' বিষয়ই বড় করিয়া টেম্‌স্ নদীর [illegible]রা বড় পথ প্রস্তুত হইল।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক [illegible] বলিতেছি [illegible]প লোক[illegible] কি অপব্যয় বিষয়ে, কি সদ্ব্যয় বিষয়ে, [illegible] বিষয়ে, কি উন্নতি বিষয়ে, সকল দিকেই [illegible]

জিনিশের মূল্য আছে। পরমেশ্বর যে হাতে খুব বড় জিনিশকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হাতেই সামান্য জিনিশকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব কোন দ্রব্যকে সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিও না; মনে রাখিও সেই বড় লোক হয় যে সামান্য বিষয়কে অগ্রাহ্য করে না।

দেখ, বাবা! কেমন বাছুর!

সন্ন বাবু এক জন বেশ শিক্ষিত লোক। তিনি অনেক কাল হইতে পশুর-প্রতি-অত্যাচার-নিবারিণী সভার * সহিত যুক্ত আছেন। তাঁহার বাড়ীতে পশুর প্রতি কখনও অত্যাচার হয় নাই;—পিতা মাতার দেখাদেখি ছেলেগুলি পর্য্যন্ত বিড়াল, কুকুর, বাছুরদিগকে নিজেদের এক বাড়ীর লোকের মত ভালবাসে। ছেলেরা পশুদিগকে কিরূপ ভালবাসিত, তাহার একটী দৃষ্টান্ত বলি। এক দিন প্রসন্ন বাবু নিজের ঘরে বসিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, উঠানে সরলা (তাঁহার কন্যা) কাহার সহিত কথা বলিতেছে; প্রসন্ন বাবুর বড় শুনিতে ইচ্ছা হইল, সরলা কাহাকে কি বলিতেছে, এই জন্য উঠানের দিকে গলা বাড়াইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন উঠানের একপাশে মঙ্গলা গাই মহাসুখে সরলার হাতের খড় খাইতেছে,পাশে সরলা দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে। (বালিকার বয়স ৭ বৎসর মাত্র) প্রসন্ন বাবু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আরও অগ্রে গেলেন। গিয়া শুনিতে পাইলেন, সরলা বলিতেছে "মঙ্গলা! লক্ষ্মীটী! এই কটা খড় খেয়ে ফেল—না খেলে পেট ভরিবে কেন? (গাভী কোন কারণে মাথা নাড়িল) ও কি মাথা নাড় কেন? আর খাবে না? রাগ করিলে? তবে আমি যাই" এই বলিয়া সরলা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় গাভীটী অল্প ডাকিয়া তাহার মুখের দিকে স্নেহের চক্ষে তাকাইতে লাগিল। জগদীশ্বর বোবা করিয়াছেন, নতুবা বোধ হয় সে এই কথাই বলিতেছিল—"ওগো সুশীলে, আমি কি তোমার উপর রাগ করিতে পারি? যদি এই পৃথিবীর সকল লোকই তোমার মত হইত, তাহা হইলে কি আমাদের কোন দুঃখ থাকিত! তুমি যাইও না, তোমার মত বালকবালিকা আমার কাছে আসিলে, আমি বড় সুখী হই; ঈশ্বর করুন, সকলেই তোমার মতন হউক।" গরুর ডাক শুনিয়া সরলা ফিরিল, এবং অবশিষ্ট খড়গুলি সম্মুখে রাখিয়া আঁচলের দ্বারা গরুর গায়ে বাতাস করিতে লাগিল। গরু যখন খাইতেছিল, তখন সরলার মুখে হাসি—সরলা বলিতেছিল "এই তো মা লক্ষ্মীটী! খাও, খাও! আবার সন্ধ্যা বেলা ভাত আনিয়া দিব এখন।" এই কথাগুলি শেষ হইতে না হইতে প্রসন্ন বাবু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সরলার গালে হাত দিয়া বলিলেন "কি মা! কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল? উনি যদি তোমার মা হন, তাহ'লে তো আমার মায়ের মা—দিদীমা—হলেন! বেশ মা! তোমার জন্য গরুর সঙ্গে আমার বেশ সম্পর্ক হ'ল।" "যাও, বাবা! তুমি বড়—"ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলা সে স্থান হইতে দৌড়িয়া প্রস্থান করিল।

এমন সাধের গরুর কিছুকাল পরে বাছুর হইবার সময় হইল। প্রসন্ন বাবু তখন কোন কর্য্যের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন—ছেলেরা পত্র লিখিয়া জানাইল মঙ্গলার শীঘ্রই বাছুর হইবে। অবশেষে এক দিন রাত্রিতে বাছুর হইল। প্রাতঃকালে

জম। উ ... সভার কার্য্যালয়, কলিকাতা রাধাবাজার ১১১নং ... ভা অনেক স্থানে আপনাদিগের এজেণ্ট অর্থাৎ নিযুক্ত করিয়াছেন: ইঁহারা পশুর প্রতি কোন ... খিলে অত্যাচারীর নামে আদালতে নালিশ ... শাস্তি দেওয়াইয়া থাকেন।

ছেলেরা উঠিয়া দেখে সুন্দর বাছুর হইয়াছে, তখন তাহাদের আহ্লাদ দেখে কে? পাড়াময় ছুটিয়া গিয়া ছেলেরা খবর দিয়া আসিল বাছুর হইয়াছে। পাড়ার মেঝ দাদা, সেঝ কাকা, দাদা বাবু, গোলাপ দিদী, কবিরাজ জেঠা মহাশয়, মামাবাবু, দিদিমণি, গৌরমণি পিশী সকলেই প্রসন্ন বাবুর ছেলেদের গোলমালে নিদ্রা হইতে জাগিলেন—শুনিলেন বাছুর হইয়াছে। সকলেই প্রসন্ন বাবুর ছেলেদের সুখে সুখী, যেন প্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে একটী নূতন ছেলে হইয়াছে! তবে ছেলেদের একমাত্র দুঃখ প্রসন্ন বাবু বাড়ীতে নাই। স্কুল হইতে আসিয়া বাছুরের খেলা দেখা ও বাছুরের সঙ্গে খেলা করা, ইহা ভিন্ন ছেলেদের অন্য খেলা নাই। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে প্রায় একমাস পরে প্রসন্ন বাবু বাটী আসিলেন। ছেলেরা যখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইল অমনি 'বাবা বাছুর দেখিবে এসো' বলিয়া গরুর ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। দয়ালু প্রসন্ন বাবু—ছেলেদের সুখে সুখী; তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে তাঁহার ছেলেরা বোবা পশুদিগকে এত যত্ন করে এবং ভালবাসে। ছেলেদের সহিত গরুর ঘরে গিয়া প্রসন্ন বাবু নূতন ছেলের ন্যায় নূতন বাছুর দেখিলেন; ছেলেরা পিতাকে বাছুর দেখাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। ছবিতে দেখ তাহারা কেমন বাছুর দেখাইতেছে!

ঈশ্বর করুন আমাদের সকল বালকবালিকাই এই প্রসন্ন বাবুর ছেলেগুলির মত পশুর প্রতি ...ষয় করিতে শিখুক। আহা! যাহারা কথা ব...রা বড় খুলিয়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না বলিতেছি প্রতি অত্যাচার করা কি উচিত? ...প লোক...

গারফীল্ডের বাল্যকালের দুটী গল্প।

মহাত্মা গারফীল্ডের নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই শোন নাই। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকার ইনউনাইটেট্শ্ প্রদেশের সর্ব্ব প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। বাল্যকালে কখনও রাজ মিস্ত্রীর কাজ করিয়া, কখন ছুতারের কাজ করিয়া, কখন চাষার কাজ করিয়া, গারফীল্ড্ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, এবং তাহার দ্বারা বিধবা মার সাহায্য করিয়া নিজের লেখাপড়ার খরচও চালাইয়া দিতেন। এইরূপ চেষ্টা ও সুবুদ্ধির বলেই তিনি অত্যন্ত ছোট অবস্থা হইতে উঠিয়া এত বড় হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং পরম ধার্ম্মিকা ছিলেন বলিয়া গারফীল্ডের চরিত্র অল্প বয়স হইতেই ভাল হইয়া উঠে। আমরা অন্য সময়ে এই মহাত্মার জীবনচরিত পাঠকপাঠিকাদিগকে জানাইব; এখন কেবল সংক্ষেপে তাঁহার বাল্যকালের দুটী মাত্র গল্প লেখা যাইতেছে; এই গল্প দুটী পড়িলেই বুঝিতে পারিবে তিনি বাল্যকালেও কি চমৎকার লোক ছিলেন।

গারফীল্ডের একটী পোষা বিড়াল ছিল; বিড়ালটী তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, তিনি যেখানে যাইতেন, প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে থাকিত—বোবা পশু পর্য্যন্ত যেন বুঝিয়াছিল যে গারফীল্ডের মত বালকের কাছে থাকিলে তাহার কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। একদিন গারফীল্ড্ আপনাদিগের বাড়ীর বাগানে কাজ করিতেছিলেন,—বিড়ালটী সঙ্গে ছিল—এমন সময়ে [illegible]র সমবয়স্ক একটী বালক সেইখানে আসিয়া [illegible]ইল। অন্য দশ জন বালক যেরূপ এই [illegible] সেইরূপ কুকুর বিড়াল প্রভৃতির উপর [illegible]ায়া আমোদ বোধ করিত। কাজেই [illegible] বিড়ালটী দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল [illegible] ড়িয়া লয়! দুই একঘা ঢেলা খাইয়া বেচারা বিড়াল দৌড়িয়া ঘরে চলিয়া গেল, নিষ্ঠুর বালক নিজের মনে হাসিতে লাগিল।

বিড়ালের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া গারফীল্ড্ অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার পর খানিক ক্ষণ পরে বলিলেন—"আমি এরূপ ব্যবহার ভাল বাসি না।" বালক একটুও অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আঃ এমন কি ব্যবহার? একটা সামান্য বিড়াল বইতো নয়।'

গারফীল্ড্।—বিড়াল সামান্য হইলেও একটা প্রাণী।

বালক।—তাহা হইলে ইন্দুর, ছুঁচো, টীকটীকিও একটা প্রাণী।

গারফীল্ড্।—তাতে আর সন্দেহ কি? ঠাট্টা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ; যে এই বয়স হইতেই বোবা পশুর প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিতেছে সে বড় হইয়া মানুষের প্রতিও অভদ্র ব্যবহার করিবে। বালক গারফীল্ডের এই কথা শুনিতে একটু থতমত খাইয়া বলিল—"তুমি আমার হইয়া তোমার বিড়ালের নিকট ক্ষমা চাহিও।" এইরূপ কথা বার্ত্তার পর দুজন বালক দুদিকে চলিয়া গেল,—গারফীল্ড্ বিড়ালের হইয়া দুকথা বলিতে পারিয়াছেন, এই আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে গেলেন, এবং অন্য বালকটী সমবয়স্ক গারফীল্ডের কথায় চিন্তিত হইয়া পশুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহাই ভাবিতে ভাবিতে গেল।

আর একবার আর একটী ঘটনাতে, গারফীল্ড্ ভদ্র ব্যবহার করিতে কত ভাল বাসিতেন, তাহা বুঝা গিয়াছিল। 'সখা'র পাঠকগণ বোধ হয় জানেন (অন্ততঃ যাঁহারা সহরে অথবা বড় নগরে থাকেন, তাঁহারা জানেন) যে কোন স্কুলে একটা বালক নূতন ভর্ত্তি হইলে তাহাকে কত কষ্ট পাইতে হয়। ছোট বড় সকল ছেলেই তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলে, এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে 'পাড়াগেঁয়ে

ভূত' বলিয়া ঠাট্টা করে। আমরা নিজে জানি এই রূপ নূতন ছেলেরা কত কষ্ট পায়। গারফীল্ড্ যে বিদ্যালয়ে পড়িতেন, সেইখানে একবার একটী ছোট ছেলে নূতন আসিয়া 'ভর্ত্তি' হয়। সকলেই তাহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন 'এটা পাড়াগেঁয়ে ভূত,' কেহ বলিলেন 'এটা নিতান্ত বাচ্ছা', এইরূপে এক এক জন এক এক কথা বলিয়া বেচারা ছোট বালককে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দু চার ঘা চড় চাপড় দিতেও ছাড়েন না। ন্যায়বান গারফীল্ড্ এই সকল দেখিয়া বড় বিরক্ত হইলেন, এবং একদিন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "যে এই বালককে কষ্ট দিবে তাহাকে আমি আমার শত্রু বলিয়া মনে করিব।" গারফীল্ডের এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "ওঃ এত দয়া যে? এমন কি গুণ ওর আছে, যে তোমার মন ভিজিয়া গেল?" গারফীল্ড্ বলিলেন "গুণ থাকুক বা না থাকুক, উহার পিতা অথবা উহার বড় ভাই কেহই এখানে নাই; এমন সময়ে উহাকে এই অত্যাচার হইতে না রক্ষা করিলে কে উহার মুখের দিকে তাকায়?" বালকেরা হাসিয়া বলিল "তবে তুমি ছোট বালকের বাবাও হইবে, দাদাও হইবে?" গারফীল্ড্ এই কথার উত্তরে মুখ ভার করিয়া বলিলেন "বাবাই হই, আর দাদাই হই, আর যাই হই, ঠাট্টাই কর আর যাই কর, এই কথা মনে রাখিও যে আমার অপেক্ষা যদি কাহারও গায়ে জোর অধিক থাকে, তাহা হইলে এই বালকের প্রতি অত্যাচার করিতে আসিও, নতুবা মঙ্গল হইবে না।" গারফীল্ডের এই কথায় বালকদিগের মনে ভয় হইল, তাহারা সেই অবধি নূতন বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করা ছাড়িয়া দিল; ছোট বালকেরাও বিপদাপদে গারফীল্ড্কে দেখিলে সাহস পাইতে লাগিল।

এইরূপ সচ্চরিত্র বালকই ধন্য। যাঁহারা বাল্যকালে এইরূপ ভাল হন, বড় হইলে তাঁহারা যে সকলের নিকট প্রশংসা পান এবং চরিত্রের গুণে সকলের উপরে থাকেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ধূমপান।

একদিন পটলডাঙ্গার বাজারের এক দোকানে কি কিনিতে গিয়াছি, এমন সময় ছোট ছোট দুটী বাবু আসিয়া উপস্থিত। বয়স চৌদ্দ পোনের বৎসর হইবে, কিন্তু এত বড় ছেলের যত দূর ভদ্রতা জানা উচিত তাহার কিছুই তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। পোষাক অতি পরিপাটী; বাঁদর বাঁধিবার মত করিয়া বুকে পিঠে চাদর জড়ান; কোঁকড়ান চুলে লম্বা সীথী; চক্ষের চাউনিতে যেন অহঙ্কার পোরা; জুতার শব্দ যাহাতে কিছু বেশী হয় তাহার মত করিয়া চলা; দেখিলেই বোধ হয় মা বাপ ইঁহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু অযত্ন করেন। আমি যে দোকানে গিয়াছিলাম ছেলে দুটী সেইখানেই আসিলেন, আমার একটু কৌতূহল হইল। জানিলাম তাঁহারা চুরট কিনিতে আসিয়াছেন। দোকানদার চুরট দেখাইল। চুরট পসন্দ হইল না, একজন বলিলেন "এর চাইতে গুলি খাওয়া ভাল যে!"—আমি হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম। ছেলে মানুষ তামাক খায়! কি ভয়ানক লজ্জার কথা!

যে ছেলেরা তামাক খায় তাহার সঙ্গে বেড়াইতেও তোমাদিগকে পরামর্শ দিই না। তাহারা কখনও ভাল ছেলে নয়; তোমাদিগকে অনেক মন্দ বিষয় শিখাইয়া দিতে পারে, যাহার জন্য তোমরা বড় হইলে অনুতাপ করিবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে যাঁহারা তামাক খান তাঁহারা খারাপ লো[illegible] দুঃখের বিষয় অনেক ভাল ভাল লোক [illegible] খান। কিন্তু তোমাদিগকে সাবধান ক[illegible]

তোমরা তামাক স্পর্শ ও করিও না; তামাক বিষ। তামাক খাইয়া ও যাঁহাদের বুদ্ধি পরিষ্কার রহিয়াছে, তাঁহারা যদি তামাক না খাইতেন তবে আরো কত ভাল থাকিতে পারিতেন। অন্যান্য অনেক দোষের মত তামাক খাওয়া ও কুসঙ্গের ফল; যে ছেলেরা তামাক খায় তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিওনা।

তামাক খাওয়ার অনেক দোষ। প্রথম, নিজের ক্ষতি। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তামাকে মাথা গরম হয় এবং যাহারা তামাক খায় তাহাদের ঠোঁট প্রায়ই কাল হইয়া যায়।

তুমি বসিয়া রহিয়াছ, তামাকখোর তাঁহার যন্ত্র হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর ভ্রূড় ভ্রূড় শব্দে রাশি রাশি ধূম তোমার নাকে মুখে দিতে লাগিলেন। তখন কি ইচ্ছা হয় না যে কাছে একটা লাঠি থাকিলে লোকটাকে কিছু ঔষধ দিয়া দাও ?*

তৃতীয় দোষ, তামাক একবার যাহারা অভ্যাস করিয়াছে, অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া ও তাহারা ছাড়িতে চায় না। কাহারও নিকট গেলে সে যদি তামাক দিয়া অভ্যর্থনা না করিল তবে অনেক তামাকখোর তাহাকে অভদ্র মনে করে।

চতুর্থ দোষ, ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তামাকখোরেরা প্রায়ই শেষকালে মদখোর হইয়া উঠেন। তবেইতো কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের পথ খোলা হইল ভাব দেখি ?

পঞ্চম দোষ, কাপড়ে মুখে বিলক্ষণ দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। তামাকখোর যে গেলাশে জল পান করিলেন, তোমার আমার সাধ্য নাই যে সেই গেলাশে জল পান করি। ভদ্র সমাজে যাওয়া কষ্ট—দুর্গন্ধে ভূত পলায়।

তামাকের নানারূপ আকার আছে,—নস্য, তামাক, এবং চুরোট। অনেকে শর্দ্দি হইলে নস্য লইয়া থাকেন, এবং তাহাতে শর্দ্দি আরাম হয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা জানি এইরূপে ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করিতে গিয়া তাঁহারা নস্যের কেনা চাকর হইয়া পড়েন, আর তাহার হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না; আবার যে শর্দ্দির জন্য এই ঔষধ, তাহাও যেন বার মাস তাঁহাদের শরীরে লাগিয়া থাকে। তামাকের দুই রকম ব্যবহার দেখা যায়; এক ব্যবহার পানের সহিত চিবাইয়া খাওয়া, এবং অন্য ব্যবহার গুড় মাখিয়া আগুন দিয়া তাহার ধূম পান করা। বোধ হয় বলিতে হইবে না, আমরা ইহার কিছুই পসন্দ করি না। আর চুরোটের কথা কি বলিব ? চুরোটের ফল যেরূপ খারাপ, মুখে শরীরে যেরূপ দুর্গন্ধ করিয়া দেয়, চুরোটটী কাহারও মুখে দেখিতেও সেইরূপ খারাপ। লেজের মত মুখে লাগিয়া আছে এবং তাহার এক পাশ হইতে যেন আগ্নেয় গিরির ধূমরাশি বাহির হইতেছে! ছি!

এ জঘন্য অভ্যাস শীঘ্রই সকলের পরিত্যাগ করা উচিত। আমাদের অনেকের অভিভাবক ধূম পান করেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদিগকেও সেই পথে যাইতে হইবে, কে বলিল ? যাঁহারা অভিভাবকদিগকে তামাক খাইতে দেখিয়া মনে করেন, বড় হইলে ভদ্র সমাজে তামাক খাওয়াই উচিত, তাঁহারা আপন আপন অভিভাবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি, নিজেরা তামাকখোর হইলেও তাঁহারা বালকদিগকে তামাক স্পর্শ করিতে পরামর্শ দেন কি না ? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা এরূপ পরামর্শ কখনই দিবেন না। নিজেরা কুৎসিত কার্য্য করেন বলিয়া যে ছোট ভাই, ভাইপো, অথবা ছেলেদিগকেও তাহা

* এত শক্ত শাস্তি না দেওয়াই ভাল। যাহা হউক, তামাকের প্রতি কত বিদ্বেষ, ইহাতে তাহাই বুঝা যায়। স।

করিতে বলিবেন, ইহা সম্ভব নহে। আমার কোন অভিভাবক ভয়ানক তামাকখোর, অথচ আমি বাল্যকালে একদিন কুসঙ্গে থাকিয়া হুঁকা হাতে করিয়াছিলাম দেখিয়া তিনি আমাকে ভয়ানক বেত্রাঘাত করিতে ছাড়েন নাই। 'সখা'র পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ ধূমপায়ী থাকেন, আমাদের আশা, তাঁহারা শীঘ্রই এই কু-অভ্যাসের হাত ছাড়াইয়া পলাইবেন। স্কুলের শিক্ষকগণ যত্ন করিলে স্থানে স্থানে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য সভা হইতে পারে।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা ঢাকা নিবাসী বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ ও উপাসনা পদ্ধতি" নামক এক খানি ছোট পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে এইরূপ পুস্তক ভিন্ন আমরা অন্য পুস্তকের সমালোচনা করি না, সুতরাং আমরা এই পুস্তক খানির সম্বন্ধে কিছুই মতামত দিতে পারিতেছি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যদি আমাদের কোন পাঠক অথবা পাঠিকা 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?' তাহা জানিতে চান, তাহা হইলে এই পুস্তকে সে বিষয়ে অনেক জানিতে পারিবেন। পুস্তকের মূল্য এক আনা মাত্র।
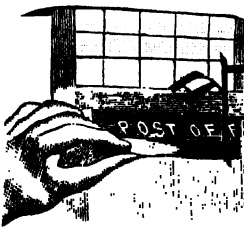
পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

দেবনারায়ণঘোষ, বগুড়া।—১। আপনার সমস্ত পত্র গুলিই পাওয়া গিয়াছে; রচনা সংশোধন করিবার সময় নাই বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে না; যাহা হউক কাগজে প্রকাশিত হউক বা না হউক আপনি ক্রমাগত রচনা করিবেন। ইহাতে কালে বিশেষ উন্নতি হইবে, আশা করা যায়। ২। বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী সখার সম্পাদক নহেন—সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় নহে।

শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া।—আপনাদিগের উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। 'সখা' পাঠে আপনাদিগের উপকার হয়, এসংবাদে 'সখার' লেখক ও লেখিকা মাত্রেই সুখী হইবেন।

শ্রীনীলকমল সরকার, লাহিড়ী।—রচনাটী মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষরূপে বদলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইল, সেরূপ সময় আমাদের নাই। যদি আপনার নিকট রচনার নকল একটী থাকে তাহা হইলে 'কি ছার কুসুম' ইত্যাদি দুই এক স্থল বদলাইয়া দিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, মালতীনগর।—আপনাদিগের উপকার হইতেছে জানিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোপালপুর।—একটী ভিন্ন সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শালডঙ্গা।

শ্রীবামাপদ চট্টোপাধ্যায়, কালনা।—দুটিভিন্ন সমস্ত গুলির উত্তর হইয়াছে।

ধাঁধাঁ।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। 'কমল' নিরাকার অর্থাৎ া কার নাই তাহাতে া কার যোগ করিলে 'কমলা' হইল।

২। ক র ভ প্রথম অক্ষরগুলিতে 'কলিকাতা'
লি খি য়া এবং
কা মা ন শেষের অক্ষর গুলিতে [illegible]
তা মা ক হই[illegible]

৩। সু শী ল এবং ত র লা

শী ত ল র সা ল

ল ল না লা ল সা

৪। অবিমৃষ্যকারিতা ; মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৫। পকেট ঘড়ি।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ; শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া ; ইহাঁর উপরের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর করিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার, কলিকাতা এবং শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, মালতীনগর ; ইহাঁরা একটী ভিন্ন আর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

নূতন।

১। ি—ি—ি—।=খাইতে মিষ্ট।—া—া—া—া =খাইতে মিষ্ট।

২। পুস্তকেতে আছি আমি, নাই কিন্তু মনে,
কাননেতে আছি আমি, নাই কিন্তু বনে।
কলিকাতা মাঝে আমি দুই ঠাঁই থাকি,
অথচ সহরে মোরে পাবেনা নিরখি।
শিক্ষকেতে আছি আমি পণ্ডিতেতে নাই।
বল দেখি কোন্ প্রাণী আমি হই ভাই।

৩। আমার ১ম ও ৩য় অক্ষর ··এক সঙ্গে লইলে—আশা

———১ম ও ৪র্থ অক্ষর···কলারে বামণের আশা কিন্তু পো-ড়োর ভয়।

———১ম ও ৫ম অক্ষর··বড়লোকে মাথায় বাঁধে।

———২য় ও ৪র্থ অক্ষর··এসময়ে ছেলেরা বাহির হয় না।

———২য় ও ৫ম অক্ষর···চটা মেজাজ।

———২য় ৩য় ও ৬ষ্ঠ অক্ষর···একটা রাক্ষস।

বলত আমি কে?

১। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথা স্থানে বসাইয়া তাহাতে কি নাম হয় তাহা বাহির করঃ—

নাম	বিশেষ পরিচয়
সূর্ঘতাদীত্র	এই দোষে লোকের কোন কাজ হয় না ; এ দোষ যাহাকে ধরে তাহাকে কি বিদ্যালয়ে, কি অর্থো-পার্জ্জনে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে দেয় না। ইংরাজীতে ইহাকে লোকে সময়ের চোর বলিয়া থাকে।
রণতাশ্ব পয়রাঈ	এই গুণ থাক্‌লে মানুষ কখনও ক্লেশে পড়ে না, ঈশ্বরই তাহার সহায় হন।

৫। একটী ছেলে তান ছেড়ে দেশের কাছে গেল ; অমনি সে একটী ভাল খাবার জিনিশ হয়ে গেল! বল দেখি কেমন ক'রে?

৬। তিনটি অক্ষরে নাম যথা তথা মম ধাম
দ্বিতীয় ছাড়িলে অর্থ অল্প-মাত্র হয়।
তৃতীয়ে ছাড়িলে পরে যন্ত্র অর্থ সবে করে
ভাষার বাহক আমি কেবা মহাশয়?

সখা

সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। বর্ত্তমান মার্চ মাসের পরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন বিদেশবাসী হইলে তাঁহাদের পক্ষে পত্রিকার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৴১০ মাত্র।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সম্বাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে ; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি, সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়-কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, তাহার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

প্রথম ভাগ । ১লা এপ্রেল ১৮৮৩, রবিবার । ৪র্থ সংখ্যা ।

জর্জ ষ্টিফেন্‌শন— ৫৭ পৃষ্ঠা ।

রামায়ণের উপদেশ।

(খ) হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গবাস ও পতন।

হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্বে অযোধ্যাতে অনেক রাজা ছিলেন—কিন্তু কেহই আমাদের ভক্তি পান নাই, আর রাজা হরিশ্চন্দ্রকেই বা এত ভক্তি করি কেন? ভক্তি করিবার কারণ আছে; হরিশ্চন্দ্রের জীবন উপদেশে পূর্ণ। আমরা সচরাচর কি দেখিতে পাই? বড়লোক হইলে প্রায়ই ধার্ম্মিক হয় না—যাহার টাকা আছে সে প্রায়ই অহঙ্কারে মাতিয়া পরম ধন যে ধর্ম্ম তার দিকে মন দিতে চায় না। এই যখন পৃথিবীর দশা, তখন যদি দেখি একজন বড়লোক রাশি রাশি টাকার অধিকারী হইয়াও অহঙ্কারী নন, যদি দেখি একজন রাজা হাজার হাজার লোকের প্রধান হয়ে, কখনও তাদের কটু কথা বলেন না, বা অপকার করেন না, যদি দেখি পৃথিবীতে যত সুখ থাকিতে পারে সে সকল সুখে সুখী হয়েও একজন অতি প্রধান পুরুষ ধর্ম্মের জন্য সব ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর আমাদের আশ্চর্য্যের সীমা থাকে না। এই জন্যই আমরা ভক্তির সহিত, আশ্চর্য্যের সহিত হরিশ্চন্দ্রের গল্প পড়িয়া থাকি বা শুনিয়া থাকি। যে সময় হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার রাজা ছিলেন, তখন অযোধ্যাই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান নগরী ছিল, তখন অযোধ্যার রাজার নামে চারিদিকের রাজারা ভয়ে কাঁপিতেন। হরিশ্চন্দ্র এত বড় রাজা হইয়াও কখনও অহঙ্কৃত হন নাই; সৎপথে থাকিয়া রাজ্য শাসন করাই হরিশ্চন্দ্র পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী শৈব্যার রোহিতাশ্ব নামে সবে [illegible] ছিল। হরিশ্চন্দ্র এই রোহিতাশ্বকে [illegible]সিতেন, কি আপন প্রজার উপকার [illegible] বাসিতেন, তাহা স্থির করা [illegible] বড়ই ভালবাসিতেন। রাজকার্য্য করিয়া অবসর পাইলেই অথবা মন্ত্রীকে রাজকার্য্যের ভার দিয়া হরিশ্চন্দ্র মধ্যে মধ্যে আপন রাজ্যের নানা স্থানে বনে বনে বন্যপশু মারিয়া ফিরিতেন।

এই মৃগয়া করিবার জন্য একদিন হরিশ্চন্দ্র এক প্রকাণ্ড বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমে এজন্তু ওজন্তু শিকার করিয়া অবশেষে হরিশ্চন্দ্র একটা বরাহ অর্থাৎ বুনো শূকর বধ করিবার জন্য এত মত্ত হইলেন, যে তাঁহার সঙ্গীরা কেহই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিল না। তিনি একটা বন হইতে আর একটা বনে, অল্পবন হইতে বেশী বনে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি বরাহ বধ হয় না—হঠাৎ তাঁহার কাণে কি একটা শব্দ আসিল। যে দিক হইতে শব্দটী আসিতেছিল, সেই দিকে কাণ পাতিয়া হরিশ্চন্দ্র শুনিতে পাইলেন, কতক গুলি স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, এবং 'কোথায় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রক্ষা কর!' এই বলিয়া তাঁহাকেই ডাকিতেছে। পরম ধার্ম্মিক হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় এই কাতর বাক্যে বড়ই ব্যথিত হইল—তিনি বরাহ বধ ছাড়িয়া দিয়া যে দিক হইতে রোদনের শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে চলিলেন, এবং 'ভয় নাই, ভয় নাই,' এই কথা বলিতে বলিতে শীঘ্রই সেই গভীরবন ছাড়িয়া একটা নিকটবর্ত্তী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যেখানে হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত হইলেন, বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহাকে বাড়ী বলা যায় না; চারিদিকে সুন্দর সুন্দর গাছ মিলিয়া একটী ঘরের মত হইয়াছে—তাহার ভিতরে একটী বেদী অর্থাৎ বসিবার আসন। দুএকখানি কুঁড়ে ঘর যা আছে, তাও ঘর নয় বলিলেও হয়। কিন্তু এই স্থানের স্বাভাবিক শোভা অতি সুন্দর। এই রূপ স্থানটী মুনি বিশ্বামিত্রের আশ্রম বা তপোবন; এইখানে বসিয়া মুনি, দেব-পূজা বা তপস্যা করেন—এ

মন পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়। এই খানে যে বিশ্বামিত্রের তপোবন, তাহা হরিশ্চন্দ্র জানিতেন না সুতরাং যখন তিনি আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক বাঁধা রহিয়াছে এবং প্রাণ যাইবার ভয়ে তাহারা কাঁদিতেছে—তখন তিনি অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র সংবাদ পাইলেন হরিশ্চন্দ্র তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়া যে মেয়েদের তিনি বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখনি তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—মনে মনে ভাবিলেন "কি? আমার তপোবনে আমার অনুমতি না নিয়ে এসে আবার আমারই উপর অত্যাচার? এর শোধ যদি না দিই তবে আমার নাম বিশ্বামিত্রই নয়!" এই ভাবিয়া বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বজ্রের ন্যায় কর্কশ স্বরে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে দুরাত্মা, তুমি রাজা হয়ে বড় অহংকৃত হয়েছ? তোমার কি সাহস—আমার তপোবনে গিয়ে সেই মেয়েদের খুলে দিয়ে এসেছ?" বিশ্বামিত্রের রাগ দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রের ভয় হইল; তিনি বলিলেন "ঠাকুর, আমিতো জানি না আপনি বেঁধেছেন? আমি শুনিলাম কতকগুলি স্ত্রীলোক 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিতেছে; আমি ক্ষত্রিয়, দান করা, রক্ষা করা, এসকল আমার স্বধর্ম্ম, তাই নিজ ধর্ম্মানুসারে মেয়েদের ছাড়িয়া দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের এই মহৎ কথাগুলি শুনিয়া কিছু হটিয়া গেলেন—কিন্তু তিনি জব্দ করিতে আসিয়াছিলেন, এই কথাতেই চুপ করিয়া গেলেতো জব্দ করা হয় না! তাই বলিলেন "তুমি দান করে থাক, না? আচ্ছা আমাকে দাও দেখি কি দেবে?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "প্রভো, আপনাকে ধন-জন-পূর্ণ আমার সমস্ত রাজ্য দিলাম।" বিশ্বামিত্র ইহাতেও না পারিয়া দক্ষিণার ছল করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বিপদে ফেলিলেন। তোমরা বোধ হয় সকলেই জান ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে কাহারও বাড়ীতে আহার করিতেন না, অথবা কাহারও দান লইতেন না; যদি কাহাকেও এই বিষয়ে অনুগ্রহ করিতেন তাহা হইলে এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে কিছু টাকা দিতে হইত; এই টাকার নাম দক্ষিণা এখনও অনেক স্থানে ব্রাহ্মণেরা কাহারও বাটীতে আহার করিলে এইরূপ দক্ষিণা লইয়া থাকেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন "তোমার দান আমি লইলাম; যেমন দান তেমনি দক্ষিণা চাই, এই দানের মতন দক্ষিণা সাত কোটী মোহর আমাকে দিতে হইবে।" হরিশ্চন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; এত টাকা কোথায় পাইবেন?—নিজের ধনাগারে টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহাতো দান করিয়াছেন; কাহার ধন কাহাকে দিবেন? হরিশ্চন্দ্রকে ভাবনায় পতিত দেখিয়া বিশ্বামিত্র মনে মনে ঘৃণার সহিত হাসিলেন, এবং ঠাট্টার স্বরে বলিয়া উঠিলেন "বড় নিজের ধর্ম্মের জাঁক করা হচ্ছিল! হারে পামর! এখন দক্ষিণা দেবার বেলা মুখ শুকিয়ে গেল কেন?" হরিশ্চন্দ্র স্থির ভাবে বলিলেন "ঠাকুর, আপনি অনুগ্রহ করে এক মাস অপেক্ষা করুন; আমি উপার্জ্জন করে আপনার দেনা পরিশোধ করিতেছি।" বিশ্বামিত্র আরও রাগিয়া বলিলেন "তুমি রোজগার করেই আন আর চুরি করেই আন—এক মাসের মধ্যেই দিতে হবে; আর আমার এ রাজ্য থেকে তুমি চলে গিয়ে যা খুসি তাই করগে। কাশী আমার পৃথিবী রাজ্যের মধ্যে নয়, তুমি সেই খানে যাও।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; হরিশ্চন্দ্রও দুঃখিত মনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্রের দুঃখের কারণ এ নহে [illegible] না বুঝিয়া পৃথিবী দান করিলে [illegible]

দুঃখের কারণ অনেক গুলি;—প্রথম তিনি না জানিয়া, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, কোন একজন মুনির ক্ষতি করিলেন? দ্বিতীয়,—মুনি যদি রাগান্বিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের কোন অপকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারই দোষে তাঁহার প্রজারা কষ্ট পাইবে; তৃতীয়,—দক্ষিণার টাকা উপার্জ্জনে যে ক্লেশ হইবে, তাহাতে তিনি কাতর নন, কিন্তু সেই কষ্টের সময় মহারাণী শৈব্যা ও বালক রোহিতাশ্ব কোথায় দাঁড়াইবে? কার মুখ চেয়ে বাঁচিবে? তিনি তাঁর সত্যের জন্য দায়ী—প্রাণ দিয়ে নিজের সত্য পালন করিবেন, কিন্তু তাঁহার জন্য অন্য লোকে কষ্ট সহ্য করিবে, একি বিষম বিপদ এইরূপ ভাবনাতেই হরিশ্চন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি মলিনমুখে অন্তঃপুরে—যেখানে রাজরাণী ও রাজকুমার ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শৈব্যা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রের পথ চাহিয়া ছিলেন; তিনি আসিলে তাঁহার ম্লানমুখ দেখিয়াই শৈব্যার প্রাণ উড়িয়া গেল। অধিক বিলম্ব করিতে হইল না, হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মুখে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া শৈব্যা ভয় বা কষ্ট কিছুই বোধ করিলেন না। বরং স্বামী যাহাতে নিজের কথা রাখিয়া ধর্ম্মে বজায় থাকিতে পারেন, তাহার জন্য স্বামীর সহিত কাশীতে যাইতে চাহিলেন। বালক রোহিতাশ্বও পিতার সাহায্য করিবে বলিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল। রাজ্যের দুটী একটী প্রধান কর্ম্মচারী ভিন্ন, আর কেহই এ সম্বাদ জানিল না। জানিলে তাহারা তাহাদের পিতৃতুল্য রাজার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিত। রাত্রির অন্ধকারে প্রজাদিগকে ফাকি দিয়া প্রজার ... হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্মপালনের জন্য অযোধ্যা ত্যাগ ...লিয়া গেলে অযোধ্যার দশা কি হইল তাহা বলিতে চাই না; হরিশ্চন্দ্র রাণীকে এবং রোহিতাশ্বকে লইয়া কোথায় গেলেন, আইস তাহাই দেখি। যথাসময়ে হরিশ্চন্দ্র কাশীতে পৌছিলেন।—অনেক দিন, কি করিবেন এই ভাবনাতেই গেল।—অবশেষে বিশ্বামিত্রের টাকা দিবার দিন আসিল।—শৈব্যা আর উপায় নাই দেখিয়া বলিলেন "আমাকে বিক্রয় করিয়া আপনার অর্থ পরিশোধ করুন, আর ভাবিয়া কি হইবে?"—যখন শৈব্যা এই কথা বলিতেছিলেন, তখন দুঃখে তাঁহার গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল—তিনি যে দাসী হইবেন, তাহাতে কষ্ট কি? কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে হরিশ্চন্দ্রের ক্লেশ হইবে—বালক রোহিতাশ্ব কাহার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইবে, এই ভাবনায় তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।—শৈব্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মহারাজ—আর বিলম্বে কাজ নাই। যাহাতে নিজের কথা থাকে তাহা করুন।" হরিশ্চন্দ্র ব্যথিত মনে 'কেউ দাসী কিনিবে? কাহারও দাসীর প্রয়োজন আছে?' এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে দাসী বিক্রী ক'চ্চ, বাপু? আমার একটী দাসী চাই। 'এই—এই দাসীটী—তা বেশ। বাপু, কত হলে দাসীটী পাওয়া যায়?" হায়! হায়! ধর্ম্মের জন্য কি কষ্ট-স্বীকার! হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "৩ কোটী মোহর চাই।" ব্রাহ্মণ তাহাতেই রাজি হইলেন, কিন্তু যখন রোহিতাশ্ব—'মাকে কোথায় নিয়ে যাও' বলিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল, তখন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইল। শৈব্যা বলিলেন "ঠাকুর, আপনাকে পয়সা দিতে হইবে না—এ ছেলেটীকেও আপনি ক্রয় করুন; আপনার পূজার আয়োজন করা, ফুলটুল তুলে দেওয়া, এসব পারবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "না বাপু, আর আমি বেশী লোক নিয়ে খেতে দিতে পারবো না;—

আবার ছেলে মানুষ, কত দুষ্ট, তা কে জানে।" ব্রাহ্মণ, তুমি কি নিষ্ঠুর?—ঐ দেখ শৈব্যা চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতেছেন—একটী ছোট ছেলেকে মা ছাড়া করে রাখিতে চাহিতেছ? কি নিষ্ঠুর?—শৈব্যা বলিলেন "আমার পুত্র আপনার চাকর হইয়া থাকিবেক; উহাকে আহার দিবার জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না--আমাকে যাহা দিবেন, তাহা হইতেই উহার আহার চলিবেক।"

ক্রমশঃ—

জেমৃশ্ এব্রাম গার্ফীল্ড্।

প্রথমে দুটী কথা বলা আবশ্যক। বিদেশীয় নামগুলি লইয়া কোন কোন বালক আমাদিগকে বড়ই ত্যক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন "প্রথমটীই নাম, শেষেরটীতো বংশের উপাধি, তবে সাহেবদিগকে শেষের নামে ডাকা হয় কেন? ইহাতে এক বংশের অনেকের মধ্যে গোল হয় না?" এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি। সাহেবদিগের শেষের নামটী বংশের;—যেমন সেন বংশ, দাস বংশ, কি রায় বংশ, সেইরূপ গার্ফীল্ড্ বংশ, এ কথা সত্য, এবং পূর্ব্বের নামগুলি পিতা মাতার দ্বারা তাঁহাদের নিজের নামের সহিত মিলাইয়া বা কোন বড় লোকের নামের সহিত মিলাইয়া রাখা হয়, সুতরাং সেইগুলিই যথার্থ নাম, তাহাও সত্য, কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে এই নিয়মই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে যে প্রত্যেককে বংশের নাম ধরিয়া ডাকা হয়। তবে পিতা মাতা কিম্বা বয়সের বড় অন্য কোন নিকট আত্মীয় হইলে, তাঁহারা প্রথম নামেই ডাকেন। যদি এক স্থানে এক বংশের দুই তিন জন থাকেন, তাহা হইলে প্রথম ও শেষের নাম দুই ধরিয়া বাছিয়া লওয়া হয়। এই সম্পর্কে আর একটী কথা আছে। সাহেবদের বংশের নামের আগে যে দুটী নামই থাকিবে তাহার অর্থ নাই—কাহারও একটী কাহারও বা তিনটী থাকে; সুতরাং আমাদের যেমন 'সতীশ' বলিলেই 'চন্দ্র' তাহার পরে আপনি বসে—সাহেবদিগের সেইরূপ একটী নাম আর একটা নামের উপর নির্ভর করে না; প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র।

আমাদিগের দ্বিতীয় কথা আমেরিকার সম্বন্ধে। উত্তর আমেরিকার খানিকটা স্থান পূর্ব্বে ইংরাজদিগের অধীন ছিল, কিন্তু ইংরাজেরা কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু অত্যাচার করাতে সেই স্থানের লোকেরা দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। এই দলের কর্ত্তার নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটন। ইহাঁর সম্বন্ধে এখন কিছুই বলিবার নাই, তবে এই বলিলেই চলিতে পারে যে যখন ইংরাজেরা ইহাঁদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন সে দেশের রাজকার্য্য কি ভাবে চলিবে, ইনি সে বিষয়ে অনেক পরামর্শ দেন, এবং ইহাঁরই চেষ্টাতে স্থির হয় যে এ দেশের কেহই রাজা থাকিবেন না, সকলে মনোনীত করিয়া একদল লোক বাছিয়া দিবেন, তাঁহাদের পরামর্শে সমস্ত কাজ চলিবে, এবং সকলে মনোনীত করিয়া কয়েক বৎসরের জন্য এমন একজনকে বাছিয়া দিবেন, যিনি এই মহাসভার কর্ত্তা হইবেন, এবং যাঁহার নামে [illegible] আমেরিকার সমস্ত রাজকার্য্য চলিবে। [illegible] চারীর নাম 'প্রেসিডেণ্ট।' যে উপ[illegible] এই কার্য্য পাইতে পারিবে, [illegible] কন

বিচার থাকিবে না; একজন সামান্য পথের মুটে পর্য্যন্ত আশা করিতে পারিবে যে, লেখা পড়া শিখিয়া খুব বুদ্ধিমান এবং উপযুক্ত হইলে সেও একদিন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে। গরিবের ঘরে জন্মিলে আমেরিকায় কোন ভয় নাই, গুণ থাকিলেই প্রত্যেকে তাহার উপযুক্ত আদর পায়।

এমন আমেরিকা দেশে এক গরিবের ঘরে মহাত্মা গার্ফীল্ড্ জন্মগ্রহণ করেন। গার্ফীল্ড্ তাঁহার বাপ মায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, এই জন্য বাপ মায়ের বড় ভালবাসার পাত্র ছিলেন। যখন গার্ফীল্ডের বাপ মরিয়া যান, তখন গার্ফীল্ড্ অতি অল্প বয়স্ক। গার্ফীল্ড্-পরিবার যেখানে বাস করিতেন, তাহার চারিদিকেই জঙ্গল; তাহার মাঝের একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া তাঁহারা নিজেদের বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একবার এই বনে আগুন লাগিয়া গেল, ভয়ানক রৌদ্রে গাছপালা প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং চারিদিক পোড়াইয়া ভয়ানক বেগে আগুন গার্ফীল্ড্দিগের ঘরেরদিকে আসিতে লাগিল। বাড়ী ঘর, ছেলে মেয়ে, সকলই বুঝি এইবার যায়, এই ভয়ে গার্ফীল্ডের পিতা ভয়ানক সাহসের সহিত সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড়াইয়া গাছ কাটিয়া আগুনের পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর অগ্নি থামিল বটে, কিন্তু ভয়ানক গরমে শরীর উত্তপ্ত হইয়াছিল, তাহার পর অনেকক্ষণ শীতল বাতাসে বসিয়া থাকাতে অল্প সময়ের মধ্যেই কাশরোগে হঠাৎ গার্ফীল্ডের পিতা মরিয়া গেলেন; যে পরিবারটীকে প্রাণে বাঁচাইবার জন্য তিনি নিজে মারা পড়িলেন, তাহাদের জন্য কিছুই পুঁজি করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। কেবল মরিবার সময় [illegible]ল্ডের মাতাকে এই কথা বলিয়া গেলেন,— [illegible]নি রক্ষা করিয়াছেন, তিনি এখনও [illegible] আমার বালক বালিকাদিগকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তোমার সুবুদ্ধির দ্বারা ইহাদিগকে চালাইও।

গার্ফীল্ডের পিতার মৃত্যু হইলে অনেকে তাঁহাদিগকে সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু গার্ফীল্ডের মাতা তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না। তিনি নিজে অত্যন্ত পরিশ্রমশীলা ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বড় পুত্র টম্ ভয়ানক পরিশ্রমের সহিত ক্ষেতের কাজ করিতে লাগিল; কাজেই সেই পরিবারের বিশেষরূপ কষ্ট ছিল না। যদিও বা কখনও কষ্ট হইত, তাহা হইলে তাঁহারা এই ভাবিয়া সকল কষ্ট ভুলিতেন যে সৎপথে থাকিয়া কষ্ট পাইলে, তাহাতে দুঃখ নাই।

টমের বয়স এই সময় ১১ বৎসর মাত্র, কিন্তু পরিশ্রম করিতে তিনি বুড়ো মানুষের মত মজবুত ছিলেন। লাঙ্গল চষা, গাছ রোপণ করা, বীজ ছড়ান, কাঠ কাটা, গরু দোহা, এইরূপ অনেক কাজে টম প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। মা বাড়ীতে বসিয়া চরকায় কাটিয়া ছেলে মেয়েদের জন্য কাপড় প্রস্তুত করেন। এইরূপে সেই গরিব পরিবারটী অনেককাল সেই স্থানে কাটাইলেন। নিজেদের বাড়ীর আবশ্যকীয় কাজ করিয়াই যে টম্ স্থির থাকিতেন, তাহা নহে; তাঁহাদের বাড়ীর নিকটে একটী পরিবারের একজন চাকরের প্রয়োজন হইয়াছিল;—টম্ মায়ের পরামর্শে অমনি সেখানে গিয়া চাকরী আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যে টাকা উপার্জ্জন করা হইল, বালক গার্ফীল্ডের জন্যই তাহা কাজে আসিল; তাঁহার একযোড়া জুতা হইল, (ইহার পূর্ব্বে আর জুতা ছিল না;—গরিব কোথায় পাইবেন?) এবং তাঁহার স্কুলে পড়িবার বন্দোবস্ত হইল। সেই জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা দূরে যে একটী স্কুল ছিল, ৩।৪ বৎসরের বালক গার্ফীল্ডের সাধ্য ছিল না সেখানে হাটিয়া যান, কাজেই তাঁহার দিদি তাঁহার ঘোড়া হইলেন।

দিদির ঘাড়ে চড়িয়া গার্‌ফীল্‌ড্‌ প্রত্যহ স্কুলে যাইতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের দিনে ঘরের কাজ কর্ম্ম, চাষ-বাস করিতে হইত, সুতরাং সে সময় পড়াশুনার তত বেশী সুবিধা হইত না; যে সময় শীত আসিত, ভয়ানক শীতে চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইত, তখনই তাঁহাদের পড়িবার সময়। তেলের পয়সা জুটিত না, বাড়ীতে আগুন পোহাইবার জন্য যে কাঠ জ্বালা হইত, তাহাতেই আগুন পোহান এবং পড়া শুনা, দুয়েরই কাজ চলিয়া যাইত। যাহা হউক এইরূপ কষ্টে পড়িয়াও গার্‌ফীল্‌ডের পড়াশুনার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। আট বৎসর যখন তাঁহার বয়স, তখন তাঁহাকে তাঁহার জানিত বিষয়ে কেহই ঠকাইতে পারিত না, কারণ তিনি কিছুই অর্দ্ধেক শিখিয়া ফেলিয়া রাখিতেন না। ক্ষেত্রের কাজেও তিনি এই সময়ের মধ্যে পটু হইয়াছিলেন। আর না হইবেনই বা কেন? ছোট ছেলেরা যেমন কোন কাজ করিতে বলিলে, বলিয়া বসেন 'আমি পারিব না,' গার্‌ফীল্‌ডের সে অভ্যাস ছিল না; বরং তিনি কোন কাজ করিতে পাইলেই, আনন্দের সহিত 'আচ্ছা যাই' বলিয়া ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার মা সর্ব্বদাই তাঁহাকে বলিতেন, "দেখ বাছা! কোন কাজ করিতে হইলে, 'পারিব' বলিয়া মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহস থাকিলেই সে কাজের অর্দ্ধেক হইয়া যায়"; গার্‌ফীল্‌ডেরও মনে মনে এই বিশ্বাস চিরকাল ছিল।

ইহার কিছুকাল পরে টম্‌ চাকরী করিবার জন্য বিদেশে যান, কাজেই ক্ষেতের সমস্ত কাজ গার্‌ফীল্‌ডের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। ভাবিয়া দেখিলে এই অল্প বয়সেই গার্‌ফীল্‌ডের একরূপ সংসারের আরম্ভ হইল। সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে দুটী অমূল্য উপদেশ দিলেন—(১) "ঈশ্বর তোমাকে যে অবস্থাতেই রাখুন, তিনি যে তোমার মঙ্গলই করিবেন, এটী বিশ্বাস করিও, এবং সকল বিষয়ে তাঁহারই সাহায্য চাহিও, কারণ তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কিছুই হয় না।" (২) "যাহা ঠিক বুঝিবে তাহা করিতে ভয় পাইওনা। পৃথিবীর মধ্যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভীত যে ভাল কাজ করিতে ভয় পায়।" শেষের উপদেশটী শুনিয়া গার্‌ফীল্‌ড্‌ বলিলেন, "মা, যাহারা বড় হইয়াছে, তাহাদের ভাল কাজ করিতে ভয় পাওয়া উচিত নয়, তুমি এই কথা বলিতেছ?" মাতা উত্তর করিলেন "কেবল তাহা কেন? বালকদিগের কথাও বলিতেছি। অনেক বালক ভাল কাজ করিতে সাহস পায় না। মাতা অথবা শিক্ষক একটা কাজ করিতে হয়তো বারণ করিয়াছেন, কিন্তু পাছে একবয়স্ক সঙ্গীরা ঠাট্টা করে এই ভয়ে অনেক বালক সেই কাজ করিয়া ফেলে, এরূপ করা ভয়ানক অন্যায়। যে দিকে ভাল কাজ সেই দিকেই ঈশ্বর থাকেন; তবেই বোঝ, যদি ঈশ্বর তোমার দিকে থাকিলেন, হাজার বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা করিলে বা চটিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি?"

এইরূপ উপদেশ পাইয়া গার্‌ফীল্‌ড্‌ চলিতে লাগিলেন। ভয়ানক পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার কোন কষ্ট হইত না! বিশ্রাম যে এক দ্রব্য তাহা তিনি চাহিতেন না। কাজ করিয়া অবকাশ পাইলেই সে সময়টুকু পড়াশুনায় কাটাইয়া দিতেন, আবার পড়া শুনা করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, সে সময় টুকু নূতন নূতন কাজ শিখিয়া কাটাইয়া দিতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ছুতোরের কাজ শিখিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার দাদা টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাড়ী ফিরিলে, তাঁহার সাহায্যে মাতাকে একখানি সুন্দর ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আরও দুই তিন রকম কাজ করিয়া গার্‌ফীল্‌ডের বড়ই ইচ্ছা হইল, একবার সমুদ্রে চাকরী করিতে যান। তিনি গল্পের পুস্তকে সমুদ্রের নানারূপ গল্প পড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন, কাজেই [illegible] প্রবল হইল; মাতা প্রতিক বুঝিয়া [illegible] কেন ততঃ সমুদ্রে গিয়া কাজ নাই, নিব[illegible]

সেখানে গিয়া যদি সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা অধিক হয়, তখন যাইও।" এইরূপে পুত্রকে বিদায় দিয়া স্নেহময়ী মাতা ভয়ানক কষ্টে দিন শেষ করিতে লাগিলেন।

এদিকে গার্‌ফীলড্‌ আপনার 'পুঁজিপত্র' বাঁধিয়া হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলেন, এবং এক জাহাজে উঠিয়া সেই জাহাজের কাপ্তেনের সহিত দেখা করিলেন। তিনি পুস্তকে পড়িয়াছিলেন কাপ্তেন সাহেবেরা বেশ ভদ্রলোক, কিন্তু কাজে যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ানক মাতাল একটা লোক সকলকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। যাহা হউক ইহারই নিকটে কোন একস্থানে গার্‌ফীলড্‌ একটুকু আশ্রয় পাইলেন। একজন ভদ্রকাপ্তেন দয়া করিয়া তাঁহাকে চাকরী দিলেন। এইখানে কিছুকাল থাকিয়া গার্‌ফীলডের সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা চলিয়া গেল। শরীরের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া তাহার ফল পাইতে পাইতে তিনি বাড়ী আসিলেন। যদিও কম্পজ্বরে ভুগিতে ছিলেন, তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লভাবেই তিনি বাটী আসিলেন, এবং মা কি করিতেছেন দেখিবার জন্য চুপি চুপি জানালা দিয়া তাকাইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, তিনি সেই আলোতে দেখিতে পাইলেন ঘরের এককোণে তাঁহার মা হাটুপাতিয়া বসিয়াছেন, সম্মুখে চেয়ারে একখানি পুস্তক খোলা। মা কি পড়িতেছেন? গার্‌ফীলড কাণ পাতিয়া এই কথা শুনিলেন--(তাহাতে তাঁহার মনে কি রূপ ভাব হইল, আমরা বলিতে পারিনা, পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিয়া লইবেন)—তিনি শুনিলেন;—"হে জগদীশ্বর, আমায় দেখা দাও, আমাকে দয়া কর। তোমার দাসীর মনে বল দাও, এবং তোমার দাসীর পুত্রকে রক্ষা কর।" ধন্য মা! ধন্য মা! আমরা আর কি বলিব? ঈশ্বর হাতে হাতে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাঁহার ভালবাসার ধন ঘরে গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল,—আহ্লাদে মায়ের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

এই খানেই তাঁহার বাল্য জীবন একরূপ শেষ হইল। তাহার পর তিনি কেমন করিয়া নিজের চেষ্টায় টাকা উপার্জ্জন করিয়া ভালরূপ লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন, স্কুল হইতে কালেজে, কালেজ হইতে সংসারে, কেমন করিয়া তিনি নিজের সদ্গুণের দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার দেশীয় মহাসভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, কেমন করিয়া হতভাগ্য কাফ্রীদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য যুদ্ধ করিলেন, কেমন করিয়া সকলের মনের সম্মতিতে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইলেন, সামান্য কাঠের ঘর ছাড়িয়া রাজবাড়ীতে আসিলেন, এ সকল বিশেষ করিয়া বলিবার স্থান আমাদের নাই।

একজন পাগলের বন্দুকের গুলিতে অবশেষে গার্‌ফীলডের প্রাণ গেল। যখন তিনি বাঁচিবেন কি মরিবেন তাহার স্থিরতা ছিল না, তখন একজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন 'গার্‌ফীলড্‌ মরিয়া গেলে আমেরিকার ঘরে ঘরে ক্রন্দন উঠিবে।" আজ তাহাই হইয়াছে--এমন লোক আমেরিকাতে নাই, যে না আজ এই মহাত্মার মৃত্যুতে দুঃখ করিতেছে। এইরূপ জীবনই ধন্য! ধন্য গার্‌ফীলড্‌! ধন্য আমেরিকা।

রেলের গাড়ী।

বাল্যকালে আমার বিশ্বাস ছিল যে বাড়ীতে বা স্কুলে যেরূপ রেল থাকে, সেই রূপ রেলের উপর দিয়াই গাড়ী যায়, কিন্তু যখন সত্য সত্যই রেলের গাড়ী দেখিলাম, তখন জানিলাম সেরূপ নহে। মাটীর উপরে লোহার রেল শক্ত করিয়া বসান, তাহার উপর দিয়া গাড়ী যায়। দেখিয়া আগের ভুল চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তখনও একটা বিশ্বাস মনে রহিল—তাহা এই যে, যেখানে রেলের গাড়ী যাইবে, সেখানকার সমস্ত জিনিশ ভয়ানক দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে; পল্লীগ্রামের সমস্ত ভাল ভাল খাবারি জিনিশগুলি কলিকাতায় বা অন্যান্য বড় সহরে আসিয়া পড়িবে—আর গরিব পাড়াগেঁয়ে লোকেরা হাত তুলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবে!!!

বোধ হয় এই বিশ্বাস অনেকেরই আছে, এবং এই জন্য এমন কেহ কেহ ও বোধ হয় আছেন যাঁহারা মনের সহিত ভাবেন "কি কুক্ষণেই রেলের গাড়ী আমাদের দেশে আসিয়াছিল!" কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এটীকে প্রথমে যত অসুবিধা বোধ হয়, বাস্তবিক ইহাতে তত অসুবিধা নাই। রেলের গাড়ীতে কত সুবিধা ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, এ সামান্য অসুবিধা কিছুই নহে। প্রথমতঃ যখন রেলের গাড়ী দেশে ছিল না, তখন যাতায়াতের কত কষ্ট ছিল, ভাবিয়া দেখ। দূরদেশে যাইতে হইলে বাড়ীতে সকলের নিকট বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে [illegible] পাছে আর ফিরিয়া আসিতে না হয়; রাস্তা ঘাট নানারূপ ভয়ে পূর্ণ ছিল; [illegible] কেন করিয়া বাহির হইতে হইত। আর যখন রেলের গাড়ী হইল, তখন এই রূপ ভাবনা [illegible]

লোকে অনায়াসে নির্ভয়ে দেশে বিদেশে যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ—তোমরা বোধ হয় জান বাণিজ্য অর্থাৎ কারবারের যত উন্নতি হয়, ততই দেশের উপকার হয়। রেলের গাড়ীর সৃষ্টি হওয়াতে যে এই দিকে ভয়ানক উঃতি হইয়াছে, তাহার কি আর সন্দেহ আছে? কারবারের সৃষ্টি কেমন করিয়া হয় জান? মনে কর, পাটনায় খুব ভাল ডাল হয়, কিন্তু এত বেশী হয় যে সেখানকার সমস্ত লোকের কুলাইয়া গিয়াও অতিরিক্ত থাকে; এ দিকে আমাদের দেশে এত চাল হয় যে আমাদের প্রয়োজনের ও বেশী থাকে; অথচ আমাদিগের ডালের প্রয়োজন এবং পাটনার লোকদিগের চালের প্রয়োজন, তাহা হইলে পাটনার লোকে আমদিগের চাল লইবে, এবং আমরা পাটনার ডাল আনিব। এখন, মনে কর পাটনা ও আমাদিগের দেশের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা নাই; তাহা হইলে এদেশ হইতে ও দেশে দ্রব্যজাত লইতে যে খরচ হইবে, তাহাতেই দ্রব্য গুলি ভয়ানক দুর্ম্মূল্য হইবে। যে পরিমাণে যাতায়াতের সুবিধা, সেই পরিমাণেই কারবার ভাল চলিবে। রেলের গাড়ী হওয়াতে এই যাতায়াতের সুবিধা কত বাড়িয়াছে, তাহা সকলেই জানেন; আজ যে আমরা কলিকাতায় বসিয়া অনায়াসে বৈদ্যবাটীর তরকারি, পদ্মার মাছ, এবং অন্যান্য স্থানের অন্যান্য ভাল জিনিশ আহার করিতে পাইতেছি, ইহা কি রেলের গাড়ীর প্রসাদে নয়?

তৃতীয়তঃ—সহরে বা বড় বড় নগরে লেখাপড়া এবং জ্ঞানের চর্চ্চা সর্ব্ব প্রথমে হয়, তাহা বোধ হয় জান। এখন, যদি সহর হইতে এই [illegible] চর্চ্চা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা [illegible] তাহা হইলে সহরেরই গুটী কয়েক [illegible]চক্ষণ বুদ্ধিমান থাকিতেন, পল্লীগ্রামের লোক যে মূর্খ, যে অল্পবুদ্ধি, তাহাই থাকিত। কিন্তু রেলের গাড়ীর সৃষ্টি হইয়া যাতায়াতের সুবিধা বাড়িয়াছে; দেশ বিদেশ হইতে অনেক লোক সহরে বা বড় বড় নগরে আসিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া যাইতেছেন; তাঁহাদের সহিত মিশিয়া, আলাপ করিয়া পল্লীগ্রামের লোকে অনেক নূতন কথা শিখিতেছে; আবার সহর হইতেও অনেক সুশিক্ষিত লোক নানা স্থানে গিয়া নানা রূপ উপদেশ দিয়া সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে পারেন। কেবল যে লোকের মুখের দ্বারাই এই শিক্ষা হয়, তাহা নহে। আজকাল দেশে নানা রূপ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে; রেলের গাড়ীর সাহায্যে সেই সকল পত্র দেশময় নানা রূপ নূতন সংবাদ ছড়াইয়া দিতেছে। আজ কলিকাতায় লাট সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রীরা যে আইন করিবার পরামর্শ করিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই হিমালয় হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সে খবর পৌঁছিল; লোকে সেই আইনের সম্বন্ধে চারিদিকে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, এবং এই রূপে তাহাদের জ্ঞান বাড়িতে লাগিল।

চতুর্থতঃ—যাঁহাদের সহরে কারবার বা চাকরী করিতে হয়, রেলের গাড়ী হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে অনেক সময় সহরেই কাটাইতে হইত, বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে সহরের মহা গোলমালে ঝালাপালা হইতে হইত; কিন্তু এখন রেলের গাড়ী হইয়াছে বলিয়া অনেকেই নির্ভয় মনে সহরের ১০।১৫ ক্রোশ দূরেও থাকিতে পারেন; দরকার হইলেই কর্ম্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। ইহাতে তাঁহাদের পল্লীগ্রামের শীতল বাতাস লাভ করাও হয়, অথচ সহরের কার্য্যাদিরও কিছুই ব্যাঘাত হয় না।

রেলের গাড়ীর এতগুলি সুবিধা; ইহা ভিন্ন আরও কত সুবিধা আছে, তাহা কত লিখিব?

আর অসুবিধার মধ্যে পল্লীগ্রামের দুধ, ঘির মূল্য বাড়িয়া যায়, তাহা সত্য; কিন্তু অন্যপক্ষে আবার সহরের জিনিষ পল্লীগ্রামে সহজে আমদানি হইয়া, তাহার মূল্য কমিয়া যায়। কাগজ, কলম, ছুরি, কাঁচি, প্রভৃতি পূর্ব্বে যে মূল্যে পাওয়া যাইত, রেলের গাড়ী দেশ বিদেশে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া, তাহার মূল্য অনেক স্থানে কমাইয়া ফেলিয়াছে। আরও যত রেলওয়ে হইবে, তত আরও সুবিধা বাড়িবে। তবে কত সুবিধা হইল দেখ।

রেলের গাড়ী আমাদিগের দেশের জিনিষ নহে। আমরা পূর্ব্বকালের নানা রূপ রথের কথা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু রেলের গাড়ী আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের জানা ছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ। জলের বাষ্প দেখিয়া জেম্‌শ ওয়াট নামক কোন সাহেব স্থির করেন যে বাষ্পের জোর আছে, একথা আমরা গতবারে পাঠক ও পাঠিকাদিগকে জানাইয়াছি। তিনি বাল্যকাল হইতেই নানা রূপ 'কারীকুরী' কাজে পটু ছিলেন; সম্প্রতি বাষ্পের এই গুণ আছে জানিতে পারিয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা পাইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই মোটামুটি রকমের একখানি 'এঞ্জিন' অর্থাৎ বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহাতে ভাল রূপ কাজ চলিত না। অবশেষে মহাত্মা জর্জ ষ্টিফেন্‌শন (৪৯শ পৃষ্ঠা দেখ) অনেক বুদ্ধি করিয়া বাষ্পীয় শকটের এরূপ উন্নতি করেন, যাহাতে সমস্ত বাষ্পের জোরে শকট চলিতে লাগিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় ৫২ বৎসর পূর্ব্বে লিভারপুল এবং মাঞ্চেষ্টার নামক ইংলণ্ডের পশ্চিমদিকের দুটী নগরের মধ্যে লোকজনের যাতায়াতের জন্য প্রথম রেলের গাড়ী খোলা হয়। সেই অবধি পৃথিবীর সমুদায় স্থানেই রেলের গাড়ী জালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের দেশে আজ প্রায় ৩১।৩২ বৎসর হইল রেলের গাড়ী স্থাপিত হইয়াছে। * এখনও অনেক স্থানে রেলের গাড়ীর পথ প্রস্তুত হইতেছে। ছবিতে দেখ কেমন ধূঁয়া উড়াইয়া গাড়ী আসিতেছে! এক পাশে প্রকাণ্ড একটী থামের দুপাশে দুখণ্ড কাষ্ঠ লাগান রহিয়াছে দেখিতেছ? উহা গাড়ীর চিহ্ন বিশেষ। রাস্তায় বিপদাপদের সম্ভাবনা না থাকিলে আগে সংবাদ লইয়া, যে দিকে গাড়ী যাইবে সেই দিককার কাষ্ঠ খণ্ডটী নীচেকার শিকলির দ্বারা টানিয়া ফেলিয়া দেয়; যে গাড়ী চালায় সে তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারে, পথ পরিষ্কার—তখন সে স্বচ্ছন্দ মনে গাড়ী ছাড়িয়া দিতে পারে। রেলের পাশে পাশে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যুতের তার বসান থাকে। ইহার দ্বারা কোন্ সময় কোন্ গাড়ী কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে, সমুদায় স্থানে তাহার খবরাখবর যায়; এরূপ না হইলে কার্য্যের বড় অসুবিধা হয়—দুখানি গাড়ী হয়ত পরস্পরের মুখে মুখে লাগিয়া ভয়ানক ক্ষতি হইল, কত লোকজন মারা গেল। আর পূর্ব্বে যদি সকল বিষয় ঠিক জানা থাকে, তাহা হইলে কোন গোলই হইতে পারে না।

যতই মানুষের সভ্যতা এবং জ্ঞান বাড়িতেছে, ততই আমাদের সুখ ও সুবিধার জন্য নিত্য নূতন নূতন যন্ত্র সকল বাহির হইতেছে। এই উন্নতি এবং জ্ঞানের যে কোথায় শেষ হইবে, কে বলিতে পারে?

"শীঘ্রগতি চল চল পরে লও সাজ,
কলিতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ,
কর ত্বরা! পড়ে থাক্ ছড়ি, ঘড়ি, তাজ!
দুয়ারে পুষ্পকরথ বেঁধেছে ইংরাজ।"

---

* এই সময় লর্ড ডালহৌসী আমাদিগের [illegible] শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ বড় লাট সাহেব ছিলেন [illegible]

ভীমের কপাল।

৫ম অধ্যায়।

দীনদয়াল বাবুর ভাইবোন অনেক গুলি ছিল: কিন্তু তাঁহারা এখন ভাই বোনে দুজন মাত্র বাঁচিয়া আছেন; সুতরাং বাপ মা তাঁহাদিগকে বড়ই স্নেহ করেন। দীনদয়াল এবং তরলা যাহা কিছু করিবে, অন্যায় না হইলে, কর্ত্তার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। গৃহিনী বড় কোমলস্বভাবা ছিলেন। এইরূপ বাপ মায়ের সন্তান বলিয়াই দীনদয়াল দয়াতে পূর্ণ এবং তরলা করুণার ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহাদের ধন সম্পত্তি তত অধিক না থাকিলেও তাঁহারা এরূপ মিতব্যয়ী ছিলেন, যে সংসারের খরচ নির্ব্বাহ হইয়া দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচনের জন্যও যথেষ্ট অর্থ থাকিত। দীনদয়াল বাড়িতে আসিলেই এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় কে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া বেড়াইতেন, এবং যদি দেখিতেন কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন, অমনি তাহাকে লইয়া বাড়ীতে আসিতেন। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া তরলা এসকল বিষয়ে দাদার সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহারা দু ভাইবোনে গরিব দুঃখীদের জন্য যে কত কাঁদিয়াছেন তাহার সীমা নাই। দাদা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুঃখী, রোগী সংগ্রহ করিতেন, বোন তাহাদের রীতিমত সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ফলতঃ দীনদয়াল বাবু বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর দশা কিরূপ হইত তাহা নিম্নলিখিত গল্পটী হইতে বুঝা যাইতে পারে;—এক দিন চাকরেরা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গৃহিনীর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল "মা, আমাদের মাইনে হিসেব করে দিন, আমরা আর থাকবো না।" গৃহিনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন বাপু কি হয়েছে?" চাকরেরা বলিল "আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের চাকরী ক'রে দুটো করে খাব বলে এসেছি—কিন্তু ছোট বাবুর জ্বালায় আর তরু দিদির উৎপাতে রোজ এক দল ছোটলোকের খান্‌শামাগিরি করতে হয়, তা আমরা পারি না. এতে আমাদের মানের হানি হয়।" গৃহিনী মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া, জলখাবারের জন্য সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিলেন।

সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ী দয়ার মন্দির বলিলেও হয়। এই দয়ার মন্দিরে দীনদয়াল ভীমেন্দ্রকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। চাকরেরা দেখিবামাত্র পরস্পরকে টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল "যা বলিছি, ঐ আর একটা উৎপাত যুটিয়ে এনেছেন।" দীনদয়াল বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই ছুটিয়া মাতার নিকট গেলেন এবং কি অবস্থায় ভীমেন্দ্রকে পাইয়াছেন, তাহা বলিয়া তরুকে তাঁহার সাহায্যের জন্য ডাকিলেন। তরু তখন স্নানের পর চুল শুকাইয়া চুল বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিল, দাদার কথা শুনিয়া কেশবিন্যাস রাখিয়া ছুটিয়া গেল। তাহারা দুজনে মিলিয়া ভীমেন্দ্রকে একটা বিছানায় শোওয়াইয়া খানিকটা পুষ্টিকর ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই উপযুক্তরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইল। ভীমেন্দ্রকে দীনদয়াল পরিতোষমত আহার করাইলেন;—ভীমেন্দ্র সুস্থ হইল। প্রায় ৭ দিন ভীমেন্দ্র মিত্রদের বাড়ী রহিল।

উদ্ধত গোঁয়ার লোকের স্বভাবই এই, তাহারা কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতে পারে না, এবং অনেক কাল অপরিচিত কাহারও আশ্রয়ে (বিশেষ আবশ্যক হইলেও) থাকিতে ভালবাসে না। ভীমেন্দ্র দেখিল দীনদয়ালদের বাড়ীর সকলেই তাহাকে নিজের বাড়ীর ছেলের মত দেখেন; দীনদয়াল, তরলা যখন যাহা প্রয়োজন সাধ্যমত তাহা যোগাড় করিয়া দেন, তথাপি ভীমেন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল; সেখানে আর অধিক কাল থাকিতে ইচ্ছা

হইল না। এক দিন বিকালে বেড়াইবার নাম করিয়া ভীমেন্দ্র নদীর ধারে গেল, এক জন মাঝির সহিত কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিল। ভীমেন্দ্র কি মূর্খ! মাঝির নাম জিজ্ঞাসা করিল না। মিত্রদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিল না; অবশেষে যখন রাত্রি এক প্রহর, তখন ভীমেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল।

ভীমেন্দ্র! কি করিলে? যাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় বাঁচিয়া গেলে, যাইবার সময় তাঁহাদিগকে দুটো মিষ্ট কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না? এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা? আর যাইবার সময় সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নামও লইলে না? ধন্য তোমার বুদ্ধির গতি!

অন্ধকার রাত্রিতে ভীমেন্দ্র কোন মতে পথ চিনিয়া গেল, এবং শীঘ্রই নৌকায় উঠিল। মাঝিরা জাগিয়াছিল, ভীমেন্দ্র উঠিবা মাত্র নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি নৌকা চলিল। একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্ত রাত্রির মধ্যে কখনও বিপরীত স্রোত হয় নাই। পরদিন প্রাতে যখন দীনদয়ালদিগের বাড়ীতে ভীমেন্দ্র কোথায় গেল খোঁজ আরম্ভ হইল, এবং স্নেহময়ী তরু ছল ছল চক্ষে বসিয়া পড়িল, তখন ভীমেন্দ্র একটা প্রকাণ্ড নদীর উপরে নৌকার মধ্যে। দীনদয়ালদিগের বাড়ীতে শীতে কষ্ট পাইতে হইত না, কিন্তু নৌকায় ভীমেন্দ্র ভয়ানক কষ্ট পাইল। প্রাতে সূর্য্য ভালরূপ উদয় হইলে ভীমেন্দ্র নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইল; কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল গত কল্য যে নৌকা ভাড়া করিয়াছিল এবং যে মাঝির সহিত কথা বলিয়াছিল এ সে নৌকা নহে, এবং এ নৌকায় সে মাঝি নাই। মাঝিরাও আশ্চর্য্য হইয়া টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল "এ কোন্ বাবুরে!"—কিন্তু চেঁচাচেঁচি করিল না। ভীমেন্দ্রের কিছু আশঙ্কা হইল, কিন্তু কিছুই বলিল না। নৌকা চলিতে লাগিল। রাত্রি শেষে একটা ছোট নগরের নিকটে নৌকা থামিল। মাঝিরা অপরাহ্নে রন্ধন ও আহারাদি করিয়া লইয়াছিল—কিন্তু ভীমেন্দ্রের যে কি হইবে তাহা তারাও জিজ্ঞাসা করে নাই, ভীমেন্দ্রও তাহা ভাবে নাই। নৌকা থামিলে মাঝিরা বলিল "বাবু নামুন।" ভীমেন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া নামিল। মাঝিরাও টাকা চাহিল না, ভীমেন্দ্রও দিল না; সেই নগর মধ্যে ভীমেন্দ্র প্রবিষ্ট হইল। ক্রমশঃ—

কেন্দ্রীয় ঊষা।

গদীশ্বর এই পৃথিবীর কত স্থানে যে কতরূপ সুন্দর দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়া মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দতা বাড়াইতেছেন তাহার সীমা নাই; কেন্দ্রীয় ঊষা নামক দ্রব্যটী এই সকল আশ্চর্য্য সৃষ্টির মধ্যে একটী।

পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে যদি চারিদিকে ঘুরাইয়া একটী রেখা টানা যায়, তাহা হইলে সেই রেখাকে বিষুব রেখা বলে। এই বিষুব রেখার দুপাশে খানিক দূরে যে সকল দেশ, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গরম। এই সকল দেশ হইতে যতই উত্তরে এবং দক্ষিণে যাওয়া যায় ততই শীত বেশী পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ সীমা ভয়ানক শীতে চির কাল বরফ-ঢাকা হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের একটী নিয়ম এই যে তথায় দিন ছোট, রাত বড় হইয়া যায়; যে দেশে শীত যে পরিমাণে বেশী, সেই দেশে দিন যত ছোট এবং রাত তত বড়। এই হিসাবে ধরিয়া গেলে পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটে যে সকল দেশ, সেখানে কি হইতে পারে ভাবিয়া দেখ। আমরা [illegible] সেই দেশে ছমাস দিন এবং ছমাস রাত্রি [illegible] কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে [illegible]
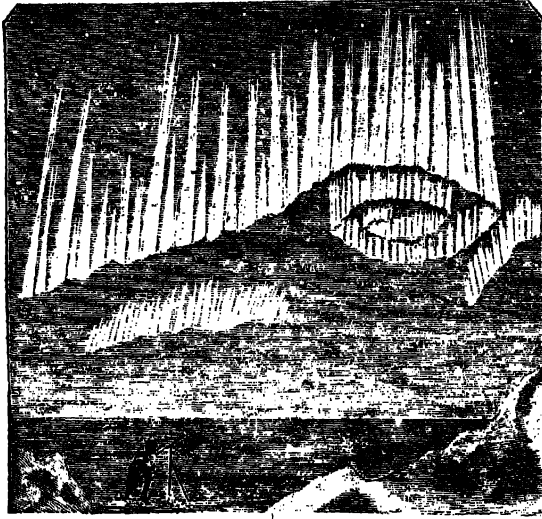
লোক রাত্রির ছমাস কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাইয়া কাটায়? না, তাহা কেন? তাহারা আমাদেরই মত ৬।৭ ঘণ্টা ঘুমায়, এবং অন্য সময় আমাদেরই মত সংসারের কাজ কর্ম্ম করে। কিন্তু অন্ধকারের সময় কাজ কর্ম্মের কত অসুবিধা ভাবিয়া দেখ। এই জন্য দয়াময় জগদীশ্বর কেন্দ্রীয় উষা নামক এক রূপ আলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা অদ্য তাহা রই একটী চিত্র প্রদান করিলাম। সকল স্থলের কেন্দ্রীয় উষা দেখিতে একরূপ হয় না, কিন্তু কার্য্য সকল গুলিরই একরূপ। অন্ধকারের সময় আকাশে উঠিয়া উত্তম আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল করিয়া কেন্দ্রীয় উষা সেই দেশের লোকদিগের লম্বা রাত্রির কষ্ট দূর করিয়া দেয় যদিও সূর্য্যের আলোকের মত উষার আলোক তত পরিষ্কার নহে, তথাপি এই আলোকে লোকের অনেক অসুবিধা দূর হয়। ভোর বেলা আমাদের যেরূপ অস্পষ্ট আলো হয়, কেন্দ্রের এই আলোকমালারও সেই রূপ আলো, বোধ হয় ইহার নাম কেন্দ্রীয় উষা। ী কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে জানা যায় নাই, এবং যাহা জানা গিয়াছে তাহা লিখিলেও অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকাদিগের বুঝিতে একটু শক্ত হইবে সুতরাং সে বিষয়ে বলিবার প্রয়োজন নাই।

জগদীশ্বর এইরূপ অনেক স্থানে অনেকরূপ সুন্দর সুন্দর দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিলে অথবা তাহার বিষয় শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, এবং পরমেশ্বরকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

একটী আশার কথা।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমাদিগের পাঠকগণকে জানাইতেছি, যে আমাদিগের মফস্বলের কোন পাঠক গতবারের ধূমপান বিষয়ক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া, তামাক খাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি এসম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল; নাম প্রকাশ লজ্জার কারণ হইতে পারে বলিয়া, প্রকাশ করা গেল না।

"মহাশয়!

আমি পূর্ব্ব হইতে তামাক খাইতাম; কিন্তু 'সখার' একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অদ্য হইতে তামাক খাওয়া চির-

দিনের মত পরিত্যাগ করিলাম। ইতি, তারিখ ৮ই চৈত্র, ১২৮৯ সাল।"

শ্রী————

'সখা'র পাঠক মাত্রেরই শুনিয়া আহ্লাদ হইবে যে বালকদিগের মধ্যে যাহাতে ধূমপান প্রচলিত না হয়, তাহার জন্য এখানকার কোন কোন বন্ধু একটী সভা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। যদি সভাটী বাস্তবিক স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।
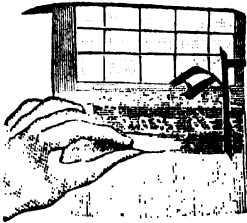
পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

আমরা এবার এত স্থান হইতে এতগুলি পত্র পাইয়াছি যে সমস্ত গুলির প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত আমরা করিতে পারিতেছি না। ধাঁধার উত্তর যাঁহারা ঠিক দিতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই নাম যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার, হেয়ার স্কুল।—

প্রথমবারে বালকবালিকাদিগের আলোচনার জন্য খানিকটা স্থান রাখিবার কথা ছিল, কিন্তু অদ্যাবধি কেহই কোন বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন নাই কাজেকাজেই সে বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই। কি বিষয়ে আলোচনা চলিবে, তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া সম্পাদকের কার্য্য নহে।

বালিকা সমিতির সভ্যাগণ, বেথুন স্কুল।

ধাঁধার উত্তরগুলি সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কিন্তু এক সঙ্গে না মিলিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে উত্তর বাহির করিলেই ভাল হইত।

শ্রীকালিদাস রায় চৌধুরী, মাধবকাটী।

হেয়ালীটী অত্যন্ত দীর্ঘ,—বিশেষতঃ তাহার কি উত্তর হইবে, লিখেন নাই।

শ্রীতুলসীচরণ দে, শ্রীঅমৃতধন মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী।—যে হেয়ালী গুলি পাঠাইয়াছেন, তাহার উত্তরও সেই সঙ্গে পাঠান উচিত ছিল।

শ্রীচুনিলাল ঘোষ, কৈথালি।—হেয়ালী গুলির উত্তর পাঠান নাই।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী।—হেয়ালী গুলি প্রকাশ করা যাইবে কিনা, আমরা সে বিষয়ে বিবেচনা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু, ধূলজুরি।—আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। সখার লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই সুপরিচিত নহেন, কাজেই নাম প্রকাশ করা হয় নাই; যাহা হউক, যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, সখার আগামী কোন সংখ্যায় তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া।—আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। রচনাটী আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ পাল, বরাহনগর।—ভাল হয় নাই।

শ্রীধ, গ, ও শ্রীক, চ, কলিকাতা।—বেশ হইয়াছে, কিন্তু কিছু শক্ত বলিয়া প্রকাশিত হইল না।

শ্রীবনবিহারী বন্দোপাধ্যায়, ফরিদপুর।—মন্দ হয় নাই, আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল। কেবল পদ্য না লিখিয়া যাহাতে বুদ্ধিব্যয় করিতে হয়, এরূপ বিষয়েও লিখিবেন। সাধারণতঃ বিজ্ঞান, জীবন চরিত, ইতিহাস বা এইরূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিলেই ভাল হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ পাল, পিরোজপুর। 'সখা'র মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৹ মাত্র। এইরূপ অল্প মূল্যে সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন; বিশেষতঃ পত্রিকার যে ব্যয় তাহাতে ইহা অপেক্ষা কম মূল্যে দিতে গেলে কাজ চলেনা, এই জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি—সিকিমূল্য, অর্দ্ধমূল্য বা তিন চতুর্থাংশ মূল্যে কাহাকেও পত্রিকা দিব না।

শ্রীপ্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতি—বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী। আপনাদের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর সব ঠিক হয় নাই।

শ্রীকরুণানিধান সিংহ, ভান্ডাড়া। মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ছন্দ পতন হইয়াছে; যাহা হউক আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল।

শ্রীনিঃ, সিলং; "উকিলের পরামর্শ," কলিকাতা; স্থানাভাব।

———

ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। জি-লি-পি; ছা-না-ভা-জা। ২। 'ক' এই অক্ষরটী। ৩। পারাবতগণ। ৪। দীর্ঘসূত্রতা; ঈশ্বরপরায়ণতা। ৫। 'সন্তান' এই কথাটী হইতে 'তান্' ছাড়িয়া দিলে সন্ থাকে, তাহার নিকটে 'দেশ' এইটী বসাইলে 'সন্দেশ' হয়। ৬। কলম।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে উপরের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর পাওয়া গিয়াছে;—বালিকা সমিতি, বেথুন স্কুল; শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য, পারসীর বাগান, কলিকাতা শ্রীছমিরদ্দীন আহম্মদ, কলিকাতা মাদ্রাসা; শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া; শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোপালপুর; শ্রীসতীনাথ বসু, বাগেরহাট; শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা; শ্রীমুক্তিদারঞ্জন রায়, কিশোরগঞ্জ।

নূতন।

১। আমার প্রসাদে কেহ ধনরত্ন পায়,
কৃপায় আমার কারো তৃষ্ণা দূরে যায়;
তিনটী অক্ষর মম সুন্দর শরীরে,
প্রথম ছাড়িলে সবে ঘৃণা করে মোরে।
দ্বিতীয় ছাড়িলে পরে বালক উল্লাসে,
ছাড়িলে তৃতীয় বর্ণে ন্যূনতা প্রকাশে।
কালেতে সুলভ আমি অকালেতে নই,
বলতো সুবোধ শিশু আমি কেবা হই।

২ একি দেখি সর্ব্বনাশ! ডাকাতে ঘিরিল বাড়ী
ঘেরা হ'তে ঘর পালালো, গৃহীর গলায় দড়ি!
বলতো কেমন করে?

৩। আমি যদি না থাকি, তা' হ'লে রক্ষা থাকে না; কিন্তু তবুও মানুষ আমাকে দুচোখে দেখ্‌তে পারে না। আমার প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর এক সঙ্গে লইলে থাকবার যায়গা হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর এক সঙ্গে লইলে খেলাবার জিনিশ বলতো আমি কে?

৪। [illegible]ী ছেলের বাপ আমার সমস্তটা; তিনি এক স্থান হইতে আসিয়া আমার প্রথম ও [illegible]গিলেন, রাখাল তাঁহার হুকুম না মানিয়া তাহার ভগ্নীর প্রথম ও তৃতীয় লইয়া খেলা করিতেছে; তিনি রাগিয়া রাখালকে আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় মারিলেন।

৫। গ্রীষ্মকালে পথ হাটিয়া যে মানুষ বাড়ীতে আসে তাহাকে পাখী বলা যায় কি না? পাখীতে তাহাতে তফাত কি?

সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। ডাকের নোট, মণি অর্ডার, বা অর্দ্ধ আনার টিকিটে মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালক বালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সম্বাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি, সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, তাহার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

[illegible]হ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। মে ১৮৮৩, বৈশাখ ১২৯০। ৫ম সংখ্যা।

ভীমের কপাল।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় কিছু আ-শ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তাইতো, কেমন হ'লো? টাকা না নিয়েই চলে গেল! ব্যাপারটা কি?"। সুতরাং অধিক বিলম্ব না করিয়া এই খানেই বলিয়া রাখি ব্যাপারটা কি? যে নৌকা ভীমেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, তাহার মাঝিরা প্রথমতঃ স্বীকৃত ছিল বটে, কিন্তু ভীমেন্দ্র চলিয়া গেলে„ তাহারা পরামর্শ করিল যে ওরূপ ছেলেমানুষকে লইয়া যাওয়া উচিত নয়, এই স্থির করিয়া তাহারা নৌকা খুলিয়া পরপারে গিয়া বাঁধিয়া থাকিল। এদিকে আর একখানি নৌকা সেই ঘাটে আসিয়া বাঁধিয়াছিল, এ নৌকা বগুড়ার পুলীশের দারগা বাবুর। গঙ্গাধর বাবু কোন সরকারী কাজে সুজনখালীর নিকটে আসিয়াছিলেন; রাত্রিতেই তাঁহার ফিরিয়া যাইবার কথা;—তিনি পুলীশের লোক, চোর ডাকাত ধরিবার জন্য সর্ব্বদা সাবধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মাঝিরা তাঁহার অনুমতি পাইয়াছিল, "আমি নৌকায় উঠিলেই নৌকা খুলিয়া দিবে, কোনও কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নাই—তাহা না হইলে কাজ উদ্ধার করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে;" আবার যখন ভীমেন্দ্র নৌকায় উঠিয়াছিল, বাবুটীরও সেই সময় আসিবার কথা ছিল; সুতরাং ভীমেন্দ্র নৌকায় উঠিবা মাত্রই মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। [illegible] বলিয়াছি ভীমেন্দ্র শীতে কষ্ট পাইয়াছিল, [illegible]ী মেন্দ্রের দোষ;—নৌকায় বেশ বিছানা [illegible] ভীমেন্দ্রের তাহা ব্যবহার করিতে [illegible] অর্দ্ধেক পথে গিয়া যখন মাঝিরা দেখিল ভীমেন্দ্র তাহাদের বাবু নহে, তখন তাহারা ভাবিল "এখন যদি ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে দারগা বাবু বিরক্ত হইবেন, যদি বগুড়া পর্য্যন্ত যাই, তাহা হইলেও বিরক্ত হইবেন,—তবে একবার বগুড়ায় ঘরে যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া তাহারা ভীমেন্দ্রকে লইয়া আসিয়াছিল। ভীমেন্দ্রকে নামাইয়া দিয়া মাঝিরা কিছুকাল বিশ্রাম করিল এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি ঘর হইতে লইয়া পরে দারগা বাবুকে কি বলিবে ভাবিতে ভাবিতে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

ভীমেন্দ্র নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। করতোয়া নদীর তীরে বগুড়া নগর অবস্থিত। স্থানে স্থানে নদীর ধারের শোভা অতি মনোহর—বিশেষতঃ যাহারা নূতন আসিয়াছে তাহাদের পক্ষে। ভীমেন্দ্র এ শোভা দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। সেই আত্মীয় স্বজন শূন্য স্থানে ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় মলিন মুখে একাকী বেড়াইতে লাগিল। প্রাতঃকালে অনেক বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই ভীমেন্দ্রকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, ভীমেন্দ্রও কাহাকে কোন কথা বলিল না। এক জন ১৫ বৎসরের বালক কতক্ষণ এইরূপে বেড়াইতে পারে? পরিশ্রান্ত হইয়া ভীমেন্দ্র একটা ঝাউগাছের তলে বসিয়া পড়িল। বাতাসের সহিত মাথা নাড়িয়া ঝাউগাছগুলি হুঁ হুঁ করিয়া যেন ভীমেন্দ্রের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। ভীমেন্দ্র সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল। এই সময়ে মুন্‌সেফ আদালতের উকিল হরিপদ বাবু এই রাস্তায় যাইতেছিলেন, তিনি দেখিলেন একটী শীর্ণকায় বালক পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই নগরের মধ্যে হরিপদ বাবু ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। যাঁহারা হরিপদ বাবুকে চিনিতেন না, তাঁহার অনেক সময় তাঁহাকে গালাগালি দিতেন, কিন্তু তাঁহাকে যাঁহারা চিনিতেন, তাঁহারা সকলেই

শ্রদ্ধা করিতেন। হরিপদ বাবু অধিক লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান বলিয়া জানিত। উকিল হইলেই প্রবঞ্চক হইতে হয় যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা শুনিলে কি মনে করিবেন জানি না, হরিপদ বাবু অসত্যের, প্রবঞ্চনার ছায়াতেও থাকিতেন না, যে মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া হরিপদ বাবুর বিশ্বাস হইত, যথেষ্ট অর্থের আশা থাকিলেও তাহাতে তিনি হাত দিতেন না। হরিপদ বাবুর আর একটী অসাধারণ গুণ এই ছিল যে তিনি সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধা করিতেন, কখনও কোনও ধর্ম্মকে পরিহাস করিতেন না, এই জন্যই হরিপদ বাবু ব্রাহ্ম হইয়াও সকলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। হরিপদ বাবু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন "ওহে, তুমি কে এখানে ঘুমুচ্ছো?" ভীমেন্দ্র জাগিয়া উঠিয়া বসিল। হরিপদ বাবু পুনশ্চ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভীমেন্দ্র বলিল "আমি কে, কোথায় আছি, তা কিছুই জানি না।" এইরূপ উত্তরে হরিপদ বাবু কিছু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন "তুমি কে তাও জান না, কোথায় এসেছ তাও জান না? ভাল, এখানে এলে কি করে?"

ভীমেন্দ্র বলিল, "তাও জানি না।"—ভীমেন্দ্র এইরূপে কথার উত্তর দিতেছে কেন বোধ হয় পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন। দুটী কারণে ভীমেন্দ্র এইরূপ করিতেছে, প্রথম কারণ কিরূপে নিজের পরিচয় দিলে বাবুটী চিনিতে পারিবেন তাহা, ভীমেন্দ্র ভাবিয়া পাইতেছিল না, কোন্ স্থানে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ভীমেন্দ্র বাস্তবিকই তাহা জানিত না; তাহার পর এই স্থানে আসিবার ব্যাপার এত আশ্চর্য্য যে যদিও পাঠক পাঠিকা কি ঘটনা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, ভীমেন্দ্র এখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই; দ্বিতীয় কারণ ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় মৃতপ্রায় হইয়াছে, এখন সবিশেষ বলিতে কোনরূপ ইচ্ছা নাই। হরিপদ বাবু বালকের চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন বালকটী কোন বিপদে পড়িয়াছে; তখন তিনি স্নেহের সহিত তাহার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন "আমার বাড়ীতে এস; কিছুকাল বিশ্রাম করিলে, তাহার পর সকল কথা শুনিব।" ভীমেন্দ্র কলের পুতুলের ন্যায় উঠিল এবং ভাবিতে ভাবিতে, হরিপদ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বাড়ীর কর্ত্তা ধার্ম্মিক হইলে বাড়ীর কেহই যে অসৎ থাকিতে পারে না, হরিপদ বাবুর বাড়ী তাহার এক প্রমাণ। ভীমেন্দ্র যখন হরিপদ বাবুর বাড়ীতে গেল, তখন হরিপদ বাবুর ছেলে মেয়েগুলি ছুটিয়া আসিল এবং 'ইনি কে, বাবা?' 'আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বেন কি?' ইত্যাদি কথা বলিয়া ৫ মিনিটের মধ্যেই ভীমেন্দ্রকে আপনার লোক করিয়া তুলিল। একটী ছেলে বলিল "বাবা, এঁকে কি ব'লে ডাক্‌বো?" হরিপদ বাবু মহামুস্কিলে পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, ডাকবার বন্দোবস্ত পরে হবে, আগে ওঁর জলখাবারের বন্দোবস্ত কর দেখি, উনি বোধ হয় অনেক ক্ষণ কিছু খান নাই।" ছেলেরা যেন বিদ্যুতের মত হরিপদ বাবুর বাড়ী আলো করে ছুটিয়া গেল। মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া একটী বড় ছেলে দোকান হইতে খাবার লইয়া আসিল; একটী মেয়ে আসন ও জলের গেলাশ আনিল—যাহারা কিছুই লইয়া যাইতে পারিল না, তাহারা বড় দুঃখিত হইল, এবং এই দুঃখের কিছু উপশম করিবার জন্য আগে গিয়া খবর দিল "বাবা, খাবার আস্‌ছে!" গোঁয়ার ভীমেন্দ্র অসুখের অবস্থায় দীনদয়াল ও তরুর নিকট যে স্নেহ পাইয়াছিল, দেখিল এখানে তদপেক্ষা কম নহে, বরং অধিক।—হরিপদ বাবুর আয় তত অধিক নহে—অথচ পরিবারে লোক সাত আটটী, সুতরাং [illegible] বাবুর একটী বই দাসী নাই। [illegible] টাকা হাতে হইলে একেবারে [illegible]

জন্য জিনিশ কিনিয়া রাখিয়া দেন, তাহাতে পয়সার সুবিধা হয়।—হরিপদ বাবুর স্ত্রী নিজে রন্ধন করেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান, এবং ঘরদ্বার সজ্জিত করেন।—এই সকল কার্য্য সমস্ত দিন করিয়াও বসন্তবালা দেবীর মুখ কখনও মলিন দেখা যায় নাই —ফলতঃ আলস্য বলিয়া একটী কথ হরিপদ বাবুর বাড়ীতে শুনা যাইত না।—এইরূপ স্নেহের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ভীমেন্দ্রের গোঁয়ার প্রকৃতি যে কোথায় গেল, তাহার স্থিরতা রহিল না।—সকল ছেলেমেয়েরাই ভীমেন্দ্রকে 'দাদাবাবু' বলিয়া ডাকে, এখন ভীমেন্দ্র কাহার উপর রাগ প্রকাশ করিবে? ভীমেন্দ্র বালকবালিকাদিগকে নিজের ভাই বোনের মত ভাল বাসিতে শিখিয়াছে; ভালবাসায় তাহার মন গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে—সে মনে আর রাগের বা তেজের স্থান কোথায় হয়? পাঠক পাঠিকা, জান কি কে প্রায়ই গোঁয়ার বা একগুঁয়ে হয়? যে কাহারও জন্য ভাবে না, যে মনে করে তাহার জন্য কেহ ভাবে না, সেই কঠিন হৃদয় হইয়া উঠে। কিন্তু যখন ভাল বাসিবার লোক ভগবান যুঠাইয়া দেন, যখন আমার আপনার জনের জন্য ভাবিতে এবং তাহাদিগকে ভাল বাসিতে ভগবান শিক্ষা দেন, তখন আর গোঁয়ারের ভাব থাকেনা। ভীমেন্দ্র একথা বুঝিল।—ভীমেন্দ্র আর একটা বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল—সেই বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি বাপ মায়ের সহিত মিলিয়া প্রত্যহ ব্রহ্মসঙ্গীত গান করে, এবং ঈশ্বরের নাম করে। ভীমেন্দ্রের এতদিন বিশ্বাস ছিল, গান করাটা একটু খারাপ কাজ, সুতরাং বাপ-মায়ের সাক্ষাতে গান করা কখনই হইতে পারে [illegible]র আরও বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরের নাম [illegible] করা, এ সকল বৃদ্ধদের কাজ, ছেলে-[illegible] [illegible]রাং এখানে তাহার বিপরীত দেখিয়া কিছু অবাক্ হইল। ভীমেন্দ্র কখনও ঈশ্বরের নাম করিতে শিক্ষা করে নাই, সুতরাং হরিপদ বাবুর বাড়ীতে যখন উপাসনা হইত, তখন ভীমেন্দ্র এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, এবং ভাবিত "এ বাড়ীর ছেলে মেয়েগুলি পর্য্যন্ত যে ভাল একি এই ঈশ্বরের নাম করার গুণে? তাহা যদি হয় তবেতো ঈশ্বরোপাসনা ভাল।" ভীমেন্দ্র এইরূপ ভাবিত কিন্তু উপাসনা কি রূপে করিতে হয়, জানিত না বলিয়া কখনও উপাসনা করিত না!

এইরূপে পাঁচ ছয় দিন হরিপদ বাবুর বাড়ীতে কাটিয়া গেল। দীনদয়াল বাবুদের বাড়ী হইতে ভীমেন্দ্র দীনদয়ালকে দুঃখিত করিয়া, তরুকে কাঁদাইয়া, সকলকে ব্যস্ত করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, ভীমেন্দ্র এখান হইতে পলাইবার কোনও চেষ্টা করিল না; কিন্তু কিছুকাল পরে কলিকাতায় যাইবার জন্য অত্যন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।—এক দিন বসন্তবালাদেবী রন্ধন গৃহে আপনার কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময় ভীমেন্দ্র সেইখানে গেল। ভীমেন্দ্রকে সেইখানে দেখিয়া ছেলেগুলি দুটী একটী করিয়া সেইখানে গিয়া যুঠিল। ইহাদের ছাড়িয়া যাইবার কথা কেমন করিয়া গৃহিণীকে বলিবে ভাবিয়া ভীমেন্দ্রের চোখে জল আসিল। একটী ছোট বালিকা তাহা দেখিতে পাইয়া ছোট মুখটী কাল করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল, এবং মায়ের মুখে হাত দিয়া বলিল "ওমা! মা! দাদাবাবুল্ খিদে পেয়েছে—দাদাবাবু কাঁদ্ছে।" সরলার বিশ্বাস ক্ষুধা না পাইলে মানুষ কাঁদে না; কারণ হরিপদ বাবু কখনও বালক বালিকাদিগকে প্রহার করিতেন না। বসন্তবালা ভীমেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন চোখের কোণে জল শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া বসন্তবালা জিজ্ঞাসা করিলেন "ভীমেন্! বাবা, তুমি কাঁদ্ছো কেন?" পাঠক পাঠিকা

দিগের মধ্যে বোধ হয় সকলেই জানেন দুঃখের সময় যদি কেহ দুটো মিষ্ট কথা বলে, তাহা হইলে দুঃখটা আরও যেন অধিক বোধ হয়— আর চোখের জল রাখা যায় না। ভীমেন্দ্র বাটীর গৃহিণীর এইরূপ ব্যস্ততা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কিছুই বলিল না। অবশেষে অতি-কষ্টে বলিল "আমি অনেক কাল মাকে দেখি নাই আমার বিধবা মা আমার জন্য না জানি কত কত পাইতেছেন; আমার কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু—।" ভীমেন্দ্র আর বলিতে পারিল না। ছেলেমেয়েদের কোমল হৃদয়ে ভীমেন্দ্রের রোদনে আঘাত লাগিল, তাহারাও কাঁদিতে লাগিল। বসন্তবালা দেবী আঁচলের কোণে চক্ষু মুছিলেন। অবশেষে হরিপদ বাবু আফীশ হইতে বাড়ীতে আসিলে স্থির হইল যে ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু ভীমেন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে—বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ১ বার—স্কুল ছুটি হইলে বগুড়ায় আসিতে হইবে; যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় হরিপদ বাবু দিবেন। ভীমেন্দ্র যে চলিয়া যাইতেছে ছেলেদের একথা জানান হইবে না। এইরূপ বন্দোবস্তের পর হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে কিছু পথের খরচ দিলেন, একটী বাক্স পুরিয়া কিছু কাপড় ও খাবার দিলেন। হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে একখানি গরুর গাড়ী করিয়া দিলেন, তৎকালীন নিয়মানুসারে ভাড়া আগেই দিলেন এবং ভীমেন্দ্রের বাক্সটী তাহাতে তুলিয়া দিলেন। ভীমেন্দ্রের টাকা পয়সার থোলেটী বাক্সের মধ্যে পুরিয়া দিল;—পরিচিত গাড়োয়ান, ভয় কি? এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কর্ত্তা ও গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া, ঈশ্বরের নাম করিয়া (ভীমেন্দ্র যাত্রার সময় ঈশ্বরের নাম করিল, কিন্তু তাহা গৃহিণীর অনুরোধে) ভীমেন্দ্র বগুড়া পরিত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ

রামায়ণের উপদেশ।

হরিশ্চন্দ্রের গল্প।

ধন্য মায়ের স্নেহ! এমন মাকে কত নিষ্ঠুর বালক অত্যাচার করিতে, কষ্ট দিতে ছাড়ে না। ওরে নির্ব্বোধ বালক! মা কি ধন আজ তাহা চিনিতেছ না; কিন্তু যে দিন মা মরিয়া যাইবেন— যে দিন 'আহা' বলিবার আর দুটী লোক থাকিবে না,—যখন 'মা' এই মিষ্ট কথা আর মুখে বলিতে পাইবে না—তখন বুঝিতে পারিবে, কি ধন ছিল, কি ধন গেল! আমরা মাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি—এখন ভাবনার বোঝা মাথায় পড়িয়াছে;—যখন কষ্টে অস্থির হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই—(হতভাগা আমাদের মা নাই)—সেই ভাবনায় প্রাণের সহিত দুটো মিষ্ট কথা বলে এমন লোক নাই যখন দেখি, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে ইচ্ছা হয়,— "মা আমার! এতকাল তোমাকে কষ্ট দিয়াছি—সেই দুঃখে কি মা আমাকে ছাড়িয়া গেলে? ফিরিয়া আইস;—তোমাকে যে কষ্ট দিয়াছি, তার দশগুণ কষ্ট দিয়া যদি খুশী হও, মাথা পাতিয়া দিলাম— তবু ও ফিরিয়া আইস। আমি যে এখন বড় হইয়াছি,—ভাবনা, পাহাড়ের মত চারধারে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে;—এ সময়ে আপনার ভাবিয়া প্রাণের টানে দুটো স্নেহের কথা কে বলে?"—শৈব্যার মাতৃ স্নেহ দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাহাড়ের ন্যায় মন ও গলিয়া গেল; তিনি অগত্যা শৈব্য ও রোহিতাশ্ব উভয়কে লইয়া চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র কিছুই বলিলেন না;—ভয়ানক দুঃখে কান্না পায় না—কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার প্রাণের তলা পর্য্যন্ত পুড়িয়া গেল। শৈব্যা রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার নিকট [illegible] লইলেন; একদিন যাঁহার শত শত [illegible] সেই শৈব্যা আজ পরের ঘরে [illegible] করিতে গেলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র দিন গণিতেছিলেন, কখন রাজাকে তাড়া দিবার দিন আসিবে—কাজেই সময় মত কাশীতে দেখা দিলেন। গিয়া দেখেন অর্দ্ধেক টাকা যোগাড় হইয়াছে;—তখন বিশ্বামিত্রের আর রাগ দেখে কে? বলিলেন "এই যতটুকু বেলা আছে, এর মধ্যেই যোগাড় করে রাখ, নইলে বড় ভদ্রস্থতা নাই; আমি এখন স্নান করে আসি।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করিবার জন্য সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কাশীর বাজারে বাজারে ঘূরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে কিনিতে চাহে না। অবশেষে এক চণ্ডাল সেই থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অপরিষ্কার কালীর মত কাপড়ে চর্ব্বির গন্ধ, গলায় হাড়ের মালা, চোখ বসিয়া গিয়াছে, চুলে এত ধুলো দেখিলেই বোধ হয় যেন সমস্ত রাস্তাটা পা দিয়া না হাটিয়া মাথায় হাটিয়া আসিয়াছে, লম্বা লম্বা চুল কপাল ঢাকিয়া, চোখ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া পেচকের মত মিটির মিটির করিয়া তাকাইতে তাকাইতে, মূলোদাঁতে হাসিতে হাসিতে চণ্ডাল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে চাকর বেস্তিচে? মুই তোকে কিনমু। বালো অইচে; এড্ডা চাকর পালিতো মুই বেঁচে যাই। তোর দাম কতরে?" চণ্ডালের ভাবভঙ্গী দেখিয়াই হরিশ্চন্দ্রের বিরক্তি হইল, কিন্তু তিনি স্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে বাপু"? চণ্ডাল আবার মূলোদাঁতে হাসিল, কপালের চুল সরাইয়া হরিশ্চন্দ্রের পা অবধি মস্তক পর্য্যন্ত বিশেষ করিয়া দেখিল, এবং বলিল "মুই বড্ডিলোক, হকোল মশানের কর্‌তা—মোরে না পুছ ক'রে কোনো মড়া কেউ পোড়াত্তি পারে না— [illegible] কত?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "দামের [illegible] ব; তোমার কি কাজ করতে হবে, [illegible]।" শ্মশানের কর্ত্তা বলিলেন—"মোর ঝা কাম হকোলি তোকে কর্‌তি অবে। শোর চর্‌বি, মড়ার কাপড় যড়ো কর্‌বি, ঝে মড়া পোড়াত্তি আসবে, তার কাছে হোলো কাহন কড়ি লবি। লে, লে হব মোকে দিবি। এখন বল্ তোর দাম কত।" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "৪ কোটী মোহর।" চণ্ডাল বলিল "তুই ঝা চাস তাই তোকে দিচ্ছি; এখন আয় মোর সাথে আয়।" এই কথা বলিয়া চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে ৪ কোটীর মোহর দিল;—বিশ্বামিত্র ৭ কোটী সোণা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, তাহা আমাদিগের জানিবার প্রয়োজন নাই। ইহার পর হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার কি হইল, তাহাই দেখা যাউক। চণ্ডালের চাকর হইয়া হরিশ্চন্দ্র তাহার সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন, শ্মশানে মৃত দেহের কাপড় ইত্যাদি তুলিয়া রাখেন, যাহারা পোড়াইতে আসে তাহাদিগের নিকট পয়সা লন, এবং অন্যান্য সময়ে শূকর চরান। বিধাতা কেন যে অনেক সময় মহাধার্ম্মিকদিগকে মহাক্লেশে ফেলেন আর মহাপাপীরা পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, পৃথিবীকে জ্বালাতন করিয়াও পায়ের উপর পা রাখিয়া মহাসুখে জীবন কাটায় এ সকল প্রথম প্রথম বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ধার্ম্মিকদিগের এইরূপ পরীক্ষা তাঁহাদের উপকারের কারণ। স্বর্ণ অগ্নিতে পোড়াইলে যেমন অধিক উজ্জ্বল হয়, প্রদীপের আলো যেমন গভীর অন্ধকারেই অধিক শোভা পায়, ধার্ম্মিকের চরিত্র ও সেইরূপ বিপদাপদের মধ্যেই পরীক্ষিত হইয়া সুন্দর শোভা ধরে। সমস্ত বিপদাপদের মূলে এইরূপে দেখিলে দেখা যায় যে সেখানেও ঈশ্বরের দয়া! এই জন্যই ধার্ম্মিক পুরুষগণ ভয়ানক বিপদে পড়িলেও হাত দুটী যুড়িয়া বলিয়া থাকেন, 'ঘোর বিপদেও ব'লব তোমায় দয়াময়!'

শ্মশানে ও অন্যান্য অপরিষ্কৃত স্থানে চণ্ডালের কার্য্য করিয়া হরিশ্চন্দ্রের আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী রহিল না; কিছুকাল পরে তাঁহাকে আর চেনা যায় না; সামান্য চণ্ডালের ন্যায় অযোধ্যার পূর্ব্বের রাজা এইরূপে ধর্ম্মের জন্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাণী শৈব্যা রাজকুমার রোহিতাশ্বকে লইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর কার্য্য করিতে লাগিলেন, রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের দেবপূজার ফুল, বিল্বপত্র সকল খুঁজিয়া আনে এবং শৈব্যা ঘরের অন্যান্য কার্য্য করেন। এইরূপে অনেক দিন যায়; এক দিন রোহিতাশ্ব ফুল সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদে পড়িল। যে গাছ হইতে রোহিতাশ্ব ফুল আনিতে গিয়াছিল, সেই গাছে সাপ ছিল; রোহিতাশ্ব ফুলের জন্য গাছ নাড়িবা মাত্র সর্প তাহাকে দংশন করিল। বালকের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, সে বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া দৌড়িয়া গৃহে আসিল, এবং 'মা! আমার কি হ'ল' বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। শৈব্যা পাগলিনীর ন্যায় তাহাকে 'ভয় কি' 'ভয় কি' বলিয়া কোলে করিলেন, কিন্তু প্রাণ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। আহা! মায়ের প্রাণ কি তাহা বুঝে! শৈব্যা ব্রাহ্মণ-প্রভুর অনুগ্রহে চিকিৎসক পাইলেন, কিন্তু মৃত্যু যাহাকে ধরিয়াছে, চিকিৎসক তাহার কি করিবে? আহা! রাজরাণী পথের ভিখারিণী হইয়াও যে একমাত্র পুত্রের মুখ চেয়ে বেঁচেছিল, আজ সেই বুক-চেরা ধন তাকে ফাঁকি দিয়া গেল। কি কষ্ট! যত প্রতিবেশীর মেয়েরা আসিয়াছিল, সকলেই শৈব্যার মিষ্ট ব্যবহারে তাঁহার বাধ্য ছিল, সকলেই সেই 'সোণার চাঁদ' ছেলের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের অধিক দয়া হইল না। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ বলিলেন "বাছা! তোমার ছেলেকে শ্মশানে ফেলে এসো! আমার বাড়ীতে রাত্রিতে মড়া থাকিতে পারিবে না।" শৈব্যা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিলেন। মৃতপুত্র কোলে করিয়া শৈব্যা শ্মশানের দিকে চলিলেন। তোমরা দেখ, কে কোথায় আছে, একবার চেয়ে দেখ! রাজ রাজেশ্বরী আজ মৃতপুত্র কোলে ক'রে শ্মশানের দিকে যাইতেছেন। আহাহা! বিধাতার নিয়ম বুঝা ভার। কেন আজ শৈব্যা এত ক্লেশে পড়িলেন! আমি কেন তাঁহার ক্লেশের ভাগী হইতে পারিলাম না! যদি আমার দ্বারা তাঁহার কষ্টের কিছু শান্তি হইত, তাহা হইলে আমি যে মহা আহ্লাদে তাহা করিতাম। যাহারা চিরকাল সুখে কাটাইয়াছে, তাহাদের হঠাৎ এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের ক্লেশ যে সহ্য হয় না! শৈব্যা শ্মশানে গেলেন, যে শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র কার্য্য করিতেন, এ সেই শ্মশান। অন্ধকার রাত্রি; তাহাতে মেঘাচ্ছন্ন; -কাঁদিতে কাঁদিতে শৈব্যা সেই শ্মশানে গেলেন। হরিশ্চন্দ্র অন্য অন্য দিনের ন্যায় আজও শ্মশানে কার্য্য করিতেছিলেন, হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া সেই দিকে ফিরিলেন; তাঁহার কোমল মন উথলিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র যখন অন্ধকারের মধ্যে অল্প অল্প দেখিতে পাইলেন, যে একটী স্ত্রীলোক মৃত বালককে কোলে করিয়া আসিতেছে, তখন তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। 'আমার রোহিতাশ্ব নয়তো!' হায়রে দুঃখ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, দেখ কি! তোমারই রোহিতাশ্ব ওই গেল! তুমি চিনিতে পারিলে না! হরিশ্চন্দ্রের মনে দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখেতে পাছে আপন প্রভুর নিয়মানুসারে কড়ি ও কাপড় লইতে ভুলিয়া যান, এই জন্য দুঃখ দূর করিলেন। যেখানে শৈব্যা কাঁদিতেছিলেন, হরিশ্চন্দ্র সেই খানে আসিলেন; এবং অতি কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'ওগো আমার কড়ি দাও'। বিদ্যুতের [illegible] সেই হস্ত দুখানি দেখিতে পাইয়া শৈ[illegible] [illegible] পারিলেন এবং 'মহারাজ! সর্ব[illegible]

বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন হরিশ্চন্দ্রের যে ক্লেশ তাহা কে বর্ণনা করিবে। কাটা ছাগলের মত হরিশ্চন্দ্র ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, এবং শৈব্যাকে বাতাস দিয়া যাহাতে তাঁহার জ্ঞান হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। শৈব্যা চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু আবার সেই শোকের আগুণ জ্বলিল। আর কত কষ্ট তাঁহারা সহ্য করিবেন? যখন কষ্টের চূড়ান্ত হইল, তখন ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্রকে দেখা দিলেন; দৈব ঔষধের গুণে রোহিতাশ্বের প্রাণ বাঁচিল। রোহিতাশ্ব অবাক্ হইয়া পিতামাতাকে শ্মশানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা, রোহিতাশ্ব সকলে মিলিয়া নগরের দিকে আসিতেছিলেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার বিশ্বামিত্র আসিতেছেন দেখিয়াই শৈব্যার প্রাণ উড়িয়া গেল। বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন "ভয় নাই। যাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পায়, পৃথিবীতে তাহাদের ভয় কি? আজ তোমাদের সুদিন। সত্যধর্ম্মে স্থির থাকিয়া তোমরা পৃথিবী ও স্বর্গ দুই ই জয় করিয়াছ। আর ক্লেশে প্রয়োজন নাই। তোমাদের রাজ্য তোমরা লও, তোমাদিগকে দান করিলাম।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি চলিয়া গেলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র পুনর্ব্বার রাজা হইলেন। রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের মত চরিত্র আর একটীও নাই। কিসে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের এত খ্যাতি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে বিধাতা আমাদিগকে পরম সুখে অথবা ভয়ানক দুঃখে যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন, যদি সেই সকল অবস্থাতেই তাঁহারই চরণে মন রাখিয়া ধর্ম্মপথে থাকিতে পারি, তবে ইহকাল ও পরকালে নিশ্চয়ই স্থান পাইব, এবং সেই সুখী হইবার এক

রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের বিষয়ে আরও একটু উল্লেখ দেখা যায়। হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মের গুণে হরিশ্চন্দ্র আপনার সমস্ত প্রজার সহিত স্বর্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্গীয় কোন ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপুহে! তুমি স্বর্গে আসিলে কোন গুণে?" তখন হরিশ্চন্দ্র নিজে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। অমনি হরিশ্চন্দ্রের পতন হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যতই সৎকার্য্য কর না কেন, একমাত্র অহঙ্কারই সকলকে নষ্ট করে। অতএব উপদেশ এই, যে কার্য্য করিবে, তাহাতে তোমার নিজের বল না দেখিয়া ঈশ্বরের দয়া দেখিবে। 'আমিই এই কার্য্য করিলাম' ইহা না ভাবিয়া, মনে করিও 'ঈশ্বরের দয়াতে এই কার্য্যটী হইল' কারণ তাঁহার দয়া না হইলে কি কোন কার্য্য হয়? এইরূপে সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরকে দিলে অহঙ্কারের হস্ত হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

মাকড়সা।

অনেকে মাকড়সা মারাকে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন। "মাকড়সা মেরোনা" বলিলে তাঁহারা হয় তো চমকিয়া উঠেন। মাকড়সার পূর্ব্ব পুরুষ কেহ বড়লোক ছিল না, সুতরাং বেচারা আমাদের নিকট আদর পায় না।

মাকড়সা দেখিতে অনেকটা কাঁকড়ার মত। পিপ্‌ড়ে প্রভৃতির সঙ্গেও কিছু সাদৃশ্য আছে। একটা গোল আঁক দিয়া তার চারিদিকে আটখানি পা বসাইয়া দিলেই মনে করিতে পার একটী কাঁকড়া হইল। কাঁকড়ার পেছনে আর একটী গোলাকার রেখা সংযুক্ত কর মাকড়সার কাছাকাছি যাইবে। মাকড়সার মাথায় বড় পাগড়ী থাকিলে পিপ্‌ড়ে জাতীয় পোকার মত দেখা যাইত— তবে ঠ্যাং দুখানা বেশী হইত। মাকড়সার মুখে ভয়ানক দুটী অস্ত্র; তার দু একটী "চিম্‌টী" খাইলে হয় তো বড় সুবিধা বোধ করিবেন না। এই দুইটীকে

মাকড়সার সাঁড়াশী (দাঁত নয়!) বলা যাইতে পারে। যুদ্ধ এবং শিকারের সময় এই গুলি কাজে আসে। মাথায় বড় বড় দুটি চোখ। তার 'আশপাশে' খুঁজিলে ছোট ছোট আরো ৪।৫টী দেখিতে পাইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর "এত চোখ কেন?" আমি বলিব "জানি না।"

মাকড়সার নাম লইলেই তাহার জালের কথা মনে পড়ে। জালে দুই কাজই চলে; বাড়ী করিয়া থাকা হয়, শিকারেরও সাহায্য হয়। মাকড়সার পেটের উপর গরুর বাঁটের মত ছোট ছোট কয়েকটী বাঁট আছে। এই বাঁটের মুখ দিয়া এক প্রকার আঠা বাহির হয় তাহাই বাতাসে শক্ত হইয়া দড়ির কাজ করে। এই দড়ি দিয়া জাল তৈরি হয়। এর এক একটা এত সরু যে চোখে দেখা যায় না, তবুও বড় বড় মাকড়সা তাহাতে ঝুলিয়া থাকে। কোন হতভাগ্য পোকা এক[illegible] মাকড়সার জালে পড়িল তবে ত[illegible] সম্ভাবনা অল্পই থাকে। হুড়োহু[illegible]

করে ততই গোলমাল আরো বাড়িতে থাকে। শেষে নিরুপায় হইয়া পড়ে। জালওয়ালা এতক্ষণ মধ্য হইতে শান্তভাবে চাহিয়াছিল। যাই দেখিল যোগাড়টা পাকাপাকি হইয়াছে অমনি আস্তে আস্তে কাছে আসিল ; দড়ি সঙ্গেই আছে ; চারিদিক উত্তম রূপে দেখিয়া অম্লান-বদনে হতভাগ্যকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইলে আহার। মাথা ছিড়িয়া শরীরের রস চুষিয়া লয়, আর কিছু খায় না। মাঝে মাঝে দুই একটা বোলতা আসিয়া জালে পড়ে। তখন আমাদের ইনি মনে করেন আপদ গেলেই বাঁচি! বোলতা চড়্ পড়্ করিয়া জালের খানিকটা ছিঁড়িয়া পালায়।

জালের কোন অংশ ছিড়িয়া গেলে 'লোকটা' যত্ন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামত করিয়া রাখে। এক জাল অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে আর একটা করিয়া লয়। এই রূপে দড়ির পুঁজি ফুরাইয়া যায়। তখন প্রতিবেশী কেহ থাকিলে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার জাল দখল করে। অন্যের জাল নিকটে না থাকিলে কি করে? গোল্‌ডস্মিথ সাহেবের মনেও এই প্রশ্ন হইয়াছিল। তিনি একটা মাকড়সার পেছনে লাগিলেন। সে তাঁহার থাকিবার ঘরেই বাড়ী করিয়াছিল। তিনি তাহার সমস্ত ভাঙ্গিয়া তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সে বার বার জাল গড়িতে লাগিল, সাহেব ও ভাঙ্গিতে ত্রুটি করিলেন না। একটা পোকার পেটে আর কত দড়ি থাকে! ভাল মানুষ নিরুপায় ভাবিয়া অগত্যা নিকটস্থ জাল দেখিতে গেল। জালের কর্ত্তা 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া প্রচণ্ড লড়াই করিলেন। কিন্তু সাহেবের মাকড়সারই [illegible] হইল। সাহেব ইহা দেখিয়া ঘরের সমস্ত জাল [illegible]লেন। এবার বেচারা বড় বিপদে [illegible] ছোট জন্তু বলিয়া বুদ্ধি কম নয়। [illegible]জ পত্রের মধ্যেই বাড়ী করিল। ক্ষুধা হইলে এক যায়গায় মড়ার মত পড়িয়া থাকিত, কোন পোকা কাছে আসিলেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। ক্রমশঃ—

ফুঁদিয়ে প্রদীপ নিবাইও না।

(প্রাপ্ত)

আমি ছেলে বেলায় বড় দুরন্ত ছিলাম কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু ঈশ্বরের কেমন মহিমা বলিতে পারি না, মাকে বড় ভাল বাসিতাম, তাঁহার কথা শুনিতাম। তিনি ধমকাইতেন না তাই বলিয়া হউক, বা আর কোন স্বাভাবিক কারণ থাকাতেই হউক কখনও তাঁহার অবাধ্য হইতে সাহস হইত না। আমি যা ধরিতাম, তা ছাড়িতাম না। তবে মা বারণ করিলে আর যেন তাহা করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

এক দিন সন্ধ্যার সময় মা রান্নাঘরে প্রদীপ জালিয়াছেন, ঘরটী আলোতে 'ফুট ফুটে' হইয়াছে, অন্ধকার চোরের মতন কোন্ কোণে লুকাইয়াছে। মা সেই ঘরে বসিয়া কি কাজ করিতেছেন, আমি সেই সময় "খিদে পেয়েছে" "খিদে পেয়েছে" বলে তাঁর কাছে গেলাম ; মা আমার কথার উত্তর দিলেন না, তাই তাড়াতাড়ি একটু রাগ করিয়া বলিলাম "আচ্ছা যেমন আমায় খাবার দিলে না, তেমনি তোমার কাজ পণ্ড করছি—আমি তোমার প্রদীপ নিবাইয়া দিই।" যেমন বলা ; অমনি কাজ করা। আমি প্রদীপ নিবাইয়া দিলে মা বলিলেন "যা! প্রদীপটা নিবাইয়া ফেল্‌লি! দেখ দেখি কত কাজের ক্ষতি হইল। তা যা করেছিস্ তা করেছিস্, তা প্রদীপটা ফুঁদিয়া নিবাইস্ নিত?" আমি বলিলাম "ফুঁদিয়াই নিবাইয়াছি।" মা বলিলেন "হারে হাবা ছেলে, ফুঁদিয়া কি প্রদীপ নিবাইতে

আছে?" আমি বলিলাম "কেন তাতে দোষ কি মা?" মা বলিলেন "তা তুমি জানিবে কি ক'রে? ওতে যে মুখে দুর্গন্ধ হয়। কথা কইতে গেলে মুখ দিয়া ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরোয়। কেউ তোমার সহিত কথা কহিতে চাহিবে না, যদিও বা কথা কয়, তাও নাকে মুখে কাপড় দিবে। তখন মনে কত কষ্ট পাবে, মনে ভেবে দেখ দেখি।" আমার মনে একটু দুঃখ হইল, মনে ভাবিলাম, কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! সে দিন হতে স্থির করিলাম এমন কাজ আর করিব না। আমি আর কোন উত্তর করিলাম না।

রাত্রিটা নিদ্রায় কাটিয়া গেল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল, কালিকার রাত্রির কথাটা মনে পড়িয়া বড় ভয় হইল। তবে আজ আমার সঙ্গে কেহ কথা কহিতে আসিলে নাক মুখে কাপড় দিবে? দু বার তিন বার মুখের গন্ধ লইবার জন্য জোরে নিশ্বাস টানিলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি মাকে বলিলাম "মা দেখত আমার মুখ হতে গন্ধ বাহির হচ্চে কি না।" মা একটু হাসিয়া আমার মুখের ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, "গন্ধ হয়নি, এক দিনে তত গন্ধ হয় না।" একটু সুস্থ হইলাম, প্রাণটা যেন বাঁচিল। সেই থেকে আর ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাই না।

ও কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আসল কথাটা বলি। মা যাহা বলিয়াছেন, যে ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাইও না, ইহা বড় সত্য। আজ কাল বিজ্ঞান তাহা অপেক্ষা ভয়ানক কথা বলে। মাতো কেবল মুখের দুর্গন্ধের ভয় দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞান তাহার চেয়ে শক্ত ভয় দেখায়। এখন জানিয়াছি, যে উহাতে কঠিন পীড়া, এমন কি প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। কেরোসিন তৈলের দীপ ফুঁদিয়া নিবাইতে গিয়া মানুষ মারা পড়িয়াছে শুনিয়াছি।

সকলেই জানেন যে প্রদীপ নিবাইলে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঐ দুর্গন্ধময় পদার্থটা বড় ভয়ানক জিনিশ। ইংরাজিতে উহার নাম কার্ব্বনিক এসিড। বাঙ্গালায় কেহ উহাকে দ্রাম্ল অঙ্গারক কেহ বা কেবল অঙ্গারক বাষ্প বলেন। অনেক অঙ্গারক বাষ্প যেখানে থাকে সেখানে মানুষ বাস করিলে তাহার প্রাণ নষ্ট না হউক, শক্ত রোগ জন্মিতে পারে। যাত্রা শুনিতে গেলে গরম বোধ হয়—সর্দ্দিগর্ম্মি লাগে। তাহার কারণ ঐ অঙ্গারক বাষ্প। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করি তাহাতে উহার ভাগ নাই বলিলেই চলে,—৫০০০ ভাগে ৩।৪ ভাগ থাকে মাত্র। উহাই বিশুদ্ধ বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ু শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। যখন বায়ুতে অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ বেশী হয়, তখন তাহা নিশ্বাসে টানিয়া লইলে শরীরের মধ্যে যাইয়া রক্ত দূষিত করে। রক্ত দূষিত হইলে সকল পীড়াই জন্মিতে পারে। রোগ হইলে জীবনের কত অপকার এক বার ভাবিয়া দেখ। যদি আমি প্রতিদিন ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাই তাহা হইলে অঙ্গারক বাষ্প নিশ্বাসের সহিত শরীরের ভিতরে যাইবে, রক্ত দূষিত করিবে, কত রোগ জন্মাইবে, কত কষ্ট দিবে। এক আধ দিনে যদিও জানিতে পারা না যাক্ কিন্তু রোজ রোজ এইরূপ করিলে একটু একটু করিয়া অঙ্গারক বাষ্প শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া একটু একটু করিয়া রক্ত দূষিত করিবে, কঠিন পীড়া জন্মাইয়া দিবে। দেখ এই একটা সামান্য কাজে কত অনিষ্ট করে। তাই বলি একাজটা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশের মেয়েরা যদিও বিজ্ঞান জানেন না, কিন্তু তাঁহারা কেমন বৈজ্ঞানিক দেখ। যাহা মেয়েরা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেন না, তুমি কি তাহা উড়াইয়া দিবে? ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবান অভ্যাস [illegible] মন্দ। সাবধান!

[illegible]

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

পাঠিকাগণ! আপনারা যে আমাদিগের ঘরে বেতন না লইয়া নিজের ইচ্ছায় রন্ধন করেন এবং ঘরের অন্যান্য সমস্ত কার্য্য করেন, ইহাতে কি শুধু আমাদেরই সুখ, আপনাদিগের কি নাই? যখন আমার ভগ্নী অথবা আমার মাতা, অথবা আমার স্ত্রী, আমারই সুখের জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করেন বা অনেক কাজ করেন তখন আমার ক্লেশের বোঝা কত কমিয়া যায়, প্রাণে কত আরাম হয়, তাহা কি আপনারা বুঝিতে পারেন? কিন্তু ইহাতে কি শুধু আমাদিগেরই আনন্দ, আপনাদিগের কি ইহাতে বিলক্ষণ আনন্দ নাই? সে মূর্খ যে বলে 'নাই!' "আমারই ভাই অথবা আমারি পুত্র, অথবা আমারি স্বামী আমার সামান্য পরিশ্রমের গুণে মনের সুখে, শরীরের সুখে কাল কাটাইবেন," এই চিন্তাতেও কোন্ স্ত্রীলোকের মন না উৎসাহিত হইয়া উঠে? জগদীশ্বর স্ত্রীলোককে ঘরের গৃহিণী করিয়া বাস্তবিকই যেন পৃথিবীর দুঃখের বোঝা অর্দ্ধেক কমাইয়া ফেলিয়াছেন। সমস্ত গৃহকর্ম্মের মধ্যে রন্ধন একটী প্রধান কর্ম্ম;—স্ত্রীলোকেরা ইহাতে যত পরিপক্ক, পুরুষেরা প্রায়ই তত নহেন। যাঁহারা ধনী তাঁহারা অনেক সময় ব্রাহ্মণ রাখিয়া এই ভাল কাজ করেন না। রন্ধন যে স্ত্রীলোকদিগের সকল অবস্থাতেই করিতেই হইবে এরূপ বলিতেছি না, তবে ভগিনী, মাতা, স্ত্রী, অথবা কন্যা নিজ হাতে কোন দ্রব্য সামান্য ভাবে রন্ধন করিলেও ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী, বা পিতার তাহা খাইতে যত মিষ্ট লাগিবে, হাজার ব্রাহ্মণে ঘি-[illegible] করিলেও কি তত মিষ্ট লাগিতে পারে? যাঁহারা ব্রাহ্মণের হাতে সমস্ত রন্ধনের [illegible]বা কিছুই করেন না, আমরা তাঁহাদিগের এই কাজকে তত ভাল মনে করি না। আজ আমরা একটী পরম সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম পাঠিকাদিগকে শিখাইয়া দিব, যাঁহারা জানেন না তাঁহারা শিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দেখিবেন। অল্পবয়স্কা পাঠিকাদিগের জন্য যদিও এইটী লিখিত হইতেছে, তথাপি আশা করি ইহাতে অনেক অধিক-বয়স্কা পাঠিকারও উপকার হইতে পারিবে।

চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

আগে এই কয়েকটী জিনিশ যোগাড় করিয়া রাখঃ—(১) একটা ঝুনো নারিকেল; (২) খানিকটা ছানা; (৩) খানিকটা দোবরা চিনি, অভাবে যত ভাল পরিষ্কার পাওয়া যায়, সেইরূপ চিনি; (৪) ২।৩ ঝিনুক দুধ; (৫) খানিকটা ক্ষীর; (৬) অল্প একটু ঘি; (৭) পেস্তা, কিস্‌মিস, বাদাম; (৮) মিশ্রির গুঁড়ো; (৯) কিছু কলাপাতা; (১০) এক যোড়া কাঁচি বা একখানা ছুরি, বা বঁটি; (১১) গোটাকয়েক বাটী; (১২) গোটা দুই কড়াই; (১৩) শিল নোড়া।

তাহার পর নারিকেলের উপরটা ছোবড়া ছাড়াইয়া বেশ করিয়া চাঁছিতে হইবে, তাহার উদ্দেশ্য এই, তাহা না হইলে ছোবড়ার গুঁড়ো সকল উড়িয়া কুরিবার সময় আসিয়া পড়িবে। এইরূপ বেশ পরিষ্কার করিয়া ভাঙ্গিয়া কুর্‌তে হবে। তৎপরে খুব কাদার মত না হয়, একটু শক্ত থাকে, এই ভাবে বাটিতে হইবে, এবং ছানাও (যতটুকু দিলে ভাল হয় মনে হইবে' সেই আন্দাজে) নিংড়ে বাটিতে হইবে। এই দুটী বাটা জিনিশ একপাশে রাখিয়া দাও। এদিকে দোবরা চিনি জলে গুলিয়া চড়ান আবশ্যক; চিনি যখন ফুটে উঠিবে, তখন ২।১ ঝিনুক দুধ ছড়াইয়া দিবে; ইহাতে গাদ উঠিতে থাকে। গাদ শেষ হইলে, ঢালিয়া ছেঁকে লইয়া একটা বাটীতে রাখ।

ইহার পর কড়াটীকে বেশ পরিষ্কার করিয়া বা অন্য একটা পরিষ্কার কড়ায়, নারিকেল এবং

ছানার আন্দাজে এই রস চড়াও। রসটা বেশ ঘন হয়ে আসিলে নারিকেল, ছানা, আর তাহার উপযুক্ত ক্ষীর দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর খুন্তি বা অন্য কোন যন্ত্র দিয়া খানিকক্ষণ নাড়িতে থাক; যখন দেখিবে বেশ পাক হইয়াছে অর্থাৎ এমন হইয়াছে যে ঘি হাতে মাখিয়া উনুনের উপরের জিনিশ গুলি হাতে পাকাইলে হাতে লাগিয়া যায় না, তখন নামাইয়া পেস্তা, বাদাম, কিসমিস্ পরিমাণমত দিয়া নাড়িতে হইবে। নাড়িতে নাড়িতে সবগুলি বেশ মিশিয়া গেলে, ছটো কলাপাতার ভিতরে ফেলিয়া দুহাত দিয়া চন্দ্রের আকার করিয়া ঠেলিতে হইবে। এই কার্য্য শেষ হইলে কাঁচি দিয়া কাটিয়া, প্রত্যেক পুলির উপরে মিশ্রির গুড়ো ছড়াইয়া দিবে।

ওঃ নূতন বছরের আমোদ দেখ!!

নববর্ষ।

বাহবা! বাহবা! হোঃ! হোঃ! হোঃ! ছেলে বাবুরা একেবারে হেসেই কুটপাট! বলি এত হাসি কেন? নূতন বছর এসেছে, বলেই বুঝি বাবুরা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠেছ? বেশ! বেশ!

নূতন বৎসর আসিয়াছে। 'সখা'র পাঠক পাঠিকাগণের আর এক বৎসর বয়স বাড়িল। এই বালকবালিকারা যেমন নূতন পোষাক পরিয়া আহ্লাদে হাসিতেছে, আমরাও আজ সেইরূপ মনের আহ্লাদে, নূতন পোষাক পরিয়া পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, সকলকেই আমাদিগের মনের আদর এবং মঙ্গল ইচ্ছা জানাইতেছি; আশীর্ব্বাদ করি নূতন বৎসরে সকলে সুখে থাকুন।

একটী বৎসর চলিয়া গেলে—দেশের সকলেই আনন্দ করে। বাড়ীর গৃহস্থ, দোকানের দোকানী, নৌকার মাঝি, সকলেই নূতন বছরে আপন আপন থাকিবার স্থান সাজায় এবং আনন্দ করে। যাঁহারা লেখাপড়া শিখিতেছেন, নূতন বৎসরের প্রথমে তাঁহারা আপন আপন ভাই ভগ্নী বা ভাল, বাসার অন্য দশজনকে নানারূপ নূতন জিনিশ কিনিয়া দিয়া থাকেন। আমরাও নূতন বৎসরে আনন্দিত হইয়াছি কিন্তু পাঠক পাঠিকাদিগকে কিছু উপহার দি, এমন সাধ্য অমাদের নাই। তবে নূতন পোষাক পরিয়া সকলের নিকট আসিয়া এই মনের কথা জানাইতেছি যে "ছবিতে চিত্রিত বালকবালিকাদিগের ন্যায় আপনাদিগের সকলের নূতন বৎসর ওইরূপ মনের সুখে কাটুক।"

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে একটী কথা না বলিলে যথার্থ 'সখা'র কার্য্য করা হয় না। সমস্ত বৎসর কাটিয়া গেল—সকলের একবৎসর বয়স বাড়িল—কিন্তু এই এক বৎসরে 'সখা'র পাঠক পাঠিকা দিগের মধ্যে কে কতখানি উন্নতি করিয়াছেন, কে কতখানি লেখা পড়া অধিক শিখিয়াছেন, কে কতখানি ভাল হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার এই সময়। যদি একটী বৎসর মিছামিছি নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে আনন্দ করা উচিত হইবে কি? সেই হাস্যুক, যাহার বছর ভাল গিয়াছে। যাহা হউক, যে অবস্থাতেই হউক না কেন, নূতন বৎসরের প্রথমে সকলে প্রতিজ্ঞা করুন 'যেন এই বৎসর সকলে ভাল কাজ করিয়া, ভাল হইয়া, নিজের উন্নতি করিয়া কাটাইতে পারি।' পরমেশ্বর 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের ভাল ইচ্ছার সহায় হউন, 'সখা'-সম্পাদকের এই আন্তরিক প্রার্থনা।

নূতন বৎসরের সুখবর।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমাদিগের কোন বন্ধুর স্ত্রী ইচ্ছা করিয়াছেন সখার পাঠক পাঠিকা-দিগের উৎসাহের জন্য কিছু পুরস্কা[illegible] তিনি এসম্বন্ধে আমাদিগকে যে পত্র [illegible] তাহা প্রকাশ করা গেল:— [illegible]

"শিশুদিগের উৎসাহের জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াছি দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক যে বালক কিম্বা বালিকা আপনার পত্রে মুদ্রিত ধাঁধা সকলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তর দিতে সক্ষম হইবে, তাহাকে বৎসরান্তে ৫ পাঁচ টাকা পারিতোষিক দিব। আশা করি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।"

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
অলকাসুন্দরী রায়।

বোধ হয় বলাবাহুল্য যে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমাদিগের মাননীয়া পত্রপ্রেরিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 'সখা'র পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম তাঁহারা এইবার চেষ্টা দেখুন। যে যতগুলি ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন, আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আমরা তাহার একটী হিসাব রাখিতে স্বীকৃত আছি। বৎসরের শেষে যাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে, তিনিই এই পুরস্কার পাইবেন। ধাঁধার উত্তর গুলি কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজে নিজে বাহির করিতে হইবে, এবং পত্রিকা প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আর একটী আশার কথা।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে 'সখা'র অল্পবয়স্ক একজন গ্রাহক নিজের সুখের ক্ষতি করিয়া 'সখা' গ্রহণ করিতেছেন। আমাদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন যে এই বালকটী মাতার নিকট হইতে জলখাবারের জন্য একটী টাকা পাইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা জলখাবারের জন্য খরচ না করিয়া তাহা দ্বারা 'সখা'র গ্রহক হইয়াছে। বালকদিগের মধ্যে যে এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা দিন দিন বাড়িতেছে, সুখের একটু ক্ষতি করিয়াও যে বালকগণ নূতন নূতন বিষয় শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি?

বোধ হয় পিতা মাতা এইরূপ সৎকার্য্যে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহই দিবেন, কারণ সেই বালকই বড় হইয়া ভাল হয়, যে এই রূপে বাল্যকাল হই-[illegible]গের জন্য একটু একটু কষ্ট স্বীকার করা [illegible]। প্রত্যেক বালক বালিকারই উচিত [illegible] দেখিয়া চলেন।

[পত্]ত্র প্রেরকদের প্রতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ — যে মাসে পত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিতে হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রগুলি এখানে আসা আবশ্যক। যাঁহাদের পত্রের বিষয়ে কিছু লেখা নাই, তাঁহারা জানিবেন যে তাঁহাদিগের পত্র হয় মনোনীত নহে, নতুবা স্থানাভাব।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর।—একটী মাত্র গৃহীত হইল।

শ্রীশরৎকুমার সরকার, ঘোড়ামারা,—৪টীর উত্তর হইয়াছে।

শ্রীতুলসীচরণ দে, কাদিহাটী।—প্রথমটী ভাল হইয়াছে, অন্যগুলি নয়, কিন্তু স্থানাভাব।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী। বাণানের দিকে আর একটু মন দিলে ভাল হয়। হেঁয়ালী মনোনীত নহে।

শ্রীসুশীলাবালা মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী। এই রূপ প্রশ্ন পাইলে আমরা বড়ই সুখী হই, তবে কোন কোন বালক বা বালিকা যেমন সম্পাদকের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য যত রাজ্যের 'বিদ্ঘুটে' প্রশ্ন সকল করিয়া থাকেন, সেরূপ না করাই যথার্থ সুশীল বা সুশীলার কার্য্য। প্রশ্নগুলির উত্তর এইঃ—১। যখন আকাশে মেঘ উঠে, তখন সেই মেঘের মধ্যে তড়িৎ নামে একরূপ জিনিশ জন্মে—আবার তাহার ঠিক্ নীচে পৃথিবীতে ও তড়িৎ জন্মে। তড়িতে তড়িতে পরস্পরের দিকে একটু যেন ভালবাসার টান আছে, তাই পরস্পরের কাছে যাইতে চায়। এইরূপ টান যদি দুখণ্ড মেঘের মধ্যস্থ তড়িতে হয় তাহা হইলে আর

পৃথিবীর লোকের বজ্রপাতের ভয় থাকে না ; কিন্তু যখনই পৃথিবীর তড়িতে আর একখণ্ড মেঘের তড়িতে ভয়ানক টান হইল, অমনি মেঘের তড়িৎ পৃথিবীতে চলিয়া আসে। এই আসিবার নামই বজ্রপাত। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যাইবার সময় তড়িতের তেজে যে আলো হয়, তাহাকেই আমরা বিদ্যুৎ বলি ; আর যে শব্দটী আমরা শুনিতে পাই তাহাও এই তড়িতের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। যখন ভয়ানক তেজে, ভয়ানক বেগে বাতাসের মধ্য দিয়া মেঘের তড়িৎ পৃথিবীতে নামে, তখন বাতাস হঠাৎ দুভাগ হইয়া তড়িৎকে পথ দেয়, কিন্তু তাহার পরেই সেই দুভাগ বাতাস খুব জোরের সহিত 'ঘষাঘষি' করিয়া মিশিয়া যায়। এই মিশিবার সময়েই দুভাগের 'ঘষাতে' যে শব্দ হয়, আমরা তাহাই শুনিতে পাই। বিদ্যুৎ বজ্রপাতের আগে হয়, একথা না বলিয়া বোধ হয় ইহাই বলা অধিক সঙ্গত যে শব্দ হইবার আগে আমরা বিদ্যুৎ দেখি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল এই, যে শব্দ যত তাড়াতাড়ি চলে আলোক তাহা অপেক্ষা অধিক তাড়াতাড়ি যায়, এই জন্যই আমরা আগে বিদ্যুৎ দেখি, পরে শব্দ শুনি। বোধ হয় সকলেই জানেন যে যখন হাওয়া এক দিকে বহিতেছে, তখন যদি কেহ তাহার অন্য দিকে খানিকটা দূরে (মনে করুন নদীর একপাশে) দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ বা উত্তর পাশে, একজন ধোবা কাপড় পরিষ্কার করিতেছে, তাহা দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, কাঠের উপর কাপড় পড়িবার খানিক পরে শব্দটা কাণে আসে। এই দুই স্থলের কারণই এক। বজ্রপাত বলিলে সচরাচর সকলে মনে করে একখণ্ড লোহা মাথায় পড়িয়া মানুষ মরে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ; তড়িতের তেজে শরীরের ভিতর এমন ভয়ানক একটা ঝাঁকুনি লাগে যে তাহাতে তখনই প্রাণ বাহির হয়। ২। বিদ্যুতের দ্বারা অনেক উপকার হয়, যাহা জানি ; এমনও অনেক উপকার থাকিতে পারে যাহা বিদ্যুতের সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন। একটী উপকার;—ইহাতে সমস্ত বায়ুমণ্ডলের দূষিতভাবটী শোধরাইয়া দেয় ; দ্বিতীয় উপকার,—ইহাতে অনেক পীড়া ভাল করে ; তৃতীয় উপকার,—মানুষের জন্য দেশে বিদেশে 'খবরাখবর' লইয়া বেড়ায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ৩। স্ফটিক প্রাসাদের ন্যায় প্রস্তাব থাকিবে কি না, তাহা বলা যায় না। আমাদের বিলাতের লেখিকার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে বিদেশের কথা বলার আগে, দেশের নানারূপ খবর দিলে ভাল হয় না কি? আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীশ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া—পূর্ব্বের রচনা প্রকাশিত হইবে না, স্থির করা গিয়াছে। আপনার শেষের পত্রের বিষয় আগামীবারে আলোচিত হইতে পারে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনার বয়স কত তাহা জানা আবশ্যক, কারণ বালক ভিন্ন অন্য কেহ এই পত্রিকায় আলোচনা করিতে পারিবেন না।

শ্রীনলিনাক্ষ রায়, কড়াপাড়া।—স্থানাভাব, বিশেষতঃ লেখা কাগজের একপিঠে এবং আরও পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। 'সখা' বালকবালিকাদিগের ধাগ্য হইলেও বালকবালিকাদিগের লেখার দ্বারা আমরা 'সখা'কে পূরিয়া দিতে চাই না। বালকদিগের রচনায় অত সংস্কৃত শ্লোক কেন?

ভ্রমসংশোধন।

এবারকার প্রথম পৃষ্ঠায় যে ছবিটী দেওয়া হইয়াছে, সেটী "শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র" রাজার ছবি—স্থানাভাবে পূর্ব্বে লেখা হয় নাই।

ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। কমলা—লক্ষ্মী, লেবু। ২। জাল দিয়ে মাছধরা। ৩। বাতাস। ৪। উকীল। ৫। দুয়েরই পাখা আছে, প্রভেদ এই পাখীর পাখা শরীরে, বাবুর পাখা হাতে, বাতাস খাইতেছেন।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে উপরের উত্তর গুলি সমস্ত পাওয়া গিয়াছে ;—বালিকা সমিতি, বেথুন স্কুল ; যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যাসডাঙ্গা ; সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, কলিকাতা ; শ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া ; বিহারীলাল [illegible] এবং হরিভূষণ গুপ্ত, পাবনা। [illegible]

নূতন।

১। একটী সাড়েচার বৎসরের বালক 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—

'বাঘ নয়, ভালুক নয়, আস্ত মানুষ গেলে"—কে?

২। একজন শিক্ষকের অনেকগুলি ছেলে, তাহাদের মধ্যে একজন খুব চালাক। শিক্ষক একদিন রাগিয়া তাহার আক কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহাকে সিদ্ধ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। বলতো খাওয়াটা কি রকম হইল?

৩। এমন সাতটী কথা কি যাহাদের প্রথম অক্ষর গুলি একসঙ্গে লইলে একজন লাট সাহেবের নাম, এবং শেষের অক্ষর গুলি একসঙ্গে লইলে অন্য একজন লাট সাহেবের নাম হয়? কথাগুলির বিশেষ পরিচয় এই—

১ম কথাটী, ইংরাজী	—	কার্য্য বিবরণ।
২য় কথাটী	—	অত্যন্ত।
৩য় কথাটী	—	৯০০।
৪র্থ কথাটী	—	বাগান।
৫ম কথাটী	—	সর্ব্বদা।
৬ষ্ঠ কথাটী	—	২ নয়।
৭ম কথাটী	—	প্রস্তুত করিব।

৪। নিম্নলিখিত পত্র খানির মধ্যের শূন্যস্থান পূর্ণ কর, কেবল সাবধান হইবে যে প্রথম শূন্য স্থানটী যে কথাটী বা কথাগুলির দ্বারা পূর্ণ করিবে, দ্বিতীয় স্থানটী, সেই কথার উলটা কথা দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে; যথা, প্রথমটী পূর্ণ করিতে যদি 'তন' লাগে, তাহা হইলে দ্বিতীয়টী পূর্ণ করিতে, 'নত' বসাইতে হইবে।—

ভাই যদু—

তোমার পত্র পাইলাম। অখিল এবং—সে দিন—তে স্নান করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিল।—ও সঙ্গে ছিল, কিন্তু—কোন বিপদে পড়ে নাই। তাহারা যখন যাইতেছিল, তখন আমি বলিলাম তোমরা এখন—; কিন্তু আমার—না শুনিয়া,—সেই—রাত্তিই—তে গেল।—একটু শুনিয়াছিল, কিন্তু অখিল কোনমতে না শুনিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।—রফল ও পাইয়াছেন;—রফল এই হইয়াছে যে গিয়া যাই নাবিয়াছেন, —গুলি মাছ সেই ঘাটে ছিল, তাহারা অখি-অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে, এবং—কে কাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। অখিল এখন খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে। সত্বর যে আ—হবে তাহার সম্ভাবনা নাই; বলিতে কি এখন সে—র মত পড়ে থাকে। আর অধিক কি লিখিব, ইতি। তোমার স্নেহের হেমচন্দ্র।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৴১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণি অর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

৮। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

ভীমের কপাল।

৭ম অধ্যায়।

বগুড়া হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে চৈতন্যগ্রাম পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীতে আসিতে হয়। তথায় বিশ্রাম না করিয়া গরুর পক্ষে চলা কষ্ট, সুতরাং তৎকালে এইরূপ নিয়মই ছিল যে বগুড়া হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে চৈতন্যগ্রামে গিয়া গাড়ী বিদায় দেওয়া হইত। পূর্ব্বে নৌকা করিতে গিয়া যেরূপ ঠকিয়াছিল ভীমেন্দ্রের তাহা স্মরণ ছিল, সুতরাং সে এবার মনে করিয়া 'কাহার গাড়ী' একথা জানিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা গরুর গাড়ীর আড্ডায় গিয়া ভীমেন্দ্র দেখিল দু তিন খানা গাড়ী প্রস্তুত রহিয়াছে, ভীমেন্দ্র একখানার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'একি খোদাবক্সের গাড়ী?' গাড়োয়ান বলিল হাঁ। ভীমেন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠিল—গাড়োয়ান গরু যুতিয়া গাড়ী হাঁকিতে লাগিল।

ভীমেন্দ্র কখনও গরুর গাড়ীতে চড়ে নাই, সুতরাং যখন এক একবার মাথা নীচের দিকে পা উপর দিকে যাইতে লাগিল, এক এক বার যখন গড়াইতে গড়াইতে গাড়ীর এপাশ ওপাশ করিতে হইল, তখন ভীমেন্দ্রের কিছু ক্লেশ বোধ হইল। যাহা হউক এইরূপে সমস্তরাত্রি কাটিয়া গেল, ভীমেন্দ্র অর্দ্ধ জাগরণে অর্দ্ধ নিদ্রায় রাত্রি কাটাইল। প্রাতঃকালে ভীমেন্দ্র গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল 'আর কতদূর আছে?' গাড়োয়ান বলিল "আর ১ ক্রোশ; এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছিব।"অবশেষে একটী বড় গ্রাম বা বন্দর দেখা যাইতে লাগিল। ভীমেন্দ্র মনে করিল 'ঐ চৈতন্যগ্রাম';—জিজ্ঞাসা করিল 'ঐ বুঝি দেখা যায়?' গাড়োয়ান বলিল "হাঁ বাবু!" যথা সময়ে গাড়ী থামিল। ভীমেন্দ্র নামিয়া বলিল "গাড়োয়ান! বাক্সটা কই?"গাড়োয়ান কহিল "কই, আমার এই গাড়ীতে কেউ কোন বাক্স দেয় নাই ত!" ভীমেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানের সহিত যে কথা বার্ত্তা হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার মর্ম্ম এই; এস্থান চৈতন্যগ্রাম নহে—ভীমেন্দ্র এবারেও ভুল করিয়া অন্য গাড়ীতে আসিয়াছিল। বগুড়ার এক পার্শ্বে খোদাবক্স নামে একজন মুসলমান বাস করিত, তাহার অনেক গুলি ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ী ছিল। সকলগুলিই 'খোদাবক্সের আড্ডার গাড়ী' এই নামে পরিচিত। সুতরাং বিশেষ করিয়া গাড়োয়ানের নাম জিজ্ঞাসা না করাতেই এই গোলমাল ঘটিয়াছিল। যে দিন ভীমেন্দ্র চৈতন্যগ্রামে যাইবার জন্য খোদাবক্সের একটা গাড়ীতে ব[illegible] দিয়াছিল, সেই দিনই আর একটা গাড়ীতে [illegible] মুন্সেফ বাবুর একটী দূর সম্পর্কীয় [illegible]

পুর যাইবার কথা ছিল। এখন পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ভীমেন্দ্র কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। রগুলপুরে ভীমেন্দ্র আসিল, কিন্তু তাহার যে বাক্সের মধ্যে টাকা, খাবার, সমস্তই রহিয়াছে সে বাক্স না পাইয়া ভীমেন্দ্র বড়ই দুঃখিত হইল। তখন সে ভাবিল "ভাল, এই গাড়ীতেই বগুড়ায় ফিরিয়া যাই না কেন?" গাড়োয়ানকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে গাড়োয়ান বলিল "আমার গরুকে না ঠাণ্ডা করে আমি যেতে পারি না। পরশু আমি এখান থেকে যাব।" তবেইত বিপদ! অন্য গাড়ী করিতে হইলে নিয়মানুসারে আগেই ভাড়াটী দিতে হয়; ভীমেন্দ্র টাকা কোথায় পাইবে? তখন সে গাড়োয়ানের নিকট বিদায় লইয়া খানিকটা দূরে গিয়া ভাবিতে বসিল। রগুলপুরের বাজার দেখিলে বোধ হয় যেন রগুলপুর খুব একটা প্রকাণ্ড গ্রাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সেই গ্রামে সপ্তাহের মধ্যে দুদিন হাট বসে, নানা স্থান হইতে নানারূপ দ্রব্যের আমদানি এবং এবং অনেক লোকের জনতা হয়; এই জন্য বাজারটি খুব বড়। ফলতঃ রগুলপুর একখানি ক্ষুদ্র-গ্রাম। তাহাতে চাষা, জেলে, ইত্যাদি জাতি ভিন্ন অন্য জাতির বাস নাই। ভীমেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, কি ভাবিল তাহা ভীমেন্দ্রই জানে; বোধ হয় কলিকাতা হইতে মামার বাড়ীতে যাত্রা এইখান হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথাই ভীমেন্দ্রের মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামে অপরিচিত একটী লোক আসিয়াছে, ভীমেন্দ্রের আসিবার অল্পকালের মধ্যেই এই সংবাদ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। তখন গ্রামের প্রাচীনলোকেরা ৪।৫ জন ভীমেন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন ভীমেন্দ্র মাথায় [illegible]বিতেছে; দেখিয়াই তাঁহারা খানিক-[illegible] দাঁড়াইলেন। রগুলপুরের দরিদ্র [illegible]কে 'তিনি' 'তাঁহারা' এরূপভাবে উল্লেখ করিতেছি কেন, জানিতে চাও? ইহাঁদের মত ভদ্র, নিরহঙ্কারী, নির্ব্বিবাদী, সহজ-সন্তুষ্ট লোক আমি আর দেখি নাই। রগুলপুরের চাষাদের সহিত যে একবার আলাপ করিয়াছে সেই তাঁহাদের গুণের প্রশংসা করিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন ধর্ম্ম, সৎভাব, প্রভৃতি কেবল বড়লোকের মধ্যেই দেখা যায়, তাঁহাদিগের যে অত্যন্ত ভুল, রগুলপুরের চাষাদের জীবন দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ইনি ভদ্র, উনি অভদ্র, এরূপ প্রভেদ যদি কেবল বংশেতেই হইত, তাহা হইলে এই চাষাদের মান্য করিতাম না। আমি ভদ্রবংশে এরূপ ছোট-লোক দেখিয়াছি, যাহাদিগকে 'তুই' বলিয়া কথা বলিতেও ঘৃণা বোধ হয়; আর রগুলপুরের ঐ যে ৫ জন চাষা ভীমেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, উহাঁদের পবিত্র জীবন দেখিয়া উহাঁদের প্রতি ভক্তি না দিয়া কি থাকিতে পারা যায়? পাঠক! তুমি যদি নীচবংশে জন্মিয়া থাক, লজ্জিত হইও না—রগুলপুরের এই চাষাদের মত হও; আমি তোমাকে ভদ্র বলিব। আর যদি ভদ্রবংশে জন্মিয়া ভদ্রোচিত গুণ না পাইয়া থাক, তবে তোমাকে ছোট লোক ভিন্ন কি বলিব?

বদন জেলে, কেরামতালি চাষা, হারাণ কামার, জগন্নাথ তেলী এবং ভগীরথ নাপিত সেই গ্রামের মধ্যে প্রধান লোক বলিয়া পরিচিত।—ইহাঁদের কার্য্যদক্ষতা এবং ধর্ম্মভয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহাঁদের দ্বারা আপনাদের আবশ্যকীয় কাজ করাইয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলতঃ এই সকল "ছোট লোকেরা" তাহাদের সৎচরিত্র এবং পরিশ্রমী হস্তের গুণে মহাসুখে কাল কাটাইতেছিল। তুমি বিদ্বান, তুমি হয়ত নিজের বিদ্যায় মনে মনে অহঙ্কৃত হইয়া আমার এইরূপ বর্ণনায় হাস্য করিবে, কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলিয়া রাখি—লেখা পড়া শিখিয়া বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশের প্রশংসা-ভাজন হও, তাহাতে দুঃখ কি?

কিন্তু যদি সৎচরিত্র এবং শ্রমশীলতা এই দুটী জিনিশের তোমার অভাব হয়, যদি যথেচ্ছাচারকে এবং আলস্যকে তোমার অঙ্গের ভূষণ করিয়া থাক, যদি উদরান্নের জন্য শারীরিক পরিশ্রমকে তুমি ছোটলোকের কাজ মনে করিয়া তাহা হইতে বিরত থাক, তাহা হইলে তোমার বিদ্যা তোমার সুখের কারণ না হইয়া, গলগ্রহ মাত্র হইয়া উঠিবে।

ভীমেন্দ্র খানিকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া দেখিল কয়েকজন প্রাচীন লোক কাছে দাঁড়াইয়া আছেন; ভীমেন্দ্র কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না; ভীমেন্দ্র অপরিচিত লোকের চাউনি সহ্য করিতে পারিত না; একবার ভাবিল অন্যত্র চলিয়া যাই, আবার কি ভাবিয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল। তখন হারাণ কামার এবং ভগীরথ নাপিত একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন। অনন্তর উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া, হারাণ কামার ভীমেন্দ্রের নাম, বয়স, অবস্থা, সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীমেন্দ্র নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলিল। বুড়ো কেরামতালি এই দুঃখের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আল্লা কখন কাকে কোন্ দুঃখে ফেলেন, তা তিনিই জানেন।— সে বার মক্‌বুলালির ছেলে খেতাবদিন যে কোথায় গেল, আর তাকে পাওয়া গেল না। হয়ত মারা পড়েছে। আল্লাতালা আমাদের বুড়োদের না নিয়ে ছেলেদের কেন যে নেন তা বুঝি না।" এই কথা বলিতে বলিতে কেরামত ছুটিয়া আসিয়া ভীমেন্দ্রকে বলিলেন "বাবা! এস আমাদের বাড়ীতে কি যেখানে খুশি, এস—এখানে তুমি ছেলেমানুষ পড়ে থাক্‌লে আমরা বুড়ো মানুষ কোন্ প্রাণে ঘরে যাই?" সেই বুড়োদের মধ্যে কে ভীমেন্দ্রকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবে, এই লইয়া বাদানুবাদ হইল। অবশেষে স্থির হইল, ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের বাড়ীতেই থাকিবে। সকলে আসিয়া তাহাকে রোজ দেখিয়া যাইবে, এবং হাটের দিন বাবুরা আসিলে ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবে। 'বাবুরা' এ কথার অর্থ এই যে রশুলপুরের বাজার যাঁহার সম্পত্তি, প্রতি হাটবারে তাঁহার দুজন প্রধান কর্ম্মচারী সকলরূপ গোলমাল নিবারণের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকেন। ইঁহারাই 'বাবুরা' এই নামে পরিচিত। এইরূপ স্থির হইলে অসহায় ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের সহিত তাঁহার বাড়ীতে গেল। অন্যান্য চাষারাও আপন আপন কর্ম্মে গেল। ক্রমশঃ—

গিল্‌ফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র-যাত্রা।

তোমরা— 'ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্'কোথায় জান? পৃথিবীর মান চিত্রের বাঁ ধারের গোলাকারটির নাম নূতন মহাদ্বীপ। নূতন মহাদ্বীপের বড় দেশটা আমেরিকা। আমেরিকার মাঝখানটা খুব সরু; দেখিতে দুইটী দেশের মত দেখায়। এই দুইটীর উপরেরটীর নাম উত্তর আমেরিকা আর নীচেরটীর নাম দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর আমেরিকার যত দেশ, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ তার মধ্যে সকলের বড়!

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে গিল্‌ফয় সাহেবের বাড়ী। গিল্‌ফয় সাহেব বড় মজার লোক। বয়স ৩৩ বৎসর হইবে। সাহেব এই বয়সটা প্রায় জাহাজে থাকিয়াই কাটাইয়াছেন। জাহাজে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছেন, কত তামাসা দেখিয়াছেন, কিন্তু একা ছোট নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর পার হন নাই, এই দুঃখে সাহেবের আর মন ঠাণ্ডা হয় না। ছুতোরকে বলিলেন 'আমাকে একখানা নৌকা গড়িয়া দাও'। ছুতোর তাহাই করিল। নৌকা দীর্ঘে ১২ হাত, চওড়ায় ৪ হাত, আর উঁচুতে ২ হাত হইল। ৫৫ মোন জিনিস ধরে। নাম রাখিলেন পাসিফিক্। সাহেব বলিলেন জলবিহার করিয়া করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যাইব। [illegible] লিয়া আমেরিকা হইতে প্রায় ৬০০০ মাইল দূ[illegible]

পাঁচ মাসের আন্দাজ খাদ্য সামগ্রী নৌকায় উঠান হইল। ১৮৮২ সালের ১৯এ আগষ্ট গিল্‌ফয় সাহেব যাত্রা করিলেন। প্রথম সপ্তাহ বেশ স্থখে স্থখে গেলেন—তবে নৌকা বড় নীচু বলিয়া জল ছিটিয়া খাবার জিনিশ গুলি ভিজাইয়া দিতে লাগিল,—এই একটু অস্থবিধা। এর পর প্রায় একমাস পর্য্যন্ত কোন দিন বাতাস পান কোন দিন বা বাতাস থাকেই না; আর দলে দলে মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ আসিয়া নৌকা ঘিরিয়া তামাসা দেখে। বাতাস নাই, পথ এগোয় না; খাবার জিনিশও বেশী নাই; সাহেব দেখিলেন অত বেশী খাইলে চলিবে না। এক যায়গায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই সময়ে সাহেবের ক্ষুধা হ্রাস হইয়া উঠিল। বেশী খাইতে পারেন না—স্থবিধার বিষয়ই হইল। ভোর হইবার পূর্ব্বে ৩।৪ ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস ছিল, কিন্তু নৌকার নীচে কিসে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। সাহেব দেখিলেন হাঙ্গরের তাড়ায় ছোট ছোট মাছ আসিয়া নৌকায় ঠেকে—তাহাতেই এই শব্দ হয়। তিনি হাঙ্গর তাড়াইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তোমরা অনেকে বোটের মাঝিদের হাতে এক রকমের লগী দেখিয়াছ, তাহার মাথায় লোহার একটা বড়ষির মত লাগান থাকে। সাহেবের এর একটা ছিল। তিনি তাহার অগ্রভাগটা সোজা করিয়া লইলেন। এই অস্ত্র হাতে করিয়া তিনি হাল ধরিতে বসিতেন আর হাঙ্গর কাছে আসিলেই স্থট করিয়া ঘা মারিতেন। হাঙ্গরগুলি ভয় পাইল, তিনি যতক্ষণ বাহিরে বসিয়া থাকিতেন ততক্ষণ আর কাছে আসিতে সাহস পাইত না। ঘুমাইবার সময় একটা পিরাণ তাঁহার বসিবার যায়গায় লট্‌কাইয়া রাখিতেন; ...হাঙ্গরগুলি মনে করিত মানুষটাই বুঝি ...হিয়াছে; স্থতরাং ঠক্ ঠকি থামিল।

১০ই নবেম্বর একখানা জাহাজ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিয়া লইলেন। তার পর কয়েক দিন এত বাতাস পাইয়াছিলেন যে এক দিন প্রায় ১০৬ মাইল গিয়াছিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর, ঝড় তুফানের দিন; একটা বড় ঢেউ আসিয়া তাঁহার নৌকাখানি উল্টাইয়া ফেলিল। সাহেব সাঁতরিয়া নৌকার পাশ দিয়া গেলেন, এবং নঙ্গরের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে এক ঘন্টায় নৌকাটীকে সোজা করিলেন। জল সেঁচিতে গিয়া তিনি কিছু বেশী হুড়ো হুড়ি করিতে লাগিলেন—নৌকা খানি আবার উল্টিয়া গেল। দ্বিতীয় বার নৌকা সোজা করিতে তত কষ্ট বোধ হইল না; এবার খুব সাবধান হইয়া জল সেঁচিলেন। এই গোলমালে সাহেবের ঘড়ি এবং কম্পাস হারাইয়া গেল। কিছু কাল পরে একটা কিরিচ মাছ আসিয়া নৌকার গায় ছিদ্র করিয়া দিয়া গেল। সাহেব তখন টের পাইলেন না। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন নৌকায় জল উঠিয়া জিনিশপত্র ভাসিতেছে, তখন চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি ছিদ্র বন্ধ করিলেন।

নূতন বৎসর আসিল। ৭ই জানুয়ারি একটী পাখী উড়িয়া নৌকায় আসিল, সাহেব তাহা ধরিয়া খাইলেন। ১১ই জানুয়ারি আর একটী পাখী ধরিলেন। কখন কখন দুই একটী "উড়ুক্কু" মাছ নৌকায় আসিয়া পড়িত তাহাও বিনা আপত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। ১৬ই তারিখ তাঁহার হালটী ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি আর একটী করিয়া লইলেন। ইহার পর আর এক দিন একটী পাখী ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ২১এ হইতে ক্ষুধায় তাঁহাকে রোগা করিতে লাগিল। নৌকার গায়ে যে সমস্ত শামুক ছিল তাহার বড় গুলি চুষিয়া খাইলেন। আর এক দিন গুলি করিয়া একটী পাখী মারিয়াছিলেন; কিন্তু জল হইতে উঠাইতে

পারিলেন না। ৩০এ একটি পাখী ধরিয়া দেশলাইএর আগুনে পোড়াইয়া খাইলেন। তার পর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার প্রতি মনোযোগ রহিল না। এক দিন হেট মস্তকে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিলেন—একটা জাহাজ! তিনি আনন্দে জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন; জাহাজের লোকেরাও দেখিতে পাইয়া জাহাজ ফিরাইল। জাহাজে উঠিয়াই কিছু খাবার চাহিলেন। খাবার শীঘ্রই আনা হইল; খাইয়া ঠাণ্ডা হইলে পর সমস্ত লোক তাঁহার ইতিহাস শুনিতে আসিল। তিনি নোট বহিতে সব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই বহি হইতে ইংরেজী পত্রিকায় এই গল্পটী ছাপা হইয়াছে।

শিশু-স্বাস্থ্য রক্ষা।

উপক্রমণিকা।

বালক বালিকাগণ! শরীর রক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাই তোমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই দুয়ের মধ্যে যেটীকে অবহেলা করিবে, তজ্জন্যই ইহার পর ক্লেশ পাইতে হইবে। যেমন বিদ্যা না শিখিলে চিরকাল অতি গরিবের দশায় কাটাইতে হইবে, তেমনি শারীরিক নিয়ম অবহেলা করিলে চিরকাল সকল সুখে বঞ্চিত থাকিবে। যিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই তোমাদের শরীর ও মন দুয়েরই চালনা করিতে বলিয়াছেন। যেমন পাঠশালায় উত্তম পড়া বলিতে পারিলে তোমাদের মনে আনন্দ হয়, সেইরূপ কোন নির্দ্দোষ শারীরিক খেলায় খুব ভাল হইতে পারিলেও মনে অতিশয় আমোদ উপস্থিত হয় এবং কোন রূপ পরিতাপ হয় না, বরং শরীরে ও মনে অতিশয় স্ফূর্ত্তিই হইয়া থাকে। এই যে আনন্দ ও মনের স্ফূর্ত্তি, ইহাতে এই কথাই প্রমাণ হইতেছে যে শরীরের চালনা করাও ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

সুতরাং শরীর ও মন ইহার কিছুরই অবহেলা করিওনা। যদি বিদ্বান ও ধনী হইতে চাও, প্রতি দিন শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। এই দুয়েরই এক সঙ্গে উন্নতি করিলে তোমরা চিরকাল সুখী হইবে। তোমরা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছ, যে তোমাদের দেশের অনেক সুশিক্ষিত যুবক কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবার অপরাধে কেহ বা অল্প বয়সে মরিয়া গিয়াছেন এবং কেহ বা চিরকাল রোগে সারা হইতেছেন। আমি অনেককে জানি যাঁহারা কালেজ হইতে বাহির হইয়া বা তৎপূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছেন; সুতরাং শিক্ষাদ্বারা তাঁহার কি তাঁহার পিতা মাতার কি ফল লাভ হইল, দেশেরই বা কি উপকার হইল? [illegible] জন্য বলিতেছি, তোমরা যাহাতে শরীর [illegible] উভয়েরই মঙ্গল সাধন করিতে পার, উভ[illegible] উন্নত করিতে পার, এরূপ চেষ্টা করিবে। (ক্রমশঃ)

মণিরামের 'কাহিনী।'

বিনোদ বাবুর বাড়ীতে আজ সকলেই দুঃখিত। বিনোদ বাবুর মেয়ে হিরণ্ময়ী আজ মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে; কর্ত্তা এবং গৃহিণীরও দুঃখ হইয়াছে তাঁহারাও নিশ্বাস ছাড়িতেছেন। বাড়ীর বাঘাকুকুর কি একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ছট ফট করিয়া খেউ খেউ শব্দে চারিদিকে ঘুরিতেছে, মেনী বিড়ালটা পর্য্যন্ত দুঃখে পড়িয়া শুইয়া রহিয়াছে; চাকর বাকর সকলেই 'আহা বেশ ছিল!' এই ব[illegible] দুঃখ করিতেছে; সকলেরই দুঃখ,—মণি[illegible] [illegible]কেন গিয়াছে।
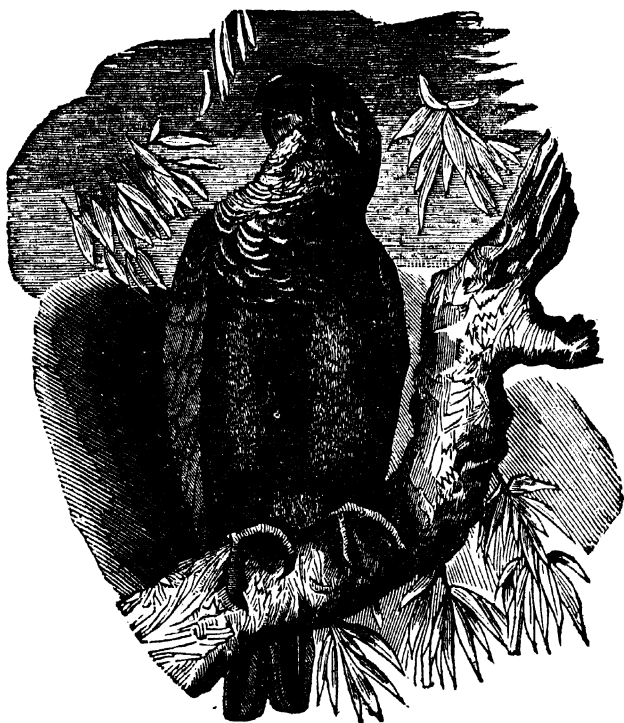
কিন্তু মণিরাম কে? কোন বালক? না বাড়ীর কোন আত্মীয় স্বজন,কেউ? না। তবে মণিরাম কে? মণিরাম একটী সুন্দর কাকাতুয়া পাখী। শাদা ধব ধব করিতেছে, মাথায় হল্‌দে ঝুটি। পাখীটী অনেক কেলে, বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তাহার কত গুণ! সে হাঁসের মত ক্যাঁ ক্যাঁ করিত, শিশুর ন্যায় কাঁদিত, বিড়ালের ন্যায় ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিত, কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিত, বালিকার ন্যায় হাসিত, বুড়োর ন্যায় কাশিত, "ওরে রামশশী" এই গান এবং এই রকম আরও অনেক গান গাইত, ফোঁৎ ফোঁৎ করিয়া নাক ঝাড়িত, ভয়ানক হাঁচি দিত, রেলের বাঁশীর শব্দ করিত, ... হিরণ্ময়ী ও কর্ত্তা এবং গৃহিণীর সঙ্গে মাঝে ... কাচুরী খেলিত।

... সকলের মধ্যে হিরণ্ময়ীর সঙ্গেই মণিরামের কিছু অধিক ভাব ছিল। হিরণ্ময়ীর বয়স ১৩। ১৪ বৎসর। দুঃখ কাহাকে বলে সে তাহা জানেনা; এক গাল পান চিবাইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া হাসিয়া হিরণ সমস্ত দিনই বাড়ীময় আমোদ করিয়া ফিরিত। মণিরামকে খাবার দিবার ভার হিরণের উপর ছিল। সে পাখীকে খাবার দিত, কখনও তাহার ধারাল ঠোঁটে চুমো খাইত, কখনও তাহার সহিত খেলা করিত এবং কখনও 'বাছা আমার' 'যাদু আমার' বলিয়া আদর করিত। এই সকল কারণে মণিরাম হিরণ্ময়ীর বড়ই বাধ্য ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া যে সে সকলেরই বাধ্য হইত তাহা নহে। যে একবার তাহাকে ত্যক্ত করিয়াছে মণিরাম কখনও তাহাকে ভাল বাসে নাই। মণিরামের অন্য ক্ষমতা বেশী থাক না থাক নষ্ট করিবার ক্ষমতাটী বেশ ছিল। যেখানেই

তাহাকে বসাইয়া রাখ সে কিছু না কিছু নষ্ট করিয়া বসিয়া আছে। প্রথমে পোষাপাখী বলিয়া মনিরামকে শিকলে বাঁধা হয় নাই, কিন্তু খোলা বেড়াইতে পাইয়া যখন সে বাড়ীঘরের ক্ষতি করিতে লাগিল, তখন তাহাকে পায়ে শিকল বাঁধিয়া রাখা হইতে লাগিল।

বিকাল বেলা তাহাকে অল্প সময়ের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আবার পায়ে শিকল পরিয়া, মনিরামকে সেই অবস্থাতেই সমস্ত রাত্রি রান্নাঘরে থাকিতে হইত। মনিরাম রান্নাঘরে একা থাকিতে ভাল বাসিতেন না, কাজেই যাই দেখিতেন সকলে তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, অমনি স্বুর চড়াইয়া, গলা কাঁপাইয়া বলিতেন "রান্নাঘরে কেও?—একাকিনী!"

বাড়ীতে যখন লোক জন আসিত তখন মনিরামের জাঁক দেখে কে! মনিরাম তখন মাথা উচু করিয়া, ঝুটি বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিত "হা! হা! কর্ত্তাকে চাই?" যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা সকলেই মনিরামকে আদর করিতেন—মনিরাম ও তাহাই চাহিত। যদি কখনও দেখিত যে অনেক লোক আসিয়াছে কিন্তু কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না, তাহা হইলে মনিরাম প্রথমে আস্তে, আস্তে, তার পরে একটু জোরে, তারপর আরও একটু জোরে, তার পর ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিত "আহা বেচারা! আহা বেচারা"; চীৎকার এত বেশী হইত যে এই জন্য মনিরামকে কখন কখন শাস্তি পাইতে হইয়াছে; কিন্তু অভ্যাস কোথায় যায়?

সে যাহা হউক দুই বৎসর পূর্ব্বে মনিরাম হিরণদের একটা মস্ত উপকার করিয়াছিল। একদিন দুপুর বেলা কর্ত্তা আফিসে গিয়াছেন, হিরণের মা কি একটু দরকারে পাড়ায় গিয়াছিলেন, হিরণ কোথায় কি তামাসা দেখিতে গিয়াছে, বাড়ীতে শুধু ঝি আর মনিরাম। এমন সময়ে এক চোর কিছু 'যোগাড়' দেখিবার আশায় চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকিয়া যায়; মনিরাম তাহা দেখিতে পাইল। অমনি সে বলিয়া উঠিল "রান্নাঘরে কেও? একাকিনী!" বেচারা চোর ভাবিল, বুঝি কেউ দেখিতে পাইয়াছে; তখন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল; পায়ের শব্দ শুনিয়া ঝি ছুটিয়া আসিল, তখন চোর ভায়া কি করেন? লজ্জার ভয়ে মার দৌড়! সেদিন মনিরামের আদর দেখে কে! সে দিন মনিরামের খাবারটা খুব ভালরকমেরই হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মনিরাম খুব কাশিতে পারিত। এক দিন মনিরাম বাগানে বসিয়া আছে এমন সময়ে বাগানের মালী সেই খানে কাজ করিতে আসিল। বেচারা বুড়োমালীর কাশির ব্যারাম ছিল; তাহাকে কাজ করিতে করিতে অনেক বার থামিয়া কাশিতে হইত। মালীর দু এক-বারের কাশির শব্দ শুনিয়াই মনিরামের মজা লাগিয়া গেল; মনিরাম ও তখন কাশিতে আরম্ভ করিল। মালী যত কাশে মনিরাম ও তত কাশে, মালী ভাবিল বুঝি কেহ ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু যখন দেখিল যে সে মনিরাম, অমনি রাগিয়া দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "উঃ গা—ধা! যদি সত্যি সত্যি কাশ হ'ত তবে টের পেতে।"

এমন আমুদে পাখীকে কে না ভাল বাসে? কিন্তু এই আমোদ আর অধিক দিন রহিল না। এক দিন খাঁচার মধ্যে মনিরামের মাথা ঢলিয়া পড়িল—মনিরামের ভয়ানক অসুখ হইয়াছিল। এই অসুখের মধ্যে ও হিরণের সাধের পাখী দুবার তিন বার "আহা বেচারা!" "আহা বেচারা!" বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল। কর্ত্তা কতবার তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিলেন, কত ঔষধ পত্র করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। [illegible] বয়সে মনিরাম মরিয়া গেল। হিরণ্ময়ী [illegible]

কাঁদিয়া চোখ্ ফুলাইয়া শেষে মুখ ভার করিয়া বসিল। কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বাড়ীর সকলেরই দুঃখ হইল। যাহাকে ভালবাসা যায় সে চলিয়া গেলে কাহার না মনে কষ্ট হয়?

প্রকৃতির শোভা।

১

আকাশে উঠেছে তারা
বাগানে ফুটেছে ফুল।
থোকা থোকা ফল ঝোলে
ডালে ডাকে পাখীকুল॥

২

নিশি করে ঝক্ মক্
নদী করে কুল কুল!
পুরাণ পুকুর পারে
ফুটেছে বকুল ফুল॥

৩

মাঠেতে করেছে শোভা
থোকা থোকা পাকাধান।
প্রহরী চাষার ছেলে
মনে সুখে করে গান॥

৪

সপ সপ বায়ু বয়
পাতা করে মর্ মর্।
ঝন্ ঝন্ ধান বাজে
হেলে দুলে নাচে খড়।

৫

আকাশে উঠিয়ে চাঁদ
আলোক করিছে দান।
পুলকেতে পৃথিবীর
হাসি হাসি মুখ খান॥

৬

আধঘুমে জেগে উঠে
চাষার কোলের ছেলে
মধুমাখা আধ বোলে
ডাকিতেছে মা মা বলে॥

৭

ঘন ঘন পেঁচা ডাকে
ভয়ে কাঁপে পাখীগণ।
বালক বালিকা বুড়ো
ঘুমে সব অচেতন॥

৮

কালি হবে বাকি পড়া
আজি পড়া রেখে দাও।
হয়েছে অনেক রাতি
বই রেখে ঘুম যাও॥

সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস।

"সখার" পাঠকেরা বোধ হয় প্রায় সকলেই বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাল করিয়া জানেন। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতার ছেলেদের তিনি কলিকাতার যুবকদলের মনে একটী গব আনিয়া দিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের আপনার যে একটা দেশ আছে, ইহা ভাল করিয়া বাঙ্গালী যুবকেরা জানিতেন না। মাতৃভূমির ঠিক অর্থ তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা অসাধারণ; এবং এই ক্ষমতাগুণে তিনি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য ভালবাসা জন্মাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজেরা আমাদের দেশ শাসন করেন; আমাদের আইন কানুন তাঁহারাই প্রস্তুত করেন; আমাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আমাদের টাকা তাঁহারাই আপনাদিগের ইচ্ছামত ব্যয় বা অপব্যয় করেন, আমাদিগের তাহাতে কোন হাত নাই। ইহাতে অনেক সময় দেশের ঘোর অনিষ্ট হয়। ভাল কাজে যে টাকার প্রয়োজন অনেক সময় মন্দ কাজে সে টাকা খরচ হয়। তার পর আমরা নিজেরা নিজেদের আইন কানুন তৈয়ার করিতে পারি না বলিয়াও অনেক সময় বিশেষ অনিষ্ট হয়। ইংরাজেরা বিদেশী লোক, ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র ও আমরা যে ভাবে থাই, থাকি তাঁহারা সে ভাবে খান, থাকেন না। কাজে কাজেই আমাদিগের যে কি দরকারী ও কি দরকারী নহে, ইহাঁরা সহজে তাহা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং আমাদের দরকার মত আইন কানুনও সব সময় তৈয়ার হয় না। তার পর দেশের বড় বড় কাজ যত— যাহাতে অধিক চিন্তা, অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন ও যাহাতে বেশী মাহিয়ানা পাওয়া যায়, তাহাও সবই প্রায় তাঁহাদের দখলে। ইংরাজেরা আমাদের দেশের উপকার করিয়াছেন; তাঁহারা দেশে আছেন বলিয়া এখনও আমাদের অনেক উপকার হইতেছে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের যতই চোখ্ ফুটিতেছে, যতই আমরা জ্ঞান ও শিক্ষা পাইতেছি ততই সমস্ত কাজ চালাবার ভার আমাদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এই সকল ভাব দেশের যুবকগণের ও জনসাধারণের মনে প্রধা-

নতঃ স্থুরেন্দ্র বাবুই গাঁথিয়া দিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এ কথা ভাবিতাম না; দশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের শাসন-কার্য্য যাহাতে ভাল হয়, অপর অপর জাতির মত যাহাতে আমরাও আমাদের নিজেদের হাতে আমাদের স্বদেশের শাসনভার পাইতে পারি, এবিষয়ে লোকের মনোযোগ প্রায় ছিল না বলিলেও হয়। স্থুরেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়া ও কাগজে লিখিয়া আমাদের এই কর্ত্তব্যভাব সজাগ করিয়াছেন। বিগত আট নয় বৎসর কাল তিনি প্রাণপণে আমাদের জন্য, তাঁহার স্বদেশের উপকারের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি আমাদের পরম বন্ধু; তিনি সমস্ত ভারত-বর্ষের পরম হিতৈষী। মাতৃভূমির দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে, ও দেশের নরনারীর ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সর্ব্বদা হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পান। ধন্য সেই ব্যক্তি যে আপনার মাতৃভূমির ও আপনার স্বজাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে ভয়ানক ক্লেশ পায়। দেশের জন্য যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে, সে পুণ্যবান। তাহার এই সামান্য এক এক ফোঁটা চোখের জল স্বর্গে ভগবানের নিকটে মুক্তা-ফলের মত শোভা পাইয়া থাকে!

বেঙ্গালী নামক একখানি অতি স্থুন্দর ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আছে। স্থুরেন্দ্র বাবু এই পত্রের সম্পাদক। কিছু দিন হইল ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনি-য়ান নামক আর একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের নামে কয়েকটী কথা লেখা হয়। নরিস সাহেব আজ প্রায় নয় মাস হইল এ দেশে আসিয়াছেন। প্রথমে লোকে তাঁহার একটীভাল কাজ দেখিয়া বড়ই সুখী হয়। চৌরঙ্গীর রাস্তায় তিনি এক দিন গাড়ীতে যাইতে-ছিলেন; এমন সময়ে আর এক জন সাহেবের গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া একটী বৃদ্ধা মেয়েমানুষ আহত হয়; সাহেব তাহার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না; সাঁ সাঁ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলেন; নরিস সাহেবের প্রাণে আঘাত লাগিল। নিষ্ঠুর-হৃদয় সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জোরে গাড়ী চালাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এই হতভাগ্য স্ত্রীলোকটীকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া কি আপনার উচিত নয়?" নিষ্ঠুর সাহেব বলিয়া উঠিল,—"এদেশের সাহেবদের গাড়ীর চাপে কোনও দেশীয় লোক পড়িলে, তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার নিয়ম নাই।"—উচ্চমনা নরিস এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। নিজে গাড়ী করিয়া বৃদ্ধাকে হাঁস-পাতালে পাঠাইয়া দিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া দেশ-শুদ্ধ লোক আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল। কিন্তু এ দেশে আসিয়া সাহেবেরা অনেক দিন ভাল থাকিতে পারেন না। নরিসেরও স্বভাব উল্টাইতে লাগিল। তিনি দেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগের উপর অপমান অত্যাচারও করিতে আরম্ভ করিলেন। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান" পত্রে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দার কথা বাহির হইল। স্থুরেন্দ্র বাবু তাঁহার বেঙ্গালী পত্রে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ানের লিখিত একটী প্রবন্ধ তুলিয়া দেন। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান" লিখিয়াছেন যে নরিস সাহেব জোর করিয়া হিন্দুদের দেবতা শাল-গ্রাম ঠাকুরকে খোলা কাচারিতে আনিয়াছেন। স্থুরেন্দ্র বাবু এই কথা উপলক্ষ করিয়া নরিস সাহেব হাইকোর্টের জজিয়তির উপযুক্ত নন, এ কথা বলেন; বহুদিন হইল বিলাতে জেফ্রিজ নামে অতি-শয় অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী এক জন বিচারক ছিলেন; স্থুরেন্দ্র বাবু এই প্রবন্ধে নরিস সাহেবের অত্যাচার, অবিচারের কথা বলিবার সময় এই জেফ্রিজ ও তাঁহারই মতন অত্যন্ত অধর্ম্মপরায়ণ স্ক্রগ্স নামে অন্য এক জন জজের নাম ক[illegible] "ইংলিশম্যান" নামে ইংরাজদের একখানা

কাগজ আছে। এই খবরের কাগজ চিরকালটা বাঙ্গালীদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া কাটাইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর উপরি উক্ত লেখাটী নকল করিয়া "ইংলিশম্যান" পত্র লেখেন যে এতদ্দারা হাইকোর্টের অপমান করা হইয়াছে। জজ নরিসের ইংলিশম্যানের কথা পড়িয়া মনে হইল,--"তাইত!" আর অমনি তিনি বেঙ্গালী পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবু ও ঐ পত্রের ছাপাওয়ালা বাবু রামকুমার দের উপর সমন অর্থাৎ আদালতে আসিবার হুকুম জারি করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু সমন পাইয়াই, হাইকোর্টে আসেন, এবং তথায় জানিতে পান যে ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়ান শালগ্রাম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য নহে। অর্থাৎ জজ নরিস জোর করিয়া শালগ্রাম আনেন নাই। কিন্তু উভয় পক্ষের সম্মতি লইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামতেই তিনি হিন্দুদের একজন দেবতাকে হাইকোর্টের বারান্দায় আনিয়া উপস্থিত করেন। পর দিন প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব, নরিস সাহেব ও অপর দুইজন ইংরাজ জজ ও আমাদের দেশের রত্ন জজ রমেশচন্দ্র মিত্রকে লইয়া সুরেন্দ্র বাবুর বিচার করিতে বসেন। সুরেন্দ্র বাবুকে লোকে এত ভাল বাসে, ও এই বিচার কিরূপ হইবে সে বিষয়ে লোকের এত উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে বিচারের দিন হাইকোর্টের গার্থ সাহেবের এজলাসে, বারান্দায়, উঠানে পর্য্যন্ত তিল ফেলিবার স্থান ছিল না। কেবল হাইকোর্টের প্রকাণ্ড বাড়িটী যে লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহা নহে; বাহিরের রাস্তায়, ও পাশের মাঠে পর্য্যন্ত হাজার হাজার লোক জড় হইয়াছিল।

কোনও বিষয়ে ভুল হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহা অবিলম্বে স্বীকার করা ও তৎক্ষণাৎ তাহা শোধরাইবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে সত্যপ্রিয়তা প্রকাশ পায়; ইহাদ্বারা চরিত্রের মাহাত্ম্য হয়। যথার্থ বীরত্বের লক্ষণই এই। সুরেন্দ্র ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়নের যে কথা সত্য বলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ঠিক সত্য নহে জানিতে পারিয়া, আপনার ভুল স্বীকার করিলেন। এবং ভুল-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জজ নরিসের প্রতি যে কটু কথা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্যও দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই রূপ ভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা হাইকোর্টের নাই; এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন। তবে ক্ষমতা আছে কি না এ বিষয় ভাল করিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে হইলে অনেক আইন কানুন, অনেক নজির ও অনেক খাতা পত্র খুঁজিতে হইবে; সুতরাং তিনি জজদিগের নিকট কিছুকালের জন্য তাঁহার মোকদ্দমা মুলতবি অর্থাৎ থামাইয়া রাখিতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি যে বারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি সুরেন্দ্র বাবুর এই প্রার্থনায় দুকথা বলা উচিত বোধ করিলেন না। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে বেশি কিছু বলিলেন না। জজেরা এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন,—ও পরদিন সুরেন্দ্র বাবুকে বিনা পরিশ্রমে দুইমাস কাল প্রেসীডেন্সী জেলে (হরিণবাড়ীতে) কয়েদ থাকিতে হুকুম দিলেন।

এই কারণেই আজ আমাদের প্রিয় সুরেন্দ্র বাবু কারাগারে। "সখা" বালক বালিকাদিগের পত্র, তাঁহার আইন কানুন লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সুরেন্দ্র বাবু অন্যায় করিয়াছেন কি না, হাইকোর্টের তাঁহাকে এই রূপ শাস্তি দিবার অধিকার আছে কি না, অথবা যে দোষে কিছুদিন পূর্ব্বে এই হাইকোর্টেই ইংরাজ টেইলর সাহেবের কেবল জরিমানা হইয়াছিল, ও ইংলিশম্যান পত্রের সম্পাদক-সাহেব ক্ষমা চাহিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে বাঙ্গালী সুরেন্দ্র নাথের দুইমাস কারাদণ্ড ন্যায় হইয়াছে কি অন্যায় হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু দেশের হিতৈষী, সুরেন্দ্র বাবু ছেলেদের—'সখা'র অনেক পাঠকের—শিক্ষক, তাই সুরেন্দ্র বাবুর অপমানে আমরা দুঃখিত হইয়াছি;

সুরেন্দ্র বাবুর অবমাননায় সমস্ত বাঙ্গালা অবমানিত হইয়াছে, এ কথা বলিব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "আমরা সুরেন্দ্র বাবুর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।" তাঁহারা ভ্রান্ত। সুরেন্দ্র বাবুর আবার দুঃখ কি? আপনার কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যে কষ্ট পায় তাহার কি দুঃখ? দেশের উপকার করিতে গিয়া যাঁহার কষ্ট হয়, তাঁহার জন্য আমরা কাঁদিব কেন? সুরেন্দ্র বাবু পুণ্যবান, দেশের জন্য তিনি জেলে গিয়াছেন। তাঁহার আজ আনন্দের দিন, তাঁহার আজ গৌরব করিবার সময়। আমরা তাঁহার গৌরবে আপনাদিগের গৌরব হইল মনে করিতেছি। তাঁহার শাস্তিতে এই হতভাগা জাতির কাল মুক আজ উজ্জ্বল হইল! পাঠক! পাঠিকা! তোমার হতভাগ্য মাতৃভূমির জন্য এক ফোঁটা চক্ষুজল ফেলিতে শেখ! এক দিন তোমার দ্বারাও ভারতের কারাগার পবিত্র হইবে, এক দিন তোমার নিজের ক্লেশে দেশের দুর্গতি দূর হইবে; এক দিন তোমার গৌরবেও তোমার জাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে!

ঠাকুরদাদার গল্প।

একদিন বিকালে নবীন বাবু তাঁহার ছোট ছোট দৌহিত্র, পৌত্রগুলিকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলেন। গঙ্গার জল কেমন বায়ু বেগে নাচিতেছে, ছোট ছোট ঢেউ গুলি কেমন কল কল করিয়া তীরে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আবার ফিরিয়া যাইতেছে। সকলেই তথায় বসিয়া শোভা দেখিতে লাগিলেন। বালক বাবুদের তাহা ভাল লাগিল না। নলিন একটী প্রজাপতিকে ধরিতে ছুটিলেন, বিনয় জলে ঢিল ফেলিয়া মজা দেখিবেন বলিয়া ঢিলের সন্ধানে চলিলেন, কিশোরী ঠাকুরদাদার জুতা লইয়া দূরে পলায়ন করিল। নবীন বাবু বিনয়কে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা বল দেখি গঙ্গায় এত জল কোথা হইতে আসিল?" বিনয় বসিল, কিছু ক্ষণ ভাবিয়া বলিল "কেন, চির কালই ত আছে! আমি আর বছরে এসে ও দেখেছি গঙ্গায় ত এত জলই ছিল।" কিশোরী ও গল্প শুনিতে আসিয়া জুতা রাখিয়া বসিল, ক্রমে নলিন ও আসিয়া যুটিল—তাহারা গল্প বড় ভাল বাসে।

কিশোরী।—"আচ্ছা জল ত ক্রমাগতই চলিতেছে, এক বারও স্থির হয় না, তবে ফুরায় না কেন? এ কথাটী আজ আমাকে বুঝাইয়া দাও না।" নবীন বাবু।—"আমি ও সেই কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম, দেখি নলিন কি বলে।" নলিন বলিল "পিসী বলিয়াছেন গঙ্গা যে ঠাকুর, ঠাকুরের বুঝি আবার জল ফুরায়?" নবীন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "তবে মন দিয়া শুন। নলিনের পিসীর বাড়ীতে গঙ্গা আছে তোমরা জান। সে এই গঙ্গা, সেবার সেই যে তোমরা নৌকায় করিয়া সেখানে গিয়াছিলে।"

সকলে।—মনে আছে।

নবীন বাবু।—এখন বুঝিলে যদি কেহ ক্রমাগত উত্তর দিকে নৌকা করিয়া যায়, তবে গঙ্গার দুধারে কত গ্রাম, কত সহর, কত বন, কত পুরাতন ভাঙ্গা মন্দির, কত কত সুন্দর বাগান, কত বিস্তীর্ণ মাঠ, প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে যায়। ক্রমিক এক গ্রাম ছাড়াইয়া অন্য গ্রামে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে এই রূপে না থামিয়া যদি দিন রাত্রি চলে তথাপি ও এই গঙ্গা, এই রূপ স্রোত দেখিতে পায়।

বিনয়।—তবে কি গঙ্গার শেষ নাই?

কিশোরী।—তাও কিও কি কখন হয় [illegible] শেষ আছে।

নবীন বাবু।—শেষ আছে, আমরা কিন্তু গোড়ারদিকে দেখিতেছি, গঙ্গার উৎপত্তি কোথা?

কিশোরী—কেন? হিমালয় পর্ব্বতে, আমারা ত পড়িয়াছি?

নবীঃ—ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু উহা যে কি রূপ পদার্থ তাহা বোধ হয় জাননা। এই রূপে অনবরত চলিতে চলিতে ক্রমে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ক্রোশ দূরে হরিদ্বার নামে একটী স্থান আছে।

নলিন—হাঁ হাঁ আমি জানি—মা বলেন 'হরিদ্বার গঙ্গাসাগর' তাই?

নবীঃ—হাঁ। সেই হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা অতিশয় কম চওড়া। তারও পরে আরও সরু। তার পরে সেই হিমালয় পর্ব্বতের গা বহিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া পড়ে, তাহার নাম প্রস্রবণ বা ঝরণা। এখন বুঝিলে যে সেই ঝরণার জল ক্রমে একত্র হইয়া গঙ্গা হইয়াছে। এ জন্য হরিদ্বার এত সরু। ক্রমে যত নীচে আসে, অন্য অন্য সব ঝরণার জল ও সেই রূপে আসিয়া ইহার সঙ্গে মিশে; অন্য অন্য ছোট ছোট নদী আবার ইহাতে পড়ে, তাদের উপনদী বলে।

কিশোঃ—হাঁ, আমি জানি, যেমন যমুনা, শোণ, গণ্ডকী, বাঘমতী, কুশী। না দাদা?

নবীঃ—হাঁ ঠিক বলিয়াছ। এই সকল উপনদীর জলও সেই প্রকার ঝরণা হইতে আসে। ক্রমে ক্রমে গঙ্গা যত নীচে আসিয়াছে ততই অনেক উপনদী আসিয়া ইহাতে মিলিয়াছে ও ততই অধিক চওড়া হইয়াছে। যে দিকটা বেশী নীচু জল সেই দিকেই চলে, এজন্য গঙ্গা ক্রমে পর্ব্বত থেকে আসিতে আসিতে নীচে চলিয়াছে। যদি স্রোতের সঙ্গে বরাবর যাওয়া যায়, তবে শেষে এমন একটা স্থানে উপস্থিত হইব, যেখানে কোন দিকেই কূল কিনারা দেখা যায় না যাকেই অকূল জল ধূ ধূ করিতেছে, বড় বড় ঢেউ সকল উচুঁ হইয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে, জল মুখে দিবার যো নাই, বিকট লোণা।

কিশোঃ—সেই বুঝি সমুদ্র?

নবীন—হাঁ তার নাম গঙ্গাসাগর। এইখানে গঙ্গা বঙ্গ উপসাগরে পড়িয়াছে। এইখানে গঙ্গা ও সাগরে মিশিয়াছে বলিয়া ইহার নাম গঙ্গাসাগর। এই স্থানেই গঙ্গার যত জল সব হুহু শব্দে পড়িতেছে। চিরকালই গঙ্গার জল এই ৫০০ ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়া এখানে আসিয়া পড়ে। তুমি যদি আজ এখানে একটী বস্তু জলে ভাসাইয়া দাও, তবে উহা ভাসিতে ভাসিতে সেই গঙ্গাসাগরে গিয়া পড়িবে।

বিনঃ—দেখ দাদা, আমাদের খিড়কীর পুকুরের মোন দিয়া সেদিন বৃষ্টির পর যে জল চলেছিল তাতেও ঠিক এমনি মজা করেছিলাম। আমি একটা কচুরপাতা ছিঁড়িয়া দিলাম, পাতাটা ভাসিতে ভাসিতে পুকুরে পড়িল—সেখানে জল হুড় মুড় করিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তার পর দিন সকালে গিয়া আর খানায় জল দেখিতে পাইলাম না, বড় দুঃখ হল কিন্তু।

নবী ঃ—ঠিক এও সেইরূপ; গঙ্গা মনে কর সেই রূপ একটা খুব বড় খানা, আর সাগর একটা প্রকাণ্ড পুকুর। গঙ্গার সব জলই সাগরে গিয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি গঙ্গার জল ফুরায় না; কেন বলিব? বর্ষাকালে যে বৃষ্টি হয়, সে সমস্ত জল কোথা যায়? তার কতক পুকুরে ও অন্যান্য জলাশয়ে পড়ে, কতক বড় বড় খাল দিয়া গঙ্গায় পড়ে, কতক মাটিতে শুষিয়া যায়। এইরূপে বৃষ্টির জলের অধিকাংশ গঙ্গা ও পরে গিয়া সমুদ্রে পড়ে। এখন দেখিলে গঙ্গার জল কোথা কোথা হইতে আসে, সর্ব্ব প্রথমে হিমালয় পর্ব্বতের ঝরণাগুলি হইতে, পরে উপনদী হইতে, ও বৃষ্টির জল হইতে।

নলিন—ঝরণার জল কোথা থেকে আসে?

নবীঃ—বলিতেছি শুন। ঐ পর্ব্বত প্রায় ৫০০।৬০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের উত্তর দিক ব্যাপিয়া আছে। আর উহা পৃথিবীর অন্য সকল পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ—এমন কি প্রায় ১০০০টী নারিকেল গাছ উপরি উপরি রাখিলে যত উচ্চ হয় তত। আর একটী নিয়ম আছে জান যে যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক। তবে মনে কর, পর্ব্বতের উপরে কত শীতল। ভয়ানক শীত, এত শীত যে সেখানে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। এখন দেখ গ্রীষ্ম কালে দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমাগত বায়ু বহে, সেই বায়ু গিয়া হিমালয় পর্ব্বতে ধাক্কা লাগে। আমাদের দেশের দক্ষিণ দিকে,ভারত মহাসাগর,এই মহাসমুদ্র হইতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া উঠে, ঐ সকল সূক্ষ্ম জল কণাকে মেঘ বলে.ঐ মেঘ বায়ু অপেক্ষা হাল্কা এজন্য উহা বায়ুতে ভাসিতে থাকে। সুতরাং যখন বায়ু স্থির ভাবে থাকে তখন মেঘ ও নিশ্চল হইয়া থাকে, আর যখন বায়ু কোন দিকে বহে, তখন বায়ুতে ভাসিতে ভাসিতে মেঘরাশি ও সেই দিকে চলে ; বুঝিতে পারিতেছ না ?

নলিন—দাদা ! মেঘেরাত শালপাতা খাইবার জন্য চলে ? কেশব বলেছিল !

কিশোঃ—না না, সে সকল কথা শুনিও না। কেন আমরাত প্রথম সংখ্যার 'সখা'তে পড়িয়াছি "মেঘ সূক্ষ্ম জলকণা বৈ আর কিছুই নহে।"

নবীঃ—সত্যইত ! তোমার বুঝি 'সখা' মন দিয়া পড়না ? এখন শোন। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-সাগর হইতে রাশি রাশি মেঘ বায়ুবেগে উত্তরদিকে চালিত হইয়া অবশেষে ঐ হিমালয় পর্ব্বতের গায়ে গিয়া ঠেকিয়া যায়, কেন না মেঘেরা অধিক উচ্চ দিয়া যায় না,—প্রায় আধ ক্রোশ, এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ উপর দিয়া যায়, কিন্তু হিমালয় প্রায় ২৷৷০ আড়াই ক্রোশ উচ্চ। সুতরাং ঐ সমস্ত মেঘ গিয়া ভয়ানক শীতল পর্ব্বত-শৃঙ্গে আটকায় ও প্রচণ্ড শীতে জমিয়া তৎক্ষণাৎ বরফ হইয়া যায়। এই কারণে অতি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়াগুলি সুন্দর শুভ্রবর্ণে শোভিত, চিরকালই ধপ্ ধপ্ করে। ভাল ; এই বরফ-রাশি ক্রমেই স্তূপাকার হইয়া পর্ব্বতের চূড়া ঢাকিয়া ফেলে। দিবাভাগে রৌদ্রে কতক গলিয়া যায়, কিন্তু সে এত অল্প যে তাহাতে ঐ স্তূপের কিছুই হ্রাস হয় না। আবার নূতন বরফ জমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এই বরফ অনেক অধিক গলে ও পর্ব্বতের গা বহিয়া পড়ে—ইহাই নির্ঝর। আর এক প্রকারে নির্ঝরের উৎপত্তি হয়। যে সকল মেঘ কিছু নীচে গিয়া লাগে, যেখানে শীত কিছু অল্প, তাহারা তত জমিতে পায় না, বৃষ্টি হইয়া পড়ে। এ বৃষ্টিও বড় কম নয়, খুব বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল অল্পে অল্পে পর্ব্বতের গা বহিয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে ২১৫ টী স্রোত একত্র হইয়া একটী নির্ঝর হয়। কিন্তু এ ঝরণাগুলি কেবল বর্ষাকালেই দেখা দেয়, তদ্ভিন্ন বরফজাত যে গুলি সেগুলি বারমাস থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাদের বলবৃদ্ধি হয়।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, এই যে গঙ্গার জল হুড় হুড় কুল কুল করিয়া সতেজে চলিতেছে, কোথায় ?—সমুদ্রে। আবার গ্রীষ্মকালে এই জলরাশি বাষ্পরূপে আকাশে উঠিবে,বায়ু অমনি পাল্কীবেহারা হইয়া ইহাদিগকে হিমালয় পর্ব্বতে লইয়া যাইবে, ইহারা যাইয়া কতক বৃষ্টি হইয়া নূতন ঝরণা প্রস্তুত করিবে, কতক জমিয়া বরফ কণা হইবে, ও ধীরে ধীরে রৌদ্রতাপে গলিয়া গিয়া পর্ব্বত বহিয়া নীচে নামিবে। সুতরাং নির্ঝর দুই প্রকার—বর্ষাকালীন ও চিরস্থায়ী। প্রথম গুলি বৃষ্টির জলে জন্মে, দ্বিতীয় গুলি অনবরত বরফ গলিয়া জন্মে। এই দুই প্রকার নির্ঝরই নদীর জলের মূল। সুতরাং দেখা যায়, যে সকল নদীর জল প্রথম প্রকার নির্ঝরের উপর নির্ভর করে তাহারা কেবল বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য [illegible] শুকাইয়া যায়।

কিশোঃ—দাদা আমি কাকার সঙ্গে পাটনা যাবার সময়ে রেলের নীচে সে বার কত নদী দেখেছিলাম; তাতে জল নাই, কেবল সব বালি পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহারা গঙ্গার অপেক্ষা ছোট।

নবী :—হাঁ সে সকল নদী প্রায়ই ছোট হয়। আর যে সকল নদীর জল দ্বিতীয় প্রকার প্রস্রবণের উপর নির্ভর করে তাহাদের বার মাস জল থাকে, তবে বর্ষাকালে তাহাদের জল বাড়ে (যেমন গঙ্গার) আবার শীতকালে কমিয়া যায়। কেন না বর্ষাকালে অনেক অধিক বরফ গলে ও অনেক জল দেশগুলির উপর দিয়া আসিয়া নদীতে পড়ে। সুতরাং তখন জল বাড়ে। শীতকালে কেবল বরফের উপর নির্ভর, তাও আবার কম গলে; সুতরাং জল কমিয়া যায়; কিন্তু একেবারে শুষ্ক হয় না কেন না তখনও বরফ গলে, এবং আর একটী কারণ আছে। সেটী এই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃষ্টির যে জল মাটীতে পড়ে তাহার কিছু পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে। সে জলটা কোথা যায়? তোমরা আশ্চর্য্য হইবে, সে সমস্ত জলই প্রায় আবার নদীতে আসিয়া পড়ে। জলের একটী গুণ এই যে তাহা নীচু দেখিলেই সেই দিকে ছোটে। সূক্ষ্ম বৃষ্টির কণাগুলি মৃত্তিকার সূক্ষ্ম ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে অলস বালকের ন্যায় ঘুমায়না—ক্রমাগত নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। নিকটে যদি কোন নদী থাকে তবে সত্বরেই তাহার গর্ভে প্রবেশ করে, নতুবা কিছু বিলম্বে ক্রমে ক্রমে আসিয়া অবশেষে পড়িবেই পড়িবে। কেন না মৃত্তিকার নিম্নে কিছু দূর খনন করিলে হয়ত এমন একটা স্থানে পৌছান যাইবে যে তাহার ভিতরে জল আর তেমন প্রবেশ করিতে পারেনা, সুতরাং সম্মুখে বাধা পাইয়া পার্শ্বদিকে গড়াইয়া যায় এবং অবশেষে নদীতে আসিয়া পড়ে। এই কারণে পতনের অনেককাল পরেও ঐ জলের কিয়দংশ [illegible]ার মধ্য দিয়া নদীতে উপস্থিত হয়; এই জন্যই গঙ্গাতে বর্ষার অনেক পরেও জল থাকে। কি শীত, কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই গঙ্গার জল দেখা যায়; তবে পূর্ব্বোক্ত কারণে বর্ষাকালে জল অধিক বৃদ্ধি পায়। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয় যে গঙ্গার জল কোথা হইতে আসে ও অনবরত চলিয়া ও ফুরায়না কেন?

নলিন—হাঁ দাদা, বেশ বুঝিয়াছি, আর আমি পিসীমার মিছা কথায় ভুলিব না। এখন অবধি আমার যে সন্দেহ হবে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।

বিনয়।—আজ বিকালে বেড়াইতে আসিয়া কেমন নূতন কথা সকল শিখিলাম, রোজ আসিব। আরও সকলকে ডাকিয়া আনিব।

কিশোঃ—সব বুঝিয়াছি, কিন্তু দাদা, তুমি যে বলিলে যত উপরে উঠা যায়, ততই শীত অধিক, এটী আমি বুঝিলাম না। উপরে আরও গ্রীষ্ম অধিক হওয়াই সম্ভব, কেননা সূর্য্যের যত নিকটে যাওয়া যায়, ততই উত্তাপ অধিক হওয়াই সম্ভব। তবে উপরে শীত এত অধিক কেন? এ বড় আশ্চর্য্য কথা, আমাকে বলিতে হইবে।

নবীঃ—আজ বড় রাত্রি হইয়া পড়িয়াছে, আর এক দিন বলিয়া দিব। আজ চল বাড়ী যাই, আজ যে নূতন বিষয় শেখা হইল তাহার জন্য পরমেশ্বরকে সকলে ধন্যবাদ দাও।

সে দিন সকলে বাটী গেলেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

অনেকে আপনাদের ইংরাজী বিদ্যা দেখাইবার জন্য আমাদিগকে Professor of Sakha, Secretary of Sakha, ইত্যাদি নূতন নামে পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক Editor কিংবা Manager, Sakha এই নামেই পত্র লিখিবেন; বাঙ্গালায় "সখা সম্পাদক" বা "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" বলিয়া পত্র লিখিলে আমরা আরও সুখী হই।

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

পোষাক।

বালিকাদিগের কিরূপ পোষাক হওয়া উচিত এই বিষয়ে আমাদিগকে কেহ কেহ 'সখা'য় লিখিতে বলিয়াছেন। আমরা আজ এই সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব।

অনেক স্থানে দেখিয়াছি মেয়েরা এমন পোষাক পরেন যে সমস্ত শরীর দেখা যায়, কিন্তু তবুও তাঁহাদের লজ্জা হয় না, কেননা এইরূপ সরু কাপড়ের দাম অনেক, এবং কাজেই এই সকল কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া উচিত! পাতলা কাপড় পরিলে যে ভদ্রসমাজে লোকে লজ্জায় মুখ ফিরায় তাহা এই সকল মেয়েদের মনে থাকে না। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলে, তাঁহারা মুখে হাত দিয়া বলেন "ওমা! পোষাকী কাপড় পরিব, তায় আবার লজ্জা কি!" আমরা এরূপ কথার উত্তর দিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায়, পোষাকী কাপড় পাতলা হইলে, তাহা শক্ত করিয়া তুফের দিয়া পরা উচিত, এবং পরিবার কাপড় পাতলাই হউক আর পুরুই হউক, দশজনের নিকট যাইতে হইলে সর্ব্বদা একটী জামা গায়ে থাকা উচিত। যদি সুবিধা হয় তাহাহইলে হাটুর নীচে পর্য্যন্ত লম্বা, এবং হাতকাটা (কুনই পর্য্যন্ত) একটা জামা পরিয়া তাহার উপরে কাপড় পরিলে বড়ই ভাল হয়। আজকালকার কোন কোন মেয়ে সুশিক্ষিত বাপ বা ভাইয়ের যত্নে ভদ্র পোষাক পরিতে পান, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মেয়ে যেরূপ পোষাক পরেন, তাহাতে নিজের বাড়ীর লোকেরই সুমুখে যাওয়া কষ্ট, ঘরের বাহিরে, নিমন্ত্রণে যাওয়াত দূরের কথা। আজকাল যত লেখা পড়ার চর্চ্চা বাড়িতেছে, ততই মেয়েদের এ দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে। কিন্তু আমাদের ঘরের অধিক-বয়স্কা গৃহিণীরা আজিও জামা গায়ে দেওয়ার উপরে বিলক্ষণ বিরক্ত। আমি একটী সুশিক্ষিত লোকের স্ত্রীর কথা জানি, তিনি বাড়ীতে গেলেই, তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে বলিতেন "জামাটা খোল,—ভদ্রলোক হও দেখি—কি মুসলমানের না খ্রীষ্টানের মেয়ের মত একটা জামা গায়ে!" এইরূপ বলিয়া অনেক সময় জামা খোলাইয়া তবে তিনি ছাড়িতেন। যাঁহাদের এরূপ মত যে গায়ে জামা না থাকিলেই ভদ্র, এবং থাকিলেই ভয়ানক অভদ্র হইতে হয়, তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিব? তবে আমরা সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে মেয়েদের সমস্ত শরীর ঢাকিয়া পুরুষের নিকট বাহির হওয়া উচিত, কোন ক্রমেই খোলাগায়ে বাহির হওয়া উচিত নয়। কেহ কেহ বলেন "জামা গায়ে দিলে কাজ কর্ম্ম করিবে কেমন করিয়া?" তাহার উত্তরে এই বলিলেই হইবে যে যেরূপ হাতকাটা জামার কথা বলিয়াছি, তাহাতে কাজের কিছুই ক্ষতি হইতে পারে না। এইতো গেল লজ্জানিবারণের কথা। তাহার পর এইরূপ জামা থাকিলে শীতের সময় বেচারা মেয়েদের কত সুবিধা, কর্ত্তাদের একথা ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বে যেরূপ জামার কথা বলিয়াছি সেইরূপ একটী জামা থাকিলে সবদিকেই ভাল হয়। এস্থলে গয়নার কথাও কিছু লেখা উচিত। আমাদের বিবেচনায় গয়নার ঘটা না করাই ভাল;—পোষাক যত 'সাদাসিধে' হয়, ততই ভাল। যাঁহাদের যথেষ্ট গয়না আছে, তাঁহারা এইরূপ গয়না পরিলেই চলিতে পারে, যথা:—কাণে দুল্ বা ইয়ারিং, কি মাকড়ি; হাতে বালা, চুড়ি, কি শাঁখা; এবং গলায় চিক্ কি হার। আর অধিক গয়নার ঝম্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ করার কোন প্রয়োজন আমরা দেখিনা; তবে অন্য কাহারও যদি অন্যমত হয়, তবে নাচার।

ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। ইজের বডি বা জামা। ২। 'চালাক' এই কথাটী, হইতে 'আক' ছাড়িয়া দিলে, 'চাল' থাকে, চাল সিদ্ধ করিয়া খাইলেই ভাত খাওয়া হইল। ৩। কথাগুলি এই—রিপোর্ট পরম, নয়শ, বাগান, হামেসা, ছু(ই) নচে রচিব। প্রথম অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে "রিপণ বাহাদুর," এবং শেষের অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে 'টমশন সাহেব' হইল। ৪।

ভাই যদু,—

তোমার পত্র পাইলাম। অখিল এবং (দীন) সে দিন (নদী)তে স্নান করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিল। (নবীন) ও সঙ্গে ছিল, কিন্তু (নবীন) কোন বিপদে পড়ে নাই। তাহারা যখন যাইতেছিল, তখন আমি বলিলাম তোমরা এখন (থাক); কিন্তু আমার (কথা) না শুনিয়া, (তারা) সেই (রাতা) রাতিই (নদী)তে গেল। (দীন) একটু শুনিয়াছিল, কিন্তু অখিল কোন মতে না শুনিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। (না শুনা)র ফলও পাইয়াছেন; (না শুনা)র ফল এই হইয়াছে যে গিয়া যাই নাবিয়াছেন, অমনি (কতক) গুলি মাছ সেই ঘাটে ছিল, তাহারা অখিলের পায়ের (কতক) অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে, এবং (দীন)কে (নদী)র মধ্যে কাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। অখিল এখন খোড়া হয়ে পড়ে আছে। সত্বর যে আ(রাম) হবে তাহার সম্ভাবনা নাই; বলিতে কি এখন সে (মরা)র মত পড়ে থাকে। আর অধিক কি লিখিব, ইতি।

তোমার স্নেহের হেমচন্দ্র।

নূতন।

১। এই কথাগুলি সাজাইয়া একটি বাক্য রচনা করা দেখি; নূতন কথা বসাইতে পারিবে না এবং ইহার একটিও ছাড়িতে পারিবেনা;—

যদি, যদি, যদি, হইতে, থাকিতে, হয়, হয়, হয়, সুস্থ, প্রশংসাভাজন, প্রকৃত,নকল, প্রার্থনীয়, শারিরীক, মানসিক, বাঁচিয়া, হইয়া, করিয়া, করিও, মনুষ্যনাম, হস্ত ক্ষেপ, তবে, মনে, তাহাতে দশের, ঈশ্বরের কার্য্যকেই।

২। বলতো কোন্ জিনিশ খেতে খুব মিষ্ট, কিন্তু দেখালেই বা খেতে বল্লেই লজ্জা করে এবং কখনও কখনও রাগ হয়?

৩। ভাগ্য দোষে দিবা রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াই,
অথচ ঘূরিতে কেহ নাহি দেখে ভাই!
কিন্তু নাহি যাই একা, যত লোকে পাই দেখা
সবারে সঙ্গেতে করি ভ্রমণেতে যাই।
...শেষে মূলকথা রাজি রাগী, কিছুই বুঝিনা,
...নেকেবা খোঁড়া কেবা অন্ধ কিছুই জানিনা—
...র মুচির রোগী যেই জন কিম্বা মৃত, অচেতন
আমাকে ছাড়িয়া থাকে, হেন কোন জনা?
সঙ্গে করে লয়ে ঘুরি,—তাওকি জাননা!

৪। একটী লোককে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—"আমার ঠাকুর্দ্দাদার বয়স আমার বাবার বয়সের ৪/৩; আমার বয়স বাবার বয়সের ২/৫; এক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের তিন জনের বয়স এক সঙ্গে ৯×২০ ছিল,।" স্থির কর কাহার বয়স কত?

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণি অর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

৮। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

...রণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা," কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। জুলাই, ১৮৮৩। ৭ম সংখ্যা।

ভীমের কপাল।

অষ্টম অধ্যায়।

পাঠক পাঠিকা, তোমরা কি কেহ কখনও ভীমেন্দ্রের মত বিপদে পড়িয়াছ? ভীমেন্দ্র এতবার বিপদে পড়িল, কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি আছে তিনি লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কতবার ভীমেন্দ্রকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। ভীমেন্দ্র ভাবিতেছে তাহার কপাল দোষেই সে বিপদে পড়িতেছে এবং তাহার কপালগুণেই সে প্রত্যেকবারে মাথা রাখিবার স্থান পাইতেছে। আমরা বলি বিপদে পড়া তাহার অবিবেচনার ফল এবং ভীমেন্দ্র যে বিপদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহা জীবন মরণের সহায় জগদীশ্বরের কৃপা।—ভীমেন্দ্র আজিও কৃতজ্ঞ হইতে শিখে নাই; কাহারও নিকট উপকার প্রাপ্ত হইলে ভীমেন্দ্র ভাবিত তাহার নিজের কপালের জোরে সে উপকার পাইল। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে কত রকমে যে শিক্ষা দেন, তাহা কে বলিতে পারে? যে দুঃখী ছিল, ঈশ্বর তাহাকে দেখাইলেন, তাহার অপেক্ষাও দুঃখী পৃথিবীতে আছে, অমনি সে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইল; যে ঈশ্বরের কথা, ধর্ম্মের কথা ভাবিত না, ঈশ্বর তাহার কোন ভালবাসার বন্ধুকে লইয়া গেলেন, অমনি সে ধর্ম্মের দিকে, ঈশ্বরের দিকে মন দিল; যে রোগের জ্বালায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল, ঈশ্বর তাহাকে শিখাইলেন—তাঁহারই উপর নির্ভর না করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে না এবং হাত পা ছাড়িয়া ঈশ্বর যা করেন বলিয়া বসিয়া পড়িলে, সেই দুর্য্যোগেই ঈশ্বর মানুষের সহায় হন। এই জন্যই বলিতেছি মানুষের দুর্য্যোগে ঈশ্বরের সুযোগ। ভীমেন্দ্রের জীবনটী পড়িলেও তাই মনে হয়। পাঠক পাঠিকা, এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ঈশ্বর ভীমেন্দ্রকে কেমন করিয়া কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন,—প্রথম, সামান্য কারণে রাগ করা অনুচিত; দ্বিতীয় বিশেষ না দেখিয়া শুনিয়া কোনও কাজে হাত দেওয়া অন্যায়; তৃতীয়,—ভালবাসার লোক যত অধিক হয়, মানুষ ততই নিজের সুখ ভুলিয়া তাহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। ভীমেন্দ্র বালক, এখনও তাহার অনেক শিখিবার ছিল—ঈশ্বরানুগ্রহে ভীমেন্দ্র সকলি শিখিয়াছিল। পাঠক পাঠিকাদিগকে সে সমস্ত বিষয়ই জানাইতেছি।

ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের বাড়ীতে গেল। সেখানে গিয়া এক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিল। কামারের বাড়ী অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভীমেন্দ্র কল্পনাও করে নাই।—বাড়ীতে তিনখানা বই ঘর [illegible] তাহাও অত্যন্ত বৃহৎ নহে; কিন্তু বাড়ীতে অ[illegible] লেই যেন একটু পবিত্রতার ভাব মনে হয়। উ[illegible]

শাদা ধব্ ধব্ করিতেছে, তাহাতে কামার-গৃহিণীর যত্নে ঘাস জন্মিতে পারে না। ছেলে গুলি কখনও ময়লা কাপড় পরে না; কামারের স্ত্রী মধ্যে মধ্যে ক্ষার দিয়া সমস্ত কাপড় গুলি নিজ হাতে কাচিয়া থাকেন। হারাণ কামারের বাড়ীতে গেলে হারাণের মিষ্ট ব্যবহার, কামার-পত্নীর স্নেহ, ছেলেগুলির সহাস্য মুখ এবং বাটীর চারিপার্শ্বের পরিষ্কার শোভা দেখিয়া, বাস্তবিকই বোধ হয়—

"পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে,
নগরের কোলাহল সহিতে না পারি।"

ভীমেন্দ্র এই কামারের বাড়ীতে গেল।—হারাণ কামার প্রাতঃকালে আরম্ভ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আপনার কাজ করিতেন—তাঁহার কার্য্যে এত অধিক নিপুণতা ছিল যে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই কার্য্যে পরিপূর্ণ থাকিত।—হারাণ কামার যখন বাড়ীতে আসিতেন, তখন ছেলেগুলি পিতার চুম্বন লাভের জন্য ছুটিয়া আসিত, গৃহিণী স্নানের জন্য তেল আনিয়া দিতেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা কেহ গামছা কেহ কাপড় আনিয়া দিত— বাড়ীর আদরে হারাণ প্রাতঃকালের সমস্ত পরিশ্রমের ক্লেশ ভুলিতেন।—ফলতঃ হারাণের দুঃখ ছিলনা। দুঃখ ছিলনা, একি কথা বলিতেছি? এ পৃথিবীতে এমন লোক দেখিনা, যে কখনও দুঃখে পড়েনা। তবে এ কি কথা? ইহার অর্থ আছে। পাঠক পাঠিকা, জান কি, এ জগতে এমন লোকও আছেন যাঁহারা কখনও দুঃখ পান না? সেই লোকই সুখী যে জানে সুখ দুঃখ দুই ই ভগবান দিতেছেন।—সেই দুঃখী যে সুখকে ভগবানের দান আর দুঃখকে অপদেবতার দান ভাবে। সেই সুখী যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই দান [illegible]য়া দুঃখ ক্লেশ রোগ শোক অকাতরে সহ্য [illegible], সেই দুঃখী যে বিপদের সময় ঈশ্বরের মঙ্গল বুঝিতে পারে না।—এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরে-বিশ্বাসী হারাণ কেন সুখী হইবে না। ভীমেন্দ্র এই খানে থাকিয়া চাষাকে ভাল বাসিতে শিখিল; কলিকাতায় থাকিতে "ছোট লোক" দিগের উপর যে ঘৃণা ছিল, হারাণ কামারের বাড়ীতে থাকিয়া ভীমেন্দ্রের সে ভাব রহিল না, ভীমেন্দ্র আস্তে আস্তে অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল—ভগবান ভদ্রলোকের প্রতি অধিক সদয় চাষার প্রতি কম সদয় নহেন;—ভীমেন্দ্র বুঝিল চাষাও ভদ্রলোক হইতে পারে এবং কেবল পরিষ্কার কাপড় পরিয়া, মাথায় টেরি করিয়া, বুকে থোপ করিয়া চাদর বাঁধিয়া, গোলদীঘিতে, নদীর ধারে, এখানে সেখানে বেড়াইলেই ভদ্রলোক হয় না।—ভীমেন্দ্র চাষার সহিত চাষার ভাবে ৩।৪ দিন এই খানে থাকিল। বুড়ো কেরামতালি প্রভৃতি সকলেই ভীমেন্দ্রকে প্রত্যহ দেখিয়া যাইতেন, এবং যতদিন ভীমেন্দ্র রসুলপুরে ছিল কিসে তাহার সুখ হইবে, কিসে বিদেশে থাকার ক্লেশ যাইবে, তাহার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে হাটের দিন উপস্থিত হইল। ৩ টার সময় হাট বসিল। আজ "বাবু"দের আসিবার কথা; ভীমেন্দ্র কতক আহ্লাদ কতক দুঃখের সহিত, কখন তাঁহারা আসিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুঃখের কারণ এই এত ভালবাসা যাহারা দেখাইল সেই সকল সরলহৃদয় দরিদ্র চাষাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ভীমেন্দ্র অনেক শিখিয়াছে কিন্তু ভীমেন্দ্র কৃতজ্ঞতা শিখিতে পারে নাই—সুসভ্য লোকেরা যেমন মুখে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সে কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছি না। উপকার পাইলে উপকারীর প্রতি যে প্রাণের টান হয়, আমরা এখানে সেই কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছি।—কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ভীমেন্দ্র যে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছেনা, ইহাইত তাহার প্রাণের টানের একটা প্রমাণ। তদুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে। এত-

কাল সুখে ছিল, এখন আবার কোথায় গিয়া আবার কোন্ বিপদে পড়িয়া ক্লেশ পায় মনের এই অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের জন্য দুঃখ। চাষাদের সহিত ভীমেন্দ্র হাটে গিয়াছিল—'ভদ্রলোক' কাজে কাজেই 'প্রধান' বলিয়া ভীমেন্দ্রের এখন আর কোন অভিমান নাই। সকল চাষাদের সহিত ভীমেন্দ্র হাটের মধ্যে একটা বটগাছ তলায় বসিয়া কিহয় কিহয় ভাবিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল।—কিছুকাল পরে দেখিল একজন সুন্দর পুরুষ, মুখে শাদা দাড়ি, তিনি হাটের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কাল, কিন্তু তাহাতে এমনই একটু সৌন্দর্য্য আছে যে দেখিতে ইচ্ছা করে —হাতে কতকগুলি পুস্তক, অপর হাতে একটী ছাতা; বাবুটী হাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; ইনি পূর্ব্বে কখনও এখানে আইসেন নাই, আজ নূতন আসিয়াছেন—সুতরাং অ কালের মধ্যে তাঁহার চারিদিকে অনেক লোক জমিল। তিনি প্রথম আসিয়াছেন সুতরাং অনেকে গিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, এইদলে ভীমেন্দ্রও ছিল। আমরা তাঁহার পরিচয় দিতেছি। ইনি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস বসু; ইনি অনেককাল পর্য্যন্ত বেতন লইয়া প্রচার করিতেন, সম্প্রতি প্রাচীন বয়সে পেন্‌সন লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ও অসাধারণ কষ্ট সহ্য করিয়াও ইনি বিশ্রাম করিতে চান না; ইহঁর ইচ্ছা "ঈশ্বরের শরীর যত দিন ঈশ্বর রাখিবেন, ততদিন এ শরীরের দ্বারা তাঁহারই কার্য্য করিব।" বাবুটী সম্প্রতি বগুড়া হইতে আসিয়াছেন; হরিপদ বাবু ইহাঁর জামাতা; রশুলপুরের হাটে অনেক লোকের সমাগম হয় শুনিয়া তাঁহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস সেই ধর্ম্মের কথা লোককে শুনাইতে আসিয়াছেন। হরিপদ বাবু ইহাঁর জামাতা, এ কিরূপ কথা? হরিপদ বাবু ব্রাহ্ম, ইনি খৃষ্টীয়ান; তবে কিরূপে হরিপদ বাবু ইহাঁর জামাতা হইলেন, সে কথা বলা আবশ্যক। বিপ্রদাস বাবু হরিপদ বাবুর পাঠাবস্থায় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন—প্রায়ই তাঁহাকে আপন বাটীতে ডাকিতেন। এই খানেই হরিপদ বাবুর সহিত বসন্ত বালার পরিচয় ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। বিপ্রদাস বাবু এই ভাল বাসা দেখিয়া তাহাতে বাধা দেন নাই;—শেষ কালে বড় হইয়া যখন হরিপদ বাবু ও বসন্ত বালার পরস্পরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল, বিপ্রদাস বাবুর মন এত উদার যে তিনি তাহাতে মহাসুখে সম্মত হইয়া সেই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকেই কন্যা সম্প্রদান করেন। ভীমেন্দ্র এই কথা শুনিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল। বিপ্রদাস বাবু ভীমেন্দ্রকে ওরূপ ব্যগ্র ভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভদ্রলোক, এখানে কোথায় থাক?" ভীমেন্দ্র সমস্ত কথা বলিল;—ধর্ম্ম প্রচারক এই কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "আমি বগুড়ায় ফিরিয়া যাইতেছি—যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে লইয়া যাইতে পারি।" ভীমেন্দ্র স্বীকৃত হইল। অনন্তর বিপ্রদাস বাবু একখানি পুস্তক খুলিয়া খানিক ক্ষণ পাঠ করিলেন। চাষারা অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিল। অবশেষে তিনি ঈশা খৃষ্টের কথা বলিতে লাগিলেন। ঈশা খৃষ্টের নাম সেখানে কোন চাষারই কর্ণগোচর হয় নাই, সুতরাং যখন বিপ্রদাস বাবু কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিতে লাগিলেন কেমন করিয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ঈশাখৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য লোকের অত্যাচারে প্রাণ দিয়াছিলেন, তখন অনেকের অনেক দুঃখের কথা মনে পড়িয়া কান্না পাইতে লাগিল—অল্পকাল মধ্যে সেই সরল চাষাদের মধ্যে কান্নার স্রোত দেখা গেল;—ধন্য বক্তা! ধন্য বক্তৃতা! বক্তৃতা শেষ হইল—অনেকে বিপ্রদাস বাবুকে আসছে হাটে আসিতে বলিল—বিপ্রদাস [illegible] আপনার কার্য্যের ফল দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন[illegible]

দিলেন।—ভীমেন্দ্র এইবার কৃতজ্ঞতা শিখিল। যাঁহার নিকট এমন সুন্দর ভাবের কথা শুনিল ভীমেন্দ্র তাঁহাকে ভক্তি না দিয়া থাকিতে পারিল না।—চাষারাও সকলে খুব আশ্চর্য্য হইয়া শুনিল। বিপ্রদাস বাবু আপনার কার্য্য শেষ করিয়া যাহারা যাহারা পড়িতে পারে, তাহাদের নিকট পুস্তক বিতরণ করিলেন। অবশেষে ভীমেন্দ্রকে বলিলেন, 'তুমি বগুড়াতে যাইতে ইচ্ছা করিলে আমার সহিত যাইতে পার।" ভীমেন্দ্র যাঁহাদিগের বাটীতে এতদিন ছিল, তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া বিপ্রদাস বাবুর সহিত বগুড়া যাত্রা করিল। ক্রমশঃ—

শিশু-স্বাস্থ্য রক্ষা।

প্রথম উপদেশ।

প্রাতঃ ক্রিয়া।

প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবে; যাহাদিগের সকালে উঠিবার অভ্যাস আছে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হয়। বিলাতের এক জজ সাহেব তাঁহার কাছারীতে যত প্রাচীন সাক্ষী আসিত সকলেরই আহার ব্যবহারের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিতেন, প্রাচীন সাক্ষীরা প্রায়ই বলিত, যে তাহারা অতি সকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া থাকে। তোমরাও ভোরে উঠিবে, তাহা হইলে তোমরাও অনেক দিন বাঁচিতে পারিবে।

নিদ্রা হইতে উঠিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। যাহাদিগের সকালে এই কাজ করিবার অভ্যাস আছে,তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে ও পরিপাক শক্তি উত্তম হয়। এ বিষয়ে কোন নিয়ম না থাকিলে নানারূপ পেটের অসুখে ক্লেশ পাইতে হয়। তাহার পর চক্ষু ও মুখ শীতল জলে ধুইয়া ফেলিবে। ...ক বালক বালিকার তাহা অভ্যাস নাই। ...হ মুখ না ধুইলে মুখে দুর্গন্ধ হয় ও অনেক পীড়া হইতে পারে। দাঁত গুলি প্রত্যহ কয়লার গুঁড়ো কি মৃত্তিকা বা খড়ি দ্বারা পরিষ্কার করিবে, নতুবা দাঁত রুগ্ন ও মলিন হয়। মলিন দাঁত দেখিতে বড় অপ্রীতিকর। যদি দাঁত পানসিয়া বা ইহার গোড়া নরম হয়, তবে খড়ি ও ফটকিরি একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিবে। মুখ ধুইবার পরে চিরুণি বা ব্রুস্ দ্বারা চুল আঁচড়াইবে, এরূপ অভ্যাস থাকিলে মস্তকে উকুন কিম্বা খুসকী অর্থাৎ মরামাংস থাকিতে পারে না।

সকালে অতি অল্প পরিমাণে আহার করিবে। আম্র, কমলালেবু, কি অন্য কোন সুপক্ক ফল, রুটী ও মোহন ভোগ, ডিম্ব কি অন্য কোন পুষ্টিকর পদার্থই আহার করিবে। কতক গুলি মিষ্টান্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে না।

অনন্তর কোনরূপ ব্যায়াম করিবে, কিংবা খুব খানিকটা বেড়াইয়া আসিবে। এরূপ করিলে অনেকে মনে করেন সে পড়ার ক্ষতি হয়, ইহা নিতান্ত ভুল। কিঞ্চিৎ ব্যায়ামের পরে অতিশয় স্ফূর্ত্তির সহিত পড়িতে পারিবে।

অনন্তর অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

দ্বিতীয় উপদেশ।

অধ্যয়ন।

ছাত্রেরা বলেন যে তাঁহারা পড়ার বিঘ্ন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগ করিতে পারেন না। এ কথা নিতান্ত অসার। অধ্যয়ন ও শরীর রক্ষা উভয়ই যে সমান কর্ত্তব্য আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ নিয়মিত রূপে চলিলে পড়ারই বা অনিষ্ট কেন হইবে। আমরা নিম্নে ছাত্রগণের জন্য একটী কার্য্যের তালিকা দিতেছি, তদনুসারে চলিলে শরীর ও মন দুইই রক্ষিত হইবে।

ছাত্রগণের কার্য্যের তালিকা।

প্রাতঃকাল ৫টা হইতে ৬টা বাহ্যে ও মুখ ধোওয়া ইত্যাদি।

৬	৭	কিঞ্চিৎ জল খাইবার পরে ভ্রমণ।
৭	৯	অধ্যয়ন।
৯	১১	স্নান, আহার, স্কুলে গমন।

মধ্যাহ্ন ১১ টা হইতে ৪ টা স্কুল।
অপরাহ্ণ ৪ ,, ৫ জল খাওয়া ও ব্যায়াম।
রাত্রি ৭ ,, ১০ অধ্যয়ন।
,, ১০ ,, ১১ আহার ইত্যাদি।
,, ১১ ,, ৫ নিদ্রা।

প্রায়ই বালকগণ ১০॥০ টা বা ১১ টার সময় স্কুলে যায়, এবং গড়ে ৬টার সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়, সুতরাং স্নান, আহার, প্রাতঃক্রিয়া, ব্যায়ামাদির জন্য ৩॥ ঘণ্টা বিয়োগ করিলেও প্রাতঃকালে ২ ঘণ্টা পড়িবার সময় থাকে, বালকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

স্কুল হইতে আসিয়া শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তখন কোন রূপ খাবার খাইয়া কিছুকাল বিশ্রামের পরে ব্যায়াম করিবে। সন্ধ্যার পরে পড়িতে বসিয়া ৩ ঘণ্টা* পড়িয়া, আহারের পরেই শয়ন করিবে, আহারের পরে পাঠ করা অনুচিত।

পাঠগৃহ নির্জ্জন, বায়ুযুক্ত, শুষ্ক, ও শীতল হওয়া কর্ত্তব্য। একজনের একস্থানে বসিয়াই পাঠ করা উচিত। যাহা পড়িবে, অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িবে, অন্য বিষয়ে মন দিলে পড়া হয় না। এই জন্যই মনোযোগী ছাত্রেরা দুই ঘণ্টায় যে পড়া করিতে পারে, অনাবিষ্ট বালকের পাঁচ ঘণ্টায়ও তাহা হয় না। সুতরাং মনোযোগী হইবে। পড়িবার পরে পঠিত বিষয় সকল মনে মনে আলোচনা করিবে, তাহা হইলে সকল পড়াই মনে আসিবে। এক বিষয় পড়িতে পড়িতে বিরক্তি হইলে অন্য বিষয় আরম্ভ করিবে। পড়িবার সময়ে নিদ্রা আসিলে অঙ্ককসা বা লেখা দ্বারা তাহা দূর করিবে, অতিশয় বিরক্তি বোধ হইলে পরিষ্কার বায়ুতে কিঞ্চিৎ বেড়াইয়া আসিবে।

অনেকে বৎসরের প্রথমে অলস হইয়া বসিয়া থাকেন, ও পরীক্ষার ২ কি ৩ মাস পূর্ব্বে দিবারাত্রি পরিশ্রম করেন, শরীরকে ক্লেশ দেন, ইহা বড় অন্যায়। যাহারা বৎসরের প্রথম হইতে মনোযোগ পূর্ব্বক বাড়ীতে ও স্কুলে পড়া শুনা করে, তাহারা পরীক্ষার সময়ে শরীর ক্ষয় না করিয়াও ভাল হইয়া থাকে।

পাঠ সময়ে যতদূর সম্ভব স্থির ভাবে বসিবে;—চেয়ারে বসিয়া পড়িলে অনেক ভাল হয়। অনবরত মস্তক হেট করিয়া লেখা কি পড়া উচিত নহে। অনেক কৃতবিদ্য লোক এই অভ্যাসদোষে কুঁজো হইয়া থাকেন! অল্প কি তীব্র আলোকে পড়িবে না, পড়িবার সময়ে পুস্তক এমন ভাবে রাখিও না যে তদুপরি চন্দ্র কি সূর্য্য কিরণ পতিত হয়। যদি পড়িতে পড়িতে চক্ষু বেদনা বোধ হয়, তখন পড়া ত্যাগ করিয়া শীতল জলে চক্ষু ধুইয়া ফেলিবে ও চক্ষু বন্ধ করিয়া মনে মনে পড়ার বিষয় সকল আলোচনা করিবে। ক্রমশঃ—

* মনোযোগের সহিত পড়িলে বালকেরা ইহা অপেক্ষা অনেক কম পড়িয়াও বেশ চালাইতে পারেন।

আখ্যান-মালা।

এ পৃথিবীতে আর আসিবে না।

এক দিন সরোজা আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এমন সময়ে একটু কাগজে লেখা এই কয়টী কথার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল :— "সৎলোকেরা মনে করেন, আমি এই পৃথিবীতে কেবল একবারই আসিব; সেই সময়ের মধ্যে যত ভাল কাজ করা যায় ও করা উচিত ইহার প্রতি অমনোযোগী হওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে।" সরোজা এই কথাগুলি একবার

পড়িল, দুইবার পড়িল,—এই কথাগুলি তাহার প্রাণে বিশেষ রূপে অঙ্কিত হইল। সে অতিশয় ভাবিতে ভাবিতে আহার করিতে বসিল। আহারের সময় মাতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার কোন সৎইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই— যাহা আর হইবে না। সরোজা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিল এই ছুটীর কয় দিন খুব আমোদে কাটাইবে, কিন্তু এখন তাহার ইচ্ছা হইল "যতদূর পারি কাজ করিয়া আমার সময়ের সদ্ব্যবহার করিব।" 'আমি আর এ সময় পাইব না'—এই ক্ষুদ্র কথাটী তাহার প্রাণকে নাড়িয়া দিল; তাহার প্রাণে আর এক নূতন চিন্তার স্রোত বহাইয়া দিল। যদি মাতা দিন দিন রোগা হইয়া যান, যদি তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি পায়, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, এই সকল মহাকষ্টকর ভাবনায় বালিকাকে অস্থির করিতেছিল। সে কেবল এই ভাবিতে লাগিল "হায়! আমি মায়ের নিকট তাঁহার স্নেহের জন্য ঋণী রহিলাম তাহার পরিশোধ কিরূপে দিব। যাহা হউক যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" আহারের পর সে আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে মাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা! তুমি না বলেছিলে একদিন ভবানীপুরে গিয়ে মাসীর সঙ্গে দেখা করিবে। আজই যেওনা,—আমি তোমার আজকার সমস্ত কাজ করিব।" মাতা উত্তর করিলেন "না মা! আজ অনেক কাজ আছে, আজ আর যাওয়া হবে না।" সরোজা বলিল "হাঁ মা! আজই যাওনা—আজ আর আমার কোন কাজ নাই, কেবল তোমার কাজই ক'রব।"

সরোজা তাহার কথা রখিল। তাহার মাতা আসিয়া তাঁহার কার্য্য সমস্তই হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। সেই দিন হইতে সরোজাকে আর কোন কার্য্যের জন্য কিছুই বলিতে হয় নাই।

রাজার ভদ্রতা ও সুবুদ্ধি।

একদিন কোন একজন রাজা একটী দরিদ্রকে উপদেশ দিতেছিলেন দেখিয়া, একজন খোসামুদে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; তিনি উত্তর দিলেন, "দেখ, যদিও বালকটী গরিব তথাপি উহার আত্মা আমারই ন্যায় মূল্যবান, উহার ও আমার উভয়েরই এক ঈশ্বর ও এক পথ। তবে কেন উহাকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করিব?"

এযে নূতন মেয়ে!

একবার একটী নৈতিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত একজন ধার্ম্মিক লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি প্রাতঃকালের কাজে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন,—বৈকালে আপনার কাজ করিতে পারিবেন না, এইরূপ মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই স্থানে যাইতে হইল। তিনি সেই স্থানে গিয়া সেই সকল লোককে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন একটি বালিকা অতি কদর্য্যরূপে কাপড় পরিয়া সেই স্থানের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে; তাহার রৌদ্রতপ্ত ছোট মুখখানি হাত দিয়া ঢাকা, এবং চক্ষের জল হস্তের মধ্য দিয়া দর দর করিয়া পড়িতেছে। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া বোধ হইল যেন, দুঃখে কষ্টে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটী ফাটিয়া যাইতেছে। শীঘ্রই আর একটি একাদশবর্ষীয়া বালিকা সেইখানে আসিল। সে এই বালিকাটিকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার নিকটে গেল এবং অতি স্নেহের সহিত তাহাকে নিকটের নদীর ধারে একখানি কাঠের উপর বসাইয়া হস্তে করিয়া জল লইয়া তাহার চক্ষু ও অশ্রুমাখা মুখ খানি শীতল করিয়া, তাহার সহিত অতি প্রফুল্ল ভাবে কত আলাপ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বালিকাটী পুনরায় প্রফুল্ল হইল, চোখের জল তাহার নিকট বিদায় লইল, মুখখানি ফের হাসিমাখা হইল। সেই ভদ্র লোকটী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"বাছা! এটী কি তোমার ছোট বোন"। বালিকাটী নম্রভাবে উত্তর দিল, "না মহাশয়! আমার একটিও বোন নাই।"

"তবে বোধ হয় তোমরা এক পাঠশালায় পড়, না?"

বালিকাটি বলিল "না, আমি ইহাকে কখনও দেখি নাই, জানি না কোথা থেকে এসেছে।"

"জান না? তা হলে কেমন করে ওকে নিয়ে এসে এমন যত্ন কর্‌ছ?"

"ও মেয়েটী এখানে নূতন এসেছে, একলা একলা, ফাঁক ফাঁক লাগছে,—কাহারও উহার উপর ভাল ব্যবহার করা উচিত, সেই জন্য আমি ওকে এখানে এনেছি"।

ভদ্রলোকটী মনে করিলেন "আমি আজ এই বিষয় লইয়া কিছু বলিব।" তাঁহার সেদিনকার উপদেশের বিষয় এই:—"তুমি তোমার ভাই বোনদিগের প্রতি যে টুকু ভাল ব্যবহার কর, সে টুকু ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যই কর।" তিনি বালিকা দুটিকে সেখানে লইয়া গিয়া ঘটনাটি সংক্ষেপে সকলকে জানাইলেন। অনেক বালকবালিকা একমনে সে কথা শুনিল।

ঠিক উত্তর।

একদিন একটি বালককে তাহার সঙ্গীগণ তাহার পিতার গাছ হইতে কতকগুলি আম পাড়িতে বলিল। কিন্তু তাহার পিতা সেই আমগুলিতে হাত দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গীরা বলিল; "তুমি ভয় পাও কেন? তোমার বাবাত আর তোমায় মারিবেন না?" বালকটি উত্তর করিল, "সেই জন্যই আমার হাত দেওয়া উচিত নয়। বাবা আমায় আঘাত করিবেন না বটে, কিন্তু আমিত অবাধ্য হইয়া তাহার মনে আঘাত দিব?"

শাস্তি।

পাঁচ বৎসরের একটি ছোট ছেলে কোন দোষ করাতে, তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়া তাহার দোষের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে সে যে দোষ করিয়াছে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া, ঈশ্বরের কাছে তাহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তার পর একখানি বই হইতে, এই কথাগুলি পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন:—"যিনি সন্তান দোষ করিলে শাস্তি দেন না, তিনি সন্তানের মঙ্গল চান না। যে পিতা সন্তানের মঙ্গল চান, তিনি যথাসময়ে তাহার দোষের জন্যে তাহাকে শাস্তি না দিলে ছেলেদের জ্ঞান হয় না। ছেলেদের আপনাদের ইচ্ছামত কাজ করিতে দিলে শেষে এমন কাজ করে, যাহাতে পিতা মাতার নিন্দা হয়"। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বাপু! আমার কি করা উচিত বল দেখি?" ছেলেটি উত্তর দিল, "কেন বাবা! আমি যে দোষ করিয়াছি ও শাস্তি পাবার উপযুক্ত; আমায় শাস্তি দিবেই।" শাস্তি পাবার পরে, বালকটি পিতাকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "বাবা! আমি আর কখন তোমার অবাধ্য হইব না।"

শিশুর সততা।

গ্রামের কোন ছোট বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীর বালকদিগকে, তাহাদের পড়া লইতে লইতে, একটি কঠিন শব্দ বানান করিতে বলিলাম। প্রথম, দ্বিতীয়, করিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সকলের চেয়ে ছোট একটী বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম; সে ঠিক বলিল। আমি তাহাকে প্রথম বসিতে বলিয়া আরও ভাল করিয়া শিখিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে যাই বোর্ডে লিখিয়া দেখাইব, অমনি ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আমি 'উ'র স্থানে 'ঊ' বলিয়াছি।" এই বলিয়াই সে আপন স্থানে আসিয়া বসিল। বল দেখি ক্ষুদ্র বালকের পক্ষে ইহা কি সামান্য সুবুদ্ধি দেখান! যদি সে আপনার ভুল না বলিত তাহা হইলে আমি চিরকালই মনে করিতাম সে ঠিকই বলিয়াছিল, কিন্তু বালকটি এমন সৎ যে যাহা তাহার পাওয়া উচিত নহে, তাহা তাহার লাভ করিবার ইচ্ছা হইল না।
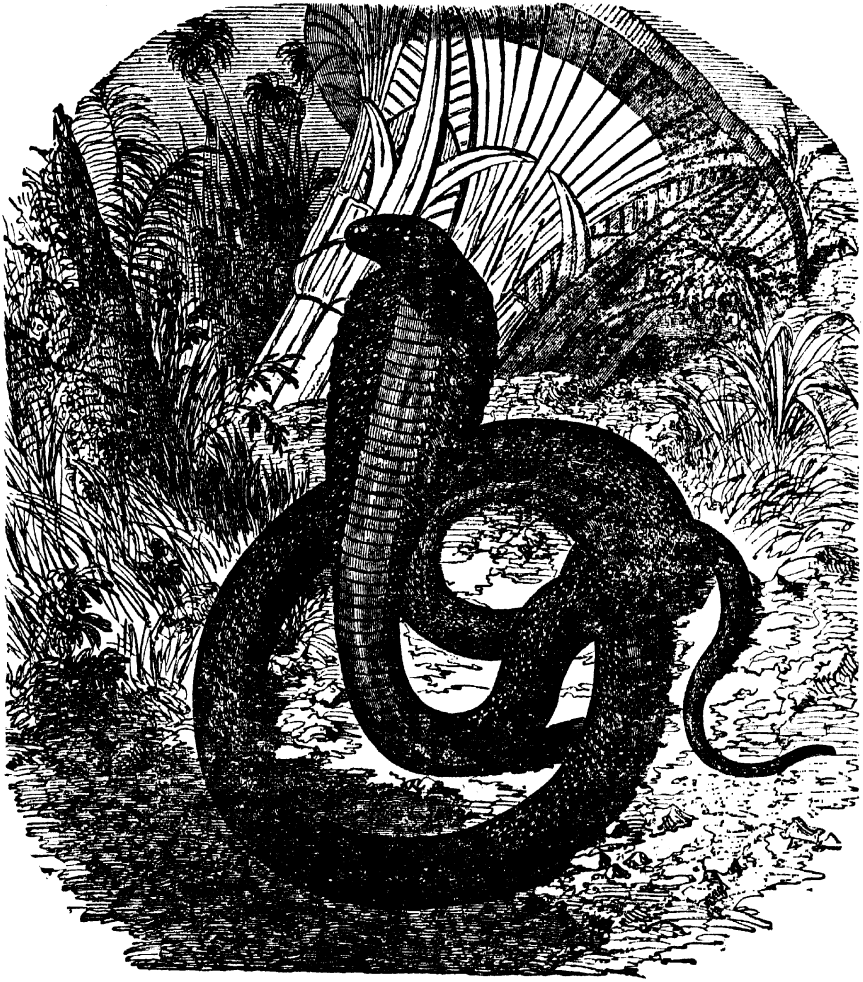
সর্পের ঔষধ।

আমরা মার্চ্চ মাসের 'সখা'তে বলিয়াছি কিরূপ সতর্ক হইলে সাপের ভয় অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু সাপে কামড়াইলে কি করা উচিত, তাহার এ পর্য্যন্ত লিখি নাই। মার্চ্চ মাসে একদিকে সর্পের চিত্র দেওয়া গিয়াছে, তাহা বিষাক্ত নহে; অর্থাৎ তাহারা কামড়াইলে বিষ লাগে না। কিন্তু অদ্য যে চিত্রটী দিলাম, এই দলের সাপ বড় ভয়ানক! দেখিয়াছ, কি ভয়ানক ফণা ধরিয়াছে! আমরা আজিও সাহসের সহিত বলিতে পারি না, সর্পাঘাতের যথার্থ ঔষধ আছে কি না। তবে অনেক ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া যত গুলি ঔষধ বাহির করিয়াছেন, তাহা নীচে লিখিয়া দিলাম—আবশ্যক হইলে পাঠক পাঠিকাগণ

পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আমাদের কিন্তু সব গুলিতে বিশ্বাস হয় না।

১। একুশটী গোলমরীচের সহিত শ্বেত দূর্ব্বার শিকড় বাটিয়া খাইলে সাপে কাটা রোগী আরোগ্য লাভ করে।

২। যেখানে সাপে কাটিবে, তাহার একটু উপরে খুব শক্ত করে দড়ি বা সুতার দ্বারা তাগা বাঁধিবে। তাহার পর লোহা গরম—লাল—করিয়া সেই স্থানটী পোড়াইয়া দিবে।

৩। পূর্ব্বের মত তাগা বাঁধিবে। তাহার পর মোরগের একটী শিরা কাটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে; এই রূপ একটীর পর একটী ক্রমাগত লাগাইতে থাকিবে, যখন দেখিবে শেষ মোরগটী মরিল না, তখনই জানিবে বিষ গিয়াছে।

৪। সাপুড়িয়ারা একটী ঔষধ বলিয়া থাকে; চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন ফল-ধরে-নাই-এমন বেল গাছের উত্তরমুখী একটা শিকড় এক নিশ্বাসে তুলিয়া রাখ। এই শিকড় সাপের যম। আমরা সংক্রান্তি, উত্তর দক্ষিণ, বা—এক নিশ্বাসের কথা কিছুই জানি না। তবে বেলের শিকড়ে সাপের ভয় আছে তাহা জানি। বোধ হয় ইহাতে ঔষধেরও কাজ করিতে পারে।

সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে।

এক দিন শনিবার বৈকালে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছুটির পর আপন গৃহে যাইতেছিল। যাহাদের বাড়ী নিকটে তাহাদের মধ্যে কেহ শীঘ্রই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরস্পরে কথোপকথন কিম্বা খেলা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। অপর যাহারা দূর হইতে পড়িতে আসিত তাহারা যথাসময়ে পরিবারবর্গের সহিত একত্র আহার করিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ধাবিত হইল। শেষোক্ত সন্তানগণের মধ্যে একটী বালকের ও আর একটী বালিকার বাড়ী অপেক্ষাকৃত অনেক দূরে। তাহাদিগকে পর্ব্বতের উপর দিয়া অনেক পথ হাঁটিয়া আসিতে হইত; কিন্তু তাহারা অতি খারাপ দিন ছাড়া অন্য কোন দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিত না। তাহাদের মাতা নলিনের মত সৎ ও সতর্ক বালকের হস্তে ক্ষুদ্র ভগিনী কুন্দকে নিরুদ্বেগে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। যদি কোন দিন পথিমধ্যে বৃষ্টি হইত তাহা হইলে নলিন আপনার জামার দ্বারা কুন্দকে ঢাকিয়া লইত। পথের যে স্থানে পাথর লাগিয়া কুন্দের ক্ষুদ্র পা দুটীতে আঘাত লাগিতে পারে, সেইস্থানে নলিন প্রিয়ভগিনীর হাত দুটী ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইত। বিদ্যালয়ে যাইবার পথে তাহাদের একটী ছোট খাল পার হইয়া যাইতে হইত। নলিন কুন্দকে পিঠে করিয়া সেই খাল পার করিয়া দিত। এ দিকে কুন্দও নলিনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। ভাই ভগিনীকে পাঠের সময় ছাড়া প্রায় কখনও সঙ্গ ছাড়া হইতে হইত না, কারণ কুন্দ বালিকাদিগের সহিত অন্য বিদ্যালয়ে পড়িত। ছুটী হইলে ঐ ক্ষুদ্র বালিকা লাফাইতে লাফাইতে হাসিতে হাসিতে, দুজনে এক সঙ্গে বাড়ী যাইবে বলিয়া নলিনের নিকট আসিত। কিন্তু আজ বৈকালে নলিন দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল যে কুন্দের আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই, সে মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে ছেলেদের স্কুলের দিকে আসিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু লাল হইয়াছে। হাত দুটী ধরিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া নলিন ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয়ভগিনি! আজ তোমার কি হইয়াছে?" নলিনের এই কথা শুনিয়া কুন্দমালা সমুদায় ঘটনা বলিতে আর[illegible] করিল; কিন্তু সে এত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদি[illegible]ন

ছিল যে নলিন তাহার একটীও কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কতকগুলি বালক বালিকা তাহাকে সকল ঘটনা বলিয়া দিল। ঘটনা এই—বালিকা-বিদ্যালয়ের একটী বড় মেয়ে কুন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সেই দিন প্রাতে কুন্দ তাহার নিকট হইতে ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ একটী ছোট চক্‌চকে মেটে পাত্র পাইয়াছিল। পাঠের সময় স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অবশ্য সেই পাত্রটী দূরে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ছুটির পর কুন্দমালা সঙ্গিনী-দিগকে দেখাইবার জন্য তাহা বাহিরে আনিল এবং বিদ্যালয়ে যাইবার পথে একখানা বেঞ্চের উপর রাখিয়া যেমন সে শক্ত করিয়া কাপড় পরিতেছিল, অমনি ভূপাল নামে একটী বালক তাহা দেখিতে পাইয়া অভদ্রভাবে উহা কাড়িয়া লইতে গেল। কুন্দ বিস্তর মিনতি করিল; এমন কি তাহার হাত ধরিল, কিন্তু গোঁয়ার বালক অতিশয় রাগিয়া তাহাকে এমন ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল যে সে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইল। তার পর ঐ দুষ্ট বালক ভাঁড় হাতে করিয়া বলিতে লাগিল, "না, নিবনা বইকি? আমার খুসী আমি একশবার নিব!" অন্যান্য বালক বালিকারা যদি ঐ দুষ্ট বালকের রাগ থামা পর্য্যন্ত তাহাকে কিছু না বলিত, কিম্বা বেশ বুঝাইয়া দু একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু সকলেই একেবারে উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ছি! ছি! করিতে লাগিল, কেহ বা তাহার হাত হইতে ভাঁড় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। এই রূপ করাতে ভূপালের আরও রাগ বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে সে ভাঁড় মাথার উপর করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে কিছু দূরে দৌড়িয়া গিয়া, বেচারা কুন্দের প্রিয় সামগ্রী সেই মাটীর ভাঁড়টী দেয়ালে আছাড় মারিয়া চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল উচিত, মন কুন্দ এইবার আসুক না, আর ভাঁড় নিয়ে একদিন না।" বলা বাহুল্য যে সাধের ভাঁড় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, এবং ইহাই আজ বালিকা কুন্দের দুঃখের কারণ। নলিন চুপ করিয়া এই কথাগুলি শুনিল। তার পর ভগ্নীর হাত ধরিয়া দুজনে বাড়ীর দিকে ছুটিল। নলিনের স্বাভাবিক হাসাহাসি মুখ-খানি আজ বড় দুঃখে ভার হইয়াছে; কুন্দের দুঃখে নলিনের ভয়ানক দুঃখ হইয়াছে। বালিকার ঘিন্‌ঘিনে স্বভাব ছিল না, শীঘ্রই পথের ধারের বনফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সাধের ভাঁড়ের কথা ভুলিয়া গেল।

তাহারা কিছু অধিক অৰ্দ্ধেক পথ গিয়াছে, এমন সময় তাহাদের সহিত নলিনের একজন বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। সেই বালক কয়েকদিন তাহার পিতার পীড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে পারে নাই, এক্ষণে নলিনকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "নলিন! আমার পিতা অনেক সুস্থ হইয়া-ছেন, আমি কাল স্কুলে যাইব।" নলিন হেঁটমুখে বলিল "তা বেশ!"

দেবনাথ বলিল, "কেন, তোমার কি হইয়াছে? তোমাকে বিমর্ষ ও গম্ভীর দেখাইতেছে কেন? তুমি কি আজ স্কুলে কোন লজ্জায় পড়িয়াছিলে?" নলিন বলিল "তা না। কিন্তু ভূপাল আজ বড় মন্দ কাজ করিয়াছে, সে কুন্দের ভাঁড় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে।" দেবনাথ বলিল, "ভূপালের অতিশয় অন্যায় করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি তোমার দুঃখিত হইবার কারণ দেখিতেছি না। আমি বেশ বলিতে পারি, ভূপাল আপনই আপনার মন্দ ব্যবহারের কথা ভাবিয়া দুঃখিত হইবে।" এই কথা শুনিয়া নলিন রাগের ভরে বলিল "আমি তাহাকে এর শাস্তি দিব। যদি সে আমার অপেক্ষা বলবান না হইত তাহা হইলে আমি যাইয়া তাহাকে মারিতাম, কিন্তু যখন তাহা পারি-তেছি না, আমি হয় তাহার নূতন লাঠিম ভাঙ্গিয়া দিব না হয়—" দেবনাথ বলিল, "এ! থাম, থাম। তোমার এপ্রকার বলা বা এমন কি ভাবা ও উচিত

কে

নহে। তুমি কি জান না ইহাকেই প্রতিশোধ লওয়া বলে অর্থাৎ খারাপের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা? কিন্তু আমাদের কি করা উচিত? আমাদের অসাধুতাকে সাধুতার দ্বারা জয় করা উচিত।" নলিন বলিল, "কেন আমরা স্কুলে কিছু দোষ করিলে শিক্ষক মহাশয় ত আমাদিগকে শাস্তি দেন।" দেবনাথ উত্তর করিল "বটে; কিন্তু আমাদিগকে সেই কার্য্য হইতে ভাল করিবার জন্য; কিন্তু তুমি ভূপালের শিক্ষক নও; আর তা ছাড়া তুমি তাহার কিছু ক্ষতি করিতে চাও, কারণ তোমার মনে একটী খারাপ ভাব রহিয়াছে এবং সেই ভাবকেই 'প্রতি হিংসা' বলে।" নলিন কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিল; পরে বলিতে লাগিল, "ভূপাল যদি আমার কোন অপকার করিত তাহা হইলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম; কিন্তু হায়, আমার ভগ্নী কুন্দ! আহা! তার ক্ষতি করিল কেন? আমি কাহাকেও কুন্দকে কষ্ট দিতে দিব না।" দেবনাথ বলিল "আচ্ছা তুমি যদি ভূপালের লাঠিম ভাঙ্গিয়া দাও,তাহা হইলে তাহাকে কি কুন্দের প্রতি কি এরূপ আর কাহারও প্রতি দয়ালু হইতে বা মৃদুব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে? আমার পিতা সে দিবস বলিতেছিলেন, আমাদের প্রিয়জনের উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহাকে ভালবাসা বড়ই শক্ত কিন্তু শক্ত হইলে কি হয়? আমরা যদি পরমেশ্বরের নিকট হইতে দয়া পাইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আমাদের শত্রুকেও ভালবাসা দেওয়া উচিত"। নলিন প্রায় কাঁদকাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল, "আমার বোধ হইতেছে যেন ভূপালকে ক্ষমা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।" দেবনাথ বলিল, "ভাল, তোমার এই যে সৎইচ্ছা হইয়াছে, তাহা যাহাতে থাকে তাহার জন্য একমনে পরমেশ্বরকে ডাক। যাহার ইচ্ছা ভাল ঈশ্বর তাহার সহায়"—এই কথা বলিতে বলিতে দেবনাথ পথের এমন স্থানে উপস্থিত হইল যেখান হইতে তাহার যাইবার পথ অন্যদিকে ফিরিয়াছে। অতএব নলিনকে বলিল "এস ভাই এস, আমি আজ চলিলাম।" নলিন একটীও কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কুন্দের সহিত ক্রমাগত চলিতে লাগিল। এদিকে কুন্দ ও পথ পার্শ্বস্থ ফুল তুলিতে তুলিতে ক্লান্ত হইয়াছে, ভাইয়ের হাত ধরিয়া অবশেষে দুজনে গৃহে পৌঁছিল। বাড়ী আসিয়াই কুন্দ মায়ের নিকট দৌড়িয়া গেল এবং তাঁহাকে মাটীর ভাঁড়ের কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু নলিন খানিকক্ষণ দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। ইহার কারণ কি? সে কি এখন কেমন করিয়া ভূপালের লাঠিম নষ্ট করিবে তাহা ভাবিতেছে? না, কি রূপে সে নিজের রাগ থামাইবে তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে নলিন এক দিন স্কুলে যাইতেছিল। সে দিন কুন্দের শর্দ্দি হওয়াতে স্কুলে যাইতে পারে নাই। নলিন দূর হইতে শুনিল একটী বালক কাঁদিতেছে। নিকটে আসিয়া দেখিল, সেই বালক আর কেহই নয় আগেকার চেনা লোক—ভূপাল। নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" ভূপাল মাথা তুলিয়া যখন দেখিল নলিন তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তখন সে কিছু না বলিয়া অমনি মুখ নামাইল। নলিন পুনরায় মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ভূপাল! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে বল তোমার কি হইয়াছে।" নলিনের এই স্নেহের কথায় ভূপাল আর থাকিতে পারিল না, বলিল "আমি অতিশয় ক্ষুধিত, মা আমার কাল সকাল হইতে জ্বরে শয্যাগত আছেন এবং আমি এপর্য্যন্ত কিছুই খাই নাই।" নলিন বলিল, "দুর্ভাগা বালক, আহা, তুমিত ক্ষুধিত হইবেই! আমার সহিত একখানা ভাল রুটি আছে আমি উহা তোমাকে দিতেছি।" ভূপাল বলিল, "এই রুটী কেমন

নিজেরই আবশ্যক হইবে, ইহা তোমার সকাল বেলার খাবার।" নলিন ক্ষুদ্র একখণ্ড আপনার জন্য রাখিয়া অপরখণ্ড ক্ষুধিত ভূপালের হাতে দিল। ভূপাল যদিও মাঝে মাঝে অত্যন্ত গোঁয়ার হইয়া উঠিত তথাপি তাহার মনটী নিতান্ত মন্দ ছিল না। এই জন্য নলিনের এই দয়া তাহার বিলক্ষণ মনে লাগিল। সে বলিল "আমি তোমার ছোট ভগিনীর উপর যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি তাহা বিবেচনা করিলে আমি কোন প্রকারে তোমার এই দয়ার যোগ্য নহি। বাস্তবিক কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিতে পার?" নলিন বলিল, "পারি। আমি সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমি আশা করি তুমি আর কখনও কুন্দের প্রতি রাগ প্রকাশ করিবে না।" ভূপাল বলিল, "কখনই না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ প্রাতের এই ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে।"

সেই দিন হইতে বাস্তবিক ভূপাল তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল; আর কখনও তাহার মুখ হইতে নলিন বা কুন্দের প্রতি কর্কশ কথা শুনা যায় নাই। তা ছাড়া অপরাপর বালক বালিকাদিগের প্রতিও সে আর কখন অভদ্র ব্যবহার করে নাই। সেই দিন হইতে সে ভাল হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে ভূপাল তাহার খুড়ীমার নিকট হইতে মেলায় খরচ করিবার জন্য একটী সিকি পাইয়াছিল। তখন সে আর কিছু না কিনিয়া কুন্দের সেই ভগ্ন ভাণ্ডের মত আর একটী ভাঁড় কিনিতে সেই সিকি খরচ করিল। নলিন যে দেবনাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার উপদেশ মত কার্য্য করিয়াছিল ইহা কি নলিনের পক্ষে ভাল হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছিল। প্রতিহিংসা বা রাগ হইতে মুক্ত হওয়াই [illegible]দের কর্ত্তব্য। অপরে করুক না করুক আমরা কখনও কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিমুখ না হই।

(☞ আমরা এই প্রাপ্ত প্রবন্ধের ভাষা অনেক স্থানে বদলিয়া দিয়াছি। প্রবন্ধ-প্রেরকের প্রতি অনুরোধ, ভাষার দিকে এবং প্রবন্ধের আকারের দিকে একটু দৃষ্টি রাখেন। সখা-সম্পাদক।)

ঠাকুরদাদার গল্প।

অদ্য আবার ঠাকুরদাদা নবীন বাবু বায়ুসেবনে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় পৌত্র দৌহিত্রগণও উৎসুক মনে সঙ্গে আসিয়াছেন ও অমূল্য, মন্মথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকগুলি বালককে লইয়া আসিয়াছেন। কেন না ভাল ভাল কথা সকল শুনিতে হইলে একাকী না শুনিয়া অনেককে সঙ্গে করিয়া লইলে এককালে অনেকেরই উন্নতি হয়;—যেমন কোন ভাল সামগ্রী একা না খাইয়া প্রিয়-বন্ধুদিগকে দিয়া খাইলে বেশী মিষ্ট লাগে, সেইরূপ ভাল কথাও অনেকে একত্রে শুনিলে ভাল হয়।

কিশোরী—সেদিনকার প্রশ্নটী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক ইহার কারণ কি?" নবীন বাবু বলিলেন, "এ বিষয়টী তত সহজ নহে, তোমরা সকলে স্থির ভাবে বসিয়া মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। এটী বুঝিতে হইলে তোমাদিগকে আরও অনেকগুলি বিষয় বুঝিতে হইবে, সে গুলি এখন সহজভাবে বলিয়া যাই, অন্য সময়ে সে গুলিও এক একটী করিয়া বুঝাইব। প্রথমতঃ—তোমরা জান পৃথিবীর যে উত্তাপ আমরা অনুভব করি, সে সমস্তই সূর্য্য হইতে পাই;—সূর্য্যই আমাদের সমুদায় উত্তাপের মূল কারণ। আর এটীও জানিও যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৪ কোটী ৮০ লক্ষ ক্রোশ দূরে আছে।

সকলে:—উঃ! কি ভয়ানক দূরে!

নবী:—এখন শোন। তোমরা যদি একটী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হাত দেও তাহা হইলে তোমা-

দের হাত পুড়িয়া যাইবে; আর যদি সেই অগ্নির নিকট হাত রাখ তবে পুড়িবে না বটে কিন্তু ভয়ানক যাতনা হইবে এবং অধিকক্ষণ সে রূপে রাখিলেই হাতে ফোস্কা হইবে। কেমন? (সকলে:—হাঁ) নবী।—আবার যদি একটা লৌহের শিকের একটা দিক সেই আগুনে রাখিয়া কিছু পরে তাহার অপর দিকে হাত দাও তাহা হইলেও হাতে খুব আঘাত লাগে। (সকলে:—লাগে) বেশ কথা! এখন দেখিতেছি যে কোন একটী তেজোময় বস্তু হইতে উত্তাপ পাইবার এই তিন রকম উপায় আছে:—(১) ঐ বস্তুর "স্পর্শ" দ্বারা; ২) উহার সহিত যোগ না থাকিলেও "উত্তাপের ব্যাপ্তিগুণ" দ্বারা ও (৩) উহার সহিত কোন ধাতু নির্ম্মিত বা তদ্রূপ অন্য কোন বস্তুর এক দিক যোগ রাখিয়া অপর দিকের স্পর্শ দ্বারা। এই স্থানটী তোমাদের একটু কঠিন বোধ হইবে, কিন্তু মন দিয়া শুনিলে বেশ বুঝিতে পারিবে সন্দেহ নাই। যে কোন দ্রব্য হউক অগ্নিতে পড়িলে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কাষ্ঠ, বস্ত্র, কাগজ, যাহা ইচ্ছা, একটু অগ্নি সংলগ্ন হইলেই জ্বলিয়া উঠে। এটী প্রথম উপায়ের দ্বারা। আবার কোন গৃহের একটী কোণে একটী অগ্নিপাত্র রাখিয়া দিলে সে গৃহটী শীঘ্রই উত্তপ্ত হয়, আতষী নামে এক প্রকার পাথর আছে (কাচের ন্যায়) তাহার ভিতর দিয়া রৌদ্র টিকার উপর ফেলিলে ঐ টিকাতে আগুণ ধরে, অথচ টিকা ঐ পাথরে লাগে না, এ গুলি দ্বিতীয় উপায়ের দ্বারা। তাপের আধার যে অগ্নি তাহা হইতে চারিদিকে ঐ তাপ ব্যাপ্ত হইতেছে সুতরাং অগ্নি স্পর্শ না করিলেও নিকটে থাকিলে তাহার উত্তাপ বেশ অনুভব করা যায়।

অমূল্য:—কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইলেত আর তাপ পাওয়া যায় না।

মন্মথ:—হাঁ, দাদামশাই। মা যখন রাঁধেন, তখন দেখিছি, আমি ঐ উনানের যত নিকটে থাকিব তত মুখে তাপ লাগে, আর যত সরিয়া যাই ততই কম তাপ লাগে।

নবী:—তাত হবেই। সব কাজেরইত সীমা আছে, তাপ ত আর অসীম দূর অবধি ছোটে না, যত দূরে যাইবে উত্তাপ ততই হ্রাস হইবে। আরও একটী কথা আছে। অগ্নি যদি ছোট হয় তাহা হইলে তাহার উত্তাপ তত অধিক দূর যায় না, অগ্নি বড় হইলে যত দূর যায়। মনে কর একটী প্রদীপের খুব নিকটে গেলেও হয়ত কোন তাপ পাওয়া যায় না, একটী পাত্রে কতকগুলা গুল্ পোড়াইলে সে পাত্রের তত নিকটে আর যাওয়া যায় না, আবার কতকগুলা শুষ্ক বৃক্ষপত্র রাশীকৃত করিয়া অগ্নি দিলে তাহার অনেক দূর পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করে; তথাপি তাহারা নিকটে যত গরম, দূরে তত নহে; ক্রমে ক্রমে কম। সুতরাং বুঝা যাইতেছে দ্বিতীয় উপায়ে অর্থাৎ 'তাপব্যাপ্তি' দ্বারা পদার্থ সকল অগ্নিকে স্পর্শ না করিয়াও দূরে থাকিয়াও উত্তাপ পাইতে পারে,—যদি অগ্নি বেশ বড় হয়। তৃতীয় উপায়টীর নাম "তাপ পরিচালন"। ইহা দ্বারা দ্রব্যের এক ভাগে উত্তাপ লাগিলে ঐ তাপ পরিচালিত হইয়া উহার অপরাপর ভাগকেও তপ্ত করিয়া তুলে, যেমন লৌহের শিক। এটী বড় মজার গুণ। যেমন কতকগুলি বালক থাকে তাহাদিগের এক জনকে একটী কোন কথা বলিলে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই শুনে, সেইরূপ লৌহ, তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের এমনি স্বভাব যে এক অংশে তাপ দিলে ক্রমে দূরস্থ অংশ গুলিও তপ্ত হইয়া উঠে, এই উত্তাপ চালনের শক্তি আছে বলিয়া এই সকল বস্তুকে "পরিচালক" কহে। আবার কতকগুলি বালক আছে তাহারা অতি সৎ পরের কথা লইয়া নাড়াচাড়া কানাকানি করে না, তাহারা নিজ ক[illegible] রত থাকে, কোন কথা কাহাকেও বলে না। [illegible]কেন

রূপ কতকগুলি পদার্থ আছে তাহারা উক্ত প্রকারে এক অংশ হইতে অন্যাংশে তাপ চালিত করিতে পারে না, তাহাদিগকে "অপরিচালক" কহে, যথা কাচ, তুলা, পশম ইত্যাদি—।

চন্দ্র :—কাচের এক দিক তাতাইলে কি অপর দিক গরম হয় না? আচ্ছা আমি আজ বাড়ী গিয়া পরখ করিয়া দেখিব।

নবী : হাঁ! এইরূপে তোমরা যদি সকল বিষয় নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহা হইলে পরে বিলক্ষণ উন্নতি করিতে পারিবে। সে যাহা হউক, এখন বল দেখি, সূর্য্য যে একটী প্রকাণ্ড তেজোময় পদার্থ আর আমাদের পৃথিবী যে ইহা হইতে উত্তাপ পায়—তাহা এই তিনটী উপায়ের কোন্‌টীর দ্বারা?

কিশো :—প্রথমটীর দ্বারাত নয়ই, কেন না সূর্য্যত পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া নাই। বোধ হয় দ্বিতীয়টীর দ্বারা, সূর্য্যের কিরণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও এক দিকে পৃথিবীতেও আসে। কেমন, এই না?

অমূল্য :—কেন তৃতীয়টীও হয়ত। সূর্য্যের তাপে আকাশ তাতিয়া ঐ তাপ পরিচালিত হইয়া আমাদের কাছে আসে?

নবী :—না তা নহে, কিশোরীই ঠিক বলিয়াছে। সূর্য্যের তেজ সকল দিকে ছড়াইয়া পড়ে তাই "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পৃথিবীও তপ্ত হয়। আর এত ভয়ানক দূরে থাকিয়াও যে সূর্য্যের তেজ এত পাওয়া যায় তাহার কারণ সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৪ লক্ষ গুণে বড়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অগ্নি যত বড় হইবে তেজ তত অধিক দূর অবধি ব্যাপ্ত হইবে। তাই এই দূরত্ব সত্বেও সূর্য্যের প্রকাণ্ড আকার বলিয়া তাপের ব্যাঘাত হয় না। আর তৃতীয় উপায়টীত হইতেই পারে কারণ আকাশ কোন বস্তু নহে কেবল শূন্য। পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত এই যে বিস্তীর্ণ পথ ইহাতে কোন বস্তু নাই। সুতরাং আকাশকে পৃথিবীর অংশ বলা যায় না। বুঝিলেত? (সকলে; "হুঁ"।)

নবী :—এখন কেবল আর একটী কথা বুঝিলেই হয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে উপর পর্য্যন্ত যে বায়ুরাশি দেখিতেছ, পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহা ২৫ ক্রোশের উপরে আর দেখা যায় না, সেখানে বায়ু নাই, আর যত উপরে উঠা যায়, বায়ু ততই পাতলা। সূর্য্যের তেজ পৃথিবীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে এই বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিবে। সুতরাং সহজ বুদ্ধিতে উপরের বায়ু অগ্রে ও ক্রমে নিম্নের বায়ু উত্তপ্ত হইবারই কথা কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। কেন?—শ্রবণ কর। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কঠিন দ্রব্যের মত বায়ু "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা অতি সামান্যই হয়। তাহা যদি না হইল, তাহা হইলেই বেশ দেখা গেল যে সূর্য্যের কিরণ এই বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিবার কালে ঐ বায়ুকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। যেমন চিনির বলদ দোকান হইতে চিনির মোট বহিয়া আনে কিন্তু নিজে তাহার কোন স্বাদ পায় না, সেইরূপ বায়ু বোকা বেহারর ন্যায় সূর্য্যদেবের উত্তাপ ২৫ ক্রোশ পথ বহিয়া পৃথিবীকে আনিয়া দেয় অথচ নিজে তাহার একটুও তাপ পায় না, নিজে যেমন শীতল তেমনি থাকে। বুঝিলেত? (সকলে "হাঁ বেশ বুঝিলাম।")

কিশো :—আচ্ছা তা যদি হইল, তবে দুই প্রহরের সময় বাতাস এত আগুনের মত হয় কেন?

নবী :—তাহা বলিতেছি শোন। বায়ুত তেজ আনিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠে দিল, ক্রমে যত বেলা হইতে লাগিল পৃথিবী ততই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; আবার বায়ু বহিতে বহিতে সেই তপ্ত মাটী, রাস্তা,

বাড়ী প্রভৃতিতে ঠেকিয়া উত্তপ্ত হয়। এটী কিন্তু প্রথম উপায় দ্বারা তাহা যেন মনে থাকে; উষ্ণ পদার্থের "স্পর্শে" বায়ু তাপ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পারে না। এজন্য দেখা যায়, যতক্ষণ মাটী না গরম হয় ততক্ষণ বায়ু তপ্ত হয় না কিন্তু বেলা ৯টার পর হইতে যতই মাটী, পথ, বাড়ী গরম হয় ততই বাতাস গরম হইতে থাকে। আর এক মজা দেখ, খুব রৌদ্রের সময় গঙ্গার মধ্যস্থলে নৌকায় বসিলে অনেকটা শীতল বায়ু ভোগ করা যায়। আবার পল্লীগ্রামে মধ্যাহ্নে রৌদ্রের যেরূপ তাপ কলিকাতায় তদপেক্ষা অনেক অধিক, তাহারও কারণ এইঃ—জল বা গাছ পালা তত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না, যত শীঘ্র রাস্তা বাড়ী পাথরের টালী প্রভৃতি হয়।

এখন বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছ যে বায়ুর উত্তাপ একেবারে সূর্য্যের উপর নির্ভর করে না, তবে কি? প্রথমে, বায়ু সূর্য্যের তেজ পৃথিবীকে আনিয়া দেয়, পরে তাহাতে পৃথিবী বেশ তপ্ত হইলে তবে তাহার স্পর্শে বায়ু আবার তপ্ত হইয়া উঠে। যেন বায়ু পৃথিবীর চাকর; চাকর একটী আম্র আনিয়া মনিবকে দিল, তিনি ইচ্ছামত খাইয়া পরে সেই উচ্ছিষ্ট আম্র একটু চাকরকে দিলেন। (বালকেরা হাসিয়া উঠিল।) সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বায়ু যদি 'স্পর্শ' ভিন্ন উত্তাপ লাভ করিতে না পারে, এই ২৫ ক্রোশ উচ্চ বায়ুরাশির যে অংশ তপ্ত পৃথিবীর নিকটে থাকিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পায়, তাহাই গরম হয়; কাজেই নীচের বায়ুই কেবল গরম হইতে পায়। একারণ নীচে হইতে যত উপরে উঠা যায়, ক্রমে ততই বায়ুর শীতলতা বেশ বোধ হয়। অবশেষে অধিক উচ্চে এত শীত যে সেখানে গেলে আমরা মারা যাই। এমন কি ২।৩ ক্রোশ উপরেই জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। এই জন্যই সিমলা, দার্জ্জিলিং, নেপাল প্রভৃতি স্থান ভয়নাক গ্রীষ্মকালেও খুব শীতল। কে কেমন বুঝিলে বল?

কিশোঃ—দাদা, সেদিন অবধি কত লোককে একথাটী জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কেহই ইহা এরূপ বুঝাইতে পারে নাই, এখন আমিই ১০০০ জন লোককে বুঝাইয়া দিতে পারি।

বিনয়—আমাকে এক জন বলিয়াছেন যে উপরে সূর্য্যের তাপ বাঁকা হয়ে পড়ে, ভাই! কিন্তু আমি তা বুঝিতে পারি নাই, আজ বেশ বুঝিলাম!

সকলে আনন্দ করিতে করিতে বাটী গেলেন। যাইবার সময় বিনয়কে মন্মথ বলিতেছে "দাদা দেখিলে তুমি যে সে দিন বল্‌ছিলে দাদামশাই হয়ত এবার বুঝাইতে পারিবেন না? ছি! ও রকম অশ্রদ্ধার কথা বলিও না।"

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সখার পাঠকপাঠিকাদিগকে জানান যাইতেছে যে আমরা এবৎসর চিত্র বিষয়ে একটী পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পাঠকপাঠিকাগণ যে কোন বিষয়ে চিত্র করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা অন্য কোন ছবি দেখিয়া নকল করা না হয়। আগামী ১৫ই আগষ্টের অর্থাৎ আর এক মাসের মধ্যে ছবি গুলি আমাদের এখানে পৌছান আবশ্যক। পেন্সিল বা রং যাঁহার যেরূপে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। ছবিগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রেরক বা প্রেরিকার নাম, ধাম, এবং বয়স লিখিতে হইবে, এবং শিক্ষক বা অভিভাবকের নিকট হইতে এই ভাবে লিখিয়া ঐ সঙ্গে পাঠাইতে হইবে যে, "এই বালক কিম্বা বালিকা কাহারও সাহায্য না লইয়া এই ছবিটী করিয়াছে।" আগষ্ট মাসের শেষে পুরস্কারটী দেওয়া যাইবে। আমরা আশা করি সখার পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদের একটুকুও চিত্র করিবার অভ্যাস আছে, তাঁহারাই এইবার চেষ্টা করিবেন।

'সখা' কার্য্যাধ্যক্ষ।

৫০ নং সীতরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওরে আমার পায়রা মণি।

ওরে আমার পায়রামণি কোথায় ছিলে এত বেলা ?
খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে কোথা গে ক'র্‌ছিলে খেলা ?
পেটের ভিতর পেট পড়েছে, মুখখানি শুকিয়ে গেছে,
এমন করে থাক্‌তে আছে
নাওয়ায় খাওয়ায় করে হেলা ?
জান না, মা বলেন আমায়
"খেলায় ভুলে খেলে বেলায়,
পিত্তি পড়ে অসুখ হবে দুঃখ পাবে কত,
কটু,কষা, তেত ওষুধ খাইয়ে দেবে কত !!"
আর কখন এমন ক'রে,
খাবার ফেলে খেলার তরে,
পিত্তি পড়ে থেকনাক অবোধ ছেলের মত !
তা হ'লে ধন ! দেখবে তখন ভালবাস্‌বো কত !
কত খাবার তোমার তরে, রেখেছি যে যত্ন করে,
দেখবে চল খাবে চল ক্ষিদে আছে যত ;
মটর, কলাই, চাউল, ছোলা,
রেখেছি ওই ভরে ডালা,
যা'চাও তাই দেব যাদু ! খাবে ক্ষিদের মত !
দু-পায় দুটী দেব ঘুমুর, বাজবে কেমন ঝুনুর ঝুনুর,
আহ্লাদেতে নাচবে যখন "বাকুম বাকুম" ক'রে।
মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমি দেখবো দু চোক ভরে !
আবার যদি এমন তর, খাবার খেতে বেলা কর,
খু তখন বকবো কত অবোধ ছেলে ব'লে !
র দেব না আদর তোমায় নেবনা আর কোলে !!

ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। যদি সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি দশের প্রশংসাভাজন হইতে হয়, যদি প্রকৃত মনুষ্য নাম প্রার্থনীয় হয়, তবে শারীরিক, মানসিক সকল কার্য্যকেই ঈশ্বরের মনে করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও। ২। কলা। ৩। পৃথিবী।

৪। ছেলের বয়স, ৩৬; বাবার বয়স ৬৩; ঠাকুর্দ্দাদার বয়স ৮৪।
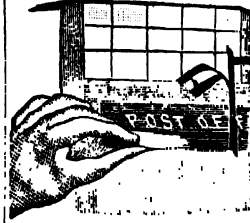
পত্র প্রেরকদের প্রতি—অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর চান ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমরা সকল আবশ্যকীয় পত্রেরই উত্তর যথা সময়ে দিয়া উঠিতে পারি না;তবে অনাবশ্যকীয় পত্রের কি উত্তর দিব ? যাঁহাদের পত্রোত্তর পাইবার নিতান্তই ইচ্ছা, তাহারা আপন আপন পত্রমধ্যে এক একখানা টিকিট বা পোষ্ট কার্ড পাঠাইবেন। অনেক বালক রচনা পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে পত্র লিখিতে তাড়াতাড়ি ছাপাইবার অনুরোধ করেন, এবং ছাপান কেন হইবে না তাহার কারণ দেখাইতে বলেন। আমরা তদুত্তরে বলি যে আমরা অত অধিক অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি না। পত্র প্রেরকগণ ছাপান না হইলেই জানিবেন, হয় স্থানাভাব না হয় মনোনীত নহে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ, সিটী স্কুল—লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের অনেক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে লইয়া একটী সভা আছে। স্কুলের অধ্যক্ষগণের এই সভার প্রতি যত্ন আছে। এই সভার সভ্যেরা পদ্য মুখস্থ বলা, কথোপকথন অভিনয়ের ভাবে আবৃত্তি করা, চাঁদা তুলিয়া গরিবকে দান করা এবং রচনা ও অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া পুরস্ক'র দেওয়া এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন বিষয়ে রচনা পাঠ ও উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা হয়। আমরা সকল স্কুলেই এইরূপ সভা হওয়া উচিত মনে করি।

... এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। আগষ্ট, ১৮৮৩। ৮ম সংখ্যা।
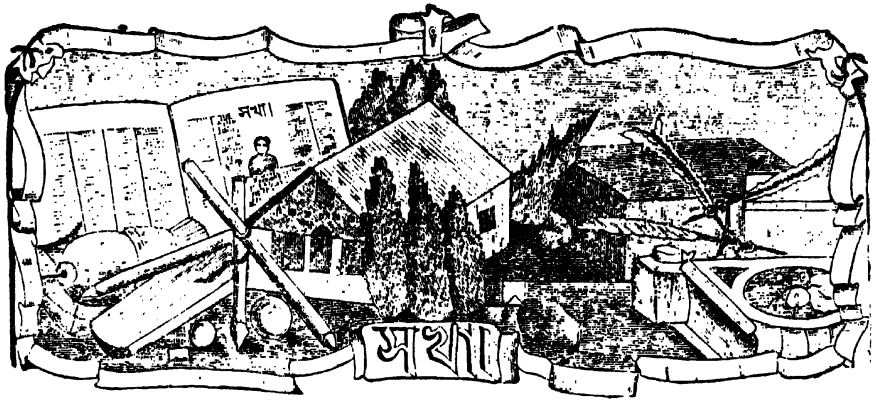
ভীমের কপাল।

৯ম অধ্যায়।

এই বারে জগদীশ্বরের কৃপায়—ভীমেন্দ্র বিপ্রদাস বাবুর সহিত নিরাপদে বগুড়ায় পৌঁছিল। যতক্ষণ ভীমেন্দ্র গাড়ীতে ছিল সমস্ত সময়টা ভীমেন্দ্র কল্পনায় হরিপদ বাবুর ছেলেদের সহিত কথা বলিতেছিল এবং কখন এই কল্পনা কাজে ফলিবে, তাহাই ভাবিতে ছিল।—যথা-সময়ে ভীমেন্দ্র হরিপদ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং যতক্ষণ বিপ্রদাস বাবু জামাতার সহিত বাহিরবাড়ীতে আলাপ করিতেছিলেন, ভীমেন্দ্র ততক্ষণ 'খোকা' 'খোকা' করিয়া বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গিয়া ছোট খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়াছে। বাড়ীর সব ছেলেগুলি ভীমের সঙ্গে যুটিয়াছে—কেহ কাঁধে, কেহ কোলে, কেহ পিঠে—ভীমেন্দ্র ২ মিনিটের মধ্যে যেন ছেলে বিক্রীর দোকান খুলিয়াছে।—ভীমেন্দ্র এইরূপ সুখে কিছু-কাল কাটাইয়া বসন্তবালাকে নিজের অবস্থার কথা বলিল। বসন্তবালা বলিলেন "তুমি কোথায় ছিলে তাহা জানিতাম না, তার জন্য বড় ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু তুমি সে রঙ্গলপুর পর্য্যন্ত গিয়াছ, তাহা জানি, কারণ এখানকার মুন্‌সেফ্ বাবুর ভাইপোর যে গাড়ীতে যাবার কথা ছিল, তিনি গিয়া দেখিলেন—সে গাড়ী নাই—এক গাড়ীতে একটা বাক্স রহিয়াছে। তখন তিনি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ বাক্স কার?' গাড়োয়ান বাবুর নাম করিয়া বলিল, তাঁহার। সে বাক্স আমরা পাইয়াছি।—তা, তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে তোমার জন্য যে কত দুঃখ করি-য়াছি বলিয়া শেষ করিতে পারি না, তুমি বাবার সঙ্গে আসিয়াছ, তবু সুখের কথা—তা না হলে, আবার হয়ত কোথায় গিয়া পড়িতে"—ভীমেন্দ্র এই শেষের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইল—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া কোন ও কাজে হাত দিব না।—ভীমেন্দ্র এইরূপে নানা কথায় সে দিন কাটাইল। আবার ভীমেন্দ্র বালকদিগের মনোরঞ্জন কার্য্যে নিযুক্ত হইল—একটী কথা এখনও বলা হয় নাই—হরিপদ বাবুর ছেলেরা স্কুলে যাইত না।—হরিপদ বাবু দেখিয়া-ছিলেন অনেক ভাল ছেলে স্কুলে গিয়া অসৎ ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া অসৎ-প্রকৃতি হইয়া গিয়াছে; সুতরাং যতদিন ছেলেদের পরিপক্ক বুদ্ধি না হয়, যতদিন তাহারা ভালমন্দ বু[ঝিতে] না পারে, ততদিন তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পা...

অন্যায়, হরিপদ বাবুর এই ধারণা ছিল; সুতরাং হরিপদ বাবুর ছেলেরা স্কুলে যাইত না। বসন্ত-বালা দেবী দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যাবেলা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; সময় হইলে হরিপদ বাবু ও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন; কিন্তু সাধারণতঃ মাতার দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইত।—ভীমেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে যতদিন এখানে ছিল ছেলেরা দাদা-বাবুর কাছেই পড়িতে চাহিত; সুতরাং ভীমেন্দ্র যতদিন এখানে ছিল বসন্তবালা ছেলেদের পড়া-ইতে পারেন নাই, সমস্তই দাদাবাবু করিয়াছেন—আবার ভীমেন্দ্রের উপর সেই ভার পড়িল। আবার ছেলেরা 'দাদাবাবু' নহিলে আর কাহারও কাছে পড়িতে চায় না। ভীমেন্দ্রের উপর ছেলে পড়াইবার ভার পড়িল—তবে বসন্তবালা সাধা-রণ ভাবে এক একবার ছেলেদের দেখেন।—এইরূপে অনেক দিন এইখানে কাটিয়া গেল। ভীমেন্দ্র প্রায় দুমাস কলিকাতা হইতে দূরে রহি য়াছে—অবশেষে হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে কলি-কাতায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন—আবার পূর্ব্বের ন্যায় বাক্সে পূরিয়া কাপড় ও খাবার দিলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাথেয় দিলেন; কিন্তু যাহাতে গাড়ীতে ভুল না হয়, হরিপদ বাবু তদর্থে বিশেষ চেষ্টা করিলেন—সুতরাং এবারে কোনও গোল হইল না। আবার রাত্রিতে ছেলেদের ভুলাইয়া ভীমেন্দ্র গাড়ীতে উঠিল। ভীমেন্দ্র গাড়ীতে দেখিল—বাক্স আসি-য়াছে কিনা—গাড়োয়ানের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল, যাহার সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই গাড়োয়ান কিনা—তখন নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠিল কিন্তু উঠিয়াও পথ চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল 'চৈতন্য গ্রাম যাইতে হইলে এই পথে যাইতে হয় কিনা'—'আমরা চৈতন্য গ্রামে যাই-[illegible] কিনা'—এই সকল বিষয়ে সন্তোষজনক [illegible] লইয়া ভীমেন্দ্র গাড়ীর ঝাঁকুনির মধ্যেও নিদ্রিত হইল।—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী চলিল। ভীমেন্দ্র 'ছোট খোকা'কে স্বপ্ন দেখিতেছিল—দেখিতেছিল যেন 'ছোট খোকা' তাহার কাণ ধরিয়া টানিতেছে, এবং মুখের জল পেটে গড়া-ইয়া পড়িতেছে এই ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁত-শূন্য মাড়ি খুলিয়া মনের সাধে হাসিতেছে।—ভীমে-ন্দ্রের এমন সুখের স্বপ্ন কে ভাঙ্গিল? গাড়োয়ান ভয়ানক ব্যস্তভাবে বলিল "বাবু, ও বাবু—শীগ্‌গির ওঠ!"—ভীমেন্দ্র উঠিল কিন্তু উঠিয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারিল না—দেখিল খানিকটা দূরে কতকগুলি আলো জ্বলিতেছে আর কতক-গুলি প্রকাণ্ড মোটা লোক ভয়ানক চীৎকার করতঃ 'মার' 'মার' করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।—কাহারও কথা বলিবার সময় হইল না।—পলাই-বার ও সময় হইল না। ডাকাইতের দল নিকটে আসিয়াই আলো নিবাইয়া দিল।—অন্ধকার রাত্রে যখন কে কোথায় লক্ষ্য রহিল না—তখন দলের মধ্যে ২ | ৩ জন গাড়ীর উপরে লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল। ভীমেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। গাড়োয়ান একটু জোর করিয়াছিল—কিন্তু ডাকা-ইতের সর্দ্দারের লাঠির ঘা মাথায় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন দলের মধ্যে একজন হুকুম দিল—'আলো জ্বেলে দেখ্ কোন জিনিশ আছে কিনা।' আলো জ্বালা হইল।—দেখা গেল গাড়ো-য়ান রক্তময় শরীরে গাড়ীরপাশে পড়িয়া আছে।—গরু গুলি দড়ি ছিঁড়িয়া কোথায় গিয়াছে, তাহার খোঁজ নাই, আর একটী বালক গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। গাড়ীর মধ্য হইতে বাক্স বাহির করা হইল—তখন ভীমেন্দ্র বিপদে 'যাহা হয় হবে' ভাবিয়া জোর করিল। অমনি একজন তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল আর একজন মাথায় লাঠি মারিল। ভীমেন্দ্র অচেতন হইল। হা জগদীশ্বর!—ভীমেন্দ্র আর কত কষ্ট

সহ্য করিবে? কবে ভীমেন্দ্র বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে? ভীমেন্দ্রকে বালক দেখিয়া একজন ডাকাতের দয়া হইল!—সে বলিল 'আহা বালক, একে অত শাস্তি কেন?' মেঘের ডাকের মত গলা চড়াইয়া একজন উত্তর করিল "কি! রঘুরামের কাজের উপর কথা? খবরদার!!"—রঘুরাম শিকদার ডাকাতের দলের সর্দ্দার; রঘো ডাকাতের নাম সে সময় কাহারও অজানা ছিল না, ইংলণ্ডে রবিন হুডের নামে যেমন ছেলেরা কাঁপিত, আমাদের দেশে রঘো ডাকাতের নামেও সেইরূপ ছেলেরা কাঁপিত। রঘো ডাকাতের এই তাড়না শুনিয়া কেহ কিছুই বলিতে সাহস করিল না। তখন সকলে মিলিয়া ভীমেন্দ্রকে বাঁধিল; বাক্স ভাঙ্গিয়া দেখিল খাবার রহিয়াছে—অট্ট হাস্য করিয়া খাবার গুলি খাইল; এবং টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া সম্মুখস্থ মাঠ পার হইয়া চলিয়া গেল। ভীমেন্দ্রকে কেন কাঁধে করিয়া লইয়া গেল তাহা ঈশ্বরই জানেন।

ক্রমশঃ—

"না, আমি প্রতারণা করিব না"

আমাদের 'সখা'র পাঠকপাঠিকাগণকে নিম্নলিখিত বিষয়টী আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে অনুরোধ করি।

আমাদের কিরণবালার বয়স ৯ বৎসর মাত্র, তাহার দাদা নগেন ১৪ বৎসরের। কিরণ জুন মাসের "সখা" পড়িয়া তাহার ধাঁ ধা গুলির উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে পাঠাইবে বলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় নগেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল "কি কচ্ছ, কিরণ?" কিরণ বলিল "দাদা অলকাসুন্দরী নামে এক সদাশয়া রমণী ১২ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকার মধ্যে যে অধিক সংখ্যক হেঁয়ালির উত্তর ঠিক করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বৎসরান্তে ৫্ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছেন, তাই আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি কয়টী পারি—লিখিয়া পাঠাইব।" নগেন হাসিয়া নিকটে গিয়া বলিল "আয় আমি তোকে সব বলিয়া দিতেছি; আমি পরশু পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সমস্ত বলিয়া লইয়াছি। বেশত তাহলে তুমিই ৫্টী টাকা পাইয়া যাইবে; কেমন?" কিরণবালা বিরক্ত হইয়া বলিল "ছি! ছি! দাদা! তোমার এমন মন্দ বুদ্ধি? পরের নিকট বলিয়া তাতে কি ফল হইল? তাহাত প্রতারণা হইল? আমি কি এমনি নীচ? না আমি প্রতারণা করিব না।" নগেন বলিল—"সখার লেখকত আর দেখিতে আসিতেছে না।" কিরণ আরও রাগিয়া বলিল নাই বা তিনি দেখিলেন, আমি নিজেত জানিতে পারিলাম যে কাজটা অন্যায়? সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরত জানিলেন, তার চেয়ে কি সখার সম্পাদক? ছি দাদা! তুমি কি এই শিখিতেছ? এতে ৫্ টাকা চুরি করাই হইল। আমি তাহা কখন পারিব না। কেন, টাকার অভাব কি? মাকে বলিলে এখনি ৫্ টাকা লইতে পারি। কেবল ক্ষমতার পরীক্ষা ও উন্নতি বিধানের জন্যই না পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে? আর যদিই টাকার অভাব থাকে, তথাপি চরিত্রে এমন ভয়ানক দোষ পড়িয়া টাকা লওয়া কি ভাল? টাকা আগে না চরিত্র আগে? চল দেখি মার কাছে যাই,—তিনি কি বলেন শুনিবে?"

তখন নগেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল "তবে তুমি কি লিখিয়াছ দেখি?" কিরণ তাহাতেও সম্মত হইল না; বলিল "না আমি তাহাও করিব না। আমি তোমাকে দেখাই আর তুমি বল 'এইটা ভুল হইয়াছে' আবার আমি চেষ্টা করিয়া লিখিব, সেওত তোমার সাহায্য লওয়া হইবে। কেন

এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য নহে। আমি তোমার সাহায্য লইব না। আমার নিজ বুদ্ধিতে যা আসে সাধ্য মত চেষ্টা করিব ; যাহা পারিব, লিখিয়া পাঠাইব ; তুমি যাও।"

তাহাদের পিতা অন্তরাল হইতে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া কিরণকে কোলে লইয়া পরমানন্দে মুখ চুম্বন করিলেন ও ৫৲ টাকার একখানি নোট তখনি তাহার সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ তাহার হস্তে দিলেন। সেই অবধি নগেনেরও জ্ঞান হইল। সে আর কখন ওরূপ কার্য্য করে নাই।

আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর "সখা"র প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে এইরূপ চরিত্র বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করুন। তাঁহাদের জনক জননী ও অভিভাবকগণও যেন তাঁহাদের এই হিত ইচ্ছা বাড়াইতে যত্ন করেন, নতুবা বালক বালিকাদিগের চরিত্র-রত্ন চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবেক।

শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা।

তৃতীয় উপদেশ।

স্নান।

যদি শরীরে কোন অসুখ না থাকে, তবে প্রত্যহ স্নান করিবে। স্নানের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে পারে না। যাঁহার যেরূপ অভ্যাস, তদনুসারে সময় নিরূপণ করিবে। অধিকাংশ লোক প্রায় ৯টা। ১০টার সময়ে স্নান করেন, এবং আমাদের বিবেচনায় ইহাই স্নানের উপযুক্ত সময়। তখন প্রাতঃকালের শীত কমিয়া আইসে, অধিক গ্রীষ্মও থাকেনা,—যে ঘর্ম্ম উৎপাদন করিবে। অনেকে প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে, এ অভ্যাস মন্দ নহে। দুর্ব্বল শরীরে বিশেষ কাশীরোগ থাকিলে স্নান করা উচিত নহে।

স্নানের পূর্ব্বে যে তৈল মাখার নিয়ম আছে তাহা অতি উত্তম। ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ থাকে, শরীর পোষিত হয়, ও লোমকূপ সকলের ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। স্নান সময়ে উত্তমরূপে শরীর মার্জ্জন করিবে। স্নানের পরে ভিজে কাপড় শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক কাপড় পরিবে, এবং শরীরে যাহাতে জল না থাকে এরূপ করিয়া মুছিয়া ফেলিবে।

অনেকে শীতের ভয়ে স্নান করিতে চায়না, কিন্তু এ অভ্যাস অতি অনিষ্টকর। যদি শীতের অত্যন্ত আতিশয্য হয়, তবে উষ্ণজলে স্নান করিবে। কিন্তু অভ্যাস অনুসারে গরম জলে স্নান করা অনুচিত। অধিক বৃষ্টির দিনে জল দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিবে এবং মস্তকে শীতল জল দিবে।

শরীর দুর্ব্বল থাকিলে অথবা জ্বরাদি রোগ হইতে আরোগ্য হইবার সময়ে গরমজলে স্নান করিবে। শর্দ্দি হইলে প্রথম দিবস স্নান বন্দ করিবে, পরদিবস গরম জলে স্নান করিবে কিন্তু শর্দ্দির অবস্থা তরুণ থাকিলে স্নান না করাই ভাল। শর্দ্দি পুরাতন হইলে স্নান করার কোন বাধা নাই।

স্নান করার পূর্ব্বে মস্তকে শীতল জল দেওয়া উচিত। সন্তরণ শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, ইহা দ্বারা উত্তম ব্যায়াম হয়, এবং অনেক বিপদ আপদ সময়ে অনেক উপকার, কিন্তু ধীরভাবে সন্তরণ করিবে। বালকেরা যেরূপ দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া মহাবেগে জলমধ্যে পতিত হয়, তাহা অতিশয় অনিষ্টকর, ইহাতে বক্ষে অত্যন্ত আঘাত লাগে, অথবা জলমধ্যে কোনরূপ গোঁজ বা খোঁটা থাকিলে তদ্দ্বারা প্রাণ সংশয় হইতে পারে অথবা হস্ত পদ ভগ্ন হইতে পারে। আহারের ঠিক পূর্ব্বে কি পরে স্নান না করিয়া আহারের অন্ততঃ দুই ঘন্টা পূর্ব্বে স্নান করিবে। জলমধ্যে অত্যন্ত

অধিক সময় থাকা উচিত নহে। পরিশ্রমের অব্যবহিত পরেই ঘর্ম্মাক্ত শরীরে স্নান করিবে না, এরূপ করিলে অনেক পীড়া হয়।

চতুর্থ উপদেশ।

ব্যায়াম।

চাষার হস্ত কেমন শক্ত, এবং পাল্কি বেহারার কাঁধ কেমন দৃঢ়, আবার বাবুর হস্ত কেমন কোমল, ও স্ত্রীলোকের শরীর কেমন নরম? ইহার কারণ কেহ বলিতে পার? চাষারা সর্ব্বদা হস্তদ্বারা কার্য্য করে, বেহারারা সর্ব্বদা কাঁধে পাল্কি বহন করে, এই জন্য ঐ সকল অঙ্গ এত দৃঢ়। বাবুর হস্ত শোভার জন্য, কার্য্য করে না—এই জন্য দুর্ব্বল ও কোমল, নারীজাতির শারীরিক পরিশ্রম কম, এই জন্য শরীর এত নরম। শরীরের যে অংশ চালনা করিবে সেই অংশ দৃঢ় ও সবল হইবে,—এই নিয়মানুসারে সমস্ত শরীর চালনা করিলে সমস্ত শরীর সবল হইবে—একথা সকলেই বুঝিতে পারে। কৃষকেরা পরিশ্রমী, সুতরাং তাহারা সবল-শরীর; বড় লোকেরা বিলাসী ও অলস,—এই জন্য তাহারা দুর্ব্বল ও অল্পায়ু।

যদি বলবান হইতে চাও, নীরোগ হইতে ইচ্ছা থাকে, অনেকদিন বাঁচিতে চাও, তবে প্রত্যহ ব্যায়াম করিতে অভ্যাস করিবে। ব্যায়াম করিলে বক্ষ প্রশস্ত হয় ও নিশ্বাসের যন্ত্রের বল হয়, রক্তের জোর অধিক হয়, চর্ম্ম কোমল ও পরিষ্কার থাকে, সাহস ও মনের বল বৃদ্ধি হয়, পরিপাক শক্তি উত্তম হয়, হস্ত পদে বল হয়, সমস্ত শরীর নীরোগ, সতেজ ও সবল হয়—শরীর ও মনের অযথা কোমলতা দূর হয়। ফলতঃ শরীর ও মনের ইহার দ্বারা সকল প্রকার উন্নতি হয়।

এমন ব্যায়াম করিবে, যাহাতে সমস্ত শরীরেরই সঞ্চালন হয়। ভ্রমণ, ঘোড়ায় চড়া, দৌড়ান, সাঁতার দেওয়া, শারীরিক খেলা, কুস্তি প্রভৃতি নানাপ্রকারে ব্যায়াম করা যাইতে পারে। গান করা ও বাঁশী বাজানও একরূপ ব্যায়াম—এতদ্দ্বারা ফুস্‌ফুসের বল হয়। এমন কোন ব্যায়াম করিও না,—যাহা দ্বারা কোন বিপদ ঘটিতে পারে।

অপরিমিত ব্যায়াম করিলে ক্ষতি হয়। পরিশ্রমের পরে বিশ্রাম অতি আবশ্যক এবং পরিশ্রমের নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। খাদ্য সামগ্রীও এরূপ হওয়া উচিত যে, শরীর পোষণ করিতে পারে।

ক্রমশঃ—

আমার কপাল মন্দ।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে বৃদ্ধ, যুবা, বালক, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই যখন কাহারও অবস্থা ভাল দেখেন তখনই তাহার কপাল ভাল ও নিজের কপাল মন্দ বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহারা জগদীশ্বরকে কতই নিন্দা করেন; তাঁহারা বলেন তিনি পক্ষপাতী। আবার যখন কেহ কোন কার্য্যে অকৃতকার্য্য হয়, তখন নিজের কার্য্যের ভুল বাহির করিতে না যাইয়া কপাল মন্দ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই "কপাল মন্দ" বাক্যটী ব্যবহার করিয়া অনেক বালক কোন কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়াও সন্তুষ্ট থাকেন এবং অন্যের অবস্থা ভাল দেখিয়াও নিজের অবস্থা ভাল করিতে চেষ্টা করেন না। আমরা যাহার "কপাল মন্দ" তাহার কপাল কি করিয়া ভাল হয় তাহা সারদার উপদেশ হইতে জানিব।

এক দিবস সারদা ও তাঁহাদের গ্রামের একটী বালক সন্ধ্যার সময় বেড়াইতেছেন। বালকটীর নাম রাসবিহারী। রাসবিহারী বলিল:—

"ভাই! আজ চারি বৎসর হইল গোপালের সহিত একত্রে একই স্কুলে পাঠ করিতেছি। গোপাল প্রত্যহ গাড়ি চাপিয়া স্কুলে আইসে আবার গাড়ি চাপিয়া বাড়ী যায়। আমরা রৌদ্রের মধ্যে এ-

মাইল হাটিয়া স্কুলে যাই আবার রৌদ্রের মধ্যে বাটীতে আসি। আবার দেখ তাহার কপাল কেমন ভাল—সে ভাল পুরস্কার পায়। ভাই! যাহার কপাল মন্দ তাহার কিছুই হয় না। না?"

সারদা—তুমি কি কোন দিন পুরস্কার লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছ?

রাসবিহারী—না ভাই। আমি প্রত্যেকবার পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে আমাদের পাড়ার গণকের নিকট পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করি। সে বলে যে আমি পরীক্ষায় বেশ করিব। কিন্তু সময়ে কিছুই হয় না।

সারদা—আমি গোপালকে বেশ জানি। তোমার মনের ভাব ও তাহার মনের ভাব এক নহে। তুমি ভবিষ্যৎ ফল জানিবার জন্য গণকের নিকট যাও, গোপাল তাহা করে না। সে জানে যে গণক নক্ষত্রের অবস্থা দেখিয়া মনুষ্যের ভবিষ্যৎ ফল বলে, কিন্তু তাহার নিকট মনুষ্যই তাহার নিজ নক্ষত্র সুতরাং সে জন্য গণকের নিকট যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের নক্ষত্র কি? যখন দেখিব যে মনুষ্য পরিশ্রম করিতে কাতর নহে, যখন দেখিব যে মনুষ্য অধ্যবসায়ী, যখন দেখিব যে, তাহার ইচ্ছা সৎ, তখনই জানিলাম যে তাহার নক্ষত্র ভাল এবং তাহার ভবিষ্যৎ ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে। শ্রম, অধ্যবসায় এবং সৎ ইচ্ছাই যাহার নক্ষত্র তাহারই 'কপাল ভাল' হয়, আর যাহার নক্ষত্র কেবল গণকের পুস্তকে লিখিত তাহারই কপাল মন্দ তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমি গণকের নিকট যাইয়া শুনিলে যে তোমার পরীক্ষার ভাল ফল হইবে অমনি তুমি নৃত্য করিতে করিতে বাটীতে আসিলে এবং পুস্তকের সহিত যে সম্বন্ধটুকু ছিল তাহা দূর করিলে! এদিকে দেখ গোপাল দেখিল যে তাহার নক্ষত্র তাহার [illegible]জর শ্রম এবং অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করে [illegible]তরাং সে পরিশ্রমের সহিত পাঠ করিতে লাগিল, অর্থাৎ পুস্তকের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল তাহা আরও দৃঢ় করিয়া লইল। এক্ষণে বল দেখি পুরস্কার কে পাইবে?

রাস।—তুমি যাহা বলিলে, তাহা বুঝিলাম। তোমার কথা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে গোপাল অতি নির্ব্বোধ। সে এত পরিশ্রম করিয়া পাঠ করিল, যদি ঘটনাক্রমে ব্যারাম হইয়া পুরস্কার না পায় তবে তাহার পরিশ্রম বৃথা হইল। আর পুরস্কার পাইবে এমনই বা কি কথা?

সারদা—এ প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার? ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে অন্য একটি কথা বলিব। কৃষক অতি যত্ন করিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিল; রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে কত কষ্ট সহ্য করতঃ সে চাস করিয়া বীজ বপন করিল। কৃষক কি এই সমুদয় কার্য্য করিবার সময় নিশ্চয় করিয়া জানিত যে সে অগ্রহায়ণ মাসের শেষে প্রচুর পরিমাণে শস্য আনিয়া গৃহে স্তূপাকার করিয়া রাখিবে? হইতে পারে অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি বশতঃ তাহার শস্য নষ্ট হইল এবং তাহার পরিশ্রম বৃথা হইল। কিন্তু গোপাল পুরস্কার লাভের জন্য পরিশ্রম করিল; সে যদি পুরস্কার লাভ করিতে অক্ষম হয়, তবে যে বিদ্যা লাভ করিল তাহাই তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার। সুতরাং পরিশ্রমের পুরস্কার হইবেই হইবে। মনে রাখিও

"যে অলস সে দরিদ্র, যে পরিশ্রমী সে ধনী" গোপাল গাড়ি চাপিয়া স্কুলে আইসে আর গাড়ী চাপিয়া বাড়ী যায় কি করিয়া? তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি পরিশ্রমী ছিলেন তাই তাঁহারা পরিশ্রমের ফলে ধন পাইয়াছেন তাই আজ গোপালের সুখ। আবার দেখ গোপাল যে রকম পরিশ্রমী সেও সম্ভবতঃ কালে ধনী হইবে এবং তাহার সন্তান সন্ততিগণ সুখে দিন কাটাইবে, "কপালমন্দ" বলিয়া তুমি যদি এই প্রকার উৎসাহহীন হও, তোমার

সন্তানগণ তোমার ন্যায় গোপালের সন্তানদের অবস্থা দেখিয়া বিলাপ করিবে। শ্রমী যে ধনী হয় ইহার অর্থ কেবল টাকা সম্বন্ধে নহে, আরও অনেক আছে তাহা কালে বুঝিবে।

গোপাল যদি প্রথমবার পুরস্কার না পায়, তবে সে পরিশ্রম করিতে বিরত না হইয়া, বরং নূতন উৎসাহের সহিত কার্য্য করে। কোন কার্য্যে যদি প্রথম অকৃতকার্য্য হও তবে হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিও না। "Try again" "পুনর্ব্বার চেষ্টা কর" এই নীতি বাক্যটী সর্ব্বদা মনে রাখিও। স্কট-লাণ্ড দেশীয় কোন বীর পুরুষ স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য একবার, দুইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃত-কার্য্য হইলেন না। এক দিবস তিনি বিষণ্ণ বদনে গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে একটী পোকা প্রাচীরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারি-তেছে না। বীর পুরুষ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পোকা যদি তৃতীয়বারের চেষ্টায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিতে পারে, তবে আমিও তৃতীয়বার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি না পারি তবে জন্মের মত মাতৃভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। পোকা তৃতীয়বার কৃতকার্য্য হইল। বীরপুরুষও তাঁহার প্রতিজ্ঞা-নুসারে তৃতীয়বার মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিলেন এবং কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি পোকার নিকট হইতে যে মহৎ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

রাসবিহারী! এখন দেখিতে পাইলে যে কপাল ভাল করিবার জন্য শ্রম এবং অধ্যবসায়ের আব-শ্যক? কিন্তু আরও কয়টি বিষয়ের আবশ্যক আছে। ইউরোপীয় কোন সদাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে যে সমুদায় উপদেশ পাইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বলিব। এই সমুদায় উপদেশ পালন করিও,—দে-খিবে তোমার মন্দ কপাল শীঘ্রই ভাল হইবে এবং তুমিও কালে পুরস্কার পাইবে। উপদেশ গুলির মধ্যে এই কয়টী বিষয় নিতান্ত আবশ্যকীয়।

১। অতি ভোজন পরিত্যাগ কর।

২। যাহা দ্বারা নিজের বা অন্যের উপকার হইবে এইরূপ কথা কহিও। সামান্য গল্পাদি পরি-ত্যাগ কর।

৩। দ্রব্য সকল যথাস্থানে স্থাপন কর; প্রত্যেক কার্য্যকে উপযুক্ত সময় দাও।

৪। যে কার্য্য সম্পাদন করিবে বলিয়া ভাবিয়াছ তাহা করিতে প্রতিজ্ঞা কর। যাহা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত হইও না।

৫। যাহা দ্বারা নিজের বা অন্যের উপকার হইবে এরূপ কার্য্যে অর্থব্যয় কর অর্থাৎ অপব্যয় করিওনা।

৬। বৃথা সময় নষ্ট করিওনা—কোন না কোন উপকারী কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিও। সমস্ত অনাবশ্যকীয় কার্য্য পরিত্যাগ কর।

৭। কাহাকেও প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিও না। যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে আলস্য করিওনা।

৮। কোন কার্য্যের দাস হইও না।

৯। সর্ব্বদা নম্র হইবার জন্য চেষ্টা কর।

১০। মনে খারাপ চিন্তা আসিতে দিও না।

প্রেরিত।

দুটি প্রশ্ন।*

"সখা" সময়ে সময়ে নানাবিধ প্রশ্ন ও প্রহে-লিকা প্রকাশ করেন। সখার সখাগণও তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। আমাদের দুটী প্রশ্ন আছে,

*এইরূপ প্রশ্ন 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের না করিয়া তাহাদের অভিভাবক দিগকে করিলেই ভাল হইত। স-স।

প্রহেলিকা নহে। ভরসা করি সখার পাঠকগণ তাহার সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন।

১ম। ঘুড়িসকলেই দেখিয়াছেন। ঘুড়ি উড়ান প্রচলিত নাই, পৃথিবীতে এমন দেশ আছে কি না জানি না। সখার পাঠক মাত্রেই ঘুড়ি না উড়াইয়া থাকিলেও অনেকেই তাহা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা অনেক রকমের ঘুড়ি উড়াইয়াছি এবং উড়াইতে দেখিয়াছি। সচরাচর যে সকল ঘুড়ি উড়ান হয় তাহা ছাড়া সাপের মত, মানুষের মত এবং 'কিম্ভূত কিমাকার' অনেক ঘুড়িও উড়িতে দেখা গিয়াছে। কাঁঠাল, বাদাম,শাল, প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতার পত্রও ঘুড়ির ন্যায় উড়ান যায়। বেশ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে সকল প্রকার ঘুড়িই হয় চার-কোণা না হয় ডিমের অর্দ্ধেকের মত কিন্তু একেবারে ঠিক গোলাকার ঘুড়ি কেহ কখনও উড়াইয়াছেন? কি উড়িতে দেখিয়াছেন? প্রশ্ন হইতেছে—সম্পূর্ণ গোলাকার ঘুড়ি উড়ে কি না? যদি না উড়ে তাহার কারণ কি?

২য়। এ প্রশ্নটী আরও গুরুতর; ইহার ঠিক উত্তর হঠাৎ কেহ দিতে পারিবেন এরূপ আশা অতি অল্প। কারণ অনেক দেখিয়া এবং অনেক খোঁজ করিয়া, তবে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ প্রদান করিতে কাহাকে অনুরোধ করি না—উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করি। জিজ্ঞাস্য এই—পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কি হয় না? অর্থাৎ মনুষ্য প্রভৃতির যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে কেশ লোমাদি পাকে, দাঁত পড়িয়া যায়, মাংস ঝুলিয়া পড়ে, শরীর শুকাইয়া যায়, ভিতরের যন্ত্র খারাপ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, এবং শেষে ঘুমাইয়া পড়ার মত মরিয়া যায়, কেহ কোন পাখীকে সেইরূপ মরিতে দেখিয়াছেন কি না? পোষা পাখীর খারাপ আহারেতে যে হয়, বা রোগে যে মৃত্যু হয় তাহার কথা জানা করিতেছি না। পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কি না, হইতে কেহ দেখিয়াছেন কি না, ইহাই আমার প্রশ্ন।

মনুষ্য ও পশু উর্দ্ধ সংখ্যায় কত জীবিত থাকে তাহা একরূপ ঠিক করা হইয়াছে। মনুষ্য ও কোন কোন পশুর আয়ু বিষয়ে বোধোদয়ের ছাত্রও উত্তর দিতে পারিবে। কিন্তু কাক কোকিল চীল প্রভৃতি পাখীর আয়ুঃকাল বিষয়ে পণ্ডিতগণের মুখেও কিছু শুনিতে পাই না। অধিক কি গৃহস্থ বাড়ীর পায়রা ও চড়াই কতকাল জীবিত থাকিয়া স্বভাবতঃ মরিয়া যায় তাহাও ঠিক জানা নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক খোঁজ করিয়াও এ বিষয়ে বিশেষ কোন মতে আসিতে পারিয়াছেন এমন বোধ হয় না। আমরা লুই ফিগুওয়ারের "সরীসৃপ ও বিহঙ্গম" নামক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ হইতে যে অংশ টুকু তুলিয়া দিলাম তাহাতেই বুঝা যাইবে যে আমাদের কথা ভুল নহে।

"The duration of the life of birds in a state of nature is one of those subjects on which little is known. Some ancient authors—Hesiod and Plini, for example,—give to the crow nine times the length of life allotted to man, and to the raven three times that period; in other words, the carrion crow, according to these authors attains to seven hundred and twenty years, and the raven two hundred and forty. The swan, on the same authority, lives two hundred years. This longevity is more than doubtful,"—Vide p. 203.

বাস্তবিক এ সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত ভাবে কিছু বলিতে পারেন না। আমরা হঠাৎ ব্যারামে, পোষার দোষে, কি অন্য কোন দৈবকারণ ভিন্ন পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কোথাও কখন দেখি নাই এবং খুঁজিয়া কাহার নিকট জানিতে পারি নাই। তাই আমাদের প্রশ্ন হইতেছে "পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কি না?"

মান্যবর শ্রীযুক্ত "সখা" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

আমার এ ক্ষুদ্র পত্রখানি যদি "সখা"তে একটু স্থান দেন, তবে আমার ন্যায় অনেক পল্লীগ্রামস্থ বালকের বিশেষ উপকার হয়, আমিও আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

সম্প্রতি আমি একদা আমা'র একজন বন্ধুর সহিত হুগলী কলেজের পুস্তকালয়ে যাই। সেখানে গিয়া যে কি দেখিলাম তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। সারি সারি প্রায় ৪০।৫০টী বড় বড় আলমারি পুস্তকে পূর্ণ! কত শত সাহিত্য পুস্তক, কত উপন্যাস, কত ইতিহাস, কত শত লোকের জীবন বৃত্তান্ত, কত শত লোকের ভ্রমণবিবরণ, কত সহস্র সহস্র পুস্তক দেখিয়া আমার যেন মস্তক ঘুরিয়া গেল। আমি ইহার পূর্ব্বে কখন এত পুস্তক দেখি নাই। আমি মনে করিতাম বাঙ্গালায় খানকতক ও ইংরেজীতে খানকতক বৈ পড়িলেই বুঝি পড়া শেষ হইল। কি ভয়ানক! ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার অভিধানই যে কত দেখিলাম তাহা বলিতে পারিনা। নানাবিধ জীব জন্তুর ছবি যে কত, নানা স্থানের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, নানা দেশীয় বিখ্যাত লোকদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি যে কত তাহার সংখ্যা নাই। উঃ! এক একটী দেশের ইতিহাস অমনি এক এক আলমারি পোরা। বিজ্ঞানের পুস্তকই যে কত দেখিলাম তাহা বলিতে পারিনা। সকলের নামের অর্থও জানিনা! ধর্ম্মপুস্তকই বা কত! চারিদিকে রাশি রাশি পুস্তকের মধ্যে থাকিয়া যেন আমার কি বোধ হইতে লাগিল। এত বৈ আছে জানিয়া বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে হতাশ হইলাম। আমাদের ক্লাশে আমি একজন উত্তম বালক, সে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। হতাশ হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এত বৈ কি পড়িতে পারিব? কতই শিখিতে এখনও বাকী আছে? আমিত তেমন ভাবে সময়ের ব্যবহার করিনা তবে কিরূপে এত বৈ পড়িব? আমার একখানি বৈ শেষ করিতে যদি একমাস লাগে তাহা হইলেও আমার জীবনে এত বৈ পড়িতে পারি না। তবে উপায় কি?

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল এই যে এক একজন গ্রন্থকর্ত্তা ২০।২৫।৫০।১০০ খানা করিয়া বৈ লিখিয়া গিয়াছেন, ইঁহারাও ত আমার মত ছিলেন, তবে আমি কেন হতাশ হই? উৎসাহ ও চেষ্টার সহিত পড়িতে আরম্ভ করিব, সময়ের রীতিমত ব্যবহার করিব; তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই। মনে আশা হইতে লাগিল। সেই অবধি যখনি আলস্য আসে তখনি ঐ পুস্তকরাশির কথা মনে করিয়া শতগুণ উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয়।

সেই অবধি আমি যেন আর একটী পৃথিবীতে বেড়াইতেছি। পড়িবার এত আছে জানিতামনা, চেষ্টার সাধ্য এতদূর তাহা জানিতাম না। এখন আমার পড়া খুব আমোদের ও সুখের কার্য্য বোধ হইয়াছে, আর কোন বিষয়ে আমার তত সুখ, তত আনন্দ ও তত ভরসা হয়না। আমি এখন খুব পরিশ্রম করিতে পারি। সেই অসংখ্য গ্রন্থকর্ত্তারা যেন সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহ দেন। এত সুখ, এত আশা যাহাতে আমার বন্ধুগণ সকলেই দেখিতে পান, এই অভিপ্রায়ে আপনার নিকট এই পত্র পাঠাইতেছি। ইহাতে 'সখা'র পাঠক পাঠিকা মাত্রকেই অনুরোধ করি যেন তাঁহারা একবার কোন বড় পুস্তকাগার দেখিতে যান।

আপনার একান্ত স্নেহের—শ্রীঃ—

ঠাকুরদাদার গল্প।

আদা ঠাকুরদাদা নবীন বাবু প্রিয় বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। গোলাপ, মল্লিকা, জুঁই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষে বাগানটী সুশোভিত। চারিদিকে সুন্দর মেদী গাছের বেড়া। মধ্যে মধ্যে সবুজ কামিনী বৃক্ষের পাতাগুলি তিনি স্বহস্তে কাঁচী দিয়া কাটিয়া দিয়াছেন, পাতাগুলি স্তরে স্তরে সাজিয়া কেমন শোভাই ধারণ করিয়াছে, ঐ সবুজবর্ণ পত্রগুলির উপরে ও মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার শ্বেতকুসুম কি সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে! বাগানের মধ্যস্থলে একটী বিলাতী ঝাউগাছ কেমন সূক্ষ্ম চূড়া তুলিয়া যেন পাহারা দিতেছে। চারি দিকে মৌমাছি সকল ফুলের মধু আহরণে নিযুক্ত রহিয়াছে। অপরাহ্নে উদ্যানের অতি সুন্দর শোভা হইয়াছে—গাছ গুলি সব যেন হাসিতেছে। কিশোরী, বিনয় ও অন্যান্য বালকগণের যত্নে গাছগুলির একটুও হানি হইতে পায় না। তাহারা সকলেই প্রিয়তম ঠাকুরদাদার সঙ্গে প্রত্যহ উদ্যানে আসিয়া গাছগুলিতে জল দেওয়া, গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, ঘাস তোলা প্রভৃতি নানাবিধ প্রকারে বাগানটীর যত্ন করে ও গাছগুলিকে যেন আপনাদের ভ্রাতার মত স্নেহ করে। এরূপ করাতে তাহাদের আরও একটী উপকার হয়। সমস্ত দিবসের লেখাপড়ার পর এইরূপ শারীরিক শ্রম করাতে আনন্দে ও স্ফূর্ত্তিতে তাহাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে ও রাত্রিতে আবার পাঠাভ্যাস করিতে বিশেষ ইচ্ছা জন্মে ও তৎপরে অতি সুনিদ্রা হইয়া আহারীয় সামগ্রী সকল উত্তমরূপে পরিপাক হয়। এই সকল উপকার পায় বলিয়া এক দিনও তাহারা কালে স্বকার্য্য বিস্মৃত হয় না।

আজিকার বাগানের কার্য্য শেষ হইলে নবীন বাবু সকলকে চারি দিকে লইয়া সুন্দর সবুজ মখমলের ন্যায় ঘাসের উপর বসিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা মহাশয়! আমরা যে বোধোদয়ে পড়িয়াছি 'পদার্থ তিন প্রকার চেতন, অচেতন, ও উদ্ভিদ,' আমার তাহাতে একটু কথা আছে। আমি বলি পদার্থ দুই প্রকার বলিলেই ঠিক হইত। আমার বোধ হয় যাহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলা হইয়াছে, তাহারাও চেতন পদার্থ। নয় কি?"

মন্মথঃ—তা কিরূপে হইবে? বৃক্ষদের ত চেতনা নাই, তাহারা ত ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পারে না, তাহারা কথা কহিতেও পারে না। তাহাদের যেখানে পুতিয়া দেওয়া যায় সেখানেই থাকে।

অমূল্যঃ—তবে ত মাছেরাও চেতন পদার্থ নয়। তাহারাও ইচ্ছামত যথা তথা যাইতে পারে না, কথা কহিতে পারে না, একটী পুকুরেই চিরকাল থাকে? তাত নয়। আমারও বিবেচনায় বৃক্ষ সকল চেতন পদার্থ, মৎস্য যদি চেতন হয় তবে বৃক্ষ লতাদিরাও চেতন নিশ্চিত। কিশোরীরও এই মত ছিল। মন্মথ ও বিনয় বলিল "তা কেন হইবে? মাছেরাত সেই জলাশয়ের যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, মাছেদের ডিম ও ছানা হয়, তাহারা ডাকিতেও পারে। মাছ ও বৃক্ষ লতার তুলনা হয় না।" নলিন বালক, কোন পক্ষে না যোগ দিয়া ঠাকুরদাদার মুখেরদিকে চাহিয়া রহিল; তখন কিশোরী বলিল "সেরূপ ত বৃক্ষদের ও শিকড় আছে—ঐ শিকড় মাটীর চারি দিকে ছড়াইয়া যে দিকে ইচ্ছা যাইতে পারে, আমি দেখিয়াছি হরিমোহন দের বাটীর সম্মুখের অশ্বত্থ গাছের শিকড় অনেক দূর অবধি গিয়াছে। আর আমি বলিতে পারি লতাদের জ্ঞান আছে, কেন না, আমাদের বাড়ীতে একটী লাউ গাছ আছে তাহার আঁকড়া গুলি সব এক একটী কঞ্চিতে জড়াইয়া থাকে।

আমি এক দিন একটা আঁকড়ার সম্মুখ হইতে সমস্ত কঞ্চি সরাইয়া এদিকে রাখিয়াছিলাম। তার পর দিন দেখি সে আঁকড়টা মুখ ফিরাইয়া সেই পশ্চাৎ দিকে আসিয়াছে ও একটা কঞ্চিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; সেই অবধি আমি যে কি আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আর সেই অবধি আমার বোধ হইয়াছে পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যকেই বুদ্ধি দেন নাই, লতাগুলিকে পর্য্যন্ত শিখাইয়াছেন।"

এবারে আর মন্মথ ও বিনয় কোন কথা বলিতে না পারায় সন্দেহ মিটাইবার আশায় ঠাকুরদাদার মুখের দিকে তাকাইলেন। কিশোরীর এত অল্প বয়সে এরূপ খোঁজ করিবার ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ভক্তি দেখিয়া তাঁহার মন গলিয়া গিয়াছিল, তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছিল। তিনি কিশোরীর মুখ চুম্বন করিয়া সকলকে আদর করিয়া বলিলেন:—"জ্ঞানী হইবার এইই উপায়। পুস্তকে যে কিছু লেখা থাকে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া পরে কি সত্য তাহা স্থির করিতে হয়, ইহাই নিয়ম ও তদ্রূপ করিলেই জ্ঞান রত্ন লাভ করিয়া ভবিষ্যতে সুখী হইতে ও যশোলাভ করিতে পারা যায়।

কতকগুলি বস্তুকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় এমন গুণ গুলিকে জাতি বিভাগ করিবার জন্য লইতে হয় যাহার একটী ও ভিন্ন জাতিতে পাওয়া যায় না। স্বর্ণ ও রৌপ্য বিভিন্ন জাতীয় ধাতু, কেন না এই উভয়ের বর্ণ, শব্দ, ভার প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সেইরূপ চেতন ও অচেতনে এত প্রভেদ কখন একটী অন্যটীতে ভুল হয় না, কিন্তু এই যে গোলযোগ তোমরা বাহির করিয়াছ এটী বড় সহজ নহে। কেন না কোন কোন জন্তু এমনি নিশ্চল ও জড়বৎ যে তাহাদিগকে চেতন বলা যায় না, বৃক্ষ লতাদি এমনি সতেজ ও জীবিত যে সহসা তাহাদিগকে চেতন বলিয়া বোধ হয়। মনে কর পুরুভূজ নামক বৃক্ষের একটী অঙ্গ ছেদন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন অংশ আবার একটী নূতন বৃক্ষ হইয়া উঠে; তোমরা এতক্ষণ লতার বুদ্ধি প্রভৃতির কথা বলিতেছ এ সকল দেখিলে হঠাৎ প্রাণী বোধ হয়। বাস্তবিক পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত চেতন অচেতন ও উদ্ভিদের একটী সীমা রেখা দেখাইতে পারেন নাই। তবে যে গুলির প্রভেদ সুস্পষ্ট দেখা যায় তাহাদিগকেই জাতি বিভাগ করিয়া ছোট ছোট বালকদিগকে বুঝান বোধোদয়ের উদ্দেশ্য। নতুবা জন্তুদের যাহা যাহা আছে বৃক্ষলতাদিরও প্রায় তাহা সমস্ত আছে। জন্তুরা অনেকেই মুখ দ্বারা আহার করে, নানা প্রকার পুষ্টিকর সামগ্রী মুখদিয়া শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে, পিপাসার সময়ে জল পান করে, মুখই জীবের প্রধান সহায়। ঐ সকল সামগ্রী পেটের মধ্যে গিয়া ক্রমে ক্রমে হজম হইতে থাকে; এইরূপে পরিপাক হইয়া সার অংশটুকু শরীরের পুষ্টি করিবার জন্য রক্ত হইয়া যায়, অসার ভাগগুলি মল মূত্রাদি ও ঘর্ম্মাদি আকারে বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদ্‌দিগেরও এইরূপ আহার-শক্তি আছে। তাহারাও শিকড় দিয়া আহার করে। শিকড়গুলির ভিতরে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া আহারীয় সামগ্রী সকল মৃত্তিকা হইতে টানিয়া লয় ও তদ্দ্বারাই জীবন ধারণ করে। কাটিয়া ফেলিলেই গাছ মরিয়া যায়,—যেমন আহার না পাইলে আমরা বাঁচি না। সুতরাং দেখা গেল বৃক্ষ সকল যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে কোথাও যায় না, নড়ে না, তাহার কারণ, তাহাদের আবশ্যক নাই, তাহারা এক স্থানেই চিরকাল আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয় ও তথায় থাকে। কিন্তু একস্থানে চিরকাল থাকে বলিয়াই যে তাহারা 'চেতন' এই দলের বাহিরে তাহা বলা যায় না, কেন

না প্রাণীদের মধ্যেও এমন অনেক আছে যাহারা কখন এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না।

আবার দেখ, আমরা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, বিশুদ্ধ বায়ু নাসিকাদ্বারা টানিয়া লই ও দূষিত বায়ু ফেলিয়া দিই, বৃক্ষেরাও তদ্রূপ করে, ইহাদেরও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আছে। আমাদের একটী নাসিকা,—ইহাদের নাসিকা অনেক। প্রত্যেক পত্রই এক একটী নাসিকা। আমরা বায়ু হইতে 'অম্লজান' নামে এক প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ টানিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশটী দূষিত করিয়া ছাড়িয়া বায়ুতে দিই। বৃক্ষের সবুজ পত্রেরা রবিকিরণের সাহায্যে সেই দূষিত বায়ুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ দূষিত পদার্থের মধ্য হইতে "কার্বন" অর্থাৎ অঙ্গার ভাগ নিজেরা গ্রহণ করে ও অম্লজান ছাড়িয়া দেয়। এই অঙ্গার তাহাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। সুতরাং দেখিলে বৃক্ষ সকল আমাদের ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও সম্পন্ন করিয়া থাকে, তবে আমরা অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করি—অঙ্গার ছাড়িয়া দিই, ইহারা ঠিক তাহার বিপরীত করে—অঙ্গার গ্রহণ করিয়া অম্লজান ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সে জন্য ভিন্ন জাতি বলিয়া বিভক্ত হইতে পারে না, কেননা অনেক প্রাণীও সেরূপ যাহার যে বস্তু আবশ্যক, বায়ু হইতে গ্রহণ করে—সকলে সমান লয়না।

তারপর দেখ, আমাদের শরীর চারি প্রকার সামগ্রীতে প্রধানতঃ গঠিত:—অস্থি, মাংস, ত্বক (অর্থাৎ ছাল) ও রক্ত। অস্থি দেহের মূলাধার, মাংস রক্তপরিচালনের ও অন্যান্য উপকারের জন্য, ত্বক্ সেই সকলকে আবরণ করিয়া রক্ষা করে, ও রক্ত সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া জীবন বজায় রাখে। বৃক্ষদের ও এ সমস্ত আছে। উপরেই যেটী দেখা যায় সেটী ত্বক বা ছাল, ইহার দ্বারা বৃক্ষের ভিতরস্থ আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলি নষ্ট হইতে পায় না, তাহার নীচেই কোমল এক প্রকার বস্তু তাহাকে বৃক্ষের মাংস বলা যায়! ইহারই ভিতর দিয়া পুষ্টিকর পদার্থ সকল বৃক্ষের সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হয়। গাছের রস আছে জান?—তাহাই উহাদের রক্তের কার্য্য করে। ইহা মিথ্যা কথা নহে; বাস্তবিকই পৃথিবী হইতে সকল দরকারী বস্তু আহার করিয়া এই রসটীই বৃক্ষের শিকড়েরা উপরে পাঠাইয়া দেয় ও ইহাই বৃক্ষের বাঁচিবার এক মাত্র কারণ। গাছেদের আমাদের মত অস্থি আছে তাহা বোধ হয় সকলেই জান, তাহাদের সারভাগ যেটী, যাহা শুকাইয়া কঠিন হয় ও স্থায়ী হয়, সেই কাষ্টের সারাংশটীই বৃক্ষের হাড়। কোন বৃক্ষের পাতা অনেক দিন জলে পড়িয়া থাকিলে পরে শুষ্ক হইলে দেখা যায়, মাংস ও ত্বক্ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল সরু সরু কঠিন কতকগুলি শির আছে, সে গুলি পত্রের হাড়; সেইরূপ সকল বৃক্ষেরই অস্থি আছে। সুতরাং দেখা গেল বৃক্ষের রক্ত মাংস, ত্বক্ ও অস্থি আমাদের ন্যায় সমস্তই আছে।

তবে আমাদের ন্যায় ইহাদের সকল ইন্দ্রিয় নাই। ইহারা দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না আস্বাদন পায় না, ঘ্রাণ পায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় ইহাদের আছে। লজ্জাবতী লতার পাতায় হাত দিবামাত্র অমনি সঙ্কুচিত হয়। আবার আমেরিকায় এক প্রকার মাংসাশী বৃক্ষ আছে, তাহাদের পাতায় মাছি বা অন্য কোন ছোট প্রাণী বসিলে অমনি পাতা কুঁকড়াইয়া গিয়া জন্তুটীকে ধরিয়া ফেলে ও ক্ষণেক পরে একেবারে খাইয়া ফেলে। উদ্ভিদেরা জন্তুদের মত কথা কহিতে বা ডাকিতে পারে না। আর ইহাদের ডিম ও ছানা হয় না সত্য, কিন্তু ইহাদেরও দল বাড়াইবার প্রণালী অতি চমৎকার। আজি আর সময় নাই। রাত্রি হইয়াছে। চল বাড়ী যাই,—আর এক দিন বলিব। কিন্তু এ কথাটী যেন চিরকাল স্মরণ থাকে যে নিজেরা চেষ্টা করিয়া যাহা শিক্ষা করিবে, আপ-

নারা পরীক্ষা করিয়া যাহা জানিতে পারিবে, তদপেক্ষা আর মূল্যবান জ্ঞান নাই। সর্ব্বদা চিন্তা করিবে, মন দিয়া চতুর্দ্দিকের পদার্থ সকলের গুণাগুণ ও কার্য্যপ্রণালী বেশ করিয়া দেখিবে, তাহা হইলেই শীঘ্র নানা মহামূল্য জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে। বিশ্বপতির সৃষ্ট এই জগতের প্রত্যেক বস্তুই অনেক শিক্ষা দিতে পারে, একটী তৃণকেও অগ্রাহ্য করিবে না। একটী সামান্য তৃণের মধ্যে যে তাঁহার কত বুদ্ধি, কত জ্ঞান, কত দয়া প্রকাশিত আছে তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি মহান্, তোমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে ভক্তি করিবে।

সকলে পরমেশ্বরের কার্য্যে আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সে দিন গৃহে গমন করিলেন।

পেঁচো চোরা কি?

সর্ব্ব মঙ্গলা আমার দু বৎসরের ছোট। তাহার সহিত আমার বড় ভাব। সে আমার প্রতিবেশীর কন্যা; গ্রাম সম্পর্কে ভগিনী হইত। আমাদের বাড়ীর পাশেই তাহাদের বাড়ী; সেই জন্য দুজনে এক সঙ্গে রাত্রি দিন থাকিতাম, এক সঙ্গে বেড়াইতাম, একত্রে লেখা পড়া করিতাম; শয়ন ও ভোজন অনেক দিন এক সঙ্গেই চলিত। সে আমাকে বড় ভাল বাসিত, এক দণ্ড না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিত না—আমার মনও ঠিক সেইরূপ হইত। ছেলেবেলা দুই জনে বড় আমোদে কাটাইয়াছিলাম। এখন আমি বা কোথায় আর মঙ্গলাই বা কোথায়! আমি এখন বিদেশে চাকুরী করি, মঙ্গলা শ্বশুর বাড়ীতে থাকে, কদাচিৎ পিত্রালয়ে আসে আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। ছেলেবেলার ভালবাসার পরিণামটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

পূজার ছুটিতে বাড়ীতে আসিয়াছি। বাড়ী এসে পাড়ার সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মঙ্গলা আমাদের গ্রামে আসিয়াছে, তাহার একটী ছেলে হইয়াছে,—আজ ছয় দিন। শুনিয়া বড় আনন্দ হইল। আমার আদরের সেই মঙ্গলার পুত্র, মনটা একেবারে গলে গেল—দেখিবার বড় ইচ্ছা হ'ল। আহারাদির পর তাহাদের বাড়ীতে গেলাম, গিয়া বলিলাম "খুড়ীমা—(মঙ্গলার মাকে খুড়ীমা বলিয়া ডাকিতাম) প্রণাম করি, আমি বাটী এসেছি, মঙ্গলার ছেলে হয়েছে, তা—আমাকে দেখাও।" খুড়িমা তাড়াতাড়ি বাহিরে এলেন; "এস বাবা এস" বলে কত আদর করিতে লাগ্‌লেন। সাত রাজার ধন এক মাণিক পেলেও লোকের অত আনন্দ হয় না। আমার মনটা বড় ভিজিয়া গেল, সহরে থাকি, সেখানে অনেক বন্ধু বান্ধব আছে সত্য, কিন্তু এমন মিষ্ট করে মিষ্ট ভাষায় কেহ ডাকে না। তিনি আমাকে কোথায় রাখ্‌বেন, কোথায় বসাবেন তাহার স্থান খুঁজিয়া পান্ না। তার পর মঙ্গলা যেখানে ছেলে কোলে করে বসে আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সে যায়গাটা দেখে আমার প্রাণটা চম্‌কে উঠ্‌ল। আমি মনে কর্‌লাম "একি সর্ব্বনাশ! এত আদরের ধন, হৃদয়ের আশা ছেলেটীকে এমন স্থানে রাখা হয়েছে!" দেখ্‌লাম ঘরটী অতি ক্ষুদ্র, একটী ছোট দুয়ার, কেবল একটী মানুষ কোন রূপে যেতে আস্‌তে পারে আর কোন স্থানে ফাঁক নাই। সেই আতুড় ঘর দেখেইত আমার চক্ষুস্থির—একটু খানি সেখানে থাকাতেই প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। মঙ্গলা ছেলে কোলে করে কুঁড়ে খানিকে আলো করে রেখেছে। সেইত ঘরের শ্রী; আবার তাহার এক পাশে একটা আগুণের কুণ্ড, তাতিয়া ধোঁয়া উঠ্‌ছে; কতগুলা ময়লা ছেড়া কাপড় পড়ে রয়েছে, তার গন্ধে ভূত পালায়। আবার ঘরের মেজেটা জলে জব্‌জবে হয়েছে। ছেলে দেখে মনটা সুখী হয়েছিল, কিন্তু তাকে যে যায়গায় রাখা হয়েছে তা দেখে বড় কষ্ট হ'ল, প্রাণটা যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লো। বাহিরে এসে ব'ল্‌লাম "খুড়িমা! অমন চাঁদপানা ছেলেটীকে অমন যায়গায় রেখেছো কেমন করে? আর তোমার সেই মঙ্গলাত, যে নরম দুধে-ধোয়া বিছানা না হলে শুতে পারে না, যাকে কত আদর করে চুল বেঁধে দিতে, পরিষ্কার রাখ্‌তে, যার কাপড় একটু ময়লা হলে কত বক্‌তে, তাকে ঐ নরককুণ্ডে রেখেছ কি করে?" তিনি বল্‌লেন "তা বাছা কি কর্‌ব বলো, নটা দিন বৈত নয়, তার ছদিন কেটে গেল, দেশের আচার এইরূপ।" আমি ব'ল্‌লাম "যে ভাবে ওদের রেখেছ, তাতে ছেলের একটা ব্যামো না হলে বাঁচি।" এ সকল দেখে সুখী হলাম না—বাড়ী চলে এলাম।

ছদিনে ষেটাড়া। ১২টী বামুনের পায়ের ধুলা চাই; আজ বিধাতা পুরুষ ছেলের কপালে লিখ্

বেন—তারও উদ্যোগ করা হয়েছে। বেলা অল্পই আছে, তখন বিধাতা পুরুষের লিখিবার সময় হয় নাই। এমন সময়ে মঙ্গলার গলা শুন্‌লাম—সে একেবারে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। বাড়ীর মেয়েরা 'কি হলো কি হলো' বলে সেই দিকে ছুটে গেল। আমি তখন একখানি খবরের কাগজ পড়্‌ছিলাম; কিন্তু কান্নার স্বরটা শুনে প্রাণটা যেন ধড় ফড় করে উঠ্‌ল। বাহিরে এসে শুন্‌লাম মঙ্গলার ছেলেকে পেঁচো চোরায় পেয়েছে। ভাব্‌লাম "এ আবার কি; এই কতক্ষণ বেশ ছেলে দেখে এলাম, এর মধ্যে চোর এল কোথা হ'তে। যাই দেখ্‌তে হলো" বলে দৌড়াদৌড়ি গিয়ে দেখি আঁতুড় দুয়ারে আর লোক ধরে না সকলে ঠেলাঠেলি কর্‌ছে, সকলেই তাহার ভিতরে যেতে ইচ্ছুক; কিন্তু ভিতরেও তিলমাত্র স্থান নাই। আমি কি হয়েছে কি হয়েছে বলে সেখানে গিয়া উঠ্‌লাম। কতকগুলি স্ত্রীলোক আমায় দেখে লজ্জায় ঘাড় হেট করে তফাতে গেল, আর কতকগুলিকে ধমক দিয়া তফাৎ করে দিলাম—একেবারে আতুড় ঘরে ঢুকে পড়্‌লাম, গিয়ে দেখি সেই সোণার চাঁদ এখন কালি হয়েছে, হাত পা খিচুনি ধরেছে, দুধ খায় না, মায়ের স্তন মুখে করে না, আগে যে দুধ খেয়ে ছিল তাহা দই হয়ে বেরিয়ে পড়্‌ছে, চো'ক মেলে চায় না। আমিত তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে করে বাহিরে আনিলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলাও বাহিরে এলো। তাদিগকে সঙ্গে করে এক খানি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লাম। আমি একটু ডাক্তারী জান্‌তাম, অবস্থা বুঝে একটু ঔষধ খাইয়ে দিলাম—ঔষধ আমার বাড়ীতে ছিল। বাহিরে ভাল বাতাস পেয়ে এবং সময় মত ঠিক ঔষধ পেটে পড়াতে ছেলেটীর হাত পা খিচুনি কমে এলো—ক্রমে চোক মেলে চাইলে। মানা করে দিলাম আর যেন কেউ সে ঘরে না আসে—ওরূপ জটলা না করে। মঙ্গলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। সে ধাক্কা সামলাইয়া গেল। বিধাতা পুরুষ কপালে না লিখ্‌তেই একটী কাণ্ড ঘটে গেল। রোগের প্রভাব কমে এলো দেখে যেমন যেমন ঔষধ খাওয়াতে হবে তা বলে দিলাম—আরও বল্‌লাম যে, যেন আতুড় ঘরে আর না নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে ছেলে আর বাঁচবে না।—যখন বাড়ী এলাম তখন রাত তিনটা বেজেছে।—তার পর দিন সকালে অনেক লোকের নিকট লাঞ্ছনা খেতে হয়েছিল। কেউ বলে খ্রীষ্টান হয়েছে, কেউ বলে ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গিয়েছে; সব সাহেবী চাল চলন শিখেছে। কিন্তু আমার অপরাধ কি তাত আমি জানি না!

এখন কথা হ'চ্চে পেঁচো চোরা কে? সে কোথা থাকে? পেঁচো চোরা একটা মানুষ নহে, সে ভূত প্রেতও নহে, তার হাত পাও নাই; কিন্তু তার ক্ষমতা বড়! আমরা যে রকম করে আতুড় ঘর বাঁধি, তাতেইত পেঁচো চোরা বাধা থাকে; আমরা তাকে আদর করে এনে সেই ঘরে বাসা দিই। তা না হলে আর সেখানে সে আস্‌বে কেমন করে?

জীবন ধারণের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন; কোন রকমে যদি তাহা দূষিত হয় তা হলে পীড়া জন্মে। আতুড় ঘরখানি যেমন স্থানে যে প্রণালীতে বাঁধা হয় সে কথা বলিতে লজ্জা করে। ছোট ঘর ছোট একটী দুয়ার, জমি সেঁতসেতে, চারিদিক বেশ ঘেরা—তাহার চারি পাশ নানা রকম জঞ্জালে পোরা। সেই ঘরে সদ্যোজাত বালক থাকবে। ছেলেটী যেমন ভূমিষ্ঠ হবে অমনি পাড়ার লোক দলে দলে দেখ্‌তে আস্‌বে; সেই দুয়ারটীতে সকলেই সেই ঘরের বায়ু হইতে নিশ্বাস লইবে—সেই ঘরে প্রশ্বাস ফেলিবে, কাজেই ঘরের মধ্যে যে বাতাস টুকু থাকে, তাহা ফুরাইয়া যায়। আবার বাহিরের বায়ুও আসিতে পায় না, কেন না দুয়ারে যে একটু থাকে, তাহা ফুরাইয়া যায়। সুতরাং বিষের মত বায়ু সেই ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া যায়। মা ও ছেলে দুই জনেই তাহা নিশ্বাস টানিয়া লয়। এই বায়ুই পেঁচো চোরার একটী প্রধান চোর।

জমি সেঁতসেতে তাহাতেও বায়ু দূষিত করিয়া ফেলে। আবার সেই মাটীতে শুইয়া থাকাতে শরীর মধ্যে জল প্রবেশ করে; তাহাতে শ্লেষ্মা—কফ কাশি জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং এই আর একটী চোর।

ছেলেকে শোওয়াইতে যে বিছানা দেওয়া হয় তাহা ময়লা দুর্গন্ধ যুক্ত, সেই দুর্গন্ধ রাত দিন ছেলের নাকের মধ্যে যায়। তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। সুনিদ্রা না হওয়া রোগের ঘর। ইহাও চোরের মধ্যে গণ্য।

আতুড় ঘরের মধ্যে একটী করিয়া আগুণের কুণ্ড থাকে তাহাতে কাট দেওয়া হয় সেই জন্য তাহাতে

হাতে খুব ধোঁয়া উঠে। সেই ধোঁয়া চোকে লেগে ছেলে কাঁদিতে থাকে—চোক দিয়ে জল পড়ে। কেঁদে কেঁদে পীড়া হবে তাহার আশ্চর্য্য কি? আবার ইহা বায়ু দূষিত করিবার একটী কারণ। এইত গেল চার চোর।

তারপর আহার—সে ব্যবস্থাও সুন্দর নহে। আমরা কচিছেলের জন্য গোদুগ্ধ ব্যবস্থা করি, তাহা আবার ঘন করে জাল দিই। আবার রাত্রির জন্য এবং পরদিন প্রাতঃকালে দুধ পাওয়া যাইবে না বলিয়া দিনে জাল দিয়ে আগে তুলিয়া রাখিয়া দিই। সেই দুধ ছেলেকে খাইতে দেওয়া হয়। ঘন দুধ পেটে সয় না, কাজেই পেটের পীড়া হয়; তার পর আবার বাসি দুধ খাওয়ান হয় বলে ছেলের অম্ল রোগ জন্মায়—তাই দুধ খেলেই ভেদ হইয়া যায়। দুধ তোলা রোগের সৃষ্টি এই রূপে হয়।

পেঁচো-চোরা এই পাঁচটী একত্রিত হইয়া হইয়াছে। এখন তোমরা এক দুই করে পাঁচটী চোর গুণে লও। চোরে লোকের কি ক্ষতি করে, ঘটীটা বাটীটা বা দুচারিখান গহনা, না হয় নগদ টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু সে প্রাণে মারে না। পেঁচোর হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই, শুধু যে কেবল ছেলেটী মরে গেল তা নয়; তার শোকে বাপ মার মনে দারুণ আঘাত লাগে, তাহার সংসারের অনুরাগ চলিয়া যায়; মন উদাস হয়ে পড়ে, শরীরের প্রতি যত্ন থাকে না, স্বাস্থ্য চলিয়া যায়, কাজেই ভগ্নদেহ ভগ্ন মন নিয়ে ঘর করিতে হয়। সে বড় কষ্টের কারণ হয়ে পড়ে। পেঁচোর হাত হতে যাতে মুক্তি পাওয়া যায় তাহার উপায় করা উচিত। সখার পাঠক পঠিকাগণ! তোমরা এখন ছোট আছ; এখন তোমাদের সে ভয় নাই বটে। কিন্তু পরে আবার তোমরাই সংসারী হবে, তখন যাতে এই দুস্তর ব্যাধির হাতে না পড় তার চেষ্টা করিবে। কেবল আতুড় ঘরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যত ছেলেকে পেঁচোয় পায় তাহা প্রায়ই আতুড় ঘরে দেখা যায়। এই কথাটী যেন বেশ মনে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলতে পারবে, সেই ভাবে চলিলে পেঁচোর হাত হইতে উদ্ধার পাবে। নচেৎ দেশের মঙ্গল নাই।

মাকড়সা।

(৫ম সংখ্যার পর।)

মাকড়সা খায় কি? এ কথার উত্তর আমি তত সহজে দিতে পারিতেছি না। আমি এ পর্য্যন্ত এমন কিছু দেখি নাই যাহা পাইলে সে খুসী না হয়। জালে যাহাই পড়ুক না, নড়িলে চড়িলেই হইল; কি পড়িয়াছে কে খোঁজ লয়? মশা মাছির তো কথাই নাই, ক্ষুধার সময় স্বজাতীয় দুই একটী হইলেও চলে। কেহ কেহ ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খান।

সকলের বড় যে মাকড়সা তাহার নাম 'টরান্টূলা।' এই জাতীয় মাকড়সাই নাকি পাখী ধরিয়া খায়। এক সাহেব একবার তিনটী টরান্টূলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনটীকেই এক খাঁচায় (খাঁচায় থাকিবার যোগ্য ও বটে, এক একটা যে বড়!) রাখা হইল। প্রথম প্রথম কয়েক দিন তাহরা কিছুই খাইল না। তার পর কয়েক খণ্ড মাংস চাটিয়া যেন তাহাদের ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। তখন একটা আর দুইটাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিল। শেষটী আনিয়া সাহেব বিলাতের প্রাণীশালায় উপহার দিলেন। সেখানে তাহাকে ছোট ছোট ইদুঁর খাইতে দেওয়া হইত। প্রথম প্রথম ইঁদুরটীর কিছুই ফেলা হইত না, শেষটা যেন টরান্টূলা মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে ইদুঁরের অভাব হইবে না। তখন থেকে কেবল মাথাটী খাইতে লাগিলেন।*

গায়ের কাপড় ময়লা হইলে আমরা ধোপার নিকট দিই। মাকড়সার ধোপা নাই, কিন্তু সেও একটা খোলস পুরাণ হইলে সেটাকে বদলাইয়া ফেলে। তোমরা অনেক সময় দেখিয়াছ মরা মাকড়সাটা হাত পা কোঁকড়াইয়া জালে ঝুলিতেছে,—বাস্তবিক হয়তো সেটা মাকড়সার খোলস মাত্র। এক একটী খোলস এত পরিপাটী যে চিনিবার যো নাই। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

মাকড়সার বড় বুদ্ধি। একটী বাড়ীর বারাণ্ডায় একটা মাকড়সা জাল পাতিয়াছিল। বাতাস

---

* পরের পৃষ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইহারই। এত বড় মাকড়সা দেখিয়াছ কি? কোন কোনটা এর চাইতেও বড় হয়।

আসিলেই জালের নীচের দিকটা উঠিয়া আসিত ; বেচারা বড় জ্বালা-তন হইত। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একখানা ছোট লাঠি টানাটানি করিয়া লইয়া আসিল। বাতাস আসিবার সময় সেই লাঠিখানা জালে ঝুলাইয়া দিত ; তাহাতে নঙ্গরের কাজ হইত।

মাকড়সার জালে বড় পোকা পড়িলে দড়ি কাটিয়া তাহার যাইবার সহায়তা করে।

এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহারা মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঘর বাঁধে। ভিতরে সাটিনের মত মসৃণ। দেখিতে কাবুলী মেওয়া ওয়ালাদের টুপীর মত ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। একটী দরজাও আছে। দরজাটী মুখে এমন সুন্দর ভাবে লাগে যে ভিতর হইতে ঠেলিয়া না দিলে খোলা যায় না। দরজার গায় ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহাতে নখ দিয়া ভিতর হইতে ধরিয়া রাখে। দরজার বাহিরের দিকে মাটী মাখাইয়া এমন করিয়া রাখে যে সহসা চেনা যায় না।

মাকড়সার প্রস্তাব আমরা শেষ করিলাম। ভরসা করি তোমরা আর মাকড়সা দেখিলেই মারিতে যাইবে না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমরা গতবারে যে চিত্রের পুরস্কার দিব বলিয়াছিলাম, সেই সম্বন্ধীয় সমস্ত চিত্র আগামী ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে এখানে পৌছান আবশ্যক বিশেষ প্রয়োজন হইলে আর ৫ দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া যাইতে পারে। কার্য্যাধ্যক্ষ।

[স্থানাভাব বশতঃ এবারেও ধাঁধা দেওয়া গেল না।]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
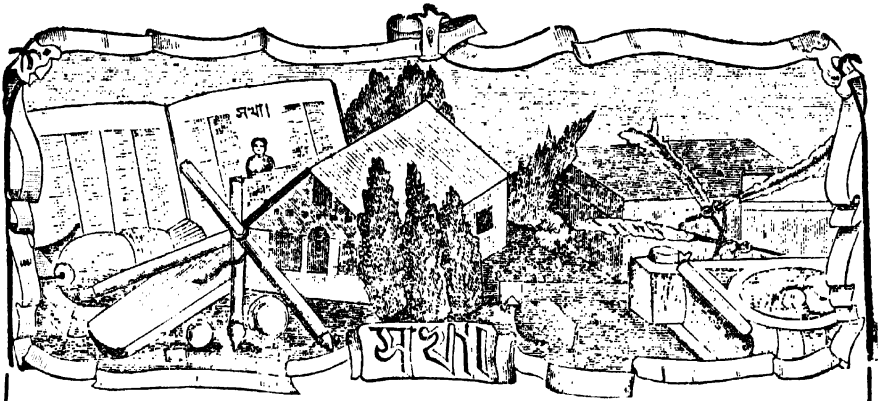
প্রথম ভাগ। সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩। ৯ম সংখ্যা।

ভীমের কপাল।

১০ম অধ্যায়।

খন ভীমেন্দ্রের চেতনা হইল, তখন সে দেখিতে পাইল এক সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে সে রহিয়াছে। সম্মুখে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছে। ভীমেন্দ্র চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায়? এ কোন স্থান?" বৃদ্ধা উত্তর করিল "বলিতে নিষেধ আছে।" ভীমেন্দ্র পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল, আমাকে এখানে কে আনিয়াছে এবং কেনই বা আনিয়াছে?" দাসী উত্তর করিল "বোধ হয় ডাকাতেরা তোমাকে তাহাদের চাকর করিয়া রাখিবে বলিয়া লইয়া আসিয়াছে।"—ভীমেন্দ্রের মনে রাগ, ঘৃণা, দুঃখ এক সঙ্গে উদয় হইল। সে বলিয়া উঠিল "কি? আমি যদি চাকরী না করি?"—বুড়ী চেঁচাইতে বারণ করিয়া বলিল "তাহারা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। আর যদি পলাইয়া পুলীশে খবর দিতে যাও, তা হলেও রক্ষা নাই। রঘো ডাকাতের নামে দেশশুদ্ধ কেঁপে যায়, তোমার কি সাহস যে পলাইয়া বাঁচিবে।"—ভীমেন্দ্র এই কথা শুনিয়া ভয় পাইল—আর তাহার কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। যৎকালে এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময় ডাকাতের সর্দ্দার রঘুরাম সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দিনের বেলায় ভীমেন্দ্র রঘুরামকে দেখিয়া লইল—তাহার প্রকাণ্ড শরীর লৌহ নির্ম্মিত বলিলেও হয়—হাত পা গুলি গাছের মত—কপাল বিলক্ষণ চওড়া। দস্যু আসিয়াই দাসীর দিকে চোখ লাল করিয়া তাকাইল, এবং বলিল "যার তার সঙ্গে তোর কি কথা বার্ত্তা হয়?" অনন্তর ভীমেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "রঘো ডাকাতের বাড়ীতে বসেই রঘো ডাকাতের বিপক্ষে পরামর্শ কর্‌ছো?" ভীমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। দস্যু আবার বলিল "আজ থাক; কাল্‌কে তোমাকে যা কর্ত্তে হয় কর্‌বো।"—এই বলিয়া দস্যু সেখান হইতে চলিয়া গেল। ভীমেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কি পলাইবার কোন উপায় নাই? তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমায় বলে দাও। আমার আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতে ভয় হইতেছে।" দাসী উত্তর করিল "কেন বাছা, আবার ঐ কথা বলিয়া বিপদে

পড়িবে? আর আমাকেও বিপদে ফেলিবে? এখান থেকে পলাবার যদি কোনও উপায় থাকিত তাহা হইলে কি আমি এই বুড়ো বয়সে এদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে এখানে পড়ে থাকি?" ভীমেন্দ্র এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না, ভাবিল যে কোন উপায়ে পারি পলায়ন করিতে হইবে। এই রকমের নানা ভাবনায় ভীমেন্দ্র সে দিন কাটাইল—মাথার ঘা শুকাইয়া উঠিয়াছে। পর দিন ভীমেন্দ্র আপনার ঘর হইতে বাহিরে একটু বেড়াইতে আসিল—চারিদিকে লোক জন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এক স্থানে কতকগুলি লোক বসিয়া মদ্যপান করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে 'হাহা' করিয়া হাস্যের শব্দে গৃহটীকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এক স্থানে কতকগুলি লোক অস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে—তন্মধ্যে এক জন ভীমেন্দ্রকে দেখিয়া হাসিল; বলিল "আমিও তোমার মত এক সময় ছিলাম কিন্তু রঘো ডাকাতের দলে পড়ে এখন আমি ডাকাত হইয়াছি। তুমিও থাক তোমার শরীরটী বেশ দেখ্‌চি—তুমি কালে খুব একজন ভাল ডাকাত হ'তে পারবে।"—ভীমেন্দ্র ঘৃণায় কোনও কথা না বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া শুনিল যে স্থানে ভীমেন্দ্র রহিয়াছে, তাহা রঘুরামেরই জমীদারী। সমস্ত লোক তাহার অধীন—সুতরাং রঘো ডাকাতের পুলীশের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা নাই।—এমন কি এরূপ গুজব শোনা যায় যে রঘো একবার ৫ জন পাহারাওলার হাতে পড়ে;—রঘো একা তাহাদিগকে আধমরা করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে নিজের দলে মিশাইয়া লয়। রঘুর বিরুদ্ধে কে কি বলিবে? দুই তিন দিন গেল—ভীমেন্দ্র পলাইবার পথ পায় না। রঘুও ভীমেন্দ্রকে কিছু বলে না। অবশেষে এক দিন সন্ধ্যাবেলা ভীমেন্দ্র নিজের ঘরে বসিয়া কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় রঘো ডাকাত সেইখানে আসিল। সে আসিয়াই ভীমেন্দ্রকে কহিল "দেখ্, আমরা একটা বড়লোকের বাড়ী লুটপাট কর্‌তে যাব; তুই আমাদের সঙ্গে থাকিস্, তা হলে কেমন করে ডাকাতি কর্‌তে হয় তা অভ্যাস হবে এখন। প্রস্তুত হ।" ভীমেন্দ্রের ভয় থাকিলে কি হয়, তাহার দ্বারা একটা অন্যায় কাজ করাইয়া লইবে, ইহাতে ভীমেন্দ্র প্রাণান্তেও রাজি হইবে না, স্থির করিয়া বলিল "ডাকাতি করাটা আমি অন্যায় মনে করি—আমি কখনও যাব না।" রঘো ঠাট্টার স্বরে বলিল "বাবু অন্যায় মনে করেন বটে—তবে আপনাকে এইখানে শোয়াইয়া রাখিয়া যাই।" এই বলিয়া জোরের সহিত ভীমেন্দ্রের মাথায় লাথি মারিল—ভীমেন্দ্র আপনার দুর্ব্বল শরীর লইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রঘো চোখ্ লাল করিয়া "আরও কিছুকাল লাগিবে," এই কথা গুলি বার বার বলিতে বলিতে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। দস্যু সেখান হইতে চলিয়া যাইবা মাত্র দাসী তথায় ছুটিয়া আসিল এবং চোখে মুখে জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল—দাসীর দুচোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ পরে ভীমেন্দ্রের চৈতন্য হইল। ভীমেন্দ্র বুঝিল কে একজন পাশে বসিয়া আছে—সে মনে করিল রঘো ডাকাত। তখন সে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বলিল "এমন লোক দেখি নাই—যে জোর ক'রে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে চালাতে পারে। তুমি আমাকে কেটে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও আমার দ্বারা তোমার সিকিপয়সারও কাজ হবে না।" দাসী বলিল "আমি ডাকাত নই, আমি তোমার দুঃখে দুঃখী"—চক্ষু খুলিয়া ভীমেন্দ্র দেখিল দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে পাখার বাতাস করিতেছে। ভীমেন্দ্র এই দয়া দেখিয়া চোখের জল রাখিতে পারিল না। দুজনে মিলিয়া নিজের নিজের দুঃখের কথা বলিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিল।

এইরূপে সেই রাত্রি কাটিয়া গেল। গ্রামবাসী কাহাকেও নিজের অবস্থার কথা বলিলে, রঘোর ভয়ে কেহই তাহার দুঃখে দুঃখ দেখায় না। ভীমেন্দ্র মরুভূমিতে রোপিত লতার ন্যায় দুঃখে শোকে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। ডাকাত সর্ব্বদা আসিয়া প্রহার করে।—তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে বলিলে ভীমেন্দ্র কেন তাহাতে রাজি হয় না? পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ কেহ আছেন কি না জানি না, যিনি হয়ত এইরূপ অবস্থায় পড়িলে, মার খেয়ে মরা অপেক্ষা ডাকাতের দলেই মিশিয়া যাইতেন। ভীমেন্দ্র অন্যায় কার্য্য জানিয়া কেমন করিয়া তাহাতে যোগ দিবে? ভীমেন্দ্র যে কাজ করিবে না, কাহার সাধ্য তাহাকে দিয়া সে কাজ সম্পন্ন করায়? একগুঁয়ে ভীমেন্দ্রের স্বভাবই এই ছিল। সুতরাং রোজ ভীমেন্দ্রকে অসহ্য প্রহার, যাতনা সহ্য করিতে হইত। ডাকাত ভাবিল এক রত্তি ছেলে—তিন দিনের শাস্তিতেই সোজা হইয়া উঠিবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া ডাকাত হুকুম দিয়া গেল "ছোঁড়াটাকে রোজ ১০ঘা বেত মারিও।" প্রত্যহই ভীমেন্দ্র বেত খায়, কিছুতেই রাজি হয় না। অবশেষে ভীমেন্দ্রের সমুদায় শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল—আর ভীমেন্দ্র সহ্য করিতে পারে না। তখন ভীমেন্দ্র ভাবিল জলে ডুবিয়া মরি। ঈশ্বর জানেন ভীমেন্দ্র আর যদি সহ্য করিতে পারিত কখনও এই অন্যায় কাজের কথা ভাবিত না; ভীমেন্দ্র অনেক সহ্য করিয়াছিল, বালক আর সহ্য করিতে পারিল না। যদি পলাইয়া বাঁচিতে পারিত, তাহা হইলেও ভীমেন্দ্র আত্মহত্যা করিতে যাইত না; কি সর্ব্বনাশ! পলাইবার পথও যে বন্ধ! রঘুরামের উপদ্রবে তাহার অধীনস্থ কাহারই পলাইয়া বাঁচিবার যো ছিল না। ভীমেন্দ্র তখন যাঁহার প্রাণ তাঁহাকে দিবার জন্য এক দিন দ্বিপ্রহরের সময় একটী নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর ধারে গিয়া দাঁড়াইল—তাহার চেহারা দেখিলেই যে সে বুঝিতে পারিত, ভীমেন্দ্র জীবনে আশা ছাড়িয়া আসিয়াছে। কিছু দূরে একটী বালক একটা গাছতলায় বসিয়া এইটী লক্ষ্য করিল। দেখিতে দেখিতে ভীমেন্দ্রের চক্ষু জলে পূরিয়া গেল। ভীমেন্দ্র সহ্য করিতে না পারিয়া, নিজের দুটী পা গামছা দিয়া বাঁধিল, এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া ঝাঁপ দিয়া সেই উচ্চ তীর হইতে জলে পড়িল। ও ভীমেন্দ্র তুমি যে তোমার মায়ের বুকযুড়ানো ধন, তুমি যে অনেকের ভালবাসার পাত্র, সে সকলকে ফাঁকি দিয়া কোথায় যাও?—ভীমেন্দ্র,—এ কি করিলে?—যাহাদের ভালবাসিতে তাহাদের বলিয়া গেলে না?—যাহারা তোমাকে না দেখিয়া কাঁদিবে, তোমার মন তাহাদের জন্য একটু কাল বিলম্ব করিল না? কি কষ্ট! কি কষ্ট!—হা ঈশ্বর, এই কি **ভীমের কপাল**?—যে বালক অদূরে বৃক্ষমূলে বসিয়াছিল, সে হঠাৎ একটী বালককে এইরূপে জলে পড়িতে দেখিয়া অবিলম্বে তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিল—নিজের জামা খুলিয়া রাখিয়া জলে পড়িল এবং অতি কষ্টে অচেতন বালককে টানিয়া তীরে তুলিল। পরম সৌভাগ্যের বিষয় সেই সময়ে রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর ছিল বলিয়া কেহই সেখানে ছিল না। নূতন আগত বালকের চেষ্টায় ভীমেন্দ্র অল্পকাল পরে চেতন পাইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল কিন্তু যাহা দেখিল সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না—দেখিল সেই বালক আর কেহ নহে তাহার মাসতুত ভাই এবং প্রিয়তম বন্ধু **বিপিন**!—ভীমেন্দ্রের ইচ্ছা হইল যদি তাহার এক শত মুখ থাকিত, তাহা হইলে একেবারে তাহার সমস্ত দুঃখের কথা বলিয়া বিপিনকে জড়াইয়া ধরিত। এখন কিছুই বলিতে না পারিয়া বলিল 'বিপিন'।—বিপিনও দেখিয়া চিনিল ভীমেন্দ্রই বটে, কিন্তু সমুদায় শরীর ক্ষত বিক্ষত ইহার কারণ জানিয়া বিপিন যে কত কাঁদিল

তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। কিন্তু ভীমেন্দ্র নিজের অবস্থা সংক্ষেপে বলিয়া বিপিনকে অধিকক্ষণ ডাকাতদের দেশে থাকিতে নিষেধ করিল,—বলিল 'আমার যা হয় হবে; তুমি এখানে থাকলেই মারা পড়'বে। আমাকে যাতে উদ্ধার করতে পার, অন্যত্র গিয়া তাহার চেষ্টা দেখ।" বিপিন জামার পকেট হইতে একখানা চিঠির কাগজ, ও একটা টীকিট-লেফাপা ও পেন্সিল দিয়া ভীমেন্দ্রকে গোপনে কলিকাতার ঠিকানায় তাহাকে চিঠি লিখিতে বলিয়া গেল।

ক্রমশঃ—

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

লজ্জা ও নম্রতা।

বিনোদিনীর বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর, লেখা পড়া অতি সামান্যই জানা আছে। বাপের এক মাত্র দুহিতা, সুতরাং বড় আদরের। বিনোর বিবাহ হইয়াছে কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আজিও পিত্রালয়েই থাকে। বাল্যাবস্থা হইতেই বিনো বড় দুরন্ত, গালাগালি বৈ আর কথা নাই, সকলেরই সম্বোধন "পোড়ার মুখী, লক্ষীছাড়ী, সর্ব্বনাশী" প্রভৃতি সুমধুর বচন! অথচ কেহ কিছু বলে না, পিতার আদরের ধন। এইরূপে আদর পাইয়া বিনোর চরিত্র ভয়ানক দূষিত হইয়া গেল, সে ঘোর অত্যাচারী ও ভয়ানক স্বেচ্ছাপ্রিয় হইতে লাগিল। রাগ হইলে সম্মুখে ঘটী বাটী, যাহা পাইত তাহাই চূর্ণ করিয়া ফেলিত, মাকে মারিয়া গালাগালি দিয়া উৎসন্ন করিয়া দিত, ঘোর দুরন্ত হইল। তথাপি কথা নাই! এখন বড় হইয়া অনেক দোষ সারিয়াছে বটে, কিন্তু যে ঘোর স্বেচ্ছাচারিতা একবার অভ্যাস হইয়া গেল তাহা আর গেল না। চিরকালের জন্য তাহার চরিত্রে একটী প্রবল দোষ স্থায়ী হইয়া গেল। সে এখনও যাহা ধরিবে তাহা না পাইলে কাহারও রক্ষা নাই, যাহা বলিবে তাহা না শুনিলে কাহারও শান্তি নাই। এত বয়স হইয়াছে অদ্যাপি স্থির গম্ভীর বুদ্ধি টুকু তার হইল না, কাকে কি বলিতে হয়, কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা কিছুই জানে না। শিখাইলেও শুনিবে না। ভুলিয়াও সত্য কথা কয় না—এত মিথ্যা কথা রচনা করিয়া কহে যে তাহার সংখ্যা নাই, তাহা দেখিয়া শুনিয়া প্রাচীন লোকও অবাক হয়।

প্রিয় পাঠিকাগণ! আমাদিগকে নিন্দুক ভাবিবেন না, আমরা বিনোকে ভালবাসি এবং তাহার চরিত্র মন্দ হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু কি করি, সত্যের খাতিরে, ও আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিতে হইল। যাহা হউক এত দোষ সত্বেও বৃদ্ধারা বিনোর বড় সুখ্যাতি করেন, —বিনোর একটী গুণ আছে, সে বড়ই লজ্জাবতী। তাহার লজ্জার সুখ্যাতি দেশে বিদেশে বিখ্যাত। বিনো যখন শ্বশুরালয়ে যায় তখন তাহার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র, তাহাকে তখন কাপড়ের পুতুল বলিলেও হয়, রাত্রিদিন বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া ২।৩ হাত ঘোমটা টানিয়া ষষ্টি বুড়ী সাজিয়া বসিয়া থাকে। কেহ মুখ দেখিতে আসিলে বিনোর সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত। সকলকে ধ্বস্তাধ্বস্তী করিয়া মুখ দেখিতে হয়! কথা ত নয়ই, কাহারও সঙ্গে না। কাহারই সম্মুখে আহার হয় না—ভয়ানক লজ্জা! কাজেই দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া বিনোর লজ্জার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমবয়স্কারা তাহার নিন্দা করে, "এত বাড়াবাড়ী, মেয়ের সব মন্দ," প্রভৃতি নানাপ্রকার নিন্দা করে। কত বুঝায়, কত উপদেশ

দেয়, কে সে সব কথা শুনে? বিনোর স্বভাব যাইবার নয়।

তাহারই বাড়ীর পাশে বোসেদের কামিনী আর এক রকম মেয়ে। সে বাল্যাবধি পিতার নিকট লেখা পড়া শিখিয়াছে, ভাল ভাল স্থানে যাইয়া অনেক দেশের স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া কত জ্ঞান লাভ করিয়াছে ও কত কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে। এখন তাহার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র, কিন্তু ইহারই মধ্যে অনেক ভাল ভাল বৈ তাহার পড়া হইয়াছে। শ্বশুরালয়েই থাকে, বাড়ীর মধ্যে সে আর তাহার শাশুড়ী এই দুটী স্ত্রীলোক আর সকলেই পুরুষ। কামিনী অর্দ্ধাবৃত মুখে তাঁহাদের সকলেরই সম্মুখে আসে, সকলের কথা মুখ নীচু করিয়া শুনে ও ঘাড় নীচু করিয়াই নিম্ন-দৃষ্টিতে তাহাদের উত্তর দেয়। বিনোর মত চীৎকার করিয়া ডাকা বা উচ্চহাস্য কামিনীর মুখে কেহ কখন শুনে নাই। কেহ দূরে থাকিলে সে তাহার নিকটে গিয়া কথা বলিয়া আসে,উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলে না। হাসির কথায় যখন সকলে গড়াইয়া যাইতেছে, কামিনী তখন স্থিরভাবে বসিয়া— মুখে অল্প অল্প হাসি। খুব দুঃখ হইলেও কাঁদে না, কেবল চক্ষু দিয়া টস টস করিয়া জল পড়ে মাত্র। তাহার মুখে কেহ কখন গালাগালি শুনে নাই। আর সকলে যেমন সচরাচর গায়ের কাপড় খুলিয়া থাকে, কোন লোক আসিলেই তাড়াতাড়ি গায় ও মাথায় কাপড় তুলিয়া দেয়; কামিনী সেরূপ করে না, সদাই তাহার সর্ব্বাঙ্গ সলজ্জ ভাবে আবৃত, অথচ সে কুঞ্চিত ভাব নাই যাহা অন্যের দেখা যায়। কামিনী সকলের সঙ্গে বসিয়া থাকিবার সময়ে নিজে অধিক কথা কয় না, মেলা অনাবশ্যক কথা কহিয়া গোল করে না। আবশ্যকমত ধীরে ধীরে ২।৪টী কথা বলে। কথা কহিবার সময়ে হাত পা নাড়িয়া সে কখন ব্যাপকতা প্রকাশ করে না। অতি মৃদুভাবে মধুরস্বরে কথা কহে, তাহার কথা শুনিলে ও তৎকালীন তাহার মুখের বিনম্রভাব দেখিলে সকলেই তাহাকে এ অল্প বয়সে দেবী মনে করে। তাহার চক্ষে কখন চঞ্চলতা দেখা যায় না, স্থির গম্ভীর ভাব।

এতগুণ থাকিতেও বৃদ্ধারা কামিনীকে দেখিতে পারে না তাহার একটী মহৎ দোষ আছে—সে "বেহায়া"! সে অনায়াসে (নম্রভাবে) শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ও অপরিচিত অতিথির সম্মুখেও বাহির হইয়া তাঁহাদের কথার উত্তর দেয়, তাঁহাদের পরিবেশন করে, তাঁহাদিগকে নমস্কার করে, ইত্যাদি। কত দোষ বলিব? কামিনীর অনেক দোষ।—কামিনী বৈ পড়ে! পড়িয়া আবার প্রতিবেশিনীগণকে শুনায়! তাহার আর একটী প্রধান দোষ আছে।—সে স্বামীকে বন্ধু বলিয়া যত্ন করে! "ওমা! কলির মেয়ে" প্রভৃতি কতই দুর্ণাম যে তার, তা আর কি বলিব। যদি কেহ এ অবস্থায় পড়িয়া থাকেন ত জানিবেন কামিনীর কত নিন্দা। কিন্তু তাহার দোষ কি? এ শেষোক্ত দোষটীর জন্য বিনোদিনী তাহার বড়ই নিন্দা করে।

পথে চলিবার সময় কামিনী বড় বেহায়াপনা করে;—সে এত কম ঘোমটা দেয় যে তাহার মুখের অনেকটা দেখা যায়। বিনোর মত ১ হাত ঘোম্‌টা দিয়া যায় না, তাহার মত দুহাত ঘোম্‌টার মধ্যে ফাঁক করিয়া সব দেখিতে দেখিতে যায় না। আপন মনে পথ পানে চাহিয়া স্থিরভাবে চলিয়া যায়!

পাঠিকাগণ! আমাদের কোন দোষ নাই। যেমন জানি তেমনি সত্য সত্য দুজনেরই চরিত্র বর্ণনা করিলাম। উভয়েরি সুখ্যাতি আছে, উভয়েরই অখ্যাতি আছে। বৃদ্ধারা ও মূর্খ লোকেরা কামিনীর নিন্দা করে ও বিনোদিনীর প্রশংসা করে, কিন্তু যাঁহারা বুঝেন, যাঁহারা সভ্যতা ও নম্রতার পক্ষপাতী তাঁহারা বিনোর বড়ই নিন্দা করেন ও কামিনীকে দেবী জ্ঞান করেন। আমরাও তাই

মনে করি। বৃথা বাহ্য লজ্জাতে আবশ্যক নাই। আন্তরিক নম্রতাই মানবের শোভা, এইটীর নামই প্রকৃত লজ্জা, নহিলে এ দিকে চূড়ান্ত বাচালতা, চূড়ান্ত দুরন্তপনা ও ঘোর বেহায়াপনা করিয়াও যদি একটু ঘোমটা টানিলেই লজ্জাশীলা হওয়া যাইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। ভরসা করি, আমাদের প্রত্যেক পাঠিকা কামিনীর মত লক্ষ্মী হইবেন ও বিনয় নম্রতা ও স্থৈর্য্য দ্বারা বিভূষিত হইয়া স্ত্রীজাতির ভূষণ স্বরূপা হইবেন।

ঠাকুরদাদার গল্প।

পরদিন যখন সকলে নিয়মিত বাগানের কার্য্য শেষ করিয়া গল্প করিতে বসিলেন তখন নবীন বাবুই প্রথমে কথা তুলিলেন:—"আজ উদ্ভিদ জাতির বংশবৃদ্ধির প্রণালী আমাদের বিবেচ্য। ভাল! তোমরা কে কি জান বল ত দেখি তার পরে আমি স্বয়ং বলিব। আগে মন্মথ বল।" মন্মথ তখন একটু আনন্দিত হইয়া বলিল "উদ্ভিদদিগের বংশবৃদ্ধি ত কেবল বীচিতেই হয়। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই ত গাছ হয়।"নবীন বাবু ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বীজ কোথা হইতে হয়?"

মন্মথ—সেত মালীর ঘরেই থাকে? কিশোরী অমূল্য ও নবীন বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কিশোঃ—তাই বুঝি শিখেছ? ওরে শিবু! (মালীর নাম শিবু) তুই বীচি কোথা হতে পাস? মালীঃ—কেন বাবু বীচিত সকল ফলের ভিতর থাকে? নবীঃ—দেখ দেখি মন্মথ! ভাই এসব তুচ্ছ বিষয় তোমরা জাননা? কি আশ্চর্য্য! ফল মাত্রেই বীজ থাকে, ও এই বীজ ভূমিতে রোপণ করিলে উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ঐ অঙ্কুর বড় হইয়া গাছ হয়। এই রূপেই বৃক্ষ লতাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, বুঝিলে? এই রূপেই একটী বীজ পাইলে ক্রমে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ প্রস্তত করা যায়।

নলিন এতক্ষণ চুপ করিয়া একবার এদিক একবার ওদিক চাহিতেছিল এখন বলিল, "দাদা মহাশয়! কি করে গাছ থেকে ফল হয়, ফল কে দিয়া যায়? কিরূপে ফল হইতে বীজ হয় ও বীজ হইতে আবার গাছ হয়? সমস্ত আমাকে বুঝাইয়া বলনা। আমার বড় শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" নবীঃ—সে যে অনেক কথা! আচ্ছা তবে মন দিয়া শুন। আর,—একটী গোলাপের কুড়ি আন দেখি।"—নলিন আনিল।
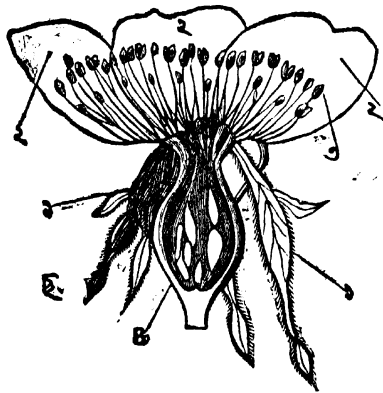
নবীনবাবু আস্তে আস্তে কুঁড়িটী ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, এই উপরেই পাঁচটী সবুজ বর্ণের পাতার মত দেখিতেছ? (সকলে "হাঁ") বেশ তার পরে ফুলের পাপড়ী গুলি কেমন সুন্দর ভাবে উপর্য্যুপরি লাগিয়া রহিয়াছে! যেন আলাদা করা কঠিন, এই দেখ একটা ছাড়িয়া গেল। ক্রমে এই সবগুলি খুলিলাম, ফুলটী এখন ফুটন্ত হইল। তার পরে দেখ কতকগুলি কি পরস্পরের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। (ছুরি দিয়া সোজা দিকে ফুলটী চিরিয়া ফেলিলেন!) দেখ দেখ! ইহার মধ্যে আবার কিরূপ ব্যাপার দেখ! লেবুর কোষার মত অতি কচি কচি কি সব ঠেষাঠেষি করিয়া রহিয়াছে! আচ্ছা, আর একটা বড় ফুটন্ত ফুল আন (বিনয় আনিল;—

সেটীও তেমনি চিরিলেন) ইহার ভিতরেও দেখ ঠিক সেই রকম। (১৩৪ পৃষ্ঠায় 'ছ' চিহ্নিত চিত্র দেখ!) আচ্ছা বলদেখি এ সব কি?" (সকলে—জানিনা) কিশোরী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি চমৎকার দাদা মহাশয়—এমন কৌশলে ফুল থাকে! ছি ছি! আমরা রোজ ফুলবাগানে কার্য্য করিতে আসি, কিন্তু এমন যে কৌশল এই ফুলগুলির মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে তাহা জানি নাই। দেখুন দাদা মহাশয়! আপনি আমাদিগকে সব সুন্দর বস্তু দেখাইয়া বুঝাইয়া দিন। এ ফুলের সব আমরা বুঝিয়া তবে ছাড়িব। কেমন?" কিশোরী বড় ভাল বালক, তাহার হৃদয় মন ফুলের কৌশল দেখিয়া একেবারে গলিয়া গিয়াছে। নবীঃ—"এখনি কি হইয়াছে? যখন সমস্ত বুঝাইয়া দিব তখন দেখিবে যে ঈশ্বরের মহিমা যথার্থই অসীম।

"এই ফুলটী তাহাহইলে ঠিক চারি অংশে নির্ম্মিত। ১ম—বাহিরের সবুজ পাতার মত অংশটী; ২য়—পুষ্পের সুবর্ণ পাপড়ী; ৩য়—এক একটী সরু কাটীর মাথায় মাকুর মত; ৪র্থ—লেবুর কোষার মত। যেমন এই চারিটী অংশ গোলাপে দেখিতেছ, সেইরূপ, সমস্ত পুষ্পেই আছে। যে ফুল ইচ্ছা লইয়া আইস, দেখিবে এই ৪টি অঙ্গ আছেই। তবে এক জাতীয় ফুল আছে তাহাদের হয়ত ১ম, না হয় ২য়, না হয় উভয় অঙ্গই নাই। আবার কতক গুলি ফুলের হয়ত তিন অঙ্গ নাই, কোন জাতীয়ের ৪র্থ অঙ্গ নাই,—যথা লাউ কুমড়া ফুল। কিন্তু সাধারণতঃ প্রায়ই দেখা যায় যে পুষ্প মাত্রেরই এই ৪ প্রকার, অন্ততঃ ৩ প্রকার অঙ্গ আছে। (সকলে "আমরা দেখিব"।) লোকে ফুলের পাপড়ী গুলিরই সৌন্দর্য্য দেখে, সুগন্ধেই মুগ্ধ হয়, ফুলের দ্বারা যে কত মহা উপকার সাধিত হয় তাহা দেখিতে পায় না, সকল ফুলেরই যে এই ৩।৪টী ভিন্ন জাতীয় অঙ্গ আছে তাহাও দেখে না।"

আমরা আশা করি সখার পাঠকপাঠিকাগণ এখন হইতে মন দিয়া সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিবেন ও নিজ নিজ বিজ্ঞ বন্ধুদিগের নিকট হইতে এইরূপে জ্ঞান লাভ করিবেন। নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন;—"জগতে কত ফুল ফোটে কে তাহার সন্ধান লয়, কে তাহাদের উপকারিতা অন্বেষণ করে? আমরা সকলে অজ্ঞান ও স্বার্থপর। যাহাতে লাভ আছে তাহাই খুঁজি। তোমরা সকলেই আম্র খাইয়াছ, কিন্তু বৃক্ষ হইতে কি রূপে যে আম্র উৎপন্ন হইল, তাহার সন্ধান কি লইয়া থাক? এখনত গাছে আম নাই, জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কোথা হইতে আইসে, বল দেখি? (সকলে "বোল হইতে") বোল হইতে আম্র কি রূপে কোন্ উপায়ে হয় তাহা কি দেখিয়াছ? ("না") এইবার যখন বোল হইবে তখন দেখিও; দেখিবে যে বোল আমের ফুল বৈ আর কিছুই নহে। উহা ফুল। একটী ডালে অনেকগুলি ফুল দল বাঁধিয়া জন্মে। তাহাদের এক একটী ফুল বেশ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে তাহারও এইরূপ ৪টী স্বতন্ত্র অঙ্গ আছে (উপরের "খ" চিত্র দেখ) কিন্তু অতি ছোট। ছোট ছোট ৫টী সবুজ "বহিরাবরণ," ছোট ছোট ৫টী "পাপড়ী" ছোট ছোট ৫টী "পরাগ কেশর" (তৃতীয় অঙ্গ), ও একটী ক্ষুদ্র "গর্ভকেশর" সকলের মধ্যস্থানে রহিয়াছে। তদ্রূপ বেল, আতা, পেয়ারা, চালতা, লেবু, লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি যত ফল আছে সকলেরই জন্ম ফুল হইতে। ফুলের ১ম ও ২য় অঙ্গ দুটী না থাকিলেও হানি হয় না কেবল ৩য় ও চতুর্থ অঙ্গ দুইটী ফলোৎপাদনের মূল; যেমন পান গাছ ও ঝাউ গাছে যে ফুল হয়, তাহাদের ১ম ও ২য় অঙ্গ নাই অথচ সে ফুল হইতে ফল জন্মে। তবেই দেখা গেল যে ১ম অঙ্গটী কেবল অন্য সকলগুলিকে ঢাকিয়া রাখে, নষ্ট হইতে দেয় না, ও ২য়টী শোভাবর্দ্ধনের জন্য

যথার্থ বংশ বৃদ্ধির জন্য অপর ২য়টী অঙ্গ। তাহাদের মধ্যে পারগকেশরগুলি অপেক্ষা আবার গর্ভকেশরের অধিকতর নিকট সম্বন্ধ; কেন না ঐ গর্ভকেশরই পরিপক্ক হইয়া ফলরূপে পরিণত হয়। পরাগকেশরের অগ্রভাগস্থ মাকুর মত থলি এক প্রকার চূর্ণ (গুঁড়া) দ্বারা পূর্ণ। সময়ে ঐ থলি ফাটিয়া যায় ও চূর্ণগুলি বাহির হইয়া পড়ে। ঐ চূর্ণ গর্ভকেশরের অগ্রভাগে পড়িলেই গর্ভকেশর পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই ফলের আদিম অবস্থা। আম্রের বৌলে, লেবুর ফুলে ও অন্যান্য সকল ফুলেরই একটু পরিণত অবস্থায় ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছোট সবুজ বর্ণের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কড়াই শুঁটীর একটী ফুল সোজা চিরিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই গর্ভকেশর ক্রমে বড় হইয়া "বীজকোষ" হইয়াছে, তাহা ঠিক কড়াই শুঁটীর মত আকার পাইয়াছে, এমন কি তাহার মধ্যে ছোট ছোট
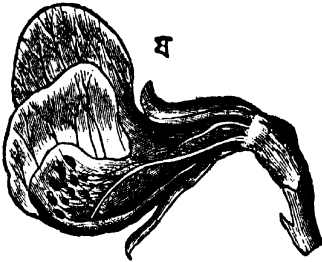
শুঁটীর দানাগুলি পর্য্যন্ত দেখা যায় (উপরে "ঘ" চিহ্নিত চিত্র দেখ)। ইহার পর ফুলের পাপড়ী ও অন্যান্য অঙ্গগুলি ক্রমে শুকাইয়া যায়, কেবল এই পক্ক গর্ভকেশর অর্থাৎ "বীজকোষ" ক্রমে ক্রমে পরিণত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।
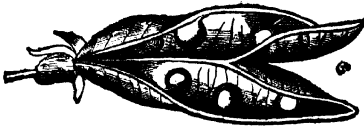
অবশেষে কিছুকাল পরে ইহাই ফল হইয়া দাঁড়ায়, ভিতরের শুঁটীগুলি তখন বেশ বড় বড় হইয়া উঠে, তখন উহাকে চিরিলে ঠিক উপরের "ঙ" চিহ্নিত ছবির মত দেখায়। সুতরাং দেখ কেমন আশ্চর্য্য

কৌশল ও সুন্দর নিয়মে "গ" চিহ্নিত কড়াই এর ফুলটী হইতে কেমন ফলটী উৎপন্ন হইল। এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ফলই ফুল হইতে সৃষ্ট হয়, ফুল না হইলে ফল জন্মিতে পারে না"

কিশোঃ—"তবে ডুমুরের ত ফুল হয় না?"—

নবীঃ—কে বলিল ডুমুরের ফুল হয় না? অবোধ স্ত্রীলোকেরা ও মূর্খ লোকেরাই ডুমুরের বড় বড় ও স্পষ্ট ফুল না দেখিয়া ঐরূপ কহে। কিন্তু বাস্তবিক ডুমুরের অসংখ্য ফুল হয়। বুঝাইয়া দি শুন। গাছে যে ফুল ধরে তাহা নানারূপে অবস্থিত হয়। গোলাপ, মল্লিকা, জবা প্রভৃতি বৃক্ষে একটী বৃন্তে (বোঁটায়) একটীর অধিক ফুল হয় না। অনেক বৃক্ষেই কিন্তু ফুল সকল গুচ্ছ বাঁধিয়া এক বোঁটায় অনেক ফুল ধরে, যেমন আম, জাম, নারিকেল, তাল, শুপারি, কলা প্রভৃতি। একটী বৃন্তে অনেক ফুল গোছা বাঁধিয়া থাকে, তাহার আবার নানা প্রকার ভেদ আছে। নারিকেল প্রভৃতির ফুল বোঁটাটীর গায়ে সংলগ্ন হইয়া থাকে, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল সকল আর এক রকমে ধরে;—সেইরূপ গাঁদা, রাধাপদ্ম, প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ফুল আছে তাহারা সহসা দেখিতে একটী মাত্র ফুল বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে তাহারা

একটী পুষ্প নহে। অসংখ্য ফুল সকলের গুচ্ছ। গাঁদার যাহাকে এক একটী পাপড়ী বোধ হয়, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী স্বতন্ত্র পুষ্প, ("স্ব স্ব" চিত্র দেখ) একমাত্র বোঁটায় আবদ্ধ। বেশ মন

মন দিয়া শুন। গাঁদা একটী ফুল নয় বুঝিলে, সেইরূপ অন্যান্য কয়েক জাতীয় পুষ্প আছে তাহাদের বৃন্তের অবস্থার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে আদৌ ফুল বলিয়াই চিনা যায় না। গাঁদা ফুলের বোঁটা নীচে থাকে, খুব মোটা হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহার উপর হইতে সব ফুল বাহির হয় (জ চিত্র দেখ)। অন্যান্য বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছের নিয়ম ভিন্ন রূপ। যথা কদম্ব পুষ্পের বোঁটা খুব ফুলিয়া গোল ভাঁটার মত হয় ও তাহার চারিদিকে গোলাকারে ফুল ধরে। কাঠালের বোঁটা ফুলিয়া ও লম্বা হইয়া তাহার "ভোঁতাটা" হয়। ইহারই চারিদিকে ফুল ধরে। হয় ত তোমরা আশ্চর্য্য হইতেছ, কচি কাঁঠাল যাহাকে বল, তাহা ফুল!! তোমরা বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিও কচি কাঁঠাল হস্তে রগড়িয়া কেমন সুন্দর গন্ধ দেখিতে পাইবে। সেইরূপ আর এক জাতীয় আশ্চর্য্য জনক পুষ্পগুচ্ছ আছে তাহা বড় চমৎকার। ইহার বোঁটাটীর চারিদিকে বৃদ্ধি পাইয়া ফুলগুলিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, এইরূপে গোল পানা বোঁটাটীর ভিতরে অসংখ্য ফুল থাকিয়া যায়, এই গোল বোঁটাটী বাহির হইতে দেখিতে ঠিক ফলের মত। কিন্তু বাস্ত-

বিক ইহা অগণ্য ফুলের সাধারণ বোঁটা!! কি চমৎকার! অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল এই জাতীয়; বাহিরে কিছুই নাই, ঠিক যেন একটী ফল। চিরিয়া দেখিলেই ভিতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল দেখা যায়। এই সকল ফুলের পূর্ব্বমত অঙ্গ সকলও আছে, কিন্তু অনুবীক্ষণের সহায়তা ব্যতীত স্পষ্ট দেখা যায় না (উপরে চ ও থ চিহ্নিত চিত্র দেখ)। এখন বুঝিলে ডুমুরের ফুল হয় কি রূপে। পরমেশ্বরের যে কি প্রগাঢ়জ্ঞান, কি অশেষ কৌশল, কি অপূর্ব্ব বিচিত্রতা, কি অপার মহিমা তাহার ঈয়ত্বা নাই!!
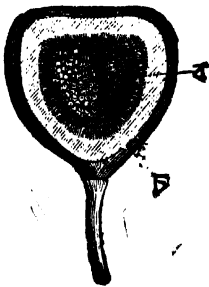
এই রূপে ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি হয়। এই ফলই বৃক্ষাদির ডিম্বের তুল্য। ডিম্বের মধ্যে যেমন ভাবী জীবের বীজ অবস্থিতি করে, তেমনি ফলের ভিতরও ভাবী বৃক্ষাদির উৎপত্তির নিদান স্বরূপ বীজ থাকে। ডিম্বের ভিতরে যেমন ঐ বীজের পোষনোপযোগী পদার্থ সকল থাকে, এই ফলের ভিতরস্থ সেই সূক্ষ্ম বীজটীর পোষণ ও বর্দ্ধনের জন্যও উপযুক্ত সামগ্রী আছে। নারিকেলের ভিতর বীজটী অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু উহার পুষ্টিকর পদার্থ যে কত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে জল উহার মধ্যে থাকে তাহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসে এবং উহার বীজ ঐ জলের সারভাগ গ্রহণ করে ও জলীয় অংশ শুকাইয়া যায়, ক্রমে শাঁস বর্দ্ধিত হয়, অবশেষে ঐ শাঁসও বীজের বর্দ্ধনের জন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এদিকে বীজটী ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া নারিকেলের মধ্যস্থ শূন্য স্থানটী সমুদায় অধিকার করিতে থাকে, তাহাকে আমরা সচরাচর "ফোঁপল" বলিয়া থাকি। শেষে নারিকেলের বোঁটার দিক ফুঁড়িয়া বীজের অঙ্কুর বাহির হয়, ও একটী নূতন নারিকেল গাছ প্রস্তুত হয়!! সেই রূপে একটী ছোলা ভিজা মাটিতে ফেলিয়া রাখিলে উহার উপরিস্থ খোসা ফুঁড়িয়া অঙ্কুর বাহির হয়, ও আস্তে আস্তে বীজদল দুটী ভিন্ন করিলে তন্মধ্যে ঐ অঙ্কুরের পত্র প্রভৃতি দেখা
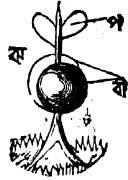
যায় ('ক' চিহ্নিত চিত্র দেখ)। সেই রূপ তেঁতুলের বীচি মাটীতে পড়িলে প্রথমে খোসা ফাটিয়া দুটী বীজদল ('খ' চিত্র দেখ) বাহির হয়, তৎপরে তাহাদের মধ্য দিয়া উহার পত্রাদি উপরে উঠে ও শিকড় নীচে চলিয়া যায়। অঙ্কুরটীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীজদল দুটীও উচ্চে উঠে ও পরিষ্কার দেখা যায়। তাহার পরে ক্রমে নূতন হরিদ্বর্ণ পত্র বাহির হয়। এই রূপে অবশেষে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া উঠে। তাহাতে আবার প্রতি বৎসর অগণিত ফুল হয়। ঐ ফুলে ফল জন্মে, এই ফল গুলির কতক মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণ আহার করে; তাহাদের বীজ মৃত্তিকায় পড়িয়া আবার অগণিত বৃক্ষের সৃষ্টি হয়। এই রূপে বৃক্ষ লতাদির বংশবৃদ্ধি অতি আশ্চর্য্য কৌশলে চিরকাল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।—"

"এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে পরে বলিব। আজ রাত্রি হইয়াছে, চল বাড়ী যাই।" এই বলিয়া নবীন বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে বালকগণ অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

সিংহ ও মাতাল।

ভীমসিং, বিউগেলদার—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন যায়গায়, সৈন্যদলে বিউগেল বাজায়। বিউগেল কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় জান। সানাইয়ের মত একটা যন্ত্র, তাহার শব্দের ইঙ্গিতে গোরাদের সমস্ত কাজ কর্ম্ম হয়। যাক্—ভীমসিংহ সৈন্যদলে বিউগেল বাজায় এবং মনের সুখে দিন কাটায়, সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই তাহাকে ভাল বাসে। কিন্তু তা' হইলে কি হয় সে বড় মদ খাইত। যখন কাজ কর্ম্ম থাকিত না, তখনই গিয়া দেখ ভীমসিং চোখ লাল করিয়া বসিয়া আছে। এইরূপে অনেক দিন যায়;—এক দিন বিকালবেলা, ভীমসিংহ অন্য দুই তিন জন সঙ্গীর সহিত, তাহাদের কেল্লার নিকটে বনের ধারে বসিয়া মদ খাইতেছিল—বিউগেল কোমরে বাঁধা আছে। ক' বোতল মদ তাহারা খাইয়াছিল, আমরা তাহার কোন খবর পাই নাই; তবে ভীমসিংহের বড়ই নেসা হইয়াছিল, একথা আমরা শুনিয়াছি। সঙ্গীরা তাহার রকম সকম দেখিয়া সরিয়া পড়িল—ভীমসিংহও যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না—সেইখানে পড়িয়া গেল। চোখ বুঝিয়াই ভীমসিংহ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল 'যেন সে রাজা হইয়া গদীতে বসিয়াছে—আর চোখ্ রাঙ্গাইয়া সকলকে হুকুম করিতেছে আর সকলে তাহার সিংহাসন কাঁধে করিয়া একবার রাজসভাতে একবার এখানে, একবার সেখানে লইয়া বেড়াইতেছে'! ভাল, ভীমসিং! তুমি তোমার সুখের স্বপ্ন দেখিতে থাক, আমরা ইতিমধ্যে পাঠক পাঠিকাকে আর কি ঘটিয়াছিল, সে কথা বলিয়া ফেলি।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।—যে বনের কাছে ভীমসিং পড়িয়াছিল, তাহাতে সিংহ বাস করিত, সুতরাং সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া পশুরাজ উদরের চেষ্টায় বাহির হইলেন। পশুরাজ বাহির হইয়া দেখিলেন, বা! বা! বা! একটা মানুষ পড়িয়া আছে—তাইতো বিনা পরিশ্রমের শিকার! সিংহ নিকটে আসিয়া দেখিল বেশ জোয়াল মানুষ, দু এক দিনের খাবার বেশচ লিবে,
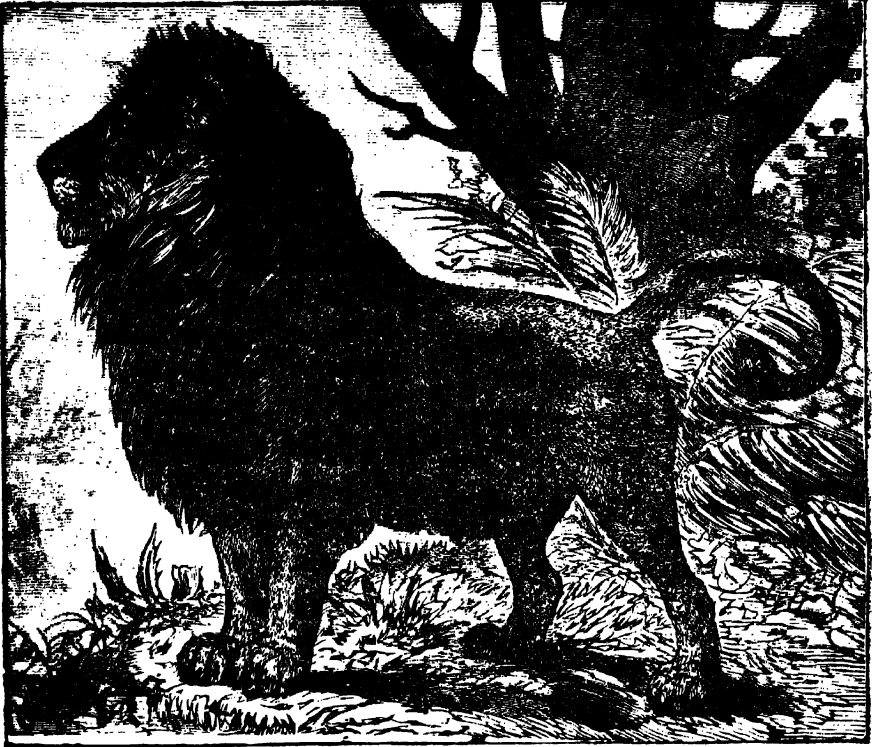
তখন বিনা আপত্তিতে তাহাকে পিঠের উপরে ফেলিয়া পশুরাজ ঘরে চলিলেন।

যখন সিংহ ভীমসিংকে পিঠে করিয়া লইয়া যায়, তখন ভীমসিংহ ভাবিতেছিল হয় রাজবাড়ীর চাকরেরা তাহার সিংহাসন বহিয়া লইয়া যাইতেছে, না হয় তাহার বন্ধুরা তাহাকে কেল্লায় লইয়া যাইতেছে। কিন্তু খানিকটা যাইতে যাইতে তাহার একটু নেশা ছুটিল। তখন সে চোখ খুলিয়া দেখিল সিংহের পিঠে মা দুর্গার মত কোথায় যাইতেছে—সিংহ তাহার পেটের এক ধার কামড়াইয়া আছে, পাছে পড়িয়া যায়। তবেই তো কি হবে? হঠাৎ তার বিউগেলের কথা মনে পড়িল—যদি বিউগেলে বিপদের সময়কার শব্দ করিলে কেল্লা হইতে লোক আসিয়া সাহায্য করে। এই ভাবিয়া সে আস্তে আস্তে কোমর হইতে বিউগেলটী খুলিয়া লইল, এবং তাহাতে শব্দ করিল।

টু—টু—উ—উ—উ—উ—উ

বেচারা সিংহ চমকিয়া উঠিল, ভাবিল এ আবার কি?—এবং চমকিয়া দাঁড়াইল। মাতাল

দেখিল শব্দে কাজ হইয়াছে। আবার বাজাইল টুট্—টূ—টূটু—টূটু—টূ—টু—উ—উ—উ—উ। এবার সিংহ ভয়ে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু বিউগেল আর থামে না।

টূটু—ভু পূঁ—ভো পোঁ—টু-টু-টু-টু-টু-টু-উ-উ-উ। বেচারা সিংহ আর কি করে, চার ধারে ছুটোছুটি করিয়া শেষকালে শিকার ফেলিয়া মার দৌড়। ভীমসিংহও ভাবিল বাঁচিলাম, সিংহও ভাবিল 'বাঁচিলাম'।

ইতিমধ্যে এই শব্দ কেল্লার লোকদিগের কাণে পৌছিয়াছিল। তাহারা ভীমসিংহের কোন বিপদ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বন্দুক, লাঠি, তরবার লইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পথেই ভীমের সহিত দেখা হইল। ব্যাপার কি শুনিয়া সকলেই হেসে আকুল।

যাহা হউক, সিংহের পিঠে ভগবতীর মত চাপিয়া মাতালের একটা উপকার হইল, সেইদিন হইতে সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'আর কখনও মদ খাইব না'। সে অনেক দিনের কথা। আমরা শুনিয়াছি তাহার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই। ভীমসিং আজও মদ খায় না।

"সহচরী" হইতে পরিবর্ত্তিত।

নরেনের স্বর্গ দর্শন।

(উপকথা)

ঠাকুরমার গল্প না শুনিলে নরেনের ঘুম আসিত না। সন্ধ্যা হইলেই নরেন ঠাকুরমার কাছে গিয়া বসিত ও কত রকম গল্প শুনিত। ঠাকুরমার গল্প ঠাকুরদের কথা লইয়াই হইত। ঠাকুরদের কথা বলিতে গেলেই স্বর্গের কথা আসিত; ইন্দ্রভুবন, পারিজাত কানন, কিন্নর, অপ্সরা, বিদ্যাধরী, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র ইত্যাদি কত রকম গল্প হইত। নরেন এই সকল কথা এক মনে শুনিত, নরেনের মনে হইত স্বর্গ কি দেখা যায় না? স্বর্গ দেখিবার জন্য নরেনের বড়ই ইচ্ছা হইল।

নরেনের অবিনাশ কাকা নরেনকে একখানি ছবির বই দিয়াছিল। নরেন ছবি দেখিতে বড় ভাল বাসিত। ঘরের এক কোণে নরেন ছবি দেখিতেছিল। প্রথম ছবি খানি ইন্দ্রালয়। সহস্রলোচন ইন্দ্রদেব সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সম্মুখে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে। সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে গন্ধর্ব্ব বালকগণ দাঁড়াইয়া; তাহাদের কেমন হাসি হাসি মুখ। নরেনের ইচ্ছা হইল ঐ বালকদিগের সহিত খেলা করে। এমন কি চারিদিক চাহিয়া ছবির বালকগণকে নরেন বলিয়াছিল "আমার সঙ্গে ভাব কর্‌বে, আমি সন্দেশ দিব"। আর একখানি ছবি, পদ্মবনে বীণাপাণি সরস্বতী বীণা হস্তে বসিয়া আছেন, সম্মুখে ছোট ছোট বালকগণ বসিয়া পড়িতেছে। স্বয়ং বীণাপাণি বালকগণকে পড়াইতেছেন। নরেন গুরু মহাশয়ের কাছে পড়িতে ভাল বাসিত না। গুরু মহাশয় বড় ধমক দেন। ছবির বালকদিগের সহিত বসিয়া নরেনের পড়িবার ইচ্ছা হইল। তৃতীয় ছবিখানি বৈকুণ্ঠধাম। শ্রীকৃষ্ণ বালক ধ্রুবের হস্ত ধরিয়া লক্ষ্মীর সম্মুখে উপস্থিত। লক্ষ্মী দুই হাত বাড়াইয়া কত আদর করিয়া ধ্রুবকে কোলে লইতেছেন। এইরূপ অনেকগুলি মনোহর ছবি দেখিয়া নরেনের স্বর্গ দেখিবার সাধ আরও প্রবল হইল। কাহার না হয়?

নরেন মনে করিল, ঠাকুরমা স্বর্গ দেখিবার সন্ধান বলিতে পারেন। এক দিন নরেন ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "হ্যাঁ, ঠাকুরমা, ঐ যে আকাশ দেখা যাচ্ছে, অ্যাঁ ঐ যে চাঁদ উঠেচে অ্যাঁ ওর ভিতর কি স্বর্গ আছে?" ঠাকুরমা বলিল,

"হ্যাঁ দাদা ওরই ভিতর স্বর্গ আছে।" "আচ্ছা, ঠাকুরমা স্বর্গ কি দেখা যায় না?" "এখনকার লোকে কি স্বর্গ দেখিতে পায়। এখন যে ঘোর কলি পাপে ভরা। সে কালের লোকদের সঙ্গে ঠাকুর দেবতারা কথা কহিতেন। তারা স্বর্গ দেখিতে পাইতেন।"

নরেন তাহার অবিনাশ কাকাকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ কাকা আকাশের ভিতর যাওয়া যায়?" "দূর, আকাশের কাছে গেলে মানুষ মরে যায়, আকাশ কেবল ধোঁয়া বইত নয়।" "তবে দেবতারা থাকে কেমন করে।" নরেনের কাকা হাসিয়া বলিল, "দেবতারা কি আর আছেন, তাঁরা ধোঁয়ার ভিতর দম আট্‌কে মরে গেছেন। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কেবল একজন আছেন, কিন্তু তাঁকে লইয়াও টানাটানি হইতেছে।" নরেন বুঝিল কাকা তামাসা করিলেন।

একটু সূর্য্যকিরণ নরেনের বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়া খেলা করিতেছে। কখন একটি বেলোয়ারির মার্বেলের উপর পড়িয়া কত রকম রং ফলাইতেছে। আবার সরিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে। নরেন এক দৃষ্টে বাক্সর দিকে চাহিয়া স্বর্গ দেখিতেছিল হঠাৎ মনে হইল, কিরণ স্বর্গে থাকে, বলিতে পারে কিরূপে স্বর্গ দেখা যায়। ছেলে বুদ্ধি তাড়াতাড়ি কিরণ টুকুকে হাত চাপা দিয়া ধরিল "অ্যাঁ, তুমি আমার খেলানা লইয়া খেলা করিতেছ, আজ তোমায় ছাড়িব না, আগে বল আমায় স্বর্গ দেখাইবে?" কিরণটুকু হাসিতে হাসিতে নরেনের আঙুলের ফাঁক দিয়া পলাইয়া গেল, নরেন শুনিতে পাইল কে যেন বলিল "সহজে কি স্বর্গ দেখা যায় দিব্য চক্ষু পাইবার চেষ্টা কর, তবে স্বর্গ দেখিতে পাইবে।"

দিব্য চক্ষু পাইলেই স্বর্গ দেখা যায়! তবে আর কি নরেনের দুটি টাকা ছিল, বাক্স হইতে টাকা দুটি লইয়া কেষ্টোর দোকানে ছুটিল। "কেষ্টো, কেষ্টো? দিব্যচক্ষু আছে।" "দিব্যচক্ষু না বাবু আমরা দিব্যচক্ষু বেচি না, লজঞ্চুষ চাই?" দিব্যচক্ষু কিনিতে পাওয়া গেল না।

এক দিন নরেন বাগানে বেড়াইতেছে, একটি সুন্দর গঙ্গাফড়িং আসিয়া একটি গোলাপ ফুলে বসিল। নরেনের একটি পাখী ছিল, পাখীকে খাওয়াইবার জন্য নরেন ফড়িং দেখিলেই ধরিত। এটিকেও পা টিপে টিপে যাইয়া ধরিল। কিন্তু ফড়িং কথা কহিয়া উঠিল। তাইত ফড়িং কি পাখীর মতন পড়িতে পারে? এমন সুস্বরে কথা কয় কে? নরেন এমন কথা ত কখন শুনে নাই! অবাক হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল তাহার হাতের ভিতর ফড়িংটির উপর বসিয়া একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক—প্রজাপতির ন্যায় পোষাক। পরিধানে প্রজাপতির ডানা। দেখিতে বড়ই সুন্দর। তিনিই নরেনকে বলিতেছিলেন "ছি বাবা, কাহাকেও পীড়ন করা ভাল নয়,ফড়িংটি ছাড়িয়া দাও, অনেক দূর আসিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছে, তাই তোমার গোলাপ ফুলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সন্ধ্যা হইল, ছাড়িয়া দাও, আমাদের অনেক দূর যাইতে হইবে।" নরেন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ী কতদূর।" "ঐ যে আকাশে একটী আলো দেখিতে পাইতেছ ঐ খানে আমার বাড়ী।" এই বলিয়া নরেনকে একটি আকাশের তারা দেখাইয়া দিল। "ও তবে তুমি স্বর্গে থাক, তোমায় কখন ছাড়িব না। একবার আমাকে স্বর্গ দেখাইতে পার, তা হ'লে ছাড়িয়া দিই, নতুবা আমার বাক্সর ভিতর পুরিয়া রাখিব।" সুন্দরী বড়ই বিপদে পড়িলেন। স্ত্রীলোকটী আর কেহ নয় স্বর্গের একটী অপ্সরা। অপ্সরা নরেনের আবদার শুনিয়া অবাক। নরেন তাহাকে ভাবিতে দেখিয়া বলিল, আচ্ছা স্বর্গ না দেখাইতে পার, আমাকে দিব্যচক্ষু দাও তা হ'লে তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি।" "দিব্যচক্ষুর যে দাম অনেক।" "কত দাম আমি

এখনি তোমায় টাকা দিতেছি।” অপ্সরা বলিল “বোকা ছেলে, স্বর্গের জিনিষ কি তোমাদের সামান্য টাকায় পাওয়া যায়, স্বর্গের টাকা চাই? তা এক কাজ কর তোমাকে একটি ছোট কৌটা দিতেছি—একটি সুকাজ করিলেই কৌটার মধ্যে একটি টাকা আপনি আসিবে; কিন্তু একটি কুকাজ করিলেই জমানো টাকা হইতে একটি উড়িয়া যাইবে। এইরূপে যখন তোমার এক কৌটা টাকা হইবে, আমি আসিয়া তোমায় দিব্যচক্ষু দিব।”

নরেন হাঁ করিয়া কথা শুনিতেছিল, ফড়িং আলগা পাইয়া এক লাফে চলিয়া গেল। নরেন কৌটা লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী আসিল। নরেন বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন ভিখারী একটী পয়সার জন্য চীৎকার করিতেছে। নরেনের কাছে পয়সা ছিল, কিন্তু ভিক্ষুককে দিবার ইচ্ছা ছিল না। নরেন ভিক্ষুককে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে ছিল এমন সময় তাহার অবিনাশ কাকাকে জানলায় দেখিতে পাইল। অবিনাশ কাকা নরেনকে দান করিতে দেখিলে বড় খুসি হন এবং দানের চতুর্গুণ পুরস্কার দেন। কাকাকে দেখিয়া নরেন ভিখারীকে দুইটী পয়সা দিল। সে দিন নরেনের কাকা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন, নরেনকে একটি আধুলি বকসিস দিলেন। নরেন মনে করিল দেখি দেখি কৌটায় টাকা আসিয়াছে কি না, ভিখারীকে পয়সা দেওয়া ত খুব ভাল কাজ! কৌটা খুলিয়া দেখিল ফোক্কা। কে যেন বলিল “আধুলির লোভে পয়সা দিয়াছিলে, আধুলি পাইয়াছ আর টাকা পাইবে না।”

নরেনের বন্ধু বরেনের বড় জ্বর। নরেন বরেনকে দেখিতে গিয়াছিল। বরেন ডালিমের জন্য বড় আবদার করিতেছে। মা বুঝাইতেছিলেন “ডালিম কোথা পাব, বাবা! ছিঃ কেঁদনা, এই দেখ ঘড়া বাঁধা দিয়া তোমার চিকিৎসা হইতেছে।” ছেলেয় তা কি শোনে; বরনের মার কথা শুনিয়া নরেনের বড়ই দুঃখ হইল, সে কাহাকে কিছু না বলিয়া কেষ্টোর দোকানে আসিয়া দুটি বেদানা কিনিয়া বরেনকে দিয়া আসিল। বরেনের মা কত আশীর্ব্বাদ করিল। ঠুন ঠুন! ওকি! নরেন কৌটা খুলিয়া দেখে দুটি চকচকে টাকা কৌটায় আসিয়াছে।

বাড়ী আসিয়া নরেন দেখিল, তাহার ছোট বোন “বুড়ী” তাহার এ, বি লিখিবার খাতা লইয়া হিজিবিজি কাটিতেছে। “পোড়ার মুখী, কি কচ্ছিস্” বলিয়া বুড়ীকে একটী চড় মারিয়া খাতা কাড়িয়া লইল। ঠুন্! কৌটার একটি টাকা নাই।

একদিন নরেন কতকগুলি সিসের ফৌজ লইয়া খেলা করিতেছে। দুই দিকে দুই দল সৈন্য বন্দুক ঘাড়ে করিয়া খাড়া রহিয়াছে। নরেন একবার একটীকে সরাইতেছে, ওটিকে সম্মুখে আনিতেছে, আর একটীকে পশ্চাতে দাঁড় করাইতেছে। ভয়ানক ব্যস্ত! তুমুল যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন্ সেনাপতি স্থির থাকিতে পারেন? এ সময়ে বুড়ী ডাকিল “দাদা দাদা, আমার অতের নিশেন পয়ে গেল, অ্যা—।” আঃ এমন সময়েও বিরক্ত করে। একবার মনে করিল ধমক দিয়া বুড়ীকে তাড়াইয়া দিই। কিন্তু আবার মনে পড়িল মা বলিয়াছেন “ছি ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে কি ঝগড়া করে, তারা যে ছেলেমানুষ. তাদের কি বুদ্ধি আছে।” যুদ্ধ থামাইয়া, নরেন বুড়ির রথের নিশান সারিয়া দিল। ঠুন! আবার টাকা আসিয়াছে। তাই ত স্বর্গের টাকা খুব সস্তা।

প্রথম প্রথম টাকার লোভে সৎকার্য্য করিয়া নরেনের এমনই অভ্যাস হইয়া গেল যে নরেন এখন আর ভুলেও অন্যায় কার্য্য করে না।

আজ নরেনের এক কৌটা টাকা। বড়ই আহ্লাদ। তুমি বলিতেছ নরেনের এত আহ্লাদ কেন, তোমার এক সিন্দুক টাকা আছে তোমার

ত এত আহ্লাদ হয় না। কেন হবে? এ টাকায় আর তোমার টাকায়? নরেন কি পরের অন্ন মারিয়া টাকা জমাইয়াছে, না অপরকে ঠকাইয়া নিজের কৌটা পূর্ণ করিয়াছে?

অপ্সরার কথা মিথ্যা হয় না। এখন স্বর্গ দেখিবার উপায় হইল। মনের আনন্দে নরেন বাগানে বেড়াইতেছে। এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দাড়াইল। নরেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল "তোমার হাতের কৌটা দেখিয়া আসিয়াছি, উহাতে স্বর্গের টাকা আছে, আমারও ঐরূপ এক কৌটা টাকা ছিল, কাল গঙ্গাস্নান করিবার সময় কৌটাটি জলে পড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে যাইয়া বাস করিব মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু সম্বল হারাইয়াছি, কেমন করিয়া যাই? অমাকে কৌটাটি যদি দাও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া যাই।—" সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসী তো জানিত কতকষ্টে এক কৌটা টাকা হয়। নরেনের এত যত্নের ধন চাহিতে তাহার লজ্জা হইল না?

কিন্তু নরেনের মনে এরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। নরেন ভাবিল, সন্ন্যাসী যে প্রকার বুড়ো হইয়াছে টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বর্গে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, আমার বিস্তর সময় আছে, ইচ্ছা করিলে এমন কত কৌটা জমাইতে পারিব। নরেন অম্লান বদনে সন্ন্যাসীর হস্তে কৌটা দিল। সন্ন্যাসী কৌটা পাইয়া বলিল, "তোমার দান মিছা হইবে না, আমার নিকট একটী জিনিষ আছে তোমাকে দিই। চক্ষু মুদ্রিত কর।" নরেন চক্ষু মুদিল। সন্ন্যাসী নরেনের চক্ষুতে হস্ত বুলাইল। নরেন চাহিল। সন্ন্যাসী নাই। কিন্তু নূতন চক্ষে সে সকলই নূতন দেখিতে লাগিল।

নরেন যে দিব্য চক্ষুর জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল সেই দিব্য চক্ষু লাভ করিল। সে পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের শোভা দেখিতে পাইল; পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের মনোরম সুখ পাইতে লাগিল। হে বালক বালিকাগণ! যদি পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গ দেখিতে চাও, যদি মর্ত্ত্যে থাকিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিতে চাও, তবে পরোকার কার্য্যে প্রাণ মন ঢালিয়া দাও। স্বার্থপরতা ও ছোট মন লইয়া আর থাকিও না।

শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা।

পঞ্চম উপদেশ।

নিদ্রা।

ঘর্ষণে প্রস্তর ক্ষয় হয়, পরিশ্রমে শরীর ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয় দূর করিবার জন্য শরীরের বিশ্রাম চাই। এই জন্যই নিদ্রা অতিশয় আবশ্যক। নিদ্রা সকলেরই প্রয়োজনীয় এবং যাহার সুনিদ্রা হয়, সেই সুস্থ ও সুখী। কোন কারণেই নিদ্রায় অন্যথা করা অনুচিত।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। রাত্রিই নিদ্রার প্রকৃত সময়। সকাল রাত্রে শয়ন ও অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলে শরীর ভাল থাকে। অনেক ছাত্রের এমন অভ্যাস আছে যে তাহারা দিবসে আলস্য করিয়া কেবল রজনীতে অধ্যয়ন করে এবং ১২টা কি ১টা রাত্রির সময় তাহারা শয়ন করে, তাহাদিগের যত রোগ হয় এই রূপ অনিয়মই তাহার বিশেষ কারণ; সুতরাং কেহ এরূপ করিও না। ১০টা কি ১১টার সময়ে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। যে ঘরে শয়ন করিবে তাহা যেন পরিষ্কার বায়ুযুক্ত হয়। এক বিছানায় এক জনের অধিক শয়ন করা অন্যায়, যদি নিতান্তই তাহা করিতে হয়, তবে যাহাতে একজনের নিশ্বাস অন্যের শরীরে না লাগে এরূপ করিবে। গৃহমধ্যে বায়ুর প্রচুরতা আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া মুক্ত বায়ুপথে শয়ন করা অনুচিত। শয়নকালে অন্যান্য জানালা খুলিয়া দিয়া মস্তকের নিকটস্থ জানালা সকল আবদ্ধ করিয়া শয়ন করিবে। রাত্রির বাতাস নিদ্রিত ব্যক্তির শরীরে লাগিলে অপকারের সম্ভাবনা।

গুরুতর আহারের পরে চিৎ হইয়া শয়ন করা অনুচিত, বাম কি দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, সুতরাং নানা প্রকার ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখা যায়। লোকে যাহাকে "বোবায় ধরা" বলে তাহাও এইরূপ কারণে উৎপন্ন হয়।

যদি কখনও কোন কারণ বশতঃ নিদ্রার আবির্ভাব না হয় তবে হাত পা স্থির ভাবে রাখিয়া মনে মনে পড়া বিষয়ক বা অন্য কোন চিন্তা করিবে। যদি তাহাতেও নিদ্রা না হয়, তবে এক হইতে একশত পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এরূপ উপায়েই অনেকের নিদ্রাকর্ষণ হয়। কেহ কেহ শায়িত অবস্থায় পুস্তক লইয়া পড়িতে পড়িতে সহজে নিদ্রিত হইতে পারেন।

যদি এ সকল উপায় নিষ্ফল হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা লইয়া ঔষধ দ্বারা নিদ্রা আনায়ন করিবে।

ষষ্ঠ উপদেশ।

উপাসনা।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই আমাদিগকে পালন ও সর্ব্বসুখ প্রদান করিতেছেন। সুতরাং আমাদিগের শরীর ও মন সম্বন্ধে যেমন নানা প্রকার কর্ত্তব্য আছে, ঈশ্বরের উপাসনাও তদ্রূপ।

উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন কি না সে কথায় কায নাই। কিন্তু কৃতজ্ঞতা মনুষ্যের স্বাভাবিক। যখন আমরা সামান্য উপকার পাইয়াই বন্ধুগণের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ হই তখন যাঁহার নিকট হইতে সমস্ত পাইয়াছি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

উপাসনা করিলে মন সবল ও সুস্থ হয়, সৎ প্রবৃত্তি সকল সতেজ হয়, পাপের চিন্তা দূর হয় এবং পাপ করিবার ইচ্ছা কমিয়া যায়। নিষ্পাপ হইলে শরীর সুস্থ থাকে, সুতরাং উপাসনার এক ফল শারীরিক সুস্থতা লাভ।

অনেকে মনে করেন যে, ছাত্রদিগের উপাসনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধেরাই তাহা করিবেন। এ বিশ্বাস অত্যন্ত ভুল। শৈশবই আমাদিগের শিক্ষার সময়। এই সময়ে যাহা অবহেলা করিবে, তাহাই শিক্ষা হইবে না।

যাহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হয়েন যাহারা ঈশ্বর প্রেমিক ও উপাসনাশীল, তাঁহারাই ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হয়েন, যাহারা ঈশ্বর মানে না ও উপাসনা করেনা, তাহারা কুচরিত্র ও পাপী হয়। অনেক উত্তম ছাত্রেরাই উপাসনাশীল। উপাসনার পরে সাহস ও স্ফূর্ত্তির সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়।

অতএব দিবসে অন্ততঃ দুই বার উপাসনা করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যা সময়ে। এক এক বার অর্দ্ধ ঘণ্টাই বালক বালিকার পক্ষে যথেষ্ট।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুলসহ ১।০ এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকার কমিশন বলিয়া ৵০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। অক্টোবর, ১৮৮৩। ১০ম সংখ্যা।

ভীমের কপাল।

১১শ অধ্যায়।

বিপিন এখানে কেমন করিয়া আসিল, তাহা বলা আবশ্যক। যেদিন রাত্রিতে ভীমেন্দ্র রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, বিপিন সেই রাত্রিতেই অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীমেন্দ্রকে অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না, তখন বিমর্ষভাবে বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। পরদিন প্রাতে বিপিন মাতুলালয় হইতে বিদায় লইয়া ভীমেন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইল। মাতুলের আদেশ ছিল যখন যেখানে যাইবে, সেইখান হইতেই আমাকে জানিতে দিবে ভীমেন্দ্রকে খুঁজিয়া পাইলে কি না, অথবা কতদূর সন্ধান হইল। এইজন্য বিপিনের পকেটে কতগুলি ডাক কাগজ, টিকিট-লেফাপা এবং একটা পেন্সিল সর্ব্বদা থাকিত। বিপিন বল্লভগঞ্জ পর্য্যন্ত অনায়াসেই সন্ধান করিতে করিতে গেল—সেখানে গিয়া শুনিল বিপিন যেরূপ বালকের কথা বলিতেছে সেইরূপ একটী বালক আসিয়া জমিদারের বাড়ীতে বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর সে যে কোথায় গিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিপিন খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য একটী ময়রা দোকানে গিয়া বসিল, সেখানে শুনিল ভীমেন্দ্রের মত একটী বালক সম্মুখে রাস্তা দিয়া খাবার খাইতে খাইতে চলিয়া গিয়াছে। বিপিনের আশা হইল; তখন সে সেই রাস্তা ধরিয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া শুনিল—একটী ছেলে আর একটী ছেলেকে বলিতেছে মার্‌তে পাল্লি না? না চেয়েই কেড়ে নিলে? কতবড় সে ছেলেটা? যাহাকে বলা হইতেছিল সে উত্তর করিল "মস্ত বড় ছেলে—মাল্লে পার্ব্বো কেন? আর মারতে ইচ্ছে হলো না, দেখে বোধ হল যেন কদিন খায় নাই।" বিপিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কোন্ ছেলের কথা বলছ? তাহার কি এই রকম চেহারা?" ছেলেরা বলিল হাঁ। বিপিন বলিল "ভাল, সে ছেলেটী কোন্ পথে গিয়াছে বলিতে পার?" এক জন বালক পথ দেখাইয়া দিল। বিপিন অনেকক্ষণ সেই পথে চলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া একটা গাছতলায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল, এবং নিকটে গোপালনগরের ডাকঘরে মাতুলের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া পুনশ্চ পথ চলিতে লাগিল। যে রাস্তায় বিপিন যাইতেছিল সেই পথের প্রত্যেককেই বিপিন ভীমেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে

যাইতে লাগিল। এইরূপে কতদূর গিয়া বিপিন শুনিল দুজন প্রাচীন লোক নিজের দুষ্ট ছেলেদের কথা বলিতে বলিতে যাইতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত দুষ্টমতি, পিতামাতার কথার অবাধ্য এই কথা বলিয়া তাঁহারা নিজের নিজের কপালের নিন্দা করিতেছিলেন। একজন বলিলেন "লোকের যদি ছেলে হয় তবে যেন স্বজনখালীর মিত্রদের ছেলের মত হয় তাহার বাপ মাকে কি ভক্তি! গরিব দুঃখীকে কি দয়া! সেদিন একটী পরের ছেলেকে রাস্তায় মরার মত পড়ে আছে দেখে কি যত্নটাই করলে। আজও সে ছেলেটী তাদের বাড়ীতে রয়েছে।" বিপিন বলিল 'মহাশয় সে ছেলেটীর নাম কি জানেন?' প্রাচীন বলিলেন 'ভীমেন্দ্র।' বিপিন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া বলিল "মহাশয় সে বাড়ী কোথায় আমাকে বলিতে পারেন? সে বালকটী আমার ভাই, রাগ করিয়া বাড়ী হইতে আসিয়াছে।" প্রাচীন স্বজনখালী যাইবার পথ বলিয়া দিলেন। বিপিন কি ভাবে স্বজনখালীর মিত্রদের বাড়ী গেল তাহা তিনিই বুঝিতে পারিবেন যিনি কোন ভাই অথবা ভগিনী বহুকাল পরে বিদেশ হইতে বাড়ীতে আসিতেছে শুনিয়া নদীর কাছে অথবা রেলওয়ের ধারে তাহাকে অগ্রসর হইয়া আনিতে যান! বিপিন মিত্রদের বাড়ীতে গেল। শুনিল ভীমেন্দ্র গত রাত্রিতে কি অদ্য ভোর বেলায় যে কোথায় গিয়াছে তাহার এখনও খোঁজ হইতেছে না। অল্পকালের মধ্যেই সন্ধান হইল গ্রামের একজন লোক গত কল্য বিকাল বেলা ভীমেন্দ্রকে নদীর ধারে দেখিয়াছে। তখন বিপিন দীনদয়াল বাবুর সহিত মিলিত হইয়া নদীর ধারে গেল, এবং ভীমেন্দ্র কোনও নৌকায় চলিয়া গিয়াছে কি না তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। এক মাঝি বলিল 'আপনারা যে রকম চেহারার কথা বলিতেছেন, সেই রকম একটী ছোট বাবু কলিকাতায় যাইবার জন্য আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমরা যাই নাই; ঘাটে যত নৌকা বাঁধা ছিল তাহার মধ্যে কেবল বগুড়ার নৌকা খুলিয়া গিয়াছে। আর সকল নৌকাই রহিয়াছে যদি সে নৌকায় গিয়া থাকেন, তাহা বলিতে পারি না।" নৌকায় বগুড়ায় যাইবার সম্ভাবনাও যত হাঁটিয়া অন্যত্র যাইবার সম্ভাবনাও তত। তখন দীনদয়াল বিপিনকে কি করিতে পরামর্শ দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। খানিকক্ষণ উভয়ে স্থির হইয়া নদীতটে বসিয়া রহিলেন—তখন বিপিন বলিল বগুড়ায় যাওয়া অগ্রে উচিত। দীনদয়াল অনেক ভাবিয়া সম্মতি দিলেন। অবশেষে যে নৌকায় ভীমেন্দ্রের যাইবার কথা ছিল, সেই নৌকার মাঝির সহিত বগুড়ায় যাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। মাঝিকে কিছু বায়না দিয়া বিপিন দীনদয়ালের সহিত তাঁহাদের বাড়ীতে গেল। মধ্যাহ্নে দীনদয়ালের বাড়ীতে আহার করিয়া ভীমেন্দ্রের উপকারকর্ত্তা দীনদয়াল ও তাঁহার ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিপিন নৌকায় উঠিল। দীনদয়াল ও তরু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যেন ভীমেন্দ্রের সন্ধান করা হইলেই তাঁহাদিগকে পত্র লেখা হয়। নৌকা স্বজনখালীর নিকটবর্ত্তী নদীর ঘাট হইতে খুলিয়া গেল।

যথাসময়ে নৌকা বগুড়ায় পৌঁছিল। বিপিন নামিয়া সহর খুঁজিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সন্ধানই হয় না—তখন সে পুনশ্চ নদীর ঘাটে আসিয়া মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিল "বগুড়ার যে নৌকা সেই রাত্রিতে খুলিয়া আসিয়াছিল, সে নৌকা কাহার জন্য?" মাঝিরা বলিল 'এখানকার দারোগা গঙ্গাধর বাবুর।' তখন বিপিন খুঁজিতে খুঁজিতে দারোগা বাবুর বাড়ীতে গেল এবং তাঁহার নৌকাতে কোনও বালক আসিয়াছে কি না, বাড়ীর লোকদের তাহা জিজ্ঞাসা করিল। দারোগা বাবুর বাড়ীর বহির্ব্বা-

টীতে একজন লোক বসিয়াছিল সে দারোগা বাবুর মাঝিদের মুখে এই কথা শুনিয়াছিল—সে বলিল 'হাঁ এই রকম একটী ছেলে এসেছিল বটে কিন্তু সে কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না।' বিপিন কতক আশ্বস্ত হইয়া আবার খুঁজিতে বাহির হইল। এই বারে সৌভাগ্য-ক্রমে হরিপদ বাবুর সহিত দেখা হইল। হরিপদ বাবু বিপিনকে এদিকে ওদিকে তাকাইতে দেখিয়া, এবং তাঁহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন"তুমি কে? কেন এসেছ?"বিপিন নিজের অবস্থা এবং তথায় আসিবার কারণ বলিল। তখন হরিপদ বাবু বলিলেন "ভীমেন্দ্র আমার বাড়ীতেই ছিল বটে, কিন্তু সে গত রাত্রিতে চৈতন্য গ্রামে গিয়াছে; কোনও ভয় নাই, বোধ হয় কলিকাতায় শীঘ্রই পৌছিবে।"তখন হরিপদ বাবু জানিতেন না ভীমেন্দ্র ভুলিয়া রসুলপুরে গিয়া পড়িয়াছে। বিপিন বিদায় লইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম খুঁজিতে খুঁজিতে চৈতন্যগ্রামে চলিল। পথে ১০।১২ দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে একদিন বিপিন দেখিতে পাইল একজন গাড়োয়ান শুধুগাড়ী গরুর বদলে নিজে টানিয়া আনিতেছে, তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। বিপিন তাহাকে এইরূপ অবস্থায় পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গাড়োয়ান সমস্ত খুলিয়া বলিল। পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, এ সেই গাড়োয়ান। বিপিন গাড়োয়ানের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল ভীমেন্দ্র হয় ডাকাতের হাতে মরিয়াছে, না হয় ডাকাতেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এত পরিশ্রম করিয়া বিপিন কি এই সংবাদ শুনিতে আসিল? বিপিন অন্ধকার দেখিতে লাগিল, এবং তেজের সহিত প্রতিজ্ঞা করিল হয় ভীমের কি হইয়াছে সন্ধান করিব, নতুবা দস্যুদের যাহাতে জব্দ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। বিপিন কিছু না বলিয়া পথ চলিতে লাগিল। কত দূরে গিয়া দেখিল রাস্তায় খানিকটা রক্তের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বিপিন দেখিয়া বুঝিল, এই খানেই ভীমেন্দ্র দস্যুদিগের হাতে পড়িয়াছে। পাগলের মত বিপিন নিকটবর্ত্তী মাঠ দিয়া ছুটিল, এবং অনেক দূরে গিয়া একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল। বিপিন ভাবিতেছিল "যদি ভীমেন্দ্রের দেখা না পাই, তবে আর কলিকাতায় যাইব না। যখন মাসীমা ভীমেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন কি বলিব? জগদীশ্বর, এইবার যেন ভীমেন্দ্রের দেখা পাই।" এই ভাবিতে ভাবিতে বিপিন আবার চলিতে লাগিল, আবার একটা গ্রামের মধ্য দিয়া দ্বিপ্রহর রৌদ্রের সময় যাইতে যাইতে বিপিন বিশ্রামের জন্য একটা গাছতলায় বসিল। খানিকক্ষণ বসিয়া বিপিন দেখিল একটী বালক আসিতেছে; সে আসিয়া কাঁদিল, গামছায় পা বাঁধিল, এবং জলে ঝাঁপ খাইয়া পড়িল। বিপিন অবিলম্বে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পরের ঘটনা পাঠক পাঠিকাদিগের অবিদিত নাই।

১২শ অধ্যায়।

বিপিনকে দেখিয়া ভীমের মনে আশার উদয় হইল। বিপিনকে বিদায় দিয়া ভীমেন্দ্র গৃহে গেল। তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ভীমেন্দ্র মন খুলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। প্রাণের কাতরতার সহিত ঈশ্বর যা' করেন বলিয়া ভীমেন্দ্র যেন নূতন লোক হইয়া গেল। ভীমেন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার পক্ষে যাহা ভাল ঈশ্বর তাহা নিশ্চয় করিবেন। তখন ভীমেন্দ্র দুঃখের ভাব ছাড়িয়া প্রফুল্ল হইল। দাসী এটা বুঝিতে পারিল। তখন ভীমেন্দ্র তাহার নিকট যাহা হইয়াছে সমস্ত ঘটনা বলিল। বুড়ী কাঁদিয়া, হাসিয়া ভীমেন্দ্রের মাথায় হাত দিল এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল 'বাবা! যেখানে থাক

সুখে থেক, আর বুড়ীকে মনে রেখ।' রঘুরাম সেই দিন হইতে দেখিল ভীমেন্দ্র ১০ ঘা বেত খাইয়াও দুঃখ প্রকাশ করে না। রঘুরাম ভারি চতুর লোক—বুঝিতে পারিল ভীমেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, এবং পলাইয়া বাঁচিতে পারিবে তাহার আশা হইয়াছে। রঘো ডাকাত তখন অল্পকালের মধ্যেই তাহার দলের লোকদের ডাকিল, এবং ভীমেন্দ্রের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা জানিতে চাহিল। অনেকেই পরামর্শ দিল 'মারিয়া ফেল'। রঘো সে পরামর্শ শুনিল না। বলিল "আমার যে ধন চুরী গিয়াছে তাহার মত যাহাকে পাই, তাহাই মঙ্গল; উহাকে শাস্তি দিতে পার, প্রহারে আধমারা করিতে পারে, কিন্তু মারিও না, মারিলে আর হবে না।" রঘু ডাকাত এরূপ দয়ার কথা কেন বলিতেছে, জানিতে ইচ্ছা হয়? তবে শোন। রঘু এক জন ভয়ানক অত্যাচারী জমীদারের প্রজা ছিল। জমীদারের অত্যাচারে তাহার ও তাহার প্রতিবেশীদিগের আর কষ্টের শেষ ছিল না। এক দিন জমীদার একটা সামান্য ছল করিয়া এক দল লোক লইয়া রঘুরামের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহার ৬ | ৭ বর্ষ বয়সের ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া, স্ত্রীকে প্রহারে মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়। সেই রাত্রিতেই রঘুরাম তাহার প্রতিবেশীদের সহিত বনে আসিয়া ডাকাতির দল করে। এ আজ ৮ | ৯ বৎসর পূর্ব্বের কথা। যে দিন ভীমেন্দ্রের গাড়োয়ানকে ও ভীমেন্দ্রকে প্রহার করিয়া রঘোর দল তাহাদের জিনিশাদি কাড়িয়া লইয়াছিল রঘুরাম সেদিন রাত্রিতে দেখিয়াছিল ভীমেন্দ্রের মুখ তাহার হারাণ ছেলের মত; পাছে মমতা হয়, এই জন্য প্রদীপ নিভাইয়া দিতে বলিয়াছিল, তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। আলো জ্বালা হইলে যখন ভীমেন্দ্র জোর করিয়াছিল, তখন যে ভীমেন্দ্রের মাথায় লাঠি মারিয়াছিল—সেও পাছে কেউ কাপুরুষ মনে করে, এই ভয়ে এবং যখন একজন ডাকাত বালকের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন রঘো মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইলেও নিজের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য রাগের ভান করিয়াছিল। ভীমেন্দ্রকে একদিন বই রঘু নিজে প্রহার করে নাই, এবং কখনও একাকী পায় নাই বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, কিন্তু রঘোর নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল ভীমেন্দ্র তাহার পুত্র,—সুতরাং তাহাকে যে প্রহার করিয়াছিল, অথবা করিতে অনুমতি দিয়াছিল—সেও এই জন্য যে ভীমেন্দ্রের উচিত রঘুরামের সহিত মিশিয়া অত্যাচারী জমিদারদিগকে জব্দ করিতে চেষ্টা করা। যাহা হউক এখন মূল ঘটনার কথা বলা যাউক। এখন বোধ হয় সকলে বুঝিয়াছেন—'আমার যে ধন চুরী গিয়াছে' ইত্যাদি যে সকল কথা রঘু বলিয়াছিল, তাহার অর্থ কি।—রঘু ভীমেন্দ্রের সম্বন্ধে অন্য একরূপ বন্দোবস্ত করিল। স্থির হইল যে যতদিন ভীমেন্দ্রের পলায়নের ইচ্ছা না যায়, ততদিন তাহাকে অন্য স্থানে নিয়া রাখিতে হইবে। এই স্থির হইলে তাহারা কয়েকজন সেই রাত্রিতেই দাসীটীকে ও ভীমেন্দ্রকে চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া সে স্থান হইতে যাত্রা করিল। কতক গরুর গাড়ীতে, কতক নৌকায়, কতক হাঁটিয়া, পুনশ্চ গরুর গাড়ীতে, পুনশ্চ নৌকায়, এইরূপে অনেক পথ চলিয়া ভীমেন্দ্র এক বাড়ীতে পৌঁছিল। তখন ভীমেন্দ্র ও দাসী উভয়ের চোখ খুলিয়া দেওয়া হইল।—রঘুরাম ভীমেন্দ্রকে স্বাধীনতা দিল, কিন্তু দুজন লোক সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিত এবং মনোযোগ করিয়া দেখিত ভীমেন্দ্র কখনও পুলিশের থানায় না যাইতে পারে। আমরা এই গল্প পড়িতে পড়িতে এখন আশ্চর্য্য হই, ভাবি ভীমেন্দ্র কেন ছুটিয়া গিয়া পুলিশে খবর দিল না; কিন্তু তখন পুলিশে খবর দেওয়া বড় সহজ কাজ ছিল না। তখন পুলিশের অধিকাংশ ছোটকর্ত্তারা ডাকাতদিগের নিকট

হইতে ঘুস লইয়া তাহাদের সহায়তা করিতেন। একি এখনকার দিন? ভীমেন্দ্র কি করিবে? তবুও রঘুরাম সতর্ক হইয়া ভীমেন্দ্রকে পুলিশ থানার কাছে যাইতে দেয় না। অবশেষে ভীমেন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া ঘরে বসিয়া বিপিনকে পত্র লিখিল—তাহাতে বাড়ীটী কিরূপ যায়গায়, কি রকম, ভীমেন্দ্র তাহা খুলিয়া লিখিল, এবং অনেক দিন সুযোগ খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক দিন গোপনে ডাকঘরে ফেলিয়া দিল। ভীমেন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে গৃহে গেল। তাহার সঙ্গীরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। যথাসময়ে বিপিনের হাতে চিঠি পড়িল—বিপিন দেখিল চিঠিতে খিদিরপুরের ছাপ। তখন বিপিন ভীমেন্দ্রের একজন কাকার নিকটে গেল। তিনি আলিপুরের একজন বড় উকীল ছিলেন। তাঁহাকে পত্র দেখাইয়া বিপিন তাঁহাকে ইহার উপায় করিতে বলিল। বলা বাহুল্য তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া বাড়ী বাহির করিলেন, এবং একদল পুলিশের দ্বারা বাড়ী ঘেরাও করিয়া রঘুকে গ্রেপ্তার করাইলেন। আলিপুরে তাহার বিচার হইল। ভীমেন্দ্র ও বৃদ্ধার সাক্ষ্যে রঘু যে একজন ভয়ানক ডাকাত তাহা প্রমাণ হইল—ইতিপূর্ব্বে তাহার নামে অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, রঘু পাহাড়ের মতন স্থিরভাবে বিচারপতির নিকট দাঁড়াইয়া সে সকল স্বীকার করিল; কিন্তু অশিক্ষিত মূর্খ চাষা রঘু যখন বিচার হইবার পূর্ব্বে কেন সে ডাকাতি কার্য্যে যায়, তাহার কথা বলিতে লাগিল—যখন অত্যাচারী জমীদারের ভয়ানক অত্যাচারের কথা বলিতে লাগিল—তখন অনেকেরই খুব আশ্চর্য্য বোধ হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? বিচারপতি বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা দিলেন। রঘু একবার ভীমেন্দ্রের দিকে তাকাইল—কঠিন হস্তে চক্ষের জল মুছিল, এবং পাহারাওয়ালাদের সহিত জেলঘরে গেল।

ভীমেন্দ্র তাহার কাকাকে দেখিয়া যখন বাড়ীতে যাইতে চাহিল, তখন বুড়ী ছুটিয়া আসিয়া ভীমেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল, এবং বলিল 'বাবা, আমার কি হবে? আমাকে এখন কে দেখ্‌বে?" ভীমেন্দ্র কাকার দিকে তাকাইয়া বলিল "তুমি আমাদের বাড়ীতে এস।"

ভীমেন্দ্র আর বিলম্ব করিতে পারিল না। বিপিনের সহিত আলিপুর হইতে বাড়িতে আসিল। তাহার বিধবা মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকাইয়া গিয়াছিলেন—একমাত্র ছেলেকে বহুকাল পরে আসিতে দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অচিরাৎ তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তখন জননীর আহ্লাদের কথা কে বুঝিবে? যে সকল বালক অথবা বালিকা অকারণে বা সামান্য কারণে মাতার উপর রাগান্বিত হইয়া কটূক্তি করিতে ছাড়ে না; যে সকল বালক অথবা বালিকা মাতার দুঃখ, ক্লেশ বুঝিতে না পারিয়া, মাতা কখনও একটু কর্কশ কথা বলিলে সমস্ত দিন মুখ ফুলাইয়া কাল কাটায় এবং আহার না করিয়া বিছানা পত্র উল্টা পাল্টা করিয়া রাগ প্রকাশ করে, তাহারা এই স্নেহের কথা কি বুঝিবে?

ভীমেন্দ্র ঘরে ফিরিল। বুড়ী মৃত্যু পর্য্যন্ত ভীমেন্দ্রের বাড়ীতে স্থান পাইল। ভীমেন্দ্র এইরূপে নানা বিপদে আপদে পড়িয়া যে সকল অমূল্য শিক্ষা লাভ করিল পাঠক পাঠিকা তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। বাল্যকালে ভুগিয়া ঠেকিয়া যাহা তিনি শিখিয়াছিলেন তাহা আজও তাঁহার মনে গাঁথা আছে। কিন্তু এইরূপে শিক্ষালাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সেই যথার্থ বিজ্ঞ, যে বিপদে পড়িবার পূর্ব্বে আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সমস্ত শিক্ষা করিয়া রাখে। ভীমেন্দ্রের গল্প শেষ হইল—ভরসা করি এইখান হইতেই পাঠক পাঠিকাদিগের শিক্ষার আরম্ভ হইবে।

ঠাকুরদাদার গল্প।

সেদিন সন্ধ্যাকালে কিশোরী অন্যান্য বালকগণকে লইয়া উদ্যানে নানা জাতীয় ফুল কাটিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে নবীন বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের শিক্ষার আন্তরিক যত্ন দেখিয়া পরম আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিশোরীর প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ—"জ্ঞান লাভের এই-ই প্রকৃত পথ, সংসারে সুখী হইবার এই-ই প্রধান উপায়। প্রত্যেক বালক বালিকা যদি শুদ্ধ ক্লাশের পাঠ্য ২।১ খানি পুস্তক পাঠ হইলেই নিশ্চিন্ত না হইয়া এইরূপে প্রকৃতির শোভা দর্শনে অশেষ জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিতে জানিত তাহা হইলে আর তাহারা বৃথা আমোদে সময় নষ্ট বা জীবনে মূর্খ, অজ্ঞান ও অসুখী হইয়া কালাতিপাত করিত না। যে সময় তাহারা অনর্থক নষ্ট করে তাহার কিছু অংশও যদি সৎজ্ঞান ও সৎশিক্ষায় ব্যয় করিতে পারে তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়।"

কিশোরীঃ—"দাদা মহাশয়! সকল বালকের দোষ নহে। তাহারা ত আর শিখাইবার লোক না পাইলে এ প্রকারে জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না। ইতিপূর্ব্বে আমরাও ত সেইরূপ ছিলাম; এ প্রকার শিক্ষা করিতে যে কত আমোদ তাহা যে অবধি বুঝিয়াছি সেই অবধিই এই আমাদের খেলা, এই আমাদের সুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি সকল বালক একবার বুঝিতে পারে তাহা হইলে আর তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করিবে না।" আমরা সখার পাঠক পাঠিকা মাত্রকেই অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন প্রত্যেকেই কিশোরীর মত সুবোধ হইয়া বহুবিধ জ্ঞানলাভে সুশিক্ষিত হইবার জন্য কোন জ্ঞানী আত্মীয়ের সাহায্য লন।

অমূল্য ঃ—"দাদা মহাশয়! সেদিন যে বলিয়াছিলেন উদ্ভিদ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, কি কথা বলুন না। সামান্য গাছ পালার মধ্যে যে এত কৌশল তাহা কখন জানিতাম না। আরও কি, সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" নবীন বাবু বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সে দিনকার কথাগুলি সকলে মন দিয়া শুনিয়াছ ও বুঝিয়াছ? (সকলেই 'হাঁ উত্তম বুঝিয়াছি।') তাহা হইলে আর উদ্ভিদ যে কেবল অপদার্থ তাহা বোধ হয় তোমাদের মনে হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আরও বিশেষ কথা আছে। যে সকল উদ্ভিদের কথা সে দিন বলিয়াছি তাহাদের সকলেরই ফুল হয় ও ফল হয়। সচরাচর যে সমস্ত বৃক্ষ লতাদি "গাছ" বলিয়া পরিচিত তাহারা সকলেই প্রায় এই জাতীয়, ইহাদের পুষ্প হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'সপুষ্পক' উদ্ভিদ বলা যায়। আর কয়েক প্রকার উদ্ভিদ আছে তাহাদের ফুল হয় না (অপুষ্পক)। ইহারা প্রায়ই নিতান্ত ছোট, কিন্তু এই জাতীয় উদ্ভিদই পৃথিবীর অধিকাংশ অধিকার করিয়া আছে। তোমরা ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, ঈশ্বরের অপার ক্ষমতা বুঝিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিবে।

ঐ যে দেয়ালের গায়ে কেমন সুন্দর একটী ছোট গাছ হইয়াছে উহা এই অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ।
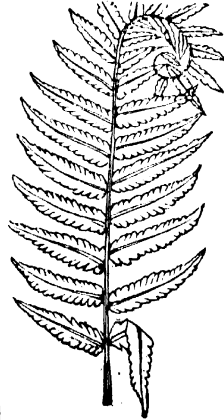
এই জাতীয় গাছেরা প্রায়ই শীতপ্রধান দেশে জন্মে, হিমালয় পর্ব্বতের কোলে দার্জ্জিলিঙে এই জাতীয় উদ্ভিদের অভাব নাই। ইহাদের প্রধান লক্ষণ পাতার অগ্রভাগ শুঁড়ের মত ঘোরান(চিত্র দেখ)। পুষ্করিণীর শুষুণীশাক এই জাতীয় উদ্ভিদ। ইহারা সচরাচর জলনির্গমনের নল বা নরদামার নিম্নে প্রাচীরের গায়ে জন্মে।

ইহাদের পাতার নীচের পিঠে কাল কাল বিন্দু বিন্দু এক রকম দাগ দেখা যায়, এই গুলির মধ্যে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ থাকে, তাহাই ইহাদের বীজের কার্য্য করে। পাতা শুকাইয়া গেলে এই গুঁড়া মাটীতে পড়ে ও বর্ষার জল পাইলে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদ জন্মায়।

তদ্ভিন্ন জলে যে অসংখ্য শৈবাল (শেওলা) জন্মে সে সমস্তই অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ্। তোমরা জান পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও অনেক অধিক যায়গা জলে আবৃত, এই অপার সাগরের অতল জল এই শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। সুতরাং দেখ আমরা যাহাকে বৃক্ষ বলি তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ উদ্ভিদ্ জলে থাকে। আরও দেখ আম্র, জাম, কাঁঠাল, নীম প্রভৃতি প্রায় সমুদায় বৃক্ষেরই ছালের উপর এক প্রকার শাদা দাগ দেখা যায়। এখনি যাও দেখিবে গোল গোল দাগ আছে। সেই দাগ গুলি বৃক্ষের ছালের অংশ নহে, তাহারা এক জাতীয় উদ্ভিদ্! ইহারাও অপুষ্পক। অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে যে ইহাদিগকে কি চমৎকার দেখায় তাহা বলা যায় না। যেন অগণিত হীরক, চুণি, পান্না প্রভৃতি মহামূল্য মণি দিয়া গঠিত। এই এক একটী বৃক্ষে এমন কত শত সহস্র "লাইকেন্" আছে তাহার সংখ্যা নাই, তাহাতে আবার জগতে কত বৃক্ষ আছে মনে কর। তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ পৃথিবীতে কতই যে এই জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে, তাহা কল্পনাতেও ধারণা হয় না!! আর ইহাদের এক একটীতে যে কি অপূর্ব্ব কৌশল, তাহা যখন বড় হইবে তখন বুঝিবে।

ঐ প্রাচীরের গায়ে যে সবুজ বর্ণের মখ্‌মলের মত কি সুন্দর ছোট ছোট, খুব ছোট গাছ রহিয়াছে, উহারাও অপুষ্পক জাতীয়। ইহাদেরও সংখ্যা নাই, বর্ষাকালে যেদিকে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়! ইষ্টকের উপরেই অধিক জন্মে, সর্ব্বত্রই আছে। ইহাদের বংশবৃদ্ধি বড় চমৎকার। কিন্তু তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। তবে এই মাত্র জানিয়া রাখ যে ইহারা যেখানে থাকে ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করে, ইহাদের শিকড় হইতেই নূতন নূতন গাছ জন্মে। শীতপ্রধান ও পার্ব্বত্য দেশেই ইহাদের জন্মের বড় সুবিধা, ঐ ঐ স্থানে ইহারা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও সহস্র সহস্র জাতিতে দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যা বৃক্ষ লতাদির অপেক্ষা অনেক অধিক।
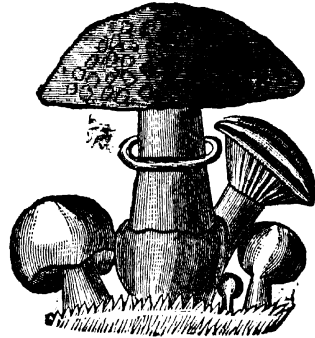
তৎপরে তোমরা সকলেই কোঁড়ক ও "বেঙের ছাতা" দেখিয়া থাকিবে। (ছবি দেখ) তাহাও এই অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ্, বেঙের ছাতা নহে। গরিব ভেক ছাতা কোথা পাবে? (সকলে হাস্য করিল) কোঁড়ক উদ্ভিদ্, অন্য কিছুই নহে। তদ্রূপ আরও কত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদিগকে চিনাই যায় না। আচ্ছা, চুন্‌কাম করা দেয়াল এক বৎসরেই যে কাল দাগে ঢাকিয়া যায় তাহার কারণ কি জান? (সকলে "না") আর কিছুই নহে, বর্ষার জল লাগিয়া উহাতে এক প্রকার অপুষ্পক উদ্ভিদ্ জন্মে তাহাই পরে শুষ্ক হইয়া যায় ও ঐ রূপ কাল দাগে দেয়াল আচ্ছন্ন হয়—এই মাত্র। বর্ষাতে পথে ঘাটে যে "পেছল" হয়, তাহাও উদ্ভিজ্জ। আর বড় বৃষ্টির পর উঠানে যে এক প্রকার বর্ণহীন জীয়ল আটার ন্যায় পেছল

পদার্থ দেখা যায়, তাহাও উদ্ভিজ্জ। এখন তোমরা অবাক হইতেছ,—দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য বাসি হইলে তাহাদের উপর শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের যে ছাতা ধরে, তাহাও উদ্ভিজ্জ। জামা, কাপড় প্রভৃতি অনেক দিন অবধি ঘর্ম্মাক্ত হইলে তাহাতে যে তিলের মত "ম'সে" ধরে তাহাও এক জাতীয় উদ্ভিজ্জ বৈ আর কিছু নহে।

পৃথিবীর এমন স্থান প্রায় নাই যেখানে কোন না কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখা যায় না। এমন কি শীতের আবাস ভূমি বরফের অঙ্গেও উদ্ভিদ্ জন্মে। উদ্ভিদ্ পৃথিবীর কত যে উপকারী তাহার সীমা নাই। যাবতীয় পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি প্রাণী সকলেই উদ্ভিদের উপরে বা উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুর উপরে নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদেরা পৃথিবীর অলঙ্কার ও জীবের জীবন ধারণের উপায়। ইহারা পরম কৌশলী পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য ও অপার বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। তাই বলি সামান্য তৃণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।" অতঃপর সকলে বাটী গেলেন।

শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা।

সপ্তম উপদেশ।

একদিন উপবাস করিলে শরীর কেমন দুর্ব্বল বোধ হয়, মাথা ঘূরে, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়, পা চলে না, শরীরের কি মনের কোন কার্য্যই করা যায় না,ইহা কে না জানে? আবার পরিমিতাহারের ক্ষণকাল পরেই শরীরে ও মনে কেমন স্ফূর্ত্তি বোধ হয়। বাস্তবিক আহার জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। কিন্তু কেবল আহার করিলেই যে যথেষ্ট হইল, তাহা নহে, এমন দ্রব্য আহার করা চাই, যাহা শরীর রক্ষার উপযুক্ত। কতকগুলি অসার বস্তু দ্বারা উদর পূর্ণ করা অপেক্ষা অনাহারই ভাল। অতএব বিশেষ বিবেচনা সহকারে আহার্য্য পদার্থ নির্ব্বাচন করিবে।

সচরাচর যে সকল দ্রব্য আমরা আহার করি, তাহাকে চারি ভাগ বিভক্ত করা যায়।

এক শ্রেণীর মধ্যে ভাত, রুটী, ডাউল, মৎস্য, মাংস, হংসডিম্ব প্রভৃতি প্রধান। মনুষ্য মাত্রেরই এই শ্রেণীর পদার্থ সকল প্রধান আহার। ইহারা শরীরের পুষ্টি করে, তাহার সারাংশ উৎপাদন করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে চিনি, আলু, অনেক সুপক্ক ফল প্রভৃতি প্রধান, এতদ্দ্বারা শরীরের তাপ রক্ষা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে তৈল, ঘৃত, নবনীত, মেদ, ইত্যাদি। ইহারাও তাপ রক্ষা করে ও মেদ উৎপাদন করে।

লবণ পৃথক ভাবে ও শাক সবজির মধ্যে নানা প্রকারে অবস্থিতি করে, ইহা রক্তের উপাদান, ও অস্থি প্রভৃতি মধ্যে অবস্থিতি করে, ইহা চতুর্থশ্রেণী।

এই চারি শ্রেণীর সকলগুলিই শরীর রক্ষার্থ আবশ্যক, সুতরাং প্রকৃত শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য তাহাই, যাহাতে এই চারি শ্রেণীর পদার্থ সকল উপযুক্ত পরিমাণে অবস্থিতি করে। সুতরাং আহারের উপযুক্ত দ্রব্য নির্ণয় করিতে হইলে সকল শ্রেণীর পদার্থই কতক পরিমাণে গ্রহণ করিবে। আহারের পরিমাণ শরীরের বৃদ্ধি, বয়স, পরিশ্রম, অবস্থা প্রভৃতি অনুসারে পৃথক প্রকার, সুতরাং তাহা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। নিম্নে বালকদিগের আহার সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম লিখিতেছি, তদ্দ্বারা বোধ হয় অনেকেই চলিতে পারিবেন। কিন্তু এই নিয়ম যে সকলের উপযুক্ত, এমত বলি না, কারণ এরূপ নিয়ম সম্ভব নহে।

সকাল বেলা দুগ্ধ ও ডিম্ব বা রুটী চিনি ও দুগ্ধ, কিম্বা দুগ্ধ ও ভাত। অল্প পরিমাণে এই সকল দ্রব্য আহার করিবে। যাহার অবস্থা এ সকলের উপ-

যোগী নহে, তিনি গরম ভাত, মৎস্য প্রভৃতিও খাইতে পারেন। পক্কফল—আম্র, কমলালেবু—প্রভৃতিও উত্তম।

৯॥০ টা বেলার সময় অর্থাৎ স্কুলে যাওয়ার পূর্ব্বে ভাত, ঘৃত, মৎস্য, ডা'ল, মাংস ও দুগ্ধ প্রভৃতি যথোপযুক্তরূপে আহার করিবে। নিতান্ত দরিদ্র হইলেও ভাত, মৎস্য, ডা'ল, এবং দুগ্ধ ইহার কম কিছুতেই শরীর পোষিত হয় না। লবণাদি যাহা আবশ্যক, স্বভাবই তাহা শিক্ষা দিয়া থাকে সুতরাং তাহা পৃথক ভাবে লিখিলাম না।

স্কুল হইতে আসিয়া লুচি, দুগ্ধ ও রুটী প্রভৃতি আহার করিবে, কিন্তু তখন পূর্ণ ভোজন করিবে না। অধিক মিষ্টান্ন খাইবে না, কারণ তাহাতে উপকার যা হউক না হউক, বিলক্ষণ অপকার হয়।

রজনীতে আবার মধ্যাহ্নের ন্যায় পূর্ণ আহার করিবে। কেহ কেহ ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী ব্যবহার করেন; যাহা হউক, তাহা অভ্যাস অনুসারে হইয়া থাকে। অন্যান্য পদার্থ মধ্যাহ্নের ন্যায়।

নিম্নে বিশেষ বিশেষ খাদ্যের গুণাগুণ লিখিলাম।

বাঙ্গালা দেশে ভাত প্রধান খাদ্য, ইহাতে শরীর রক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু ময়দার রুটী তদপেক্ষা অধিক উপকারী।

মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, এই সকল খাদ্য শরীর পোষণ করে, বলবৃদ্ধি করে, শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি উৎপাদন করে। কিন্তু ইহা যে শরীর রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক এমন কথা বলি না। কারণ হিন্দু জাতির মধ্যে অনেক সম্প্রদায় ইহা ব্যতীতও সবলকায় ও সুস্থ শরীর থাকে।

ডা'ল অতিশয় পুষ্টিকারক, ইহার মধ্যে মসূর, মুগ, প্রধান; মটর ও খেসারি উৎকৃষ্ট নহে। মাংসাদির পরিবর্ত্তে ডা'ল ব্যবস্থা হইতে পারে। নিরামিষভোজীদিগের ইহা একমাত্র শরীর-পোষক কিন্তু অধিক পরিমাণে ডা'ল খাইলে উদরের পীড়া হইতে পারে।

দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর, রক্ত বৃদ্ধি করে, বল বৃদ্ধি করে, শিশুর শরীর এতদ্দ্বারাই রক্ষা হয়। পূর্ণবয়স্কের পক্ষেও ইহা অতি আবশ্যক। এরূপ সুস্বাদু নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য কিছুই নহে।

আলুও পুষ্টিকর। তরকারীর মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রথম। আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহাই প্রধান খাদ্য।

কচু, কাঁচকলা, শালগম প্রভৃতিও উত্তম তরকারী মধ্যে গণ্য। পটল, মূলো, বেগুন, প্রভৃতি তরকারী মন্দ নহে কিন্তু বেগুন অধিক পরিমাণে ও অনেক দিন আহার করিলে চর্ম্মরোগ হয়।

পক্ক ফলের মধ্যে কলা, আম্র, কমলালেবু, নারিকেল প্রভৃতি উত্তম ও উপকারী। আতা, পেয়ারা, লিচু, জাম, কুল, প্রভৃতি অল্প পরিমাণে আহার করিবে। কাঁঠাল অধিক পরিমাণে খাইলে অজীর্ণ উৎপাদন করে, অল্প পরিমাণে আহার করিলে মন্দ নহে। তাল অতি অপকারক। অম্ল ও কাঁচা ফল—জলপাই, কামরাঙ্গা, কুল, আমড়া—প্রভৃতি অপকারক।

ঘৃত, নবনীত, সর শরীর পুষ্ট করে, মেদবৃদ্ধি করে, কিন্তু ইহা পরিমিতরূপে আহার করিবে।

ক্ষীর অতি গুরুপাক, সুতরাং অধিক আহার করা উচিত নহে। দধি ঘোল প্রভৃতি বিশেষ উপকারী নহে, অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত। তবে ঘোল অজীর্ণতার উপকার করে।

পিষ্টকাদি বিশেষ উপকারক নহে, কখনও ইহা খাইতে হইলে অল্প পরিমাণে আহার করিবে। মিষ্টান্ন সকলই তদ্রূপ।

অধিক পরিমাণে মশলা দ্বারা যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, যেমন পোলাও, মাংসের নানা প্রকার ব্যঞ্জন, ইত্যাদি অতিশয় গুরুপাক। অধিক মশলার পাকের বস্তু আহার করিবে না। উপযুক্ত পরিমাণে মশলার পাকই উত্তম। অতি ভোজন অনু

চিত, বরং অল্প অল্প ক্ষুধা রাখিয়া আহার কর্ত্তব্য। ধীরে ধীরে আহার করিবে। আহারের সময় গল্প করিবে। আহারের পূর্ব্বে বা পরেই স্নান, ব্যায়াম বা পাঠ করিবে না। আহারের পর দুই ঘণ্টা বিশ্রাম চাই।

ক্রমশঃ।

বড় বালক বালিকাদিগের জন্য লিখিত।

বীরেন্দ্রসিংহের রত্ন-লাভ।

[আমরা গতবারে নরেনের স্বর্গ দর্শন নামক সুন্দর গল্পটী 'সহচরী' পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিয়া কাহারও কাহারও কাছে গালাগালি খাইয়াছি; তাঁহারা বলেন যে "মিথ্যা গল্প দিলে বালকদিগের মনে অনেক বিষয়ে ভুল বিশ্বাস হয়।" যাহারা কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা বুঝিতে না পারে, তাহাদের পক্ষে 'সখা' নয়, এরূপ আমরা বলিতে সাহস করি না; তবে নীচের গল্পটী কেবল তাঁহারাই পড়িবেন, যাঁহারা সত্য মিথ্যা বাছিয়া উপদেশ লইতে পারেন।]

পুরাকালে ভারতবর্ষে বীরেন্দ্র সিংহ নামে এক সুবিখ্যাত, এবং মৃগয়া-প্রিয় রাজা ছিলেন। একদিন তিনি সসৈন্য-সভাসদ-সঙ্গে মৃগয়ায় গমন করিলেন,—সহস্র সহস্র অশ্ব পদদাপে প্রান্তর পথ কম্পিত করিয়া মৃগয়া-ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। ক্ষেত্রের প্রান্ত-সীমা হইতে একটী হরিণশাবক, সচকিতে ভয়বিহ্বল-নেত্রে অশ্বারোহীদিগের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া সহসা দ্রুতবেগে পলায়ন করিল, মহারাজ সঙ্গীবর্গকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

দ্বিপ্রহর হইয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যের প্রখর কিরণে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, উত্তপ্ত বায়ুস্রোতে উত্তপ্ত ধূলিকণার তরঙ্গ উঠিয়াছে, চারিদিক নিস্তব্ধ—বিশাল দিগন্ত শূন্য প্রান্তরে মৃগশিশুটি বিদ্যুতের মত এক একবার মহারাজকে দেখা দিয়া মাঝে মাঝে একটি গাছ গাছড়া ও তৃণ মণ্ডলীর আড়ালে আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। আর লোক নাই, আর পশু নাই,—অগ্নিময় প্রান্তর যেন জীবশূন্য। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মহারাজের শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত, মৃগয়া উৎসাহে তথাপি তিনি শ্রান্তি অনুভব করিতেছেন না—অবিশ্রান্ত অবারিত বেগে মৃগের অনুসরণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে মৃগ প্রান্তর ছাড়াইল, তিনিও প্রান্তর ছাড়াইলেন, মৃগ এক অনিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিল, তিনিও প্রবেশ করিলেন; বন মধ্যে একটি মন্দির ছিল, তথায় মৃগশিশু প্রাণপণ গতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল—রাজা হতাশ হইয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বুঝিলেন তাহা মন্দিরের প্রতিপালিত মৃগ—তাহা অবধ্য।

নিরাশ অবসন্ন রাজা শ্রান্তি দূর করিতে মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুরোহিতের আতিথ্য-সৎকারে সজীব হইয়া কিছুক্ষণ পরে দেব-চরণে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। অপরাহ্ণের নিস্তেজ সূর্য্যরশ্মি মন্দির ভেদ করিয়া দেবমূর্ত্তি উজ্জ্বল করিতে অক্ষম,—মন্দিরস্থিত জ্বলন্ত দীপালোকে ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি বিভাসিত। প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় মহারাজের প্রদীপে দৃষ্টি পড়িল—কি আশ্চর্য্য! দেখিলেন প্রদীপ তৈলশূন্য অথচ তাহার প্রজ্জ্বলন্ত দীপ্তির কিছুমাত্র হ্রাস নাই। মহারাজকে বিস্মিত দেখিয়া পুরোহিত বলিলেন "মহারাজ বিস্মিত হইবেন না ইহার নাম ইচ্ছাদীপ্ত প্রদীপ। এই প্রদীপের নিম্নভূমিতে ব্রহ্মা একটি দেবরত্ন রাখিয়া ইহা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। যদি কেহ সেই রত্নটি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তবেই এই প্রদীপ নিভিবে নহিলে ইহার নির্ব্বাণ নাই—"

মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন "সে রত্নটি কি ?" পুরোহিত বলিলেন "তাহা জগতের সার রত্ন তাহা লাভ হইলে দেবত্ব লাভ হয়।"—মহারাজের লোলুপ হৃদয় তাহা লাভ করিতে উৎসুক হইল ; তিনি বলিলেন "তাহা কিরূপে লাভ করা যায় ?" পুরোহিত বলিলেন "ইহা লাভ করিতে হইলে পৃথিবীজয়ী হইতে হইবে, পৃথিবী জয়ী না হইলে আশা বৃথা।" মহারাজ তাহা লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাইবার সময় পুরোহিত তাঁহার হস্তে একটি কুশাঙ্গুরীয় পরাইয়া তাহাতে দেব প্রদীপের কালী মাখাইয়া বলিলেন "যেদিন দেখিবে এই কালীর দাগ মুছিয়া গিয়াছে সেইদিন বুঝিও তুমি পৃথিবী জয়ী হইয়া এই রত্ন লাভে অধিকারী হইয়াছ—দীপ নিভিয়াছে।"

রাজা বাটী ফিরিয়া আসিলেন,—দিগ্বিজয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত হইল, মহারাজ দিগ্বিজয়ে গমন করিলেন। তখন রাজাগণ ভারত জয় করিতে পারিলেই আপনাদিগকে পৃথিবী জয়ী জ্ঞান করিতেন। বীরেন্দ্র সিংহ সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আহ্লাদে হৃদয় উন্মত্ত, তিনি মানব হইয়া স্বক্ষমতায় দেবরত্ন লাভ করিবেন এপর্য্যন্ত ধরাধামে এরূপ সৌভাগ্য কাহারো ঘটে নাই ;—কিন্তু সহসা তাঁহার সে আহ্লাদ দূর হইল, পুরোহিত কুশাঙ্গুরীয় পরাইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল, হস্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন অঙ্গুরীয়কের কালীর চিহ্ন যেমন তেমনি রহিয়াছে। মহারাজ নিরাশ হৃদয়ে মহা মহোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সভা আহ্বান করিলেন। মন্দিরের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে বলিয়া এসম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন "পুরোহিতের কথামত আপনি পৃথিবী জয় করিলেন কিন্তু তাহাতেও যখন অঙ্গুরীয়কের কালী মুছিল না, তখন পুরোহিতের কথার যথার্থ অর্থ তাহা নহে। পৃথিবীর রক্তপাতে যথার্থ পৃথিবী জয় হয় না। যখন আপনি পৃথিবীর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন তখন যথার্থ পৃথিবী জয়ী হইবেন। জগতের লোক ভয়দৃষ্টিতে আপনাকে মনুষ্য-হন্তারক বলিয়া না দেখিয়া যখন ভাল বাসার চক্ষে, ভক্তির চক্ষে দেখিবে, যখন জগতের হৃদয় অধিকার করিবেন, তখনি আপনি পৃথিবী জয়ী হইতে পারিবেন।"

মহারাজ এই কথা সত্য বলিয়া বুঝিলেন ;—রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধন রত্ন ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, যশে জগৎ ধ্বনিত হইল, কিন্তু হায় ! রাজা ব্যথিত হৃদয়ে দেখিলেন তাঁহার অঙ্গুরীয়ক এখনো কালীময়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দিগের কথাও ব্যর্থ দেখিয়া কালী মুছিবার উপায় জানিতে, তিনি ভগ্ন হৃদয়ে আবার সেই দেব মন্দিরের পুরোহিতের নিকট যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় পথে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার ম্লান বদন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সবিশেষ শুনিয়া সস্নেহে বলিলেন "বৎস! রক্তপাত করিয়া কিম্বা যশের কামনা পরবশ হইয়া পৃথিবী জয়ী নামের আশা করিও না। তাহাতে সে প্রদীপ নিভিবে না। যদি আত্মজয় করিতে পার তাহা হইলেই যথার্থ পৃথিবী জয়ী হইবে ও তাহা হইলেই তুমি সেই দেবরত্নের অধিকারী।"

সন্ন্যাসীর কথায় মহারাজের চৈতন্য হইল। তিনি মন্দিরে না গিয়া পথ হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। অন্যায় রূপে যে সকল রাজত্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন—তাহা ফিরাইয়া দিলেন, নিজের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আন্তরিক প্রার্থনায় ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইলেন—ক্রমে লোভ, ঈর্ষা, অহঙ্কার সকলি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—তিনি ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তাহার হস্তের কালী মুছিয়া গেল, কিন্তু তখন আর কোন রত্ন লাভে তাঁহার লোভ রহিল না, তিনি বাসনাহীন হৃদয়ে পুরোহিতকে ধন্যবাদ করিতে

এবং মন্দিরদেবকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে সেই মন্দিরে গমন করিলেন ;—দেখিলেন প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। পুরোহিত বলিলেন—"তুমি যে রত্ন লইতে আসিয়াছ তাহা ইতিপূর্ব্বেই তোমার হইয়াছে এই দেখ দীপ নির্ব্বাপিত। এখন তুমি কেবল মাত্র পৃথিবী জয়ী নহ—ত্রৈলোক্যজয়ী!"

"সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।
ন বিভেতি রনাদ্ যোবৈ সংগ্রামেহপ্য পরাংমুখঃ
ধর্ম্ম যুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।"

সত্যই যাঁহার ব্রত এবং সর্ব্বদা দীনে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

বানর।

মানুষের বুদ্ধি বেশী; মানুষ সকলের রাজা; মানুষের পরেই বানর। দুয়ের চেহারায় অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অনেক সময় স্বভাবের ও সাদৃশ্য দেখা যায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া এক পণ্ডিত ঠিক করিয়াছেন বানর মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ! অর্থাৎ বানরই কালে রূপান্তরিত হইয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

বানর শব্দটীর উপর কিছু মন্তব্য আবশ্যক হইয়াছে। এই জাতীয় জন্তুদের মধ্যে যাহাদের লেজ আছে তাহারাই যথার্থ আইন-সঙ্গত বানর। "হুকু" "বনমানুষ" প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায় আছে তাহাদের বানরত্ব পরিচায়ক ঐ বিশেষ চিহ্ন টুকু নাই; এ স্থলে বানর বলিতে আমরা তাহাদিগকেও বুঝিব।

তবে দেখা যাইতেছে প্রধানতঃ বানর দুই প্রকার;—সলাঙ্গুল আর অলাঙ্গুল। সলাঙ্গুলদের মধ্যেও দুইটী সম্প্রদায় আছে। এক দলের লেজ, আমরা যতদূর বুঝি শোভার জন্য; আর লোমে ঢাকা। অপর দলের লেজ প্রায় লোমশূন্য, কিন্তু তাহার এই বিশেষ গুণ আছে যে তদ্দ্বারা স্পর্শন, অবলম্বন, প্রভৃতি হাতের প্রায় সমস্ত কার্য্য হয়। সকল বানরেরই সাধারণ কয়েকটী গুণ আছে; যথাঃ—বুদ্ধি, কৌতূহল, অনুকরণপ্রিয়তা ক্ষতি-প্রিয়তা ইত্যাদি। আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এই তিন খণ্ডেই অসংখ্য বানর দেখিতে পাওয়া যায়, সামুদ্রিক দ্বীপ সকলেও বানরের অভাব নাই। তবে সভ্য দেশ বলিয়াই হউক কি অন্য কোন কারণেই হউক, ইউরোপে বানর বড় নাই। প্রায় সকল বানরেই নিরামিষ খায়, গাছে থাকে এবং বিরক্ত হইলে তিরস্কার স্বরূপ নানা প্রকার হাস্যোদ্দীপক মুখভঙ্গী করে। বানরের সম্বন্ধে ইংরাজি বই এবং অন্যান্য স্থান হইতে আমরা কতকগুলি সুন্দর গল্প সংগ্রহ করিয়াছি। সেই গুলি আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

অপত্য স্নেহ।—কোন ডাক্তার সাহেবের চাকর একটী ছোট বানর ধরিয়া সাহেবের তাঁবুতে লইয়া আসিল। বানরটীকে খুব যত্ন করা হইত। কিন্তু তাহাকে ধরিয়া আনাতে একটী বুড়ো বানর—বোধ হয় তাহার মা—এত কষ্টে পড়িল যে সে সর্ব্বদাই তাঁবুর কাছে বসিয়া থাকিত আর কিচ্ মিচ্ করিয়া ডাক্তার সাহেবকে মনের কষ্ট জানাইত। ডাক্তার সাহেব তাহার চীৎকারে থাকিতে না পারিয়া অবশেষে বানরটীকে ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। বুড়ী তাহাকে লইয়া আনন্দে স্বজাতীয়ের সমাজে গেল। কিন্তু বোধ হয় বানরদের 'পঞ্চায়েৎ" মনে করিলেন যে এদের জাত গিয়াছে সুতরাং ইহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে না। তখন সকলে মিলিয়া হতভাগিনীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল।

কয়েক দিন পরে ডাক্তার সাহেব দেখিলেন সেই বানর বুড়ী ছানা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে আপনা আপনি তাঁবুর ভিতরে আসিল। এবং আস্তে আস্তে সেখানে ছানাটীকে রাখিয়া কিছু দূর যাইয়াই পড়িয়া মরিয়া গেল। মৃত শরীরটী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে সে ভয়ানক রোগা হইয়া গিয়াছে, আর সমস্ত গায় প্রহারের এবং আঁচড়ের দাগ।

স্বার্থপরতা।—আমেরিকার এক সাহেব কাফির ক্ষেত করিয়াছেন। কাফি প্রায় সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। এক দিন ক্ষেতের দিকে একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিতে পাইলেন। তখন দুরবীণ দিয়া দেখিলেন যে একদল বানর কাফি খাইতে আসিয়াছে। কাফির প্রায় প্রত্যেক গাছেই বোলতার বাসা। নিষ্কণ্টকে কাফি খাওয়ার পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে। দলপতি তখন ভাবিলেন "নিজে কেন ঠকি?" সুতরাং তিনি বোলতা তাড়াবার জন্য ছোট ছোট বানর গুলিকে গাছে ফেলিয়া দিতেছেন। বোলতার কামড়ে বেচারারা ক্যাচ ম্যাচ করিতেছে; তাই অত গোলমাল।

প্রতিহিংসা।—একটা স্তম্ভে একটা বানর বাঁধা ছিল। কাকগুলি মনে করিল যে "বাঁধা আছে, এই বেলা বড় সুযোগ"। তাহার খাবার জিনিস দুটী একটী করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বেচারা কি করে! শেষটা মড়ার মত হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিল। পক্ষীগুলি আস্তে আস্তে কাছে আসিতে লাগিল, বানর কিছু বলে না। কাক মহাশয়েরা মনে করিলেন বুঝি মরিয়া গিয়াছে। তখন আর স্থানাস্থান রহিল না, পারিলে তাহার বুকে উঠিয়া মুখের খাবার খুলিয়া খান। বানরের কার্য্যোদ্ধারের সময় উপস্থিত। সে থপ্ করিয়া এক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া বসিল। মারিয়া ফেলিলে উপযুক্ত শাস্তি হইবে না একথাটা বানর বুঝিতে পারিল। সে নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া আস্তে আস্তে এক একটী করিয়া কাকের সমস্ত পালক ফেলিয়া দিল। তার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিলে কি হইল বুঝিতেই পার।

বানর এবং কেউটে সাপ।—বানরটী পাটনার একটা বড় বটগাছে থাকিত। গাছে উঠিতে যাইবে এমন সময় গাছের গোড়ায় একটা বড় কেউটে সাপ দেখিতে পাইল। সে গাছে উঠিতে চাহিলেই সাপটা মাথা তুলিয়া কামড়াইতে আসে। বানর ঘুরিয়া গাছের ও পাশে গেল। সাপও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজির। কোন মতেই গাছে উঠিতে দিবে না। ইহা দেখিয়া বানর লাফাইতে আরম্ভ করিল। একবার এখানে যায়, আবার ওখানে যাইয়া লাফায়, কখনো বা সাপের গলা ধরিতে হাত বাড়ায়। সাপও কোন দিক রক্ষা করিবে বুঝিতে না পারিয়া ক্রমাগত বানরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল এবং শেষটা ক্লান্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিল। তখন বানর আস্তে আস্তে অতি সাবধানে সাপের কাছে আসিয়া হঠাৎ তাহার গলা ধরিয়া ফেলিল। সাপ ও বানরের গা জড়াইয়া ধরিল। বানর কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া নিকট হইতে এক খানা ইট লইয়া সাপের মাথা ক্রমাগত ঘসিতে লাগিল। ঘসিতে ঘসিতে মাথার আর কিছুই রহিল না। তখন মৃত সাপটা দূরে ফেলিয়া দিয়া বানর নির্ব্বিবাদে গাছে উঠিল।

অনুকরণ-প্রিয়তা।—জাবাদ্বীপে একজন ডাক্তার সাহেব থাকিতেন তাঁহার খুব বড়-জাতীর একটা বানর ছিল। মৃত শরীর পরীক্ষা করিতে হইলে সাহেব একটা টেবিলের উপর ফেলিয়া অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া দেখিতেন; বানর কাছে বসিয়া তামাসা দেখিত। একদিন সাহেব যাই ঐ টেবিলের কাছে গিয়াছেন অমনি বানর তাঁহাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিল। তার পর মড়া কাটিতে হইলে সাহেব যেরূপ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইতেন বানর তাহাই করিতে লাগিল। সাহেব নিতান্ত 'বেকায়দা গোছ' দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কতকগুলি লোক ঘরে আসিলে বানর থামিল।

ক্রমশঃ।

দুর্গা-পূজা।

লেগে গেল ঘোর রঙ্গ, উৎসবে মাতিল বঙ্গ,
রেলের গাড়ীর ঘরে বাধিয়াছে গোল—
সহরের ঘরে ঘরে, ছেলে গুলো গোল করে,
দোকানী পশারী সবে তুলিয়াছে রোল।
পটকা বন্দুক লয়ে, মারবেল বোঝা ব'য়ে,
ছেলে বাবু তাড়াতাড়ি চলিছেন ঘরে,
কর্ত্তার না হয় ঘুম, পূজার বাড়িছে ধুম,
কি হইবে, কি করিব, ভাবেন অন্তরে।
শুকায়েছে কাদা জল, হাসিতেছে নভস্তল,
পরিয়ে চাঁদের আভা—আপনার গলে,
কুহুহু কোকিলা গায়, কুলকুল নদী ধায়,
শ্যামলা প্রকৃতি যেন হাসে প্রাণ খুলে।
পূজার বাড়ীতে আজি, মনোহর বেশে সাজি,
ঘোর ফেরে দলে দলে ছেলে আর মেয়ে;
গরিবের ছেলে যারা, মনোদুঃখে মনে মারা,
তারাও পরেছে আজি সুবসন চেয়ে।
কিন্তু এ আনন্দ দিনে, আহা! কত দীন হীনে
অনাহারে দিনে দিনে যায় শুকাইয়ে,
পিতা মাতা নাহি যার, দিবা রাত্রি হাহাকার,
সুখহাসি চির তরে গেছে পলাইয়ে।
উৎসবেতে রুচি নাই, হেন কত শত ভাই,
নীরবে আকাশে চেয়ে ফেলে নেত্র নীর—
'কবে প্রাণ বাহিরিবে, এ যাতনা দূরে যাবে,'
ভাবে তাই কোলে বসি ঘোর রজনীর।
আজি ইহাদের তরে, কার অশ্রু জল ঝরে,
উৎসবেতে উষ্ণশ্বাস পড়ে আজি কার?
কার প্রাণ দয়া ক'রে, আজি অভাগারে স্মরে,
কে শুনিছে আজি ওই ঘোর হাহাকার?
আমার ভগিনী ভাই! প্রাণে ব্যথা, বলি তাই,
দুখীরে রাখিও মনে এই সুখ-দিনে,
আর কি চাহিতে পারি,— বিন্দুমাত্র অশ্রুবারি,
ফেলাইও ফেলাইও স্মরি দীন হীনে।
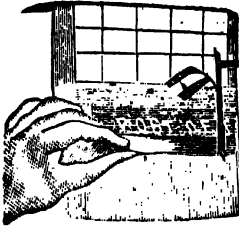
ত্র প্রেরকের প্রতি শ্রীমহম্মদ জামালুদ্দিন, শম্ভুগঞ্জ।—স্থানাভাব।

শ্রীমোহিনী নাথ রায়, পলাশডাঙ্গা।—আপনার 'নবকথা' মনোনীত নহে। শ্রীনলিনমোহন গোস্বামী, শ্রীরামপুর।—এরূপ পদ্য লিখিয়া ফল কি? আপনার দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি; 'দুর্গা-পূজা' পদ্যটী কি আপনার রচনা? প্রকাশ করিবার স্থান নাই। শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু ধুলজুড়ি।—১। আপনার ন্যায় 'নাছোড়' পত্রপ্রেরক পাওয়া ভার। 'সখা'র সম্পাদক যিনিই হউন, তাঁহার নাম আপাততঃ প্রকাশ করা যাইবে না; লেখক লেখিকাদিগের নামও আমরা এখন প্রকাশ করিব না.—যদি নিতান্তই জানিতে ইচ্ছা করেন, দয়া করিয়া বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, তখন কিছুই জানিতে বাকি থাকিবে না। ২। আপনার ধাঁধার উত্তর না পাঠাইলে উহা মুদ্রিত হইতে পারে না।

শ্রীমনসাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা।—যাঁহাদের পড়া শুনার দিকে মন আছে, তাহারা অল্প বয়সে বিবাহ করা ভাল মনে করেন না। দেশের বৃদ্ধ লোককে পরামর্শ দেওয়া ভাল নহে। যাহাদের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা তাহাদেরই দল বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করা উচিত। আপনার রচনা প্রকাশ করিয়া আর বিশেষ লাভ কি?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন, সৈয়দপুর।—লিখিয়াছেন, যে ছোট গোয়ালে পাতার রস সাপেকাটা যায়গায় রক্তের সহিত মিশাইয়া দিলে রোগী আরাম হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আমরা সাপের ঔষধের কথা লিখিয়া, তাহার কিছু দিন পরে আর একটী ডাক্তারী ঔষধের কথা জানিতে পারিয়াছি; খ্রীষ্টীয় বান্ধব বলেন—"পোটাসিয়াম আইওডাইটের সহিত উগ্র সোলিউশান অভ আইওডাইট মিশ্রিত করিয়া সর্পদষ্ট রোগীকে পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।"

শ্রীআ———, কাশী।—আমরা ইতিপূর্ব্বে দুটী প্রশ্ন দিয়া যে পত্র ছাপাইয়াছিলাম, তাহার উত্তর পাঠাইয়াছেন। প্রশ্ন ও উত্তর এইরূপ: (১) প্রশ্ন—পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কেহ দেখিয়াছেন, কি না? উত্তর, স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, কারণ কোন জিনিশই চিরস্থায়ী নহে; দ্বিতীয়তঃ উহাদেরও রোগ হইতে পারে, তাহা হইতে তাহাদিগের মৃত্যু হইতে পারে।" (২) প্রশ্ন, সম্পূর্ণ গোল ঘুড়ি উড়ে কি না? উত্তর—জানি না!!!

শ্রীভুবনমোহন দাসগুপ্ত, গফরগাঁও।—লিখিয়াছেন, "উহার (সখার) কোন এক খণ্ডে তামাক সেবনের দোষ বর্ণিত আছে তাহা দেখিয়া আমি আমার বহুকালের (১১ বৎসরের) 'পাপ' পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি।" আমরা এই সম্বাদে বড়ই সুখী হইয়াছি, আশা করি যাঁহারা তামাক খান, তাঁহারা এ বিষয়ে একবার ভাবিয়া দেখিবেন, এবং আমাদিগকে তামাক ছাড়ার সংবাদ দিয়া আরো সুখী করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণবন্ধু সান্যাল লিখিয়াছেন যে কোড়কদি গ্রামে একটী ধূমপান বিরোধিনী সভা হইয়াছে। এ বড়ই সুখের সংবাদ। গ্রামে গ্রামে এইরূপ সভা হইলেই মঙ্গল।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি আমরা 'সখা'র পরিবর্ত্তে নিয়মিতরূপে পাইতেছি; আশা করি অন্যান্য বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদক

মহাশয়েরাও আমাদের সহিত পরিবর্ত্তন করিবেন।—(১)বঙ্গবাসী; (২) সাধারণী; (৩) চারু বার্ত্তা; (৪) ভারতমিহির; (৫) সঞ্জীবনী; (৬) সময়; (৭) সারস্বত পত্র; (৮) ভারতী; (৯) খ্রীষ্টীয় বান্ধব; (১০) ভারতসুহৃৎ; (১১) কিরণ; (১২) বামাবোধিনী; (১৩) নব্যভারত; (১২) বিজ্ঞান-দর্পণ; (১৫) বেঙ্গল পাব্লিক ওপিনিয়ান। এতদ্ভিন্ন "চিত্তরঞ্জিনী" নামে একখানি সুন্দর দ্বিমাসিক পত্রিকাও আমরা পাইয়াছি।

[গত কয়েক বারে স্থানাভাবে ধাঁধা দিতে না পারাতে আমরা দুঃখিত আছি।]

ধাঁধা।

১। ব্রজ বাবুর ছেলে বিপিন এক দিবস আমাকে ঠিক সমান দুভাগ করিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম "ও কি করিলি?" তা,—সে উত্তর না দিয়া দেখিল দুই ভাগই ঠিক একরূপ; তখন সে এক ভাগের নাম ধরিয়া জোরে ডাকিল; তাহাতে ব্রজ বাবুর স্ত্রী এসে বলিলেন "কেন রে বিপিন?"

বলতো বিপিন আমার কে?

২।—হস্ত পদ নাই তার, নাহিক নয়ন,
তবু আমাদের মাথা রাখেন সে জন;
রজনীতে তিনি যদি না রন্ সহায়,
কত কষ্ট পেতে হয় বলা নাহি যায়।
বলতো সুবোধ শিশু স্থির করি মন,
(ঈশ্বর নহেন তিনি) তবে কোন জন?

৩। একটি ছেলে একজন বৃদ্ধকে বলিল "আপনি না একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন?" বৃদ্ধ কয়েকটী অঙ্ক লিখিয়া দেখাইলেন। বালক বুঝিয়া বলিল "তবে?" বৃদ্ধ আবার সেই কয়টি অঙ্ক লিখিয়া তাহাদের মধ্যে একরকমের কয়টি চিহ্ন দিয়া বালককে দেখাইলেন। বালক বলিল 'ইঃ আর দুই হইলেই তো এক কম পঁচিশ হইত!"

ছেলেতে বুড়োতে কি কথা হইল বল তো?

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুলসহ ১।০ এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।
} কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রথম ভাগ। নবেম্বর, ১৮৮৩। ১১শ সংখ্যা।

ঠাকুরদাদার গল্প।

অদ্য বালকেরা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে দাদা মহাশয়কে একটী প্রশ্ন করিবে ঃ—কতকগুলি বস্তু বেশ শক্ত আর কতকগুলি পাৎলা কেন? নবীন বাবু আসিবামাত্র সকলে প্রণাম করিয়া এক বাক্যে ঐ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিল। তিনিও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "ক্রমে তোমরা কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তা ভাল; আমিও বুঝাইয়া দিব, কেবল তোমরা খুব মনোযোগ দাও, যেখানে না বুঝিবে অমনি বলিবে। এক মনে শুন। পৃথিবীতে যতগুলি বস্তু আছে সমস্তকেই তিনটী ভাগ করা যায়,—যথা, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। ধাতু, কাষ্ঠ, পাথর, কাচ, কাগজ, জন্তুদিগের হাড়, প্রভৃতি যে সকল শক্ত জিনিষ দেখা যায় তাহারা 'কঠিন'। দুগ্ধ, জল, তৈল, প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যকে আমরা পাৎলা বলি তাহারাই 'তরল'। এবং বায়ু, জলীয় বাষ্প, ধুম প্রভৃতি পদার্থ গুলিকে 'বাষ্পীয়' কহে। এই তিন জাতীয় বস্তুর মধ্যে কঠিন দ্রব্য সকলের নির্দ্ধারিত আকৃতি আছে, যেথানেই রাখ ইহাদের সে আকার বদ্‌লিয়া যায় না। কিন্তু পাৎলা জিনিষের কোন রকম নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, যে পাত্রে তাহারা থাকে সেই পাত্রেরই আকার অবলম্বন করে, বুঝিলে? (সকলে "হঁা")। বাষ্পীয় পদার্থের বিশেষ গুণ এই যে উহারা কোন সীমাবদ্ধ পাত্রে বা স্থানে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, কেবল উড়িয়া উড়িয়া ছড়াইয়া বেড়ায়। একটী বাটিতে এক বাটি জল রাখিলে তাহা তেমনি থাকে, কিন্তু এক বাটি ধুম রাখিলে সেরূপ থাকে না; অমনি উড়িতে আরম্ভ করে ও কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাটি বায়ুতে পূর্ণ হইয়া সমস্ত ধুম অদৃশ্য হয়, না? (সকলে "তা জানি"।) কঠিন বস্তুকে ভিন্ন আকারের করিতে হইলে, কি বিভাগ করিতে হইলে অনেক বল আবশ্যক; তরল বস্তুকে বিভাগ করা খুব সহজ, অতি সামান্য বলেই জলীয় পদার্থ সকল ভিন্ন হইয়া পড়ে; বায়বীয় পদার্থকে বিভাগ করিতে একটুও বল লাগে না, তাহারা আপনারাই সর্ব্বক্ষণ বিভিন্ন হইতে চেষ্টা করিতেছে, বরং তাহাদিগকে একত্র রাখিতেই বলের আবশ্যক। সোডা ওয়াটারের বোতলের ভিতর যে বাষ্প থাকে তাহাকে উহার মধ্যে রাখিবার জন্য একটা খুব মজবুত ছিপি শক্ত তার দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়, যাই ঐ তার খোলা যায় অমনি দম্ করিয়া ছিপিটী ছিট্‌কিয়া যায় এবং ঐ গ্যাস বাহির হইতে

থাকে, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা জলও বাহির হয়। ইহাতেই দেখা যাইতেছে, কতকটা জলীয় পদার্থ একটা পাত্রে রাখিয়া দিলেই ঠিক থাকে; কিন্তু বাষ্পীয় কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে কোন পাত্রে রাখিলে কিছুতেই সেরূপ থাকে না, কেবল বলপূর্ব্বক তাহাকে সেইরূপে রাখিতে হয়। কেমন? (সকলে "সত্যি? তাতো জানিতাম না"।) কোন টেবিলের উপর একটী কঠিন দোয়াত ঠিক বসাইয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহা হইতে খানিকটা কালি ঢালিলে ঐ কালী কখন উঁচু হইয়া দোয়াতের মত থাকে না, উহা গড়াইয়া যাইবে, কিন্তু বাষ্পীয় পদার্থের মত উড়িয়া যাইবে না। কোন কঠিন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া তাহা আর যোড়া যায় না, ভাঙ্গা হাঁড়ী যোড়া লাগে না। কিন্তু কোন তরল বস্তুকে যেমন সহজে বিভাগ করা যায় তেমনি সহজেই আবার একত্র করিলেই মিশিয়া যায়। বাষ্পীয় পদার্থ স্বাধীন, স্বেচ্ছামত আপনা আপনিই বিভক্ত হইতেছে, আবার মিশিতেছে, যেখানে ইচ্ছা যাইতেছে, মানুষের কথা শুনে না"। (সকলের হাস্য)

কিশোরী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল "ও সব জানি। কেন এরূপ হয়, তাহাই বুঝাইয়া দিন না?" নবীন বাবু বলিলেন "তাই বলিব শ্রবণ কর। কোন জিনিষকে ভাগ করিতে করিতে ক্রমে খুব ছোট হইয়া যায়, আরও ভাগ কর, ১০০, ২০০, ২০০০, ২০০০০ ভাগ, আরও আরও এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে একটী এমন ছোট বিন্দুবৎ কণা পাওয়া যাইবে যাহা আর ভাগ করা যায় না। (তত ছোট বস্তু দেখাই যায় না, ভাগ করিব কিরূপে?) তবু মনে কর যদি করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে এ প্রকার বিভাগ করা অসম্ভব এমন একটী কণা পাওয়া যাইত—এইটীর নাম "পরমাণু"। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর দ্বারা প্রস্তুত। কি কঠিন, কি তরল, কি বাষ্পীয়, কি স্বর্ণ, কি লৌহ, কি মৃত্তিকা, কি রক্ত, কি বৃক্ষলতাদি, সমস্ত বস্তুই এই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কোটী কোটী পরমাণু মিলিত হইয়া এক একটী বালুকাকণা নির্ম্মিত হইয়াছে। কোটী কোটী পরমাণু লইয়া এক একটী জলীয় বাষ্পের কণা হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য পরমাণু লইয়াই এ বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি।"

মন্মথ:—যদি একই পরমাণু দ্বারা সমুদায় বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ইহার কারণ কি?"

অমূল্য:—তবে একটী বা শক্ত কেন, আর একটী নরম কেন?

নবীনবাবু:—এই পরমাণুগুলির একটী প্রধান গুণ এই যে ইহারা পরস্পরকে আপনার দিকে টানে। প্রত্যেক পরমাণু অপর সকলগুলিকেই নিজের দিকে টানে, তবে স্থান ও অবস্থাভেদে সকল পরমাণুর টানের জোর সমান নহে। কিন্তু এমন একটীও নাই যে এই "আকর্ষণের" অধীন নয়। চারিদিকে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই সে সমস্ত এই আকর্ষণের বলেই বর্ত্তমান আছে। যে দ্রব্য কেন হউক না, এ আকর্ষণ না থাকিলে থাকিত না। ক্রমে যখন বড় হইবে এই আকর্ষণ শক্তির যে কত ক্ষমতা, ইহা দ্বারা যে পৃথিবীর কত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া অবাক্ হইবে। একটা ঢিল উপরে ছুড়িয়া দিলে, ছুড়িবার বল যতক্ষণ রহিল, উহা ততক্ষণ উর্দ্ধে উঠিল, তৎপরেই মাটীতে পড়িবে কেন? (সকলেঃ 'মাটী বুঝি উহাকে টানে?") ঠিক বলিয়াছ। এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড, ইহাতে অসংখ্য পরমাণু আছে, সুতরাং পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তাহাদের সকলের অপেক্ষা পৃথিবীর নিজের আকর্ষণ শক্তি বেশী। মনে কর তোমার দলে ১০ জন লোক, আমার দলে ১০০ জন, কিশোরীর দলে হাজার জন। তাহলে কার বেশী জোর হবে?

(সকলেঃ—"কিশোরীরই"। তেমনি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পরমাণু আছে বলিয়া অন্য সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষা ইহার টানিবার ক্ষমতা বেশী। এই জন্যই সব জিনিষ পৃথিবীতে আছে, এজন্যই ফলগুলি পাকিলে মাটীতে পড়িয়া যায়। এজন্যই লৌহের দ্রব্য ভারী বোধ হয়, কেন না তাহাকে হাতে লইলেই পৃথিবী টানিতে থাকে, সেই টান ভার বলিয়া বোধ হয়। বুঝিলে?

কিশোঃ—যেমন একটা জিনিষের একদিকে আমি আর একদিকে আর কেহ টানিলে আমার হাতে জোর লাগে, ঠিক তেম্নি, আমি ধরিয়া আছি পৃথিবী নীচে হইতে টানিতেছে এজন্য ভারী হয়, এই ত?

নবীনবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হাঁ ঠিক বুঝিয়াছ, তাই বটে। শুধু লৌহের দ্রব্য কেন, পৃথিবীতে যত বস্তু আছে সমস্তই এই আকর্ষণের বশ। ইহাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কহে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বস্তুর নিজের পরমাণুগুলির যে পরস্পর আকর্ষণ আছে তাহার কাজ ঐ পরমাণুগুলিকে একত্র রাখিবার চেষ্টা করা। এই আকর্ষণকে আণবিক আকর্ষণ বলে। এটী থাকাতেই আমরা প্রত্যেক বস্তুর আকার দেখিতে পাই, নতুবা কেবল রাশি রাশি পরমাণু পৃথিবীময় ছড়ান দেখিতাম। সুন্দর বৃক্ষলতা, চমৎকার স্বর্ণালঙ্কার, পরম শোভাময় কাচের বাসন, বৃহৎ অট্টালিকা, প্রকাণ্ড পর্ব্বত, কোন বস্তুই থাকিত না। ঐ পরমাণুগুলিকে একত্র করিয়া রাখিবার ক্ষমতা মাধ্যাকর্ষণের নাই, ইহা বরং উহাদিগকে টানিয়া আলাদা করিতে চায়, কঠিন বস্তুর আণবিক আকর্ষণ অধিক বলিয়াই পারে না। এখন বেশ বুঝিলে প্রত্যেক পরমাণুর উপর দুইটী শক্তি কার্য্য করিতেছে; একটী তাহার নিকটবর্ত্তী পরমাণুগুলির সঙ্গে তাহাকে মিশাইতে চায়, আর একটী তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে ভিন্ন করিয়া পৃথিবীর দিকে ফেলিয়া দিতে চায়। এখন সহজেই বুঝিতে পারিবে, যে শক্তিটী অধিক বলবান হইবে তাহারই দিকে সেই পরমাণুটী যাইবে। যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বল আণবিক আকর্ষণ অপেক্ষা অধিক না হয় তাহা হইলে পৃথিবী আর তাহাকে ভিন্ন করিতে পারিল না; কেমন? (সকলে "হাঁ তাত হবেই।") সুতরাং তাহার যেমন আকার তেমনি থাকিয়া গেল। এইরূপ পদার্থকেই 'কঠিন' বলে। আবার যে বস্তুতে আণবিক আকর্ষণ অপেক্ষা মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অধিক, সে বস্তুর পরমাণুদিগকে পৃথিবী টানিয়া আলাদা করিয়া ফেলে, সব পরমাণু গড়াইয়া, আল্‌গা হইয়া, মাটীতে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদিগকেই 'তরল' বা পাৎলা বলে। ইহাদের নিজেদের ভিতরে তেমন আঁট্ নাই, অথচ শত্রু পৃথিবী সর্ব্বদাই ইহাদিগকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কাজেই ইহারা আর ঠিক থাকিতে পারে না। এইরূপে আমরা বেশ বুঝিলাম, কি প্রকার বস্তু কঠিন ও কি প্রকার দ্রব্য তরল। যাহার আণবিক আকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের অপেক্ষা অধিক বলবান তাহার পরমাণুরা পৃথিবীকে যেন বলে 'তুমি টান না, তোমার চেয়ে আমাদের মিল বেশী, আমরা কখন আলাদা হব না।' এই সকল দ্রব্যই 'কঠিন' হয়। তাহাদের মধ্যে এমনি 'ভাব' যে পৃথিবীর মত প্রকাণ্ড জিনিষও তাহাদের মধ্যে 'আড়ী' করাইতে পারে না। (সকলে হাসিল ও বলিল "বেশ বুঝিয়াছি।") আর যে সকল জিনিষের পরমাণুদের আকর্ষণ অপেক্ষা পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি বেশী, পৃথিবী তাহাদিগকে বলে—'কেমন জব্দ, এখন আয়, সব ছাড়িয়া পড়্।' ইহারাই পাৎলা ইহাদের এইরূপ অসহায় অবস্থা বলিয়াই আমরা ঘটী, বাটী, হাঁড়ী, খোরা প্রভৃতি পাত্রে ইহাদিগকে রাখি, তাহা হইলে আর ইহারা ছড়াইতে পারে

না, কঠিন পদার্থের মত ইহাদিগকে রেকাবীতে কিম্বা টেবিলে রাখিবার যো নাই।

"কঠিন ও তরল দুই প্রকার দ্রব্য কি রূপে হয় তাহা বুঝিলে; এই বার বাষ্পীয় দ্রব্যের কারণ বলিব শ্রবণ কর। বাষ্পীয় পদার্থেরও পরমাণুকে পৃথিবী আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহাদের আর একটী গুণ আছে. তাহাদের পরমাণুগুলিতে আর একটী শক্তি কার্য্য করিতেছে, সে শক্তিটী বড় প্রবল। উহার বল এত অধিক যে আণবিক ও পৃথিবীর আকর্ষণ দুটী শক্তিও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। পৃথিবী সমস্ত বলে ইহাকে টানিতেছে তথাপি উহা মাটীতে কঠিন ও তরল দ্রব্যের মত পড়িয়া থাকে না। এই তৃতীয় শক্তির নাম—'আণবিক বিয়োজন'। ইহার কার্য্য কেবল প্রত্যেক পরমাণুকে অন্য সকল পরমাণু হইতে দূরে ব্যাপ্ত করা। ইহা যেন পরমাণুদের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্যই আছে। যাহাতে এক একটী অণু অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হয়, ইহাই এই বিয়োজন শক্তির উদ্দেশ্য। এই জন্যই, কি আণবিক আকর্ষণ, কি মাধ্যাকর্ষণ, ইহার কাছে কাহারও বল খাটে না। এজন্যই বায়ু, বাষ্প প্রভৃতি পদার্থ সকল স্বাধীনভাবে আকাশে বেড়ায়, কোন সীমাবদ্ধ পাত্রে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। বিস্তীর্ণ আকাশই ইহাদের গৃহ। পুষ্করিণী, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতি হইতে জল বাষ্প হইয়া এই নিমিত্তই আকাশে উঠে এবং সেখানে মেঘরূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করে।

"এখন বোধ করি বুঝিলে কি প্রকারে পরমাণু গুলির অবস্থাভেদে পদার্থ সকল কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় তিন প্রকারে বিভক্ত। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই এই তিন অবস্থার একটী না একটীতে দেখা যায়। হয় কঠিন, না হয় পাৎলা, নয়ত বাষ্পীয়। এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া আজ বাড়ী যাইব। কঠিন দ্রব্যও তরল করা যায় ও বাষ্পীয় করা যাইতে পারে। তরল বা বাষ্পীয় দ্রব্যকেও কঠিন করা যায়।" অমূল্যঃ—"কেন যাবে না? বাতী, গালা প্রভৃতি কত কঠিন পদার্থ আগুণে দিলেই গলিয়া পাৎলা হয়। আবার দুধ, মালাই, লেবুর রস প্রভৃতি সব ঠাণ্ডা করিয়া কুল্পী তৈয়ার করে, তখন ঐ পাৎলা জিনিষগুলি ত জমিয়া কঠিন হয়।" বিনয়ঃ—"আর বরফ? বরফ ত জল জমিয়াই হয়।"

নবীন বাবু বড় সুখী হইয়া বলিলেন "ঠিক। উত্তাপদ্বারা কঠিন দ্রব্য তরল হয়, এবং তরল দ্রব্য বাষ্পীয় হয়। তোমরা সকলে জান স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আগুনে দিলেই গলিয়া যায়। আরও জান রৌদ্রে জল গরম হইয়া বাষ্প হয়, ও কড়ায় দুধ জ্বাল দিবার সময়ে কড়া হইতে বাষ্প উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উত্তাপ তরল বস্তুকে বাষ্পীয় করে ও কঠিন দ্রব্যকে তরল করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে—উত্তাপের একটী বিশেষ গুণ—উহা দ্রব্য মাত্রেরই আণবিক আকর্ষণ হ্রাস করিতে থাকে, সুতরাং অল্পক্ষণ মধ্যেই কঠিন স্বর্ণ রৌপ্যাদি পদার্থ উত্তপ্ত হইলে প্রথমে কোমল ও পরে তরল হয়। আরও উত্তাপ দিলে অবশেষে উহাদের আণবিক আকর্ষণ একবারে বিনষ্ট হয়, এবং বিয়োজন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে বাষ্প করিয়া দেয়। উত্তপ্ত হইলে এইরূপ যেমন পরমাণুর আকর্ষণ হ্রাস হয়, শীতল হইলে তদ্রূপ উহা বর্দ্ধিত হয়, এবং তজ্জন্য শীতে বাষ্প ঘন হইয়া তরল হয় এবং আরও শৈত্য পাইলেই তরল পদার্থ সকল জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। এই কারণেই জলের বাষ্প জমিয়া জল হয়, এইজন্য শ্লেটে হাই দিলে মুখের জলীয় বাষ্প সকল প্রশ্বাসের সঙ্গে আসিয়া শীতল শ্লেটে লাগিয়া জমিয়া যায় ও জলকণারূপে দেখা যায়। এই জন্যই একটা গ্লাস বরফ রাখিলে, ঐ ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে লাগিয়া বায়ুর অদৃশ্য জলীয় বাষ্প সকল জমিয়া যায় ও গ্লাস

ঘামে বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই আবার দুধ, মালাই, লেবুরস, আনারসের জল প্রভৃতি তরল পদার্থ সকল বরফের মধ্যে রাখিয়া জমাইয়া বরফ করে ও কুল্পী করিয়া ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করে। এই জন্যই বৃষ্টির ফোঁটা জমিয়া গিয়া শিলাবৃষ্টি হয়। এই জন্য শীত-প্রধান দেশে জল জমিয়া বরফাকারে কঠিন হয়।"

কিশোরী:—শক্ত নরম জিনিষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আজ আমরা কত নূতন কথা শিখিলাম। পরমাণু, আণবিক আকর্ষণ, আণবিক বিয়োজন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ—কত শিখিলাম। দেখ ভাই, যখন 'সখাতে' এ বিষয় লেখা হবে তখন এই সকল কথা আবার অনেক বার পড়িব, না হইলে মনে থাকিবে না, আর এ শিক্ষার কোন ফলই হইবে না।" তৎপরে হৃষ্টমনে সকলে বাড়ী গেলেন।

খোলা ভাঁটীর ফল।

(১ নং)

রাধালতার দুঃখের কথা।

আজ কাল আমাদের দেশে সকল স্থানেই মদের দোকান হইয়াছে, এই সকল দোকানে মদ প্রস্তুত হয় বলিয়া দোকানদার বেশ অল্প মূল্যে মদ বিক্রয় করিতে পারে। আগে মদের দাম অধিক ছিল,এই জন্য টাকা না থাকিলে যে সে মদ খাইতে পাইত না, কিন্তু এখন সস্তা হইয়া অনেক গরিব দুঃখী লোকও মদ খাইতে শিখিতেছে। নিজের পরিবারের ছেলেদের হয়ত মুখের খাবার নাই, পরিবার কাপড় নাই, অথচ বাড়ীর কর্ত্তা ঘটী, বাটি বেচিয়া মাতাল হইতেছে, এবং বাড়ীতে সকলের উপরে উৎপাত করিতেছে। আজ কাল এইরূপ যে কত স্থানে হইতেছে তাহার খোঁজ নাই। আমরা এইরূপ একটী পরিবারের দুঃখের কথা বলিব।

রামগোবিন্দ যে গ্রামে বাস করে, সেখানকার পাল্‌কী বেহারাদিগকে 'কাহার' বলে। রামগোবিন্দ এই 'কাহার'এর কাজ করিত। তাহার শরীর বেশ মোটা সোটা; গায়ে বেশ বল, পাল্‌কী বইতে তাহার মতন মজবুত আর কে ছিল? কিন্তু দেশে মদের দোকান বসিয়া মদ সস্তা হইয়া গেল; তখন কি "ভদ্দরলোকের খাবার" না খাইয়া গরিব কাহারের ছেলে থাকিতে পারে? রামগোবিন্দ মদ ধরিল;—কি সর্ব্বনাশ! এক দিন খাইয়া আর একদিন খাইতে ইচ্ছা হইল, তার পর আর এক দিন, তার পর আর একদিন, এই রূপে রামগোবিন্দ ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিল। তাহার স্ত্রী একটী ছোট মেয়েকে লইয়া পাড়ায় ঘুরিয়া কখনও চা'ল, কখনও ডা'ল ভিক্ষা করিয়া আনিত, এবং নিজেদের বাড়ীর পাশের জঙ্গল হইতে শাকটা, পাতাটা, কুড়াইয়া আনিয়া তাহার দ্বারাই কোনমতে বাঁচিয়া থাকিত। অবশেষে মনের দুঃখে, ক্ষুধার জ্বালায়, ব্যামোয় পড়ে, সতী সাধ্বী মরিয়া গেল। একদিন রামগোবিন্দ টলিতে টলিতে ঘরে আসিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে; তখন সে তথা হইতে চলিয়া গেল। রাধালতা তখন ৯ বৎসরের বালিকা। সে নিরুপায় দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রতিবেশীরা আসিয়া দেখিলেন—মায়ের মৃত শরীরের পাশে পড়িয়া রাধালতা ফুপিয়া কাঁদিতেছে। তখন তাঁহারা দয়া করিয়া রাধার মায়ের শরীর শ্মশানে লইয়া গেলেন—শরীর পুড়িয়া গেল। যাক্; চিরকাল জ্বলে পুড়ে মরা অপেক্ষা একেবারে পোড়া ভাল নয় কি?

অনেকে ভাবিয়াছিল স্ত্রীর মৃত্যুতে মাতাল ভাল হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। নেশা ছুটিয়া গেলে রামগোবিন্দ একটু নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল

"রাধা! তুই রান্না বান্না কর্, আমি একবার বেড়িয়ে আসি। আজ থেকে তোকেই সমস্ত কর্‌তে হবে—আর কে কর্‌বে?" এই কথা শুনিয়া রাধা কাঁদিয়া উঠিল, এবং আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কি রাঁধিবে তাহার উদ্যোগ দেখিতে গেল;—রামগোবিন্দ ও একটুখানি 'টানিতে" গেল।

প্রায় আড়াই বৎসর এই ভাবে কাটিল; রাধার বয়স এখন ১১ বৎসরের কিছু অধিক। এত দিন মাতাল রাধাকে কিছুই বলে নাই, কিন্তু এখন বড়ই উৎপাত করিতে লাগিল। নিজে পয়সা দিবে না, ঘটী বাটি সমস্তই, হয় বিক্রয় হইয়াছে, না হয় বাঁধা আছে, অথচ বাড়ীতে আসিয়া খাবার না পাইলে রক্ষা ছিল না। বেচারা রাধা ছেলেমানুষ, এত কষ্ট সহ করিতে পারিবে কেন?

শীতকাল, তাহাতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে; পৃথিবীর যত শীত, আজ যেন সমস্তই রাধার ঘরে আসিয়া যুঠিয়াছে। ঘরটীকে ঘর না বলিয়া 'গোয়াল' বলিলেও হয়, চারিদিকে খড় উড়িয়া গিয়াছে, মেটে দেয়াল হাজার ছিদ্রে পূর্ণ, মেজেয় ধুলো উড়িতেছে, এইত দশা; তাহাতে আবার গায়ে মোটা কাপড় ছিল না, কেবল আঁচলটী জড়াইয়া কোন মতে বালিকা শীত বারণ করিতেছিল। ও পাড়ার জগ'পিশী খানকতক কাঠ দিয়াছিলেন, তাহাতে আগুন ধরাইয়া রাধা একটু ছোট আগুন তোয়ের করিয়া শীত থামাইতে লাগিল এবং কখন্ বাবা বাড়ীতে আসিবেন, তাহার ভাবনা ভাবিতে লাগিল। ঘরে একটুখানি বাতি ছিল; রাত্রি হইয়াছে দেখিয়াও রাধা তাহা জ্বালিল না, কারণ ফুরাইয়া গেলে আর কে দিবে? একটী মাদুরের উপর পড়িয়া রাধা নানা রকম দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সে দিন রাধার খাওয়া হয় নাই,—কে দিবে? রাধা গরিবের মেয়ে, কিন্তু কখনও ভিক্ষা করিতে তাহার ইচ্ছা হইত না। এত ক্ষুধায় বালিকার নিদ্রা আসিল? আশ্চর্য্য! কিন্তু ঘুমাইয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারে নাই, কি একটী শব্দে রাধালতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

রামগোবিন্দ ঘরে আসিতেছে, এ তাহারি শব্দ। হুড়্ মুড়্ শব্দে দরজা ভাঙ্গিয়া রামগোবিন্দ ঘরে ঢুকিল এবং অন্ধকারে 'রাধা' 'রাধা' করিয়া ডাকিতে লাগিল। রাধা বলিল 'বাবা! এসেছ? কি চাও?"—মাতাল আলো জ্বালিয়া খাবার দিতে বলিল। রাধালতা সেই পুঁজিকরা বাতিটুকু ধরাইয়া আলো জ্বালিল বটে, কিন্তু খাবার কোথায় পাইবে? বলিল "বাবা! আজ আর কিছুই নাই—আমি নিজেও কিছুই খাই নাই।" মাতাল ভয়ানক রাগিয়া বলিল "ভিক্ষা ক'রে, না হয় চুরী ক'রে আন্‌তে পারিস্ নি?" বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল, মাতাল বাধা দিয়া বলিল "মুখে মুখে উত্তর?" এই বলিয়া বালিকার কোমল শরীরে যে কি ভয়ানক প্রহার করিল, তাহা মনে করিতেও কান্না পায়। প্রহারের জ্বালায় অস্থির হইয়া বালিকা পিতার হাত ছাড়াইয়া ঘরের বাহিরে গেল, এবং "ওমাগো" "ওমাগো" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে লাগিল।—টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে হাড়ভাঙ্গা শীত। হায়! হায়! মদে কি সর্ব্বনাশ করিল? কেন রামগোবিন্দ মদ ধরিয়াছিল? বালিকা সেই রাত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাড়ীর বারান্দার নীচে দাঁড়াইল, ক্রমে বসিয়া পড়িল, ক্রমে অজ্ঞান হইয়া গেল।

কোন্ দিক দিয়া রাত্রি চলিয়া গেল, রাধা তাহা জানিল না; আবার সূর্য্য উঠিল, পাখীগুলি আবার মনের আনন্দে গান গাহিল, তাহারা দুঃখিনী বালিকার দুঃখ বুঝিল না। রাধালতা চেতনা পাইয়া খানিক দূরে রোদ্ পোহাইতে বসিল; তাও কি বেচারা ক্ষুধার জ্বালায় বসিতে পারে?—সে বসিয়া "ওমাগো! ক্ষুধায় প্রাণ গেল! পরমেশ্বর!" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাধার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে; যদি সে পরমেশ্বরকে ডাকিতে জানিত, তাহা হইলে বোধ হয় এই বলিয়া ডাকিত—"দীনবন্ধু! তুমি না কাঙ্গালকে ভালবাস? কাঙ্গাল কার কাছে যাবে? তুমি না রাখলে কোথায় যাবে?" ক্রমে রাস্তা দিয়া দুই চারি জন লোক চলিতে লাগিল; রাধা আর সহ্য করিতে না পারিয়া ভিক্ষা চাহিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কে তাহাকে ভিক্ষা দেয়—কেহই দিল না।

অতি দুঃখে মানুষ চেঁচিয়ে কাঁদিতে পারে না রাধারও তাহাই হইল। সে দুটী হাতে মুখ লুকাইয়া ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর সুবালা সেইখানে আসিল। সুবালা বড় ভাল মেয়ে,—কাহারও সহিত 'ঝগড়াঝাটী' নাই, মুখপোরা হাসি, কথাগুলি বড়ই মিষ্ট, যে শোনে তাহারই মন মোহিত হয়। একটী জিনিশ সুবালা বড়ই ভালবসিত—সেটি খেলা; কিন্তু পুতুলের কাছে খেলাও কিছুই নয়। এই পুতুল কিনিবার জন্য সুবালা একটী সিকি লইয়া পাড়ার পাশে খেলনাদোকানে যাইতেছিল, এমন সময় দেখিল যে তাহারই মত একটী ছোট মেয়ে ভয়ানক কাঁদিতেছে। তখন সুবালার বড় দুঃখ হইল—সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাগা, তুমি কেন কাঁদ্‌ছ? বল না? আমায় বলনা?"—রাধা নিজের দুঃখের কথাগুলি সমস্ত বলিল। আহা! দয়া যেখানে থাকে, সেখানে বুঝি ছোট বড় থাকে না? বড় লোকের মেয়ে সুবালা গরিবের ঘরের রাধার দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিল। ভগ্নী যেমন ভগ্নীর দুঃখে কাঁদে, এ সেইরূপ কান্না; পরে কিছু শান্ত হইয়া বলিল—"তুমি কাল থেকে কিছু খাওনা; এই সিকিটা লইয়া খাবার খাও।" ওইযা! সুবালা পুতুল কিনিবার সিকিটা দিয়া ফেলিল? এত সাধের পুতুল কেনা হবে না? সুবালা সে কথা ভাবিল না—সিকিটী ফেলিয়াই দৌড়িয়া মায়ের কাছে গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিল। মা বড়ই খুশী হইয়া সুবালার মুখচুম্বন করিলেন, এবং তাহার সহিত আসিয়া দেখিলেন, রাধা শীতে কাঁপিতেছে, উঠিয়া খাবার আনিতে যাইবে এমন সাধ্য নাই। সুবালার মা তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া আপনার ঘরে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে আগুন জ্বালিয়া, তাহাকে কিছু গরম করিয়া, গরমজলে স্নান করাইয়া দিলেন। সুবালার আহ্লাদ দেখে কে? তাহার খেলিবার একটী সঙ্গী যুটিল। এখানে থাকিয়া গরিবের মেয়ে রাধা ঘরের কাজকর্ম্ম করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিল, এবং তাহার দ্বারা পিতার খরচ চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহার বাপ যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার অত্যাচারে রাধা বাড়ী ছাড়িয়াছে, তখন কোথায় তাহার মনে কষ্ট হইয়া মদ ছাড়িয়া দিবে, তাহা না হইয়া সে আগের মতই রহিল। অবশেষে একবার চুরী করিয়া সে জেলে গেল, এবং সেইখানেই ভয়ানক পরিশ্রমে ব্যারাম হইয়া তাহার মৃত্যু হইল। রাধার কানে এই সম্বাদ গেলে সে অনেকদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে শান্ত হইল। এমন বাপের এমন মেয়ে? বাপ চিরকাল অত্যাচার করিলেন, মেয়ে চিরকালই ভাল বাসিল। কিসে এ তফাৎ? উত্তর—রামগোবিন্দ মাতাল, রাধা মদ স্পর্শও করিত না। মদে এত সর্ব্বনাশ করে? তবুও লোকে মদ খায়।

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্ সাহেব।

তোমরা সকলেই বোধ হয় ইচ্ছা কর, বড় লোক হই; এমন কেউ আছেন কি না জানি না, যিনি বড় লোক হইতে চান না। মনের কথা বলিতে কি, আমারত বড়ই ইচ্ছা করে; আমি যখন কোন বড় লোকের

জীবনচরিত পড়ি, বা কোন বড় লোকের গল্প শুনি, তখন আমার বড়ই চোখ টাটায়, 'আমার কিছুই হইল না, আমি বড় লোক হইতে পারিলাম না, আমি ইহাঁর মত ভাল লোক হইতে পারিলাম না,' এইরূপ অনেক কথা আমার মনে হয়। দুঃখ হয় বটে, কিন্তু তবুও বড় লোকের কথা শুনিতে ইচ্ছা করে, কারণ বড় লোকের কথা শুনিতে শুনিতে বড় লোক হইতে ইচ্ছা হয়। আমি টাকার বড় লোক হইতে চাই না, কারণ টাকা থাকিলেই মানুষ সুখী হয় না—এমন কত লোক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য টাকা কড়ি উপার্জ্জন করা ছাড়িয়া দিয়া গরিব হইয়াছেন,—কিন্তু যে কাজ করিলে মানুষ হওয়া যায়, যেরূপ চরিত্র থাকিলে পাপের দিক হইতে মন ফিরিয়া গিয়া ভাল কাজে বসিয়া যায়, আমার বড়ই ইচ্ছা করে আমার কপালে সেইরূপ হয়।

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন সাহেবের বাড়ী ইংলণ্ডের উত্তরে ছিল। পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়া তিনি ছেলে বেলা স্কুলে পড়িতে পান নাই। কিন্তু অনেক ছেলে যেমন স্কুলে যাইতে না পাইয়া বাঁদর হইয়া যায়, বাপ মায়ের গুণে ডেভিড্ লিভিংষ্টোনের সেরূপ দোষ হয় নাই। বাপ মা যদি ভাল হন, এবং ছেলেদিগকে ভাল উপদেশ দেন, তাহা হইলে ছেলেরাও যে ভাল হয়, তাহার দৃষ্টান্ত এই সাহেব দেখাইয়াছেন। ছেলে বেলা একটী কলে কাজ করিয়া তিনি কিছু কিছু পয়সা পাইতেন, তাহার দ্বারাই দুই এক খানি করিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যত্ন থাকিলে কি না হয়? লিভিংষ্টোন সাহেব দিনে কাজ কর্ম্ম করিয়া রাত্রিতে একটী বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিলেন—কারণ রাত্রিতে যে সকল বিদ্যালয় হয়, তাহা গরিবের ছেলের জন্য এবং তাহাতে বেতন লাগে না। এইরূপ নিজের পরিশ্রমের গুণে তিনি বেশ সুন্দররূপ লেখা পড়া শিখিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল দেশে দেশে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইবেন; এই জন্য তিনি সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি ভাল করিয়া পড়িলেন, এবং ডাক্তারী শিখিয়া বিলাত হইতে বিদেশে যাত্রা করিলেন। যেখানে ইহার পূর্ব্বে সাহেবেরা কেহ কখনও যান নাই লিভিংষ্টোন সাহেব সেই আফ্রিকার মধ্যদেশে গেলেন। দুই চারি বৎসর নয়, ক্রমাগত ষোল বৎসর কাল আশ্চর্য্য সাহসের সঙ্গে বেড়াইলেন এবং লোকের নানারূপ উন্নতির সুবিধা তিনি সেই দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধ[illegible]র সুবিধা করিয়া দিলেন। এই ষোল বৎসর কাল তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা এই মহাত্মার প্রণীত "মিশনারী ট্রাভেল্‌স্" নামক সুন্দর পুস্তক খানি পড়িয়া দেখিবেন। এইরূপে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে লিভিংষ্টোন সাহেব একবার সিংহের হাতে পড়েন; যদিও সিংহ তাঁহাকে একটু 'চেখে' দেখিয়াছিল এবং যদিও সেই 'চাখার' জন্য তাঁহার একটা হাতের হাড় একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সুখের বিষয় এই যে তিনি প্রাণে মরেন নাই। কেবল ইহাই নহে, একবার তিনি মহাদেবের মত ষাঁড়ে চড়িয়া কোথায় যাইতে ছিলেন কি কারণে জানি না, ষাঁড় ভয় পাইয়া ভয়ানক ছুটিল; সাহেবের প্রাণ আর একটু হইলেই গিয়াছিল, কিন্তু একটা গাছতলা দিয়া ষাঁড় যেমন যাইতেছিল, অমনি সাহেব গাছের ডাল ধরিয়া ফেলিলেন; ষাঁড় মহাশয় সাহেবকে সেইরূপে ঝুলাইয়া রাখিয়াই দৌড়! তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া দেখে তিনি ঝুলিয়া আছেন!!

এইরূপ কত বিপদাপদ সহ্য করিয়াও সাহেব ধর্ম্ম প্রচারে ক্ষান্ত হন নাই,—কত নূতন স্থানে গেলেন, কত নূতন লোককে শিক্ষা দিলেন, কত নদীর উৎপত্তি স্থান বাহির করিলেন, নূতন নূতন হ্রদ বাহির করিয়া লোককে জানাইলেন। তাঁহার

স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন—যেমন স্বামী, স্ত্রীও তেমনি। স্ত্রীটী একজন বড় ধর্ম্ম-প্রচারকের মেয়ে; পিতার কাছে শিখিয়া ধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে বেশ জানিতেন, কাজেই স্বামীর সাহায্য করা ভিন্ন একদিনের জন্য ব্যাঘাত করেন নাই। আমাদের দেশের বালিকাদিগের এই কথা স্মরণ রাখা উচিত।

অবশেষে একবার একটী নূতন দেশে যাইতে, পথের কষ্টে তাঁহার প্রাণ গেল! আহা! ধর্ম্মের জন্য, সৎকার্য্যের জন্য প্রাণ গেল! লিভিংষ্টোন সাহেব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন অসভ্যদিগের দেশে বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া একাকী বেড়াইলে এক-দিন তাঁহার প্রাণ যাইতে পারে, কিন্তু তবু তিনি

ঘুরিয়া বেড়াইতে ছাড়েন নাই। কি সাহস! আমরা কবে সকলেই এইরূপ ভাল কাজ করিতে সাহসী হইব! এখন যে আমরা কোন একটা কাজকে ভাল জানিয়াও, পাছে কেউ নিন্দা করে, কি শাস্তি দেয়, এই ভয়ে সে কাজ করিতে সাহস পাইনা, কবে আমাদের এ ভাব যাইবে! যে মহাত্মার ছবি আমরা দিলাম, তাঁহার মতন হইতে আমরা কবে চেষ্টা করিব!

একটী অন্ধ সীলের* কথা।

সে প্রায় চল্লিশ বছরের কথা। ক্লু উপসাগরে একটী সীলের ছানা ধরা পড়ে। সমুদ্রের ধারেই একটী ভদ্রলোক থাকিতেন, তিনি তাকে তাঁর রান্নাঘরে রাখিয়া পুষিতে লাগিলেন। সে খুব বাড়িতে লাগিল; চাকরদের সঙ্গে তাহার খুব ভাব, বাড়ীর এবং বাড়ীর লোকের প্রতি বেশ মমতা। স্বভাবটী অতি মৃদু, কারু কিছু ক্ষতি করেনা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে, আর কর্ত্তার ডাক শুনলেই কাছে হাজির হয়। তার প্রভুভক্তির কথা বলিতে হইলে বুড়ো বলিতেন "যেমন কুকুরটী;" আর আমোদ তামাসার কথা বলিতে হইলে বলিতেন "যেমন বিড়াল ছানাটী।"

সীলটী রোজ মাছ ধরিতে যাইত, আর নিজের যোগাড় হইলে পর প্রায়ই কর্ত্তার জন্য দু একটী মাছ আনিত। গ্রীষ্মের সময় রৌদ্রে বসিয়া থাকিত আর শীতের সময় ঘরের আগুনের এক পাশে একটা যায়গা পাইলে বড় খুসী হইত। আর হুকুম পাইলে তুন্দুরটার† ভিতর যাইয়া বাসা লইত।

বার বছর এইরূপে সীলটীকে পোষা হইল। এরপর একবার কর্ত্তার "গোয়ালে" এক প্রকার রোগ দেখা দিল। কতকগুলি পশু মরিয়া গেল; অন্যান্য পশুদের রোগে ধরিল। অন্য লোকের গরু স্থান পরিবর্ত্তনে ভাল হয়; কিন্তু কর্ত্তার গরুর তাহা হইল না। কর্ত্তা একটী স্ত্রী-ওঝার নিকট পরামর্শ লইলেন। সে বলিল "ওগো! তুমি ওটা কি ধরে এনেছ, তাতেই তোমার গরু মরে যায়। ওটাকে তাড়িয়ে দাও নৈলে আমার ওষুদেও ধরবে না, রোগও সারবে না!" সুতরাং সীলটীকে একটী নৌকায় তুলিয়া অনেক দূরে গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেখানে তার যা খুসী তাই করুক। নৌকা ফিরিয়া আসিল; বাড়ীর সকলে ঘুমাইল। সকালে একটী চাকরাণী আসিয়া কর্ত্তাকে খবর দিল "সীল তুন্দুরের ভিতরে শুয়ে আছে।" বাড়ীর মায়ায় বেচারা রাত্রি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। একটী জানালা খোলা পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহার যায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে।

পরদিন আর একটী গরুর ব্যারাম হইল। সীলটাকে আর রাখা হইল না। অনেক দূর হইতে জেলে-নৌকা মাছ লইয়া আসিয়াছিল, তাহার মাঝি ২।৩ দিনের পথ লইয়া গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার পাইল। তাহাই করা হইল। একদিন এক রাত্রি গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় চাকর আগুন উস্কিয়া দিতেছিল, এমন সময় দরজার কাছে খট্ মট্ শব্দ হইল। চাকর মনে করিল কুকুরটা বুঝি; অমনি দরজা খুলিয়া দিল—আর থপ্ থপ্ করিয়া সীলটা ঘরে আসিল। অনেক পথ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া বাড়ী আসিয়াছে, তাই এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিয়া মনের সন্তোষ জানাইল, তারপর হাত পা ছড়াইয়া আগুনের কাছে সুখে নিদ্রা গেল।

এই অমঙ্গলের খবর কর্ত্তার কাণে গেল। কর্ত্তা বিপদ ভাবিয়া 'জান'কে জাগাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। জান বলিল "সীল মারলে অশুভ হয়, তবে চোখ দুটো খুঁড়ে ফের সমুদ্রে ফেলে দিয়ে

* প্রাণীবৃত্তান্তে সীলের বাঙ্গালা মকর লেখা হইয়াছে, আমাদের বড় ভাল না লাগাতে, আমরা 'সীল'ই রাখিলাম।

† রুটী প্রস্তুত করিবার বড় উনুনকে 'তুন্দুর' বলে।

এস।" কর্ত্তার বুদ্ধি চড়ায় ঠেকিয়াছে, কর্ত্তা তাহাতেই রাজি। নিষ্ঠুরেরা সেই নির্দ্দোষ বেচারার চক্ষু ছুটী নষ্ট করিয়া ফেলিল। পরদিন সকালে বেচারা যাতনায় ছট্ ফট্ করিতেছে এরূপ অবস্থায় তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এক সপ্তাহ কাল গেল। কর্ত্তার অমঙ্গল যেন যো পাইল। গরু ক্রমাগত মরিতে লাগিল। শেষটা ওঝা আসিয়া বলিলেন "ওগো আমি আর পারিনে। তোমায় বড় ভূতে পেয়েছে; আমার আর সাধ্যি নেই।"

আটদিনের দিন ভয়ানক তুফান হইল। মাঝে মাঝে বিরামের সময় দরজার নিকট কান্নার শব্দের মত শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সকালে দরজা খোলা হইল। সিঁড়ির উপর সীলটী মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

শরদের নিশি।

১

কাননে ফুটেছে ফুল,
গগনে ফুটেছে তারা,
শরদের নিশি খানি,
হাসিতেছে মুখভরা।

২

বিমল চাঁদিমা খানি
সুনীল গগন-কোলে,
হাসিতেছে ভাসিতেছে
ডুবিছে মেঘের কোলে।

৩

ঝক্ মক্ করিতেছে
যেন রজতের থালা,
মেঘে ডুবি খেলিতেছে
কত লুকোচুরী খেলা!

৪

ধবল আলোক তার
পড়েছে গঙ্গার গায়;—
ঝিকি মিকি করিতেছে
মরিকি শোভিছে হায়!

৫

ঝপা ঝপ্ দাঁড় বেয়ে
তরণী দিয়েছে সারি,
দাঁড়ি মাঝি মন খুলে
গাইছে সুখের শারি।

৬

কাঁপিছে গাছের পাতা
মৃদুল পবন বায়,
আহা কি শীতল বায়ু
শরীর জুড়ায়ে যায়।

৭

যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সকলি ধবল ময়,
ধবল তুষারে বিশ্ব
নিরমিত মনে হয়।

৮

সাধ হয় মনে মনে
বিষম দাসত্ব ফেলে,
আজীবন শুয়ে থাকি
এ হেন নিশির কোলে।

৯

টুপ টাপ্ পড়িতেছে
বকুলের ফুল গুলি;
প্রভাতে গাঁথিব মালা
ভাই বোন্ দোঁহে মিলি।

১০

এ হেন সুখের নিশি,
হেরিনু কৃপায় যাঁর,
আয় বোন্ করযোড়ে
প্রণমি চরণে তাঁর।

সর্ব্বোত্তম ছাত্রী।

সাবিত্রী দেবী নাম্নী একটী ভদ্র স্ত্রীলোক কালীঘাটের নিকটে কোন এক স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছোট ছেলে মেয়েদিগকে পড়াইতে কত পরিশ্রম হয়, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু তিনি বালকবালিকাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া তাঁহার এ কাজে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই। এক দিন রাত্রিতে তিনি কর্ম্মস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে স্কুলের নিকটে তাঁহার জন্য একটী ছোট বাড়ী ঠিক করা হইয়াছে। সাবিত্রী দেবী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক প্রফুল্লমুখে তাঁহার জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"আসুন, নমস্কার। স্কুলের অধ্যক্ষ আপনার সুবিধার জন্য সব প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলেছিলেন। আমার বোধ হয়, সব ঠিক হয়েছে। আমার স্বামী কর্ম্মস্থান হইতে বাড়ীতে আসিলে, আপনার জিনিষ সব উপরে তুলিয়া দিয়া আসিবেন।"—নূতন শিক্ষয়িত্রী অল্প হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। এ বাড়ীটী বেশ;—তার মধ্যে এই ঘরটী সকলের চেয়ে ভাল।" প্রতিবেশিনী উত্তর করিলেন,—"এ বাড়ীটী বেশ। এইটী বসবার ঘর, ঐটী রান্নাঘর, আর উপরে দুটী শোবার ঘর আছে। সকলেরই পক্ষে বাড়ীটী সুবিধাজনক, কেবল মহামায়াদেবীর আর মন উঠ্‌লো না।"

সাবিত্রী। তিনি বুঝি আগে এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন?

"হাঁ! কিন্তু তিনি পল্লীগ্রামে থাকার উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা কর্‌তেন মেয়েরা খুব বেশী বেশী শিখে যাক্, কিন্তু তাঁহার মনের মতন না হইলে ভয়ানক বকিতেন। আপনার চেহারা দেখে বোধ হয় আপনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেশ মিশে চল্‌তে পারবেন। তা, আমি এখন যাই, আমার স্বামীর আস্‌বার সময় হ'ল। আমাদের বাড়ী ওই দেখা যায়। যদি কোন কিছু দরকার হয়, তবে 'শোভার মা' 'শোভার মা' বলে ডাক্‌লেই আস্‌ব; আর আমার শোভনা আপনার অনেক কাজ করে দেবে।"—এই কথা বলিয়া শোভার মা চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে সাবিত্রী দেবী মনের আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া আহার করিতে বসিলেন। বিদেশে গিয়া কোথায় থাকিব, কেহ ভালবাসিবে কি না, বন্ধুবান্ধব যুটিবে কি না, আগে এই সকল ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন তাঁহার আশা হইল শোভার মায়ের মত যত্ন যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর কিছুই কষ্ট বোধ হইবে না। সাবিত্রীদেবী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় কে দরজার কড়া নাড়িল। তিনি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন এবং দেখিলেন যে একটী ছোট মেয়ে একটী মাছ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েটী বলিল, 'মা আপনাকে এই মাছ দিয়াছেন।"

শিক্ষয়িত্রী। কেন? এত কষ্ট ক'রে তোমার মা না পাঠালেও পার্‌তেন ত? তোমার নাম কি?

বালিকা উত্তর করিল "আমার নাম শোভনা।"

শিক্ষয়িত্রী। ওঃ, তুমি তাঁর মেয়ে। এস বাছা এস। তোমাদের স্কুলের যত খবর জান, আমায় বলত।

শোভনা স্কুলের বিষয় যাহা জানিত সমস্তই বলিল;—মনোরমা বসু সব চাইতে ভাল মেয়ে, সুনীতি দেবী পড়া না পারাতে রোজ কোণে দাঁড়ায়; সরলতার বড় লজ্জা, কথা বল্‌তে মুখ লাল হ'য়ে উঠে, মাটী থেকে চক্ষু তোলে না; স্কুলের অধ্যক্ষ বুড়ো মানুষ, তিনি প্রায় রোজই

স্কুলে আসেন, মেয়েদের বড় ভালবাসেন—এ সকল কথাই বলিল। অবশেষে সাবিত্রীদেবীর কাজের কিছু কিছু সাহায্য করিয়া বাড়ী যাইবার সময়, তাঁহার প্রদত্ত একখানি সুন্দর ছবির বই লইয়া গেল। শোভনা বাড়ীতে গিয়াই মাকে পুস্তক খানি দেখাইল। তাহার মা বলিলেন "বা! বা! দেখ দেখি কেমন ভালমানুষ! তোমাদের আগের শিক্ষয়িত্রী কি মেয়েদের এমন ভালবাসিতেন, না কাহাকেও এমন ছবির বই দিতেন? এবার তোমরা বড় ভাল শিক্ষিয়িত্রী পাইলে।" শোভনা কিছু বলিল না, কেবল মনে মনে ভাবিল "যাহাতে ইনি বিরক্ত না হন, এইরূপ ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিব।"

পরদিন সাবিত্রীদেবী স্কুলের কাজ আরম্ভ করিলেন। কে কি রকম মেয়ে তাহা চিনিয়া বাহির করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিল না। তিনি মনে বুঝিলেন শোভনাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছাত্রী। যদিও মনোরমার বেশ বুদ্ধি, কিন্তু সে ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে বড় চোখ রাঙ্গাইয়া কথা কয়। বুদ্ধি থাকিলেই ভাল হয় না—যে সৎ অথচ বুদ্ধিমতী সেই ভাল। শোভনা সর্ব্বদাই ছোট মেয়েদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, অথচ তাহার বেশ বুদ্ধি আছে, এই জন্য শোভনাকে নূতন শিক্ষয়িত্রীর বড়ই মনে ধরিয়াছিল।

কিছুদিন চলিয়া গেলে সাবিত্রীদেবী দেখিলেন যে, সমস্ত স্কুল একা চালান যায় না। তখন তিনি স্কুলের অধ্যক্ষকে বলিয়া স্থির করিলেন যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দুটী মেয়েকে ছোট ছোট মেয়েদের পড়াইবার কতক ভার দিবেন। ছোট মেয়েদিগকে ভালবাসে এবং তাহাদের সহিত আপনার লোকের মত মিশিতে পারে, এইরূপ কোন বালিকাকে বাছিবার পরামর্শ হইল।

তখন সাবিত্রীদেবী এক সপ্তাহকাল মেয়েদের বাড়ীতে ঘুরিয়া, কে কিরূপ ব্যবহার করে, কে কি করিতে ভালবাসে তাহার খোঁজ করিলেন এবং স্কুলের ব্যবহারের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিলেন।

একদিন মেয়েরা অঙ্ক কষিতেছিল, এমন সময় সাবিত্রীদেবী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি, ছোট মেয়েদের পড়াবার জন্য যে দুটী মেয়েকে পসন্দ করিবার ভার আমার উপরে ছিল, আমি তাহাদিগকে বাছিয়াছি; সে দুটী মেয়ে—শোভনা রায় ও সুকুমারী চট্টোপাধ্যায়।" এই কথা শুনিবামাত্র মনোরমা একেবারে চম্‌কিয়া গেল—"কি? আমার নাম হ'ল না?"—পাশের মেয়েটীর কাণে কাণে বলিল—"হ্যাঁ, আমার নাম হ'ল না; আমি মাকে বলে দিব।" এই কথা শুনিয়া আর একটী বালিকা চম্‌কিয়া গেল—সে শোভনা। কিন্তু তাহার চম্‌কিয়া উঠিবার অন্য কারণ। সে বলিল 'আমি তো বড় নই; আমি ভাল পার্‌ব না; অন্য বড় মেয়েরা এ বন্দোবস্ত বোধ হয় ভালবাসবেন না। শিক্ষয়িত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা কে ভাল, কে মন্দ, তাহা ঠিক করিবার ভার আমার উপর। তুমি বেশ লিখিতে পড়িতে পার, ছোট মেয়েরাও তোমাকে ভালবাসে, তুমি আমার বেশ সাহায্য করিতে পারিবে।"

"আচ্ছা আমি চেষ্টা করিব" এই বলিয়া শোভনা কতক আহ্লাদে, কতক ভয়ে বাড়ীতে গেল।

সাবিত্রীদেবী যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল। শোভনা যতদিন স্কুলে ছিল, সেই সকলের অপেক্ষা ভাল ছাত্রী ছিল, এবং ভবিষ্যতেও তাহার জীবন বাল্যকালের মত হইল। সৎচরিত্র এবং সুবুদ্ধি, এই দুই গুণ থাকিলেই বালকবালিকারা ভাল হইয়া থাকে।
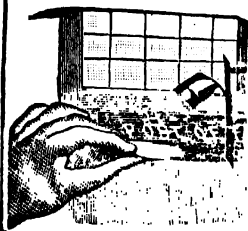
পত্র প্রেরক-দের প্রতি

শ্রীনলিনমোহন গোস্বামী, শ্রীরামপুর।—ছি! ছি! ছি! ফের ওরূপ ঠকাবার চেষ্টা করিলে অভিভাবককে জানাইব। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পদ্য কতটুকু এবং বালকের লেখা কতটুকু, তা কি বুঝা যায় না?

শ্রীঅ-না-ভা, কলিকাতা। নেশা হইতে বিরত করিবার জন্য যদি সভা করিয়া থাকেন, তবে তাহার বিশেষ বিবরণ আমাদিগকে পাঠান নাই কেন? এটী কি বালকদিগের না বয়ঃস্থদিগের সভা? একজন 'নস্যখোর' আপনাদের চেষ্টায় নস্য ত্যাগ করিয়াছেন, লিখিয়াছেন—ইহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। পদ্যটী ভাল হয় নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু, কলিকাতা।—কয়েক মাস পূর্ব্বে 'সখা'তে একটী সংবাদ প্রকাশিত হয়, যে একটী ধূমপান নিবারিণী সভা শীঘ্র স্থাপিত হইতে পারে। এই কথার উল্লেখ করিয়া আমাদের পত্রপ্রেরক জানিতে চাহিয়াছেন যে এরূপ একটী হিতকরী সভা এত দিনেও কেন স্থাপিত হইল না। আমরা যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে যাঁহাদের মুখ চাহিয়া আমরা এই সংবাদ সখাতে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাঁহাদের উৎসাহ 'জল' হইয়া গিয়াছে। আমাদের পত্রপ্রেরক তাঁহার ন্যায় অন্যান্য বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন না? বাঙ্গালীর যাহা কিছু গুণপনা তা কি কেবল বক্তৃতাতেই থাকিয়া যাইবে নাকি? ধিক্ আমাদিগকে! আমাদিগের অনেক কাজ, সুতরাং এ কাজ অত্যন্ত ভাল হইলেও, ইহাতে প্রাণ মনের সহিত লাগিতে পারিনা। নীচে থাকিয়া পরামর্শ প্রভৃতির দ্বারা যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে, আমরা তখনও প্রস্তুত ছিলাম; এখনও আছি।

প্রেরিত।

কি রূপে পড়িতে হয়?

[একটী ছোট বালক আমাদিগকে এই রচনাটী পাঠাইয়াছেন; আমরা অহ্লাদের সহিত রচনাটী মুদ্রিত করিলাম।—স,স।]

একদিন বৈকালে শ্রীশ বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইতে যাইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, যোগীন্দ্র 'সখা' পড়িতেছ ত?" যোগীন্দ্র বলিল "হাঁ, উত্তমরূপ পড়িতেছি।" শ্রীশবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা,বল দেখি ওই যে মেঘ দেখা যাইতেছে, ওগুলি কি?" যোগীন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "হাঁ, একখানা 'সখা'তে মেঘের কথা পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা কি পড়িয়াছিলাম, তা' আমার কিছুই মনে নাই, কেবল ঠাকুরমার কথাটা মনে আছে—তিনি বলিয়াছিলেন 'ও হাতীগুলা শালপাতা খাইতে যাইতেছে।'"

শ্রীশ।—হ্যাঁ, তবে যে তুমি বলিলে, বেশ সখা পড়িতেছি? ছিঃ, এ বড় অন্যায়। সখায় পড়িয়াছ, কিন্তু তোমার কিছুই মনে নাই কি জন্য? তবে তুমি 'সখা' পড়িতে জান না।

যোগীন্দ্র।—কেন আমি ত বেশ পড়িতে পারি? আজ বাটী যাইয়া আপনাকে পড়িয়া শুনাইব এখন।

শ্রীশ।—সে প্রকার পড়িলে হইবে না। বলি শুন। শুদ্ধ 'সখা' কেন, সকল পড়াই এই প্রকার করিয়া পড়িবে। তাহা হইলে যাহা পড়িবে তাহা

আর ভুলিবে না।—যখন তুমি পড়িবে সে সময়েই তোমার মন যেন অন্য বিষয় না ভাবে। তুমি মুখে যাহা বলিবে তোমার মন যেন তাহা শুনিতে পায়। আর, তোমরা বালক, তোমাদের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল; গল্প শুনিবার সময় উহা যেমন স্থির হয়, এমন আর কোন সময়েই হয় না। সেই জন্য ঠাকুরমার কথা তোমার মনে আছে। বোধ হয় তোমার এ কথাটা অনেক দিন মনে থাকিবে। সেইরূপ যখন 'সখা' কিম্বা অন্য কোন পুস্তক পড়িবে, তখন মনে করিবে যেন তোমার কাছে বসিয়া একজন গল্প করিতেছেন। তাহা হইলে দেখিবে, যাহা পড়িবে তাহা গল্প শুনার ন্যায় আর কখনও ভুলিবে না। আমি প্রতি শনিবার বাটী আসিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিব।

যোগীন্দ্র।—আচ্ছা, দাদা। এইবার অবধি আপনার কথামত 'সখা' ও অন্যান্য পুস্তক যাহা আমাকে পড়িতে হয়, সে সমস্ত পাঠ করিব, ও যাহা পড়িব তাহা বুঝিয়া আপনার নিকট বলিব।

শ্রীশ।—আচ্ছা, বেশ! অদ্য সন্ধ্যা হইয়াছে; চল বাটী যাই। কিন্তু আমার কথা যেন মনে থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সখার বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু এখনও অনেকের নিকট হইতে বার্ষিক মূল্য আদায় হইল না। আমরা বাধ্য হইয়া স্থানে স্থানে পত্রিকা পাঠান বন্ধ করিয়াছি, কিন্তু আশা করি তাঁহারা মূল্য দিয়া পুনর্ব্বার পত্রিকা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবেন। আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি কোন দৈব দুর্ঘটনা না হইলে আগামী বর্ষ হইতে পত্রিকার মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে, উভয়ের জন্য ১৲ এক টাকা করিব। কেহ কেহ পত্রিকা খানিকে পাক্ষিক করিয়া বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা স্থির করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যদি অনেকেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দেখাইয়া আমাদিগকে এক একখানি পোষ্ট-কার্ড লেখেন, তাহা হইলে আমরা আহ্লাদের সহিত আগামী বর্ষের জন্য সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারি। আর যদি মাসিক থাকাই অনেকের প্রার্থনীয় হয়, তবে আগামী বৎসরের জন্য সকলে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে বড়ই সুবিধা হয়। পত্রিকার বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও আগামী বৎসর অধিক মনোযোগী হওয়া যাইবে—অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আমাদের দেশের বড়লোকদিগের জীবনী এবং বিখ্যাত স্থান সকলের বিবরণ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।—বলা বাহুল্য, অগ্রিম মূল্য প্রেরণ না করিলে আমরা বিশেষ পরিচয় ব্যতীত কোথাও পত্রিকা দিব না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। আমি বিপিনের 'মামা'।

২। বালিশ।

৩। বুড়ো বলিলেন, ১, ১২, ৯ অর্থাৎ একবার নয়। ছেলে বলিল তবে? বুড়ো বলিলেন ১+১২+৯ অর্থাৎ ২২ বার।

[স্থানাভাবে নূতন ধাঁধা দেওয়া গেল না]

প্রাপ্তি স্বীকার।

(১) সংসার—নামক সাপ্তাহিক পত্র (২) মাণিকদহ ছাত্রহিতসাধিনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ; (৩) মুক্তাহার—কবিতা পুস্তক।

মাণিকদহ ছাত্রহিতসাধিনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। মাণিকদহ যেরূপ সামান্য গ্রাম সেই-রূপ অন্যান্য গ্রামে আমরা সচরাচর দলাদলি, তাস, পাশা, প্রভৃতি এবং খোলাভাটীর প্রসাদে মদের আমদানি যথেষ্ট দেখিতে পাই। যথার্থ কাজ করিতে কাহারই প্রবৃত্তি নাই,—বালক বা যুবকদিগের মধ্যে যদিওবা দুই চারি জন কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হন, তথাপি তাঁহাদের উৎ-সাহ অধিক দিন থাকে না। গ্রামগুলি হইতেই যদি উন্নতির আরম্ভ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই যে সমস্ত দেশে সেই উন্নতির ফল দেখা যায়, তাহাতে সন্দেহ কি? যদি উৎসাহ থাকে, যত্ন থাকে, তাহা হইলে যে অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন করা যায়, এই মাণিকদহ গ্রাম তাহার প্রমাণ। মাণিকদহের প্রাণ-স্বরূপ জমীদার বাবু বিপীনবিহারী রায় এবং জলন্ত উৎসাহে পূর্ণ ধার্ম্মিকবর বাবু শ্যামাকান্ত চট্টোপা-ধ্যায় এই দুই মহাত্মা, অন্যান্য বন্ধুদিগের সাহায্যে এবং প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় মাণিকদহ গ্রাম-টীতে যে কত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সকল গ্রামেই যদি এইরূপ ভাল কাজের সূচনা হয়—বিশেষতঃ বালকদিগের জন্য মাণিকদহের বন্ধুদিগের যেরূপ যত্ন, যদি সকল গ্রামেই সেইরূপ যত্ন দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়।

শেষের লিখিত কবিতাপুস্তকখানি দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। স্থানে স্থানে যাহা পড়ি-য়াছি তাহা বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে। আমাদের দেশে সদুপদেশপূর্ণ কবিতাপুস্তকের বড়ই অভাব। আর আমাদের এমনি কপাল যে, কলম ধরিয়া কবিতা লিখিতে বসিলেই লোকে এমন কবিতা লিখিয়া বসে, যাহা পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগিনীতে, মায়ে ঝিয়ে এক সঙ্গে বসিয়া পড়িবার যো নাই। আমা-দের গৌরবের বিষয় এই মুক্তাহার এই শ্রেণীর পুস্তকের সীমা ছাড়া। ইহাতে কুরুচির ছায়া মাত্র নাই—বরং পড়িলে উপকারেরই সম্ভাবনা। মধ্যে মধ্যে এমন কবিতাও আছে যাহা বালক বালিকা-দিগের কণ্ঠস্থ দেখিতে ইচ্ছা করি। পুস্তকখানির মূল্য ।• চারি আনা মাত্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুলসহ ১।• এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া ৴• এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়-কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্ব-রের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

... ঘোষের ষ্ট্রীট "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। ডিসেম্বার, ১৮৮৩। ১২শ সংখ্যা।

খেলা।

সেদিন সন্ধ্যার পর আমার একটী বালক বন্ধু আমাকে মহা আহ্লাদের সহিত বলিলেন—"—বাবু! আমরা আজ 'ব্যাটবল' খেলায় সাহেবদিগকে হারাইয়া দিয়াছি।" আমি শুনিয়া বলিলাম "বেশ!" তাহার পর ভাবিতে লাগিলাম, সাহেবদিগকে হারাইয়া এত আনন্দ কেন? সকল দেশের ছেলেরাই খেলা করে, তবে সাহেবের ছেলেরাইবা এত উঁচু যায়গায় কেন, আর আমাদের ছেলেরাইবা এত নীচুতে কেন? তাহার উত্তর এই যে, আমাদের দেশের কর্ত্তারা ছেলেদের শারীরিক পরিশ্রম 'দুচোখে' দেখিতে পারেন না। তাঁহারা চান, ছেলেরা নড়িবে না, উঠিবে না, ছুটিবে না, কেবল এক মনে পুস্তকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে, আর পরীক্ষা দিবে। শরীরকে ভাল রাখা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, শরীর ভাল রাখিলে যেমন ভাল থাকে, এ কথা অনেক অভিভাবকই বুঝেন না। অপর দিকে, সাহেবদিগের মনের বিশ্বাস আর একরূপ। তাঁহারা ছেলেদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে যেমন যত্নবান, খেলার দ্বারা শরীরের বল বৃদ্ধি করাইতেও সেইরূপ মনোযোগী। সাহেবের ছেলেরা সমস্ত বছর কোন না কোনরূপ 'জোরাল' খেলা খেলিয়া থাকে। ঘোড়ায় চড়া দৌড়াদৌড়ি, ব্যাটবল, দাণ্ডাগুলি, ইহার একটা না একটাতে সাহেবের ছেলেরা সমস্ত বছরই লাগিয়া আছে। এইরূপ খেলা করিতে করিতে সাহেব বালকেরা কালে খুব মজপুত হইয়া উঠে; তখন তাহাদের সঙ্গে ঐ সকল খেলাতে সমান হওয়া কাহারও পক্ষে সহজ হয় না। এই জন্যই আমার সেই বালকবন্ধু, গড়ের মাঠে সাহেবদিগকে হারাইয়া দিয়া, আহ্লাদে 'আটখানা' হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে নানারূপ খেলা আছে কিন্তু এমন খেলা অধিক নাই, যাহাতে শরীরের চালনা, মনের স্ফূর্ত্তি এবং বুদ্ধির কৌশল এক সঙ্গে থাকে। 'কপাটী' বা 'ডুডু' খেলাতে শরীরের বেশ চালনা হয় বটে, বুদ্ধিও খাটাইতে হয় বটে, কিন্তু ইংরেজী 'ব্যাটবল' খেলা যত নির্দ্দোষ এবং তাহাতে মনের যত স্ফূর্ত্তি জন্মায়,ইহা তত নির্দ্দোষ নহে এবং ইহাতে তত স্ফূর্ত্তি জন্মায় না—আমাদের বালকপাঠকমাত্রই একথা জানেন। ইংরেজী খেলা আমাদের দেশে যত বাড়ে ততই আমাদের মঙ্গল, কারণ আমাদের দেশে শরীরে চালনা হয়, এরূপ কুস্তি, মাটিয়াম অনেক আছে বটে, কিন্তু যেখানে দুইদল বাঁধিয়া খেলা হয়, সেখানে পরস্পরের সহিত 'আড়ি'তে যত উৎসাহ হয়, আপনার মনে একলা একলা খেলিলে কখনই সেইরূপ হইতে পারে না; ইংরাজদিগের অনেক 'জোরাল' খেলাই এইরূপ দুদলে হয় বলিয়া

তাহা বড়ই উপকারী। আমাদের দেশে যে এরূপ নাই তাহা বলিতেছি না, তবে এইরূপ খেলা যত বাড়ে ততই মঙ্গল, ইহাই বলিতে চাই। আমাদিগের দেশের কোন কোন স্থানে এইরূপ দুইদলে মিশিয়া খেলিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকল স্থানে তাহা নাই, এই জন্য তাহার দু একটী আমরা প্রকাশ করিতেছি। ব্যাটবল, কপাটী প্রভৃতি সকলেই মোটামুটিগোছ জানেন সুতরাং তাহার কোন উল্লেখ করিলাম না ঃ—

'চী'কুৎকুৎ।*—এই খেলাতে বালকের সংখ্যার ঠিক নাই, ৮ হইতে ১৬ জন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে খেলিতে পারে। যতগুলি বালক যুঠিবে, তাহাদিগকে সমান দুইভাগ কতিে হইবে। কোন্ দল আগে খেলিবে তাহা প্রথম স্থির করিয়া লইবে। তাহার পর, যাহারা খেলিবে তাহাদের মধ্যে একজন খুব চতুর রকমের বালককে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইবে। এই বালকের নাম 'কুৎ'। 'কুৎ'কে উঠাইয়া তথা হইতে খানিকটা দূরে যে 'চড়াই' পূর্ব্বে ঠিক করা থাকিবে, (২০ হইতে ৩০ হাত দূরে হইলে চলিতে পারে) সেখানে আনিতে হইবে। খেলিবার দল আনিতে চেষ্টা করিবে, খাটিবার দল বাধা দিবে, 'কুৎ' সুযোগ দেখিবে—এ খেলার সার মর্ম্ম এই। কিরূপে খেলিবার দলের লোক চেষ্টা করিবে, তাহা বলিতেছি।—খেলিবার দলের একজন 'চড়াই' হইতে বা 'কুৎ'কে ছুঁইয়া ‡ 'চী' এই শব্দ করিতে করিতে এক নিশ্বাসে খাটিবার দলের এক জন বা সম্ভব হইলে অধিক লোককে তাড়া করিয়া যাইবে; যতক্ষণ তাহার নিশ্বাস আছে. ততক্ষণ সে যাহাকে ছুঁইবে সে মরিবে, কিন্তু নিশ্বাস লইয়া যদি সে চড়াইয়ে ফিরিয়া আসিতে না পারে এবং নিশ্বাস ছাড়িয়া দিলে যদি পথে তাহাকে খাটিবার লোক কেহ ছুঁইয়া ফেলে,তাহা হইলে সেও মরিল। এদিকে খাটিবার লোকেরা সতর্ক আছে,—যখন দেখিল খেলিবার লোক তাহাদের এক জনকে তাড়া করিয়া গেল অমনি একজন বা অনেকে কুতের মাথা ছুঁইয়া গেল, কারণ খেলিবার লোক 'চী' ধরিয়া গেলেই যদি খাটিবার লোক কুতের মাথা না ছোঁয়, তাহা হইলে 'কুৎ' সুযোগ পাইলেই উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু খাটিবার লোকেরা একবার মাথা ছুঁইয়া গেলে, দ্বিতীয় খেলিবার লোক 'চী' না ধরা পর্য্যন্ত 'কুৎ'কে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। বুদ্ধিমান 'কুৎ' সর্ব্বদা সুযোগ খোঁজে, যাই দেখিল তাহাদের দলের একজন, খাটিবার লোকদিগকে তাড়া করিয়া গিয়াছে, আর কেহ তাহার মাথা ছুঁইয়া যাইতেছে না, অথচ সকলে ব্যতিব্যস্ত, অমনি সে উঠিয়া পলাইয়া চড়াইয়েতে গেল—পথে খাটিবার লোককেহ ছুঁইয়া দিলে 'কুৎ' মরিল, এবং অন্যপক্ষের খেলিবার পালা হইল; নতুবা নিরাপদে পৌছিলে খাটিবার লোকদিগের উপরে এক 'বাজি' জিৎ হইল।

খেলিবার লোকের প্রতি উপদেশ।—যখন 'চী' বলিয়া কুতের মাথা ছুঁইয়া খাটিবার লোককে তাড়া করিয়া যাইবে, তখন যত দৌড়িতে পার তাহা ত যাইবেই; সঙ্গে এমন আন্দাজে নিশ্বাস ফেলিবে যাহাতে একজনকে মারিয়াও চড়াইয়েতে ফিরিয়া আসিতে পার; নতুবা যেখানে নিশ্বাস পড়িবে, প্রাণের আশা ছাড়িয়া সেখান হইতেই 'গাও হে' বলিয়া চীৎকার স্বরে সঙ্গীদিগকে খবর দিবে। ইহাতে এই ফল হইবে যে তোমাদের দলের আর এক জন 'চী' ধরিবে, কাজেই তুমি এতক্ষণ যাহাকে তাড়া করিতে ছিলে, সে তোমাকে মারিবার সুযোগ ছাড়িয়া দিয়াও 'কুৎ'কে রক্ষা করিতে সেই দিকে দৌড়িতে পারে—তাহা যদি না যায়, তা না হয় মরিলে, ভয় কি? খাটিবার লোক সকলকে

* কোন কোন স্থানে এ খেলাকে 'বউ-বসান' বা 'বউ-তোলা' খেলা বলিয়া থাকে, কিন্তু আমরা এ নামটি পসন্দ করি না।

‡ কুৎকে ছুঁইয়া নিশ্বাস লইলেই ভাল হয়।

মারিলে, শেষকালে এক জন আসিয়া 'চী' ধরিয়া এক নিশ্বাসে 'কুৎ'কে অনায়াসে তুলিয়া লইয়া চড়াইয়েতে যাইতে পারে।

কুতের প্রতি উপদেশ।—তুমি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে, যতক্ষণ পলাইবার পথ খুব ভালরূপ বুঝিতে না পারিবে, ততক্ষণ মোটেই নড়িবে না, কারণ একবার একটু উঠিবার উদ্যোগ করিলেই তুমি মরিলে, এবং তুমি মরিলে তোমার দলের খেলা গেল। যদি কুকুরের মত দুবার উল্টা পাক দিয়া খাটিবার লোকদিগের হাত ছাড়াইতে পার, ভালই; নতুবা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। একটী বিষয় যেন মনে থাকে, তোমার দলের লোক তোমার মাথা ছুঁইয়া গেলে, তখনি অর্থাৎ খাটিবার দলের লোক আসিয়া তোমার মাথা ছুঁইবার আগেই, তোমাকে প্রস্থান করিতে হইবে; অপর পক্ষের কেহ মাথা ছুঁইয়া গেলে, আর সে 'চী'তে উঠিবার যো নাই।

খাটিবার লোকের প্রতি উপদেশ।—খেলিবার লোক 'চী' ধরিয়া চলিয়া গেলেই কুতের মাথা ছুঁইবে। যাহাকে তাড়া করিয়া যাইবে, সে যখন দেখিবে, 'চী'র নিশ্বাস শেষ হইয়া আসিতেছে, তখন বেশী তাড়াতাড়ি না পলাইয়া, নিজে মারা না যাই, অথচ 'চী'এর নিশ্বাস পড়িলেই তাহাকে দৌড়িয়া ছুঁইতে পারি, এই ভাবে ছুটিতে হইবে। যাহারা 'কুৎ' এবং চড়ায়ের মাঝখানে থাকিবে, তাহাদের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

এই খেলাতে দুদলের লোকই মরিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য বাঙ্গালা খেলায় যেমন হয়, এখানে সেরূপ একের পরিবর্ত্তে আর একজন বাঁচিবে না। 'চড়াই' বলিয়া যে দাগটী কাটিবে, কুৎকে বা খেলিবার লোকদিগকে যে সেই লাইনের উপরে আসিতে হইবে তাহা নহে, তাহার সোজা সোজি যেখানে হউক, এক যায়গায় আসিলেই চলিতে পারে। যদি একদল ক্রমাগত বাজি শোধ করিতে না পারিয়া, ৭ বার হারিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝা গেল দুই ভাগ সমান হয় নাই; তখন আবার ভাগ করিয়া লইবে।

এবার স্থানাভাবে আর কোন খেলার কথা দেওয়া গেল না।

নিয়ম এবং অনিয়ম; বাধ্যতা এবং অবাধ্যতা।*

গ্রীষ্মকাল; সকাল বেলা একদিন বড় সুন্দর দেখ্‌তে হ'য়েছে। একটী কর্ম্মকার মৌমাছি মধু আন্‌বার জন্য বাহির হ'ল। এমন সুন্দর রোদ্! বেশ গরম বাতাস! সে উড়ে উড়ে অনেক দূরে গেল। শেষে একটী সুন্দর বাগানে এসে প'ড়্‌ল এবং সেইখানে ঘূরে ঘূরে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। আনন্দে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে করে এত মধু জমাইয়া ফেলিল যে আর বেশী নিয়ে যেতে পারে না। বেলাও শেষ হয়ে এসেছে, তখন বাড়ী ফিরে আসবার কথা মনে হ'ল। তাহার আসবার পথে এক বড়লোকের বাড়ীতে জানালা খোলা ছিল, সে মনে করিল ঐ বুঝি পথ, সুতরাং তার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতর গেল। সেখানে ভারি খাবার ভিড়—ডাকাডাকি, হাকাহাকি, মহা গোলমাল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কথা বল্‌তে কিছু বেশী চীৎকার করে ফেল্‌ছেন; দেখে শুনে বেচারা মৌমাছির মনে বড় ভয় হল—'এ কোথায় এসে প'ড়লাম রে বাবু!"—কিন্তু তা'হলে কি হয়, বাবুরা যে লাল টুকটুকে রসগোল্লা পাতে নিয়েছেন, তার একটু খানি একবার চেটে না দেখ্‌লে কি চলে? মৌমাছি সেইদিকে গেল। এর মধ্যে একটা ছেলে চীৎকার করে বলিল—"ওরে! মৌমাছিটে, ধর!

*Parables from Nature নামক পুস্তকের একটি গল্প অবলম্বনে লিখিত।

ধর!”—মাছি ভাবিল, “বাবা গো! এই বেলা পালাই” —এই ভাবিয়া বোঁ ক'রে ছুটে বাহিরের দিকে গেল, কিন্তু তাড়াতাড়িতে বস্তুজ্ঞানটা তত ছিল না; তাই বাহিরে যেতে গিয়ে জানালার সাসীতে মুখের ঘেষ্টা লাগিয়া গেল। বড় বেদনা লাগাতে, বিশেষতঃ বাহিরে যাবার আর পথ না থাকাতে, বেচারা মৌমাছি সেই সাসীর গায়ে আস্তে আস্তে হাঁ'ট্‌তে লা'গল, ভাবিল বিশ্রাম করে গায়ে একটু বল হলেই চলে যাব।

হঠাৎ একটু একটু কাণাকাণির শব্দ তাহার কাণে গেল। চেয়ে দেখলে যে দুটী ছেলে হাঁটু গেড়ে বসে তারি দিকে চেয়ে আছে।

একটী আর একটীকে বলিল “দেখ বোন্! এটা একটা কর্ম্মকার মৌমাছি। ওর উরুতে ঐ দুটো থলে। ওতে ফুলের গুঁড়ো রাখে। তোফা লোক! ওই কাজের লোক! কেমন সারাদিন খাট্‌ছে।”

মেয়েটী বলিল “ফুলের গুঁড়ো আর মধু কি ও নিজেই এনেছে?”

“হাঁ; ফুলের ভিতর থেকে ঐ গুলো আনে। সে দিন মৌমাছিটাকে কেমন দেখেছিলাম; হলুদে ফুলগুলির ভিতরে বাহিরে কেমন ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছিল। আমাদের কেমন হাসি পেয়েছিল। ক্রমাগত খাট্‌ছে,—আর কতই ব্যস্ত। হলুদে ফুলের গায় কালো মৌমাছিগুলি কেমন সুন্দর দেখিয়েছিল। একে আজ বোঝাই হতে দেখলে হত। কিন্তু এ আরো অনেক কাজ করে। মৌচাক তোয়ের করে; আর এ ছাড়া প্রায় অন্যান্য সকল কাজই করে। ও কর্ম্মকার মৌমাছি! গরিব বেচারা!”

“কর্ম্মকার মৌমাছিটে কি দাদা? আর ওকে 'গরিব বেচারা' কেন বল্‌লে?”

'বা! তাও কি জান না? সে দিন পুলিন কাকা বলেছেন যে সব লোক অন্যের জন্য খাটে, নিজের কাজ কর্ত্তে জানে না, তারা সবগুলো হতভাগা। আর এ ও যে ঠিক্ তাই করে। চাকে রাণী মৌমাছি আছেন, তার আর কোন কাজ নেই কেবল খাবেন আর বসে থাকবেন; হুকুম জারি করবেন; আর ডিমছানা গুলোকে দেখবেন; আর সকলে তাঁর কাছে এসে যোড় হাত করে থাকবে আর তাঁর আজ্ঞা পালন করবে। তার পর জামাই মৌমাছিরা আছেন—বাবুদের আর গড়াগড়ি করেই সময় হয় না। তার পর কর্ম্মকার মৌমাছিরা, যেমন এই একজন, তারা বেচারারা আর সকলের সব কাজ করে দেয়! পুলিন কাকা জান্‌লে কেমন হাস্‌তেন।”

“পুলিন কাকা মৌমাছির কথা জানেন না বুঝি।”

“না বুঝি। মালী আমাদের বলেছিল। আর রাণী মৌমাছি না হলে এদের কাজ চলে না একথা একবার জানলে কি আর মৌমাছির গল্প বলে বলে পুলিন কাকার কথা ফুরুত? কাল শুন্‌লাম পুলিন কাকা বলছেন—রাজা রাণী ও সব স্বভাবের বিরুদ্ধ। স্বভাবতঃ তো আর কেউ রাজা কি মুচি হয়ে আসেননি, সকলেই একরকম; তাই উনি বলেন রাজা রাণী ও সব বড় অন্যায়।”

মেয়েটী চুপি চুপি বলিল “মৌমাছিদের তো আর অত বুদ্ধি নেই যে তারা ও সব জানবে।”

“তাতো নয়ই! তবে বেচারারা খেটে খেটে মারা যাচ্ছে; মালী আমাকে যা বললে সে সব যদি ওরা একবার শুনতো তা হলে ওদের কেমন রাগ হত!”

“মালী কি বল্‌লে?”

“এই যে, সে, বল্‌লে কি না যখন জন্মায় তখন কর্ম্মকার ও যা রাণী ও তা; ঠিক এক রকম; তারপর ওদের খাবার আর থাকবার যায়গা এতেই দুটীকে দুরকম করে তোলে। ধাই মৌমাছিরা ঐ কাজটা করে। একজনকে একরকম আর এক-

জনকে অন্য রকম খেতে দিলে; তুজনের ঘর তুরকম করে দিলে, আর অমনি একজন রাণী হয়ে উঠ্‌লেন, অন্য গুলি খেটে মরুক গে। পুলিন কাকাও রাজা রাণীর কথা ঠিক্ ঐ রূপ বলেন—স্বভাব সকলকেই একরকম করে। ঐ যা! খাওয়া হয়ে গেল; চল যাই।"

"একটু দাঁড়াও দাদা; মৌমাছিটাকে বাইরে দিয়ে আসি।" এই বলিয়া সেই ছোট মেয়েটী তাহাকে আস্তে আস্তে একখানা রুমালে করিয়া লইল। তারপর একটু দয়ার ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "গরিব বেচারা! তারা যদি তোমাকে ভাল খাবার দিয়ে ভাল ঘরে থাকতে দিত, তাহলে তুমিও রাণী হতে পার্ত্তে। আহা কেন তারা দিলে না! তা যে রকম হয়েছে বাপু! যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে তোমার খাটুনীতেই জীবনটা যাবে। মধু আনবে আর মোম তয়ের করবে। তা এখন যাও। খেটে খেটে সুখে থাকগে!" এই কথা বলিয়া সে খোলা জানলার ভিতর দিয়া রুমাল ঝাড়িল। মৌমাছিটী পুনরায় বাতাসে ভাসিয়া চলিল।

কেমন সুন্দর সন্ধ্যাকাল! কিন্তু ঐ মৌমাছিটীর সেরূপ বোধ হইল না। সূর্য্য দেখিতে কেমন সুন্দর হইয়াছে! ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। কিন্তু সেই মৌমাছি বেচারার মনে হইতে লাগিল যেন আকাশ কাল মেঘে ঢাকা। বাস্তবিক কাল মেঘ তাহার নিজের অন্তরেই ছিল! তাহার মনে অসন্তোষ এবং তুরাশার সঞ্চার হইয়াছে। সে এখন বিদ্রোহী, জন্মাবধি যাহারা তাহার মতে তাহার উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে তাহাদিগের উপর আজি তাহার রাগ হইয়াছে।

অবশেষে বাড়ী আসিল।—প্রাতঃকালে কেমন মনের সুখে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল! কিন্তু মুখভার করিয়া সে বাড়ীতে ফিরিল এবং রাগের সহিত তাড়াতাড়ি হুড় মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া, থলে ঝাড়িতে লাগিল। থলে ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল "আমার মত তুঃখী আর কেউ নাই।"

একজন বৃদ্ধ আত্মীয় নিকটে কাজ করিতে ছিল,—সে জিজ্ঞাসা করিল "কেন কি হয়েছে? কি করেছ তুমি? কোন বিষাক্ত ফুলের রস খেয়েছ? না মধুখোর প্রজাপতি আমাদের চাকের কোথাও ডিম পেড়েছে, তাই দেখেছ?"

"ওগো, তা নয়, তা নয়, অনেক দূর বেড়িয়েছি, আর নিজের কথা বিস্তর শুনেছি, আগে তার কিছুই জা'ন্‌তাম না। এখন বুঝি আমরা কত তুঃখী!"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল "ওরূপ উল্টো বুদ্ধি কোন্ পণ্ডিত তোমার পেটে ঢুকিয়ে দিলে?"

মৌমাছির রাগ হইয়াছে—"খাঁটি কথা! তা যেই বলুক না কেন, তাতে কি?"

"তাতো নয়ই। তা যে সে একটা বোকা জন্তু এসে বল্লে 'তুমি বড় তুঃখী', তাতেই তুমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লে, এ তো বেশ কথা? ঐরূপ কথা শোনবার আগে তো তোমার কোন কষ্ট ছিল না! ও নেহাত কাঁচা কথা; তা আমি আর তোমায় বেশী কিছু বল্‌ছিনে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ আত্মীয় আপন কাজে গেলেন এবং সুখে গান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বুড়ো হাসিলেন বলিয়া পথিক মৌমাছির তুঃখ যাবার নয়। সে তাহার যুবা সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া আনিল। বড় লোকের খাবার ঘরে যাহা কিছু শুনিয়া আসিয়াছে সমস্ত তাহাদিগকে বলিল। শুনিয়া সকলে অবাক্; অনেকে কথাগুলিতে বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। তাহার কথায় ওরূপ একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারিয়াছে দেখিয়া সে মনে মনে কত খুসি হইল; তখন বুদ্ধি ক্রমেই ঠিক হইয়া আসিতে লাগিল। তার পর দীর্ঘ বক্তৃতা।—রাজারাণী ও সব থাকা বড় অন্যায়—যখন হয়, তখন সকলেই তো এক রকম?—কথা সকল এত উৎসাহের সহিত বলিতে

লাগিল যে পুলিন কাকা শুনিলে চারি হাতে পায়ে হাত তালি দিতেন।

মৌমাছি থামিলে কতক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া থাকিল। তার পর শোঁ শোঁ করিয়া কেহ কেহ রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল; কেহ কেহ চোঁ বোঁ করিয়া কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতে বসিল। কিন্তু উৎপাতটা নিতান্ত নূতন; কেমন করিয়া কি করিতে হইবে তার সম্বন্ধে মতটা কাহারও তত পরিষ্কার বোধ হইল না। কেহ কেহ বলিল "পুলিন কাকা যদি দেশের সব মৌচাকের কর্ত্তা হতেন, তা হলে তিনি সকলকেই রাণী করে দিতেন,—বাঃ তবে কি মজাই হত!" বুড়ো তখন এক কোণ হইতে উকি মারিয়া বলিল "কাজ করে দেবার লোক না থাকলে রাণী হয়ে কি মজা পেলে বাপু?" দল শুদ্ধ মৌমাছি-গুলি বুড়োর কথায় শোঁ শোঁ করিয়া উঠিল। বুড়োকে বোকা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। বলিল, "কেন, পুলিন কাকা কি এও দেখবেন না যে যাঁরা এতদিন রাজা রাণী রাজপুত্তুর হয়ে বসে বসে মোটা হচ্ছেন তাঁরাই যত দিন বেঁচে থাকেন, অন্য সকলের কাজ করে দেবেন!"

বুড়ো হাসিয়া বলিল "তারা মরে গেলে পর?"

"শোঁ—শোঁ—শোঁ—শোঁ"।—বুড়ো চুপ মারিল।

তার পর আর এক মৌমাছি উঠিয়া বলিলেন "সকলেই রাণী হবে এটা কেমন কেমন দেখায়। তাহলে মধু আন্‌বে কে? চাক তোয়ের ক'রবে কে? বাড়ী বাঁধবে কে? ছেলে রাখবে কে।? এর চাইতে রাণী টানী কিছু না থেকে সকলেই যদি খেটে খাই তাহলে কি ভাল হয় না?"

আবার ঐ নাছোড় বুড়ো কোণ হইতে উকি মারিয়া বলিল "তাতেই বা লাভটা কি হল? এখনও তো খেটেই খাচ্ছো!" বুড়োর কাণে কতকগুলি রাগ-সূচক শোঁ শোঁ শব্দ আসিল। বুড়ো আবার আপন কাজে গেল।

অবশেষে রাত্রি আসিল। ভালই হইল। দিবসের পরিশ্রম শেষ হইয়াছে—চাকের সকলে এখন নিঃশব্দে নিদ্রা গেল। কিন্তু যেই প্রাতঃকাল ফিরিয়া আসিল অমনি সেই হতভাগা আন্দোলন। পথিক মৌমাছি এবং তাহার সঙ্গীরা মাঝে মাঝে ছোট ছোট দলে একত্রিত হইয়া তাহাদের দুঃখের প্রতীকার চিন্তা করিতে লাগিল। অন্যান্য মৌমাছিরা নিজের কাজে এত নিবিষ্ট ছিল যে তাহাদের কেহ দেখিল না। কিন্তু কতকগুলি মাথাগরম যুবক ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া এরূপ ঝড় তুলিলেন যে আর কাহারও বুদ্ধি ঠিক্ থাকিল না। ঝগড়া বিবাদের উপক্রম হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় আমাদের পথিক সেখানে উড়িয়া গেল এবং তাহাদিগকে বলিল যে সকলেই যখন বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের আর রাণী হওয়ার আশা বৃথা; তবে রাজা রাণী ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত কর্ম্মকার মিলিয়া একটা সাধারণ তন্ত্রই করা যাউক না কেন? কথাটা চমৎকার বোধ হইল; সুতরাং সকলে বিনা আপত্তিতে চাক ছাড়িল। তাহারা খোলা বাতাসে আসিয়া বাগানে সকাল বেলায় বায়ু সেবন করিতে চলিল; দলটিকে দেখিতে তখন বেশ দেখা গেল। কিন্তু মৌমাছির দলে রাণী নাই পথ দেখাবে কে? সুতরাং তাহাদের দল বাঁধাই সার হইল। তার পর সকলে মন্ত্রণার জন্য আবার একত্র হইল; তখন কথা হইল 'কেমন যায়গায় বাড়ী বাঁধিতে হইবে।'

একজন বলিল "বাগানে আর কি।" আর এক-জন বলিল "না, মাঠে"। তৃতীয় ব্যক্তি উঠিয়া বলিল "ভাল একটা চালা ঘরের তলায়।" অন্যতম প্রস্তাব করিলেন "একটী গাছের গর্ত্ত হলে আর কিছু চাইনে।" পঞ্চম কর্ত্তার মত হইল "গাছের ডালে বেশ স্বাধীন ভাবে থাকা যায়।" সকলেরই ইচ্ছা তাঁহার নিজের মত বাহাল থাকুক। সুতরাং তাহাদের মীমাংসার সম্ভাবনা খুবই দেখা গেল!

শেষে পথিক উঠিয়া বলিলেন "তোমাদের

কারখানা দেখে বড় রাগ হয়। অর্দ্ধেকটা প্রাতঃকাল চলে গেল, এখনো যে গোলমাল নিয়ে বেরিয়েছিলাম তাতেই আছি!”

কলহকারিরা বলিল, “যে রকম বল্‌ছো, তাতে দেখ্‌ছি তুমিই রাণী হয়ে উঠ্‌লে! আমাদের ইচ্ছে হয়েছে আমরা সারাদিন বসে কামড়াকামড়ি করবো, তোমার কি তাতে? তোমার কাজ তুমি করগে যাও।”

সে তাহাই করিল; সে এখন বড় লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াছে। মনের কষ্ট দূর করিবার জন্য সে বাগানের ও পাশে গেল। সেখানে দেখিল অতি সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে ফুলের মধ্যে গিয়া বসিল,—যদি মধু সঞ্চয় করিয়া মনটা একটু শান্ত হয়। আহা সে কত সুখ পাইল! মধু সঞ্চয় আর তাহার কাছে এত ভাল লাগে নাই? তাহার দৈনিক সেই সুখের গান ধরিল। তখন অন্যান্য দিনের মত বাড়ী ফিরিয়া যাইতে একান্তই ইচ্ছা হইতে লাগিল। সে যখন একটা ফুলের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল, এমন সময় দেখিল তাহার বুড়ো আত্মীয় অন্য একটার ভিতর হইতে আসিতেছেন।

বুড়ো বলিলেন “কে জান্‌তো তোমাকে এখানে একা পাওয়া যাবে! সঙ্গীরা কোথা!”

“কি জানি; তাদের বাগানের বাইরে ফেলে এসেছি।”

“কি কোচ্ছে তারা?”

“.........মারামারি ....” কথাটা কিছু বিরক্তির সহিত হইল।

বুড়ো একটু মিষ্ট মুখ করিয়া বলিল,—

“এমন সুন্দর সকাল বেলায় মৌমাছির আর কাজ কি!”

পথিক এবারে জব্দ হইয়াছেন; বলিলেন “আর হাস্‌বেন না; আমি কি করি, বলে দিন। পুলিন কাকা যে স্বভাব,স্বভাব,সাম্য,সাম্য,করেন,— শুনতে তো বেশ শুনায়। কিন্তু যাই সব ভাই সমান হতে যাবো,অমনি কেমনকরে যেন ঝগড়া বাধিয়ে বসি।”

বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল “তোমার বয়েস কত?”

“সাত দিন।”

“আমার বয়েস কি হবে?”

“সে হয়ত ক মাসইবা হয়।

“ঠিক। আমি এক প্রকার বৃদ্ধ হয়েছি। তা বাপু! এস একবার যুদ্ধ করি।”

“তা কখনই হবে না। আমার গায় বল বেশী, মশাই কষ্ট পাবেন।”

“তোমার চাইতে অত দুর্ব্বল একটা জন্তুর উপদেশ নিতে এসেছ! বড় তাজ্জব দেখ্‌চি যে।”

“আজ্ঞে! আপনার গায় যোর নেই বলে কি আপনার জ্ঞান কম? আপনার জ্ঞান বেশী বলেই আপনার উপদেশ নিতে এসেছি। আমি বড় ন্যাকা হয়েছি, কেমন কেমন বোকা বোকা ঠেক্‌ছে।”

“বুড়ো, ছেলে——বলবান—দুর্ব্বল—চালাক বোকা—সাম্যটা কোনখানটায় বাপু? তা যাক্ এ থেকেই করে নেওয়া যাবে একটা। তা চল আমরা একত্র থাকি।”

“স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কোথা গিয়ে থাক্‌বো?”

“আগে বল, মতের মিল না হলে মীমাংসা ক'রবে কে?

“আপনি; আপনি জ্ঞানী।”

“উত্তম! খাবার মধু আন্‌বে কে?”

“আমি আন্‌বো; আমার গায় বল আছে!”

“বেশ কথা; এই দেখ, আমাকে রাণী কর্‌লে আর তুমি কর্ম্মকার হলে। আরে বোকা, সাবেক বাড়ী আর সাবেক রাণীতে কি কাজ চলে না? এই তো দেখ্‌ছো দু জন এক সঙ্গে থাকতে হলেই একজন হুকুম দিচ্ছে আর একজন খাটছে। একটা দল যখন হয় তখন কেমন হবে দেখ দেখি।”

মনের সুখে বুড়োর কথায় সায় দিয়া পথিক

আনন্দে গান গাইতে গাইতে ফুলের দলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শেষে সে বলিল "এখন সঙ্গীদের দেখলে হয়।" এই বলিয়া দুজনে মিলিয়া বাগানের বাহিরে কলহকারী সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিল।

এখনও তাহারা বিবাদ করিতেছিল, কিন্তু আর তেমন উৎসাহ নাই। বুদ্ধির গোলমাল হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই অনেকে অন্যান্য দিনের মত মধু বহিয়া বাড়ী যাবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অত্যল্পকাল পরে দেখা গেল যে একদল মৌমাছি আনন্দে বোঁ বোঁ করিতে করিতে দলপতি বৃদ্ধ এবং পথিকের পশ্চাতে গালভরা মোম লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে।

যেই তাহারা ঘরে যাইবে, অমনি একজন দ্বারপাল তাহাদিগকে বাধা দিয়া বলিল "দাঁড়াও; রাজ পরিবারের একটী মৃত শরীর যাচ্চে"

বাস্তবিকও তাই। শীঘ্রই একটী মৃত রাণীমৌমাছি দেখা দিলেন। দুধারে কর্ম্মকার মৌমাছিগণ তাঁহাকে টানিয়া আনিতেছে। তাহারা চাক হইতে তাঁহাকে ফেলিয়া মৃত সৎকার করিল।

পথিকের মনে বড় দুঃখ হইয়াছে; সে জিজ্ঞাসা করিল "এ কেমন করে হল? রাণীর তো কিছু হয় নি।"

প্রহরী উত্তর করিল "না না; তবে আজ সকালে হঠাৎ চাকে একটা গোলযোগ হয়েছে। কয়েক জন আতুড়ে চৌকিদার আজ কোথা চলে গেছে। এর মধ্যে একটী ছোট রাণী মৌমাছি ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন; ঘরটা আরো দু চার দিন বন্ধ থাকা উচিত ছিল। দুজন রাণীতে দেখা হতেই ওঁরা যুদ্ধ কর্ত্তে লাগ্‌লেন। যুদ্ধ করে করে ছেলে রাণী মারা পড়েছেন। এবারে অত শীঘ্র আমরা এক ঝাঁক পাঠিয়ে দিতে পারবো না; তা ওর আর কোন উপায় নাই।"

পথিক ভাবিল "কিন্তু এর তো উপায় হ'ত।" সেই এ সব ক্ষতির কারণ এই কথা মনে করিয়া তাহার ভয়ানক কষ্ট ও অনুতাপ উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ আত্মীয় তাহার গায় একটু ঠেলা দিয়া বলিলেন "দেখেছ রাণীরাও সকলে সমান নয়। রাজা একজনের বেশী একবারে হয় না।" পথিক মৌমাছি মনের দুঃখে বলিল "হুঁ।"।—নিয়মেবাধ্যতা সকল সুখের মূল, অনিয়ম এবং অবাধ্যতাতে অনেক অসুখ, ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও এই দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তবে মানুষের কি করা উচিত তাহা কি আর শিখাইতে হইবে?

ময়ূর।

ওই যে দেয়ালের উপরে পাখিটী বসিয়া আছেন, উঁহার সঙ্গে আমার কখনই বনিল না। আমি ছেলে বেলা হইতেই ময়ূরের উপর চটা। এখন অনেক বুঝিয়া, তবে একটু ঠাণ্ডা হইয়াছি বটে, কিন্তু ময়ূরকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে না। কেমন বিশ্রী ডাক, কি রকম সাপের মত গলা উঁচু নীচু করে, চলা ফেরা কেমন কদর্য্য, এই সকল দেখিয়াই কার্ত্তিক ঠাকুরের বাহনের উপর আমি চটিয়াছি। দেবতা কার্ত্তিক ঠাকুর যেমন বাবু, তাঁহার বাহনটী ও তেমনি, সুন্দর পোষাক-পরা রাজার ছেলের মত, ডানাগুলি ছড়াইয়া ময়ূর যখন সূর্য্য কিরণে উঁচু যায়গায় গিয়া বসে, তখন দেখিতে বড়ই চমৎকার। আবার যখন মেঘের সময় ডানাগুলি ছড়াইয়া 'পাকাম' ধরে, তখন ময়ূরকে কেমন দেখায় তাহা যে দেখে নাই, তাহাকে বুঝান যায় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তবুও ময়ূরকে আমি দেখিতে পারি না। ময়ূর যেন বড় লোকের মত সর্ব্বদাই অহঙ্কারে ডগমগ হইয়া আছে—দেখিবে উঁচু যায়গা না হইলে তাহার বসা হয় না। খাবার খাইতে নীচু যায়গায় নামেন বটে, কিন্তু উড়িয়া বসিতে হইলে প্রায়ই চালের মটকায় বা কোটা বাড়ীর
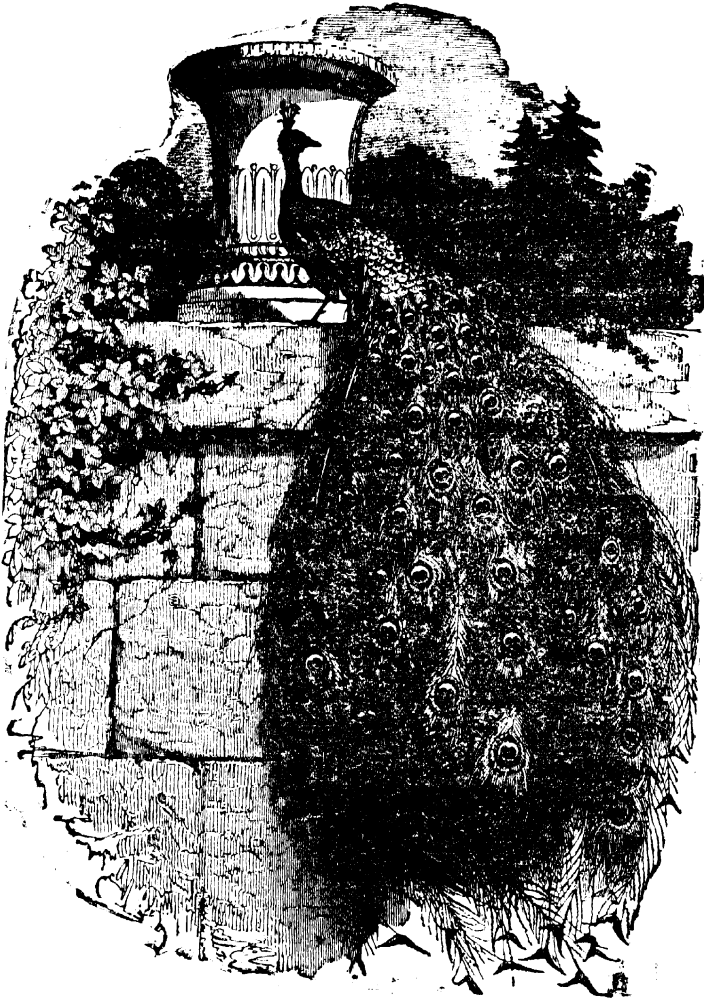
আল্‌সেতে গিয়া বসেন। তা, আবার বসিয়া কতবার গলা বাঁকান হয়, ঝুঁটি নাড়া হয়! উঃ তার রকম দেখিলেই গা জ্বালা করে। যাহারা জানে না, তাহারা সুন্দর পাখীটীকে দেখিয়াই মনে করে, না জানি ইহার ডাক কত সুন্দর। ওইযা! খানিকক্ষণ বাদে পাখী ডাকিয়া উঠিল—ক্যাঁ য়্যাঁ-ক্যাঁ! ছি! ছি! ছি! এমন সুন্দর পাখীর এমন খারাপ স্বর?

একবার ভাবি ভাল, ময়ূরের অপরাধ কি? তাহাকে পরমেশ্বর যেমন করিয়াছেন, সে তেমনি আছে,—পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহার উপর কি বলিব? কিন্তু বালক বালিকাদিগের মধ্যে যে

এইরূপ ময়ূরের দল আছে, সে দোষ কাহার? দেখিতে সুন্দর, পরিষ্কার সাজগোজ, সমস্তই ফিট্‌ফাট অথচ মাকাল ফলের মত এমন ছেলে মেয়ে অনেক আছে যাহাদের চরিত্রের দোষে তাহাদিগকে ভালবাসা যায় না। একটী সুন্দর বালক অথবা সুন্দরী বালিকা নিজের চেহারার অহঙ্কারে হয়ত কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কন না, কিম্বা একজন বড় লোকের ছেলে বা মেয়ে নিজেদের টাকার অহঙ্কারে দুচোখে পথ দেখেন না, কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া ভাল বাসেন না, আজ যাহার সহিত কথা কহিলেন, বেশ আলাপ করিলেন, কাল তাহাকে পথে দেখিয়া চিনিলেন না, আপনার গরবে আপনি মত্ত হইয়া বিয়াল্লিশ রকম অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে কোটাবাড়ীর উচ্চ আল্‌সে হইতে নীচু দিকে অনুগ্রহ করিয়া এক এক বার তাকাইতে লাগিলেন—অথচ বিদ্যা, গুণপনা কিছুমাত্র নাই, থাকিলেও তাহাতে বিশেষ অধিকার নাই—এমন বালকবালিকাদিগকে ময়ূর বলিব না তো কি বলিব?

পরমেশ্বর যাহাকে রূপ দিয়াছেন, তাহাকে অহঙ্কৃত হইতে বলেন নাই; তিনি যাহাকে ধন দিয়াছেন, তাহাকে বলেন নাই দরিদ্রকে অগ্রাহ্য করিও,—তবে এমন দশা অনেক সময় দেখি কেন? এইরূপ বালক বালিকাদিগকে কেহই ভালবাসে না। ময়ূয়ের মত কেবল রূপ বা কেবল টাকা থাকিলেই বড় হওয়া যায় না, লোকের ভালবাসা পাওয়া যায় না। বড় হইতে হইলে নত হইতে হয়, সকলকে ভালবাসিতে হয়, গরিব দুঃখীকে দয়া করিতে হয়। আর তাহা না হইয়া, দয়াধর্ম্ম ভুলিয়া যদি কেবল অহঙ্কারে ফুলিয়া থাকি, আশ্রিত গরিব দুঃখীদিগকে কষ্টদিতে কাতর না হই, তবে আমাতে আর মাকালফলে, আমাতে আর ঐ জেঁকো ময়ূরপাখীতে তফাত কি?

ভাই বোনের দোলনা।

পূরবে উঠেছে রবি, ঊষার হিঙ্গুল ছবি,
সুমুখে খেলিছে;
বকুলের তরুকোলে, চারু লতিকার দোলে,
দুজনে দুলিছে।
বকুলের ফুলগুলি, টুপ্‌টাপ্‌ খুলি খুলি,
মাথায় পড়িছে;
হেলি চলি দুইজনে, দুলিছে আপন মনে,
(আর) চাহিয়া রয়েছে।
নিকটেতে রবিকরে, ঝরণার জল ঝরে,
কি শোভা তাহার!
দিশেহারা ভাইবোনে, দুলিতেছে একমনে;
একি চমৎকার!
শিশির মুকুতা-কণা, রোদে ধরি বর্ণ নানা,
গড়ায়ে পড়িছে;
কেহবা জড়ায় দেহ, কপোলে পড়িয়া কেহ,
সোহাগ করিছে।
ক্রমে মৃদু হেলি দুলি, ওই ঊষা গেল চলি;
তবুও দুলিছে!
ক্ষুধা তৃষ্ণা হ'য়ে হারা, জগৎ পাশরে তারা;
তবুও দুলিছে!
হায়রে! কি ছেলে এরা! কেনরে এমন ধারা,
আপনা পাশরি,
প্রখর রবির করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে,—
তবু দোলা ধরি?
দু'একটী রবিকর, সাহসে করিয়া ভর,
ঘন পাতা ছেড়ে,
ছেলেটীর মেয়েটীর, মুখের উপরে—ধীর,
মৃদু আসি পড়ে।
কি জানি কি ভাবে ভোর, কি লেগেছে ঘুমঘোর
কথাটী না সরে;
ভুলিয়ে জগত-জনে—দোলা ধরি সযতনে,
যায় আর ফেরে।

ওই চলি গেল বেলা, সাঙ্গ নাহি হ'ল খেলা;
হবে কি জীবনে ?
ওই যে পড়িল ডুবি, দেখ রে সাঁঝের রবি,
পশ্চিম গগনে!
ছাড়ায়ে অনন্ত কায়া—অৰ্দ্ধ আলো অৰ্দ্ধ ছায়া—
গোধূলি আসিছে;
পাখীগুলি কাছে এসে, গান গেয়ে হেসে হেসে,
কত কি ভাবিছে!
হেথা হোথা রাঙ্গারাঙ্গা, মেঘগুলি ভাঙ্গাভাঙ্গা,
বেড়ায় ভাসিয়া।
রাত্রি হ'ল সুগভীর, সাড়া শব্দ পৃথিবীর,
যাইল মিশিয়া।
বালার মুখের পরে, জোছনার থরে, থরে,
কি শোভা ধরিছে!
নিশীথ আকাশে তারা—হইয়ে অবাক-পারা,
তাহাই হেরিছে।
ক্রমে ফুরাইল রাতি, তারাসহ ইন্দুভাতি,
যাইল নিভিয়া;
রাঙ্গা রবি পুবাকাশে, দেখা দিল পুনঃ হেসে,
মানস মোহিয়া।
তবু একি? না ফুরায়—কি এ খেলা? একি দায়!
হারায়ে চেতনা;
ভুলিয়া ঘরের কথা, ভুলি নিজ পিতামাতা,
ক্ষুধার যাতনা ?
হায়রে এ পৃথিবীতে, জীবনের এ দোলাতে,
কত ছেলে মেয়ে,
ভুলে ঘর পরিজন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা; বিচেতন—
ঢুলিছে পড়িয়ে!
দিন যায় রাতি আসে, নবারুণ পুনঃ হাসে,
চেতনা না হয়;
মায়েরে পাশরি সবে, না জানি কেমন ভাবে,
মাতিছে খেলায় ?
যেতে হবে পরলোকে—আরাম মায়ের বুকে;
নাই তাহা মনে!
হেথা এসে ভুলে গিয়ে, কি ছার খেলানা নিয়ে,
আছি রেতে দিনে।
জানি নাক কবে, হায়! জীবনের এদোলায়,
দোলা ফুরাইবে;
জগৎজননী কোলে—লুকাইব 'মা' 'মা' বলে—
হেন দিন কবে!

কে বড় লোক ?

একজন ধনীর বাড়ীতে অনেক ভদ্র লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের ছোট ছেলে মেয়েরাও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে। যাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, তিনি পূর্ব্বে অতি সামান্য অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার পিতা বড় গরিব ছিলেন। কিন্তু পিতা নিজে কষ্ট করিয়াও ছেলেকে স্কুলে দিয়াছিলেন; ছেলের নিজেরও বেশ চেষ্টা, যত্ন ছিল। তাই সেই ছেলে আজ বড় লোক। ইনি কেবল টাকায় বড় লোক তাহা নহে, ইহাঁর যেমন বুদ্ধি, গরিবের প্রতি দয়াও তেমনি।

যে সকল ছেলে মেয়ে তাহাদের পিতা মাতার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহারা সকলে মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে নীরজা নামে একটী ছোট মেয়ে দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু রূপ থাকিলে কি হয়, সে বড় দেমাকে। এ শিক্ষা সে দাস দাসীর নিকট হইতে পাইয়াছিল, পিতা মাতার নিকট নয়। তাহার পিতা আদালতের জজ তাহা সে জানিত, তাই বলিল "আমি জজের মেয়ে, আমি খুব বড় ঘরের মেয়ে, যারা বড় ঘরে হয় না, তারা কখনও বড় লোক হ'তে পারে না। আমি বড় ঘরে হয়েছি, আমি তাই বড় লোক হব—বড় ঘরের বউ হব, বড় লোকের স্ত্রী হব। যাদের বড় মানুষের ঘরে জন্ম হয় না, তারা হাজার পরিশ্রম করে লেখা পড়া শিখুক, তবুও বড় লোক হতে পারবে না। আর যাদের

নামের শেষে 'শ' আছে, তারা কোন কর্ম্মেরই নয়; এই দেখনা পুঁটীর বাবার নাম গণে'শ' তারা কত দুঃখী, ওপাড়ার জগদী'শ' বাবুরা কত কষ্টে দিন চালায়, হাবোলের কাকা সতী'শ' বাবুর কেরাণী গিরি করেই প্রাণ গেল। এদের কিছু হবে না, কিছু হবে না, কিছু হবে না!" এই বলিয়া সে সুন্দর হাত দুখানি ছড়াইয়া দেখাইল কেমন করিয়া এই 'শ'-যুক্ত লোকদিগকে দূরে রাখিতে হয়। এই কথা শুনিয়া ও এই হাত ঘূরান দেখিয়া সরলার (যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেই বাড়ীর কর্ত্তার মেয়ের) বড় রাগ হইল, কারণ তাহার বাবার নাম পরে'শ'; সে বলিল—"আমার বাবা ১০০ টাকার খেলনা কিনে দিতে পারেন, তোমার বাবা কি পারেন?"

সুষমা বলিল—"আমার বাবাও পারেন।" এই মেয়েটীর পিতা একখানি কাগজের সম্পাদক ছিলেন। সুষমা আবার বলিল "আমার বাবা,—তোমার বাবার, ওঁর বাবার সকলের নামেই ইচ্ছা করিলে কাগজে লিখিতে পারেন। মা বলেছেন বাবা কাগজে যা' ইচ্ছা তাই লিখিতে পারেন; সকলে বাবাকে ভয় করে।" এই বলিয়া জাঁক করিতে করিতে বালিকা এমনি ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল যেন তিনি রাজার মেয়ে আর কি!

যখন এইরূপ গল্প হইতেছিল, তখন একটী দুঃখীর ছেলে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল, সে ছেলেটীর নাম রমেশ। রমেশ বেচারা একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তার সাধ্য কি এই সকল ভাগ্যবতী বড় লোকদের সঙ্গে কথা বলে; সে তাহাদের সুন্দর পোষাকের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল 'আহা! আমি যদি এদের মত হ'তাম!' কিন্তু 'শ'-যুক্ত নামের কথা শুনিয়া তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। "আমার নামের শেষে ত 'শ' আছে; তবেত আমি কখন বড় লোক কি বড় মানুষ হ'তে পার'ব না"—এই ভাবনায় রমেশ বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিল।

এই দিবসের লিখিত ঘটনার পর অনেক বৎসর চলিয়া গেল। পাঠক পাঠিকা! আসুন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বালক বালিকারা কে কোথায় গেল, খুঁজিয়া দেখি। ঐ দেখুন নীরজা দরিদ্রের ঘরে বড় ঘরের অহঙ্কার লইয়া গিয়া, শাশুড়ী, ননদিনীর সহিত কি ভয়ানক ঝগড়া বাধাইয়াছে, শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, সে হাসি নাই, এবং সে স্ফূর্ত্তি নাই! সুষমা মধ্যবিত্তের ঘরে পড়িয়াছে, সে ঝগড়া করে না বটে, কিন্তু নিজের অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া এবং দুবেলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাড় সার হইয়াছে। আর সরলা—তাহার কথা কি বলিব! ওই যে বিধবা দুটী ছোট ছেলেকে পাশে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, উহাঁকে চেনেন, উনিই সরলা। সে জাঁক নাই, পরের অধীন হইয়া কতক দুঃখে কতক সুখে দিন কাটাইতেছেন! আর সে গরিবের ছেলে রমেশ কোথায় গেল? ওই যে সুন্দর বাড়ীটী দেখিতেছেন, আসুন উহার মধ্যে যাই। ওই যে পুরুষটী যাঁহার নিকট অনেকে নানারূপ পরামর্শের জন্য আসিয়াছে, এবং যাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেছে, উহাঁকে চেনেন? কে জানিত যে, যে দুঃখীর ছেলে একদিন বড় লোকের মেয়েদের সহিত সাহস করিয়া কথা বলিতে পারে নাই, আজ সে বড় লোক হইবে? কিন্তু ফলে তাহাই হইল। ভয়ানক চেষ্টায়, ভয়ানক পরিশ্রমে, নিজের বুদ্ধি বলে রমেশ পৃথিবীতে বড় লোক হইল। বৃথা গল্প যে করে, পোষাকের জাঁক করিয়া, বড় গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া বাপের টাকা নষ্ট করিয়া যে বেড়ায় সেই বড় লোক, কি নিজের উন্নতির জন্য যে গরিবের মত থাকিয়াও প্রাণপণে পরিশ্রম করে সেই বড় লোক? কে বড় লোক তাহা আর বলিতে হইবে না। *

* এই প্রাপ্ত প্রবন্ধের স্থানে স্থানে আমরা পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

সখা-সম্পাদক।

হাবা গঙ্গারাম।

অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন কেহ কোন নির্ব্বোধের কার্য্য করিলে তাহাকে অন্যান্য গালাগালির মধ্যে "হাবাগঙ্গারাম" এবং "বোকা রামমোহন" বলিয়া গালি দেওয়া হইয়া থাকে। গঙ্গারাম কে ছিল, কোথায় তাহার বাড়ী ছিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না, তবে তাহার 'হাবা' নাম কেন হইল তাহার কতকগুলি গল্প আমরা শুনিয়াছি, তাহাই আজ পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিব। যাঁহাদের অধিক বয়স, তাঁহারা হয়ত এই গল্পের দুই একটী বা সমস্তগুলিই জানেন, কিন্তু আশা করি অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট ইহার প্রায় সমস্তগুলিই নূতন লাগিবে। আজ গঙ্গারামের কথা বলিলাম, পরে রামমোহনের কথা বলিব।

১। গঙ্গারাম যে বাড়ীতে চাকর ছিল, সেই বাড়ীর কর্ত্তা একজন বড় পুলিশ-দারগা ছিলেন, অনেক সাহেবসুবোর সহিত তাঁহার ভাব ছিল। গঙ্গারাম অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়াছিল যে সাহেবেরা বাড়ীতে আসিলেই তাহার বাবু মাথায় টুপি পরিয়া নিকটে গিয়া সাহেবের হাত ধরিয়া নাড়েন; গঙ্গারামের বিশ্বাস হইল সাহেব বাড়ীতে আসিলেই বুঝি এইরূপ করিতে হয়। একবার বাবু বাড়ীতে গেছেন, কিন্তু গঙ্গারাম বাসায় আছে, এমন সময় এক সাহেব একদিন বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিল। গঙ্গারামের বিশ্বাস ছিল সাহেবসুবো বাড়ীতে আসিলে যদি 'দস্তুরমত' ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে বাবুর বড় ক্ষতি। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া গঙ্গারাম যখনি দেখিল যে সাহেব আসিতেছে অমনি রান্নাঘরের কাজ রাখিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং বাবুর একটা টুপি মাথায় পরিয়া একটা কোট গায়ে জড়াইয়া বাহিরে গিয়াই সাহেবের হাত দুইহাতে ধরিয়া বিলক্ষণ ঝাঁকিয়া দিল। কিছু না বলিয়াও ছাড়িল না। বলিল "ফ্যাট্‌ফুট্ গাইড্—বাবু বাড়ীতে গেছে"!! এই "দস্তুরমত" ব্যবহারে সাহেব অবাক হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেল,—একমাস তাহার হাতে বেদনা রহিল। এদিকে রান্নাঘরে আসিয়া গঙ্গারাম বলিতেছে "হ্যা দাদাঠাকুর! বাবুর মান রেখেছি। সাহেবকে এমন আদব কায়দা দেখিয়েছি, যে আর কথা নাই।"

২। একবার একদল ডাকাত ধরিতে গিয়া গঙ্গারামের মনিবকে বড় বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ডাকাতেরা তাঁহাকে একলা পাইয়া এমন প্রহার করিয়াছিল যে বাবুটীর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান ছিল না। গঙ্গারাম এতক্ষণ মার না খাইয়াও চীৎপাৎ হইয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিয়া গোঁ গোঁ করিতেছিল, বাবু চৈতন্য পাইয়া ডাকিলেন 'গঙ্গারাম'! গঙ্গারাম চক্ষু না খুলিয়াই বলিল "দোহাই বাবা! আমার কেবলার আমি বই কেউ নাই।"—বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেন গোঁ গোঁ কর—ডাকাত নাই; চোখ খোল।" গঙ্গারাম কাঁপিতে কাঁপিতে চক্ষু খুলিলে বাবু বলিলেন—"কোথায় কবিরাজ বাড়ী আছে যাও, এক চোঙ্গা ওষুধ তেল নিয়ে এস—বেদনায় প্রাণ গেল।"—সেই ঘরে এক পোয়া ওজনের একটী বাঁশের চোঙ্গা ছিল। গঙ্গারাম সেইটী লইয়া তেল আনিতে গেল। কবিরাজবাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে গঙ্গারাম যে সকল কাণ্ড করিল, তাহা বলার নয়।—যাক্, কবিরাজবাড়ীতে গিয়াই সে মনিবের জন্য ঔষধ চাহিল। কবিরাজের লোক চোঙ্গা পূরিয়া ঔষধ দিল। পাড়াগেঁয়ে চাষালোকের কেমন দর করা অভ্যাস—গঙ্গারাম বলিল "একটু ফাঁউ দেবে না?" কবিরাজের লোক বলিল "কোথায় নেবে?" গঙ্গারাম আস্তে চোঙ্গাটী উল্‌টাইয়া ধরিল, বলিল "এইখানে দাও।" কবিরাজ বলিলেন "সব পড়িয়া গেল যে।" গঙ্গারাম দেখিয়াও সে কথা বিশ্বাস করে না, বলিল "অ্যাঃ, আর

যেতে হয় না, ওটুকু খারাপ ; ভালটুকু ভিতরে আছে।" কবিরাজ হাসিয়া অপর দিকের ফাঁপা যায়গাটা ঔষধে পূরিয়া দিলেন। গঙ্গারাম 'বড় জিতিয়াছি' ভাবিয়া মনিবের নিকটে আসিল। মনিব বলিলেন "আর কোথা? মোটে এইটুকু?" গঙ্গারাম বলিল "ওদিকে আছে।" মনিব বলিলেন "যা যা! আর চালাকী কর্‌তে হ'বে না।" গঙ্গারাম বলিল "এমনি বোকা পেয়েছেন আর কি? এই দেখুন।"—এই বলিয়া চোঙ্গাটী উল্‌টিয়া ধরিতে, যেটুকু ছিল তাহাও পড়িয়া গেল। বাবু তাহাই কোন মতে আঙ্গুলে টানিয়া লইয়া মাখিলেন। সে দিন শনিবার ছিল—গঙ্গারাম চিরকাল বিশ্বাস করিত যে তাহার দোষে নয়, কিন্তু শনির দোষে অন্য দিকের তেল উড়িয়া গিয়াছিল।

৩। একবার গঙ্গারাম মনিবের সহিত নৌকায় চড়িয়া কোন দূরস্থানে যাইতেছিল, অনেক জিনিষ—বিছানাপত্রে নৌকা বোঝাই। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় নদীতে পড়িয়া নৌকা ঢেউএর বেগে ভয়ানক টলিতে লাগিল। মাঝিরা বলিল "কর্ত্তা! নৌকা বড় বোঝাই হইয়াছে, তাই এত টলিতেছে।" গঙ্গারাম এতক্ষণ কর্ত্তার পশ্চাতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ভাবিতেছিল নৌকা ডুবিলে কর্ত্তাকে ধরিয়া বাঁচিবে,—মাঝির এই কথায় তাহার মনে একটা বুদ্ধি হইল। সে বলিল "বাবু! এক কাজ করলে হয় না? বোঝাটা একটু কমিয়ে ফেলি!" বাবু বলিলেন "কেমন করে?" গঙ্গারাম বলিল "ইঃ—এমনি বোকা পেয়েছেন আর কি? এই দেখুন"; এই বলিয়া কতকগুলি বিছানা বালিশ, ইত্যাদি এক সঙ্গে বাঁধিয়া মাথায় করিয়া বসিল। বাবু বলিলেন "ও কিহে?" গঙ্গারাম বলিল "এখন আমার মাথায় বোঝা, নৌকার মাথায় ত আর নয়? তবেই নৌকা পাত্‌লা হল।" সেই সময় ভাগ্যক্রমে ঢেউ কমিয়া আসিয়াছিল, দেখিয়া গঙ্গারাম বলিল—"দেখুন বাবু—বোঝা কমে গেছে; কৈ আর তো নৌকা টল্‌ছে না। হাঁ! কেমন বুদ্ধি খেলেছি।"

৪। গঙ্গারাম একবার দুমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছিল। এক বুড়োমা এবং কেবলা নামে একটী ছোটছেলে ভিন্ন গঙ্গারামের আর কেহ নাই। গঙ্গারাম বাড়ীতে আসিয়াই খুব ঘটা করিয়া বড়লোকের মত বেড়াইতে লাগিল; কারণ সে বড়লোকের চাকর। সে প্রাতঃকালে খাইয়াই তাস পাশা খেলে, ছেলেকে আদর করে, এবং পাড়ার দশজনের সঙ্গে নানারূপ গল্প করে,—বৈকালে বেড়ায়; হাটবারে হাট করিয়া বাড়ীতে আসে। রাত্রিতে বুড়োমাকে সাহেবের গল্প, ডাকাতের গল্প, প্রভৃতি নানারূপ গল্প বলে। এইরূপে অনেক দিন যায়, একদিন হাটবারে গঙ্গারাম একটী টাকা লইয়া হাটে লবণ কিনিতে গেল। পথে খানিক দূরে গিয়া দেখিল ৪ ক্রোশ দূরে যে জমীদারের বাড়ী আছে সেখানকার হাতী মাহুতকে পিঠে করিয়া ঘাস লইতে আসিয়াছে। হাতী দেখিয়াই গঙ্গারামের "বড়লোকের চাল"টা বাড়িয়া গেল। সে মাহুতকে ডাকিল, "ও মাহুত, মাহুত! আমায় হাতী চড়াবি।" মাহুত বলিল "কত দেবে?" গঙ্গারাম লবণ কিনিবার টাকাটী বাহির করিয়া বলিল "একটী টাকা।" মাহুত বলিল "এস।" গঙ্গারাম বলিল "আমাকে কিন্তু সমস্ত গ্রাম ঘুরাইয়া বাড়ীর কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।" মাহুত তাহাতেই রাজি হইলে গঙ্গারাম হাতীর পিঠে উঠিল। উঠিয়া গঙ্গারামের বাহার দেখে কে! হাতীর চলিবার ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া গঙ্গারাম "হ্যাইও! হ্যাইও!" করে, এবং যাহাকে পথে দেখিতে পায়, তাহাকেই বলে "কিহে খবর কি! বাড়ী যাচ্ছি!" যখন মাহুত গঙ্গারামকে বাড়ীর কাছে নামাইয়া দিল, তখন গঙ্গারামের মা সেখানে ছিলেন না; ছেলের এমন বাহার মা দেখিলেন না, ইহাতে গঙ্গারামের বড়ই কষ্ট হইল। যাক্, কি হবে? গঙ্গারাম বুক

শিক্ষা হইয়াছে। ভারতবর্ষে তাঁহার আসা নূতন, কিন্তু যে বুদ্ধিমান সে নূতন যায়গাতেও আপনার পথ খুঁজিয়া লইতে পারে। ডফরীণ সুস্থ শরীরে ভারতের উপকার করিয়া ভারতবাসীর সুখ্যাতি লাভ করিয়া যাইতে পারেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সুরেশের শিক্ষা।

একদিন ভাদ্রমাসে বৈকালে ভয়ানক ঝড় হইতেছিল। আকাশ কালবর্ণ মেঘে চারিদিক পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুত-চমকে আরও ভয়ানক দেখা যাইতেছিল। পথ ঘাটে লোক নাই। প্রাণীর চিহ্ন মাত্র নাই। সুরেশচন্দ্র এই ভয়ানক ঝড়ের মধ্যে দ্রুতবেগে চলিয়াছে, কোথায় যাইতেছে তাহার ঠিক নাই, যে দিকে পা চলিতেছে সেই দিকেই চলিয়াছে। সুরেশ ক্রোধে অধীর; চক্ষু দিয়া আগুণ বাহির হইতেছে, পাগলের ন্যায় ক্রমাগতই চলিয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আর পথ দেখা যায় না, কিন্তু বিদ্যুতের আলোতে সুরেশ বুঝিল গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি বিশ্রাম নাই, সেই ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সেই গাঢ় অন্ধকারে সুরেশ একাকী মাঠের মধ্যে চলিতে লাগিল।

এইখানে সুরেশচন্দ্রের একটু পরিচয় দিব। সুরেশচন্দ্র ধনীর সন্তান, তাঁহার অনেক ধন সম্পত্তি ছিল, এই ধন সম্পত্তির সুরেশই একমাত্র অধিকারী। আমাদের দেশে ধনীর সন্তানগণ প্রায়ই বাল্যকাল হইতে অন্যায় আদরের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া কালে অতি ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়। সুরেশের তাহাই হইয়াছিল—সে অসঙ্গত আদরে অতিশয় 'আবদারে' ছেলে হইয়া দাঁড়াইল। যখন যাহা ইচ্ছা করিত, কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিত না। ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতা বড় বাড়িয়া গেল। ক্রমে অসৎসঙ্গ জুটিতে লাগিল; বড়লোকের ছেলের প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে,—সুরেশ কুপথে চলিতে আরম্ভ করিল। সুরেশের মাতা অতিশয় ধার্ম্মিকা ছিলেন, তিনি সন্তানের এরূপ চরিত্র দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলেন। সুরেশ প্রায়ই গৃহে থাকিত না, কাজেই মাতার সঙ্গে বড় একটা সাক্ষাৎ হইত না। যদি কখনও দেখা হইত মাতা তাহাকে নানা প্রকার উপদেশ দিতে চেষ্টা করিতেন, অসৎপথ ছাড়িয়া সৎপথে চলিবার জন্য নানা প্রকারে বুঝাইতেন; কিন্তু সুরেশ কিছুতেই কাণ দিত না।

একদিন সুরেশের মাতা শুনিলেন যে, সুরেশ কতকগুলি অসৎ বালকের সঙ্গে মিলিয়া কোন প্রতিবাসীর গৃহে নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছিল, এমন সময় কোন একটী লোক আসিয়া সুরেশকে বাধা দেয়; সুরেশ ইহাতে রাগে অন্ধ হইয়া দল বল লইয়া সেই লোকটীর গৃহে আগুণ দিয়া পোড়াইয়া দিয়াছে, এবং প্রহার করিয়া সে লোকটীকে আধমরা করিয়া ফেলিয়াছে। লোকটী অতি দরিদ্র, তাহার একটী ছোট মেয়ে ছিল, সে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। সুরে-

শের মাতা এ সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার যার পর নাই কষ্ট হইতে লাগিল, তিনি চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না, দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেশের মাতা অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, আজ তিনি সুরেশকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কার সুরেশের সহ্য হইল না; সুরেশ মাতার তিরস্কার শুনিল, কিন্তু এদিকে যে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গিয়াছে ক্রোধান্ধ সুরেশ তাহা দেখিতে পাইল না, স্নেহময়ী মাতাকে শত্রু মনে করিল। সেই মুহূর্ত্তেই সুরেশ বাটীর বাহির হইল।

রাত্রি অধিক হইল তবু সুরেশ ফিরিল না। সুরেশের মাতা বিশেষ চিন্তিতা হইলেন। চারিদিক লোক পাঠাইলেন। কেহ কেহ ফিরিয়া আসিল, কেহ কেহ তখনও ফিরিল না, কিন্তু সুরেশের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

এদিকে সুরেশ সেই মাঠ পার হইয়া এক ভয়ানক বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও ঝড় বৃষ্টি আসে নাই, আবার অন্ধকারে কিছু দেখাও যাইতেছে না। সুরেশ চলিতে চলিতে এক একবার পড়িয়া যাইতেছে, আবার উঠিয়া চলিতেছে, কোথাও কাঁটা বিদ্ধিয়া শরীর রক্তাক্ত হইতেছে। ক্রমে সুরেশ বড়ই ক্লান্ত হইল, অবশেষে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোকে সম্মুখে মন্দিরের মত দেখিল। সুরেশ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল দ্বার খোলা। মন্দিরের ভিতরে গিয়া সুরেশ ডাকিল—"এখানে কে আছ?" কোন উত্তর নাই, আবার ডাকিল,—এবারও কোন উত্তর নাই, কেবল নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল। সুরেশ বড়ই ভয় পাইল। ভয়ে, পরিশ্রমে, শীতে অবসন্ন হইয়া মন্দির মধ্যে বসিয়া পড়িল। ক্রমে শরীর আরও অবসন্ন হইয়া আসিল। ক্রমে সুরেশ চেতনা হারাইল। তখন সেই অজ্ঞান অবস্থায় সুরেশ দেখিতে লাগিল: যেন সে এখনও বালক। তাহার মাতা তাহাকে ডাকিয়া কোলে লইলেন, কতকগুলি বহু মূল্য বসন ভূষণ আনিয়া একে একে সেইগুলি দিয়া সুরেশকে সাজাইয়া দিলেন। সুরেশকে অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তখন মাতা বলিলেন—"দেখ সুরেশ! এইগুলি আমি তোমার জন্য রাখিয়াছিলাম, আজ তোমাকে এইগুলি দিয়া সাজাইয়া দিলাম, এগুলি অতি মূল্যবান জিনিস, অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিও; যাও এখন তোমার ইচ্ছামত গিয়া খেলা কর, কিন্তু সাবধান যাহা তোমাকে দিলাম, তাহা যেন হারাইও না।" সুরেশ মহা আনন্দে ছুটিয়া বাহির হইল। দৌড়িয়া আসিয়া পাড়ার বালকদের সঙ্গে মিশিল। দলে দলে বালক-বালিকা খেলিতেছিল, সুরেশ আসিয়া একদলে মিশিল; সে দলে বনিল না, সুরেশ আর এক দলে গিয়া মিশিল। তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে সুরেশ বাড়ীর কথা ভুলিয়া গেল; সুরেশের সঙ্গীগণ তাহার বসন ভূষণ দেখিয়া 'হিংসা' করিয়া, কেহ সুন্দর পোষাকটী ছিঁড়িয়া দিল, কেহ বা একখানি অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া দিল, কেহ বা তাহাকে ভুলাইয়া কতক লইয়া গেল। সুরেশ তখন এমনি খেলায় মত্ত যে, সে তাহাতে বড় আপত্তি করিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া গেল। সুরেশ তখন দেখিল বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে যাহারা ছিল তাহার একজনও এখন নাই, সেই অন্ধকারে

সুরেশ একাকী। তখন তাহার মাতার কথা মনে পড়িল; নিজের দিকে তাকাইয়া দেখিল বসন ভূষণ অনেক নাই, যাহা আছে ছেঁড়া বা ভাঙ্গা। তখন সুরেশ ভয়ে দুঃখে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হইল। চক্ষু মেলিয়া সুরেশ চাহিয়া দেখিল কাহার কোলে তাহার মাথা রহিয়াছে, প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যের কিরণ অল্প অল্প দেখা দিতেছে। সুরেশ চমকিয়া উঠিয়া বসিল, দেখিল তাহার সম্মুখে এক জন সন্ন্যাসী। সুরেশ কোন কথা বলিতে পারিল না, অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। তখন সেই সন্ন্যাসী বলিলেন "তোমার কোন ভয় নাই, এ আমার বাসস্থান। কিন্তু তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে, আর এখনই বা কেন এ প্রকার চীৎকার করিয়া উঠিলে?"—তখন সুরেশ পূর্ব্ব দিন বৈকালের ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় যাহা যাহা দেখিয়াছিল, সমস্তই বলিল; বলিয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী কতক্ষণ স্থির ভাবে রহিলেন। তার পর গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—"বুঝিয়াছি, তোমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান এই স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, মনোযোগ দিয়া শুন, ইহার মধ্যে অতি সুন্দর উপদেশ আছে।" সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—"দেখ, ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি কতকগুলি সৎগুণ ও প্রবৃত্তি দিয়া পৃথিবীতে পাঠান। সেই গুলিই আমাদের প্রকৃত ভূষণ, আমাদের প্রকৃত অলঙ্কার। তুমি যে দেখিয়াছ তোমার মাতা তোমাকে রমণীয় ভূষণ দিয়া সাজাইয়া দিলেন, তাহার অর্থ এই যে, যিনি জগতের মাতা তিনি সৎগুণ-রূপ যে ভূষণ তাহা দ্বারা তোমাকে সাজাইয়া দিলেন। এবং সেই গুলি যত্নে রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। তুমি ক্রমে বড় হইলে; কুসঙ্গে মিশিয়া মাতার কথা ভুলিয়া বাড়ী হইতে অনেক দূরে চলিয়া গেলে—অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভুলিয়া কুপথে চলিতে আরম্ভ করিলে। তোমার সৎগুণ দেখিয়া শুনিয়া তোমার সঙ্গীদের হিংসা হইল, কেন না তাহারা অনেক দিন তাহাদের সৎগুণ গুলি হারাইয়াছে। ক্রমে অসৎকার্য্যে মতি লওয়াইয়া তোমার প্রকৃত ভূষণ যাহা তাহা নষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে তোমাকে পাপরূপ অন্ধকারের মধ্যে ফেলিয়া তাহারা পলাইল। বাস্তবিক তুমি সমস্তই হারাইয়াছ, ভাবিয়া দেখ ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিয়াছিলেন তাহার একটীও এখন তোমার নাই। যাহা হউক যে উপদেশ তুমি পাইলে তাহা কখনও ভুলিও না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর তিনি আবার তোমাকে বসন ভূষণে সাজাইয়া দিবেন। তবে যাও গৃহে ফিরিয়া যাও, মাতার কাছে কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং যাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর।" সুরেশ সমস্ত শুনিল, সমস্ত বুঝিল; সেই দিন সুরেশের জ্ঞান হইল। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সুরেশ বাড়ী ফিরিল।

সুরেশ বাড়ী আসিয়াই মাতার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল, মাতা তাহাকে আদরে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। তারপর যাহাদিগের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল সুরেশ তাহাদিগের নিকট ক্ষমা চাহিল এবং যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করিল। মাতা ও আত্মীয়েরা সুরেশকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ করিতে লাগিলেন। সুরেশের নূতন ব্যবহার, নূতন চরিত্র দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। সুরেশ চিরজীবন সেই অমূল্য

উপদেশ মনে রাখিয়া, ধর্ম্মপথে থাকিয়া নানা প্রকার সৎকার্য্যে মন দিল।

যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা।

রামগোপাল বাবুকে তাঁহার ছেলে মেয়েরা ভয়ানক ভয় করে। কিন্তু তিনি যে ছেলেদের মারেন তাহা যেন কেহ মনে না করেন। কোন ছেলে কিছু অন্যায় কাজ করিলে রামগোপাল বাবু এমনি মুখ ভার করিতেন যে, তাহাতেই ছেলেদের শাস্তি হইয়া যাইত, এবং ছেলেরাও, পাছে বাবা মুখ ভার করেন, এই ভয়ে সাবধান হইয়া চলিত।

একবার রামগোপাল বাবু ঠিক করিলেন, ছেলেদের আলিপুরের পশুশালায় লইয়া যাইবেন। বাবার আজ্ঞা পাইয়া ছেলেরা সুন্দর পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইল। বড় ছেলেটীর নাম মনোরঞ্জন, সে স্বভাবতঃই কিছু চঞ্চল, এক দণ্ডও স্থির হইয়া বসিতে পারে না; কখনও লাফাইতেছে, কখনও গাছ বা থাম ধরিয়া ঘুরিতেছে, কখনও বা গাড়ীর চাবুক গাছটা হাতে করিয়া শপাং শপাং শব্দে রাস্তার দু পাশের কাঁটা গাছ বা অন্য আগাছার মাথাগুলি কাটিতে কাটিতে ছুটিতেছে, হয়ত কাঁটা এবং চাবুক ছুয়েতে জড়াইয়া কাপড়ের পাড়টা ছিঁড়িয়া গেল, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।—মনোরঞ্জন পোষাক পরিয়া আসিয়া দেখিল, তখনও গাড়ী আসে নাই এবং তাহার পিতা তখনও প্রস্তুত হন নাই। তাহার বড় ইচ্ছা হইল যতক্ষণ গাড়ী না আসে, ততক্ষণ "ঝাঁ ক'রে এক পাক" বেড়াইয়া আসে—বলিল "বাবা! আমি এই রাস্তায় একটু ঘুরে বেড়াব?" পিতা বলিলেন—"তা যাও; কিন্তু সাবধান! যদি কোন রকমে পোষাক নোংরা করিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেল, তা হ'লে তোমাকে নিয়ে যাব না।" ছেলে মনের আনন্দে সেই পাড়াতেই তার পিসীর বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু পাঁচ সাত মিনিট পরে মনোরঞ্জন যখন ফিরিল, তখন রাম গোপাল বাবু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে তাহার সমস্ত শরীরে কাদা, এক পাটী জুতো কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে, এবং হাতের খানিকটা যায়গায় কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। রামগোপাল বাবু ছেলের এই দুর্দশা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু এমন অসাবধান ছেলের শাস্তি হওয়া উচিত, এই মনে করিয়া মুখ ভার করিয়া বলিলেন—"যা বারণ করেছিলাম, তাই ক'রে ব'সেছ? যাও, তোমার মায়ের কাছে, গা হাত পা ধুয়ে ফেল গিয়ে, তোমাকে নিয়ে যাবনা।" মনোরঞ্জন জানিত, তাহার বাবা মুখ ভার করিলে আর তাঁর সঙ্গে তর্ক করা চলে না; তবুও বলিল "বাবা! আমি ইচ্ছা ক'রে—," রামগোপাল বাবু বলিলেন "আমি তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না। আমার কাছ থেকে যাও।" মনোরঞ্জন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গাড়ী তৈয়ার হইয়াছিল, রামগোপাল বাবু অন্য ছেলে মেয়েদের লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং ভগিনীর বাড়ীর নিকট দিয়া না গিয়া অন্য পথে আলি-

পুরে গেলেন। কিন্তু সে দিন পশুশালা দেখিয়া কাহারই সুখ হইল না—ছোট ছেলে মেয়েদের কেবলি দাদার কাঁদ কাঁদ মুখ খানি মনে পড়িতে লাগিল এবং রামগোপাল বাবুরও বড় কষ্ট হইতে লাগিল। যাহা হউক কোন রকমে পশুশালা দেখিয়া তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন। আসিবার সময় একবার ভগিনীকে দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা হওয়াতে রামগোপাল বাবু গাড়ীটা অন্যপথ দিয়া ঘুরাইয়া আনিলেন। যখন ভগিনীর দরজায় নামিলেন, তখন দেখিলেন তাঁহার ভগিনী ছুটিয়া আসিতেছেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন "দাদা! মনু কোথায়? আহা! আহা! বেঁচে থাক্। বাছার হাত পা ভাঙ্গে নি তো। তাকে সঙ্গে করে আন নি কেন?" রামগোপাল বাবু বলিলেন "কেন বল দেখি? আর তার হাত পা ভাঙ্গার ভয়ই বা কেন করছ?" ভগিনী বলিলেন "তা কি শোন নাই? সে কি কিছু বলে নাই? আহা! বাছা আমার কাছে না থাকলে আমার খুকীর কি হ'ত? খুকী খেয়ে ওই পুকুরে মুখ ধুতে গিয়েছিল; তা'যে পুকুর তাতো দেখ্তেই পাচ্ছ? এক ফোঁটা জল আর কেবলি কাদা। ওই যে কাঠ ফেলা, ওর উপর বসে খুকী খুব উবুড় হয়েও কোন মতেই জল নাগাল পায় না, শেষে একবার যাই খুব চেষ্টা করতে গেছে, আর অমনি মুখ থুবড়ে সেই কাদা জলের মধ্যে পড়ে হাবু ডুবু খেতে লাগিল। মনু সেই সময় কোথা থেকে সেইখানে এসেছিল, দেখ্তে পেয়েই লাফিয়ে পড়্ল এবং খুকীকে কোলে করে টান্তে টান্তে কাঠের কাছে নিয়ে এল, এমন সময় আমি এসে দেখ্লাম সে খুকীকে কাঠের উপর তুলে দিয়ে সে নিজে উঠ্ছে, কিন্তু তাহাকে উঠ্তে খুব কষ্ট পেতে হ'ল। জোর দিয়ে উপরে উঠ্তে গিয়ে তার হাতটা কেটে গেল, আর এক পাটী যুতো কাদাতে লেগে রইল। উপরে উঠ্লে আমি তার মুখে চুমো খেয়ে বল্লাম 'লক্ষ্মীবাবা আমার, এসো তোমার গা হাত পা মুছিয়ে দি।'—তা সে আমার কথা না শুনেই দৌড়ে চলে গেল।"

রামগোপাল বাবু ছেলের কথা শুনিয়া আনন্দে ভাসিয়া গেলেন। গায়ে কাদা লাগিলেই যে শাস্তি দিতে হইবে, তাহা নহে; তাঁহার ছেলে যতই কাপড় ময়লা করুক এবং যতই যুতো হারাইয়া ফেলুক, তাহাকে নিন্দা না করিয়া বরং কোলে করিয়া নাচান উচিত, রামগোপাল বাবু তাহা বুঝিলেন, এবং সমস্ত না শুনিয়া তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন বলিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। ছেলেদেরও দাদার কীর্ত্তি শুনিয়া মহা আহ্লাদ, তাহারা এতক্ষণ বাবার ভয়েতে কিছু বলে নাই; এখন বলিল "হ্যাঁ! বাবা, তুমি কেন দাদাকে কাঁদালে, তোমার বড় অন্যায়।"

রামগোপাল বাবু তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মনোরঞ্জন মনের কষ্টে না খাইয়াই বিছানায় গিয়া পড়িয়াছে, এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া গিয়াছে। রামগোপাল বাবু ঘুমান ছেলের নিকটে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। মনোরঞ্জনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রামগোপাল বাবু বলিলেন—"আমার যাদুধন! তোমার বাবাকে মাপ কর। আমি না জেনে তোমায় শাস্তি দিয়াছি। তুমি দুশ যোড়া যুতো ছেঁড়, তাতেও আমার আর কষ্ট নাই। পরের ভাল করতে গিয়ে গায়ে আঁচড় লাগ্লে, সেতো সোণার দাগ্।" মনোরঞ্জন কিছু থতমত খাইয়া বলিল "আমি সত্যই বলেছি বাবা! আমি ইচ্ছা

করে পোষাকে কাদা লাগাই নাই, আর যুতো হারিয়ে ফেলি নই। তা তুমি তখন শুনলে না, আমি কি করব? আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল, ইহা আমি বুঝেছি, কিন্তু আমি ইচ্ছা করে অসাবধান হই নাই; তুমি আমায় ক্ষমা কর।”

বালিকাদিগের বিশেষ বিষয়।

সেলাই।

(নং ১)

পাঠিকাগণ! তোমরা এতদিন ধরিয়া ‘সখা’ পড়িতেছ কিন্তু ইহা পড়িয়া চন্দ্রপুলি ছাড়া আর কিছুই প্রস্তুত করিতে শেখ নাই। এজন্য এবার থেকে যাহাতে তোমরা ‘সখা’ পড়িয়া কিছু প্রস্তুত করিতে শেখ তাহার চেষ্টা করা যা’বে। এবার-কার ‘সখা’ বাহির হইতে হইতে শীত আসিয়া পড়িল, এজন্য এবার তোমাদের শীতকালের ব্যবহার্য্য কিছু প্রস্তুত করিবার কথা বলা হইবে। তোমরা অনেকেই হয়ত শীতকালে বাবার, জ্যাঠার, কাকার, মামার, দাদার বা ছোট ভাই বোনের জন্য গলাবন্ধ বুনিয়া থাক কিন্তু প্রত্যেক বারেই হয়ত একই রকমের বোন। সেই জন্য এবার নূতন রকম করে বুনিবার বিষয় কিছু লেখা যাইতেছে।

প্রথমে কি কি রং দিয়া বুনিলে ভাল হয় বলি, পরে কি করিয়া বুনিতে হয় তাহা বলিব। যদি খুব বড়দের জন্য বুনিতে হয় তাহা হইলে শুধু সাদা, পাঁশুটে রং, কটা রং বা সাদাতে কালতে; আর মাঝারি গোছের লোকের জন্য বুনিতে হইলে শুধু সাদা, সাদাতে নীলেতে, সাদাতে বেগুণীতে, পাঁশুটে রংয়েতে নীলেতে কিম্বা সেই যে একটুখানি সাদা আর একটুখানি নীল বা বেগুণী পশম পাওয়া যায় তাহাতে; আর যদি খুব ছোটদের জন্য বুনিতে হয় তবে সাদাতে ফিকে গোলাপীতে কিম্বা সাদাতে লালেতে বুনিলে ভাল হয়। এবার যে রকম করিয়া বুনিবার কথা লেখা যাবে সে রকম করিয়া বুনিতে হইলে চেরা পশম দিয়া বুনিতে হয়। একেবারে ভাল পশম দিয়া না বুনিয়া প্রথমে তোমাদের কাছে যদি একটু আধটু খারাপ পশম থাকে তাহা দিয়া বুনিয়া দেখিবে কিরূপ দেখায়, পরে ভাল পশম দিয়া বুনিতে আরম্ভ করিবে।

যত বড় বুনিবার দরকার তত বড় করিয়া বুনিতে হইলে সাধারণতঃ যত ঘর নিতে হয় তার দ্বিগুণ বড় যাহাতে হয় সেই আন্দাজে ঘর নিতে হইবে। ঘরের সংখ্যা এত হওয়া চাই যে যেন সেই সংখ্যাকে ১৩ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকে।

ঘর নেওয়া হইলে প্রথমে ৮ লাইন সোজা বুনিতে হইবে, তাহার পর

প্রথম লাইন—২টা ঘর সোজা, * ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, ২টা ঘর এক সঙ্গে

সোজা ; এই যে দুইবার ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা বুনা হইল ইহাতে ২টা ঘর কমিয়া যাওয়াতে এবার ঘর বাড়াইবার জন্য পশম সম্মুখে আনিয়া ১টা ঘর সোজা এইরূপে আরও তিনবার পশম সম্মুখে আনিয়া ৩টা ঘর সোজা, ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, ১টা ঘর সোজা পুনরায় * চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

২য় লাইন—প্রথমে ৪টা ঘর উল্টা ও একেবারে শেষে ৪টা ঘর উল্টা মধ্যে ক্রমাগত ৭টা ঘর সোজা ও ৬টা ঘর উল্টা।

৩য় লাইন—সোজা।—

৪র্থ লাইন—উল্টা।—

পুনরায় প্রথম লাইন হইতে আরম্ভ কর ; এইরূপ বুনিতে বুনিতে যখন যতটা লম্বা দরকার ততটা লম্বা হইবে তখন ৮ লাইন সোজা বুনিয়া মুখ বন্ধ করিতে হইবে। মুখ বন্ধ করা হইলে ইহার সোজা দিকটা বাহিরে রাখিয়া লম্বা দিকে ঠিক দুপুরু করিয়া ভাঁজ করিতে হইবে তাহা হইলে যত চওড়া ছিল ঠিক তাহার অর্দ্ধেক চওড়া হইবে। ভাঁজ করা হইলে ইহার দুই ধার বরাবর এক সঙ্গে কারপেটের ছুঁচ ও যে রংয়ের পশম দিয়া বুনা হইয়াছে সেই রংয়ের চেরা পশম দিয়া জুড়িয়া যাইতে হইবে এবং অন্য গলাবন্ধের দুই দিকে যেরূপে ঝালর দিতে হয় সেইরূপে ঝালর দিতে হইবে তাহা হইলেই দেখিবে যে সুন্দর একটী দুহারা গলাবন্ধ হইয়াছে। পাঠিকাগণ! এখন হয়ত বুঝিতে পারিয়াছ কেন তোমাদের যত ঘর নেওয়ার দরকার ছিল তাহার দ্বিগুণ ঘর লইতে বলিয়াছিলাম।

কেরাণী পাখী।

ক্ষিটীর নাম শুনিয়া পাছে কেহ রাগিয়া বসেন, এই জন্য আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে, এ নাম আমরা নূতন দিতেছি না। পাখীর মাথার পালকের ঝুঁটি গুলিতে ঠিক কাণে-কলম-গোঁজা কেরাণীর মত দেখা যায়, এই মনে করিয়াই কোন একজন লোক ইহার এই নাম রাখিয়াছিল। সেই অবধি আর বেচারা পাখীর এ দুর্নাম ঘুচিল না।

পক্ষিটীর ইংরাজী নাম 'Secretary Bird' এই নামের অর্থ "বড় লোকের বড় কেরাণী।" পাখীর ইংরাজী নামে তবু একটু গৌরব আছে, বাঙ্গালা করিতে গিয়া তাহাও রহিল না, কি করি ?

কেরাণী-পাখী আফ্রিকাতে এবং অন্যান্য গরম দেশে বাস করে। সেই সেই দেশের সকল লোকেই, বিশেষতঃ চাষারা এই পাখীকে অতি যত্নে রক্ষা করে। তোমরা জান, গরম দেশে সাপ, ব্যাঙ্গ, পোকা প্রভৃতি লোককে কত জ্বালাতন করে। পোকাতে ধানের ক্ষেতে পড়িয়া, ঘরের খাবার জিনিসে বসিয়া, গরু, মহিষ, ঘোড়ার গায়ে লাগিয়া বড়ই অনিষ্ট করে। কেরাণী-পাখী

মানুষের অপকারী এই সকল জীব ধরিয়া খায়। পাখিটীর প্রধান খাদ্য সাপ; তাহার অভাবে, পোকা, টীকটীকি, ছোট কচ্ছপ ইত্যাদিতেও আমাদের কেরাণী মহাশয়ের আপত্তি নাই। ছোট খাট সাপ হইলে তাহাকে একছোঁতে ধরিয়া লইয়া গিয়া কেরাণী-পাখী গাছের ডালে আছড়াইয়া মারে, কিন্তু বড় সাপ হইলে তাহার সঙ্গে বিস্তর যুদ্ধ করিতে হয়। ছবিতে দেখ, একটা সাপের সঙ্গে আমাদের পাখিটীর কি ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধিয়াছে! সাপ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেরাণী-পাখী ডানা আগলাইয়া তাহার পলাইবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং নখের আঘাতে ও ডানার ঘায়ে সাপের বাছাকে নাকাল করিয়া তুলিতেছে, এ যাত্রা আর সাপের রক্ষা নাই!

কেরাণীকে দেখিতে যত তেজাল বোধ হয়, বাস্তবিক ইহার স্বভাব তত রাগী বা তেজাল নহে। কেরাণী-পাখী মানুষের শত্রু নষ্ট করিবার সময়েই আপনার তেজ দেখায়, কিন্তু অন্যান্য সময় আপনার প্রকাণ্ড বাসায় পক্ষিনীর সহিত মনের সুখে শান্তভাবে কাল কাটায়।

ঠাকুর দাদার গল্প।

মেঘ কি ?

আজ সকালে নবীন বাবু ছেলেদের লইয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন ; কিশোরী, অমূল্য, মন্মথ, চন্দ্রনাথ, দেবেন, নগেন, চারু, নলিন, মাখন, সকলেই সঙ্গে আছে। বড় শীত, সকলেরই গায়ে গরম কাপড়। কিন্তু খানিক চলিতে চলিতে শীত চলিয়া গেল, বেশ গরম হইয়া উঠিল। পরিশ্রম করিলে কি শীত থাকে ? যে সব ছেলেরা শীত বলিয়া প্রাতঃকালে বেড়াইতে যায় না তাহারা কুড়ে, জানে না প্রাতে বেড়াইলে শরীর কত ভাল হয়। আর সকালে বাহিরের বায়ু যেমন পরিষ্কার ও পবিত্র, বাড়ীর ভিতর ঘরের বায়ু তেমনি অপরিষ্কার ও রোগজনক। তা ছাড়া প্রাতঃকালে স্বভাবের অতি চমৎকার শোভা হয়, তাহা দেখিলে মন বড় পবিত্র হয়, ও অনেক ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা করা যায়। তাই বালকগণ ঠাকুর দাদার সঙ্গে বা আলাদা আলাদা প্রত্যহই প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হয়। আজ সকলে একত্রে বাহির হইয়াছে, কিছু শিখিতে হবে এই অভিপ্রায়।

নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে হইতে ক্রমে গঙ্গার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও সূর্য্য উঠে নাই। গঙ্গার জল হইতে ধূমের মত বাষ্প উঠিতেছে ; শিশিরে ঘাস, পাতা, সব ভিজিয়া গিয়াছে ; কাকেরা একটা গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইতেছে আর উচ্চৈঃস্বরে "কা" "কা" "কা" করিয়া চীৎকার করিতেছে। ঘাটে বসিবার যো নাই, ভিজা সুতরাং সকলে ফিরিলেন। আসিবার সময় কিশোরী বলিল "দাদা মশাই ! ঐ যে ধোঁয়ার মত কি জল থেকে উঠ্‌ছে ঐ কি বাষ্প ?"—নবীন বাবু বলিলেন "হাঁ।" কিশোঃ—"তবে যে আপনি বলেন বাষ্প দেখা যায় না ? এই ত বেশ্ দেখা যাচ্ছে ? এই কথাটা আর মেঘের কথাটা ভাল করে বুঝিতে পারি নাই, আজ বুঝাইয়া দিবেন ?" নবীন বাবু বলিলেন "চল বলিতে বলিতে যাই। কেমন নলিন ? একথা কি তোমার পক্ষে বড় শক্ত হবে ? (নলিন—"না") তবে মন দিয়া শুন। তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ, প্রথম ভাগ 'সখা'তে ১৪ পৃষ্ঠায় একথা একটু লেখা আছে, তা বরং খুলে দেখিও। এখন তোমরা একটু বড় হইয়াছ তার চেয়ে আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

"তাপ পেলেই যে সব জিনিস পাৎলা হয় তা এক দিন বলিয়াছি। পাৎলা জিনিস তাপ পেলে বাষ্প হয় তাও তোমরা জান। বাষ্প সবই অদৃশ্য নয়, অনেক রকমের বাষ্প আছে তাদের লাল, নীল কত প্রকার বর্ণ থাকে। কিন্তু জল উত্তপ্ত হইয়া যে বাষ্প হয় তাহার নাম জলীয় বাষ্প, উহার কোন প্রকার রঙ্ নাই।"

মন্মথ :—"তবে এই যে আমি হাই তুলি আর ধোঁয়ার মত বাষ্প বাহির হয়, ওর ও রঙ্ আছে ?"

নবীন বাবু—"ছিঃ ! ব্যস্ত হও কেন ? চিরকালই কি ছেলে মানুষ থাক্‌বে ? বল্‌ছি শুন না। মুখ দিয়া যে ধোঁয়া বাহির হয় বা জল হইতে যাহা উঠে তাহা কেবল শীতকালেই দেখা যায়, গ্রীষ্ম কালে মোটেই দেখা যায় না। (সকলেঃ-

"ঠিক কথা। কেন দাদা বাবু") তাহার কারণ আছে। গ্রীষ্মকালে কি বাষ্প উঠে না? তা নয়। বরং গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের তেজ বেশী ব'লে বেশী বাষ্প উঠে, কিন্তু দেখা যায় না কেন না সে সময়ে বায়ু গরম থাকে বলিয়া উহা বাষ্প অবস্থাতেই থাকিয়া যায় কাজেই অদৃশ্য থাকে। আর শীত কালে চারিদিকের বায়ু খুব ঠাণ্ডা, এজন্য যেই বাষ্প মশাই জল থেকে উঠেন, অমনি ঠাণ্ডা বাতাস লেগে জমাট্ বাঁধিয়া অতি সূক্ষ্ম জল কণা হইয়া যান। সেই সব জলের কণারা ঐ ধোঁয়ার মত দেখা যায়।"

কিশোরী—"দেখ অমূল্য! সে দিন তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে সেই বরফ থানার গা দিয়ে ধোঁ উড়্ছিল কেন, তার কারণ আমি এখন বুঝিতে পারিলাম। আচ্ছা, দাদা বাবু, বরফের গা দিয়ে গ্রীষ্মকালেও ধোঁ উঠে এই জন্য নয় যে—আগে বরফের গায়ে লেগে চারিদিকের বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা হয় তার পর যখন ঐ বরফ থেকে বাষ্প উঠে, তখনি অমনি ঐ ঠাণ্ডা বাতাসে লাগিয়া জমিয়া এই রকম সূক্ষ্ম জলকণা হইয়া যায় তাই দেখা যায়। না?"

নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "ঠিক বলিয়াছ। তোমরা সকলেই এখন বেশ্ বুঝিয়াছ বোধ হয় যে, ঐ যেটা ধোঁয়ার মত দেখা যায় ওটা বাষ্প নয়, অতি সূক্ষ্ম জলকণা। (সকলে:—"বেশ, উত্তম।") আচ্ছা! আর একটী কথা আছে। দিন রাত, সদা সর্ব্বক্ষণই জল থেকে বাষ্প উঠ্‌ছে। সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পুকুর, থানা, ডোবা, ভিজে মাটি, ভিজে কাপড়, গাছ ও প্রাণীদের শরীর, সব স্থান থেকেই জলীয় বাষ্প সর্ব্বদা বায়ুতে যাচ্ছে। বেশ! এটা উপরে উঠে কেন?—না; বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা ব'লে। উপরের বাতাস কিন্তু নীচের বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা কেন না যত উপরে যাওয়া যাবে ততই বাতাস কম, তা তোমরা জান, পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১১০ পৃষ্ঠা, ১ম ভাগ 'সখা' দেখ।) তবেই বুঝ্‌তে পার যে এই বাষ্পরাশি উঠিতে উঠিতে এমন এক স্থানেতে পৌঁছিবে যেখানে বাতাস এর চাইতে আর ভারী নয়। যেখানকার বাতাসের ভার, ইহার নিজের ভারের সমান। আরও পরিষ্কার করিয়া বলি। যত উপরে উঠা যায় ততই বায়ুর ভার কম; কাজেই নীচের বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা বাষ্পগুলো উঠ্‌তে উঠ্‌তে এমন জায়গায় পৌঁছাবেই পৌঁছাবে যেখানে বায়ুর অপেক্ষা আর সে হাল্‌কা নয়। সেখানে কি হবে? (সকলে "ভেসে থাক্‌বে।") ঠিক। সেইখানে গিয়া ঐ বাষ্প ভাস্‌বে।" নলিন বলিয়া উঠিল "তাই বুঝি মেঘ?" মন্মথ বলিল "সে কি রকম হবে? মেঘ ত দেখা যায়, বাষ্প কি দেখা যায়? আ বোকা! এই বুঝি শুন্‌ছ?" নলিন—"হাঁ হাঁ হাঁ! ঠিক বটে। আচ্ছা দাদা বল, তার পর মেঘ কি করে হয়?"

নবীন বাবু—"এদিকে পূর্ব্বে (সখা ১ম ভাগ, ১১১ পৃষ্ঠা দেখ) শুনিয়াছ, যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক। (সকলে, "হাঁ মনে আছে।") এখন ঐ বাষ্প উপরে উঠিবার সময় ক্রমেই ঠাণ্ডা যায়গায় পৌঁছাতে লাগিল, আর অমনি সেই জন্য—? (সকলে:—"জমিয়া সূক্ষ্ম জলকণা হইয়া গেল। কেমন?") হাঁ ঠিক। যত উপরে উঠে বাষ্প ততই শীতল স্থানে গিয়া শীতল বায়ুতে লাগিয়া জমিয়া যায়। এইটী শীতের শেষে বেশ্ সুন্দর দেখা যায়। মাঘ ফাল্গুন মাসে সমস্ত দিন যে বাষ্প উঠে, তাহারা উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু সে সময় বাতাস খুব ঠাণ্ডা কি না—তাই বেশী দূর উঠি-

বার পূর্ব্বেই জমিয়া যায় আর সকালবেলা পর্য্যন্ত অন্ধকার করিয়া 'কুয়াশা'হইয়া থাকে। (সকলেঃ—"বটে? তা জানতাম না। কি চমৎকার! কুয়াশা কি ক'রে হয় শিখে গেলাম। হাঃ হাঃ হাঃ!") আচ্ছা! আমারও বড় আহ্লাদ হচ্ছে। তোমরা নূতন নূতন বিষয় শিখিলে আমিও বড় খুসী হই। এখন আরও শুন। এই কুয়াশাটা যখন নীচে হয় তখনই দেখা যায়, আর যখন উপরে হয় তখন আর কুয়াশার মত দেখা যায় না; তখন উহাকে 'মেঘ' বলে। যেমন বড় বড় কলের চিমনী দিয়ে যে ধোঁয়া বাহির হয় তাহা খুব উপরে উঠিয়া ভাসিয়া থাকিলে ঠিক মেঘের মত দেখায় তেমনি এই কুয়াশাই উপরে ভাসিলে মেঘ হয়। বাস্তবিক দার্জ্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি উচু পাহাড়ের দেশে ঘরের জানালা দরজা খোলা থাকিলে এক এক খান মেঘ ঘরের মধ্যে ঢকিয়া কাপড়, মশারি সব ভিজাইয়া দেয়। সেখান থেকে বেশই বোঝা যায় যে, মেঘ কুয়াশা বৈ আর কিছুই নয়।"

কিশোরী—"ভাল, একটা কথা। কুয়াশা ত বেশী ক্ষণ থাকে না, একটু বেলা হ'লেই যায়, কিন্তু মেঘ যে সমস্ত দিন থাকে, আর অত উপরে যে জলের কণা থাকে, তা প'ড়ে যায় না কেন? বাষ্পই যেন বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা, জলকণা ত আর বাতাসের চেয়ে ভারী বৈ হালকা নয়? এটা কি রকম?"

নবীন বাবু বলিলেন "ঐ কথা নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে মহা গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে। আগে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে বাষ্প যখন জমিয়া সূক্ষ্ম জলকণা হয়, তখন তার সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম বায়ুর কণাও মিলিত থাকিত। আরও ভাল করিয়া বলি। মনে কর জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন জমিবার সময়ে জলের ছোট ছোট কণার সঙ্গে বিন্দু বিন্দু বাতাসও থাকিয়া যায়। তা একটা বরফের চাঁই মন দিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে। তাতে সূতার মত সরু সরু বাতাস থাকিবার পথ আছে দেখিতে পাইবে। এই জন্য বরফ জলের চেয়ে হাল্‌কা হয় ও ভাসে; ঠিক তেমনি বাষ্পের এক একটী কণার সঙ্গে বাতাস মিশান ছিল বলিয়া ঐ বাষ্প জমিবার সময় ঐ বাতাসটুকুও তার সঙ্গে জমিয়া যায়; ঠিক সাবানের ফেণার মত, তবে খুব ছোট। কাজেই জল ভারী হ'লেও বাতাস মিশান থাকে বলিয়া উপরের বায়ুতে ভাসে। এই ছিল আগেকার পণ্ডিতদের মত। আজ কাল 'হক্স্‌লী' 'টিণ্ডেল্‌' প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতদের মতে সেটা ঠিক নয়। ইহাঁরা বলেন যে জলের কণাগুলি এত ছোট, এত সূক্ষ্ম যে, তাহাদের বাতাসে ভাসিয়া থাকিবার কোন বাধা হয় না। মনে কর লোহা ত জলের চেয়ে ৭.৮৪ গুণে ভারী, কিন্তু কামারদের দোকান থেকে খুব গুঁড়া লোহা আনিয়া যদি জলে ফেলিয়া দাও দেখিবে ডুবিয়া যাবে না, দিব্যি ভাস্‌বে। তার মানে কি?—না, ভারী হলেও খুব সূক্ষ্ম কণা ব'লে ভাসিল। এও তেমনি, জল বায়ুর চেয়ে ভারী হ'লেও কণাগুলি এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে স্বচ্ছন্দে বাতাসের উপর ভাসিয়া থাকে। আরও একটা কারণ আমার বোধ হয় এই যে, বাতাস নাকি অনবরতই চলে বেড়ায় একটুও স্থির থাকে না, সে জন্যেও জলের কণাগুলি নামিতে পায় না। মনে কর একটা বড় জালায় এক জালা ঘোলা জল পূরিয়া যদি এক দিন রাখা যায় তবে সে সব ময়লা থিতিয়া জল পরিস্কার হয়, অর্থাৎ ঐ সব ধূলি-কণা জলের চেয়ে ভারী ব'লে নীচে পড়িয়া যায় কিন্তু যদি ঐ জালাটা নিয়তই নাড়া যায়,

তবে ধূলা কখন থিতিতে পায় না, জল ঘোলাই থাকে। এখানেও তেমনি হয়। বুঝেছ? মেঘ যে জলকণা হ'লেও ভাসে কেন, তার আরও একটা কারণ আমার বোধ হয় এই যে, মেঘেরা যেমন দেখায় তেমন কিন্তু নিশ্চল নয়। ভাল ক'রে দেখিলেই টের পাবে যে একখানা মেঘের ক্রমিক চেহারা বদ্‌লায়। কম্‌ছে, বাড়্‌ছে, ঘুর্‌ছে, ফির্‌ছে, পাৎলা হচ্ছে, ঘন হচ্ছে—ইত্যাদি। তার মানে কি?—না, একখানা মেঘ হইয়া আর উপরে থাকৃতে না পেরে নামিয়া আসিয়া ভারী হয়ে পৃথিবীতে পড়িতে চায়। কিন্তু যেই নীচের দিকে আসে, অমনি নীচের উষ্ণতর বায়ুর গায়ে লাগিয়া আবার বাষ্প হইয়া অদৃশ্য হইয়া উপরে উঠে। এইরূপে মেঘ উপরেই খেলা করিয়া বেড়ায়, নামিতে পায় না। বড় মানুষের ছেলের মত উপরেই খেলা, উপরেই বাস। নীচু লোকেদের কাছে আসে না। অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে গা ফুলিয়ে উড়িতে থাকে।"

চারু—"আঃ! আজ কেমন সুন্দর কথা শিখিতে পারিলাম। এ বিষয়টী আরও অনেক বার ভাবিতে হইবে এবং 'সখা'য় যখন লেখা হবে তখন অনেক বার পড়িব। তাহ'লে বেশ মনে থাক্‌বে। এস ভাই! আজ সকলে ভক্তির সহিত দাদা বাবুকে প্রণাম করিয়া বাড়ী যাই। বেলা হইলে পড়া তৈয়ার করা হবে না।" তখন সকলে গৃহে গেলেন।

ধাঁধা।

নূতন।

১।—ছেলেবেলা একদিন বসে আঁক কর্‌ছি হঠাৎ বাবা আর মা দুদিক থেকে এসে আমার হাত থেকে একটা জিনিস কেড়ে নিয়ে দুজনে ভাগ করে নিলেন। নিয়েই বাবা লিখিতে লাগিলেন, আর মা রান্নাঘরে গিয়ে বাটনা বাটিতে বসিলেন; সব গোল মিটে গেল। কি করে?

২।—তিন বর্ণে অঙ্গ মম সাজান কেমন,
দিনের প্রথম ভাগে দিই দরশন।
মাথা হ'তে কটি মোর ঝক্‌ঝক্ জলে,
সে জ্যোতি হেরিয়া মুগ্ধ মানব সকল।
প্রবাদ—আমার দেহ করিয়া ভোজন,
বাঁচিতেছে চিরকাল বঙ্গবাসীগণ।

৩।—আমি অতি নীচ জাতি, ছুঁলে নাইতে হয়। একদিন পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদের কাছ থেকে একটী ফোঁটা চেয়ে যাই মাথায় পরেছি, আর আমার মান দেখে কে? তখন আর আমি না হলে ব্রাহ্মণদের রান্নাই হয় না। বলত আমি কে?

৪।—দশ হস্ত পদ মম সুগোল শরীর,
জলে কিম্বা স্থলে বাস নাহিক সুস্থির।
পিতা মম মহাবীর কুরুক্ষেত্র রণে,
ত্যজিলেন দেহ শুধু আমার কারণে।
পাণ্ডবের ভয়ে আমি এখনও অস্থির,
বধে পাছে ঘর হ'তে করিয়ে বাহির।
নিজ সন্তানের হস্তে মম হইবে মরণ,
বলত সুবুদ্ধি শিশু আমি কোন জন?

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫।

অক্ষয়কুমার দত্ত।*

শ্রীমন ছেলে বা মেয়ে কে আছে যে, চারুপাঠ পড়ে নাই বা পড়িবে না? বড়দের মধ্যেই বা এমন কজন আছেন যাঁরা ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় নামক চমৎকার পুস্তকগুলি পড়েন নাই। এ সকল পুস্তক যাঁহার লেখা, তিনি আমাদের দেশের একজন বড়লোক, তাঁহার নাম বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। যদি জানিতে চাও, মানুষ নিজের চেষ্টায়, নিজের যত্নে, নানা অসুবিধার মধ্যেও কতদূর বড় হইতে পারে, তবে বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের কথা শোন, শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে।

১২২৭ সালের শ্রবণ মাসে নবদ্বীপের কাছে একখানি ছোট গ্রামে অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম হয়। যখন তাঁহার সাত বছর বয়স, তখন হইতে তিন বৎসর অর্থাৎ দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত গুরু মহাশয়ের কাছে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অক্ষয় বাবু কিছুকাল পরে কলিকাতার দক্ষিণে খিদির-পুর নামক স্থানে আসেন। এই সময়ে সর্ব্বত্রই পারসী লেখাপড়া চলিত ছিল;—আদালতে পারসী ভাষাতেই কর্ম্ম-কাজ চলিত। অক্ষয় বাবুর আত্মীয়েরা কাজেই অক্ষয় বাবুকে পারসী শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু এই সময়ে একখানি ইংরাজী পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হয়। তিনি দেখি-লেন ইংরাজী ভাষাতে এমন সকল বিষয় আছে, যাহা বুড়োদের চলিত বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না বটে, কিন্তু তাহা সমস্তই ঠিক। সেই অবধি অক্ষয়কুমারের ইংরাজীর দিকে মন গেল—সেই অল্প বয়সে পিতা ও আত্মীয়দিগের অনুরোধ

* নব-বার্ষিকী হইতে জীবনী বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি।

কাটাইয়া অক্ষয়কুমার ইংরাজী শিখিবার জন্য এক পাদ্রীর স্কুলে 'ভর্ত্তি' হইলেন। "পাদ্রীদের স্কুলে পড়িতেছে এ ছেলেটা খ্রীষ্টান হইবে," এই মনে করিয়া অক্ষয়কুমারের আত্মীয়েরা তাঁহাকে স্কুল ছাড়িয়া আসিতে বলিলেন, কিন্তু অক্ষয় বাবু তাহাতে রাজি হইলেন না। অবশেষে যখন তাঁহার প্রায় ১৭ বৎসর বয়স, তখন কর্ত্তারা পরামর্শ করিয়া অক্ষয়কুমারকে কলিকাতায় আনিয়া গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে 'ভর্ত্তি' করিয়া দিলেন। এতদিন নানা কারণে অক্ষয় বাবুর প্রায় কিছুই লেখা পড়া হয় নাই; এবারে সুবিধা পাইয়া মন খুলিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিলেন, কিন্তু অক্ষয় বাবু এ সুখ দুই তিন বৎসরের অধিক ভোগ করিতে পান নাই। আড়াই বৎসর পরে অক্ষয় বাবুর পিতার মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার কাঁধেই সংসারের ভার পড়িল; তখন তাঁহার স্কুলে পড়ার সুবিধা আর কিসে হইবে?

স্কুলে পড়া হইল না বটে, কিন্তু তাঁহার পড়া শুনা ঘুচিল না। একদিকে চাকরীর চেষ্টা, আর একদিকে লেখাপড়া শিক্ষা,—ভয়ানক পরিশ্রম; কিন্তু অক্ষয়কুমারের গ্রাহ্য ছিল না। আবার, পড়িবার বইগুলি কেমন সহজ এবং সুখময়—অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান, সংস্কৃত নানারূপ পুস্তক, ইত্যাদি!! তোমার আমার মত ছেলে হইলে হয়ত বলিয়া উঠিত—"আমার কপাল মন্দ। বাবা মরিয়া গেলেন; কেমন করিয়াই বা স্কুলে পড়ি? আবার এদিকে সমস্ত দিন 'চাকরী বাকরী'র চেষ্টা করিয়া ঘরে এসে পড়া শুনো করা—উঃ বাপু! পেরে উঠি না।"

এই খানেই বড়লোকে ছোটলোকে তফাৎ, এইখানেই অক্ষয় বাবুর মত লোকে আর তোমাতে আমাতে তফাৎ!

অনেক দিন গেল। অক্ষয় বাবু বিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। তাঁহার সাংসারিক কষ্ট একরূপ ঘুচিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের আশা মিটিল না। অক্ষয় বাবু তাঁহার আশা মিটাইবার জন্য দিনরাত খাটিতে লাগিলেন—কোন কোন দিন সমস্ত রাত জাগিয়াও লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই পরিশ্রমের ফলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রী ফিরিল, বাঙ্গালী ছেলেদের পড়িবার জন্য দুচারখানা পুস্তক প্রকাশিত হইল, ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তাদের ধর্ম্ম-বিষয়ে অনেক সাহায্য হইল; কিন্তু যিনি এই সকলের কর্ত্তা তাঁহাকে ভয়ানক শিরঃপীড়ায় অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল। তখন সমস্ত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া অক্ষয় বাবু কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন। অক্ষয় বাবু আজকাল বালীগ্রামে থাকেন। তাঁহার বাড়ী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, অক্ষয় বাবু বাড়ীঘর সুন্দর করার সম্বন্ধে যে সকল উপদেশের কথা তাঁহার চারুপাঠে লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি নিজের বাড়ীতে সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে খাটাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহার "শোভনোদ্যান"কে "চারুপাঠ ৪র্থ ভাগ" এই নাম দিয়াছেন।

অক্ষয় বাবু এখন অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার লিখিবার সাধ্য নাই, পড়াশুনা করিবার বিশেষ সুবিধা নাই। অথচ এই দারুণ পীড়ার মধ্যেও তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" নামক প্রকাণ্ড পুস্তক বাহির হইয়াছে। কেমন করিয়া এ আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল, যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "উপাসক-সম্প্রদায়" দ্বিতীয় ভাগের শেষটুকু পড়িবেন; কেমন করিয়া এর, ওর, তার খোসামোদ করিয়া, নিরেট মূর্খের দ্বারা একটু একটু করিয়া টুকরা টুকরা কাগজে লেখা-

ইয়া সেইগুলি জড় করিয়া এই বৃহৎ পুস্তক হইল, "উপাসক-সম্প্রদায়ে"র পাঠকের কাছে সে কথা অজানা নাই। ধন্য উৎসাহ! ধন্য ক্ষমতা!

অক্ষয় বাবুর বয়স এখন ৬৪ বৎসর। আমরা তাঁহার পীড়িত অবস্থার একটী ছবি দিলাম। এই ছবি তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়সে তোলা। অক্ষয় বাবু তাঁহার উপাসক-সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগে আমাদিগকে আশা দিয়াছেন, যে সুবিধা হইলে তিনি উপাসক-সম্প্রদায়ের তৃতীয় ভাগও যত শীঘ্র হয় প্রকাশ করিবেন। আমরা তাঁহার এই শরীরে এইরূপ সাহসের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। তাঁহার মনের ইচ্ছা যাহা, তাহা সফল হউক; আমরা যে এত ছোট, আমাদের কুড়েমি এই চিররোগী বৃদ্ধের উৎসাহ দেখিয়া ভাঙ্গিয়া যাক্—এসো আমরা সকলে তাঁহার পায়ের তলায় বসিয়া তাঁহার মত হইতে চেষ্টা করি।

ঠাকুরদাদার গল্প।

মেঘে কি হয়?

লকগণ সেদিনকার কথা শুনিয়া এত উপকার বোধ করিয়াছিল যে আজ আরও অনেককে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নবীন বাবুর সঙ্গে বাহিরে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কার না আনন্দ হয়? নবীন বাবু পরম আনন্দে সকলকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে চলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন কি বিষয়ে গল্প হইবে; সেদিন সকলে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল যে মেঘ হইতে আরও কি হয় জানিতে হইবে। সেই কথাই হওয়া স্থির হইল। তখন নবীন বাবু বলিতে লাগিলেনঃ—

"সেদিন তোমরা জানিতে পারিয়াছ যে মেঘ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল কণার কুয়াশা বৈ আর কিছুই নয়। এই সব জলকণা আবার ক্রমাগতই বদ্‌লাইয়া কখন বাষ্প হইতেছে আবার শীতল হইয়া জলে পরিণত হইতেছে। ক্রমে যখন কোন কারণে এই মেঘ হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে এমন স্থানে আসে, যেখানে শীত বেশী, তখন ইহার অধিকাংশ জলকণা আরও শীতল হইয়া ভারী হয় আর বড় হয়। তখনই বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পড়ে। এটুকু তোমরা সকলেই বোধ হয় জান। (নলিনঃ—"না দাদা! আমি ভাল জানি না, বল।") কেন? এত খুব সহজ কথা। জল গরম হইলে বাষ্প হয় আবার ঐ বাষ্প শীতল হইলে জমিয়া জল হয়। এও তাই। গরম বাতাসের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বাষ্প হইয়াই থাকে আর যখন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে চালিত হইয়া কোন শীতল দেশে বা স্থানে পৌঁছায় তখন ঐ বাষ্প সকল খুব ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া জল হয়। এই জল আগে ছোট ছোট কণা হইয়া কুয়াশার মত হয়। তার পর আরও শীতল হইতে থাকিলে ক্রমে বৃষ্টির আকার ধারণ করে। কিন্তু তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণা থাকে। পরে যত নীচে নামিতে থাকে, তত পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া বড় হয়। কোন

পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া এইরূপ কুয়াশা হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই এই বিষয় বেশ বুঝা যায়। একেবারে মেঘ হইতেই বৃষ্টির মত বড় বড় ফোঁটা পড়ে না। নীচে নামিতে নামিতে অনেকগুলি কণা মিলিয়া গিয়া তবে বড় বড় ফোঁটা হয়। বুঝিলে? (সকলেঃ—"হাঁ, বেশ বুঝেছি।")

"তার পরে আরও ২।৪ টী কথা বলিয়া বৃষ্টির কথা শেষ করিব। শীতল হইলেই ত বৃষ্টি হয় বুঝিলে। শীতল কত উপায়ে হইতে পারে? এ সহজ কথা। মনে কর যদি এক স্থানে বায়ু রাশি রাশি বাষ্প লইয়া চলিয়াছে, ক্রমাগত দেশের পর দেশ পার হইয়া চলিয়াছে; অবশেষে এমন একটা পর্ব্বতের গায়ে আসিয়া ঠেকিল যে আর যাইতে পারে না। তখন কি হবে? পর্ব্বতের গা ঢালু কি না (বুরুজ বা পুকুরের পাড়ের মত ক্রমে ক্রমে উচ্চ), এজন্য ঐ বায়ু তখনই গা বহিয়া চূড়ার দিকে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। আর তোমরা জান যে যত উপর তত শীতল। কাজেই ঐ বায়ু ও বাষ্প সব শীতল হইতে আরম্ভ করে। শীতল যাই হওয়া, আর অমনি বাষ্প অমনি গলে একেবারে জল! কেমন? (সকলেঃ—"হাঁ!") আর কি? হুঁ হুঁ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়। এই রকম করিয়া আমাদের দেশের মলবার উপকূলে ভয়ানক বৃষ্টি হয়। আরব সাগর হইতে গ্রীষ্মকালে বায়ু বহে, তাহাকে দক্ষিণা (বা দক্ষিণ পশ্চিমের) বায়ু বলে। এই বায়ু বিস্তর বাষ্প লইয়া ভারতবর্ষের দিকে আসিতে থাকে, কিন্তু পথিমধ্যে পশ্চিমঘাট গিরির গায়ে ঠেকিয়া আসিতে পারে না, উপরে উঠিয়া পড়ে কাজেই উহার প্রায় সমস্ত বাষ্পই বৃষ্টি হইয়া পর্ব্বতের গা ভাসাইয়া দেয়। আর তার পর ঐ বায়ু যখন পর্ব্বত পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে আসে তখন আর তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এইরূপ ভারতমহাসাগরের সমস্ত মেঘই উত্তর দিকে আসিতে থাকে শেষে গিয়া—? (সকলেঃ—"হিমালয় পর্ব্বতে ঠেকিয়া যায়।") ঠিক! আর সেই সব বৃষ্টি হইয়া পড়ে, ঐ বৃষ্টির জলে আর্য্যবর্ত্তের এত নদ নদীর উৎপত্তি হয়। কিন্তু আবার ওদিকে ঐ বায়ু যখন হিমালয় পার হইয়া তিব্বত দেশে উপস্থিত হয় তখন আর তাহাতে বৃষ্টি হয় না, এই জন্য ঐ দেশের অবস্থা এত হীন; ওখানে প্রায় সবই মরুভূমির মত।"

কিশোরীঃ—"তবেত হিমালয় পর্ব্বত থাকাতে আমাদের দেশের খুব উপকার হইয়াছে। না হইলে ত এত নদী, এত বৃষ্টি কিছুই হইত না; আর আমাদের দেশ মরুভূমির মত হইয়া যাইত। ধান চাল কিছুই জন্মিত না?"

নবীন বাবুঃ—"ঠিকই বুঝিয়াছ। এই জন্যই আমাদের দেশ এত উর্ব্বরা। আমাদের দেশের পক্ষে হিমালয় আরও কত যে উপকারী তাহা এর পর আরও জানিতে পারিবে। এখন বৃষ্টির কথা আবার বলি। যদি এইটী একমাত্র কারণ হইত তাহা হইলে যে দেশে পর্ব্বত নাই সেখানে বৃষ্টি হইত না।"

মাখনঃ—"হাঁ দাদা বাবু! আমি ঐ কথাটাই জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম। আমাদের দেশেতে পর্ব্বত নাই তবে এখানে এত বৃষ্টি হয় কেন?"

নবীনবাবুঃ—"মন দিয়া শুন। যেটী বলিলাম সেটী একটী কারণ, বৃষ্টি হইবার আরও কারণ আছে। মনে কর দুদিক হইতে দুটী বায়ুর স্রোত আসিয়া মধ্যে এক স্থানে ঠেকাঠেকী হইল; তখনই অমনি যেমন কলের গাড়ীর "কলিসন"

হলে হয়, দুটাতে খুব ধাক্কা লাগিল। কিন্তু বাতাস ত আর গাড়ীর মত ভারী নয় যে মাটীতে ভেঙ্গে পড়ে যাবে। উহা হাল্‌কা, কাজেই দুটা বাতাস উপর দিকে উঠিতে থাকে। কাজেই উপরে উপরে উঠিয়া শীতল হয় আর ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টিও হইয়া পড়ে। আরও নানা প্রকার কারণে বৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যে কোন কারণে মেঘ আরও শীতল হয় অমনি এক পশলা বৃষ্টি হইবেই হইবে।"

অমূল্য :—"আচ্ছা কোন্ কোন্ স্থানে সকলের চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়?"

নবীন বাবুঃ—"প্রায়ই যে যে স্থান সমুদ্রের ধারে, বা যেখানে বায়ুর পথের মধ্যে পর্ব্বত আছে সেই সেই স্থানেই অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। আর সাধারণতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই (tropical countries) অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের একটা স্থান আছে, বাঙ্গালার উত্তর আসামের পূর্ব্বদিকে খসিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে যত অধিক বৃষ্টি হয় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই এত বৃষ্টি হয় না।"

মন্মথ :—"আর এমন দেশ আছে, সেখানে একটুও বৃষ্টি হয় না।"

নবীন বাবুঃ—"আছে বৈকি? আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যভাগে এবং মিশর দেশের অধিকাংশ স্থলেই বৃষ্টি হয় না। আরব ও পারস্য দেশের অনেক অংশেও বৃষ্টি হইতে দেখা যায় না। আসিয়ার বিস্তীর্ণ গোবী মরুভূমি ও হিমালয়ের উত্তর পূর্ব্ব ভাগস্থ প্রদেশ, এবং তদ্ভিন্ন আমেরিকার কোন কোন অংশে বৃষ্টি হয় না। এই সমস্ত স্থানই জলহীন ভীষণ মরুভূমি হইয়া আছে।"

চারুঃ—"দাদা মশাই! মেঘও আমাদের খুব উপকার করে বল্‌তে হবে?"

নবীন বাবুঃ—"সে কথা আর একবার? মেঘ হইতে জল পড়িয়া পৃথিবী শীতল হয়। গ্রীষ্মকালে এক এক দিন কেমন ভয়ানক গুমট হয় দেখিয়াছ ত? প্রাণ যায়। ত্রাহি ত্রাহি করিতে হয়, তখন এক পশলা বৃষ্টি হইলে তবে জীব জন্তুর প্রাণ বাঁচে। কেমন? আরও বৃষ্টি দ্বারাই ভূমি উর্ব্বরা হয়। ধান্য, গোধুম, যব, ছোলা প্রভৃতি শত শত প্রকার শস্য ও ফল মূল, বৃক্ষ লতা যাহা কিছু মানুষ ও অন্য জীব জন্তুর প্রাণ ধারণের জন্য পৃথিবীতে জন্মিতেছে তাহার কিছুই হইত না। সকলেই অনাহারে মারা যাইত। জলই আমাদের জীবনের একটী সর্ব্ব প্রধান দরকারী জিনিস। তৃষ্ণার সময়ে জল না পেলে কেমন হয়? সে বৎসর তোমাদের খিড়কীর পুকুরের জল শুকাইয়া গিয়াছিল। মনে আছে ত কেমন হা হা রব পড়ে গিয়াছিল? আর এই বৎসর বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ভাল জল হয় নাই, তাই একেবারে সব মাঠ জ্বলিয়া গিয়া দুর্ভিক্ষ হইয়াছে জানত? আহা! কত যে লোক না খেতে পেয়ে মরে গেল তা আর কি বলিব? আর কত লোকের যে কি ভয়ানক ক্লেশ হল তাত সবই তোমাদের সে দিন কাগজ পড়িয়া শুনাইয়াছি। জল না হইলে পৃথিবী একদিন চলে না। জলকে সেই জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা "জীবন" নাম দিয়াছেন। আর সেই জন্যই মেঘের মধ্যে ইন্দ্র আছেন; তিনিই আমাদের জল দেন ইহা মনে করিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে দেবরাজ অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য করিয়া পূজা করিতেন। তোমরাও আজ যে সকল কথা শুনিলে তাহাতে বেশ বুঝিয়াছ যে, করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য মেঘ হইতে বৃষ্টি প্রদান করেন। তবে এস এই গঙ্গা-

তীরে বসিয়া সেই দয়াময় দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বাড়ী যাই।”

পরেশনাথ মন্দির।

রেশনাথ পাহাড় জৈন নামক লোকদিগের একটা বড় তীর্থ স্থান। এইখানে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত অনেক জৈন যাত্রীর ভিড় হয়। জৈনেরা পরেশনাথকে পরম দেবতা মনে করে, এবং জীব হত্যা অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মারা বা ক্লেশ দেওয়াকে অত্যন্ত অন্যায় ভাবিয়া থাকে। পরেশনাথ পাহাড় গিরিধি হইতে নয় ক্রোশ দক্ষিণে। ইহার মধ্যে এক স্থানে ‘বরাকর’ নামক একটী নদী আছে। রাস্তার দুদিকে ছোট ছোট পাহাড় দেখিতে দেখিতে আমরা বিনা ক্লেশে বরাকর পর্য্যন্ত আসিলাম। সেখানে আহারাদি করা গেল। এইখানে “রাজবালা ধর্ম্মশালা” নামে জৈনদের একটী মন্দির আছে। আমরা এই ধর্ম্মশালা দেখিয়া নদী পার হইলাম, এ সময়ে বরাকর নদীতে এক হাটু বা কিছু অধিক মাত্র জল থাকে; সুতরাং আমরা সহজেই নদী পার হইয়া গেলাম।

রাস্তায় ভয়ানক রদ্দুরে ছাতা মাথায় দিয়াও কিছু ক্লেশ পাইতে হইল; যাহা হউক বিকাল বেলা পাহাড়ের নীচে পৌছিলাম।

পাহাড়ের নীচের স্থানের নাম মধুবন। শুনিয়াছি ধ্রুব মধুবনে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই সেই মধুবন কিনা, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমাদিগের কোন বন্ধু আমাদের জন্য মধুবনের এক জৈন মন্দিরের বা কুঠির অধ্যক্ষকে আগেই এক পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদিগকে গিয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। মধুবনে অনেকগুলি জৈন মন্দির। কুঠির অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদিগকে সকল গুলিই যত্নের সহিত দেখাইলেন। আমরা তাঁহাদের ধর্ম্মের নিয়ম মান্য করিয়া দরজায় যুতা, ছাতা, লাঠি প্রভৃতি রাখিয়া গেলাম। এই মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিতে যে কত শত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার সীমা কি? অনেক মন্দিরই আগাগোড়া পাথরের তৈয়ারী। সকলগুলির মধ্যেই মেজে মার্ব্বেল পাথরে মোড়া এবং মূর্ত্তিগুলি নানারূপ সুন্দর অলঙ্কারে সাজান ও চমৎকার আসনে জরির কাজ করা শামিয়ানার নীচে বসান। পরেশনাথ প্রধান দেবতা; ইহা ছাড়া আরও তেইশ জন অবতার আছেন, এই কথা কুঠির অধ্যক্ষের মুখে শুনিলাম। প্রত্যেক মন্দিরের দরজায় একজন বা দুজন করিয়া দ্বারবানদেবতা আছেন। তাঁহাদের আকার নাই, পাথরের এক একটা লম্বা খণ্ড, তাতেই সিন্দূর-মাখান।

পরেশনাথ পাহাড় প্রায় তিন হাজার হাত উচ্চ। রোগা লোকের সাধ্য কি, হাটিয়া উঠে। আমরা ডুলিতে গিয়াছিলাম। সকল জায়গায় রাস্তা নাই। উপরে সাহেবদের জন্য একটা ঘর আছে, সেই পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা, তাহার ওদিকে আর রাস্তা নাই; কেবল পাথরের উপর দিয়া একটু একটু পরিষ্কার করা। পাহাড় বলিলে কি তোমাদের কেবল পাথরের ঢিবি মনে হয়? তাহা

নহে, পাহাড়ের উপরে যে কত রকম গাছ জন্মিয়াছে, তাহার সীমা কি? আমি এই সকল গাছের মধ্যে বাঁশগাছ, কলাগাছ এবং হলুদগাছ, ইহাই চিনিতে পারিলাম। ইহা ছাড়া ছোট ছোট অগাছা হইতে শাল সুন্দরীর মত বড় বড় গাছ যে কত আছে, তাহা গণিয়া উঠা যায় না।

একবার একটী ইংরাজ স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন "এদেশের পাখীগুলি কেবল দেখিতেই সুন্দর, কিন্তু গান করিতে পারে না, খালি ক্যাচ্‌ম্যাচ্‌ করে।" যদি তিনি এই পাহাড়ে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এ বিশ্বাস চলিয়া যাইত। আমার পথ চলিতে চলিতে বোধ হইল যেন স্বর্গে যাইতেছি। একদিকে ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া ঝরণার জল পড়িতেছে, একদিকে শোঁ শোঁ করিয়া গাছের মধ্যে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে শীতল বাতাস বহিয়া চলিয়াছে, একদিকে পাখীগুলি টুউ টুইট্‌ টুউ টুইট্‌ শব্দে কি সুমধুরগানই ধরিয়াছে, একদিকে রাস্তার দুপাশে দুর্গাঝাঁপ বা ফার্ণ জাতীয় গাছ সকল যেন সুন্দর সবুজ মক্‌মলের মত আপনাদের সুশ্রীরূপ পথের লোককে দেখাইতেছে—এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার ইচ্ছা হইল একবার সেইখানে লাফাইয়া পড়ি এবং এই সুন্দর সৃষ্টি যাঁর সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের নামে চিরদিনের মত ডুবিয়া যাই।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে শোভা দেখিয়া আমার মন গলিয়া গেল, সেই শোভা দেখিয়াও কোন লোকের খারাপ ভাব থাকে! পথের মাঝখানে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটা ছোট ঘর আছে। তাহার কাছে গোঁ গোঁ শোঁ শোঁ শব্দে জল পড়িতেছে, পাখীগুলি যেন তাহারই শব্দে তাল রাখিয়া গান করিতেছে, আর চারিদিকে গাছের শীতল ছায়া যেন পরিশ্রান্ত যাত্রীদিগকে কোলে টানিয়া লইতেছে। এই শোভা, এই বাহারের মধ্যে যাহার ভগবানকে মনে পড়ে না, সে কি দুর্ভাগা! আমি দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলাম, আমাদেরই কতকগুলি ছেলে (হাতের লেখায় বুঝিলাম বয়স বেশী নয়) এই বিশ্রামঘরের দেয়ালে বিশ্রী ছবি এবং বাঙ্গালাতে বিশ্রী কথা সকল লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। হতভাগা ছেলেদের ইহাতেও সাধ মেটে নাই, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন! দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের কাহারও বাড়ী ছুতোর পাড়া কাহারও বাড়ী কালেজ ষ্ট্রীট, কাহারও উহারই নিকটে। আমি বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর ছেলে বিদেশে আসিয়া এমন কাণ্ড করিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার লজ্জা ও ঘৃণা দুই হইতে লাগিল। তখন নিজের লজ্জা নিজেই ঢাকিবার জন্য সেই সকল খারাপ ছবি ও লেখা মুছিয়া ফেলিতে লাগিলাম। সকলই মুছিয়া ফেলিলাম কেবল খুব উপরে একটা লেখা হাতে পাইলাম না। দুরাত্মাদের খারাপ স্বভাবের একটা চিহ্ন সেই পবিত্র স্থানে থাকিয়া গেল।

একটা পাহাড় ডিঙ্গাইয়া বড় পাহাড়টাতে উঠিতে হয়। বড় পাহাড়ের রাস্তা যে কি ভয়ানক, তাহা বলিতে পারি না। কোন কোন স্থানে পাহাড়ের এক ধার দিয়া রাস্তা গিয়াছে, সেখান হইতে মাটি পর্য্যন্ত এক-ঢালু, তাকাইলে মাথা ঘোরে; কোন স্থানে দুপাশে বড় বড় ঘাস ও ভাঁটুইবন, তাহার মধ্য দিয়া সাপের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হয়; আবার কোথাও বা উপরে উঠিতে ডুলির তলায় ক্রমাগত পাথর ঠেকিতে থাকে, ঘা খাইয়া শরীরে বেদনা হইয়া প্রাণ যায়। এই ভাবে, কতক আহ্লাদে কতক ভয়ে আমরা উপরে উঠিলাম। আঃ—সেখানকার কি শোভা!

এক এক ঝলকা বাতাস গায়ে লাগে আর বোধ হয় যেন শরীর পাতলা হইয়া গেল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশ নীল—গাঢ় নীল। নীচে ওরূপ নীলাকাশ প্রায়ই দেখা যায় না। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম কুয়াশার ন্যায় বাতাসে মেঘগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আমরা মেঘের সীমা ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া ফেলিয়াছি! বাতাসে বেশ একটু শীত লাগে, কিন্তু তাহাতে বড়ই আরাম হইতে লাগিল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম ছোট পাহাড়টাকে একটা বনের মত, বড় বড় গাছগুলিকে ঘাসের মত এবং অন্যান্য স্থানগুলিকে রং করা ছবির মত দেখাইতেছে।

উপরে অনেকগুলি মন্দির আছে, কিন্তু সে গুলি মধুবনের মন্দিরের ন্যায় বড় বা সুন্দর নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে মন্দিরটা, আমরা তাহারই নিকটে স্নানাহার করিলাম। সঙ্গে তেল ছিল না, কি করি, খানিকটা ঘি মাখিয়া ঝরণার জলে স্নান করিলাম। সে যে কি আরাম, তাহা আর কি বলিব। পূর্ব্বকালের মুনিঋষিদের কথা মনে হইতে লাগিল। সাধে কি তাঁহারা পাহাড় পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করিতেন! একজন ইংরাজ বলিয়াছেন "প্রকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হইতে প্রকৃতির ঈশ্বর যিনি তাঁহাকে সহজেই পাওয়া যায়।" আমার একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন, "আঃ—এই রকম যায়গায় দুচারজন মনের মত লোক লইয়া থাকিতে পারিলে বড়ই সুখ হয়।" আমি বলি—"যেখানে গেলে চারিদিকের শোভা দেখিয়া ঈশ্বরকে যেন সাক্ষাৎ দেখা যায়, সেখানে আর কোন মনের মত লোকের আবশ্যক কি? সহরের সভ্যতার 'সরগরমে' ঝল্‌সিয়া মরার অপেক্ষা এমন সুন্দর স্থানে, ভগবানের সৃষ্টির বাহারে আপনাকে ঘেরিয়া, তাঁহার নাম করিয়া অসভ্যের মত একলা দিন শেষ করাও ভাল।"

ইহার পর আরও কোন কোন স্থান দেখিয়া আমরা নামিয়া আসিলাম।

—ভ্রমণকারীর পত্র।

আই-আই।

যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় আমাদের দেশে এই প্রাণী পাওয়া যায় না। আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে মাডাগাস্কার নামে যে দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপের পশ্চিম দিকের গাঢ় জঙ্গলে আই-আই বাস করিয়া থাকে। যেমন 'বউ কথা ক,' 'চোখ্ গেল' প্রভৃতির নাম তাহাদের প্রত্যেকের ডাক হইতে হইয়াছে, সেইরূপ 'আই' 'আই,' করিয়া ডাকে বলিয়া এই প্রাণীর 'আই-আই' এই নাম হইয়াছে।

আমরা সহজ চক্ষে ছবির দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইতেছি যে, এই প্রাণী কতকটা কাঠবিড়ালীর মত এবং কতকটা বাঁদরের মত। কিন্তু পণ্ডিতেরা আই-আইকে কোন্ জাতীয় প্রাণী বলিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে

পারেন নাই। যাহা হউক, এই প্রাণী পৃথিবীতে যেরূপ অল্প, এক মাডাগাস্কার দ্বীপের এক কোণে কোথায় পড়িয়া আছে, তাহা সেই দেশীয় লোকেরাই খুঁজিয়া পায় না, বিদেশীয়দের তো কথাই নাই, এরূপ অবস্থায় আমরা যে এই প্রাণীর সম্বন্ধে অতি অল্পও জানিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের সুখের বিষয় বলিতে হইবে।

আই-আই দিনের বেলায় ভালরূপ দেখিতে পায় না, ইহার চক্ষু অনেকটা পেঁচার মত। এই জন্য সমস্ত দিন ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া এবং যতক্ষণ সম্ভব ঘুমে কাটাইয়া সন্ধ্যাকালে আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। ফুলের কুড়ি, ফল এবং নানারূপ পোকা ও তাহাদের ডিম আই-আইএর খাদ্য। গাছের কোটরে, শুষ্ক পাতার মধ্যে, বা গাছের ছালের নীচেতে অনেক পোকা বাস করে; আই-আই আপনার শক্ত হাতের দ্বারা যতগুলি পারে ধরিয়া লয়। এইরূপে সমস্ত রাত্রি আহার খুঁজিয়া এবং আমোদ আহ্লাদ করিয়া ভোরবেলা আই-আই আবার আপনার গর্ত্তে ঢুকিয়া যায়।

আই-আই দেখিতে কটা এবং কটাঁশে সাদা; পা গুলো কাল। মাথা হইতে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত প্রায় এক হাত লম্বা, লেজটা প্রায়ই শরীরের সমান অর্থাৎ আর এক হাত।

সন্নাত নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত সকলের আগে আই-আই দেখিতে পান; তাঁহারই চেষ্টাতে আমরা এই প্রাণীর কথা জানিতে পারিয়াছি। তিনি যে দুটী আই-আই ধরিয়া লইয়া

যান, তাহাই সকলের আগে সভ্য দেশে যায়। প্রাণী দুটী অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে নাই। আজ কাল তাহাদের শরীর (ভিতরে খড় পোরা) জীবন্তের ন্যায় পারিশ নগরের যাদুঘরে দেখিতে পাওয়া যায়।

আখ্যান-মালা।

(১)

বাবা হাত ধরে নিয়ে গেলে ভয় কি?

দীন বাবু কোন পাড়া গেঁয়ে স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার ছয় বছরের একটী ছোট মেয়ে, সে রোজই স্কুলের ছুটীর সময় হইলে, বাবাকে আনিতে যাইত। এক দিন সে যাইবার সময় দেখিল, একটী অন্ধ ছেলেকে তাহার মা হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন; ছেলেটীও, মা যেখানে যেমন যাইতে বলিতেছেন, সেই রকমে পা ফেলিয়া অনায়াসে যাইতেছে। বালিকা ইহা দেখিয়া বাবাকে আনিতে স্কুলে গেল। যখন বাবার সহিত বাটীতে ফিরিয়া আসে, তখন মেয়েটীর ইচ্ছা হইল একবার অন্ধ সাজিয়া দেখে, কেমন হয়; তাই বলিল—“বাবা, আমি চোখ্ বুজে থাকি, আর তুমি আমার হাত ধ'রে নিয়ে চল—কেমন? —আর কোথায় উচু নীচু আছে, আমায় বলে দিও; তা'হলে আমি ঠিক যাব এখন।”—এই বলিয়া বালিকা চক্ষু বুজিয়া বাবার হাত ধরিয়া চলিল। অতি সহজেই দুজনে বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলেন। তখন বালিকা চক্ষু খুলিয়া মাকে সুমুখে দেখিয়া, হাসিয়া বলিল—“আমি পথে একবারও চোখ খুলি নাই।”—মা জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার কি পড়ে যাবার ভয় হয় নি?” বালিকা উত্তর করিল “বাবার হাত ধরে চল্‌লে পড়ে যাবার ভয় কি?”

ঠিক কথা। পরমেশ্বরের উপরে যাদের মন, তারা কি কখনও বিপদে পড়ে? আমরা সকলেই ছোট, নিজের বুদ্ধিতে চলিতে গেলেই গোলে পড়ি, কিন্তু পিতা হাতে ধরে নিয়ে গেলে ভয় কি?

---

(২)

নাম্‌তে নাম্‌তে সাম্‌লাতে পারিনি।

এক পাহাড়ে দেশে একজন ভদ্রলোক তাঁহার ছেলেকে লইয়া পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছিলেন। পিতা যখন প্রায় অর্দ্ধেক পথ নামিয়া আসিয়াছেন, তখন দেখিলেন ছেলে তখনও উপরে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, তাহাই দেখিতেছে। তিনি ডাকিয়া বলিলেন—“কেদার, সন্ধ্যা হয়ে এল—এখনও উপরে? শীগ্‌গির নেবে এসো।”—বালক বাবার কথা শুনিয়া নীচের দিকে ছুটিল, কিন্তু

পিতার নিকটে পৌঁছিয়া সে আর থামে না, ক্রমাগত নীচে ছুটিতে লাগিল। পিতা দেখিয়া বলিলেন—"কর কি ? থাম ! থাম !" বালক ছুটিতে ছুটিতে বলিল—"আঃ, আর পারি না যে !"—এই বলিয়া একেবারে নীচে আসিয়া একটা গাছ ধরিয়া দাঁড়াইল। পিতা নীচে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার সঙ্গে সঙ্গে এলে না যে।" বালক বলিল"নাম্‌তে নাম্‌তে সাম্‌লাতে পার্‌লেম না, তা কি ক'র্‌ব !"

ওঠা বড় শক্ত, নামা বড় সহজ;—ভাল হওয়া বড় শক্ত, মন্দ হওয়া বড় সহজ; আবার কেদার যেমন নামিতে নামিতে আর পথে 'সাম্‌লাইতে' পারিল না, অনেক বালক তেমনি মন্দ হইতে হইতে আর সাম্‌লাইতে পারে না। অতএব সাবধান ! যে দিকে যাইতেছ, সাম্‌লাইয়া চলিও।

(৩)

কোন্‌টা বেশী মন্দ ?

বিনোদ যে স্কুলে পড়ে, সেখানকার মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই ভাল ভাল উপদেশ দেন। এক দিন এইরূপ একটী উপদেশ শুনিয়া বিনোদ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিল। সে দিন বিনোদ একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, এবং তাহার ক্লাশের আর একটী ছেলে এক খানা ছুরি চুরি করিয়াছিল;—দুজনেরই শাস্তি হইল, কিন্তু বিনোদের কম এবং সেই চোর ছেলেটীর বেশী। শাস্তি দিবার পর শিক্ষক মহাশয় সকলকে মিথ্যা কথা ও চুরি করার বিষয় লইয়া উপদেশ দিলেন—তাহাতে বিনোদ বুঝিল মিথ্যা কথা অপেক্ষা চুরি করা মন্দ। বিনোদ নিজের দোষ গুলি খুব বেশী করিয়া দেখে, এই জন্য তাহাকে সকলই ভাল বাসে; আজও হঠাৎ মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার মনে ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। সে উপদেশ শুনিয়া শিক্ষককে কিছু না বলিয়া বাড়ীতে আসিল, এবং মাকে বলিল—"হ্যা মা ! মিথ্যা কথা আর চুরি, এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশী মন্দ ?"—মা বলিলেন "দুটোই এত খারাপ, যে কোন্‌টা বেশী, তা বলা যায় না।"—বালক বলিল—"আমার কাছে মিথ্যা কথাটাই বেশী মন্দ লাগে; কেননা, কোন জিনিস চুরি করিলে, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যায়, কি তার দাম দেওয়া যায়, কিন্তু মিথ্যা কথা একবার বলিলে আরতো ফিরে না !"—বালক বালিকা ! তোমরা কি বল ? মিথ্যা কথাটাই যত পাপের গোড়া, না ?

ভুতের গল্প।

আমি ভুতের গল্প বড় ভাল বাসি। তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়া ভুতের গল্প কর, সেখানে পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা; একটা শুনিলে আর একটা শুনিতে ইচ্ছা করে, দুটা শুনিলে একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করে। গল্প শেষ হইয়া গেলে একাকী ঘরের

বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমাদের মধ্যে আমার মতন কেহ আছ কি না জানি না, বোধ হয় আছ। তাই আমি আজ তোমাদের কাছে একটা গল্প বলিব। গল্পটা একখানি ইংরাজি কাগজে পড়িয়াছি। তোমাদের সুবিধার জন্য ইংরাজী নামগুলি বদল করিয়া দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গল্পটী পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে শুধু নাম বদ্‌লাইলে কাজ চলিবে না। সুতরাং ঠিক যেরূপ পড়িয়াছি প্রায় সেই রূপ অনুবাদ করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।

"স্কট্‌লণ্ডের ম্যাপ্‌টার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধারে ছোট ছোট দুটী দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহার উপরেরটীর নাম নর্থ উইষ্ট্, নীচেরটীর নাম সাউথ্ উইষ্ট। এর মাঝামাঝি ছোট ছোট আর কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এ সে কালের কথা, তখন ষ্টীম্ এঞ্জিনও ছিল না, টেলিগ্রাফ্‌ও ছিল না; আমার ঠাকুরদাদা তখন এর একটী দ্বীপে স্কুলে মাষ্টারি করিতেন।

"সেখানে লোক বড় বেশী ছিল না। তাদের কাজের মধ্যে কেবল মাত্র মেষ চরান, আর কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে দিন চলার মত কিছু শস্য উৎপাদন করা। সেখানকার মাটি বড় খারাপ; তারি একটু একটু সকলে ভাগ করিয়া নেয় আর জমিদারকে খাজনা দেয়। * * * এরা বেশ সাহসী লোক ছিল। আর ঐ রকম কষ্টে থাকিয়া এবং সামান্য খাইয়াও বেশ এক প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত। * * * *

"এই দ্বীপে এল্যান্ ক্যামিরণ্ নামে একজন লোক ছিলেন, তাঁর বাড়ী গাঁ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। এল্যানের সঙ্গে মাষ্টার মহাশয়ের বড় ভাব, তাঁর কাছে তিনি কত রকমের মজার গল্প বলিতেন। হঠাৎ এক দিন ক্যামিরণ্ বড় পীড়িত হইলেন, আর কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁর কেউ আপনার লোক ছিল না, সুতরাং তাঁর বিষয় সমস্ত বিক্রী হইয়া গেল। তাঁর বাড়ীটা কেহই কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া রহিল।

"এর কয়েক মাস পরে এক দিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড্ ম্যাকলীন বলিয়া একটী রাখাল ঐ বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানালার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল, আর সে ঘরের ভিতরে এল্যান্ ক্যামিরণের ছায়া দেখিতে পাইল। দেখিয়াই ত তার চক্ষু স্থির! যেখানেই সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠির মত সোজা হইয়া উঠিল, ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল। * * *

"শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল। ঐ রকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহারই বা জানা শুনা করিবার ইচ্ছা থাকে? সে ত মার দৌড়! একে-ব'রে মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে! তাঁর কাছে সব কথা সে বলিল। মাষ্টার মহাশয় এ সব মানেন না; তিনি তাহাকে প্রথম ঠাট্টা করিলেন, তার পর বলিলেন তার মাথায় কিঞ্চিৎ গোল ঘটিয়াছে; আরও অনেক কথা বলিলেন—বলিয়া যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন যে ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত বোকার কার্য্য।

"ডনাল্ড্ কিন্তু ইহাতে বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধি বিশিষ্ট অন্যান্য লোকের কাছে তাহার গল্পটা বলিল। শীঘ্রই ঐ দ্বীপের সকলেই এই গল্প জানিতে পারিল। ঐ সব বিষয় মীমাংসা করিতে বৃদ্ধারাই মজবুদ; তাঁহারা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ইহাতে কত কুলক্ষণই দেখিতে পাইলেন।

বাড়ী যাইবে, মাষ্টার যে এ কি করিয়া ফেলিলেন। মুচি বেচারির আর আতঙ্কের সীমা নাই। তবে বুঝি ভূত এল। আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তার মনে যে ভয় হইয়াছিল, তারই উপযুক্ত ভয়ানক গোঁ গোঁ শব্দ ক[illegible] করিতে সে মাষ্টার মহাশয়ের পেছনে ছুটিতে লাগিল।

"সেই ভয়ানক চীৎকার শব্দ মাষ্টার মহাশয়ের কাণে গেল। মুচি দৌড়িতেছে আর ডাকিতেছে 'দাঁড়াওগো! মাষ্টার মশাই! দাঁড়াও!' মাষ্টার মহাশয় শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে এক প্রকার পদ শব্দও শুনিতে পাইলেন। আর কি? ঐ এল্যান্ ক্যামিরণ! ভয়ে আরও দশগুণ দৌড়িতে লাগিলেন। রবী বেচারা দেখিল বড় বিপদ! ফেলিয়াই বুঝি গেল। কি করে তারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাষ্টার মহাশয় দেখিলেন পাছেরটা আসিয়া ধরিয়াই ফেলিল। তাঁহার গায়ের বল চলিয়া যাইতে লাগিল।

"অবশেষে মাষ্টার মহাশয় যখন দেখিলেন যে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি সাহসে ভর করিলেন, এবং খুব লাঠি ধরিয়া সেই কল্পিত ভূতের এবং আর মুহূর্ত কাল বিলম্ব না সেই কল্পিত ভূ এক ঘা। তার পর অদৃশ্য হইল।

"[illegible]

কি

অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি সকল গুলিরই উত্তরে বলিলেন:—

'ঐ আমি যা বলেছিলাম; ভূতটুত কিছুই তো দেখতে পেলাম না!'

"এর পর মুচির জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাষ্টারকে তাহারা বলিল যে সে স্থানান্তরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।

"আধ ঘন্টা হইয়া গেল, তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে একটা বাজিল! তার পর আর থাকিতে পারিল না, মুচির অনুপস্থিতির কারণ তাহারা মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়া ফেলিল। মাষ্টার মহাশয় শুনিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। লাফাইয়া উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং সকলকে [illegible] আসিতে বলিয়া দৌড়িয়া চলিলেন।

"সকলেরই বিশ্বাস হইল মাষ্টা[illegible] বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হৈচৈ[illegible] জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা কি[illegible] বাহিরে আসিয়া [illegible] বলিতে লাগিল।

মাঠের মধ্য হইতে গালি এবং কোঁকানি মিশ্রিত এক প্রকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কতদূর গিয়া দেখা গেল একটা লোক জলার ধারে বসিয়া আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্দ্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি। সেইখানে বেচারা দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মাষ্টারের উদ্দেশে গালাগালি দিতেছে। তাহার নিকট হইতে সকলে সমস্ত ঘটনা শুনিল।

* * * * * * * * * * * *

"শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বাড়ীর জানলার ঠিক সম্মুখে একটা ছোট গাছ ছিল। তাহারই ছায়া চন্দ্রের আলোকে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই ছায়ার আকৃতি ...খিতে ঠিক ক্যামিরণের মুখের মত। সে দিন ... না বলিয়াই মাষ্টার মহাশয় সেই ছায়া ... া নাই।"

নূতন।

১।—আমার আধখানা সাহেব, আধখানা বাঙ্গালী, কিন্তু দুইই অপদার্থ। বলত আমি কোন্ ফল?

২।—ভয়ানক লোক আমি, তিনটী অক্ষর
স্মরিলে আমারে সবে ভয়েতে কাতর।
প্রথমে ছাড়িলে যুদ্ধে যায় ত্বরা করি
ত্যজিয়া দ্বিতীয়ে মানবের মন হরি।
তৃতীয়টী নিলে গালি দিব হে তোমারে
কেমন জিনিস সবে দেখিবে আমারে।

৩।—আহা! মনের আনন্দে বাজনা বাদ্য লইয়া মহা ধূমধামে যাচ্ছি, আর ভাই একটা গোরু আমার বাঁদিকে যেই এসেছে আর কি না তোমাদের দাসীও আমাকে হাতে ক'রে লইয়া গেল?

৪।—সাগরেতে জন্ম মম জলজন্তু পাশে
মন্ত্রবলে কিন্তু ভাই বেড়াই আকাশে।
এ কি মজা, যবে আমি করিব রোদন
সে রোদনে প্রাণ পাবে সকল ভুবন?

৫।—আদরের ধ... ...ানব সংসারে
সকলেই ...
কিন্তু ...

মার্চ, ১৮৮৫।

প্রাচীনকালের ছাত্রজীবন।

এখন আমাদের দেশের বালকেরা দশটার সময় বহি লইয়া স্কুলে যায়, এবং চারিটা বাজিলে বাড়ীতে ফিরিয়া আইসে। স্কুলে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শিক্ষকের উপদেশ শুনে, শিক্ষক যেপাঠ দেন, মন দিয়া তাহা অভ্যাস করে। পরে বাড়ী আসিয়া পিতা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবকের অধীনে থাকিয়া আপনার কাজ কর্ম্ম করে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে লেখা পড়া শিক্ষার এমন নিয়ম ছিলনা। তখন ছেলেদের বয়স পাঁচ বৎসর হইতে না হইতেই, তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য গুরু-গৃহে যাইতে হইত। ছাত্র এই সময়ে মনোযোগের সহিত গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিত, এবং মনোযোগ ও ভক্তির সহিত গুরুর সেবা শুশ্রূষায় নিবিষ্ট থাকিত। বিদ্যা শিক্ষা ও গুরুর সেবা শুশ্রূষা করাই তখন তাহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইত। বিদ্বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ না ...ইলে এবং গুরুর আদেশ না পাইলে কেহ বাড়ী ...য়া বাস করিতে পারিত না। ছাত্র যত ...রু-গৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তত দিন তাঁহাকে অনেক গুলি কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত। ছাত্রকে ব্রহ্মচারী বলা যাইত এবং তাঁহার ছাত্রত্ব অবস্থার নাম ব্রহ্মচর্য্য ছিল। ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মগুলি যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন। তিনি প্রত্যূষে সূর্য্য উদয় হইবার আগে শয্যা হইতে উঠিতেন, প্রাতঃস্নান করিয়া গুরুর পূজার জন্য ফুল ও যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ আনিয়া দিতেন। ইহা ভিন্ন জল আনিতেন, যজ্ঞের স্থান পরিষ্কার করিতেন, এবং প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা গুরুকে দিতেন। গুরু তাঁহাকে যাহা খাইতে দিতেন তাহা ভিন্ন তিনি আর কিছুই খাইতে পাইতেন না। এরূপ কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিয়া, ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে, মনোযোগ সহকারে গুরুর নিকট বেদ শিক্ষা করিতেন। আমাদের এখনকার ছাত্রেরা, অনেকে লেখা পড়া শিখিতে যাইয়া বড় বিলাসী হইয়া পড়েন, বাবু-আনা চালে চলেন, পমেটম্ প্রভৃতি মাথায় দিয়া, সিঁতি কাটিয়া, রঙ্গীন জামার উপর গোলাপ ফুল প্রভৃতি গুঁজিয়া স্কুলে আসিতেও লজ্জিত হন না। শিক্ষার সময় এইরূপ বিলাসিতা, এইরূপ বাবু-আনা চাল হওয়াতে শিক্ষার্থীদিগের নিষ্ঠা দূর হয়। কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস হয় না, এবং আত্ম-সংযম ও বিলাস-বিদ্বেষ প্রভৃতি নষ্ট

হইয়া যায়। কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারা যায় না। বিদ্যাভ্যাস করিতে হইলে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি কাটাইয়া উঠিতে হয়। অনেক পরিশ্রম ও অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া, কঠিন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়; সুতরাং বিদ্বান্ হইয়া বিজ্ঞতা ও বহু-দর্শিতা উপার্জ্জন করিতে হইলে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা চাই। বাবু-আনা চালে চলিলে—ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিলে লেখা পড়া হয় না, সুতরাং সংসারে বড় লোক হইতে পারা যায় না। পৃথিবীতে যাঁহারা বড় লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন, সকলেই ঘোরতর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া, নানাবিধ বিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে ছাত্রেরা এজন্য ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম পালন করিয়া কষ্ট-সহিষ্ণু হইতেন। বিদ্যাভ্যাসের সময় কষ্ট-সহিষ্ণুতা ব্যতীত আরও অনেক গুলি গুণ থাকা আবশ্যক; তাহার মধ্যে নিষ্ঠা, মনোযোগ ও চিত্ত-সংযম প্রধান। ব্রহ্মচারীর এসকল গুণও অভ্যাস হইত। ব্রহ্মচারী প্রভাতে স্নান করিয়া পবিত্র হইতেন, দেব সেবার জন্য ফুল আহরণ করিতেন, দিবা রাত্রি গুরুর পরিচর্য্যার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন,ইহাতে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার নিষ্ঠা জন্মিত। সর্ব্বদা গুরুর উপদেশ গ্রহণ ও গুরুর আদেশ পালন করাতে তাঁহার মনোযোগ অভ্যাস হইয়া আসিত। ব্রহ্মচারী ভোগ বিলাস হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন। তিনি কোনও প্রকার গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না, বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না, উৎকৃষ্ট শয্যায় শুইতেন না, অলঙ্কার পরিয়া দেহের শোভা বাড়াইতেন না, এবং ভাল জিনিস খাইবার জন্যও উৎসুক থাকিতেন না। তাঁহার ভোগবিলাসের বাসনা, তাঁহার ভাল খাইবার, ভাল পরিবার ইচ্ছা, কিছুই থাকিত না। তিনি সামান্য কাপড় পরিতেন, সামান্য কুশাসনে শুইতেন এবং প্রত্যূষে উঠিয়া, গুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ভিক্ষা করিয়া, যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার জীবন রক্ষা হইত। এইরূপ কঠোর ব্রত পালন করাতে ব্রহ্মচারীর মনের স্থিরতা জন্মিত। এইরূপে প্রাচীনকালের ছাত্রগণের কষ্ট-সহিষ্ণুতা, চিত্ত-সংযম, মনোযোগ প্রভৃতির বিকাশ হইত। এই কষ্ট-সহিষ্ণুতা, চিত্ত-সংযম ও মনোযোগ প্রভৃতির গুণে, ছাত্র ইহার পর সৎকার্য্যশালী গৃহস্থ হইয়া উঠিতেন।

ঠাকুরদাদার গল্প।

তুষারপাত। (Snow.)

বীন বাবুর ছাত্র সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁর আনন্দ হইতে লাগির পাড়ার সমস্ত বালকগণই ক্রমে তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের ভাল ভাল গল্পে নূতন নূতন জ্ঞান

লাভ করিবার লোভে আসিয়া জমা হইতে লাগিল। তিনিও খুব আহ্লাদের সহিত সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রায়ই সকলকে সঙ্গে লইয়া এদিক ওদিক সর্ব্বত্র বেড়াইয়া বেড়ান আর নূতন বিষয় সকল শিক্ষা দেন। এইরূপ এক দিন একদল বালক সেনা সঙ্গে লইয়া মাঠে ভ্রমণ করিতেছিলেন। গণেন্দ্র নামক একটী বালক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আমরা পুস্তকে যে 'স্নো'র (Snow) কথা পড়িয়াছি তাহার কথা কিছু বিশেষ করিয়া বলিবেন কি? তাহা হইলে ভাল বুঝিতে পারি। 'স্নো' (Snow) কি, তাহা বুঝি নাই।"

নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "আজ বেড়াইতে আসিবার পূর্ব্বে এই বিষয়েই গল্প করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে বেশ্ই হইয়াছে। এ বড় চমৎকার কথা, কিন্তু 'স্নো' অর্থাৎ তুষার আমাদের দেশে পড়ে না, তাই হয়ত তোমরা সহজে বুঝিতে পারিবে না; মন দিয়া শুনিতে হইবে। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই শিলাবৃষ্টি দেখিয়াছে; শিল পড়ার সময় মাথায় ছাতা দিয়া বড় বড় শিল কুড়াইয়া খাওয়া তোমাদের ও একটা খুব বড় আমোদ। না? (সকলে:—"হাঁ।") কিন্তু শিল যে কিরূপে হয় তাহার এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থিরতা হয় নাই; নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু কেহই স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তবে তুষারের উৎপত্তি খুব সহজেই বুঝা যায়। যে সকল দেশে শীত বড় অধিক, যে সকল দেশের বায়ুর উত্তাপ ৩২° ডিগ্রীর অপেক্ষা অধিক নয়, সেই সব দেশে বায়ুর উপরে ভাসমান বাষ্প ঘন হইয়া জলকণা ও তৎপরে বেশী শীত বলিয়া একেবারে বরফ হইয়া যায়। যেমন ক্ষুদ্র কণা তেমনি ক্ষুদ্র বরফ-কণাও হয়। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ-কণাকে তুষার (Snow) বলে। তুষার জমাট কুয়াশা বৈ আর কিছুই নহে। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম অধিক, এজন্য এরূপ ঘটনা কখনই হয় না। কিন্তু উত্তর অঞ্চলে হিমালয় পর্ব্বতের উপর যে সকল স্থানের তাপপরিমাণ ৩২° ডিগ্রী অপেক্ষা অধিক নয়, সে সকল স্থানে তুষারপাত হইতে দেখা যায়। আর ইংলণ্ড,সুইজলাণ্ড্ প্রভৃতি দেশে খুব তুষারপাত হইয়া থাকে। তাহা তোমরা 'সখা'য় 'জীবনরক্ষক কুকুরে'র গল্পে পড়িয়াছ। ঐ সকল দেশে শীতকালে বড় ভয়ানক তুষারপাত হয়। এমন কি—পথ, ঘাট, মাঠ সব সাদা সাদা তুলার কুচির মত তুষাররাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সূর্য্যকে অনেক সময় দেখাই যায় না; কেবলই স্তূপাকার তুষাররাশি পড়িতেছে, বাতাসে আবার একস্থান হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া যাইতেছে, কত কি রকমে মহা আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে! সুইজর্লাণ্ড্ দেশে যে কি ভয়ানক ব্যাপার তা ত পড়িয়াছ? রাশি রাশি বরফকণার মধ্যে কত মানুষ ডুবিয়া পুতিয়া থাকে, প্রাণ হারায়,তাহার ঠিকানা নাই। অনেক স্থলে রাত্রির মধ্যে অনেক ছোট ছোট কুটীরের দ্বার পর্য্যন্ত তুষার স্তূপের মধ্যে বুজিয়া থাকে, কত কষ্টে—তবে সে সব সরাইয়া দ্বার খুলিতে হয়!

অল্প অল্প তুষারপাতের সময়ে সাহেবদের ছেলেরা মহা আনন্দে তাহাতে খেলা করিতে যায়। তাহারা লূণের গাদার মত, কি সাদা সাদা খুব হাল্কী বালির গাদার মত তুষারের কাঁড়ির উপর লম্ফ ঝম্ফ করিয়া মহা আমোদে উন্মত্ত হয়, সে সময় তাহাদের খাওয়া দাওয়ার কথা মনে থাকে না। কত যায়গায় ছেলেরা

আবার মুটো করিয়া তুষার জমাট বাঁধায়, আর তাই একত্র করে খুব মস্তো একটা মানুষের মত তৈয়ার করে। দূর হ'তে সেই মানুষটার গায় 'স্নো'র ডেলা মারিতে থাকে আর কত যে আমোদ করে তাহার সীমা নাই। 'স্নো' খুব হাল্‌কী, একটু বাতাস হ'লেই অমনি উড়িতে আরম্ভ করে। আর যখন নাচিতে নাচিতে উড়িতে উড়িতে ধীরে ধীরে বায়ুর মধ্য দিয়া পড়িতে থাকে তখন বড় সুন্দর দেখায়। এ বৎসর তোমাদের হিমালয়ে যে যে যাইতে চাও আমি লইয়া যাইব।" অমনি কিশোরী, অমূল্য, মন্মথ, নগেন প্রভৃতি সকলে মহা গোল করিয়া বলিল "আমি যাব দাদা বাবু। আমাকে নে যাবে না দাদা? আমি কি যাবনা?" ইত্যাদি।

সকলকে থামাইয়া নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন:—"তুষারকণার আকার খুব বড় নয়, আমাদের দেশে বর্ষাকালে বাদলের দিন যে গুঁড়নী বৃষ্টি হয়, কুয়াশার চেয়ে একটু বড় বড় বিন্দুগুলি ঝির ঝির ক'রে পড়িতে থাকে, তুষার তত বড়; তবে জল অপেক্ষা বরফের আয়তন নাকি একটু বড় তাই বেশ্ স্পষ্ট দেখা যায়, নাড়া চাড়া যায়। কিন্তু একটা কথা,—যখন খুব শীত হয়, যত শীতে জল জমিয়া যায় তার চেয়ে যদি খুব ঠাণ্ডা হয়, তবে তুষার বেশী পড়ে না, কিম্বা যদি বা পড়ে তবে সে খুব গুঁড়ি গুঁড়ি। কেন না বাতাস যত গরম থাকে তাতে জলীয় বাষ্প তত অধিক থাকে, আর যত ঠাণ্ডা হয় তাতে বাষ্পের অংশ তত কম থাকে। কাজেই ঐ রকম খুব শীতের সময়, ইংরাজীতে যাহাকে frost বলে, সে সময়ে বড় তুষারপাত হয় না। তাহার পূর্ব্বে খুব তুষার পড়ে, আর পরে যখন বাতাস আর একটু গরম হয় তখন পড়ে; মাঝখানে কম পড়ে, বা পড়েই না। ঐ রকম জমাট শীতের সময়ে (frost) তুষারে দেশের বড় উপকার করে। বরফ তাপ পরিচালক নহে, এজন্য যে সব চারা গাছ, শস্য প্রভৃতি ঐ তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তাপ বাহির হইয়া যাইতে না পারায় তত ভয়ানক শীতেও তাহারা মারা যায় না।"

কিশো:—"সে কি? বরফে ঢাকা থেকে তারা গরম থাকে?"

নবীন বাবু:—"হাঁ। এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম ঈশ্বরের। শীতে একেবারে গাছগুলি মারা যেত; কিন্তু তিনি বরফ দিয়া আবৃত করিয়াই তাহাদের উত্তাপ রক্ষা করিয়া সে গুলিকে সজীব রাখিয়া থাকেন! স্পষ্টই দেখা যায় যে, যে সকল স্থান হইতে বায়ুতে তুষারের ঢাকনি উড়াইয়া লইয়া যায়, সে সব স্থান শীতে একেবারে শুষ্ক হইয়া উচ্ছন্ন যায়।"

অমূল্য:—"কি চমৎকার! এ সকল জানিলে কত আশ্চর্য্য হইতে হয়; পরমেশ্বরের কেমন মহিমা টের পাওয়া যায়!"

নবীন বাবু:—"এখনও বাকী আছে। তোমরা মনে করিতেছ—তুষার ত তুষার। রাশি রাশি বরফের কুচি। তা নয়। তাহার প্রত্যেক কণার যে কি সৌন্দর্য্য, কি আশ্চর্য্য গঠন-প্রণালী তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। কাপ্তেন স্কোর্স্‌বী Captain Scoresby উত্তর মহাসাগরীয় স্থানে লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছেন যে প্রায় এক হাজারের চেয়েও বেশী রকম গঠনের তুষার কণা দেখা যায়। তাহাদের আকার যে কি সুন্দর তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে এই এক হাজারের মধ্যে যে কয়েকটীর ছবি দেওয়া গেল তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে তুষার কণা যথার্থই কি চমৎকার শোভার জিনিস। এত রকম আলাদা
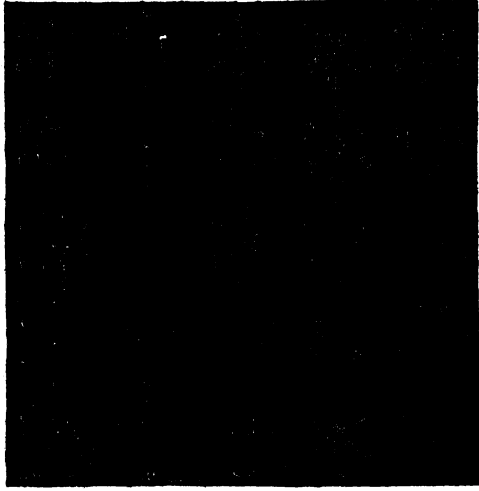
বটে, কিন্তু সকলেই দেখিতে পাবে যে তাদের মধ্যে সবই একটা সুন্দর নিয়মের অধীন। সকল গুলিরই একটা সাধারণ আকার আছে, তাহা কি?—না সকলেই ছয়টী কাঁটাওয়ালা নক্ষত্রের মত দেখিতে। তবে ওরই মধ্যে সব চেহারা আলাদা। ছটা কাঁটা কিন্তু সবারই আছে, মন দিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে।"

গণেন্দ্রঃ—"আচ্ছা এ রকম হয় কেন?"

নবীনবাবুঃ—"এই প্রকার আকার ধারণের নাম 'দানা বাঁধা' ইংরাজীতে বলে crystallisation, এই দানা গুলির নাম crystals। আমরা বলি জল জড় পদার্থ। কিন্তু ঐ জড় পদার্থের মধ্যে লুকাইয়া যে এক জন মহা শিল্পী কাজ করিতেছেন তাহা ত দেখি না! কোন কোন বস্তুর এমন গুণ আছে যে জলে মিশ্রিত থাকিবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, কিন্তু যখন ঐ জল আস্তে আস্তে উড়াইয়া বাষ্প করিয়া দেওয়া যায়,তখন সেই সামগ্রী (যাহা এতক্ষণ জলে গুলিয়া ছিল) আস্তে আস্তে দেখা দিতে থাকে; কিন্তু যে-সে আকারে দেখা দেয় না, এক বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আকারে দানা বাঁধিতে দেখা যায়। যেমন তোমরাই বাড়ী গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার—লবণ বা সোরা জলে গুলিয়া, তাপ দিতে দিতে যেমন জল শুকাইয়া আসে অমনি ঐ সকল লবণ বা সোরার কণাগুলি ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া দেখা দেয়। পরিষ্কার চিনির রস কুঁদার মধ্যে ঢালিয়া রাখিলেই পরে রস মরিয়া মিছরী হয়, তার দানা ত সকলেই দেখিয়াছ, ভাল গুড়ও কখন কখন দানা বাঁধে। এও ঠিক তেমনি; জল জমিবার সময়ে ছোট ছোট কণাগুলি ঐরূপ দানা বাঁধিয়া দেখা দেয়। কি তুষার, কি শিল, এমন কি বরফে পর্য্যন্তও এই রকম ছয়টা কাঁটাওয়ালা নক্ষত্রের মত দানার গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। কি সুন্দর! কি চমৎকার! ধন্য সেই শিল্পকার, যিনি এইরূপে জগতময় আপনার কারিকুরি ছড়াইয়া রাখিয়া-

ছেন! আমরাও ধন্য যে তাঁহার মহিমার কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে পারি।”

লেখা পড়া কিসের জন্য?

ভুবনের কাহিনী।

রামজীবন বাবু একজন বুনিয়াদি বড় লোক। তাঁহার খুব বিষয় বিভব, টাকার গাছ একেবারে। চারিদিকে ব্যবসায় বাণিজ্য, জমিদারী, কলিকাতায় ১০।১২টা বড় বড় বাড়ী ভাড়া চল্‌ছে, খুব বড় মানুষ লোক। তাঁহার একমাত্র ছেলে ছিল, তা সেও মরিয়া গেল। কাজেই তাঁহার ভাইপো ভুবনই সমস্ত বিষয় পাবে ঠিক ঠাক হইয়া আছে। তাহার সমবয়সী বন্ধুরা তাহাকে কত ভাগ্যবান বলিয়া হিংসা করে। ক্রমে ভুবন বড় হইল। মহা ধূমধামে ভুবন বাবুর বিবাহ হইল। কন্যাটী পরমাসুন্দরী, যেন স্বর্গের পরী। আহা! তাহার দুঃখের কথা এখন মনে হলে চক্ষে জল আসে, বুক ফাটিয়া যায়! তোমরাও শুনিলে মহা দুঃখিত হইবে। ভুবন আর বিদ্যালয়ে যায় না। বাবু হইয়া ভাল পোষাক পরিয়া, ভাল সুগন্ধ এসেন্স মাখিয়া, গায় ফুঁ দিয়া নানা স্থানে ছড়ি হাতে করিয়া বেড়ায়। মুখ রাঙ্গা করিয়া পান খায় আর দিব্য ফুলের মত কোঁচার আগাটী বাঁ হাতে ধরিয়া বেড়ায়। তাহার সে বেশ ভূষা দেখিলে সকল ছেলে মেয়ের রাগ হইত। নাই বা হবে কেন? একেইত ধুম বাবুগিরি ভাল ছেলে মেয়েরা দেখিতে পারে না, তাহাতে আবার ছেলেটা মূর্খের চূড়ামণি। সকলেই ভুবনকে ঠাট্টা করিত, দেখিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিত আর ময়ূররাজ বলিয়া ডাকিত। গ্রামের কেহই তাহাকে দেখিতে পারিত না। রামজীবন বাবু তাঁহার আদরের ধন ভুবনমোহনকে চিরকাল ‘খোকা’ বলিয়া ডাকিতেন। কেহ তাহার নিন্দা করিলে সহ্য করিতে পারিতেন না। বলিতেন “পাড়ার লোকের কি? আমার বাপকে আমি সাজাই, আমার খুসী। আমার এত ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্য; কাজ কি ভুবনের লেখা পড়ায়? ও যদি বিষয় উড়াইয়াও দেয়, তবু উড়াইতে উড়াইতে ৪ চারি পুরুষ কাটিয়া যাইবে। কাজ কি লেখা পড়া শিখে? যাদের চালে খড় নাই, ঘরে ভাত নাই, সাত পুরুষে টাকার মুখ দেখেনি তারাই লেখা পড়া শিখে চাক্‌রী করুক গে! সব বেটার হিংসা হয় কি না, তাই এসে আমার ‘খোকা’র নিন্দা করেন।” এই রকম নানা প্রকারে ছেলেটীকে আদর দিয়ে তাহার মাথা খাইয়া ফেলিলেন। ভুবন আড়াল হইতে সে সব কথা শুনিয়া আরও আদর পাইত আর পৃথিবীকে সরা মনে করিত। এইরূপে উত্তম মধ্যম রূপ উচ্ছন্ন গেল। ভুবনের মা বিধবা, তাহার কাকাই তাঁহার অভিভাবক, কাজেই কর্ত্তার উপর আপনার কথা আর চালাইতে পারেন না। ছেলেকে কত বুঝান, কত বলেন, কত বিনয় করিয়া শিক্ষা

দেন। ছেলে ততই একেবারে ধিঙ্গী হইয়া তাঁহার কথা তৃণ জ্ঞানও করে না। পৃথিবীতে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ তার দশা কি হইয়াছে। হয় ত তোমাদেরই গ্রামে এ রকমের 'খোকা' দু একটি আছেন।

কিছুদিন ত এই রকমে যায়, তখন স্কুল হইতে নামটী কাটাইয়া 'খোকা বাবু' বাড়ীতে বসিলেন। তাঁহার একটা আলাদা বৈঠকখানা হইল। সাজান গোজান আস্‌বাব্, ইয়ার বন্ধু অনেক আসিয়া যুটিল। রোজ বিকালে মহা ধূমধাম ব্যাপার ছোট বৈঠকখানায় চলিতে লাগিল। ক্রমে মদ্যপান অবধি গড়াইল। বাবুদের বংশ চিরকাল মদ্যের বড়ই বিরোধী। কোন পুরুষে কেহ কখনই মদ খায় নাই। কাজেই বাবু এই কথাটী শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, বিরক্ত হইলেন। প্রথমে চাকর বাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে 'খোকা' বলিল "না আমি ত মদ খাই না।" তার পরেও আবার ঐ রূপ কাণ্ড চলিতে লাগিল। তখন বাবু নিজে এক দিন ভুবনকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। সে তাঁহার কাছে বেশ্ মিছা কথা বলিয়া কাটাইয়া দিল। বাবুর বয়স অনেক হইয়াছিল, মনের দুঃখে, মনের ক্ষোভে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এত দিনের পরে বুঝিলেন যে লেখা পড়া শেখা কেবল টাকা উপায়ের জন্য নয়। লেখা পড়া না শিখিলে যে মানুষই হওয়া যায় না, চরিত্র ভাল হয় না, গুরুজনকে মান্য করিতে শেখে না তা এত দিন পরে জানিতে পারিলেন।

তাঁহার গমস্তা বিহারী সরকার,—তাহার একটি ছেলে, নাম কেশব, বয়স ১৭ বছর, ইহারই মধ্যে সে এল্ এ, পাশ করিয়া কলিকাতার বিদ্যাসাগরের কালেজে বি, এ, ক্লাশে পড়ে। একদিন বাবুর এজলাশে তাঁহার গমস্তা, দাওয়ান, খাতাঞ্জী সকলে বসিয়া বিষয় কর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে কেশব সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলের চরণ পূজা করিয়া পিতার পায়ের ধুলি লইয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ছেলেটী?" বিহারী সরকার ছেলের পরিচয় দিয়া কহিলেন "ধর্ম্মাবতার! ওটী আপনারই অনুগত ভৃত্যের সন্তান, আপনারই আশ্রিত দাস।" তাহার পর অবধি কেশবের উপর বাবুর এমন ভাল বাসা জন্মিল যে তিনি তাহাকে সে দিন আপনার বসিবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। তারপর একদিন সকলের সাক্ষাতে বলিলেন, "যাহারা লেখা পড়া জানে না, বিদ্যা শিখিয়া যাহাদের মন নরম না হয়, তাহারা মানুষই নয়। আমি এতদিন একটা গর্দ্দভকে আহার দিয়া পুষিতেছি! ধিক্ আমার বুদ্ধিতে! আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও আমি বিহারী সরকারের চেয়ে হতভাগ্য! আহা! আমার যদি কেশবের মত ছেলে হইত, আর আমি যদি পথের ভিখারী হইতাম, তাহ'লেও আমি এর চেয়ে সুখী হ'তে পারতাম!" আর কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া গেল, চক্ষে দুফোঁটা জল এল, মুছিয়া ফেলিলেন। সভাস্থ সকলে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের ক্লেশ নিবারণ হইল না। তিনি নির্জ্জন ঘরে গিয়া [illegible] কাঁদিলেন। বৃদ্ধ বয়সে [illegible] নয়; ইনি তাঁহার প্রাণ যা[illegible]জন নন; যদিও আজীবন কেশবের ক[illegible]কার্য্যের উৎসাহদাতা, তথাপি নিকট [illegible] অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া ইহাঁর নাম নয়; [illegible]ন লোকে ইহাঁর প্রশংসা করে, আর কেনই

তাহার মুখে ভাল ভাল অনেক কথা শুনিয়া বাবুর মন অনেকটা সুস্থ হইল। তিনি স্নানাদি করিলেন। কিন্তু মনের ক্ষোভ আরও যেন বাড়িতে লাগিল। কেশবকে ছাড়িয়াও দিতে চাহেন না, আবার এদিকে যতই কেশবের জ্ঞান, বুদ্ধি, সৎচরিত্রের পরিচয় পাইতে লাগিলেন, ততই হায় হায় করিতে লাগিলেন। "আহা! ভুবনকে আমি যে ৫০ হাজার টাকা খরচ করিয়া পড়াইতে পারিতাম, সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিয়াও তাহার লেখা পড়ার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। কেন করিলাম না! আহা! কেন নিজে এ সর্ব্বনাশ করিলাম! আমার বংশের মুখে ছোঁড়া কালী দিল। আর তার মুখ দেখিব না, সে দূর হউক!"

ভুবন এদিকে খুব আসর গরম করিতেছিল, মদ—মদ—মদ!! মহা ব্যাপার। তার আনুসঙ্গিক অন্য সকল কাজও চলিতেছিল। ছি! ছি!! গ্রামের সকলেই ঘৃণা করিতে লাগিল। বাবুকে পর্য্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ আর তাঁহার কাছে আসে না, গল্প করিতে আর কেহ তাঁহার বৈঠকখানায় বসে না। যদিও কেহ যায় ত কেবল তাঁহার নিন্দা করিয়া উঠিয়া আসে। তাঁহারই অন্যায় আদরে ও অবহেলায় ছেলেটী নষ্ট হইল এই বলিয়া তাঁহাকে সকলে ভৎর্সনা করে। এবারে আর তিনি সে সব কথার চটা চটা জবাব দেন না। মাথা হেঁট করিয়া শুনেন, আর দুটী চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়ে! আহা! তাহার দুঃখের [illegible]কাগণ! তোমাদেরও খুব দুঃখ হচ্ছে, আসে, বুক ফাটিয়া যায়! [illegible]নও কারণে তোমাদের মহা দুঃখিত হইবে। ভুবন আর [illegible]দাইও না। যায় না। বাবু হইয়া ভাল পোষাক প[illegible] [illegible]শন্ধ সকলেই [illegible]ভাগিনী

পতিহীনা জননীর ত কথাই নাই! আহা! তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হওয়ার সময়ে তিনি বলিয়া যান যে "ভয় কি তোমার? আমার সহোদর ভাই রহিলেন ইন্দ্রের মত, আর এই কার্ত্তিকের মত পুত্র রহিল। তোমার দুঃখ ইহাঁদের দ্বারা অনেক দূর হইবে।" এখন সেই পুত্রের এই দশা। মার কি আর সহ্য হয়? তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটী অন্ধ করিলেন, পাগলিনীর মত বেড়ান। গরিবের বাছা বৌটী ছেলে-মানুষ ছিল, এতদিন বড় কিছু বুঝিত না, এখন আর তার দুঃখের সীমা নাই। কিন্তু, আহা! অমন মেয়ে দেখা যায় না। মুখে কথাটী পর্য্যন্ত নাই, সহ্যগুণ যে কত? দিবারাত্রি কেবলই শাশুড়ীর সেবাতে নিযুক্ত থাকেন, আর কেহ কাছে না থাকিলেই চুপি চুপি চক্ষের জলে বস্ত্রের আঁচল ভিজিয়া যায়। এ সব দুঃখের কথা লিখিতে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে, চক্ষের জল রাখা যায় না। আর কোমল হৃদয় পাঠক পাঠিকাদিগকে কাঁদাইতাম না, কিন্তু ইহার দ্বারা অনেকের শিক্ষা হইবে মনে করি, তাই লিখিতেছি।

কিছুদিন ত এইরূপে গেল। মানুষের দেহে অত্যাচার কত দিন সহ হয়? ভুবনের খুব রোগ হইল। বুকে ব্যথা, জ্বর, কাশী, যকৃৎ একেবারে ছেলে রোগে আচ্ছন্ন হইয়া শেষে ভিতর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। নানাবিধ চিকিৎসা হইতে লাগিল। বহু কষ্টে এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। বুকের ব্যথা ও কাশী সারিল না। কিন্তু কে বুঝিবে? জ্ঞান শূন্য হইয়া যে যায়, তার আর কি পদার্থ থাকে? আবার মদ্যপান চলিতে লাগিল। তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক দিন রাত্রে বাবু নিজে তার ঘরে গিয়া খুব ভৎর্সনা করিয়া এলেন। তিনিও চলিয়া আসিয়াছেন, আর হঠাৎ ভয়ানক একটা বন্দুকের

শব্দ হইল। সকলে গিয়া দেখে ভুবনের ঘরে দ্বার বন্ধ। ডাকাডাকি করিয়া উত্তর পাইল না, শেষে দরজা ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখে ভুবন গুলি খাইয়া মরিয়াছে, আপনা আপনি মুখের মধ্যে বন্দুক ছুড়িয়া মরিয়াছে! তার পর যে বাড়ীতে কি কান্নার রোল, তা আমরা বর্ণনা করিতে পারিব না, তোমরা বুঝিয়া লও। সে ব্যাপার বুঝিলেই ভাল জানা যায়।

সকলেরই দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু কেশবের সৎ কথায় ও সান্ত্বনাতে বাবুর মন অনেকটা ভাল ছিল। কিন্তু কদিন থাকে? যখনই শুনিলেন যে ভুবনের মা পাগল হইয়া কোথায় গিয়াছেন, ও তাহার স্ত্রী হাতে পায়ে কাপড় বাঁধিয়া খিড়কীর পুকুরে ডুবিয়া মরিয়াছেন, তখন আর তাঁহার সহ্য হইল না। বৌটীকে তিনি "মা" বলিয়া ডাকিতেন ও বড়ই ভাল বাসিতেন। এ বড় অসহ্য যন্ত্রনা হইল। মাটিতে পড়িয়া "মা" "মা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গড়াইতে লাগিলেন। আহা! কাপড় জামা ধূলায় লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল, মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষে অচেতন হইয়া পড়িলেন। সকলে মুখে চক্ষে জল দিয়া সুস্থ করিল।

বাবু এই অবধি কেশব ভিন্ন আর কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। কেশব তাঁহাকে ইংরাজী বাঙ্গালা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া শুনাইত। ক্রমে তাঁহার বেশ ধর্ম্মজ্ঞান হইল। তিনি অল্প দিন পরে কেশবের হস্তে আপনার বিধবা স্ত্রী ও সমস্ত বিষয়, জমিদারী, টাকা ও বাণিজ্যের ভার দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এখনও কি পাঠক পাঠিকা বলিবেন "লেখা পড়া শেখা কেবল চাকুরী করিবার জন্য?"—

রামতনু লাহিড়ী।

বালক বালিকাগণ যে মহাত্মার ছবি আজ তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি ইহাঁর নাম কি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলে? যদি না শুনিয়া থাক তবে শুন, ইহাঁর বিষয় কিছু বলি। ইনি একজন আমাদের দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি। কিসের জন্য বিখ্যাত? অতুল বিভব সঞ্চয় করিয়া মতিলাল শীল যেরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন সেইরূপ বিখ্যাত নয়; বুদ্ধি বিদ্যার জন্য মৃত দ্বারিকানাথ মিত্র যেরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন সেরূপ নয়; দান ও বিবিধ সৎকীর্ত্তির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ বিখ্যাত হইয়াছেন সেরূপ নয়; ইনি ধনীদের মধ্যে একজন নন; যদিও আজীবন সকল প্রকার সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা, তথাপি সে বিষয়েও অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া ইহাঁর নাম নয়; তবে কেন লোকে ইহাঁর প্রশংসা করে, আর কেনই

বা ইহাঁর জীবন বৃত্তান্ত তোমাদিগকে বলিতে চাহিতেছি? ইনি সাধুতার জন্য দেশে বিখ্যাত। ইনি একখানিও গ্রন্থ লেখেন নাই, সকল কাজেই অন্যের পশ্চাতে থাকিয়া কাজ করিয়াছেন, আপনাকে সকলের অপেক্ষা হীন মনে ভাবিয়া লুকাইয়া থাকিতে ভাল বাসিয়াছেন, কিন্তু তথাপি মৃগনাভি যেমন কাপড় ঢাকা থাকিলেও আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, গোলাপ যেমন বনে লুকাইয়া থাকিলেও আপনাকে ধরা দেয়, সেইরূপ এই মহাত্মার সাধুতার সুবাস আপনা আপনি ইহাঁকে জানাইয়া দিয়াছে। যদিও ইনি এখন জীবিত আছেন এবং এখন এই কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন, তথাপি নিজ চরিত্রের গুণে ইনি প্রাচীন কালের সাধুদের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হইয়াছেন; আমরা সকলে ইহাঁকে পিতৃতুল্য জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করি। এরূপ সাধু মহাত্মাকে জীবনে একবার দেখিতে পাওয়াও সৌভাগ্য।

অগ্রে ইহাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলি। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে ইহাঁর জন্ম হয়; সুতরাং ইহাঁর বয়ঃক্রম এখন ৭১ বৎসর। বাল্যকালে ইনি পাঠশালায় লেখা পড়া অভ্যাস করেন। কিন্তু তখনকার বালকদিগের স্বভাব চরিত্র বড় মন্দ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাহারা অনেক কু অভ্যাস শিক্ষা করিত। এই সকল কু সংসর্গে পড়িয়া তাঁহার পড়া শুনা ভাল হইতেছে না দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই এদেশের লোককে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল-সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপন হয়। রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি কয়েক জন ইংরাজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোক এই সভার সভ্য ছিলেন। ডেভিড হেয়ার এই সভার সম্পাদক ছিলেন। রামতনু বাবুর কলিকাতা আসিবার কিছু পূর্ব্বে মহাত্মা হেয়ার সাহেবের যত্নে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে তিনি হিন্দু কালেজে গমন করেন। হিন্দু কালেজে তখন ডিরোজিও নামে একজন ফিরিঙ্গী যুবক চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁর নাম বাঙ্গালা দেশের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তির জানা উচিত, কারণ যে সকল শিক্ষিত লোকের যত্নে প্রথম প্রথম সকল প্রকার উন্নতির স্রোত এদেশে প্রবাহিত হয় সেই সকল লোক এই ডিরোজিও সাহেবেরই শিষ্য ছিলেন। এই অসাধারণ বুদ্ধিশালী যুবকের বয়স তখন ২০ বৎসরের অধিক ছিল না, কিন্তু তিনি সুবিদ্বান, সুলেখক, সুকবি ও সুভাষী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন, মুখ হাসি হাসি, ও প্রকৃতি বড় মেশক ছিল। তিনি যে কেবল বালকগণকে পড়িবার বই পড়াইয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্য সময়েও তাহাদিগের মধ্যে বসিয়া গল্পচ্ছলেও নানা প্রকার বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন। যাহাতে তাহাদের কুসংস্কার দূর হয়, সত্যের প্রতি ভালবাসা জন্মে, চিত্ত উদার হয়, চিন্তা করিবার শক্তি জন্মে, প্রাণে ভাল ইচ্ছা প্রবল হয়, সর্ব্বদা এইরূপ আলাপ করিতেন। তাঁহার ভালবাসা ও সদুপদেশের গুণে ত্বরায় অনেকগুলি ছাত্র তাঁহার শিষ্য হইল। তিনি ইহাদের সঙ্গে প্রতিদিন অনেকক্ষণ থাকিতেন। ইহাঁরা এদেশের ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাসে "ডিরোজিও ক্লব" নামে বিখ্যাত। যাঁহারা তখন ডিরোজিও সাহেবের শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তৎপরে এদেশে বড়লোক হইয়াছেন। মৃত রামগোপাল ঘোষ, যিনি

এদেশে একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া বিখ্যাত, তিনি এই ক্লবের একজন সভ্য ছিলেন; রসিক কৃষ্ণ মল্লিক যাঁহার নাম সকলে জানেন না কিন্তু যিনি সে সময়কার একজন বড় লোক ছিলেন, তিনিও ডিরোজিওর শিষ্য। এই রূপে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মৃত হরচন্দ্র ঘোষ, মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র, মৃত রাধানাথ সিকদার, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি পরে জনসমাজে এত যশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন। ডিরোজিও তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যের দ্বারা বালকগণের মন এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে ছেলেরা তাঁহার জন্য মরিতে পারিত। তিনি বালকদিগকে সত্য-প্রিয়, উদার, সাহসী ও তেজস্বী করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

তাহারা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুসমাজের কুসংস্কার-বিরুদ্ধ অনেক আচরণ আরম্ভ করিল। তখন কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু সমাজের দলপতিগণ দলবদ্ধ হইয়া ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রতি এই দোষারোপ করা হইল যে তিনি বালকদিগকে নষ্ট করিতেছেন। এই কারণে ডিরোজিও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ক্লব তাঁহার বাসবাটী ইটালীতে উঠিয়া গেল। তাঁহার এত টান ছিল যে, ছেলেরা রৌদ্র, বৃষ্টি, জল ঝড়ে কষ্ট পাইয়াও এবং বাড়ীর লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও তাঁহার বাড়ীতে যাইত। অতি অল্প বয়সেই ইহাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালি ছাত্রদিগকে যে শিক্ষা দিয়া যান, সেই শিক্ষার সুফল অদ্যাপি দেখা যাইতেছে।

সে যাহা হউক রামতনু বাবু হিন্দু কালেজে গিয়া এই সকল বন্ধুর মধ্যে পড়িলেন। তিনি বিনয়ী, তিনি বন্ধুদিগের পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিতে চিরদিন ভাল বাসেন। তিনি বন্ধুদিগের পশ্চাতেই থাকিয়া চিরদিন কাজ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের গুণে ও সাধুতার গুণে তাঁহার সকল বন্ধুই তাঁহাকে গুরুতুল্য শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।

১৮৩৪ সালে ইনি কালেজ হইতে বাহির হইয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে একটী কর্ম্ম পাইলেন। এইখানে তিনি দশ বৎসর কর্ম্ম করেন। পরে ১৮৪৫ সালে কৃষ্ণনগর কালেজ খুলিলে সেখানকার একটী শিক্ষকের পদ পাইয়া সেখানে যান। হেয়ার স্কুলে ইনি একজন সামান্য শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তথাপি ইহাঁর চরিত্রের গুণে ইনি সকলের এতদূর প্রিয় ছিলেন, যে যখন ইনি হেয়ার স্কুল ছাড়িয়া যান তখন ইহাঁর বন্ধু বান্ধব একত্র হইয়া ইহাঁকে সম্মান করিবার জন্য এক সভা করেন, ঐ সভাতে তাঁহাকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ একটী সোণার ঘড়ী দেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগর হইতে ইনি বর্দ্ধমান স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান। সেখান হইতে উত্তরপাড়া স্কুলে, তৎপরে রসাপাগলা স্কুলে, তৎপরে বরিশাল স্কুলে বদলী হন। সর্ব্বশেষে ১৮৬০ সালে আবার কৃষ্ণনগর কালেজে বদলী হইয়া আসেন। সেখানে থাকিতে থাকিতে ১৮৬৫ সালে পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর প্রতি কৃষ্ণনগরের লোকের এত ভালবাসা যে ১৮৫৪ কি ১৮৫৫ সালে তাঁহারা ইহাঁর এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখনও কৃষ্ণনগরে আছে। পেন্সন্ লওয়ার পর অবধি ইহাঁর শরীরের অবস্থা বড় মন্দ। একে বৃদ্ধাবস্থা তাহাতে শরীর খারাপ; ইনি আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত নানা কাজে যোগ দিতে পারেন না। সর্ব্বদাই বাড়ীতে থাকিতে

হয়। এইরূপে ইহাঁর জীবনের শেষদিন কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু যদিও বয়সে ইনি প্রাচীন তথাপি উৎসাহে যুবা। এখনও ইহাঁর নিকট বসিলে কত সদুপদেশ পাওয়া যায়। ইহাঁর পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলেই অসাধু মন সাধু হইয়া যায়। নিকটে দুই দণ্ড বস, কেবল ধর্ম্মের কথা, সাধুতার কথা শুনিবে। যেরূপ মনটী লইয়া যাইবে সেরূপ মনটী লইয়া আসিতে পারিবে না; মলিন মন ভাল হইয়া যাইবে। আমাদের দেশের একজন কবি এই মহাত্মার বিষয়ে বলিয়াছেন ;—

"যাঁর সঙ্গে একদিন করিলে যাপন,
সাত দিন থাকে ভাল পাপাসক্ত মন।"

ইহা অতি সত্য কথা। ইহাঁর সঙ্গে আধ ঘণ্টা থাকিলেই অপবিত্র মন পবিত্র হইয়া যায়।

আমরা ইহাঁর অনেকগুলি সদ্‌গুণ দেখিয়াছি। প্রথম সদ্‌গুণ বিনয়। এমন বিনীত লোক প্রায় দেখা যায় না। ইনি মনে করেন যেন ইনি সকলের অধম। যদি কখনও কোন ব্যক্তির কোন দোষ বলিতে হয় তখন ইহাঁর বড়ই ক্লেশ হয়। বলেন "আমি নিজে কত দোষে দোষী আমার অপরের দোষ দেখান ভাল হয় না কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সত্য রক্ষার জন্য বলিতেছি" এইরূপ করিয়া অনেক কষ্টে অপরের একটী দোষের কথা বলেন। সর্ব্ব সাধারণে যে সকল লোককে ঘৃণা করে তাহাদের যদি একটী গুণ দেখিতে পান ইনি সেই গুণের কত প্রশংসা করেন। এমন কি আমরা দেখিয়াছি যে ইহাঁর পৌত্রের বয়সী লোকের নিকটেও বিনয়ের সহিত কথা কহিতেছেন, যেন সে তাঁহাকে কত শিখাইতে পারে।

ইহাঁর দ্বিতীয় গুণ সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা। এমন সত্যপ্রিয় সরল লোক আমরা আর দেখি নাই। কপটতাকে ইনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। হিন্দু কালেজে পড়িবার সময় অবধি ইহাঁর জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। কিন্তু তার পর কয়েক বৎসর লোকের ও গুরুজনের অনুরোধে জাতি ও পৌত্তলিকতা রাখিয়া চলিতেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে, বোধ হয় বর্দ্ধমানে কর্ম্ম করিবার সময় একদিন পৌত্তলিক ক্রিয়া অনুসারে কোন মৃত আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, তখন একটী বালক দাঁড়াইয়া উপহাস করিয়া অপরের নিকট বলিতেছিল—"বাবুর এদিকেত বলা হয় আমি জাত মানি না, ঠাকুর মানি না কিন্তু এদিকে আবার শ্রাদ্ধটীও করা আছে।" এই কথাগুলি রামতনু বাবুর প্রাণে বাণের ন্যায় বিঁধিল। তিনি সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অকপট ভাবে নিজ বিশ্বাসের মত কাজ করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া জাতির চিহ্ন পৈতা পরিত্যাগ করিলেন। দেশে ভয়ানক হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সমুদায় সহ্য করিলেন। সেই অবধি ইনি সকল বিষয়েই সরল ও অকপট। লোকে রুষ্টই হউক আর তুষ্টই হউক যাহা সত্য বলিয়া জানেন ও বিশ্বাস করেন সেইরূপ বলিবেন ও করিবেন।

তৃতীয়তঃ—ইহাঁর ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্য্য, এমন আর দেখা যায় না। পাছে কোন কাজে কোন প্রকারে অন্যায় হয় এই ভয়ে সর্ব্বদাই জড়সড়। অধর্ম্মকে ইনি বড় ভয় করেন। সর্ব্বদাই বলেন—"ছেলে যদি মূর্খ হইয়া সৎ থাকে তাহা ভাল, কিন্তু শিক্ষা পাইয়া যদি অসৎ হয় সে শিক্ষা চাই না।"

চতুর্থতঃ—ঈশ্বরের প্রতি ইহাঁর প্রগাঢ় ভক্তি।

বড় বড় বিপদের সময় ইনি যে ভাবে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সুস্থির থাকিয়াছেন তাহা দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন শুনিলে ইনি চক্ষের জল রাখিতে পারেন না।

এই সাধু পুরুষের বিষয়ে অনেকগুলি ভাল ভাল গল্প আছে, তাহা আর একবারে দেওয়া যাইবে।

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

সেলাই।

নং ২।

বালিকাগণ! সেবারে তোমাদের গলাবন্ধ বুনিবার বিষয় বলিয়াছিলাম, এবার ছোট মোজা বুনিবার বিষয় কিছু বলিব মনে করিতেছি। আশা করি আমি যাহা বলিব তোমরা তাহা একটু মন দিয়া শুনিতে চেষ্টা করিবে। ছোট মোজার যে ছবি এবার দেওয়া গেল এই ছবি দেখিয়া তোমাদের কেমন বোধ হইবে তাহা জানি না; কিন্তু আমি যখন ইহা প্রথম দেখিয়াছিলাম তখনই আমার এই রকম এক জোড়া মোজা বুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

ছোট ছেলেদের মোজা যত ফিকে রং দিয়া বুনা যায় ততই ভাল দেখায়, এজন্য আমরা ইহা সাদাতে ফিকে নীলেতে, সাদাতে ফিকে গোলাপীতে, বা সাদাতে ফিকে লালেতে বুনিয়া থাকি। কখন কখন সাদাতে ঘোর গোলাপীতে, সাদাতে ঘোর নীলেতে কিম্বা সাদাতে ঘোর লালেতেও যে না বুনি তাহা নয়, কিন্তু আমার বোধ হয় ফিকে রং দিয়া বুনিলেই কচি কচি ছেলেদের বেশী মানায়। মনে কর যে মোজাটীর ছবি দেখিতেছ তাহা যেন সাদাতে আর ফিকে লালেতে বুনা হইয়াছে। আচ্ছা এখন বল দেখি ইহার কোন খানটায় লাল আর কোন খানটায় সাদা? যদি তোমাদের একটু বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারিবে; কিন্তু আমার যখন তোমাদিগকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য নয় তখন আর তোমরা বলিতে পার কি না তাহা জানিবার জন্য অপেক্ষা করিলে চলিবে না, এজন্য আমি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই তোমাদিগকে বলিতেছি।

এই মোজা বুনিতে খানিকটা ফিকে লাল এবং খানিকটা সাদা পশম চেরা এবং পাঁচটা মোজা বুনিবার হাড়ের কাঁটা দরকার। প্রথমে লাল পশম দিয়া ৯৬টা ঘর তোল, এই ঘর গুলি সমান ৪ ভাগে ভাল করিয়া আরও ৩টা কাঁটায় তুলিয়া লও তাহা হইলেই এক এক কাঁটায় ২৪টা করিয়া ঘর হইবে। ৪ কাঁটা দিয়া বড় মোজা যেরূপে বুনে এই মোজাও সেই রূপে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হয় কিন্তু ইহাতে পাঁচটা কাঁটার দরকার কারণ ইহার ৪টা কাঁটায় ঘর লইতে হয় এবং ১টা কাঁটা দিয়া বুনিতে হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।
৩বার—সাদা পশম দিয়া সোজা।

৪বার—সাদা পশম দিয়া* ৪টা সোজা পশম সম্মুখে আনিয়া ১টা সোজা, ৩টা সোজা, ৩টা একসঙ্গে সোজা। আবার * চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

৫ বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা ; ৪ বারে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছে এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে।

৬বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা ; কেবল ৫বারে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা।

৭ বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা ; কেবল ৬বারে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছে এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা।

৮ বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা। এখন একবার গুণিয়া দেখা আবশ্যক কতগুলি ঘর আছে, কারণ যদি ৪৮টা ঘর থাকে তাহা হইলে ঠিক হইয়াছে নতুবা ভুল।

৯ বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

১০বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

১১বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

১২বার—সাদা পশম দিয়া সোজা।

১৩ হইতে ৩০বার—সাদা পশম দিয়া ১টা ঘর উল্টা, ১টা ঘর সোজা।

৩১বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

৩২ হইতে ৩৩বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

৩৪বার—সাদা পশম দিয়া সোজা।

৩৫বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত পশম সম্মুখে আনিয়া ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা।

৩৬ বার—লাল পশম দিয়া সোজা।
৩৭ হইতে ৩৮বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।
৩৯ হইতে ৪৭বার—লাল পশম দিয়া একবার ১টা উল্টা আর ১টা উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে, আবার তাহার পরের বারে পূর্ব্বে যেখানে উল্টা সেখানে উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে আর যেখানে উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে সেখানে উল্টা।

এখন পায়ের পাতার জন্য ১৮টা ঘর একটা কাঁটাতে উঠাইয়া লও এবং বাকী ৩০টা ঘর দুই ভাগ করিয়া দুইটা কাঁটায় তুলিয়া রাখ।

এতক্ষণ যেরূপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হইয়াছে পায়ের পাতার জন্য সেরূপে বুনিতে হইবে না, এখন দুইটা কাঁটা দিয়া বুনিতে হইবে।
৪৮ বার—লাল পশম দিয়া সোজা।
৪৯ বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।
৫০ বার—লাল পশম দিয়া সোজা।
৫১ বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত ১টা সোজা আর ১টা উল্টা।
৫৩ বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত একটা উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে আর উল্টা বুনিতে হইবে।
৫৪ বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত ১ টা উল্টা, ১টা সোজা।

সাদা পশম দিয়া ৮২ বার পর্য্যন্ত, ৫১ বার হইতে ৫৪ বার পর্য্যন্ত যেরূপে বুনা হইয়াছে ঠিক সেইরূপে বুনিতে হইবে।
৮৩ বার—সাদা পশম দিয়া ৫১ বারের মত।
৮৪ বার—২ টা এক সঙ্গে উল্টা, ১ টা সোজা, ১টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ২টা এক সঙ্গে সোজা।
৮৫ বার—সাদা পশম দিয়া ২ টা এক সঙ্গে উল্টা, ১ টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ২ টা এক সঙ্গে সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ২টা এক সঙ্গে সোজা।

৮৬ বার হইতে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত লাল পশম দিয়া।
৮৬ বার—সোজা।
৮৭ বার—১টা সোজা, ২টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা।
৮৮ বার—২টা একসঙ্গে সোজা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ২ টা একসঙ্গে সোজা, ১টা উল্টা, ২টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে সোজা।
৮৯ বার—২টা এক সঙ্গে উল্টা, ১টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে উলটা।
৯০ বার—২টা এক সঙ্গে উল্টা, ২টা সোজা, ১টা উল্টা, ২টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে উল্টা।
৯১ বার—২ টা এক সঙ্গে সোজা, ৩ টা সোজা, ২ টা এক সঙ্গে সোজা।
৯২ বার—২ টা এক সঙ্গে সোজা, ১টা সোজা, ২ টা এক সঙ্গে সোজা।
৯৩ বার—৩ টা একসঙ্গে সোজা।
৯৪ বার—যে ঘরটা আছে তাহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে।

এখন পায়ের পাতার দুই ধারের ঘরগুলি বেশ করিয়া দুইটা কাঁটায় তুলিয়া লও। পূর্ব্বের যে ৩০ টা ঘর দুটা কাঁটায় উঠান আছে সেই দুই কাঁটার ঘর এবং এখানকার দুই কাঁটার ঘর সমস্ত একত্রে আবার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ১৬ লাইন ক্রমাগত একবার সোজা একবার উল্টা বুনিতে হইবে।

১৭ বার—সোজা; কেবল গোড়ালির শেষভাগের ঘর দুইবার দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে কারণ গোড়ালির দিকের ঘর ১৫ টা ১৫ টা করিয়া দুই কাঁটার আছে।

১৮ বার—উল্টা।

১৯ বার—সোজা, কেবল ১৭ বারে যেখানে যেখানে দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও সেখানে ২ টা একসঙ্গে সোজা।

২০ বার—উল্টা।

এখন ক্রমাগত ৮ লাইন সোজা; কিন্তু পূর্ব্বে গোড়ালির শেষ দিকে যেরূপ দুইবার করিয়া দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনিয়া ঘর কমাইতে হইয়াছিল এবারেও ঠিক তার উল্টা দিকে অর্থাৎ পায়ের পাতার দুই ধারের ঘরগুলি যে দুই কাঁটায় আছে এক লাইন অন্তর সেই দুই কাঁটারই একেবারে শেষ দিকের দুইটা ঘর এক সঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে। এইরূপে বুনা হইলে পর মোজার উল্টা দিকে অন্য মোজারও যেরূপে মুখ বন্ধ করিতে হয় এই মোজারও সেইরূপেই করিতে হয়।

এখন ৩৫ ও ৩৬ বার বুনাতে মোজার যে ফাঁক ফাঁক ঘর হইয়াছে সেই ঘরের ভিতর দিয়া যে যে পশম দিয়া মোজা বুনা হইয়াছে সেই সেই পশম একত্রে পাকাইয়া ছবিতে যেরূপ দেখিতেছ সেইরূপ করিয়া দিয়া তাহার দুই ধারে দুইটা পশমের থোপ করিয়া দিতে হইবে। এই থোপও যে যে পশমের মোজা সেই সেই পশম দিয়া করিতে হইবে।

ধাঁধা।

গতবারের উত্তর।

১।—নোনা (No=না)।
২।—মরণ।
৩।—বর–গোবর।
৪।—মেঘ।
৫।—শিশু।

নূতন।

১। ভট্টাচার্য্যগণ মোরে বলেন বানর,
স্ত্রীজাতিরা মোরে কিন্তু করেন আদর।
পুষ্প কভু পত্র কভু যন্ত্র রূপ ধরি,
আমার নিকটে কিছু নাহি রয় ভারি।

২। কোন নিরাকার ইন্দ্রিয় সাকার হইলে পোষাক হয়?
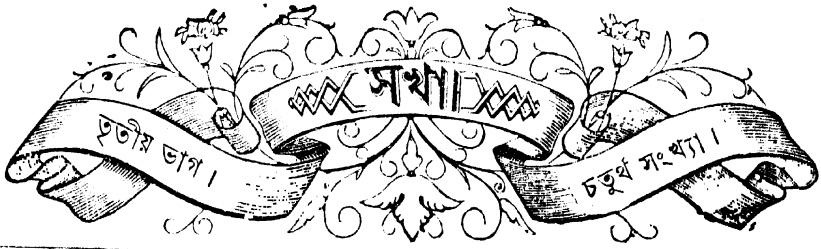
এপ্রেল, ১৮৮৫।

ঠাকুরদাদার গল্প।

শিশির।

কয়েক দিন পরে বালকগণ আবার একত্র হইয়া ঠাকুরদাদার নিকট উপস্থিত হইল;—ইচ্ছা বেড়াইতে গিয়া কোন বিষয়ে কিছু নূতন শিক্ষা করিবে। নবীন বাবুও প্রস্তুত; সন্তুষ্ট মনে সকলকে সঙ্গে লইয়া মাঠে বেড়াইতে গেলেন। আজ কি বিষয়ে কথা হইবে? নবীন বাবু সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বায়ুতে যে সব জলকণা সাগর, হ্রদ, নদ, নদী প্রভৃতি জলাশয় হইতে উঠিয়া অদৃশ্য বাষ্পাকারে থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে কি কি বলা হইয়াছে? কোন্ কোন্ আকারে তাহাদিগকে দেখা যায়, মনে আছে কি?" সকলেই উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল "হাঁ, আছে বৈ কি? কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তুষার, এই কয়েকটার কথা বলা হইয়াছে।" তখন নবীন বাবু হাসিয়া বলিলেন "বেশ! তোমরা সব কথা মনে রাখিয়াছ ত? (সকলে 'হাঁ') তবে এখন বল দেখি আর কিসের কথা বলা বাকী আছে?" সকলে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। মোহিতকৃষ্ণ চুপি চুপি গণেন্দ্রকে বলিল "কেন? শিশিরের কথা ত বলা হয় নি?" চারু ও কিশোরী হাস্য করিয়া বলিল "ছি মোহিত! তুমি দাদা বাবুকে লজ্জা কর? তাহ'লে শিখিতে পারিবে কেন? যাঁহার কাছে শিক্ষা করিব, তাঁহাকে কি লজ্জা করিলে হয়? তুমি ত বড় নির্ব্বোধ!" নবীন বাবু সকলকে শান্ত করিয়া বলিলেন "লজ্জা ও বিনীত ভাব একটু থাকা ভাল বটে, তবে কোনও বিষয়েই অধিক হওয়া উচিত নহে। সে যাহা হউক, অদ্য শিশিরের কথাই বলিব। হিম রাত্রে পড়ে, পাতা, ঘাস এই সকলেতেই বেশী পড়ে, গোলমাল করে না, ঝড় বহে না, তাই সকলে তাহাকে চিনে না, জানে না, মনে রাখে না। শিশির প্রতি দিন পৃথিবীর গাছের পাতা সকলকে কেমন স্নান করাইয়া দেয়, কেমন সুন্দর রূপে ফুলের পাপড়ীর গায়ে অমৃতের ফোঁটার মত দুলিতে থাকে, যেন ছোট শিশুর পবিত্র সুকোমল সোণার নাকে রূপার নলক দুলিতেছে! আহা! তাহা দেখিলে কে না আশ্চর্য্য হয়! মোহিত হয়! একেবারে পরমেশ্বরের খেলা দেখিয়া ও প্রকৃতির শোভা দেখিয়া প্রাণ মন পাগল হইয়া উঠে! যথার্থ, যখন শীতকালে মাঠের সবুজ বর্ণের ঘাসগুলি শিশিরে ভিজিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে মধ্যে

মাকড়সার জাল গুলা যেন রূপার সূতায় প্রস্তুত মনে হয় ;—এমন সময়ে পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ করিয়া সিন্দুর মাখাইয়া যখন সূর্য্য উঠিতে থাকেন, আর সেই রক্তিম আভা যখন ঐ শিশিরের গায়ে পড়ে—তখন, আহা! তখন যে কি এক চমৎকার শোভা হয়, তাহা বলা যায় না, কেবল দেখিলেই জানা যায়। তবে যে-সে চক্ষে তাহা বুঝা যায় না, হাস্‌তে খেল্‌তে ছড়ি হাতে করে বাবু-আনা কর্‌তে কর্‌তে, হতভাগা ছেলেদের মত বেড়ালে সেই অপরূপ শোভা দেখা যায় না। শান্ত ও ভক্তিপূর্ণভাবে, নম্রতা ও বিনয়ের সহিত, গম্ভীর অথচ প্রশান্ত, অনন্ত শোভার ভাণ্ডার প্রকৃতির দিকে চাহিলে,—চাহিয়া আশ্চর্য্যের সহিত নমস্কার করিলে, তবে প্রকৃতি তাঁর সেই গুপ্ত সুন্দর মনোহর রূপ দেখান। তা সে সকল এখন থাক্। শিশিরের শোভার কথা মনে এসে আমায় ভুলাইয়া দিয়াছিল। আমি ঐ সকল দেখিতে বাস্তবিকই পাগল হইয়া যাই। আহা! আহা!!" আর কথা বাহির হইল না। নবীন বাবুর দুটী চক্ষে দুফোঁটা জল দেখা দিল। অল্পক্ষণ সকলেই গম্ভীরভাবে পূর্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর নবীন বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অনেক জলীয় বাষ্প কমিয়া গেলেও বায়ুতে সর্ব্বদাই কিছু পরিমাণে বাষ্প থাকিয়া যায়। আমাদের দেশে প্রায় কখনই এমন সময় আসে না যখন বায়ুতে একটুও বাষ্প থাকে না। হাজার বৃষ্টি হউক, ঝড় হউক, শিল পড়ুক, খানিকটা বাষ্প বাকী থাকিবেই থাকিবে। ঐ সময়টা খুব কমিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে বাষ্পহীন কখনই হয় না।" অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল "যখন খুব গ্রীষ্মের সময় ভয়ানক আগুনের হল্কার মত বাতাস বহে তখনও কি উহাতে জলীয় বাষ্প থাকে?"—নবীন বাবু উত্তর করিলেন—"তখনই আরও অন্য সময় অপেক্ষা বেশী থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়ু যত শীতল হইবে ততই উহার বাষ্প জল হইয়া পড়িবে, আর যত অধিক গরম হইবে, ততই উহার মধ্যে অধিক পরিমাণে বাষ্প ধরিবে। সে কথা তোমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। সেই জন্যই গ্রীষ্মকালে বায়ুতে বেশী বাষ্প মিশিয়া থাকে।"

মন্মথঃ—"সে কি রকম হবে? তাহ'লে ত ঠাণ্ডা লাগিত?"

নবীন বাবুঃ—"না, তা হবে কেন? জল হলেই কি ঠাণ্ডা হয়? গরম জল কি ঠাণ্ডা? তা যদি না হয় তবে গরম বাষ্প ঠাণ্ডা হবে কেন? বায়ু যখন গরম হয়, তখন তাহার বাষ্পও গরম হয়, কাজেই ঠাণ্ডা লাগে না। বুঝিলে? (সকলে "হাঁ"।) আবার আর একটা কথা বলিয়া রাখি; তোমরা যে মনে কর শীতকালে বায়ুতে খুব বেশী বাষ্প থাকে, তা ঠিক নয়, বড় ভুল। বরং শীতকালেই বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা বাষ্পহীন হয়। সে সময়ে বায়ু উত্তর দিক হইতে আসে। সে দিকে সাগর নাই কাজেই বাষ্প আনিবার সম্ভাবনা নাই। আর শীতকালে বাতাস শীতল, এজন্য উহার বাষ্প সবই প্রায় জমিয়া জল হইয়া যায়, কাজেই সে সময়ে বায়ুতে বেশী বাষ্প দাঁড়াইতে পায় না। আর কখন মনে করিও না যে শীতল হইলেই বাষ্প অধিক থাকে। বরং ঠিক তাহারই বিপরীত। গরম বাতাসে বাষ্প বেশী থাকে, ঠাণ্ডা বাতাসে বেশী বাষ্প থাকিতে পারে না, জল হইয়া যায়।"

কিশোরী—"কি আশ্চর্য্য! আমরা কি ভুলই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম! আজ বেশ শিক্ষা হইল। আরও চাই বলুন দাদাবাবু! শিশির তবে শীতকালেই বেশী পড়ে কেন? বাষ্পই যদি শীত-

কালের বায়ুতে কম রহিল আর গ্রীষ্মকালে বেশী রহিল, তবে গ্রীষ্মকালে শিশিরের নামগন্ধও নাই আর শীতকালেই বা এত শিশির কোথা হইতে পড়ে? এ ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন না?"

মন্মথ, অমূল্য, গণেন্দ্র, চারু, নগেন, চন্দ্র, দেবন—সকলে একেবারে গোল করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমরাও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কিশোরী আমাদের সকলেরই কথা বলিয়াছে। এখন বলুন, শুনি।"

ছেলেদের এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও এরূপ উৎসাহ দেখিয়া নবীনবাবু মহা খুসী হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আর সব কথাই সহজ। বৃষ্টিরও যে নিয়ম, শিশিরেরও তাই। বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিয়া আছে, দেখা যাইতেছে না, হঠাৎ যে কোন কারণে যেই শীতল হইল, অমনি জল হইয়া দেখা দিল। এখন দেখ শীতকালেও বায়ুতে কিছু বাষ্প থাকে, তার উপর আবার দিনের বেলায় সূর্য্য যে উত্তাপ দিতে থাকেন, তদ্দ্বারা জলাশয় সমূহ হইতে অনেক বাষ্প উঠে। এইরূপে সন্ধ্যার সময়ে বা কিছু পূর্ব্বে বায়ুতে অনেক পরিমাণে বাষ্প জমা হয়। অন্য সময় হইলে উহা বাষ্প হইয়াই থাকিয়া যাইত, কিন্তু তাহা আর হইতে পাইল না। কারণ বায়ু শীঘ্রই খুব শীতল হইয়া যায় আর ঐ বাষ্প প্রায় সবই জল হইয়া পড়ে। সূর্য্য যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সকল বস্তুই গরম হয়, জলও গরম হয়, হইয়া বাষ্প হইয়া উপরে উঠে, বায়ুতে মিশে যায়। এই বায়ু যখন আবার শীতল হয়, তখন আর বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না। শীঘ্রই ইহা জল হইয়া যায়। এই জলকে শিশির পড়া বলে।

"এই সময়ে গরম হওয়া সম্বন্ধে দু একটা নূতন কথা বলিয়া দিই মন দিয়া শুনিবে। বড় শক্ত কথা এগুলি, খুব মন দাও। যত বস্তু আছে সকলেরই "তাপ-গ্রাহিতা" শক্তি আছে অর্থাৎ সকল দ্রব্যই তাপ দিলে উত্তপ্ত হয়, তার মধ্যে খানিকটা গরম প্রবেশ করে। তাপ যে কি, তাহা এখন বলিব না, তবে মোটামুটি এই জানিয়া রাখ যে সব জিনিস তাপ দিলে গরম হয়। কোন বস্তু অনেক তাপ দিলে তবে গরম হয় আবার অন্য কোন বস্তু তাপ দিলেই শীঘ্র গরম হয়। মনে কর যেমন লৌহ প্রভৃতি ধাতুগুলি শীঘ্র তাতিয়া উঠে, জল তত শীঘ্র গরম হয় না। এখন বেশ বুঝিলে? সব জিনিসের তাপ-গ্রাহিতা শক্তি সমান নয়। এই গেল একটা কথা। আর একটা কথা এই যে সকল জিনিসেরই তাপ ছড়াইবার শক্তি আছে, অর্থাৎ কোন জিনিস যদি গরম হয় তবে সেই তাপ সে সর্ব্বদাই চারি দিকে ছড়াইতে থাকে; নিয়ত, একটুও থামে না। ইহার নাম "বিকীরণ" শক্তি। এই শক্তি আছে বলিয়াই আমরা সূর্য্য হইতে উত্তাপ পাই, অগ্নি হইতে গরম পাই এবং গরম বস্তু হইতে গরম পাই। আর বাস্তবিকই এই শক্তি আগে তার পর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি। কেননা বিকীরণ না হইলে তাপ পাইব কোথায় যে গ্রহণ করিব? বুঝিতেই পারিতেছ? (সকলে—"বেশ"।) এই বিকীরণ অর্থাৎ তাপ ছড়াইবার শক্তি প্রত্যেক বস্তুরই আছে। তবে এখন আর একটা কথা বলি সেটা এই যে, যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি যে পরিমাণে অধিক তাহার বিকীরণ শক্তিও সেই পরিমাণে অধিক। অর্থাৎ যে বস্তু যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় সে বস্তু তত শীঘ্র আবার শীতলও হইয়া পড়ে। লৌহ যেমন শীঘ্র গরম হয়, আবার তেমনি শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। একথা তোমরা অনেকেই জান। কড়াতে দুধ জাল দেওয়া হইলে দেখিতে

পার; ঐ দুধটা আর একটা পাত্রে ঢালিয়া কড়াটা খালি করিয়া রাখ, শীঘ্রই দেখিবে কড়া শীতল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুধটা তখনও যেন আগুন। আবার গরম হবার সময়ে কড়ার আংটা দুটীতে যখন হাত দেওয়া যায় না এমনি গরম, দুধ গরম হইবার তখনও অনেক বিলম্ব। এ তোমরা আজই বাড়ী গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিও। অর্থাৎ লোহার কড়া যত শীঘ্র গরম হয় তত শীঘ্র আবার শীতলও হয়, তাপ ছড়াইয়া বাহির করিয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। কিন্তু দুধ কম তাপ-গ্রাহিতা শক্তির জন্য গরম হইতে দেরী লাগে, আবার তেমনি জুড়াইতেও বিলম্ব হয়; এই তিনটী কথা মনে রাখিবে। আর একটী কথা আছে—যখনই তাপ গ্রহণ করে সেই সময়েই আবার তাপ বিকীরণও করে। অর্থাৎ সকল বস্তু সকল সময়েই তাপ গ্রহণ ও বিকীরণ করিতেছে। তবে যার বিকীরণ অপেক্ষা গ্রহণ বেশী হয় সে জিনিসটা গরম হয়, আর যার গ্রহণ অপেক্ষা বিকীরণ বেশী সেটা ঠাণ্ডা হয়। ঐ কড়ার দৃষ্টান্তই ধর। উহা যতক্ষণ আগুনের কাছে থেকে তাপ গ্রহণ করিতেছিল, ততক্ষণ কি কেবল গ্রহণ করিতেছিল, বিকীরণ কার্য্য কি তখন বন্ধ ছিল? তা নয়, বিকীরণও করিতেছিল। তা না হলে তাহার নিকটে হাত লইয়া গেলে গরম ঠেকিত না। (সকলে—"ঠিক") বেশ, দুটী কাজ এক সঙ্গে চলিতেছিল। কিন্তু বিকীরণ অপেক্ষা গ্রহণ অধিক করিতেছিল এজন্য তখন কড়া গরম বোধ হইল। আবার যখন নামাইয়া হাওয়ায় রাখা গেল, তখন কি কেবল বিকীরণ হইতেছিল, তাপ গ্রহণ করিতেছিল না? তা নয়। তবে তখন বিকীরণই প্রবল, এজন্য ঠাণ্ডা হইয়া গেল। বুঝিলে? আচ্ছা বল দেখি মোহিত! চারিটা কথা কি?"

মোহিতঃ—"১ম, সব জিনিসের তাপ গ্রহণ করিয়া গরম হইবার শক্তি আছে, উহার নাম তাপ-গ্রাহিতা শক্তি। ২য়, সব জিনিসেরই আবার তাপ ছড়াইয়া শীতল হইবার শক্তি আছে, উহার নাম তাপ-বিকীরণ শক্তি। ৩য়, তাপ-গ্রাহিতা শক্তি যত প্রবল, অর্থাৎ যাহা শীঘ্র গরম হয়, তাহার বিকীরণ শক্তিও তত প্রবল অর্থাৎ তাহা শীঘ্র আবার শীতলও হয়। ঠিক রাগের মত। কতকগুলা লোক শীঘ্র ঝাঁ ক'রে রেগে যায়, আবার ঝাঁ ক'রে রাগ পড়েও যায়; কিন্তু যাদের রাগ শীঘ্র হয় না, তাদের যদি রাগ হয় ত আর শীঘ্র পড়েনা। তেমনি যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি কম, গরম হইতে দেরী হয়, তাহার বিকীরণ শক্তিও কম, উহা শীতল হইতেও দেরী হয়। ৪র্থ, প্রত্যেক বস্তুই এক সময়ে তাপ গ্রহণ এবং বিকীরণ দুইই করে, তবে যাহা অধিক হয় তাহাই প্রকাশ পায়; যদি বিকীরণ অপেক্ষা তাপ বেশী গ্রহণ করে তবে উহা গরম হয়, নহিলে যদি গ্রহণের চেয়ে বিকীরণ বেশী হয় তবে শীতল বোধ হয়। অর্থাৎ ৫০ ভাগ তাপ গ্রহণ করিয়া যদি কোন বস্তু ১০ ভাগ মাত্র বিকীরণ করে তবে উহাতে ৪০ ভাগ তাপ থাকে তাই গরম দেখি। কিন্তু তলে তলে যে দশ ভাগ বিকীর্ণ হইয়া গেল তাহা আর বুঝিতে পারি না এই রকম। নয় কি?"

নবীন বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেনঃ—"মোহিত বেশ সুন্দর বুঝাইয়া দিল ত! তোমরা বলিতেছিলে মোহিত লাজুক। এই দেখ সে তোমাদের চেয়ে ভাল ছেলে। কেমন মন দিয়া শুনিয়াছে, কেমন দৃষ্টান্ত দুটী দিয়া বুঝাইয়া দিল। বেশ মোহিত! সে যাক্। এখন তোমরা সকলেই এই কয়েকটী কথা যদি মনে না রাখিতে পার তাহা হইলে আর শিশির পতনের কথা বুঝিতে

পারিবে না, বেশ মন দিয়া কথা কয়টী 'সখা'তে পড়িবে, আরও ভাবিবে, লোকের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া আলাপ করিবে ও কথা বার্ত্তা কহিবে; তারপর বুঝিতে পারিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবে। আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক। আর এক দিন বাকী সমস্ত কথা বলিব। শিশিরের কথা এক দিনে শেষ হইবে না। আজ রাত্রি হইল বাড়ী যাই চল।"

সকলে আশ্চর্য্য ও নূতন কথা শিখিলেন বলিয়া আনন্দ করিতে করিতে ও কৃতজ্ঞতার সহিত ঠাকুর দাদার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন।

শেয়ালের গল্প।

মানুষের মধ্যে নাপিত যেমন, পাখীর মধ্যে কাক যেমন, দেবতাদের মধ্যে নারদ মুনি ঠাকুর যেমন ছিলেন লোকে বলে জানোয়ারদের মধ্যে শেয়াল তেমন। শেয়াল পণ্ডিত; সে কালে তাহার কত প্রতাপই ছিল। কুমীরের সাত ছেলে; শুনিয়াছি সব গুলিকে না কি শেয়ালের নিকট পড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। শেয়াল-পণ্ডিতও স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া সাত দিনে সাত-টার সদ্গতি করিয়াছিল। তার পর কি হইল সকলেই জানে। কিন্তু পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এখন আর শেয়ালের সে দিন নাই। স্কুলে যত মাষ্টারি খালি হয়, একটা শেয়ালকেও তাহাতে দরখাস্ত পাঠাইতে শুনি না। কত জায়গায় কত শক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এখন আর তাহার মীমাংসার জন্য শেয়ালের কাছে যাওয়া হয় না। তবুও শেয়ালের যাহা আছে তাহাতে নাম রক্ষার কাজ চলে।

শুনিয়াছি শেয়াল কুকুরের জাতি। হইতেও পারে; নহিলে তাহাদের মধ্যে এত শত্রুতা কেন? তা ছাড়া অনেক সময় কুকুর ঠিক্ শেয়ালের মতন ডাকিতে পারে; শেয়ালও মাঝে মাঝে কুকুরের ভাষায় আলাপ করিয়া থাকে। শেয়ালের ডাক সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। অনেকে ঐ ডাকের অর্থ বেশ বুঝিতে পারেন। আমি বহু অনুসন্ধানে তিন প্রকারের ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়াছিঃ—

১। প্রথম শেয়ালের পায় কাঁটা ফুটিল। সে কাঁদিল—"উঃ! আ!" দূর হইতে অন্য শেয়াল জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা হুয়া?" গোল মাল শুনিয়া অন্যেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা হুয়া?" তার পর সকলে মিলিয়া কতক্ষণ "আহা" "আহা" করিল; শেষে আহত শেয়ালকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিল যে "হুয়া তো হুয়া!"

২। প্রথম শেয়াল বলিল "আরে ওয়া? হা-হা-হা!" দ্বিতীয় শেয়াল জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা হুয়া" উত্তর হইল "মৈ রাজা হুয়া"; শুনিয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল "আচ্ছা হুয়া!" "আচ্ছা হুয়া!"

৩। শেয়াল অন্য জন্মে তামাক খোর ছিল। অধুনা সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। তাই প্রহরে প্রহরে সেই হুঁকো যন্ত্রের কথা তাহার মনে হয়; আর বেচারা ঘন ঘন 'হুক্কা' 'হুক্কা' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মনের অভাব জানায়।

প্রতি প্রহরেই শেয়াল ডাকে তাহাতেই তাহাকে যামঘোষ উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। শেয়ালের ডাক শুনিয়া এক রাজার মনে বড়ই কষ্ট হইল; তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রি ওরা কি চায়?" মন্ত্রী বলিলেন "বড় খিদে পেয়েছে কিছু খাবার চায়।" অমনি হুকুম হইল ১০০০০৲ টাকার সন্দেশ কিনিয়া ওদের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। ধূর্ত্ত মন্ত্রীর দশহাজার টাকা লাভ হইল। এক প্রহর পরে আবার শেয়াল ডাকিল। "এবারে কি চায়?" "বড় শীত, গরম কাপড় চায়।" হুকুম হইল লক্ষ টাকার বনাত কিনিয়া দাও। এক প্রহর পরে আবার শেয়াল ডাকিল। "এখন কি চায়?" "বড় মশা, মশারি চায়।" আরো লক্ষ টাকা মঞ্জুর। আবার এক প্রহর পরে শেয়াল ডাকিল "এবারে কি চায়?" "এবারে কিছু চায় না, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করে।" অমনি রাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া কোটি টাকা মূল্যের শাল মন্ত্রীকে দিয়া ফেলিলেন।

শেয়ালের একটা দুর্ব্বলতা আছে। এক শেয়াল ডাকিলে আর গুলি চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। আমার কোন বন্ধুর বাড়ীতে একটা শেয়াল খাবার খুঁজিতে আসিয়াছিল। স্বাভাবিক ধূর্ত্ততার সাহায্যে কেহ দেখিতে পাইবার পূর্ব্বেই সে একটা ঘরের ভিতর যাইয়া মাচার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানে কতক্ষণ ছিল বলা যায় না, কিন্তু সে সেখানে থাকিতে থাকিতেই জঙ্গলে একটা শেয়াল ডাকিল। অমনি আর কথা নাই, বেচারা দেশ কাল সব ভুলিয়া গিয়া সেই ঘরের ভিতর হইতেই "ক্যা হুয়া" "ক্যা হুয়া" প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রশ্নের উত্তর আর জঙ্গল হইতে শুনিতে হইল না। বাড়ীর লোকেরা আসিয়াই সে বিষয়ে তাহার জ্ঞান পরিষ্কার করিয়া দিল।

শেয়ালের ধূর্ত্ততা সম্বন্ধে সকলেই কিছু কিছু জানেন। আমাদের একজন চাকর একবার একটা শেয়ালকে লক্ষ্য করিয়া ইট ছুড়িয়াছিল। দৈবাৎ ইটটা শেয়ালের কপালে লাগিল। লাগিবামাত্রই শেয়াল 'হিঁক্' শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। শেয়াল মরিয়াছে শুনিয়া সকলেরই আনন্দ। তাহাকে টানিয়া ওঠানে আনিয়া সকলে বৃত্তাকারে তাহার চারিদিকে দাঁড়াইলেন। অনেক মন্তব্য প্রকাশের পর একজন বলিলেন "আমার সন্দেহ হয়, এটা মরে নি।" এবিষয়ে কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্ক হইল, তারপর একজন বলিলেন "অত কথায় কাজ কি, একটা লাঠি এনে দু ঘা মেরে সন্দেহ দূর করে দাও না?" এই বলিয়া তিনি লাঠি আনিতে চলিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়াতে যে একটুকু ফাঁক হইয়াছিল, শেয়ালটাও সময় বুঝিয়া সেই থান দিয়া চম্পট করিল।

এক পাদ্রী সাহেব পাড়া গাঁয়ে থাকিতেন। সেখানে শেয়ালের বড় অত্যাচার; তাঁহার সবগুলি মুরগী খাইয়া ফেলিত। সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া খুব শক্ত একটা কাঠের ঘরকরিলেন, তাহার ভিতরে মুর্গী রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইত। একদিন সাহেবের চাকরাণী মুর্গীর ঘরে যাইয়া, দেখে, যে একটা শেয়াল ঘরের ভিতর আসিয়া প্রায় সবগুলি মুরগী মারিয়া ফেলিয়াছে। কেবল কয়েকটী মাত্র প্রাণভয়ে উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেগুলিকেও উদরসাৎ করিবার জন্য চেষ্টায় আছে। চাকরাণীকে দেখিয়াই ধূর্ত্ত শেয়াল মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। সাহেব আসিয়া শেয়ালকে মৃতপ্রায় দেখিলেন এবং তাঁহার একটু আহ্লাদের বিষয় এই হইল যে, খাইতে খাইতে পেট ফাঁপিয়া শেয়ালটাও মরিয়া গিয়াছে। এখন তাহার প্রেতাত্মার উদ্দেশে ইচ্ছামত গালিবর্ষণ করিয়া তাহাকে

অনেক দূরে মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসাহইল। যিনি ফেলিয়া দিতে গিয়াছিলেন তিনি একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন যে শেয়ালটা দৌড়িয়া পলাইতেছে!

সংকেত।

আমার মনের ভাব উপরের তিনটীকথায় হয়তো অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না। মুখে কথা না বলিয়া অন্য কোন চিহ্ন বিশেষ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার নাম সঙ্কেত—অর্থাৎ আমি এ প্রস্তাবে যতবার সংকেত কথাটা ব্যবহার করিব ততবারই ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

কোন না কোন আকারে সংকেত সকল স্থানেই প্রচলিত আছে। আমরা দিনের মধ্যে কতবার সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি! বন্ধু আসিয়া একটা কিছু করিতে অনুরোধ করিলেন, তুমি মাথা নাড়িলে; আমি তোমার উপর চটিয়া গিয়া ভয় প্রদর্শন করিলাম, তুমি মুখে কিছু না বলিয়া অঙ্গুলি বিশেষ উন্নত করতঃ আমাকে হনুমানের খাদ্য খাইতে বলিলে; ইত্যাদি আর কত বলিব। এ সকলই সংকেত। এই প্রকারের সংকেত সকলেই কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে বোবা এবং কালারা এইরূপ সংকেতের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। হাতের এক এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া তাহারা ইংরাজি বর্ণমালার এক একটা অক্ষর বুঝায়। অক্ষর হইলে আর শব্দ রচনা শক্ত থাকে না। আমাদের দেশেও আছে।

"অহি, কুম্ভ, চক্র, টঙ্কার, তরল, পবন, যাতা।" হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বলি। অর্থাৎ সাপের ফণার মত করিয়া হাত তুলিলেই একটী স্বরবর্ণ বুঝাইবে। এক হাতের মুষ্টির উপর আর এক হাতের মুষ্টি রাখিয়া কুম্ভের অনুকরণ (!!!) করিলেই ক বর্গের একটী অক্ষর বুঝাইবে। হাত ঘুরাইয়া চক্র, বাতাসে টোকা দিয়া টঙ্কার, হাতে বাতাসে ঢেউ তুলিতে চেষ্টা করিয়া তরল, পাথার কার্য্য হাতে করিয়া পবন, ও হাতে হাতে চাপিয়া যাতা করিলে, আর চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ,যবর্গ (য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ ইত্যাদি) সকলই ক্রমান্বয়ে হইতে লাগিল।

স্বরবর্ণ বলিয়া পাঁচ আঙ্গুল দেখাইলে পঞ্চম স্বরবর্ণ (উ) বুঝাইল, পবর্গ বলিয়া ও আঙ্গুল দেখাইলে আর পবর্গের তৃতীয় বর্ণ (ব) বুঝাইল ইত্যাদি। একটা শব্দ শেষ হইয়াছে ইহা বুঝাইতে হইলে হাততালি দিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক শব্দের শেষে হাত তালি পড়িবে।

প্রচলিত টেলিগ্রাফের অধিকাংশই সাংকেতিক। জাহাজের লোকেরা নানা প্রকারের নিশান ব্যবহার করিয়া সাংকেতিক আলাপ করিয়া থাকে। কখনও বা একটী মাত্র নিশান হাতে লইয়া, তাহাকে নানা প্রকারে নাড়িয়া সংকেত করা হয়। কখন মাথার টুপী হাতে করিয়া তদ্দারা সংকেত করা হয়। আরো এত প্রকারে সংকেত করা হয় যে কি বলিব। কোন সময় এত দূরের লোককে সংকেত হয় যে, এ সকল কিছুই তত দূর হইতে দেখা যায় না। তখন খুব উচু জায়গায় ঘর করিয়া তাহার একটা দিক কেবল খড়খড়ি দ্বারা বন্ধ করা হয়। ঘরের ভিতরে আলো থাকে। খড়খড়ি খুলিলে সেই আলো অনেক দূর হইতে দেখা যায়। খড়খড়ি খুলিয়া কিছুকাল পর বন্ধ করিলে এক প্রকার সংকেত বুঝায়, আর খুলিয়া অমনি বন্ধ করিলে অন্য প্রকারের সংকেত বুঝায় এই দুই

প্রকারের সংকেত দ্বারা সব অক্ষর বুঝান যাইতে পারে। খড়খড়ি ওয়ালা ঘরের পরিবর্ত্তে অনেক সময় খুব উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা হয়। তখন তাহাকে একখানা তক্তা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলেই কাজ চলে। সংকেত করিবার সময় তক্তা খানা সরাইতে হয়, তবেই আলোটা দেখা যায়। তক্তা সরাইয়া অল্পক্ষণ রাখিলে একপ্রকার সংকেত আর অধিকক্ষণ রাখিলে অন্য প্রকার সংকেত বুঝায়।

সংকেতের কথা আমরা শেষ করিলাম। টেলিগ্রাফে যে সংকেত ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে মর্স সাহেবের সংকেত প্রণালীই অধিক প্রচলিত। মর্সের টেলিগ্রাফের সংকেত এই প্রণালীতে করা হয়। মর্সের টেলিগ্রাফে টাক্ টিক্ করিয়া শব্দ হয়, তাহার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অনুসারে দুই প্রকারের সংকেত হইতে পারে। শেষে যত প্রকার সংকেতের কথা বলা হইল, সব গুলিই কেবল হ্রস্ব দীর্ঘ লইয়া হইয়াছে। শব্দ কি আলোক অধিকক্ষণ থাকিলে তাহা দীর্ঘ, তাহার চিহ্ন (—) এই রূপ। অল্পক্ষণ থাকিলে তাহা হ্রস্ব, চিহ্ন (-) এইরূপ।

মনোহর ছবি।

সুশীলা এগার বৎসরের বালিকা, তাহার দাদার নাম প্রিয়নাথ, বয়স চৌদ্দ বৎসর। দুই ভাই বোনে এত ভাব যে কেহ কাহাকেও অধিকক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। প্রিয়নাথ কিছু খাবার পাইলে আগে সুশীলাকে তাহার অর্দ্ধেক দিয়া অপর অর্দ্ধেক আপনি খাইত; সুশীলাও কিছু পাইলে দাদাকে না দিয়া খাইলে সুখ পাইত না। সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিয়া যখন দুই ভাই বোনে এক সঙ্গে বসিয়া এক মনে পড়াশুনা করিত তখন তাহাদিগকে দেখিলে সকলেরই চক্ষু শীতল হইত। প্রসন্ন বাবু যখন পাড়ায় ও গ্রামে সকলের মুখে আপন ছেলে মেয়ের গুণের কথা শুনিতেন তখন তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না।

একদিন বিদ্যালয় হইতে বাড়ী আসিয়া প্রিয়নাথ কোথাও সুশীলাকে দেখিতে পাইল না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে সুশীলা তাহাদের ছোট বাগানে একটী বড় কামিনী ফুলের গাছের তলায় বসিয়া রহিয়াছে। সুশীলা তাহার ছোট ছোট দুখানি হাত জোড় করিয়া সজল নয়নে উপরদিকে চাহিয়া কি বলিতেছে। আজ তাহার কিসের দুঃখ যে সে এত কাঁদিতেছে? কেহ কি তাহাকে ধমকাইয়াছে বলিয়া সুশীলার অভিমান হইয়াছে? সুশীলার মত শান্ত ও ধীর মেয়েকে কি কেহ বকিতে পারে? সে যে ভুলিয়াও কোন অন্যায় করিতে জানে না। তাহার সেই কাঁদ কাঁদ নয়ন

দুটী, সেই কোমল ও সরল মুখ খানি দেখিলে আজ কাহার প্রাণ না গলিয়া যায়? প্রিয়নাথ সুশীলার দুটী একটী কথাও শুনিতে পাইল। সে কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে "হরি! শুনেছি তুমি বড় দয়াবান, দয়া করিয়া আমার পিতা মাতা ও ভ্রাতাকে সুখে রাখ, আমার বড় ভয় হয়, পাছে তাঁদের কাহারো অসুখ হয়, কাল থেকে মার যে মাথা ধরেছে, কি হবে ঠাকুর? তুমি ভাল ক'রে দাও। তোমার দয়াই সব সুখ দিতে পারে। দয়া ক'রে সকলকে ভাল রাখ।"

শুনিয়া প্রিয়নাথের মুখে কোন কথা বাহির হইল না, সে দেখিল সুশীলার ন্যায় গুণের ভগ্নী সকলের নাই। তাহার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার মন যেন পবিত্র হইল, সে ভাবিল "এই বুঝি স্বর্গ! আমি কখনও এত আনন্দ পাই নাই, সুশীলার কাছে দাঁড়াইয়া আমার এত আনন্দ হইতেছে, না জানি ইহার মত ভক্তিভরে ঈশ্বরকে ডাকিতে পারিলে কত সুখ ও আনন্দ হয়।" ধন্য সুশীলা, তোমাকে কেহ না শিখাইলেও তুমি আপনা আপনি পরমেশ্বরকে ডাকিতে শিখিয়াছ। সেই দিন হইতে তাহারা দুই ভাই ভগিনী প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সকল কাজ ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরকে কায়মনে ডাকিত। সেই দিন হইতে তাহারা দুই জনে কোন কষ্ট পাইলে পরম পিতার নিকট তাহা নিবেদন করিত। কিছুদিন পরে প্রিয়নাথের বড় পীড়া হইল, প্রিয়নাথ আর উঠিতে পারে না, আপনি খাইতে পারে না, এমন কি তাহার কথা কহিবার শক্তিও রহিল না। সুশীলা ভ্রাতার এই দশা দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুলা হইল। কিন্তু দুঃখে পড়িয়াও দাদার সেবা করিতে বিরত হইল না। তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই; যখনই দেখ, সুশীলা দাদার কাছে বসিয়া সেবা করিতেছে, রাত্রি জাগিয়া দাদাকে ঔষধ খাওয়াইতেছে। বারণ করিলেও সে রাত্রি জাগিতে ক্ষান্ত হইল না। ক্রমে ক্রমে প্রিয়নাথ আরোগ্য লাভ করিল বটে কিন্তু অত খাটিয়া ও অত্যাচার করিয়া সুশীলা নিজে পীড়িতা হইয়া পড়িল, পীড়িতা হইয়াও সে এক দিনের জন্য ঈশ্বরকে ডাকিতে বিরত হইল না। যখন সুস্থ ছিল, তখনও তাহার যেমন হাসি মুখ ছিল ঘোর অসুখের মধ্যে পড়িয়াও সেই সুন্দর ভাব নষ্ট হইল না। এত ক্লেশ যেন তাহার নিকট কোন ক্লেশ বলিয়াই বোধ হইত না। দেখিতে দেখিতে বালিকার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। বালিকাকে দেখিবার জন্য গ্রামের সকলেই একত্র হইলেন, তাহার সেই দশা দেখিয়া সকলেই কান্দিতে লাগিলেন। দাদাকে বাঁচাইতে পারিয়াছি এই ভাবিয়া মৃত্যু সময়েও সুশীলার মুখে আনন্দ দেখা গেল। ধন্য সুশীলা! আমরা তোমার ন্যায় বালিকা দেখি নাই। এমন বালিকাকে কাহার না ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়! এমন মনোহর ছবি ঘরে থাকে কাহার না সাধ হয়!
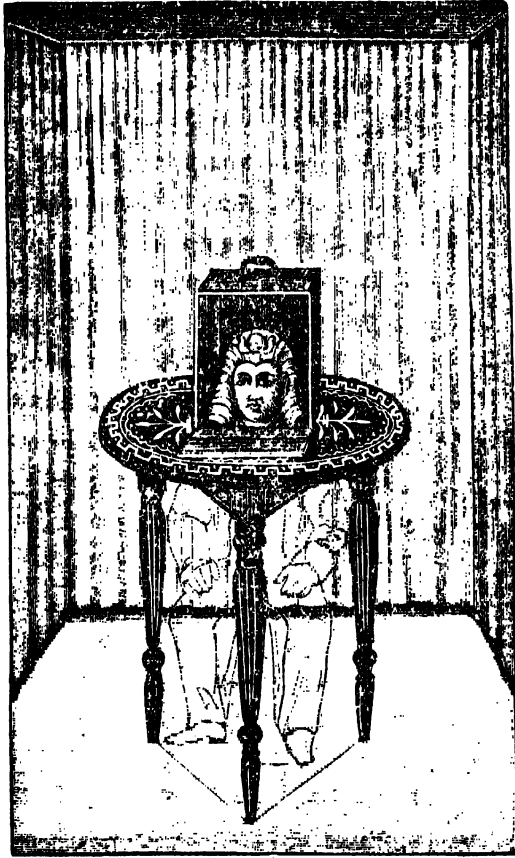
কাটামুণ্ড কথা কয়।

একদিন বৈকালে কলুটোলা ষ্ট্রীট দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি—দেখিলাম একটি বাড়ীর পাশের ছোট একটি একতালা ঘরের দুয়ারে একজন মুসলমান বসিয়া ঘণ্টা বাজাইতেছে এবং বলিতেছে 'কাটা মুণ্ডু কথা কয়, দেখে যাও, এক পয়সা।' শুনিয়া সেই স্থানে একটু দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় একজন আপীষ ফেরতা বাবু ঘরের দুয়ারের পর্দ্দার আড়াল হইতে বাহির হইলেন। আমি তাঁহাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম 'মহাশয়! ব্যাপারটা কি?' বাবুটী উত্তর করিলেন 'মহাশয়! অতি আশ্চর্য্য, প্রকৃতই কাটা মুণ্ডতে কথা বলিতেছে।' আমি বলিলাম 'কাটা মাথায় কি প্রকারে কথা কহিবে।' তিনি বলিলেন 'যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম তাহা কি আবার অবিশ্বাস করিতে হইবে। রক্ত গড়িয়ে পড়্‌চে, মহাশয়, বলেন কি? আপনার যদি সন্দেহ হয়

তবে একটা পয়সা খরচ ক'রে দেখে আস্থন।' আমি দরজার লোকটাকে একটি পয়সা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিবার পথ নাই। কয়েকটী গেলাসের আলোতে ঐ ক্ষুদ্র গৃহটী কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত হইয়াছে। দেখিলাম দ্বারের কিছু দূরে একটী সাদা কাপড়ের পর্দ্দা দ্বারা ঘরটী ছোট বড় দুই কামরায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ পর্দ্দাটী মেজে হইতে অনুমান দুই হাত উচ্চ। ঐ পর্দ্দার এক দিকে দর্শকেরা দাঁড়াইয়া দেখেন; অন্য দিকে মেজেতে একটি গোল টেবিল রহিয়াছে, তাহার সম্মুখের দিকের তিনটী পায়া ও তাহার উপর একটি কাঠের বাক্স দেখা যায়। এই কাপড়ের পর্দ্দার দ্বারা দুইটি কাজ হয়। প্রথমতঃ কোন দর্শক ঐ টেবিলের নিকটে যাইতে ও তাহার কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারেন না; দ্বিতীয়তঃ ঘাড় হেঁট করিয়া টেবিলের নীচু দিয়া টেবিলের পেছন দিক্‌কার ঘরের দেয়াল দেখা যাইতেছে কিনা তাহা দেখা যায় না।

দর্শকেরা উপস্থিত হইলে টেবিলের উপরিস্থিত বাক্সটী উঠাইয়া লওয়া হয় এবং তাহার উপরে একখানা টিনের থালার উপর একটী রক্তাক্ত নরমুণ্ড দেখা যায়। একজন মুসলমান প্রশ্ন করিতেছে এবং টেবিলের উপরিস্থিত নরমুণ্ড উত্তর দিতেছে। নরমুণ্ডের কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইল যে ঐ মুণ্ডই কথা কহিতেছে, অন্য কোন লুক্কাইত স্থান হইতে কেহ কথা কহিতেছে না। একবার মনে করিলাম যে টেবিলের উপর এমন কোন শিল্পকৌশল আছে যাহার মধ্যে শরীরটী লুক্কায়িত রহিয়াছে; কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সেরূপ কিছুই নাই।

প্রিয় বালক বালিকাগণ! তোমরা কি কাটা মুণ্ডের কথা বলা দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক তবে তাহা কি প্রকারে হয় তাহা জান কি? এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিলে তোমরা জানিতে পারিবে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা নানা রকম আমোদ জনক বিষয় প্রস্তুত হয়।

তোমরা সকলেই দর্পণে আপনাপন মুখ দেখিয়া থাক। এক খানা কাচের পিছনে পারা মাখাইলে দর্পণ প্রস্তুত হয়। যতক্ষণ কাচের পৃষ্ঠে পারা মাখান না যায় ততক্ষণ তাহার মধ্য দিয়া অপর দিকের পদার্থ সকল দেখা যায়। কাচের পৃষ্ঠে পারা মাখাইলে আর তাহার মধ্য দিয়া কোন পদার্থ দেখা যায় না কিন্তু তাহার সম্মুখে কোন বস্তু ধরিলে তাহার প্রতিবিম্ব দর্পণের উপরে পড়ে। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! বাজিকরেরা বিজ্ঞানের এই নিয়মটী অবলম্বন করিয়া কাটামুণ্ডের দ্বারা কথা বলাইতে পারে। উপরে যে টেবিলটির কথা বলিয়াছি ঐ টেবিলের সম্মুখে যে তিনটি পায়া আছে তাহাদের মধ্যে টেবিলের উপরের তক্তা হইতে মাটি পর্য্যন্ত বড় দুই খানি আয়না বসান আছে। ঐ আয়নার সম্মুখে যদি কোন পদার্থ থাকে, আয়নার উপরোক্ত নিয়মানুসারে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয় কিন্তু ঐ আয়নার পেছনদিকে পারা মাখান থাকায় তাহার আড়ালে কোন দ্রব্য থাকিলে তাহা দেখা যায় না। আয়না দুখানি এমন কৌশলে বসান যে একটু দুর হইতে গেলাসের অল্প আলোকে আয়না যে আছে তাহা বুঝা যায় না। ঐ আয়না দুখানি পাশাপাশী সোজা বসান নহে; যে রকম বাঁকা করিয়া বসান তাহা উপরের ছবিতে দেখ।

বাজিকরেরা দর্শকদিগের বিভ্রম জন্মাইবার জন্য মেজেতে ঘাস এবং খড় ছড়াইয়া টেবিলের মধ্যস্থল হইতে প্রত্যেক আয়না যতদূরে, আয়নার ঠিক ততদূরে সম্মুখে একটি গোল গেলাসে আলো দেয়। এইরূপ দুইখানি আয়নার সম্মুখে দুইটি গেলাস থাকায় তাহার প্রত্যেকটির প্রতিবিম্ব টেবিলের মধ্যস্থলে মেজের উপর পতিত হয় সুতরাং দর্শক আয়নার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ঠিক যেন দেখিতে পান যে টেবিলের নীচে ও বাহিরে সমস্ত মেজেতেই ঘাস বিস্তৃত এবং টেবিলের নীচে একটি আলো জ্বলিতেছে। গোল গেলাসে আলো দিবার কারণ বুঝিয়াছ কি? তোমরা যখন দর্পণে মুখ দেখ তখন দেখিয়া থাকিবে যে তোমার দক্ষিণ হাত ছবির বাম হাত, তোমার দক্ষিণ চক্ষু ছবির বাম চক্ষু অর্থাৎ তোমার উল্টা ছবি আয়নার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। কেন এই প্রকার উল্টা ছবি হয় তাহা আমরা পরে বুঝাইয়া দিব। গোলাকার পদার্থ ভিন্ন আর সকল প্রকার পদার্থেরই দক্ষিণ বাম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে; কেবল গোলাকার পদার্থের দক্ষিণ বাম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে না, কারণ তাহার সকল দিকই গোল। অন্য আকৃতির আলোক দিলে পাছে দর্শক সম্পূর্ণরূপে না ঠকেন, কেহ দক্ষিণ বাম বিবেচনা করিয়া হঠাৎ ধরিয়া ফেলিতে পারেন এই জন্য চালাক বাজীকর গোলাকার গেলাস ব্যবহার করে।

এই প্রকারে দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইয়া বাজিকর আয়নার পেছনে বসিয়া টেবিলের উপরিভাগে একটি ছিদ্র দিয়া আপন মস্তক বাহির করিয়া দেয়। ঐ ছিদ্রের উপর একখানা মাঝখানে কাটা টিনের থালা আছে; এই থালা খানি মানুষের গলার মাপে গোল করিয়া কাটা; তাহার দুই অর্দ্ধ দুই দিক হইতে ঠিক জোড়া দিয়া দেওয়া হয় তাহাতে বোধ হয় যেন অ[illegible] থালা খানার উপর মুণ্ডটি রহিয়াছে। পরে কিয়ৎ পরিমাণ কৃত্রিম রক্ত আলতা ও মেজেণ্টা দ্বারা প্রস্তত করিয়া ঐ থালায় ঢালিয়া রাখে এবং মুণ্ডের গলদেশে মাখাইয়া দেয়। ঐ মুণ্ড অর্থাৎ লুক্কায়িত মানুষ কথা কহিতে থাকে! বোধ হয় যেন কাটা মুণ্ড কথা কহিতেছে। দেখ দেখ কেমন মজা!

বালক বালিকাগণ! বিজ্ঞান শাস্ত্রে এই প্রকারের বহুবিধ আমোদের জিনিস আছে। তাহার কতকগুলি আমরা ক্রমশঃ তোমাদিগকে শিখাইয়া দিব।

প্রাণ কাঁদা চাই।

আমাদের একজন বন্ধু সম্প্রতি এক গ্রামে স্কুল গৃহে রজনীতে শয়ন করিয়া ছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, স্কুলের ২।৩ খানি বেঞ্চ একত্র করিয়া তাহার উপর শুইয়াছেন। এজন্য ভাল ঘুমও হইতেছে না, কাজেই আপন মনে শুইয়া শুইয়া কত কথা ভাবিতেছেন,—এমন

সময়ে কে যেন গুন্ গুন্ করিয়া বাহিরে গান করিতেছে শুনিতে পাইলেন। অল্পক্ষণ শুনিয়া মনে সন্দেহ হইল, বুঝি গান নহে। তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন; আসিয়া দেখেন যে দুইটি স্ত্রীলোক, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কাঁদিতেছে; নিকটে গেলেন, কিন্তু তাহাদের জীর্ণ শীর্ণ দেহ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। আহা! আহা! বুঝি ইহাঁরা পীড়িত। অসহায় অবস্থায় এখানে কি জন্য আসিল? এই সব চিন্তায় তাঁহার খুব দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা উত্তর পাইলেন, তাহাতে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। অতি ক্ষীণ স্বরে স্ত্রীলোক দুটী উত্তর করিল—"মহাশয়! আমাদের যে ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে, তাহাতে আমরা এখনই মরিয়া যাইব। এতক্ষণ অজ্ঞানের মতন হইয়াছিলাম এখন যেন সর্ব্ব শরীর কি করিতেছে আর বাঁচি না। না খেয়ে খেয়ে আমাদের শরীরে আর কিছুই পদার্থ নাই।"

আমাদের বন্ধু জানিতেন যে সে গ্রামের চারিদিকে খুব দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সুতরাং তখনই বুঝিলেন যে ঐ দুটী স্ত্রীলোক দুর্ভিক্ষের জ্বালায় কাতর হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল, হয়ত কোথাও কিছু না পাইয়া শেষ ক্লান্ত হইয়া ঐ স্থানে পড়িয়া মরিতে বসিয়াছে। কাল সকাল বেলা আর তাহাদের কেহ জীবিত দেখিতে পাইবে না, এমন অবস্থা হইয়াছে। রাত্রি তখন ১টা কিম্বা ২টা। এত রাত্রে কোথায় খাবার পাবেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সন্ধ্যা অবধি ত আমরা এখানে রহিয়াছি এতক্ষণ বল নাই কেন?" আহা! বলিবে কি? নিষ্ঠুর মানুষ!—যাহাদিগকে বলিয়াছিল, তাহারা দিল না, হয়ত তাহাদের কিছুই দিবার ছিল না। যাহা হউক হতাশ হইয়া ও মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া হত ভাগিনী রমণী দুজনেই শীতে হীমে বাহিরে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। পাষাণও তাহাদের অবস্থা দেখিলে গলিয়া যায়। আমাদের উক্ত বন্ধুর চক্ষে আর জল ধরিল না, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং ঐ হতভাগিনীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তত রাত্রে কার বাড়ী বা যাবেন? মনে করিলেন স্কুল ঘরটাই খুজিয়া দেখিবেন। তাহাই করিলেন, ঘরটীর চারিদিক আতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন। এক কোণে এক গ্লাস দুধ ও একটু চিনি দেখিতে পাইলেন। ঐ খাবার টুকু পাইয়া তাঁহার যে কি আহ্লাদ হইল তাহা আর কি বলিয়া জানান যায়? আমাদের পাঠক পাঠিকাদের ত আর পাথরের চেয়েও শক্ত হৃদয় নয়; তাঁহারা নিশ্চয়ই এই হতভাগিনী স্ত্রীলোক দের এরূপ ভয়ানক দুঃখের কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন। এখন, সেই দুধ ও চিনি টুকু পাওয়াতে সকলেরই আনন্দ হইল। উহা কোথা হইতে আসিল? কে এই অন্ধকারে স্কুল ঘরে রাত্রি দুটোর সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মৃতপ্রায় দুটী লোকের জন্য দুধ চিনি দিয়া গেল? ভাবিলে ভক্তিতে আর কৃতজ্ঞতাতে প্রাণ ভরিয়া যায়। সন্ধ্যার সময়ে আমাদের ঐ বন্ধুর চা খাও যার জন্য ঐ দুধ চিনি আসিয়াছিল, ঘটনাক্রমে কোন কারণে তাঁহার উহা খাইতে মনে ছিল না। ভাগ্যে এরূপ অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল, না হইলে সেই রাত্রে দুটী প্রাণীর মৃত্যু হইত, দুটী মানুষ—আমাদের মত দুটী প্রাণ, অনাহারে,—আহা!—না খেতে পেয়ে,-বাহির হইত!

সেই দুধ আর চিনি টুকুতে একটু গলা ভিজাইয়া তাহারা যেন বাঁচিল, বাঁচিবার আশা হইল। তখন তিনি তাহাদিগের হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিলেন, না হইলে শীতে তাহারা বাঁচিত না। ঘরে আনিয়া যত্ন করিয়া শোয়াইলেন। পরে প্রভাত হইলে সকলের নিকট ভিক্ষা করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। আহা! দীন হীন, দুঃখী অসহায় মৃতপ্রায় দুটী প্রাণী তাঁহার জন্য বাঁচিয়া গেল।

এইরূপে কত গ্রামে দুর্ভিক্ষের পীড়ায় যন্ত্রণা পাইয়া কত লোক যে, কত অসহ্য কষ্ট পাইতেছে তাহার ঠিক নাই! গবর্ণমেণ্ট অনেক সহায়তা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি ও আমাদের যে সকল বন্ধুরা নিয়ত ঐ সকল দীন দুঃখীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের মুখেও শুনিতেছি যে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে যাহা হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না, এজন্য নানা স্থান হইতে নানা দেশ বিদেশ হইতে দয়ালু লোকে সাহায্য করিতেছেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের চারিদিকে কত হাজার হাজার লোক যে যন্ত্রণা পাইতেছে তা মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমাদের আর কি সাহায্য করিতে বলিব? তোমরা শিশু, পয়সা টাকা কোথা পাবে? তবে একটা কথা বলিতে পারি। সেটা এইঃ— যখন তোমাদের খাবার সময় হবে, তখন যেন সেই দীন হীনদের কথা মনে ক'রে একটু দুঃখ হয়, তাদের দুঃখে দুঃখী হ'লে, পরমেশ্বরের কাছে তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য তোমরা প্রার্থনা করিলেও তাহাদের মঙ্গল হবে। আর কিছু হউক আর না হউক, তোমাদের হৃদয়ের খুব উন্নতি হবে। রোজ একবার দুবার করিয়া তোমরা হতভাগ্য নরনারীর কথা চিন্তা করিও; রোজ বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে তোমরা পার কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ করিও। আর যদি কিছু পয়সা যোগাড় করিতে পার তবে আমাদের কাছে হউক বা বঙ্গবাসী কি সঞ্জীবনীর কাছে বা অন্য কোন স্থানে পাঠাইয়া দিও। **দুঃখিত হওয়া চাই, প্রাণ কাঁদা চাই।**

বসন্ত সঙ্গীত।

(১)

আইলাম আজ আমি এত দিন পরে,
বহুদিন থেকে সবে ডাকিতেছ মোরে,
মধুর তপন তাপ লইয়া সাথেতে
দেখরে এসেছি আমি জগৎ মোহিতে।

(২)

মলয় হইতে বায়ু বহিছে আমার,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম ফুটিছে অনিবার;
আমারে দেখিয়া যত তরু লতা রাজি,
সম্ভাষে যতনে নানা ফল ফুলে সাজি।

(৩)

শীতকালে যেই বৃক্ষ মৃতপ্রায় ছিল,
মম আগমনে তারা জীবন পাইল,
ফুটিল শাখায় তার কুসুম সুন্দর,
মধুর গুঞ্জন তাহে করে মধুকর।

(৪)

দেখরে নিকুঞ্জ বনে কি শোভা ধরেছে,
পাতায় পাতায় ফুল কেমন ফুটেছে,
তদুপরে বিহঙ্গম সুমধুর রবে
পুলকে আমার বার্ত্তা জানাইছে সবে।

(৫)

ওই বসি পিক কুল গাছের শাখায়
গাইছে মধুর গীত শুনাতে আমায় ;
ফুলের সৌরভ মাখি মৃদুল পবন
আমার বারতা লয়ে ধায় অনুক্ষণ।

(৬)

দেখরে চাহিয়া নদী কি শোভা ধরেছে
রূপের ছটায় যেন চমকি চলেছে,—
ফুটেছে তাহার পাশে সুরভি বকুল
সৌরভ পাইয়া তথা ধায় অলিকুল।

(৭)

দেখরে কানন মাঝে ফুল কত জাতি—
সুন্দর বরণ কিবা—ফোটে দিবা রাতি,
কোন স্থানে ফুটিয়াছে গোলাপ কলিকা,
শোভিতেছে কোন স্থানে চারু সেফালিকা।

(৮)

দেখরে চাহিয়া ওই পর্ব্বত ভেদিয়া
বহিছে ঝরণা কিবা দিক উজলিয়া,
ভানুর কিরণ রাশি পড়িছে তাহায়,
কি সুন্দর শোভা আহা ধরিয়াছে তায়

(৯)

বালক বালিকা সবে আমারে দেখিয়া
মধুভাষে ডাকে মোরে আনন্দে মাতিয়া,
আমার সুন্দর ফুল তুলিয়া আদরে
পরিতেছে কত স্থানে কত যত্ন করে।

(১০)

বালক বালিকা তোরা আয়রে ছুটিয়া
আয়রে তোদের সাথে খেলিব বসিয়া ;
আমার বিকাশ কালে তোমরা কখন
থেক না থেক না কেহ বিষাদে মগন।

(১১)

বালক বালিকা তোরা আয় ছুটে আয়,
বড় ভাল বাসি তোদের কোমল হৃদয় ;
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা আদি পরিহরি আয় ;
দূর করি কুবাসনা আয় সবে আয়।

(১২)

যেই জন রচিলেন এ বিশ্ব ভুবন,
যাঁহার কৃপায় মোর এরূপ মোহন,
তাঁহার মহিমা গান আয় সবে গাই,
সরল হৃদয়ে আয় তাঁর পানে চাই।

ধাঁধা।

গত বারের প্রশ্নের উত্তর।

১। কপি।

২। "চোক—চোক" + আ = চোকা)

নূতন।

১। তিন বর্ণে নানারূপে করি বিচরণ,
সবার নিকটে আমি আদরের ধন।
দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ণে করিলে মিশ্রণ
পশু হয়ে করি আমি কাননে গমন।
আদি অন্তে মিলাইলে কর্ম্ম হয়ে যাই,
তৃতীয়ে ছাড়িলে আমি ক্ষুদ্র মুদ্রা হই।
সুবোধ তোমারি হাতে রহিয়াছি আমি ;
চিনিতে পারিলে কিহে বল দেখি তুমি।

২। এক গৃহস্থের বাগানে এক সারিতে ৩৬টী আমের গাছ ছিল। ১ম গাছটীতে ১টী, ২য় টীতে ২টী, তৃতীয় টীতে ৩টী এইরূপে ৩৬শ টীতে ৩৬টী আম হইত। ঐ গৃহস্থ মৃত্যু সময়ে উক্ত ৩৬টী গাছ তাঁহার ছয় পুত্রদিগকে দিয়া যান এবং বলিয়া যান যে প্রত্যেকের ভাগে যেন ছয়টী করিয়া আম গাছ হয় এবং আমের সংখ্যাও যেন প্রত্যেকের সমান হয়। বল দেখি কে কোন্ কোন্ গাছ পাইবে ?

... দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্বিতীয় সংস্করণ)
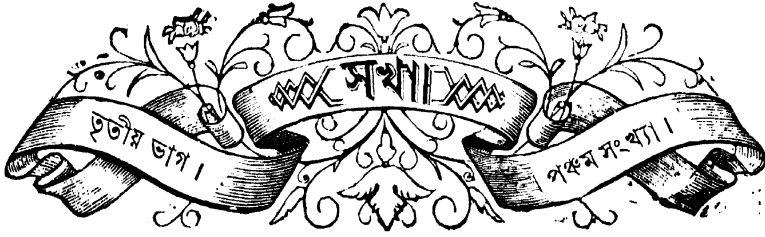
মে, ১৮৮৫। বৈশাখ, ১২৯২।

নব বর্ষ।

মহা হর্ষ নব বর্ষ আস্‌ছে শিশুগণ!
কেমন মজা নূতন রাজা দিলেন দরশন।
রাঙ্গা রবি—সোণার ছবি—সরস হাসি হাসে,
বল্‌ছে সবায়"দেখ্‌বিত আয় নূতন রাজা আসে।"
সুবাস লয়ে ত্বরিত হয়ে মলয় পবন চলে,
"পাও হে চেতন, লোক সাধারণ! রাজা এলেন বলে"

পক্ষীগণে খুসী মনে গায় মঙ্গল গান,
কুসুম সুখে কোমল মুখে হাস্‌ছে খুলে প্রাণ।
সকল ধরা সুখে ভরা বিভুর মহিমায়;—
এল নূতন আদরের ধন, পুরাতন ঐ যায়।
দেখ্‌ছে সবে ভক্তিভাবে নববর্ষে চেয়ে,
তোমরা সবাই জাগ্‌বে কি ভাই নূতন জীবন লয়ে?

সময় গেলে রত্ন দিলে আর তো নাহি পায়,
অমন ধনে, অবোধ জনে, হেলায় হারায়।
গত বর্ষ গেল ওই চক্ষে দিয়ে ধুলো!
হা করিয়ে রইল চেয়ে অলস ছেলে গুলো।
দেখ দেখি কি ফাঁকিতে প'ড়ে গেল তারা,
শেথ দেখে এখন থেকে পাঠক পাঠিকারা।
পরাণপণে বিদ্যাধনে কর্‌বে উপার্জ্জন,
গরিব লোকে দয়ার চোখে দেখো সর্ব্বক্ষণ।
স্বার্থ আর অহঙ্কার দিস্‌না মনে ঠাঁই,
আত্মসুখে মত্ত হয়ে করিস্‌নে বড়াই।
কর চেষ্টা যাতে শেষটা পরম সুখে রবে,
তোমায় দেখে সকল লোকে "দেশের রতন" কবে।

নূতন বছর নয়নগোচর যাঁহার করুণায়,
এস সবে ভক্তিভাবে প্রণমি সে পায়।
মাগি ভিক্ষা করুন রক্ষা ভারত-বন্ধুগণে,
দেশের হিত সুসাধিত হউক দিনে দিনে।
দুর্ভিক্ষেতে এ বারেতে হ'ল বড় ক্লেশ,
সে হাহাকার না থাকে আর, বাঁচে যেন দেশ।
অধম তারণ কাঙ্গাল-শরণ পিতা দয়াময়,
দিউন শক্তি, তাঁতে ভক্তি সদাই যেন রয়।
তাঁর দয়াতে কুশলেতে থাক ভাই বোন্!
সুখী হও, সুযশ পাও, বিমল হউক মন!

হাসি, কান্না, কোন্‌টা ভাল ?

যার সুখ সেই হাসে ; আর যাহার দুঃখ সেই কাঁদে। তাই জিজ্ঞাসা করি ভাই পাঠক পাঠিকা যে বৎসর গেল ইহাতে তুমি বেশী হাসিয়াছ না কাঁদিয়াছ ? যে বালক বালিকা নিজের উন্নতি করিতে এবং অপর দশ জনের উপকার করিতে গত বৎসরের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন আমরা অধিক হাসিয়াছি।

আর যে সকল ছেলে নিজের উন্নতির কথা ভুলিয়া গিয়া দিন রাতি 'মজা' করিয়া কাটাইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিবার আগেই আমি বুঝিতেছি তাঁহাদের সুখ হয় নাই। ছবির দিকে একবার তাকাও দেখি। হাসির চেহারা গুলি দেখিতে ভাল, না—কান্নার চেহারা গুলি? তবে যাহাতে, বছরের শেষে 'কি করিয়াছি' ভাবিতে বসিয়া মনের সুখে হাসিতে পার কেন সেই জন্য যত্নবান্ হও না?

লীলার ভয়।

আজ লীলাবতীর বাবা ও মা কেহই বাড়ীতে নাই। বাবা কোন কাজে বাহির হইয়াছেন। লীলার মা তাঁহার এক বন্ধুর অসুখ হওয়াতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন। লীলার উপর বাড়ীর সমস্ত ভার। নলিনীকে ও খোকাকে রাখিতে হবে। মা বলিয়া গিয়াছেন "লীলা! বাড়ীর সমস্ত ভার তোমার হাতে রহিল, তুমি বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইও না; খুব সাবধানে থাকিবে যেন বাড়ীতে কেহ না আসে; নলিনী ও খোকাকে বেশ সাবধান করিয়া রাখিবে, আমি শীঘ্রই আসিব।" লীলা মাতার কথা গুলি মন দিয়া শুনিয়াছিল, ও তাহা পালন করিবে বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। একাদশ বর্ষীয়া বালিকা লীলা আজ এ বাড়ীর গৃহিনী। সে নলিনীকে খাবার দিয়া, খোকাকে লইয়া খেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেলা চলিয়া গেল; যখন চারিদিক আঁধার হইয়া আসিল, তখন লীলাও আপন ঘরে প্রদীপ জ্বালিল। ভাইটীকে অনেক চেষ্টা করিয়া ঘুম পাড়াইল। নলিনীও ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। লীলা এখন সেই নির্জ্জন ঘরে একাকী বসিয়া ভাই বোনকে পাহারা দিতে লাগিল। বেচারা লীলা অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া মার অপেক্ষা করিতেছে, আর পারে না। কে জানে কেমন একটা লুকান ভয় তাহার প্রাণকে কাঁপাইতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। বুক দুর দুর করিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল কে যেন পিছুতে বসিয়া আছে, সরিয়া দেখিল কেহই নয়। কি আপদ! লীলা আর কি করে? তবু বোধ হইতে লাগিল কে তাহার পিছনে। একে এই ভয় তাহাতে আবার কাহার চলন ফেরনের খস্ খস্ শব্দ হইতে লাগিল। আহা! লীলা অনেক সহ্য করিতেছে, আর পারে না। একবার একবার ইচ্ছা করিতেছে যে বাড়ী ছাড়িয়া দৌড়িয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু মার কথা মনে জাগাতে তাহা পারিয়া উঠিতেছে না। বিষম পরীক্ষা। একদিকে ভয়ানক ভয়ে লীলার পা দুখানিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়, আর এক-দিকে মার কথা তাহাকে ধরিয়া রাখে—অনেক কষ্টে এখন পর্য্যন্তও ভাই বোনের বিছানার পাশে বসিয়া আছে। হঠাৎ খট্ করে কি যেন খুলিবার শব্দ হইল, অমনি ভয়ে চীৎকার করিয়া লীলা লাফাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে 'মিউ' 'মিউ' করিয়া তাহার বিড়ালটী শয্যা পার্শ্বে বসিল। এতক্ষণ পরে লীলাবতীর ঘাড়ে ভূত চাপিল। সে মনে করিল "৭টা বাজিল, মা বাবা কেহ আসিতেছেন না; আমি খিড়কি দরজা দিয়া বাহিরে গিয়া দেখি মা আসিতেছেন কি না?" কাজেই ভাই বোনকে একাকী রাখিয়া খিড়কি দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল। দ্বার খুলিয়া মাঠ পানে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিল; জন প্রাণীও তাহার চক্ষে পড়িল না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া পা দুখানি ধরিয়া গেল, তবুও মা এলেন না। এতক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। 'মা ত এলেন না; যাই তাদের দেখি, হয়ত বাড়ীতে কোন চোর ঢুকিয়াছে।' এই বলিয়া সে যেমন সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে, অমনি বাড়ীর ভিতর মানুষের পায়ের শব্দের মত 'খট' 'খট' শব্দ শুনিতে পাইল। কি সর্ব্বনাশ! মার কথা না শুনিয়া যাহা

হইবে বলিয়া ভয় পাইয়াছিল, হায় হায় তাহাই হইয়াছে। সর্ব্বনাশ! বাড়ীতে নিশ্চয়ই চোর ঢুকিয়াছে কোন সন্দেহ নাই। লীলা! কেন বাড়ী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, এখন ভোগ কর। সে আর ভয়ে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। আস্তে সিঁড়ির তলায় লুকাইয়া—ঘরে কে ঢুকিয়াছে তাহাই দেখিতেছে। দেখিতে লাগিল বটে কিন্তু লীলাতে আর লীলা নাই—ভয়ে প্রায় চেতনা হারা হইয়াছে। যদিও শীত কাল তথাপি অত্যন্ত ঘামিতেছে, তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

লীলা দেখে বারাণ্ডার আলো ক্রমে ক্রমে ঘরের কাছে আসিতে লাগিল। দেখে একজন লোকে বাতি হাতে করিয়া তাহাদের বিছানার কাছে আসিতেছে। আর লীলা স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "তুমি আমার ভাই বোনকে ছুঁতে পার্‌বে না। আমি ছুঁতে দেবোনা। দেবো না।" লীলার কথা শুনিয়া লোকটী বলিয়া উঠিলেন "আরে! এই যে এখানে!" লীলা বুঝিল ইহা তাহার পরিচিত গলা; কিন্তু কাহার গলা তাহা তখন বুঝিতে পারিল না। তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন "ওগো! লীলাকে কোথায় খুঁজিতেছ? এই যে লীলা! (লীলার প্রতি) কি মা! কোথায় ছিলে, আমরা তোমাকে সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম।" লীলা বাবার মুখ পানে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুই বলিতে পারিল না। মাতা ঘরে আসিয়া লীলাকে কিছু শক্ত কথা শুনাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, মুখখানি নীলবর্ণ; কাজেই শক্ত কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। মা একটু তিরস্কার করিলেন। বকুনি খাইয়া লীলার চৈতন্য হইল, মুখ দিয়া একটী দুটী কথাও বাহির হইল।—"তুমি কোথা দিয়ে এলে, আমিত দেখিতে পাই নাই। আমি ৭টা থেকে পিছনের উঠানে দাঁড়াইয়া তোমায় তল্লাস করিতেছিলাম।"

মাতা। এতক্ষণ! তুমি কি এখন এলে। আমি সাম্‌নের দরজা দিয়া আসিয়াছি। তোমার শরৎ মাসীমার অত্যন্ত অসুখ বাড়িয়াছে তাই এত দেরী হ'য়ে গেল। বড় ক্লান্ত হয়েছ, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন কর।

বাবা। আহা! লীলা আমার, ভাই বোনদের রক্ষা করিবার জন্য আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল।

লীলা লজ্জায় বাবার বুকের ভিতর মুখখানি লুকাইয়া ধীরে ধীরে বলিল "না বাবা আমার দোষ নাই, আমি একলাটী ছিলাম। কেহই আমার কাছে ছিল না, ভয় হবে না?"

পিতা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "না লীলা, একজন পরম দয়ালু বন্ধু তোমার অতি নিকটে ছিলেন, কিন্তু তুমি ভয়ে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে। তাঁহাকে স্মরণ করিলে মা! তোমার আর ভয় থাকিত না। তিনি সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। পাঠক পাঠিকাগণ! এমন সুহৃৎ কে তা কি বুঝিতে পারিয়াছ?

ঠাকুরদাদার গল্প।

শিশির

(পূর্ব্বের পর)।

এক দিন প্রাতঃকালে সকলে বাগানে বেড়াইতে গিয়া স্থির করিলেন যে সে দিনকার শিশিরের কথার বাকী টুকু আজ শেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। নবীন বাবুও উপস্থিত ছিলেন, সকলকে চারিদিকে বসাইয়া শিশিরের গল্প বলিতে লাগিলেন। প্রথমে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন; সে দিনকার কথা সকলের মনে আছে কি না? সে কথা সকলেরই স্মরণ ছিল। সুতরাং নূতন কথা আরম্ভ হইল।

মন্মথ বলিল—“আজ বলিয়া দিন, দাদা-বাবু, শীতকালে বেশী শীতল বলিয়া বায়ুতে বাষ্প কম থাকিলেও শিশির বেশী পড়ে কেন? এ কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে।”

নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন :—“আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বায়ু কখনই একেবারে বাষ্প-হীন হয় না। একটু না একটু জলীয় বাষ্প তাহাতে থাকেই থাকে। শীতকালেও সূর্য্যের উত্তাপ থাকে, ঐ উত্তাপে নদী, হ্রদ, সাগরাদি হইতে জল বাষ্প হইয়া উঠে। আরও একটা নিয়ম আছে যে বায়ু যত শুষ্ক অর্থাৎ বাষ্পহীন হয়, ততই উহার বাষ্প লইবার শক্তি বাড়ে। অর্থাৎ কোন জলাশয়ের উপর দিয়া যদি একটী অধিক বাষ্প-বিশিষ্ট বায়ু-প্রবাহ চলিয়া যায় তাহা হইলে উহা ঐ জলাশয় হইতে যে পরিমাণে জল বাষ্প করিয়া লইয়া যাইবে, শুষ্ক বায়ু-প্রবাহ তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেলে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল বাষ্প করিয়া লইয়া যাইবে। এ অতি সোজা কথা। কাজেই ঐ দুটী কারণে শীতকালের দিনের বেলায় বায়ুতে অনেকটা বাষ্প জমা হয়। এবং ঐ বায়ু সকালে ও রাত্রের অপেক্ষা কিছু গরম বলিয়া উহার বাষ্পটা জমিয়া তখন জল হইতে পারে না। কিন্তু যেই সূর্য্য অস্ত যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপরের সমস্ত জিনিস তাপ গ্রহণ অপেক্ষা তাপ বিকীরণ বেশী করিতে থাকে, অমনি ঐ বায়ু তাহাদের গায়ে ঠেকিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। যেমন ঠাণ্ডা হয় অমনি ক্রমে ক্রমে দিনের বেলার সঞ্চিত বাষ্পগুলা সব জল হইয়া যায়। ঐ জল খুব ছোট ছোট কণার আকারে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায় ও নিকটস্থ পদার্থ সকলে লাগিতে থাকে। ইহারই নাম হিম। শীতকালের রাত্রে সমস্ত বাতসটাই এই হিম পূর্ণ হইয়া যায়, সে সময়ে বাহিরে এলে গা বরফের মত কন্ কন্ করিতে থাকে। বুঝিতে পারিয়াছ?”

নলিন বলিয়া উঠিল “না দাদা বাবু! আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। আমাকে যতক্ষণ না ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন ততক্ষণ আমি আর বেশী বলিতে দিব না।”

নবীন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন “কেন? এর ভিতর ত আর কোন শক্ত কথা নাই। শক্ত কথা যা কিছু সে দিনই বলিয়া দিয়াছি। তুমি ত সে দিন শুনিয়াছ যে সকল দ্রব্যেরই “তাপ-গ্রাহিতা শক্তি” আছে, কোন গরম জিনি-সের নিকট এলেই গরম হবে। আবার তেমনি সকল জিনিসেরই “তাপ-বিকীরণ শক্তি” আছে, উহা থাকাতে গরম জিনিস মাত্রই নিজের গরম

চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। (নলিন,—"হাঁ শুনিয়াছি।") তবে আর কি? যতক্ষণ সূর্য্য মাথার উপর ছিল, পৃথিবী ও তাহার উপরিস্থ সব সামগ্রী গরম হইতেছিল বা তাপ গ্রহণ করিতেছিল। তখনই আবার তাপ বিকীরণও করিতেছিল, কিন্তু খরচ অপেক্ষা জমা বেশী ব'লে, অর্থাৎ বিকীরণ অপেক্ষা সূর্য্যের নিকট হইতে অধিক তাপ গ্রহণ করিতেছিল বলিয়া, দিনের বেলা সব জিনিস গরম হইয়াছিল। এখন গরম পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া বাতাসও একটু গরম হইয়াছিল। সেই গরম বাতাসে উঠিয়া জলাশয় সকলের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া ভাসিতেছিল। এই সব গেল দিনের বেলায়। সন্ধ্যা হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, পৃথিবীর গা ঠাণ্ডা হইল, তাহার উপরের জিনিসও সব ঠাণ্ডা হইয়া পড়িল। এই সব ঠাণ্ডা জিনিসের গায়ে বাষ্প-ভরা ঐ গরম বাতাস যেই লাগিতে লাগিল, অমনি উহার বাষ্প জল হইয়া ঐ সব ঠাণ্ডা জিনিসের গায়ে শিশির হইয়া পড়িল। এইরূপে শীতল হইতে হইতে যখন পৃথিবীর নিকটের সমস্ত বাষ্পটাই একেবারে শীতল হইয়া গেল, তখন সমস্ত বায়ুতে যত জলীয় বাষ্প ছিল তার অনেকটাই শীতল হিম হইয়া পড়িল। এবং ঐ হিমময় বায়ু যেখানে লাগিল অমনি খানিকটা হিম তাহার গায়ে রাখিয়া যাইতে লাগিল। এই রকমেই ঘাসে, পাতায়, জানালার কাচে, শ্লেটে, সব স্থানে সকালে উঠিয়া শিশির ফোঁটা ফোঁটা দেখা যায়। প্রথমে যখন শিশির জমিতে থাকে তখন কিন্তু একেবারে ঐ রকম ফোঁটা ফোঁটা হয় না। প্রথমে একটু সাদা দাগের মত পড়ে। ঠিক ভাল চাকু ছুরীর ফলাতে মুখ হইতে হাই দিলে যেমন সাদা হইয়া যায়, তেমনি প্রথমে খুব গুঁড়ি গুঁড়ি বাষ্প জমিতে আরম্ভ হয়, তার পর ক্রমে যত বেশী জমে তত কতকগুলা একত্র হইয়া শেষে বড় ফোঁটা হইয়া পড়ে। তা বোধ হয় তোমরাই কত দিন দেখিয়াছ, পাতার গায়ে সাদা দাগের মত সব শিশির কণা স্থির হইয়া রহিয়াছে, যেই তুমি নাড়িলে অমনি একটার পর আর একটা একত্র মিলিয়া বড় বড় ফোঁটা হইয়া পড়িল। না?—(সকলে "ঠিক্ ঠিক্।") এইরূপে শীতকালের রাত্রে শিশির পতন হয়। যথার্থ ধরিলে কিন্তু শিশির পড়ে না, বৃষ্টির মত ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া কখন পড়ে না। শিশির হয় বা জমে বলিলেই ঠিক বলা হয়। কেন না, বৃষ্টি যখন পড়ে, তখন কেবলই পড়ে, কোন দিকে চায় না, বাতাস ঠাণ্ডা হ'ল কি না, পৃথিবীর উপরকার জিনিসগুলা এখনও গরম আছে কি না, এ সব কিছুই দেখে না। উপরের বাতাস শীতল হইল, বাষ্প সব জমিয়া গেল, জলবিন্দু হইয়া ভারী হইল, আর অমনি হু হু করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। শিশির ত সে রকম নয়। শিশির উপরের বায়ুতে নয়, পৃথিবীর নিকটেরই বায়ুতে বাষ্প হইয়া এতক্ষণ ছিল, যেই দেখিল ক্রমে সুবিধা হইতেছে, সব জিনিস ঠাণ্ডা হইতেছে, অমনি তাহাদেরই গায়ে লাগিয়া তাহাদেরই গায়ে জলবিন্দু হইয়া শিশির হইল। কাজেই তাহাকে আর শিশির পড়া বলা যায় না। শিশির বরং ঠাণ্ডা জিনিসের গায়ে বাতাস থেকে জমে বা হয় বলিলেই উচিত কথা বলা হয়।"

নলিন ঃ—"হাঁ দাদা বাবু! এইবার আমি বেশ বুঝেছি। আর আমি যখন বুঝেছি, তখন আর কেহ বুঝিতে বাকী নাই।"

অমূল্য ঃ—"আচ্ছা! শীতকালে যে দিন মেঘ

করে সে দিন রাত্রে কিছু শিশির হয় না কেন? আমার ঠোঁট ফেটে গিয়েছিল, মা বল্লেন যে শিশির দিলে ভাল হবে। আমি ভোরে উঠিয়া শিশির খুঁজিবার জন্য কত পাতা, ঘাস, ফুলগাছ ঘুরিলাম কোথাও দেখিতে পেলাম না। তখন মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 'মেঘ হইলে শিশির পড়ে না।' আমি তখনই আপনাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মনে ছিল না, হঠাৎ আজ মনে পড়িল; বলিয়া দিন্ না?"

কিশোরী বলিল "তাইত? ঠিক কথা; শীতকালে যে দিন মেঘ করে সে দিন হিম পড়ে না বটে।" আর আর সকলেই এই কথার সায় দিল। ঠাকুরদাদা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"যে দিন মেঘ হয় সে দিন যথার্থই কিছু শিশির জমিতে পায় না, কেন—বলিতেছি। বলিবার পূর্ব্বে কিন্তু আর একটা কথা বুঝান আবশ্যক। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সব কালেই যে দিন মেঘ হয় সে দিন বড় গরম হয়,তা বোধ হয় সকলেই জান। এক এক দিন এমনি গুমোট হয় যে প্রাণ আই ঢাই করিতে থাকে, মানুষকে অস্থির করিয়া তুলে। আবার যখন সন্ধ্যার সময় একটু বায়ু বহিয়া মেঘগুলাকে সরাইয়া দেয়, কিম্বা এক পশলা বৃষ্টি হইয়া মেঘ কাটিয়া যায়, তখন প্রাণ বাঁচে, ঠাণ্ডা হয়। কেমন? (সকলে "এ কে না জানে?") বেশ, কেন হয় বল দেখি? নিশ্চয়ই জান না। আমি বলিতেছি শুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সব জিনিস একই সময়ে তাপ গ্রহণ ও বিকীরণ উভয়ই করে। মনে আছে? পৃথিবীও সূর্য্যের নিকট হইতে দিনের বেলা তাপ গ্রহণ করিতে থাকে, আবার তখনই খানিক খানিক তাপ বিকীরণও করিতে থাকে। কেমন করিয়া জানিতে পারি? আচ্ছা, মনে কর এই গ্রহণ হইতে বিকীরণের তাপ বাদ দিলে যা বাকী থাকে দিনের বেলা আমরা সেই টুকুই অনুভব করিতে পাই; যে টুকু চলিয়া যায় সে টুকুও অনুভব করি না, আর যে তাপটা সূর্য্য হইতে আসে তারও সবটা পাই না। বিকীর্ণ হইয়া যেটা বাকী থাকে তাহাই আমরা পাই। বেশ, এখন কোন কারণে যদি ঐ বিকীরণ বন্ধ করা যায়, তবেই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত সমুদায় তাপই অনুভব করা যাইবে। এখানেও ঠিক তাই হয়। রোজ আমরা দেখিতে পাই, সূর্য্য হইতে গৃহীত তাপের খানিকটা বিকীর্ণ হইয়া আকাশে ছড়াইয়া যায়, পৃথিবী থেকে উড়ে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যায়, তাই গরম কম বোধ হয়। মেঘ হইলে ঐ বিকীরণ হওয়ার পক্ষে বাধা পড়ে, উপরে ছাতের মত মেঘ স্তূপে স্তূপে রহিয়াছে তা ভেদ করিয়া পৃথিবীর বিকীর্ণ তেজ আকাশে পলাইয়া যাইতে পায় না, এজন্য সেখান থেকে আবার প্রতিফলিত হইয়া অর্থাৎ ঠিক্‌রিয়া পৃথিবীর দিকে আসে, কাজেই পৃথিবীর নিকটের বায়ু খুব গরম বোধ হয়। বুঝিলে? এই জন্য দুইটী কারণে মেঘ হইলে বায়ু গরম থাকে :—১মতঃ, বিকীরণ ভাল করিয়া হইতে পায় না, ২য়তঃ, মেঘের দিকে যে উত্তাপটা উঠিয়াছিল সেটা আবার প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীর দিকেই ফিরিয়া আসে। এই দুইটী কারণে মেঘলা রাত্রে পৃথিবী শীতল হইতে পায় না। কাজেই তাহার নিকটের বায়ুও শীতল হয় না, কোন জিনিসও শীতল হয় না। এই জন্য ঐ বায়ুর বাষ্প বাষ্পই থাকিয়া যায়, শিশির হইতে পায় না, ঐ জন্য গাছের তলায় বা ঘরের ছায়ার মধ্যেও শিশির হয় না। বুঝিলে? (সকলেই "হাঁ")।

ঐরূপে যে দিন জোরে হাওয়া হয় সে দিনও শিশির ভাল জমে না। নানা স্থানের গরম বায়ু আসিয়া পড়াতে বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা হইতে পায় না। আর বায়ুর চলাচল হওয়ার জন্যও উহা শীতল হয় না। কাজেই ভাল রকম শিশির জমে না, যাও একটুক আধটুক জমে তাও উড়িয়া যায়।

শিশির জমিবার নিয়ম এখন বেশ্ শিখিলে। আর একটী কথা বলিয়া অদ্য বাড়ী যাইব। তোমরা দেখিয়াছ যে ঘাস, পাতা প্রভৃতি কতক গুলি জিনিসে শিশির অন্য কতকগুলি জিনিসের চেয়ে বেশী জমে, এর কারণ কি?—না, পূর্ব্বে বলিয়াছি বিকীরণ শক্তি সকলের সমান নয়। যে সকল বস্তু শীঘ্র তাপ বাহির করিয়া শীতল হইতে পারে তাহারাই বেশী শিশির পায়। ঘাস, পাতা, কাচ, তুলা, পশম (যেমন চুল, কম্বল ইত্যাদি), লোহার বার প্রভৃতি সামগ্রী রাত্রে বাহিরে থাকিলে উহাদিগের গায় যত শিশির জমে, অন্য জিনিসের গায় তত জমে না। মোট নিয়মই এই যে, যে দ্রব্য যত শীঘ্র শীঘ্র গরম তাড়াইয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে তাহাতে তত পরিমাণে শিশির জমে।"

সকলে:—"খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম, দাদাবাবু।" নবীন বাবু বলিলেন "এই কথা বলিতে বলিতে একটা ভাল কথা মনে পড়িল। শিশির যেমন নিঃশব্দে স্বর্গ থেকে পড়ে, মানুষের উপরে তেমনি জ্ঞান ও ধর্ম্ম স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর নিঃশব্দে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু শিশির যেমন গরম না তাড়াইলে জমে না, মানুষও তেমনি যত দিন নিজের অহঙ্কার রূপ তাপকে তাড়াইয়া দিয়া বিনয়ী, শান্ত ও নম্র না হয়, ততদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মের শিশির তার প্রাণে দাঁড়াইতে পারে না। এই উপদেশ সর্ব্বদা মনে করিয়া অহঙ্কারের তেজ কমাইবে, আর নম্র হইয়া বিনয়ী হইয়া কেবল শিখিতে চেষ্টা করিবে। তবে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইয়া জগতের উপকার করিতে পারিবে। চল আজ বাড়ী যাই।"

৺ তারকনাথ প্রামাণিক।

বালক বালিকাগণ! উপরে যাঁহার ছবি দেখিতেছ, ইঁহার বিষয়ে আজ তোমাদিগকে কিছু বলিব। অল্প লেখা পড়া শিখিয়া, অল্প বয়সে বিষয় কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া, শরীরের শ্রম, বুদ্ধির জোর, কাজে মনোযোগ, ও ধর্ম্মপথে মতির দ্বারা লোকে নিজের

অবস্থার কিরূপ উন্নতি করিতে পারে,যদি দেখিতে চাও, তবে এই সাধু ব্যক্তির জীবন চরিত মনোযোগ দিয়া পড়।

ইহাঁর নাম তারকনাথ প্রামাণিক। কলিকাতায় ইহাঁর নাম জানে না এমন লোকই নাই। ইনি জাতিতে কাঁসারি ছিলেন। সিমলার কাঁসারি পাড়াতে বাড়ী। ১২২৩ সালের ৫ই আশ্বিন ইহাঁর জন্ম হয়, এবং ১২৯১ সালের ৭ই চৈত্র ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। ১২ বার বৎসর বয়সের সময় ইনি ইহাঁর খুড়ার একটী বাসনের দোকানে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। বার বৎসরের পূর্ব্বে কত লেখা পড়া জানা সম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পার। যাহারা শ্রম করিয়া খায়, এবং যাহাদের ছেলে পিলেকে শ্রম করিয়া খাইতে হইবে, তাহারা বড় বড় বাবুদের মত ছেলেপিলেকে ভাল রকম লেখা পড়া শিখাইতে পারে না। তারকনাথকেও বার বৎসর বয়সে নিজের হাতে শ্রম করিয়া বাসন পিটিয়া খাইতে হইয়াছিল। সচরাচর দেখা যায় যে এত অল্প বয়সে, ভাল রকম লেখা পড়া না শিখিয়া, কাজ কর্ম্মে লাগিলে অনেক ছেলে প্রায় কুসঙ্গে পড়িয়া বয়ে যায়; কাজে তাহাদের মনোযোগ থাকে না; অল্প বয়সে তামাক, গাঁজা বা মদ খাইতে শিখিয়া একেবারে অপদার্থ হইয়া পড়ে, কিন্তু তারকনাথের বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে এই সকল দোষে তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই। তিনি যে শ্রমে কাতর ছিলেন না, এবং তাঁহার যে কোন প্রকার অপব্যয় ছিল না, তাহা তাঁহার উন্নতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। তিনি দিন দিন নিজ ব্যবসায়ে এমন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন যে ১২৫৯ সালে হাবড়ার একটী "ডক" অর্থাৎ "জাহাজ মেরামতি কারখানা" কিনিলেন। তাঁহার হাতে ঐ ডকটীর অবস্থা দিন দিন ভাল হইতে লাগিল। তাঁহার বিলক্ষণ আয় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি ধনী হইতে লাগিলেন। ক্রমে কলিকাতায় বড় বাজারে একটী বাসনের দোকান করিলেন এবং আরও অনেক দোকানের অংশীদার হইলেন। ক্রমে দশ দিক হইতে টাকা আসিতে লাগিল।

তারকনাথের ধন বাড়িতে লাগিল; সেই সঙ্গে দান শক্তিও প্রকাশ পাইতে লাগিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধন হইলে লোকের ধর্ম্মে মতি থাকে না,কত প্রকার কুপথে মতি হয়, কত কুসঙ্গী যোটে, কত বদ খেয়ালি উপস্থিত হয়, ধনের গরমীতে মন মত্ত হয়। কিন্তু তারকনাথ প্রামাণিকের এ সব দোষ ঘটে নাই। তিনি ধনী হইয়াও ধর্ম্ম-ভীরু ও বিনীত লোক ছিলেন। এটি তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন যে জগদীশ্বর পরোপকারের জন্য ধন দিয়াছেন। এই জন্য তিনি সকল ক্রিয়া কর্ম্মে হাজার হাজার গরিব লোককে দান করিতেন। এমন দিন প্রায় যাইত না যে দিন তাঁহার দ্বারে দলে দলে গরিবলোক অন্ন পাইত না; —প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে ইহাঁর অটল আস্থা ছিল এবং ইহাঁর দান ধ্যান ও সেকেলে লোকের মত ছিল। সকল দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রেই এই উপদেশ দিয়াছে যে গোপনে দান করিবে—নাম কিনিবার ইচ্ছায় দান করিলে সে দানের মূল্য থাকে না; তাহা অতি ছোট কাজ। আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে—"দত্বা ন পরিকীর্ত্তয়েৎ"—দান করিয়া তাহা বলিবে না। খৃষ্টানদিগের বাইবেল পড়িলে দেখা যায় যে—যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেছেন যে "তোমরা যখন দান করিবে, তখন তোমাদের বামহস্ত যেন

জানে না যে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত কি কাজ করিল;" এত গোপনে পরোপকার করিতে হইবে। সকল শাস্ত্রের সকল সাধুর এই উপদেশ। কিন্তু কত লোকে এই মহা উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সুখ্যাতি পাইবার জন্য দান ধ্যান করে; দশজনে প্রশংসা করিবে এই জন্য লোককে দেখাইয়া পরোপকার করে! আবার কতজন একটু লোকের উপকার করিয়া নিজের মুখে দেমাক করিয়া বেড়ায়;—লোকের কাছে বাহাদুরী করে; উপকৃত ব্যক্তি একটু মনের অনভিমত কাজ করিলে তাহাকে লোকের কাছে কৃতঘ্ন বলিয়া নিজের কৃত উপকারকে বাড়াইয়া বলে। আমি এমন করিয়াছি, তেমন করিয়াছি, আমি উহাকে খাইতে পরিতে দিয়াছি, আমি উহাকে রক্ষা করিয়াছি, এই সকল বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা করে। এ সকল ভাল মনের কর্ম্ম নয়; ইহাতে নিকৃষ্ট মনই প্রকাশ পায়। তারকনাথের মন এত নীচ ছিল না। তাঁহার বিনয় এত অধিক ছিল যে, কেহ প্রশংসা করিলে বড় লজ্জা পাইতেন। যখন দান করিতেন, এমন গোপনে করিতেন যে বাড়ীর লোকেও জানিতে পারিত না। কর্ম্মচারিদের হাত দিয়া দান করিলে পাছে তাহারা জানিতে পারে, এজন্য যে কিছু দান করিতেন তাহা প্রায় নিজের হাতে করিতেন। যখন কোন লোক আসিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইত এবং তাহার মনে কিছু দিবার ইচ্ছা হইত তখন তিনি কি দিবেন তাহা মনে মনে স্থির করিতেন, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়াছে তাহাকে কিছু বলিতেন না। গোপনে টাকা লইয়া, তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন, এবং আস্তে আস্তে তাহার হাতখানি পশ্চাৎদিকে লইয়া, টাকাগুলি হাতে গুঁজিয়া দিয়া তাহার হাতখানি মুঠা করিয়া দিতেন ও বলিতেন "যৎকিঞ্চিৎ হইল এখানে দেখিবেন না;" সুতরাং সে ব্যক্তি গণিয়া দেখিতে পারিত না, এবং তাঁহার বাড়ী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেও জানিতে পারিত না যে কত পাইল।

এইরূপে কত লোকে যে তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে, কত লোকে যে তাঁহার অর্থে মানুষ হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার অনেক দানের কথা তাঁহার মৃত্যুর পরে জানিতে পারা গিয়াছে। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্কুলের গরিব ছাত্রদের বেতন দিবার জন্য তাঁহার মাসে ১৫০৲ টাকা ব্যয় হইত। একবার একটী গ্রামে বড় জল কষ্ট হওয়াতে একজন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কত খরচ লাগিবে।" ভদ্রলোকটি একটী পুষ্করিণী খননের খরচের অনুমান করিয়া কয়েক শত টাকার হিসাব দিলেন। তারকনাথ হাসিয়া বলিলেন—"না মহাশয়, আপনি যত টাকা বলিলেন তাহাতে হইবে না। পুকুর কাটিতে এত, ঘাট বাঁধাইতে এত, প্রতিষ্ঠা করিতে এত, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে এত," এই বলিয়া নিজে একটী খরচের আনুমানিক হিসাব করিলেন এবং একদিন লুকাইয়া ভদ্রলোকটীকে সেই সমুদায় টাকা দিলেন।

তাঁহার দান এইরূপ ছিল। আমরা আগেই বলিয়াছি তাঁহার দান সেকেলে লোকের মত ছিল। এরূপ দানের একটা দোষ এই, অনেক দুষ্ট লোক গরিব সাজিয়া ঠকাইয়া লয়, অনেক অলস লোক যাহারা খাটিয়া খাইলে সুখে চালাইতে পারিত, তাহারা ভিক্ষা করিয়া সেই টাকায় বদমায়েসি করে। তারকনাথের দানে এ দোষ যে ঘটিত না এরূপ বলা যায় না। দেশের কত

অভাব আছে, তাহা নিবারণের জন্য কত সভা হইতেছে, সে সকল প্রকাশ্য সভাতে তাঁহার বিশেষ দান ছিল না। পাছে লোকে জানিতে পারে এই ভয়েই বোধ হয় দিতেন না। কিন্তু তিনি সাবধান হইলেও তাঁহার সুখ্যাতি দেশ বিদেশে গিয়াছিল। এমন কি ১৮৭৭ সালের দিল্লী-দরবারের সময় লর্ড লিটন বাহাদুর তাঁহার বদান্যতার সুখ্যাতি করিয়া এক প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের শেষ ৭।৮ বৎসর বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া, কেবল ধর্ম্ম-চিন্তায় সময় যাপন করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল পূজা, আহ্নিক, শাস্ত্রপাঠ, হরি সংকীর্ত্তনে কাল কাটাইতেন; এবং যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের সহিত শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।

এরূপ ধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্য-নিষ্ঠ, বিনয়ী লোক দেশের অলঙ্কার স্বরূপ। সেকেলে লোকদিগের মধ্যে এইরূপ সাধুলোক অনেক পাওয়া যাইত। আমরা নূতন শিক্ষা পাইয়া যদি এই সকল সদ্‌গুণ হারাই, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি? যাঁহার বিদ্যা আছে অথচ অভিমান নাই; ধন আছে অথচ মনে অহঙ্কার নাই; বিষয়-কর্ম্ম আছে অথচ অসত্য ব্যবহার নাই; যাঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ, দুঃখীর প্রতি দয়া, এরূপ ব্যক্তিকে আমরা প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করি।

তারকনাথের আর একটী বড় সদ্‌গুণ ছিল। তিনি অতি উদার ছিলেন। পরের দোষ দেখাইতে ভাল বাসিতেন না। একদিন তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া দুইজন ভদ্রলোক পরের দোষ-গুণের বিষয় বিচার করিতেছিলেন, তিনি বাহির হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়! কোন ব্যক্তির গুণের ভাগ কত, দোষের ভাগ কত, এ বিচার আদালতের বিচারক করিবেন; আমরা যখন পরের কথা কই, তখন তাঁহার গুণের আলোচনা করা ভাল, দোষের আলোচনাতে আমাদের লাভ কি?" প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁহার ভাল ভাব ছিল না, তথাপি তিনি এমনই উদার ছিলেন যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কথা হইলেই বলিতেন,—"আমার ত বোধ হয় তিনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য অপেক্ষা বড় পণ্ডিত ছিলেন। কারণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এক প্রকার শাস্ত্রই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায় সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন।"

এইরূপে সেই সাধু-প্রকৃতি সদাশয় পুরুষ যথাসাধ্য নিজের ও অপরের কল্যাণ-সাধন করিয়া বিগত চৈত্র মাসে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে কলিকাতার ভূষণ-স্বরূপ একটী লোক আমরা হারাইয়াছি। এরূপ সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট লোক যে দেশে অধিক জন্মে সেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়।*

* আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ৺তারকনাথ প্রামাণিকের জীবনের ঘটনাবলী যাহা লেখা হইল তাহা সমুদয়ই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

গাধা-সিংহ।

সে সময়ে গাধাও কথা কহিতে পারিত। সে কত কি ভাবিত; আমাদের অনেকের মত বুদ্ধি করিয়া নূতন ফিকিরে আপনার ঘাস জলের যোগাড় করিত। একদিন গাধা মহাশয় এক চাষার কলাইএর ক্ষেতে কিছু যোগাড়ের আশায় ঢুকিয়াছিলেন। চাষাটা কিছু নির্দ্দয় লোক, সে লাঠি মারিয়া আমাদের গর্দ্দভ-চন্দ্রকে বাহির করিয়া দিল।

দুই এক ঘা চড় চাপড় খাইয়া অনেক ছেলের বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম হইয়া যায়, আমাদের গাধা-রামেরও লাঠি খাইয়া একটা নূতন বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। সে একটা সিংহের চামড়ায় আপনার শরীরটা ঢাকিয়া ফের সেই কলাইএর ক্ষেতে দেখা দিল। চাষা দেখিল একটী সিংহ আসিয়াছে, সে প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। গাধার মজা আর দেখে কে। বিলক্ষণ রকম উদর পূরণ করিয়া গাধারাম পশুদের দলে আসিলেন এবং লাফালাফি, ঝাপাঝাপি করিয়া তিনি যে সিংহ ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। নির্ব্বোধ পশুরা গাধাকে গাধা বলিয়া চিনিতে

পারিল না। ঘোড়া, গরু, মেষ প্রভৃতি যত পশু সকলই দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। অবশেষে এক খেঁকশিয়াল সেইখানে আসিয়া গাধার খুর দেখিয়া এবং তাহার সুমিষ্ট গলার সুর শুনিয়া তাহাকে গাধা বলিয়া চিনিয়া ফেলিল। তখন গাধারামসিংহের সিংহত্ব আর কিছুই রহিল না। সকলেই তাহাকে গাধার মত ব্যবহার করিতে লাগিল।

গল্পটা অনেক কালের; তবে উপদেশটী ভাল। যে গাধা তাহার গাধা থাকাই উচিত। সে যদি সিংহের গুণ না পাইয়া সিংহ সাজিতে যায় তবে তাহার এইরূপই দশ জনের নিকট হাসির পাত্র হইতে হয়। আজ কাল দেখিতে পাই অনেক ছেলে তাহাদের ছেলেত্ব ভুলিয়া গিয়া বুড়োর মত কথা কহিতে ভাল বাসে। যে ৫ম বা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বালক আপনার কতটা বিদ্যা, বুদ্ধি তাহা না বুঝিতে পারিয়া তাহার গুরু জনের মত ধর্ম্মের কথা বা অন্যান্য বড় কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে যায়, সেই ছেলেকে একজন 'গাধা-সিংহ' বলিয়া জানিও। যাহার যতটুকু পুঁজি আমরা তাহার কাছে তত-টুকুই দেখিতে ইচ্ছা করি। আমরা বালকের নিকট এই চাই যে, তিনি পড়া শুনায় যত্নবান্ হইবেন, সৎ এবং লোক-প্রিয় হইবেন, শারীরিক শ্রম করিয়া শরীরকে সুস্থ রাখিবেন এবং পিতা-মাতার বাধ্য হইয়া সুপুত্রের কাজ করিবেন। বালি-কার নিকট এই চাই যে, তিনি নানাবিধ গৃহ-কর্ম্মে সুনিপুণা, সুশীলা ও দয়াবতী, বিদ্যা উপার্জ্জনে যত্নশীলা এবং আত্মীয়-স্বজনের অনুগতা হইবেন। ইহা ছাড়া যদি দেখিতে পাই যে, একটী ছোট ছেলে অথবা মেয়ে এমন সকল কথা বলে অথবা এমন সকল বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করে যাহার কিছুই সে বুঝে না, তাহা হইলেই জানিলাম যে সেই ছেলে অথবা মেয়ে বিগড়িয়া গিয়াছে। সে ছিল গাধা এখন সাজিতে চায় সিংহ।

সত্যের জয়।

বিষ্ণুপুর খাঁটি পাড়া গাঁ। সেখানে রেল নাই, ঘোঁড়ার গাড়ীটী পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। এই ছট্ ফটে গরমের সময় বরফ পাওয়া যায় না, লেমনেড পাওয়া যায় না, কলের জল পর্য্যন্ত নাই। সেখানকার লোককে সহরের লোকে অজ্ পাড়াগেঁয়ে বলে ঠাট্টা করে। কিন্তু তা হলেও তারা আমাদের মত খায় পরে, আমাদের মত কথা বলে, লেখা পড়া শেখে; ঘরে অতিথি এলে আদর করে তাকে খেতে দেয়। রাত্রিতে হঠাৎ যদি কোন পথিক জায়গা না পেয়ে গ্রামের মধ্যে আসে ভদ্র লোকেরা আদর করে তাকে আপনার বাড়ীতে থাকৃতে দেন। তার সঙ্গে আলাপ করেন। পাড়াগাঁয়ের লোকের এই গুণটী খুব। সহরে এটা বড় দেখা যায় না।

বিষ্ণুপুর গ্রাম খানি বড় ছোট নয়। সব-শুদ্ধ হাজার ঘর ভদ্র লোকের বাস। ছোট লোকও প্রায় চার পাঁচ শত ঘর হবে। ভদ্র-লোকদের মধ্যে দামোদর মণ্ডল সবচেয়ে বড়। দামোদর জাতে চাষা। দামোদর নিজে হাতে লাঙ্গল চষে, ব্যবসা করে, মাথায় মোট

করে অনেক টাকা করেছেন। বড় অমায়িক লোক। পরের উপকার করিবার জন্য সদা ব্যস্ত অথচ তাঁর কথা কখনও খবরের কাগজে বাহির হয় না। সদাই হরিনাম করেন। পূজা বা পাঁঠা বলি হয় না কিন্তু দীন দুঃখীদের দেওয়া থোয়া বার মাসই চলে—তার কামাই নাই। গ্রামখানি দামোদরের তালুক। গ্রামের ছোট লোকেরা তাঁর ছেলের মত। বাইরের একখানি ঘরে তিনি বসে থাকেন, আর গাঁয়ের যত ছোট লোক সবাই এসে তাঁর কাছে বসে কথা বলে, নালিশ করে। দামোদরকে তারা বাপের মত দেখে। গ্রামের আর আর বামুন, কায়েত, বৈদ্যদের সঙ্গেও দামোদরের বেশ ভাব আছে। হবেই না বা কেন—যে ভাল হয় তার কেউ শত্রু থাকে না!

দামোদরের একটী ছেলে। ছেলেটী কলিকাতায় এম, এ, পাস করিয়াছেন। বাড়ীতেই থাকেন। তাঁর নাম প্রসন্ন বাবু। প্রসন্ন বাবুর পিতার অনেক টাকা পয়সা; কাজেই তিনি আর চাকরি না করে বাড়ীতেই বাবার বিষয় এবং ব্যবসায় যোগ দিয়ে টাকা রোজগার করেন। ছেলে যা ভাল বোঝেন তাহাই করেন, বাপ কোনও কাজে বাধা দেন না। ছেলেও বাবার মত না নিয়ে কাজ করেন না। ছেলের স্বভাব বাপের মত খুব সৎ। কিন্তু তা হলেও ছেলের একটু খরচ বেড়েছে। দামোদর কাপড় পরেন হাঁটুর নীচে নামে না, কিন্তু প্রসন্ন বাবুর রেলীর উনপঞ্চাশ দরকার হয়। কর্ত্তার গায়ে জামা প্রায়ই থাকে না,কেবল কাঁধে একখানি দশ আনা দামের বিলাতি উড়ানি; কিন্তু ছেলের গায়ে জামা, ফরেসডাঙ্গার উড়ানি। প্রসন্ন বাবু বাবাকে ভাল কাপড় চোপড় পরতে খুব অনুরোধ করেন, কিন্তু কর্ত্তা বলেন "আর বাবা! আমার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন তুমি ভাল পর। আমি এই রকম করে কাল কাটিয়ে দিই। বরং আমাকে যে ভাল কাপড় দেবে সে কোনও গরিবকে দাও।"

প্রসন্ন বাবুর এখন নজর বড় হয়েছিল! তিনি গাঁয়ের ভিতর একটি বেশ পরিষ্কার পথ করে দিলেন। একটি ছোট খাট ইংরেজি-বাঙ্গলা স্কুল করিলেন। একটী ছোট ডাক্তার আনিয়ে ডাক্তারখানা করিলেন। একটী ডাকবাক্স বসাইলেন। এ সকল বাপের পরামর্শে। গ্রামের লোক বড় খুসী। বামুন গুলো দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে লাগ্‌লো।

যাক্ আমরা এতক্ষণ অপর কথা বলিলাম। এখন আসল কথা বলা যাক্। আগেই বলেছি বিষ্ণুপুরে প্রায় চার পাঁচশ ঘর ছোট লোকের বাস। এদের মধ্যে চাঁড়ালই বেশী। গদা চাঁড়াল (চণ্ডাল) তাদের মধ্যে একজন। গদা প্রসন্ন বাবুর বাপের সখের পাইক। গদাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তোমার নাম কি? গদা বুক ফুলিয়ে বলে "আমার নাম গদাধর সদ্দার!" কিন্তু আমরা কি করব, বুড় কর্ত্তা দামোদর ঘোষ তাকে "গদা" বলেই ডাকেন। আমরা তাঁর কাছেই শিখেছি। যদিও গদা নামটা শুন্‌তে খারাপ লাগে তবু "গদা" বলে ডাক্‌লেই গদাধর অমনি "আজ্ঞে" বলে উত্তর দেয়।

গদার গড়ন খুব মোটা সোঁটা—খুব মজবুত। মাথা খুব বড়—মাথায় এক মাথা বাউরি চুল—তেলে মাথাটী কুচ্‌কুচে। খুব কোঁকড়া চুল। গদা ভারী চুলের গরব করে। রং মুস্‌কো কালো। অন্ধকার রাত্রিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। গাঁয়ের ভদ্রলোকের ঘরের বুড়ীরা বলেন "বাপরে গদার

গড়ন ত নয়—যেন যমের দূত!” গদা লম্বায় ঝাড়া চার হাত। দাঁতে মিসি লাগান। সাম্নের উপরে দুটী দাঁতে ভোম্‌রার দাগ কাটা। এই হল গদার চেহারা।

গদা খুব লাঠিয়াল—সে দেশে তার মতন লাঠি খেলোয়াড় দেখা যেত না। সবাই তাকে “ওস্তাদ” বল্‌ত। সে কিন্তু লোক ভাল নয়। বুড় মনিব দামোদর ঘোষের খুব সখের চাকর হলেও গদাধর ডাকাত। মনিবের খুব বিশ্বাসী। গদা বল্‌ত “আমি যতদিন থাক্‌ব মনিবের এক-গাছি কুট চুরি যাবে না।” কথাটাও খুব সত্য। গদা মনিবের খুব বিশ্বাসী, কিন্তু সে ডাকাতি করে। সে বৈশেখ, জষ্টি মাসের অন্ধকার রাত্রিতে চুপি চুপি কোথায় চলে যেত, আবার রাত্রিতেই আস্‌ত। কর্ত্তা বুঝ্‌তে পার্ত্তেন,—তাই অনেক বোঝাতেন কিন্তু তবু ডাকাতি করা ছাড়্‌তে পার্ত্ত না। প্রসন্ন বাবু কিছু জানিতেন না, আর কেহই জানিতে পারিত না। কিন্তু কর্ত্তা গদার জন্য বড়ই ভাবেন। ভাল করে খান না, কথা বলেন না। প্রাণে যেন কেমন একটা খুঁৎ খুঁতুনি ধরে গেল। এদিকে ক্রমাগত গদাকে বলেন, বোঝান। গদার একটা গুণ ছিল, গদা খুব সরল। কর্ত্তা যখন তাকে সব বল্‌তেন, সে বলিত “আমার খুব ইচ্ছা হয় যে ভাল হই, কিন্তু কেমন আমার খেলারোগ, আমি ডাকাতি করে কিছু নিই না; কেবল যাই খেলাবার জন্যে।” কর্ত্তা বড়ই ত দুঃখিত হলেন। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে বলিলেন “গদা আমি তোকে বড় ভাল বাসি, তোকে আমি হয় ভাল কর্‌ব, না হয় আমি নিজে মর্‌ব!” কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে গদা কথা শুনে চম্‌কে উঠিল। তখন সে বলিল“আপনি আমাকে কি কর্‌তে বলেন বলুন, কিন্তু আমি বোধ হয় ভাল হতে পার্‌ব না!” কর্ত্তা অনেক ভেবে চিন্তে বলিলেন “তুই ডাকাতি কর্, কিন্তু কোনও জিনিস নিবি না, আর সকলের কাছে সত্য কথা বল্‌বি।” গদা এই কথা শুনে বড়ই খুসী হয়ে বলে উঠিল “এই হলেইত আপনি রাজী।” কর্ত্তা বলিলেন “হাঁ”। গদা মনে মনে খুব খুসী হইল। সে মনে করিলে “জিনিস ত নিই না—তবে সত্যি কথা বল্‌ব, তা আমি ত ডাকাত বলে আর কেউ জানে না, এক মনিবরা জানেন। গাঁয়ের লোক জানেও না, তারা আমাকে জিজ্ঞাসাও কর্‌বে না।” এই ভাবিয়া গদা একদিন লাঠি ঘাড়ে করে রাত্রিতে যাইতেছে এমন সময় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল “কি গদাধর এত রাত্রিতে কোথায় যাও?” গদা এখন বিষম মুস্কিলে পড়িল, মিথ্যা কথাও বলিতে পারে না,সত্য বলাও মুস্কিল,কাজেই ফিরে আস্‌তে হল। এইরূপ আরও দুই এক দিন হ’ল, তখন দেখিল এক সত্য বল্‌তে গিয়েই সে ধরা পড়ে গিয়েছে। গদা এখন থেকে ডাকাতি ছাড়িল।

বুড় কর্ত্তা কেমন চতুর! এক সত্য কথা বলিতে শিখাইয়া গদার চির অভ্যস্ত ডাকাতি ছাড়াইয়া দিলেন।

সত্য কথা সমুদয় সৎকার্য্যের মূল। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে শিখিলেই কোন প্রকার অসৎ কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

স্থানাভাবে এবারে গত বারের ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা দেওয়া গেল না।

জুন, ১৮৮৫।

ঠাকুরদাদার গল্প।

আগ্নেয়গিরি।

মাস খানেক পরে একদিন নবীন বাবু ও তাঁহার বালকগণ আবার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। তথায় বসিয়া নানা বিষয়ে কথা-বার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময়ে একজন লোক কতকগুলি তুবড়ী-বাজী লইয়া উপস্থিত হইল ও বলিল "বাবু! খুব ভাল তুবড়ী নেবেন্? আট পয়সা ক'রে একটা।" নলিন চন্দ্র ক্ষেপে দাঁড়ালেন—চারিটা চাই। তুবড়ী চারিটা কেনা হইল। ফেরীওয়ালা চলিয়া গেলে নবীন বাবু বলিলেন "এই তুবড়ীতে যখন আগুণ দেওয়া হয় তখন কি রকম হয় বল দেখি, নলিন?" নলিন অমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা তুবড়ী লইয়া মাটিতে রাখিল, হাতে একটা বড় গোছের কঞ্চি লইয়া যেরূপ ভাব ভঙ্গী করিয়া আগুণ দিবার মত করিল, দেখিয়া সকলের মহা হাসি পড়িয়া গেল। হাসি থামিলে নলিন বাবু বলিতে লাগিলেন "এই—যখন—এই রকম করে—আগুণ দেব,—তখন অমনি ফুর ফুর—ফুর ফুর ক'রে সব বেরবে, আর কেমন মজা হবে!!" সকলে নলিনের আনন্দ দেখে খুসী হইলেন। নবীন বাবু তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে পার বল দেখি, প্রকৃতির স্বাভাবিক তুবড়ী-বাজী কোথায় হয়?" কিশোরী বলিল "আমরা বইতে পড়িয়াছি আগ্নেয়গিরিতে হয়।" নলিন বলিয়া উঠিল "তবে আমি সে আগ্নেয়গিরি কিন্‌বো?" —এই সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠিলেন।—তখন সে চারিদিক চেয়ে ঠাকুরদাদার হাত ধ'রে বলিল "না দাদা তবে সে কি রকম আমায় বুঝায়ে দিতে হবে।"

নবীন বাবু আরম্ভ করিলেন। "বহু দিন হইল আমি তোমাদের পর্ব্বতের কথা বলিয়াছিলাম। আগ্নেয়গিরি এক রকম পর্ব্বত, তবে পর্ব্বত অপেক্ষা ছোট, তাহাকে বরং পাহাড় বলা যায়। অনেক রকমের আগ্নেয়গিরি দেখা যায়, পর্ব্বতের গায়ে, বা আলাদা, দ্বীপে বা সমুদ্রের জলের ভিতর। সাধারণতঃ তাহারা প্রায়ই অধিক উচ্চ হয় না। কাস্পিয়ান সাগরের চারিদিকে যে সকল আগ্নেয়গিরি দেখা যায় তাহারা দেখিতে অতি ছোট, এমন কি সামান্য উচ্চ ঢিবি করা কাদা মনে হয়। আবার ওদিকে আণ্ডিস পর্ব্বতের মধ্যে কটোপাক্সী নামক গিরি ১৮,৮৮৭ ফুট অর্থাৎ ৩½ সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী উচ্চ। ইহাদের আকার

প্রায়ই গোল হইয়া থাকে। দেখিতে ঠিক তুবড়ীরই মতন। (ছবি দেখ।) তাহার চূড়ার উপরে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর থাকে, এবং ঐ গহ্বরের তলা হইতে পৃথিবীর গর্ভ পর্য্যন্ত একটী ভয়ানক নল থাকে।"

গণেন্দ্র—"হাঁ আমরা পড়িয়াছি ঐ গহ্বরের নাম crater ক্রেটার আর ঐ নলের নাম shaft সাফ্‌ট। নয়?"

নবীন বাবু বলিলেন—"ঠিক কথা। নলের ভিতর হইতে জলন্ত রক্তবর্ণের আভা বাহির হয়; ঐ আলো প্রায় সর্ব্বদাই আগ্নেয় পর্ব্বতের চূড়ার উপর দেখা যায়। আর ঐ নল দিয়া সর্ব্বক্ষণ এঞ্জিনের মত ধূঁয়া বাহির হইতে দেখা যায়। কাজেই, ভিতরে যার এমন ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড দিন রাত গম গম কর্‌ছে, তার উপর দিয়া ধূম বা আলো যে বাহির হবে এ আশ্চর্য্য কি?"

মন্মথ—"ওঃ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! আচ্ছা, দাদাবাবু! সেখানে কেও যেতে পারে?"

নবীন বাবু—"পারে বৈ কি? আমার এক বন্ধু তিনবার বিখ্যাত ভিসুভিয়স্‌ নামক আগ্নেয়গিরি দেখিতে যান। তিনি বলেন প্রথমতঃ পাহাড়ের তলায় বেশ সুন্দর গাছ ও দ্রাক্ষালতার ঝোপ, তাহার মধ্যে ছোট ছোট কুটীর সকল অতিশয় শোভা করিয়া থাকে। তাহার উপর ক্রমে ছোট ছোট গাছপালা; ক্রমে আর গাছ নাই, কেবলই পাহাড়, তাহার মধ্য দিয়া চলিতে হয়। ক্রমে একটু একটু গরম টের পাওয়া যায়। শেষে যত শিখর দেশের নিকট উঠা যায় ততই ভয়ানক। সেখানে মাঝে মাঝে এক একটা ফাটল আছে; ঐ ফাটলের ভিতর দিয়া ভিতরের জলন্ত গলা পাথর প্রভৃতি দেখা যায়, দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া যায়। আর গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। তার পর চূড়াতে পঁহুছিলে যে মনে কি হয়, সে আর কি বলা যায়? তিনি বলিতেন—'সেখানকার দৃশ্য আর কি বলিব? উপরে অন্ধকার করিয়া রাশি রাশি ধূম উঠিতেছে আর সেই অত্যুচ্চ শিখরে আমি বসিয়া যখন মুখ হেঁট করিয়া গহ্বরের দিকে চাহিলাম, দেখি সে বর্ণনা করা অসম্ভব,—ভীষণ অগ্নিময় সমুদ্র যেন গর্জ্জন করিতেছে। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, বুক ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। বুঝি বা পায়ের নীচের ছাত ভাঙ্গিয়া যায়। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! সেই অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইতে হইবে।

ভয়ে নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দৃশ্যটী এমনি গম্ভীর ও মনোহর যে সে চমৎকার স্থান ছাড়িয়া আসিতেও ইচ্ছা হয় না।' আরও কত কথা যে তিনি বলিয়াছিলেন তা সব বলিতে গেলে রাত ফুরাইয়া যাইবে।"

কিশোরী—"কে তিনি, দাদা?"

নবীন বাবু—"তোমরা জান না।"

নলিন—"আমি যখন বড় হব, আমি সেই স্থানটা দেখ্‌তে যাব।"

নবীন বাবু—"হাঁ এই ত চাই। নিজে নিজে দেখে শিখ্‌বে। আমরা বুড়ো হয়েছি আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা খুব লেখা পড়া শিখে নানা দেশ বেড়াবে, কত কি শিক্ষা করিবে ও জ্ঞান বাড়াইয়া বড় লোক হইবে। এখন, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখের বর্ণনা কেবল শুনিয়া রাখ।"

আগ্নেয়গিরি যত পুরাতন হয়, আর যত বার তাহার অগ্ন্যুদ্গম হয় ততই তাহার আকার নূতন হইতে থাকে। ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের ঠিক এইরূপ হইয়াছে। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী চূড়া, তাহার চারিদিকে আর একটী পুরাতন চূড়ার ভাঙ্গা খানিকটা দেখা যায়, তাহার চারিদিকে আবার একটা আরও পুরাতন চূড়ার ভাঙ্গা অংশ দেখা যায়। এরূপ হওয়ার কারণ তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। যেমন বেশী তেজ হইলে এক একটা তুব্‌ড়ী ফাটিয়া যায়, তেমনি ভিতরে আগুণের তেজ বেশী হইয়া প্রতি অগ্ন্যুদ্গমের সময়ে পুরাতন চূড়া উড়িয়া যায় ও তাহার উপর আবার গলা পাথর প্রভৃতি পড়িয়া নূতন একটা চূড়া প্রস্তুত হয়।"

অমূল্য—"আগ্নেয় পর্ব্বত ত এক রকম বুঝিলাম; উহার অগ্ন্যুদ্গম কিরূপে হয়, দাদা বাবু?"

নবীন বাবু—"ওঃ! সে বড় ভয়ানক ব্যাপার! না দেখিলে তার কিছুই জ্ঞান হয় না, কিছুই ধারণা করা যায় না। দেখাও সহজ নয়। তবে যাঁহারা প্রাণপণ করিয়াও জ্ঞান লাভের জন্য এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখিতে সুবিধা পান, তাঁহাদের বর্ণনা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পাইতে পারিবে। কোথাও কিছু নাই,—হঠাৎ হয়ত এক দিন দূরে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শোনা যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প হইতে থাকে। তখনি লোকে বুঝিয়া লয় যে একটা ভয়ানক ব্যাপার শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। কাজেই যে যেখানে পায় সব ধন কড়ি, বন্ধু বান্ধব সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ঐ বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্প আরও প্রবল হইয়া উঠে, এবং পর্ব্বতের চূড়া হইতেও ভীষণ শব্দ হইতে থাকে। শেষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘের মত রাশি রাশি বাষ্প উঠিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলে। ভলকে ভলকে তেজের সহিত বাষ্প সকল খুব দূর পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে থাকে। তাহাতে কখন কখন অবিরল বৃষ্টি পতিত হইতেও দেখা যায়। এই সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার আকারের প্রস্তর খণ্ড সমূহ প্রচণ্ড বেগে আকাশে উঠিতে থাকে। শুনা যায় যে পূর্ব্বোক্ত কটোপাক্সী পর্ব্বত হইতে ৫,৪০০ মণ ওজনের একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই (শুনিলে অবাক্ হইবে) ৯ নয় মাইল অর্থাৎ ৪৷৷০ সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িয়াছিল!! তোমরা পাঁচ সের গোলা একটা তুলিয়া দশ হাত দূরে ছুড়িয়া দিতে পার না, আর ৫,৪০০ পাঁচ হাজার চারি শত মণ ভারী একটা পাথর কি না, সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে ছুড়িয়া দিল! (সকলেই খুব আশ্চর্য্য হইয়া শিহরিয়া উঠিল।)

"এই সময়ে এত ভস্মরাশি গহ্বরের মুখ দিয়া আকাশে উঠিতে থাকে যে একেবারে সূর্য্যকে ঢাকিয়া দশদিক অন্ধকার করিয়া ফেলে। এমন কি ৭।৮ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত চারিদিকে অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকার করিয়া ঐ সকল আগ্নেয় ধূলি রাশি (ইংরাজিতে volcanic dust বা sand বলে) আকাশকে ছাইয়া ফেলে এবং কখন কখন ১০০।১৫০ ক্রোশ দূরে পর্য্যন্ত গিয়া অবিরল বৃষ্টিপাতের ন্যায় পতিত হইতে দেখা যায়। ইহা কিন্তু ধূলি বা ভস্ম কিছুই নয়। ভিতরে যে দ্রব (অর্থাৎ গলা) প্রস্তর ও ধাতু সকল রহিয়াছিল, তাহাই বেগে উপর দিকে উঠিয়া বায়ুতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ি গুঁড়ি ছাইয়ের কণার মত পড়ে, এই জন্য ইহাকে কখন ভস্ম কখন বা আগ্নেয় ধূলি বলা হয়। ইহা দ্বারা ভয়ানক অনিষ্ট হয়। সমুদ্রের ধারেই প্রায় আগ্নেয় গিরিরা থাকে; কাজেই ঐ ধূলি সব সমুদ্রে পড়িয়া এত জমা হয় যে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া যায়।

"আর তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান নেপল্‌স্ দেশীয় হার্কিউলেনীয়াম্, পম্পীয়াই ও ষ্টাবী নামক তিনটী নগর এই আগ্নেয় ধূলিরাশির মধ্যে একেবারে পুতিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।"

কিশোরী—"আমি পড়িয়াছি।"

মন্মথ—"আমিও শুনিয়াছি।"

সলিম—"আমি ত জানিনা?"

নবীন বাবু—"প্রায় দুই হাজার বছর পূর্ব্বে ভিসুভিয়স পর্ব্বত এখনকার মত ছিল না, তখন উহা শান্তভাবে ছিল, কোনও উৎপাতের চিহ্ন মাত্র ছিল না। হঠাৎ ৬৩ খৃষ্টাব্দে একবার ভূমিকম্প দেখা দিল, ও তার পর ১৬ বছর ক্রমাগত মাঝে মাঝে ঐ রকম ভূমিকম্পই হইত। শেষে ৭৯ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ বছর গত হইল) ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হয়। সেই ঘটনার সময়ে এত ভস্ম বাহির হইয়াছিল যে, পর্ব্বতের চারিদিকের দেশ সমূহে প্রায় ২০ হাত উচ্চ হইয়া উহা চাপা দিয়াছিল। এই ভয়ানক ভস্মপাতেই পূর্ব্বোক্ত তিনটি নগর একেবারে চাপা পড়িয়া বহুকালের মত পুতিয়া গিয়াছিল এবং প্রায় ১৬০০ ষোল শত বছর এই ভস্মস্তূপের ভিতরে লুকাইয়া ছিল। সেদিন তাহাদের কোন কোন স্থানের খানিক খানিক অংশ উপরের চাপ খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে।

"তা ছাড়া আরও ভয়ানক কাণ্ড সকল ঘটিয়া থাকে। হঠাৎ হয়ত সমুদ্রের জল খুব খানিক দূর সরিয়া গেল, তারই পরে আবার ভীষণ বেগে পর্ব্বতের মত উচ্চ হইয়া দেশ নগর, ঘর বাড়ী,—সব ডুবাইয়া বন্যা করিয়া ফেলিল। এইরূপে নানা প্রকার ভয়াবহ উৎপাত হইয়া থাকে।"

গণেন্দ্র—"ওঃ! আমার গা কাঁপ্‌ছে, বোধ হচ্ছে যেন প্রলয় কাল উপস্থিত, আর সব সৃষ্টি যেন ধ্বংস হতে বসেছে!"

নবীন বাবু—"ঠিক সেই রকমই বটে। আমি তোমাদের কি বা বলিলাম? বড় হয়ে যখন এ বিষয়ের ভাল বর্ণনা পড়িবে তখন ভয়ে আর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিবে এ কি কাণ্ড!! যথার্থই যেন মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। জগতে এমন ভয়ানক ব্যাপার আর কিছুই নাই। পৃথিবীর যেন স্নেহ মমতা কিছুই নাই, ঘোর নিষ্ঠুর, ঘোর উন্মত্ত, জ্ঞানশূন্য! কত যত্নে সে সব গাছ লতা গুলিকে রস দিয়ে এতদিন বাঁচাইতে ছিল ও বড় করিতে ছিল, তাদের কোথায় যে কে গেল তার সন্ধান নাই! এক একটা দুরন্ত ছেলে যেমন রাগ করে ঘর দোর, ঘটী বাটী, শ্লেট বই,

ছবি গহনা, যা সুমুখে পায় ভেঙ্গে চুরে লণ্ড ভণ্ড করে, আর চীৎকারে বাড়ী ফাটাইতে থাকে, এ সময়ে পৃথিবী যেন সেই রকম করে। ওঃ! কি ভয়ানক! এদিকে ভূমিকম্প হচ্ছে, তাহাতে আবার বজ্রাঘাতের মত শব্দে আকাশ যেন ফেটে যাচ্ছে, সমুদ্র উথলে উঠছে, ওদিকে আকাশে ঘোর অন্ধকার, ভস্মে একেবারে আকাশ ঢেকে ফেলেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই গুলা হুড় মূড় ক'রে এখানে ওখানে পড়্ছে, ক্রমে ভস্ম-রাশি ঘর বাড়ী, গাছপালা, পথ ঘাট, জল স্থল, দেশ নগর—সব ছেয়ে ফেল্ছে, পাহাড় কোথাও পৃথিবী কাঁপাইয়া ফেটে যাচ্ছে, কোথাও ভিতরের তেজে খানিকটা উড়ে যাচ্ছে!! পশু পক্ষী কে কোথায় পড়িয়া মরিতেছে তাহার ত সন্ধান নাই, থাকিতে পারেই না—মানুষই যে কে কোথায় পলাইল, কোথায় মরিল, কি কাণ্ড কিছুরই ঠিক নাই! কেবলই অন্ধকার আর বজ্রধ্বনি আর ধ্বংস!—এইত প্রলয়!

ক্রমশঃ

সাধুদিগকে কিসে চেনা যায়?
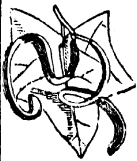
লে বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ, কার না ইচ্ছা করে খুব ভাল হইয়া জীবন কাটায়? ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু নানা কারণে উহা কাহারো ভিতরে বেশী, কাহারো ভিতরে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্যকাল হইতেই যাঁহারা সাধু লোকের গল্প শোনেন, সাধু লোকের কাজ সব মনোযোগ দিয়ে দেখেন, ভাল ভাল লোকের জীবন-চরিত পড়েন, সচ্চরিত্র বালক বালিকাদের সঙ্গে ফেরেন এবং পিতা মাতার অনুগত হইয়া চলেন, তাঁহাদের ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। আর যাহারা ছেলে বেলা হইতেই দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গুরুজন এবং মান্যগণ্য লোকদিগকে নিন্দা করিতে শেখে, খারাপ খারাপ বিষয় লইয়া আমোদ করিতে অভ্যাস করে এবং সব ইয়ার ছেলে গুলোর মত মোটামুটি একটু লেখা পড়া শিখিয়া সকল বিষয়ের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, কোনকালেই তাহাদের ভাল হইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিবে না। ভাল হইবার অর্থটা তোমরা গোল করিও না। আমি যদি বড় হইবার কথা বলিতাম তবে গোলেরই কথা ছিল বটে, কারণ তুমি যাঁহাকে বড় লোক বলিবে হয় ত আমার চোখে আমি তাঁহাকে এক সাধারণ লোক বলিয়া জ্ঞান করিব। এক হাজার লোকের মধ্যে আমায় ছাড়িয়া দেও আমি তাহার মধ্য হইতে যিনি যিনি সাধু লোক আছেন তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাহির করিতে পারিব। এক বাড়ী নিমন্ত্রণে এক শত লোক এক স্থানে বসিয়া আহার করিতেছেন আমি তাহার মধ্যে যিনি সাধু তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেছি।

সাধু লোকের চাল চলন কথা বার্ত্তা, মুখের হাসি এবং চোখের চাউনি, সকলই একটু ভিন্ন রকম। কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা সকল দেশের সকল কালের সাধুগণের মধ্যেই সমান। সাধুদের অনেক লক্ষণ আছে; তন্মধ্যে যেগুলি

আমরা সাধু চরিত্র হইতে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি। পৃথিবীতে যত সাধু জন্মিয়াছেন তাঁহাদের সকলের জীবনের ভিতরে ঢুকিয়া দেখ **বিশ্বাসই** তাঁহাদের সকল কাজের মূল। তুমি যদি একটী কাজ করিতে ইচ্ছা কর তবে আগেই ভাবিবে একাজ করিলে তোমায় কে কি বলিবে। হয় ত যদি সেই কাজ করিলে একটু ক্লেশ সহ্য করিতে হয় কিম্বা কেহ গালি দেয় কি মারিতে আইসে তবে আর তোমার পা চলিবে না। অথবা একবার যদি সেই রকমের একটী কাজ তোমার সমবয়স্ক আর কেহ চেষ্টা করিয়া না পারিয়া থাকে তবে তোমার আশা হইবে না, নিজের উপরে বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না। বাল্যকাল হইতেই প্রত্যেক সাধুর জীবনে খুব বিশ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা অনেকেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নাম শুনিয়াছ। আমাদের দেশে কুরীতি সকল যাহাতে সংশোধন হয় তাহার জন্য তিনি ১৬ বৎসর বয়সের সময় হইতেই বিশ্বাস করিয়া চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। অনেক বৎসর পরে যখন চারিদিকেই ধর্ম্মের গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, যখন শিক্ষিত লোকেরা রাজা রামমোহনের প্রচারিত মত সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন পুরাতন দলের লোকেরা চারিদিক হইতে রাজাকে উৎপীড়ন করিতে ছাড়িলেন না, রাজা কত অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বিশ্বাসের সহিত নিজের ঠিক্ মত প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজা রামমোহন রায় তখন বলিয়াছিলেন—"আজ যাঁহারা আমাকে শত্রু ভাবিয়া অত্যাচার করিতেছেন **এমন এক দিন** আসিবে যখন তাঁহাদেরই পুত্র পৌত্রেরা যথার্থ বান্ধব বলিয়া আমায় স্মরণ করিবে।" সেই **এমন এক দিনের** আগমনের উপরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি অত অত্যাচার সহ্য করিয়াও ভয়ে পেছন নাই। সত্য সত্যই সেই **এমন এক দিন** আসিয়াছে। এখন বুড়ো বুড়ীদের কথা দূরে থাকুক, তোমাদের ন্যায় ছেলে মেয়েরাও রামমোহন রায়ের গল্প শুনিতে কত ভাল বাসেন। এখন শিক্ষিত লোকেরা প্রতি বৎসরই সভা করিয়া রামমোহন রায়কে **স্মরণ** করিয়া থাকেন। এইখানেই দেখ সাধুতার লক্ষণ বিশ্বাস, এবং বিশ্বাসের পুরস্কার জয়।

সত্যের প্রতি খুব আন্তরিক শ্রদ্ধা সাধুতার আর একটী লক্ষণ। মিথ্যা কথা ত সাধুরা প্রাণ গেলেও কহিবেন না, সত্যের যেখানে অপলাপ হইতেছে অর্থাৎ খাঁটি ভাব, খাঁটি মত প্রকাশ না পাইয়া মিথ্যা ভাব, অসত্য মত প্রকাশিত হইতেছে সেখানে সাধু লোকেরা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। এই বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। তোমরা তোমাদের সখাতেই শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বিষয় শুনিয়াছ। একবার রামতনু বাবুর বন্ধু মৃত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় রামতনু বাবু বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত ছোট লাট সাহেবের দরবারে যাইতে পারিয়াছিলেন। সেই দরবারে অনেক বড় বড় বাঙ্গালী বাবুদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। রামতনু বাবু তখন এক জন সামান্য স্কুলের মাষ্টার বই ত নন? সুতরাং সেখানে রামতনু বাবুই বোধ হয় আর আর সকলের চেয়ে মান সম্ভ্রমে এবং পদমর্য্যাদায় অনেক নীচু ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা রাজা মহারাজা ও খুব বড় বড় লোক তাঁহাদের সঙ্গেই ছোট লাটের আমাদের দেশ সম্বন্ধে নানা কথা

হইতেছিল, তখন কথা বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে আহারাদিও চলিতেছিল। এই কথাবার্ত্তার মধ্যে ছোট লাট বাহাদুর কোন এক বিষয়ে এমন একটী মত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যাহা রামতনু বাবুর নিকটে খুব অসঙ্গত বোধ হইল। রামতনু বাবু আশা করিয়াছিলেন যে, বড় লোকদের মধ্য হইতেই কেহ লাট সাহেবের ভুল দেখাইয়া দিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সকলেই চুপ করিয়া সাহেবের কথা শুনিতে লাগিলেন, তখন আর রামতনু বাবু চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সাহসের সহিত লাট সাহেবকে তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিলেন। লাট সাহেব খাইতেছিলেন, হাতের চামচা কাঁটা মেজের উপরে রাখিয়া রামতনু বাবুর কথা শুনিতে লাগিলেন। রামতনু বাবুর কথা শেষ হইলে পরে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া খুব আগ্রহের সহিত ছোট লাট রামতনু বাবুকে কাছে লইয়া আবার আহার করিতে লাগিলেন এবং রামতনু বাবুও আহার করিতে বসিলেন। তৎপরেও ছোট লাট রামতনু বাবুর বন্ধু সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের নিকটে রামতনু বাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই খানেই দেখ সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও তাহার আশ্চর্য্য পুরস্কার। ছোট লাটের মুখে মুখে তাঁহার মতবিরুদ্ধে কথা কহা কি যার তার কাজ? তাই সকলেই চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের অনুরোধে যিনি বলিতে সাহস করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার সাধুতার পুরস্কার পাইলেন।

কৃতজ্ঞতা সাধুদের জীবনের একটী ভূষণ। তুমি সাধুদের মধ্যে যেমন কৃতজ্ঞতার ভাব দেখিতে পাইবে এমন আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। তাঁহারা মরিবেন তাহাও স্বীকার, তবু উপকারী ব্যক্তির মনে ক্লেশ দিবেন না, উপকারীর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া আপনার সুবিধা খুঁজিবেন না। এ বিষয়ে তোমাদিগকে আর এক জন বড়লোকের জীবনের একটা ঘটনা বলিতেছি। আমাদের দেশের এক জন সুবিখ্যাত ডাক্তার যখন পৃষ্ঠাঘাত রোগে মৃত্যু-শয্যায়, তখন ইঁহার পরম বন্ধু আর একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ইঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। সেই ডাক্তার তাঁহার ব্যারামের খুব খারাপ অবস্থায়, এমন কি যখন অন্যান্য ডাক্তারেরা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন তখনও প্রাণপণে চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু একটু ভাল দেখিয়া মনে করিলেন হয়ত অন্য ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইলে আরোগ্য হইবেন। কিন্তু যখন রোগীর বন্ধুরা তাঁহাকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি এই মতে উত্তর করিলেন—"যিনি আমার চিকিৎসা করিতেছেন তিনি আমার অতি দুঃসময়ের বন্ধু, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আর কাহারো হাতে প্রাণ দিতে পারিব না!" সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইল বটে কিন্তু তবু তিনি তাঁহার উপকারী সুবিজ্ঞ ডাক্তার বন্ধুকে পরিত্যাগ করিলেন না।

সাধুলোকের বুঝি ভালবাসা মরিলেও যায় না। তুমি আজ সতীশকে অথবা তোমার ছোট বোন স্বর্ণকে কত ভাল বাসিতেছ, কত প্রাণের কথা কহিতেছ, একত্রে খাইয়া শুইয়া, বেড়াইয়া চেড়াইয়া কত সুখ পাইতেছ, দুই বছর বাদে হয়ত সতীশ তোমার চেয়ে আর একজনকে বেশী ভাল বাসিতে পারে, স্বর্ণ হয়ত তোমার সঙ্গে আর খাইতে শুইতে, চলিতে ফিরিতে ভালবাসে না, অত গোলে কাজ কি, তোমাকে দেখিতেও চায় না। তুমি কি বলিতে পার আজও তুমি তাহাদিগকে যেমন ভাল বাসিতেছ তখনও তেমনি

বাসিবে? সাধুলোকেরা কিন্তু ছোট বেলা থেকে তাহাই করেন। তাঁহারা এক দিন যাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন চিরদিনই তাঁহাকে ভাল বাসিবেন। তাঁহাদের বন্ধু যদি দুশ্চরিত্র হন তবুও তাঁহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিবেন না; বরং যাহাতে বন্ধুকে ভাল করিতে পারেন তাহার জন্যই সর্ব্বদা বন্ধুর হাতে পায় ধরিয়া চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাহাকে লোকেরা খারাপ বলিয়া জানে এমন লোককেও শুধরাইবার জন্য তাঁহারা কত চেষ্টা করেন, মানুষকে ভাল না বাসিলে কখনও তাহাকে শুধরাইবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা হয় না।

ক্ষমাগুণ সাধুতার একটী প্রধান লক্ষণ। এই ক্ষমাগুণ আছে বলিয়াই সাধুলোকের সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পারা যায়। অন্য লোকের সঙ্গে যখন কথা কহিতে হয় তখন যেন কেমন ভয়ে কথা বাহির হয় না, প্রাণ খোলে না, মুখও ভাল ফুটে না। পাছে এমন কিছু বলিয়া ফেলি যাহাতে তিনি চটিয়া বসেন, আমায় গালি দেন, বা মারিতে পারেন এই ভয়েই প্রাণ কাঁপিতে থাকে। কিন্তু ভাই সাধুলোককে দেখিতেও যেমন ভয় করে না তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেও তেমন কোন সঙ্কোচ হয় না—মনে যাহা আইসে তাহাই বলিয়া ফেলি। কেন না মনে বিশ্বাস থাকে তিনি হাজার দোষ দেখিলেও ক্ষমা করিবেন।

যে লক্ষণটী দেখিলে নিশ্চয়ই সাধু বলিয়া মানিতে হইবে এখন সেই লক্ষণটী দেখাইয়া শেষ করিব। প্রকৃত সাধুতায় লোককে এমনই বিনয়ী করে যে পঞ্চাশ বছরের বুড়োকেও ঠিক দশ বছরের ছেলের ন্যায় করিয়া দেয়। তুমি বার বছরের ছেলে যাইয়া একজন সাধু লোককে দুটো ভাল কথা কও, তিনি তোমার কথাও যেমন আগ্রহের সহিত শুনিবেন একজন গণ্য মান্য পণ্ডিতের কথাও ঠিক সেইরূপ ভাবেই শুনিবেন। সাধুদের শ্রদ্ধা ছোট বড় সকলের প্রতিই সমান এবং ছোট বড় সকলের নিকটেই যে বিনীত হইলে সত্য শিক্ষা করা যায় এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই তাঁহারা বড়। সাধুদের মহৎগুণ যে, তাঁহারা বড় হইয়াও সকলের নিকটে ছোট হইতে চান, অনেক জানিয়া শুনিয়াও নিজেরা বিশ্বাস করেন যে কিছুই জানেন না, স্বাধীন হইয়াও পরের অনুগত হইয়া চলিতে চান, নিজে উচু হইয়াও নীচু লোকের সেবা করিতে চান এবং নিজে অবমানিত হইয়াও পরকে মানী করিতে ভাল বাসেন। পাঠক পাঠিকাগণ! এ সংসারে টাকা কড়ি উপার্জ্জন করিয়া ধনী হওয়া বা গাড়ীঘোড়া ছাড়িয়া সুখ ভোগ করা সহজ; একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই তাহা করিতে পারেন। বিএ,এমএ, পাশ করিয়া বড় বড় চাকুরী করাও সহজেই হইতে পারে, কিন্তু নিজের প্রভু হইয়া এবং পরের উপকার করিয়া যাঁহারা জীবন কাটাইতে পারেন তাঁহারই ধন্য! মানুষের যদি বাল্যকাল হইতেই কিছুর জন্য বেশী ভাবিতে হয় তবে সে সাধুতারই জন্য।

৺ ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠক পাঠিকাগণ আজ আবার তোমাদের নিকট একটী দুঃখের সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইতেছি। আমাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশের আর একটী রত্ন খসিয়াছে। আমাদের দেশের আর একটী বড় লোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তোমরা কি ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়াছ? অবশ্যই শুনিয়া থাকিবে। যিনি দেশে এত বড় বিখ্যাত লোক ছিলেন তাঁহার নাম অবশ্যই তোমাদের কাণে গিয়া থাকিবে। তবে ইঁহার বিশেষ ইতিহাস বোধ হয় জান না। সেই ইতিহাস একটু বলি শুন।

১৮১৩সালে অর্থাৎ ৭২ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ঝামাপুকুর কালীতলার সন্নিকটে মাতামহের বাটীতে ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। সেই সময়ে এ দেশের লোককে ইংরাজী শিখান

উচিত কি না এই বিষয় লইয়া দেশ মধ্যে হুল স্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কতকগুলি লোকের এই মত ছিল যে এ দেশবাসিদিগকে ইংরাজী শিখান হইবে না; আবার আর এক দিকে রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি আর এক দল লোকের মত ছিল যে এ দেশের লোককে ইংরাজী না শিখাইলে প্রকৃত উন্নতি হইবে না। একে এই গোলযোগ তাহাতে আবার রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের ভ্রম দেখাইয়া নানা গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছিলেন, দেশের বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার পুস্তকের যুক্তি সকল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এই সকল বাদানুবাদে তখন দেশের লোকের মন, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরের লোকের মন নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকল ঘরেই এই কথা, দশজনে একত্র হইলেই এই গোলযোগ; সর্ব্বত্রই প্রচলিত ধর্ম্ম সত্য কি না এই আলোচনা। এই তর্ক যুদ্ধের মধ্যে কৃষ্ণমোহনের জন্ম হইল। তিনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র, তাঁহার আর দুই ভাই ও দুই ভগিনী ছিলেন। তাঁহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায় প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষার পক্ষীয় লোকেরা একত্র হইয়া "স্কুল সোসাইটী" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। তাহার দুই উদ্দেশ্য ছিল;—(১ম) সে সময়ে কলিকাতা সহরে যে পাঠশালাগুলি ছিল, তাহার উন্নতি করা (২য়) দেশে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করা। কৃষ্ণমোহন যে বাড়ীতে জন্মিয়াছিলেন, তাহার নিকটের একটী পাঠশালা ঐ সভার লোকেরা হাতে লইলেন। স্বয়ং হেয়ার সাহেব তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহা ভিন্ন "স্কুল সোসাইটী" একটী ইংরাজী স্কুল খুলিয়াছিলেন। এখন তাহার নাম হেয়ার স্কুল হইয়াছে। পাঠশালার ভাল ভাল ছেলেদিগকে, হেয়ার সাহেবের স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত, সেখানকার ভাল ছেলেদিগকে আবার বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পাঠান হইত। কৃষ্ণমোহন সর্ব্ব প্রথমে হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি এমন আশ্চর্য্য ছিল যে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার উপর হেয়ার সাহেবের চক্ষু পড়িল। তিনি কৃষ্ণমোহনকে ছেলের ন্যায় ভাল বাসিতেন। পাঠশালা হইতে কৃষ্ণমোহন হেয়ার স্কুলে গেলেন এবং সেখান হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইয়া মনোযোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। হিন্দু কালেজে পাঠের সময় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার পরলোক হইল।

কৃষ্ণমোহন যখন হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন তখন সেই কালেজের চতুর্থ শ্রেণীতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁর নাম হেন্‌রি ভিভিয়ান ডিরোজিও। ইহাঁর নাম বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন চরিত বলিবার সময় ইহাঁর নাম বোধ হয় করিয়াছি। ইনি জাতিতে ফিরিঙ্গী ও বয়সে বালক ছিলেন। তখন ইহাঁর বয়স ১৯।২০র অধিক হইবে না। কিন্তু বুদ্ধি, বিদ্যা, উৎসাহ, স্বাধীন-চিন্ততা, স্বদেশানুরাগ, সত্য-প্রিয়তা প্রভৃতি গুণে ইনি কালেজের ছাত্রদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রেরা ইহাঁর এত বশবর্ত্তী হইয়া পড়িল যে ইহাঁর মুখের দুইটা কথা শুনিবার জন্য দলে দলে ছেলে সর্ব্বদা ইহাঁকে ঘিরিয়া থাকিত। ইহাঁর একটা কথায় যে কাজ হইত,

কালেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের দশ ঘা বেতের ভয়ে তাহা হইত না। ইনি চাকুরীর দায়ে শিক্ষকের কাজ করিতেন না, কিন্তু কিসে ছেলেদের হৃদয় মনের উন্নতি হয় সে জন্য যেন প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। সচরাচর স্কুল বসিবার এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা আগে স্কুলে আসিতেন এবং স্কুল বন্ধ হওয়ার এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে বাড়ী যাইতেন। এই অতিরিক্ত সময়ে তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না, কেবল ছেলেদিগকে লইয়া বসিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এই দলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী ও মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই দেশের বড়লোক হইয়াছিলেন। ডিরোজিও সাহেব কথা কহিবার সময় কোন বিষয় ছাড়িতেন না। ছেলেদিগকে দেশ প্রচলিত পৌত্তলিকতার ভ্রম দেখাইয়া দিতেন, অন্যান্য সামাজিক কুরীতির দোষ দেখাইতেন এবং তাহাদিগকে সাহসী ও সত্য-প্রিয় হইতে উৎসাহিত করিতেন। ক্রমে ছেলেদের মনে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। উপরের উল্লিখিত যুবকগণ সাহসের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা বলিতে লাগিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা সহরে বড় গোলমাল উপস্থিত হইল। সর্ব্বনাশ হইল, জাতি ধর্ম্ম গেল, হিন্দুয়ানি লোপ পাইল, বলিয়া যেথানে সেথানে লোকে শোক করিতে লাগিল। যে রাধাকান্ত দেব ইংরাজী স্কুল খুলিবার জন্য মহামতি হেয়ার সাহেবের সহায় হইয়াছিলেন তিনি আবার ঘুরিয়া বসিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভার বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য এক ধর্ম্ম-সভা স্থাপন করিলেন। ধর্ম্মসভার সভ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া ডিরোজিও সাহেবকে হিন্দু কালেজ হইতে তাড়াইবার জন্য কোমর বাঁধিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ডিরোজিও বাধ্য হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ওদিকে বাড়ীতে কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুদের উপর ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ হইল। পাড়ার লোক ও আত্মীয় কুটুম্ব একত্র হইয়া কৃষ্ণমোহনের অভিভাবকদিগকে লওয়াইয়া কৃষ্ণমোহনকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। কৃষ্ণমোহন এই সময়ে হেয়ার সাহেবের স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করিতেন। একবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে কর। সে সময়ে একজনকে সমাজচ্যুত করিলে তাহাকে কি ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইত একবার ভাবিয়া দেখ! কৃষ্ণমোহন সেই সমুদয় কষ্ট সহিয়া থাকিলেন তথাপি সমাজের লোকের ভয়ে বিশ্বাসের বিপরীত আচরণ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি 'ইনকোয়ারার' নামে একখানি ইংরাজী কাগজ লিখিতেন। ঐ কাগজে স্বাধীন ভাবে সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতেন, এবং যাহাতে দেশের কুসংস্কার দূর হয়, কুরীতি সকল সংশোধন হয়, নীতির উন্নতি হয়, সেই চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে বিখ্যাত খৃষ্টীয় পাদরি ডাক্তার ডফের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সাহেব তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দেশ মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ইহার পরে তাঁহার জীবনে আর বিশেষ

আন্দোলন বা পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তিনি খৃষ্টান হওয়ার পর কিছুদিন খৃষ্টান পাদরিদিগের স্কুলে কর্ম্ম করেন; তৎপরে শিবপুরে বিশপস্ কালেজে গিয়া কিছুকাল খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করেন। এই সময়ে তিনি হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত ভাষা ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য কলিকাতায় হেদুয়ার নিকটে একটী গির্জ্জাঘর নির্ম্মাণ করা হয়; উহাকে লোকে এখনও "কেষ্টো বন্দ্যোর গির্জ্জা" বলিয়া থাকে। তিনি ঐ ভজনালয়ে নিয়মিতরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে "ষড় দর্শন সংবাদ" নামক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ও তাহাতে তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "এরিয়ান উইটনেস্" নামক ইংরাজীতে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতেও তিনি জগতে যশস্বী হইয়াছেন। ১৮৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি প্রদান করেন।

শেষ দশায় লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, আর কোন কাজ করিতে পারে না, কিন্তু ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশের উপকারের জন্য খাটিয়াছেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভারতসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি যে কাজ করিতেন তাহাতেই তাঁহার সাহস ও স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি কখনই মনুষ্যকে ভয় করেন নাই; ও অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। দেশের লোকের হইয়া ইংরাজদের সহিত সর্ব্বদা ঝগড়া করিতেন; কলিকাতায় মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ছিলেন সেখানে তিনি অকুতোভয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। আমরা কত দিন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি কোথায় বৃদ্ধ বয়সে একটু আরামে থাকিবেন, না, কেবল স্বদেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি এজন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, অনেক যুবা পুরুষকেও তাহা করিতে দেখা যায় না। এইরূপে স্বদেশের জন্য খাটিতে খাটিতে ও চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বল শক্তি হ্রাস হইয়া আসিল; তাঁহার কি প্রকার রোগ জন্মিল, তাহা কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে বিগত ১১ই মে সোমবার ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই কন্যা ও কয়েকটী দৌহিত্র ও দৌহিত্রী জীবিত আছেন। তাঁহার মৃত শরীর তাঁহারই ইচ্ছা ক্রমে শিবপুরের গোরস্থানে তাঁহার মৃত পত্নীর কবরের মধ্যে একত্র গোর দেওয়া হইয়াছে।

যে দিন তাঁহাকে গোর দেওয়া হয় সে দিন খৃষ্টান নন এমন অনেকেও শোক প্রকাশের জন্য তাহার মৃত দেহের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। তৎপরে এক দিবস ভারত সভার সভ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার গোরস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন।

বালক বালিকাগণ! যাঁহার জীবন-চরিত তোমাদিগকে শুনাইলাম, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহাকে ঘৃণা করিবে? এমন কাজ কখনই করিও না। যে বিশ্বাসের মত কাজ না করে সে মানুষ মানুষই নয়। যদিও ভ্রমে পড়িয়াই হউক বা আর যেরূপেই হউক যখন তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মে আস্থা হইল, তখন নিজের বিশ্বাস অনুসারে কাজ করাই তাঁহার পক্ষে উচিত হইয়াছিল। এরূপ না করিলে তাঁহাকে বড়লোক বলিতাম না। তিনি যদি

কাপুরুষের ন্যায়, অপদার্থ লোকদিগের ন্যায়, মনে এক প্রকার বিশ্বাস রাখিয়া কাজে আর এক প্রকার করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য কলম ধরিতাম না। তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিল না হউক, তিন যে সাহসী বীরের ন্যায় নিজ বিশ্বাসের মত কাজ করিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করি।

এক দিকে যেমন তাঁহার নিজ বিশ্বাসের মত কাজ করিবার সাহস ছিল অপর দিকে আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞার বল ছিল। ৬০ বৎসর ধরিয়া এক চিত্তে আপনার উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। ৬০ বৎসরের পরিশ্রমের কথা স্মরণ কর। কয়জন লোকে এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত নিজের ও অপরের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করে? ইহা কি প্রশংসার বিষয় নয়? যে ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমাদের জন্য এত খাটিলেন, আমরা কি এমনি কৃতঘ্ন পামর যে তিনি নিজ বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিবার নিমিত্ত বিধর্ম্মী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইব না? ছি ছি! তাহা হইলে ঈশ্বরের চক্ষে অপরাধী হইব। তবে এস পাঠক পাঠিকা! সকলে মিলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি তাঁহার পরকালগত আত্মাকে চিরজীবনের পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করুন।

আশ্চর্য্য উদ্ভিদ।

মানুষ কিম্বা পশুদিগের যেমন হাত পা, নাক মুখ চোক আছে; তাহারা যেমন শব্দ করে চীৎকার করে, সেইরূপ সময়ে সময়ে উদ্ভিদের মধ্যেও দেখা যায়। এ বিষয়ে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এক রকম ছোট ছোট গাছ আছে, তাহাদিগকে ইংরাজীতে ম্যাণ্ড্রেক বলে। এক ম্যাণ্ড্রেক গাছের বিষয় কথিত আছে যে, তাহাকে মাটি হইতে তুলিলে সে চেঁচাইয়াছিল। মেজ নামক এক স্থান আছে, তথায় এক য়িহুদীর আর একটা ম্যাণ্ড্রেক ছিল; তাহার মানুষের মত মাথা ও বাকী সব মোরগের মত। সে লাভেণ্ডরের শস্য ও এক রকম মাটির পোকা খাইয়া পাঁচ সপ্তাহ বাঁচিয়াছিল। এই রকম কত ঘটনাই শুনিতে পাওয়া যায়।
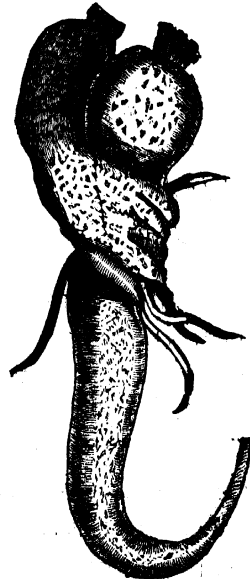
পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ছবিটী দেখ। একটী মূলা আর একটীকে জড়াইয়া আছে। যেমন একটা মানুষের হাত একটা মূলা ধরিয়াছে। কেমন আঙ্গুল গুলি স্পষ্ট স্পষ্ট। এই মূলা জোড়াটী একজন বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। হঠাৎ এক চিত্রকর তাহা দেখিতে পাইয়া অবিকল চেহারা তুলিয়া লয়। তাহা হইতে এখন অনেক ছবি প্রস্তুত হইয়াছে। আর একটী মূলা দেখ :—

মূলাটী ঠিক আমাদের হাতের মত হইয়াছে। কেমন পাঁচটী আঙ্গুল! কেমন আমাদের আঙ্গুলের মত ভাগ করা করা। বুড়া আঙ্গুলের নখটী পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। উপরের মূলার শাক আঁকা না থাকিলে কাহার সাধ্য যে, ইহা কি ঠিক করে। এটী ইংরাজী ১৮০২ সালে বিলাতের বার্মিংহাম নগরের যাদুঘরে সকলের দেখিবার জন্য রাখা হয়। কত লোক কত টাকা দিতে চাহিয়াছিল; তবু এমন আশ্চর্য্য জিনিস বিক্রয় করা হয় নাই।

পাঠক পাঠিকাগণ! ভগবানের সকল কাজই আশ্চর্য্য। যে গুলির কথা পড়িলে ওগুলি খুব আশ্চর্য্যের। এখন আর একটীর কথা শুন।

আচ্ছা, এই যে ছবি দেখিতেছ ইহা দেখিয়া তোমাদের কি মনে হয়? কেহ মনে করিতেছ একটা মানুষ হাতে পায়ে শিকড় জড়াইয়া বসিয়া আছে; মাথায় কেহ কতকগুলা পাতা বসাইয়া দিয়াছে। আর কেহ হয়ত আর কত কি ভাবিতেছ। কিন্তু ইহা কি শুনিবে? একটা শালগম। জর্ম্মাণি দেশে উইডান নামে এক গ্রাম আছে। ইংরাজী ১৬২৮ সালে, সেখানে এক চাষার অনেক শালগমের চাষ হয়। সে প্রত্যহ কিছু কিছু উপড়াইয়া বাজারে বিক্রয় করিত। একদিন সকালে সে আস্তে আস্তে এক শালগম তুলিয়াছে। দেখে, শালগমের চেহারা অবিকল মানুষের মত। চোক, নাক, কান, মুখ সব আছে।

পায়ের উপর পা রাখিয়া, হাতের উপর হাত রাখিয়া, যেমন একটী মানুষ বসিয়া আছে। পা হইতে চারিদিকে সিকড় বাহির হইয়াছে। এ অদ্ভুত শালগম দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। চারি দিক হইতে তাহা দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। যাহারা চিত্র করিতে জানিত তাহারা ছবি আঁকিয়া লইতে আরম্ভ করিল। কত লোক সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের মহিমায় মোহিত হইয়া গেল। যাহাদের দেখিবার ক্ষমতা ছিল তাহারা দেখিল যে তাঁহার কি আশ্চর্য্য শক্তি।

কাক ও কোকিল।

দুই পাখী এক আম ডালে,
বসিয়াছে দুপহর কালে।
গম্ গম্ রৌদ্র যেন অগ্নিবৃষ্টি হয়!
নীরব সে গ্রাম যেন নিশুতি সময়!
দুই পাখী আসি হেন কালে,
বসিয়াছে পাতার আড়ালে।

কাক বলে;—"আমরা দুজন
এক বর্ণ—একই গঠন।
যেন দুটী ভাই করে গড়েছে বিধাতা;
এক রূপকান্তি যেন এক জন্মদাতা;
এক নীড়ে হয়েছি পালন,
ভাই ভাই আমরা দুজন।"

"তাই বটে"——বলিল কোকিল,
"লোকগুলা বড়ই কুটিল!
কি আছে প্রভেদ দেখ তোমায় আমায়,
আমারে খাঁচায় পোষে তোমারে খেদায়।"

শুনে কাক প্রফুল্ল হইল,
বাঃ বাঃ করে ডাকিয়া উঠিল।

কোথা ছিল একদল ছেলে,
উপস্থিত সেই তরুতলে।
দুর্ দুর্ মার্ মার্ করে ঢিল মারে;
কি বিপত্তি! কাক ভায়া বসিতে না পারে!
সরে সরে বসিছে আড়ালে,
ঢিল বৃষ্টি করে শিশুদলে।

শেষে কাক উড়িয়া পলায়;
যাঃ যাঃ করে ডেকে ডেকে যায়।
পাতা মাঝে লুকাইয়া আছিল কোকিল,
সেথা না দেখিল শিশু না মারিল ঢিল।
বসি বসি—শেষে সাড়া দেয়,
শিশুগণ চারিদিকে চায়।

শুনি কুহু তারা কুহু করে,
কুহু-কুহু তাহার উত্তরে।
বালকে কোকিলে কুহু দেশ ছেয়ে যায়!
কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতিধ্বনি সে বন জাগায়!
শুনে কাক মনে মনে করে,
গুণ দেখে, আদর সংসারে।

কলির কুম্ভকর্ণ।

তোমরা সকলেই বোধ হয় রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়াছ। সে ছয় মাস ঘুমাইত আর ছয়মাস জাগিয়া থাকিত। এ কথাটা অনেকেই বড় বিশ্বাস

করেন না; বলেন ওটা গল্প বই আর কিছুই নয়। কিন্তু একটী ইংরাজ পণ্ডিত যে এক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিয়াছেন তাহা শুনিলে আর কুম্ভকর্ণের কথা গল্প বলিয়া বোধ হয় না।

ইংলণ্ডে বাথ নামে একটী স্থান আছে। তাহার নিকট এক গ্রামে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল চিলটন নামে ২৫ বৎসর বয়স্ক এক শ্রমজীবী বাস করিত। সে খুব দৃঢ়কায় ও বলবান ছিল। ঐ বৎসরের ১৩ই মে তারিখে হঠাৎ সে অতিশয় ঘুমাইয়া পড়ে; তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইলেও এক মাসের পূর্ব্বে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। একমাস পরে উঠিয়া পুনরায় সে পূর্ব্বের মত খাইতে ও চলিতে লাগিল কিন্তু আর এক মাসের মধ্যে একটীও কথা কহিল না।

দুবছর সে বেশ ভালই রহিল। ১৬৯৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে আবার সেই ঘুম উপস্থিত! এই বার একটী ডাক্তার বিলিষ্টার ও অন্যান্য অনেক উগ্র ঔষধ দ্বারা তাহার ঘুম ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছু হইল না। তাহার বিছানার নিকট কতক খাবার সামগ্রী রাখা হইত সে সময়ে সময়ে আহার করিত ও মধ্যে মধ্যে বমি করিত কিন্তু কেহ তাহাকে এই সব করিতে দেখিতে পায় নাই। কখনও বা তাহার হাতে খাওয়ার থাকিত কখনও বা মুখে থাকিত কিন্তু সে ঘুমাইয়া পড়িত। এই রকমে প্রায় ১০ সপ্তাহ অতীত হইল তবুও সে ঘুমের হাত হইতে একেবারে নিস্তার পাইল না। এই সময়ের মধ্যে সে একবার মাত্র প্রস্রাব করিয়াছিল।

যে সাহেব এই গল্পটী বলিয়াছেন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি যাইয়া চিমটী কাটিলেন, নাক মলিলেন, নাক মুখ বন্ধ করিয়া ধরিলেন কিছুতেই কিছু হইল না। এই রূপে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত রহিল। ১৯শে নবেম্বর তারিখে তাহার মাতা একটা চীৎকারের শব্দ শুনিলেন; যাইয়া দেখেন যে তার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" সে ব্যক্তি বলিল "বেশ আছি কিঞ্চিৎ খাইতে দাও।" মা খাবার আনিতে এবং তাহার ভাইকে এই সংবাদ দিতে গেলেন; আসিয়া দেখেন আবার ঘুম!! এই ঘুম জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু এ সময়ে ঘুমটা তত পাকা হয় নাই; লোকটী সকলের কথা শুনিতে পাইত বটে কিন্তু উত্তর দিতে পারিত না।

ধাঁধা।

এপ্রিল মাসের ধাঁধার উত্তর।

১ম। কাগজ।

২য়। প্রত্যেক পুত্র ১১১ টী আম পাইবে।

১ম পুত্র, ১ম, ৭ম, ১৯শ, ২৩শ, ২৫শ, ৩৬শ,
২য় „ ২য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ২৪শ, ৩৩শ, ৩৪শ,
৩য় „ ৩য়, ৫ম, ২০শ, ২১শ, ৩০শ, ৩২শ,
৪র্থ „ ৪র্থ, ৮ম, ১৬শ, ১৭শ, ৩১শ, ৩৫শ,
৫ম „ ৯ম, ১১শ, ১৫শ, ২২শ, ২৬শ, ২৮শ,
৬ষ্ঠ „ ১০ম, ১৩শ, ১৪শ, ১৮শ, ২৭শ, ২৯শ,

নূতন।

১ম। রাম এবং যদু দুইজনে তিনটী ভাঁড় লইয়া বাজারে তৈল ক্রয় করিতে গিয়াছিল। রামের নিকট দুইটী ভাঁড় ছিল; ১টী ৫ সেরী এবং অপরটী ৩ সেরী। যদুর নিকট কেবলমাত্র একটী ৮ সেরী ভাঁড় ছিল। ৮ সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিয়া তৈল ক্রয় করিয়া লইয়া আসিল; অর্দ্ধেক পথ একসঙ্গে আসিয়া তাহারা দুইজনে দুই পথে যাইবে, এখন তাহারা কি উপায়ে তৈল ভাগ করিয়া লইবে বল দেখি?

জুলাই, ১৮৮৫।

স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন।
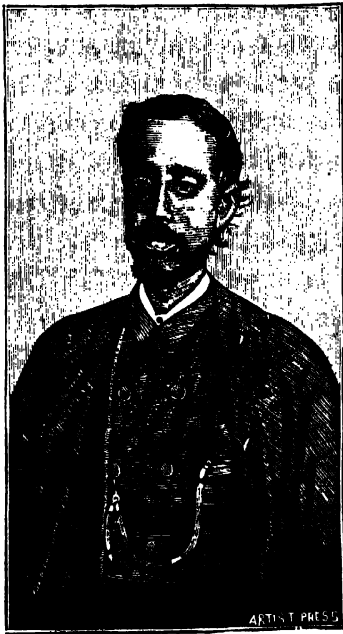
আমার পাঠক পাঠিকাগণ! আজ তোমাদের কাছে কি কথা বলিতে যাইতেছি। কোথায় আমরা ভাবিতেছিলাম গঙ্গাধর কবিরাজের জীবনচরিত লিখিব;—না এ কি লিখিতে হইল! উপরে যাঁহার ছবি দেখিতেছ উহাঁকে কি তোমরা চেন? উহাঁর নাম প্রমদাচরণ সেন। উনিই তোমাদের জন্য "সখা" বাহির করিয়াছিলেন। এই "সখা" যাহাতে ভাল হয়, ইহা পড়িয়া যাহাতে তোমাদের উপকার হয়, যাহাতে তোমরা আমোদ ও উপদেশ পাও সে জন্য উনি সারা মাস ভাবিতেন। এই "সখার" জন্য উনি কি খাটুনি খাটিয়াছেন তাহা তোমরা জান না। দেশ বিদেশ হইতে ভাল ভাল বই আনাইয়াছেন, ভাল ভাল ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন, কত বই পড়িয়াছেন, সে পরিশ্রম তোমরা কেহ দেখ নাই। এত যে খাটিতেন কেবল এই জন্য যে দেশের বালক বালিকাদের পড়িয়া উপকার হইবে।

সেই প্রমদাচরণ সেন আর নাই। প্রায় এক বৎসর কঠিন রোগে কষ্ট পাইয়া, গত ২১ এ জুন রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি সবে ২৬ বৎসর ছাড়াইয়া ২৭ বৎসরে পা দিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে মানুষ মারা পড়িলে কার না দুঃখ হয়? তাহাতে আবার প্রমদাচরণের মত লোক বেশী মেলে না; সুতরাং ইহাঁর মৃত্যুতে যে আমরা কি ব্যথা পাইয়াছি তাহা তোমাদিগকে বলিতে পারি না। এমন উৎসাহী, সত্যপরায়ণ, ধার্ম্মিক লোক কি আমরা আর পাইব? তাঁহার জীবনচরিত কিছু বলি শুন।—

১৮৫৯ সালে অর্থাৎ ২৬ বৎসর পূর্ব্বে কলি-

কাতার নিকটস্থ ইটালী নামক স্থানে ১৮ই মে তাঁহার জন্ম হয়। তখন তাঁহার পিতা সেখানে পুলিসে একটা কর্ম্ম করিতেন।

ছেলে বেলায় প্রমদাচরণ তাঁহার পৈতৃক বাসগ্রাম সেনহাটীতে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। পড়া শুনায় তিনি বরাবর ভাল ছিলেন। পল্লীগ্রামে দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পড়িয়া ছেলেরা অনেকে দুষ্টমি শিক্ষা করে। প্রমদাচরণও দুষ্ট বালকদের দেখাদেখি যদি কখনও কোন দুষ্টমি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে খুব শাস্তি দিতেন। ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। যার সংসারে মা নাই তার কেহ নাই। মায়ের মৃত্যুর পর প্রমদাচরণের পিতা ও তাঁহার দাদা তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন কিন্তু তবু তিনি বড় হইয়াও মা নাই বলিয়া কত দুঃখ করিতেন। বালক কালে সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ না পাওয়াতে ছেলেদের কত ক্ষতি হয়, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বালককালে কত সময় বৃথা গিয়াছে, কত অন্যায় কাজ হইয়াছে, বড় হইলে তাহা স্মরণ করিয়া অনেক দুঃখ করিতেন। এই জন্যই বোধ হয়, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বালক বালিকা-দিগের উন্নতির জন্য একটা কিছু করিবেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় "সখা" বাহির করিয়া-ছিলেন।

পাঠশালা হইতে প্রমদাচরণ গ্রামের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুলে কিছুকাল পড়িয়া যশো-হরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন; তথা হইতে কোন কারণ বশতঃ পুনরায় নিজ গ্রামে আসিয়া বাঙ্গলা স্কুল হইতে ১৮৭২ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িবার জন্য আসিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া খুব মনোযোগ দিয়া পড়িতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তিনি একজন ভাল ছেলে ছিলেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রমদাচরণ যখন প্রথম ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার বয়স ১৩।১৪র অধিক হই-বে না; তখনই সকল ভাল বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত উৎসাহ দেখা যাইত। একবার মান্দ্রাজ দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, প্রমদাচরণ সে সময় হেয়ার স্কুলের ছেলেদের নিকট হইতে অনেক টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ঐ স্কুলে ক্লাসের ছেলে-দিগকে লইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে নানা ভাল বিষয়ের চর্চ্চা হইত। তিনি এই সময়েই বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন; বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছেলেবেলা হইতে ছিল।

১৮৭৬ সালে এই স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় একটী বৃত্তি পান। ইহার পর তিনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়েন। এই সময়ে তাঁহার 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষা দিয়া বিলাত যাইয়া পড়িবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইল। 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষা দিতে হইলে চারিভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়; প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়িলে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজে ভর্ত্তি হন।

তাঁহার সংস্কৃত জানা ছিল সুতরাং এল, এ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে লাটিন এবং বাটীতে বসিয়া ফ্রেঞ্চ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এল, এ এবং 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষার জন্য পড়িতে লাগিলেন। এই দুই পরীক্ষার জন্য

এক সময়ে প্রস্তুত হওয়া কিরূপ কষ্টকর তাহা যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

১৮৭৮ সালে তিনি এল, এ পরীক্ষা দেন,—তাঁহার এক বিষয়ের লিখিত কাগজ দিতে একটু দেরী হইয়াছিল বলিয়া জনৈক সাহেব তাঁহার কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলেন, এই জন্য তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

১৮৭৯ সালে তিনি 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষায় তৃতীয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৃত্তি পান নাই। এই জন্য তিনি নিতান্ত হতাশ না হইয়া অন্য কি উপায়ে বিলাত যাইয়া পড়িতে পারেন তাহাই ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। এই বৎসরে তিনি ক্যাথিড্রাল মিসন কালেজে এল, এ পড়িতেছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতার সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে তিনি এত অল্প বয়সেই কালেজ ছাড়িয়া দিয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নকিপুর এণ্ট্রান্স স্কুলে তিনি কিছু দিন প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এই স্কুল উঠিয়া গেলে কিছু দিন পরে তিনি কলিকাতার সিটি স্কুলে এক শিক্ষক হন।

তিনি কেবল পরীক্ষার বইগুলি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইতেন না; ভাল বই দেখিলেই কিনিতেন ও পড়িয়া ফেলিতেন। বাড়ী হইতে যে টাকা পাইতেন, তাহাতে বই কেনার ব্যয় কুলাইত না বলিয়া নিজে 'প্রাইভেট' পড়াইয়া সেই টাকাতে বই কিনিতেন। তিনি অল্প বয়সেই কালেজ ছাড়িয়া কর্ম্মকাজে লাগিয়াছিলেন অথচ নিজে ঘরে বসিয়া এত ভাষা শিখিয়াছিলেন ও এত বিষয় জানিয়াছিলেন যাহা তাঁহা অপেক্ষা অনেক বড় বয়সের লোকে জানে না।

কালেজ ছাড়িয়া যখন কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তখন মনে দেশের কিছু ভাল কাজ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। তিনি ছোট ছোট ছেলেদিগকে বড় ভাল বাসিতেন। ভাবিতে লাগিলেন তাঁহাদের উন্নতির জন্য কি করা যায়। তিনি সিটি স্কুলের মাষ্টার ছিলেন, কিন্তু ছেলেদিগকে একটু পড়াইয়াই তাঁহার মন সন্তুষ্ট হইত না। তাহাদের চরিত্র কিসে ভাল হয় এই চিন্তা সর্ব্বদা করিতেন। ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশিতেন, খেলিতেন, গল্প করিতেন। ক্রমে 'সখা'র ভাব তাঁহার মনে আসিল এবং অনেক দিনের পরিশ্রমের পর ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে 'সখা' প্রকাশ করিলেন।

এই 'সখা'র জন্য তিনি কত খাটিয়াছেন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। না খাইয়াও ইহার জন্য টাকা জমান, রাত্রি জাগিয়া পড়া, ইহার ছবি যোগাড় করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ান, এই করিতে করিতে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই 'সখা' তিনি যখন বাহির করিলেন তখন অনেকে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এ কাগজ টেকিবে না, ইহা চালাইলে ক্ষতি হইবে, এ কাগজ ভাল হইবে না; এমন কি তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধবে তাঁহাকে নিরাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে কাজ ভাল বলিয়া বুঝিতেন তাহা সহজে ছাড়িতেন না। তিনি কাহারও কথায় ভয় না পাইয়া ইহার উন্নতির জন্য মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন এবং অবশেষে উন্নতি করিয়া তুলিলেন।

তিনি যেমন সহজে দমিতেন না, তেমনি নিজের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বড় হইবার প্রতিজ্ঞা ছিল। 'সখা'র যে এত উন্নতি করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন বড় লোকের দ্বারস্থ হন নাই। পরিচিত অনেক বড় লোক ছিলেন 'সখা'র জন্য কখনও কাহার নিকট উপযাচক হন নাই। নিজের

উপর নির্ভর করিয়া নিজে দাঁড়াইব, এই তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া শিখিবার ও নিজের উন্নতি করিবার ইচ্ছা বড় প্রবল ছিল; তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইলে ইংলণ্ডে যান। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া এখানে বসিয়া বিলাতের বি, এ পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। বিলাতের ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার এক রকম স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু কলিকাতার ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ সভ্যের মত হইল না। এখানে থাকিয়া বিলাতের পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে কি না এ বিষয়ে বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে বিলাত যাইবার জন্য টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়েও অনেকে তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমন কি যাঁহাদিগকে তিনি পিতৃতুল্য ভক্তি করিতেন সেই সকল গুরুজনও তাঁহার ইংলণ্ডে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিতেন না। অনেক চেষ্টার পর তাঁহার বিলাত যাওয়া ঠিক হইয়াছিল; তাঁহার দাদা এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধু তাঁহাকে পড়িবার খরচ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সমুদয় স্থির হইল। বিলাত যাইবার জন্য বাটী হইতে বিদায় লইয়া আসিলেন। কিন্তু বাটী হইতে আসার কিছু দিন পরেই এই কঠিন ব্যারাম হওয়াতে তাঁহার আর ইংলণ্ডে যাওয়া হইল না।

তিনি ভাল ভাল লোকের জীবন চরিত পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন এবং "মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী" "চিন্তাশতক" এবং "সাথী" নামে তিন খানি বই লিখিয়াছিলেন। তোমাদের অনেকে তাহা পড়িয়া থাকিবে।

এইরূপে খাটিতে খাটিতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিল। সেই দুর্ব্বল অবস্থাতেও খাটিতে ছাড়িতেন না। গত বৎসর এই সময় একদিন সিটি স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা তাহাদের সভাতে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে ধরিল; তিনি ছেলেদের অনুরোধ ছাড়াইতে পারিতেন না, বক্তৃতা করিতে গেলেন। এত জোরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বাসাতে ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রেই তাঁহার মুখ দিয়া অনেক রক্ত উঠিল। তার পরদিন হইতে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। এক সময়ে বোধ হইল বুঝি সারিয়া উঠিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রথমে ডাক্তারি, তৎপরে কবিরাজি, তৎপরে হোমিওপেথি, তৎপরে আবার কবিরাজি, কত রকম দেখা হইল কিছুতেই কিছু হইল না। প্রায় এক বৎসর কাল ক্ষয়-কাশ রোগে ভুগিয়া বিগত ২১ এ জুন রবিবার, খুলনায় মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

তিনি রোগ-শয্যায় পড়িয়াও সর্ব্বদা পরের জন্য ভাবিতেন। তাঁহার অন্যায়ের প্রতি বড় বিদ্বেষ ছিল, একবার তাঁহার একজন আত্মীয় কোন আপীষে কর্ম্ম পাইবার জন্য পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষাতে তিনি সর্ব্ব প্রথম হইলেন তথাপি আপীষের কর্ত্তা ইংরাজ, একটা সামান্য ছল করিয়া তাহাকে কর্ম্ম না দিয়া সে কাজ অন্যকে দিলেন। তিনি তখন বড় পীড়িত; শুনিয়া তাঁহার এত ক্রোধ হইল যে তিনি বলিতে লাগিলেন;—"কি বলিব আর বল শক্তি নাই, তাহা না হইলে একবার ইহাদের অন্যায় বিচারের কথা কাগজে লিখিতাম।"

তাঁহার যখন অত্যন্ত পীড়া তখন একদিন শুনিলেন যে তাঁহার পরিচিত একটী বালিকাকে লোকে বলপূর্ব্বক একটী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিতেছে। ঐ বালিকার মাতা অনাথা বিধবা, তাঁহার ইচ্ছা নাই; তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকে জোর জবর করিয়া ঐ কাজ করাইতেছে। ইহা শুনিবা মাত্র তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের জন্য কতই ভাবিতে লাগিলেন, নিজের টাকা দিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, তাঁহারা কিন্তু আসিতে পারিলেন না। এজন্য প্রাণে বড় দুঃখ রহিল।

একদিন রোগ-শয্যায় পড়িয়া শুনিলেন যে তাঁহার ভবানীপুরস্থ একজন ব্রাহ্ম বন্ধুও তাঁহার মত ক্ষয়-কাশ রোগে কষ্ট পাইতেছেন, সে বন্ধুটী অতি দরিদ্র। তিনি একজন লোকের হাতে ৫৲ টী টাকা দিয়া বলিয়া দিলেন—"তাঁহাকে বলিবেন, ইহা অতি যৎসামান্য হইল, আমি নিজে পীড়িত, তাহা না হইলে আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার সেবা করিতাম।"

পিতৃ মাতৃ হীন ছোট ছোট গরিবের ছেলেদিগকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া তাহাদিগের জন্য একটা "আশ্রয়-বাটীকা" নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া মানুষ করিতে হইবে, এই ইচ্ছা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিছু টাকা হইলে ঐ কাজ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা ছিল, রোগে পড়িয়াও সেই ভাবনা ভাবিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে এই রূপ প্রলাপ বকিতেন। তিনি ছোট ছোট ছেলে এত ভাল বাসিতেন যে, এইত রোগ যাতনা, কথা কহিতে কষ্ট হয়, তখনও একটী ছোট ছেলে আসিলে তাহার সঙ্গে কত কথা কহিতেন, কত উপদেশ দিতেন, কত উৎসাহ দিতেন।

ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। রোগ-শয্যায় সর্ব্বদা একখানি ব্রহ্ম-সংগীত তাঁহার বালিশের কাছে থাকিত। গাইতে জানেন এমন কোন লোক দেখিতে পাইলেই ঈশ্বরের নাম গাইতে অনুরোধ করিতেন। নিজের পীড়ার বিষয় কৌতুক করিয়া বলিতেন—আমি পিতার দুষ্ট ছেলে, তাঁর কথা শুনি নাই, স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি, তাই পিতা আমাকে সাজা দিয়াছেন, এত মাস বিছানায় ফেলিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন।" এই ভাবিয়া রোগ যাতনা সহ্য করিতেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেদিন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতি যখন কাঁদিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিলেন "তোমরা কাঁদ কেন ঈশ্বর আমাকে টানিয়া লইতেছেন।

তিনি প্রতিদিন যে যে কাজ করিতেন, দৈনন্দিন লিপিতে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। সেই দৈনিক বিবরণগুলি পড়িলে দেখা যায় যে, এমন দিন যায় নাই যে দিন তিনি ভাল হইবার জন্য একান্ত মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই।

গরিবের প্রতি তাঁহার বড়ই দয়া ছিল। এক দিন রাস্তায় এক খোঁড়ার সহিত তাঁহার দেখা হয়, তথায় সে তাঁহাকে নিজের দুঃখ সমুদয় বর্ণনা করিয়া বলে; তিনি এই খোঁড়ার দুঃখ কাহিনী শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাহাকে তাঁহার নিজ বাসায় গাড়ী করিয়া আনিয়া কিছু খাওয়াইয়া সুস্থ করিলেন এবং পরে তাহার দুঃখের কারণ সমুদয় শুনিলেন। তিনি তাহাকে একটী ক্ষুদ্র দোকান করিবার জন্য টাকা দিলেন এবং মধ্যে মধ্যে খবর লইতে লাগিলেন। দোকান চলিল না দেখিয়া তিনি নিজের ব্যয়ে তাহাকে তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

এইরূপে পরের জন্য ভাবিতে ভাবিতে ও খাটিতে খাটিতে প্রমদাচরণের জীবন শেষ হইয়া গেল। এইরূপে জীবন গেলেইত জীবন ধন্য হয়। ইনি বাঁচিয়া থাকিলে যে দেশের একটা বড় লোক হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অসময়ে আমরা ইহাঁকে হারাইলাম। যাহা হউক জগদীশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এস পাঠক পাঠিকাগণ! আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা করি যে, তিনি তাঁহার পরকালগত আত্মাকে সুখ শান্তিতে রক্ষা করুন।
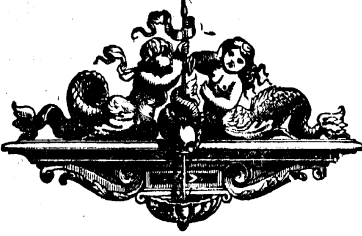
ঈশ্বরের দয়া।

জগদীশ!

এ ভব ভবন মাঝে
যে দিকে যখন চাই,
তোমার করুণা আহা!
কেবলি দেখিতে পাই।

২

তোমার আদেশে রবি
উজ্জ্বল কিরণময়,
তোমার আদেশে বায়ু
ভুবন ব্যপিয়া রয়।

৩

চাঁদের মধুর আলো
যখন জগতে ভাসে,
তোমার করুণা যেন
উছলি উছলি হাসে।

৪

আঁধার গগণে যবে
কোটী তারা দেয় দেখা,
তোমার মহিমা তাহে
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।

৫

পাখীরে ললিত গীতি
শিখায়েছ ভালবাসি,
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভারাশি।

৬

ভূধর, সাগর, মেঘ,
বিজলী, বরিষা-ধারা,
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তারা!

৭

নগরের কোলাহল
বিজনের নীরবতা,
না স্বধিতে বলে মরি!
তোমার স্নেহের কথা।

৮

যখন যা প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই,
কত যে বাসিছ ভাল
কিছু না জানিতে পাই।

৯

ভাঙিলে ভবের খেলা
কোলেতে দিতেছ স্থান,
ভাবি নে ডাকি নে তবু
নাহি ভাব "কুসন্তান"!

১০
নাহি চাও প্রতি-দান
নাহি রাখ কোন আশা,
নীরবে বাসিছ ভাল
ধন্য বটে ভালবাসা!

১১
কিছুই চাহিনে আর
তোমার চরণ তলে,—
তুমি যার, সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে?

১২
এই মাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমি যে আমার, ইহা
সদা যেন মনে রাখি।

১৩
যে জ্ঞানেতে তুমি নাই,
নাহি চাই সেই জ্ঞান।
সাধিতে তোমার কাজ
যায় যেন মম প্রাণ।

১৪
অন্তিমে তোমার পায়
ঠাঁই যেন পাই হরি!
ধর ধর প্রাণ ভ'রে
ও পদে প্রণাম করি।

মাছের কথা।

মাছ অনেক রকমের আছে, আমরা সচরাচর যে কয়েক রকমের মাছ দেখিয়া থাকি তাহা হইতে অনেক বিভিন্ন এবং অনেক আশ্চর্য্য রকমের মাছ কোন কোন স্থানে দেখা যায়।

বালক বালিকাগণ! নিম্নে এক আশ্চর্য্য মাছের
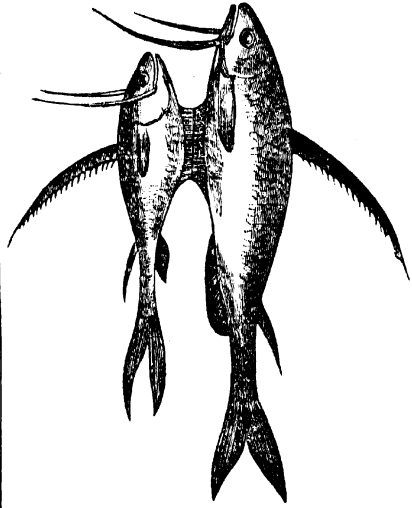
ছবি দেখ! দুইটী মাছ এক সঙ্গে যোড়া রহিয়াছে। একটী মাছ যেখানে যাইবে আর একটীকেও তথায় যাইতে হইবে। আজ ৩৮ বৎসর হইল সিলমান নামক একজন বিলাতের পণ্ডিত আমেরিকার উত্তর কারোলিনা নদীর মোহানার নিকট এই যোড়া মাছটী পাইয়াছিলেন; তিনি তথা হইতে তাহাদিগকে আপনার দেশে লইয়া আইসেন।
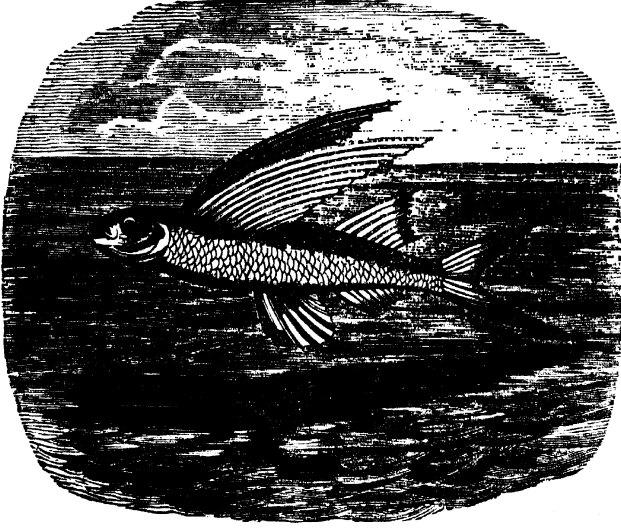
সমুদ্রে এক প্রকার মাছ আছে, তাহারা উড়িতে পারে। আমাদের নদীর কি পুকুরের মাছ কেবল মাত্র সাঁতার কাটিতে পারে; কিন্তু যে মাছের কথা (ছবি দেখ) বলিতেছি, তাহারা সাঁতার কাটে আবার জলের উপরে বাতাসেও উড়িয়া বেড়ায়। কতবার তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে জাহাজের উপর আসিয়া পড়ে; পড়িয়া ক্লান্ত হইয়া যায়, আর উড়িতে পারে না এবং নাবিকগণ ধরিয়া ফেলে। এই মাছগুলি যখন রৌদ্রের সময় দল বাঁধিয়া জলের উপর দিয়া পাখা নাড়িতে নাড়িতে যাইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিতে বেশ দেখায়। ইহাদের পিঠের উপরের রং ধূসর বর্ণ; পেটটা সাদা; ডানাগুলি গাঢ় নীল কেবল অগ্রভাগে পাকা কমলা লেবুর রঙ্গের মত একটা একটা ফোঁটা আছে। এই রকম নানা বর্ণের মাছ সূর্য্যের কিরণে উড়িতে দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়?

এই মাছকে আমাদের দেশে "উড়ুক্কু মাছ" বলে। ইহাদের কাহারও কাহারও চারিটা এবং কাহারও কাহারও দুইটী ডানা আছে। এই মাছ তিন চারি রকমের হয়; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে গুলি দেখিতে সুন্দর তাহাদিগকে ভূমধ্য সাগরে এবং লোহিত সাগরেই দেখা যায়। ইহারা অনেকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না। অধিকদূর উড়িতে হইলে এক একবার ইহাদিগকে জল ছুঁইতে হয়। জল না ছুঁইয়া প্রায় ১২০ হাত যাইতে পারে; তার পর একবার জলে একটু সময়ের জন্য আসিয়া ডানা ভিজাইয়া আরও ৪০ হাত পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। উড়িবার সময়ে ইহারা জলের চারি হাতের অধিক উপরে উঠে না। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি জাহাজে চড়িয়া মান্দ্রাজে যাও তবে এ রকম মাছ কত দেখিতে পাইবে। জাহাজের বাহিরে একটা আলো লইয়া বসিয়া থাকিও, দেখিবে তোমার

কাছে কত উড়ুক্কু মাছ উড়িয়া আসিবে। আমেরিকার জেলেরা এই রকম করিয়া কত মাছ ধরে।

উপরে যে মাছের কথা বলা হইল উহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। রুই বোয়াল যেমন এক এক রকম মাছের নাম "উড়ুক্কু"ও সেইরূপ।

ঠাকুরদাদার গল্প।

আগ্নেয় গিরি।

(অবশিষ্টাংশ।)

নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন—"এ সকল যে বর্ণনা করিলাম,—ভূমিকম্প, ধূম, অগ্নি-শিখা, ধূলি ও প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতি যাহার কথা পূর্ব্বে বলিলাম, সে সকল উৎপাত আগে দেখা যায়। কিন্তু এ সব অপেক্ষাও ভয়ানক একটা আছে। যেন আগে জনকত ফৌজ পাঠাইয়া কিছু গোল-যোগ করিয়া তার পর সেনাপতি নিজে এসে হাজির হইলেন। এতক্ষণ ধরিয়া চারিদিগের গ্রাম সহর সমস্ত বিনষ্ট করিয়া, ঘর দ্বার সব ভাঙ্গিয়া দিয়া জীব জন্তু ধ্বংস করিয়া এবার যেন নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। সব লণ্ডভণ্ড করিয়া এবার আবার নূতন মাটি দিয়া গড়িতে হইবে।

তুবড়ী ছোড়া শেষ হইয়া গেলে যখন সেটা আনিতে যাও, তখন তার গায়ে কি লাগিয়া থাকে?"

চন্দ্র—"হাঁ, আমি দেখেছি তার মুখের বিঁদ থেকে কি যেন গলা গলা সব বাহির হ'য়ে তুবড়ী-টার গায়ে লাগে আর গড়িয়ে মাটিতেও গিয়া পড়ে, সে গুলা কি গা?"

দেবেন্দ্র—"হাঁ আমিও দেখিতে পাই বটে।"

নবীন বাবু—"সত্য কথা, সকলেই প্রায় দেখে যে ছোড়া হয়ে গেলে তুবড়ীর গায় তার ভিতরের গন্ধক ও অন্য অন্য নানা জিনিস গলিয়া লাগিয়া যায়। প্রকৃতির তুবড়ীর বিষ-য়েও ঠিক সেইরূপ। অগ্নেয় পর্ব্বতের যখন অগ্ন্যুৎপাত হয় তখনও ঐরূপ কাণ্ড সকল প্রথমে হইয়া থাকে,—এদিকে তাহার ভিতরে পৃথিবীর গর্ভে যে সব ধাতু, মাটি, পাথর, গন্ধক প্রভৃতি সামগ্রী আছে, সে সমস্ত গলিয়া এক রকম আগুণের সমুদ্রের মত হইয়া তেজে উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। তেজ অল্প হইলে শুদ্ধ ভূমিকম্প হইয়াই থামিয়া যায়, আর একটু বেশী হইলে ধোঁয়া বাহির হয়, আর ঐ দ্রব (গলা) পদার্থ রাশির কিছু কিছু তেজে ঐ ধূমের সহিত পর্ব্বতের চূড়া দিয়া আকাশে বাহির হইয়া পড়ে। অনেক উপরে উঠে বলিয়া ঐ দ্রব পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধূলি বা বালির মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আসিবার সময়ে পথে যে সকল পাথরের চাঁই দেখিতে পায়, তাহারা উহার ভয়ানক তেজ থামান দূরে থাকুক, সেই তেজে উহারই সঙ্গে পর্ব্বত হইতে

আকাশে উঠিয়া কত দূরে গিয়া পড়িতে থাকে, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তখনও সেই ভিতরকার সমুদ্রের দুই একটা ঢেউ দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। সমুদ্রকে তখনও দেখা যায় নাই। অবশেষে ও সকল উৎপাত কম হইয়া আইসে, আর পর্ব্বতের উপরিস্থ সেই কড়ার মত গহ্বরটী ভিতরের গলা পাথরাদিতে পরিপূর্ণ হয়। দ্রব পদার্থের সাগরে আর ঢেউ নাই, সাগর এখন স্বয়ং উথলিয়া উঠিয়াছে! পর্ব্বতের শিখর দেশের গহ্বর হইতে পৃথিবীর ভিতর পর্য্যন্ত যে নল আছে বলিয়াছি, ঐ নল দিয়া ক্রমে ক্রমে চূড়া পর্য্যন্ত দ্রব ধাতু, প্রস্তর প্রভৃতির সেই সমুদ্র উথলিয়া উঠে ও ঐ গহ্বরটী পরিপূর্ণ করে। সেটী কিন্তু বেশী বড় নয়, কাজেই তার মধ্যে কতক্ষণ সেই সাগরে গলা সামগ্রীর স্থান হ'বে বল? কাজেই উহার যে দিক নীচু, সেই দিক দিয়া গড়াইয়া অগ্নি-সমুদ্রের তরল পাথর পর্ব্বতের গা বহিয়া পড়িতে আরম্ভ হয়। ইহারই নাম (Lava) "লাভা"। প্রায়ই আগ্নেয়গিরির গায়ে অনেকগুলি ছোট ছোট গহ্বর থাকে, সেই ছোট ছোট গহ্বরগুলি দিয়াও দ্রব পদার্থের স্রোত বহিতে দেখা যায়। কখন কখন পর্ব্বতের গা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া থাকে। কখন বা নূতন স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেখানে নূতন আগ্নেয় পর্ব্বত উৎপন্ন করিতেও দেখা যায়। এই দ্রব-প্রবাহ বড় ভয়ানক। ইহাই ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের মূল কারণ, এবং ইহা দ্বারাই আগ্নেয় পর্ব্বত সকল প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা দ্বারাই সমুদ্রের কত শত দ্বীপও নির্ম্মিত হইয়াছে। সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন নামক একজন বিখ্যাত সাহেব আগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুৎপাত সম্বন্ধে নিজে জ্ঞানলাভ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে জানাইবার জন্য ভীষণ অগ্নিকুণ্ড সম ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের নিকট নেপলস্ দেশে ৩০ ত্রিশ বৎসর কাল বাস করেন। তিনি ঐ দীর্ঘকালের মধ্যে অনেকবার উহার ভয়ানক উৎপাত স্বচক্ষে দেখিয়া যেরূপ সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আগ্নেয়গিরির বিষয়ে বেশ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু এ যে ভয়ানক ব্যাপার, তা না দেখিলে কিছুই অনুভব করা অসম্ভব। তথাপি তোমাদের জন্য আমার না দেখা কথা অপেক্ষা তাঁহার এক বারের বর্ণনা হইতে কতকটা বলি শুন।

"১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত পর্ব্বতে যে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় ইনি এইরূপ লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে তোমাদিগকে বলি :— '১৫ই জুন রবিবার রাত্রি দশটার সময়ে হঠাৎ একটা ভূমিকম্প হইল, বাহিরে গিয়া দেখি পর্ব্বতের চূড়ার উপর ও চারিদিকের ছোট চূড়ার (গতবারের ভিসুভিয়সের চূড়ার ছবি দেখ) উপর দিয়া ভয়ানক অগ্নিশিখা ও কাল ধোঁয়া বাহির হইতেছে। এইরূপ ভলকে ভলকে এমন কি ১৫টা স্থান দিয়া অগ্নি ও ধূম বাহির হইতে দেখিলাম। বজ্রের মত ভীষণ গর্জ্জনে কাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তার পর বোধ হইল যে দ্রব পদার্থের প্রবাহ সকল পর্ব্বতের চূড়া ও গায়ের নানা স্থান দিয়া বাহির হইয়া গা বহিয়া নীচে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

'এদিকে ক্রমাগত যেন ঝড়ের সময় সমুদ্রের ডাকের মত হুহু শব্দ অনবরত হইতেছে, ওদিকে যেন শত সহস্র হাউই এক সঙ্গে ছুড়িলে যেমন ভয়ানক শব্দ হয়, তেমনি ভয়ানক শব্দে হাজার হাজার পাথরের চাঁই, আকাশে মহাতেজে শাঁ শাঁ

করিয়া ছুটিতেছে ও কতদূরে গিয়া পড়িয়া গৃহদ্বার জানালা চুরমার করিয়া দিতেছে; আবার তার মধ্যে ঘনঘন লক্ষ লক্ষ কামান একত্রে আওয়াজ করিলে যেমন শব্দ হয় বা শত শত বজ্রাঘাত উপরি উপরি হইলে যেরূপ হয়, তেমনি শব্দে কানে তালা লাগিয়া যাইতেছে; আকাশ যেন ফাটিয়া যাইবে। পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইবে! পর্ব্বত যেন চূর্ণ হইবে!! সে দৃশ্য না দেখিলে বর্ণনার দ্বারা অনুভব করা অসম্ভব।

'পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে পর্ব্বতের গা বহিয়া দ্রব পদার্থের স্রোত নীচে আসিয়াছে এবং পর্ব্বতের নিম্নের "টরিডেল্ গ্রেকো" (Torredel Greco) নামক নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার অধিকাংশ স্থল দগ্ধ ও উচ্ছন্ন করিয়া শেষে সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। যেখানে গিয়া সাগরে মিশিয়াছে তথায় ৮০০ হস্ত চওড়া, ৮ আট হাত জলের ভিতর ও ৮ আট হাত উচ্চ সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ ষোল হস্ত পুরু একটী নূতন অন্তরীপ প্রস্তুত হইয়া গেল। জলের মধ্যেও প্রায় ৪২০ চারি শত কুড়ি হস্ত লম্বা হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ দ্রব-স্রোত যে কি ভয়ানক গরম তাহার কল্পনাই হয় না। এত পথ চলিয়াও যখন জলে পড়িয়াছে, দেখিলাম যে সে স্থলের জলরাশি টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল। এমন কি আমি প্রায় ২০০ দুই শত হস্ত দূরে ছিলাম আমার নিকটের জলেও প্রচুর ধূম উঠিতেছিল, ও উহাতে হাত দিবা মাত্র আমার হাত বাস্তবিকই পুড়িয়া গেল। আমাদের নৌকার তলায় যে পীচ দেওয়া ছিল মাঝি দেখিল তাহা ঐ উত্তাপে গলিয়া যাইতেছে ও নৌকায় জল উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম।' এইরূপ কত ভয়ানক কথা এর পর শিখিবে, এখন সে সমস্ত কথা বলা অসম্ভব।"

অমূল্য—"দাদা বাবু! দ্রব-প্রবাহ কি রকম—ভাল করিয়া বলুন না, কতকটা বুঝিয়াছি বটে কিন্তু ওবিষয়ে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

নবীন বাবু—"যথার্থ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে কিরূপে এমন কঠিন বিষয় তোমরা বেশ্ মনে ধারণা করিতে পারিবে। এ নিজে না দেখিলে তেমন উত্তমরূপে বুঝা কঠিন তবু এস দেখি যতটুকু পার শুন। যখন ঐ স্রোত বহিতে থাকে তখন তাহার চেহারা বড় ভয়ানক। তোমরা মনে কল্পনা করিলেই বুঝিতে পারিবে প্রায় এক মাইল দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, ৮।১০।১২ হাত উচ্চ একটা গলা পাথরের নদী চলিয়াছে। তাহার উত্তাপে নিকটে যায় কার সাধ্য? জলন্ত রক্তবর্ণ, উপরটা ধোঁয়ায় ঢাকা, ভিতরে যেন হাপর! তোমরা কখন লৌহ গলাইবার হাপর দেখ নাই তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিতে। যাহা হউক এই অগ্নিময় পাথরের নদী চলিয়াছে, সম্মুখে যাহা পড়িতেছে, অল্পক্ষণ মধ্যেই ইহার ভয়ানক গরমে পুড়িয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় মন্দির, যাহা কিছু সম্মুখে পড়িবে, সকলই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে ধ্বংস করিতে করিতে কতদূরই চলে তাহার ঠিক নাই। কখন কখন পর্ব্বত হইতে অল্প দূর গিয়াই থামিয়া যায়, কখন বা সাগরে গিয়া মিশে, কখন বা অনেক ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। আইস্লণ্ড দ্বীপের "স্কাপ্টার যোকুল" নামক আগ্নেয় পর্ব্বতের দ্রব-প্রবাহ বড় ভয়ানক। তথাকার ১৭৮৩ সালের অগ্নিকাণ্ড ১১ই জুন আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত দুই বৎসর কাল চলিয়াছিল। পর্ব্বতের দুই পাশ দিয়া দুটী

প্রবাহ বাহির হইয়া একটী ৫০ পঞ্চাশ মাইল, অপরটী ৪০ চল্লিশ মাইল পথ গিয়াছিল। প্রথমটীর বিস্তার ১২ হইতে ১৫ মাইল; অপরটীর প্রায় ৭ মাইল। চলিতে চলিতে ২০টী গ্রাম উচ্ছন্ন দেয় এবং ৯,০০০ নয় হাজারেরও অধিক লোকের প্রাণ বিনাশ করে। তদ্ভিন্ন পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যে কত নষ্ট হইয়াছিল তাহার সীমা নাই। এমন কি সে ক্ষতি আইস্‌লণ্ড বাসীরা আজও পূরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই; "স্ক্যাপটা" নামক ১৩৫ হাত চওড়া, ৪০০ হাত গভীর একটী পার্ব্বতীয় নদী ঐ দ্বীপে ছিল। দ্রব-পদার্থের স্রোত চলিতে চলিতে ঐ নদীতে গিয়া পড়ে এবং বহু দূর পর্য্যন্ত ঐ নদীর গভ পূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। এখন ভাবিয়া দেখ যে কত দ্রব পদার্থই বাহির হইয়াছিল!!

"ক্রমে যত পুরাতন হয় এই প্রবাহের উপরি ভাগের পাথরের চাঁইগুলি তত জমাট বাঁধিয়া কঠিন হয়; এমন কি তখন দেখিলে বোধ হয় যেন রাশি রাশি পাথর এক সঙ্গে জমাট করিয়া কোন দৈত্য সেই চাঁই পিছন থেকে ঠেলিয়া দিতেছে। উপরে কঠিন পাথর, তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। আর বাস্তবিকও কত লোক প্রথম দিন পলাইতে না পারিয়া কোন উচ্চ স্থানে লুকাইয়া থাকে, পরে শুকাইয়া গেলে ঐ কঠিন পাথরের উপর দিয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। উপরের ঐ কঠিন আবরণের ভিতরে কি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড তা বুঝিতেই পারিতেছ। সে আগুণ অনেক দিন পর্য্যন্ত নিবে না। ১০।১৫ দশ পনের বৎসর পর্য্যন্তও তাহার উপরের ফাটল দিয়া ভিতরের গরম ভাব উঠিতে দেখা যায়; তাহাতে হাত নিশ্চয় পুড়িয়া যাইবে।

সাগরের গর্ভেও আগ্নেয়গিরি থাকে। তাহাদের যখন অগ্ন্যুদ্গম হয়, তখন প্রায় ভয়ানক কাণ্ড হইয়া থাকে; অনেক স্থলে নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নূতন গহ্বর থাকে তাহা হইতে আবার উৎপাত হয়। এইরূপেই সিসিলী দ্বীপে এটনা, আইস্‌লণ্ডের হেক্লা, কেনেরী পুঞ্জের টেনেরীফ্ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।"

অনেক রাত্রি হওয়ায় আজ এইখানেই গল্প শেষ হইল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বাড়ী গেলেন

ছেলেবেলায় নেলসন্।

অন্যকল জাতি অপেক্ষা ইংরাজেরা জলযুদ্ধে বড়। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে জাহাজে লড়াই হইলে আজ কাল কোন দেশের লোকই ইংরাজকে পরাজয় করিতে পারে না। এই জন্য তাহাদিগকে জলের রাজা বলে। কাহার জন্য তাঁহারা এত বড় হইলেন জান? তিনি হোরেসিও নেলসন্। ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের মহাযুদ্ধ হয়। তাহাতে তিনি আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ও সাহসের গুণে জয় লাভ করেন। নেলসনের সমস্ত জীবন চরিত

আজ তোমাদিগকে বলিব না। তিনি যখন তোমাদের মত ছেলেমানুষ ছিলেন সেই সময়ের দুই একটী কথা শোন। দেখিতে পাইবে যাঁহারা বড় লোক হন ছেলেবেলা হইতেই তাঁহাদের বড় লোক হইবার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

নেলসন্ যাহা করিব বলিতেন তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। তাঁর সাহসের কথা শুনিলে গল্প বলিয়া বোধ হয়। ১২ বৎসর বয়সের সময় তিনি একদিন একটা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার কাকা কোন জাহাজের কর্ত্তা হইয়া এক যুদ্ধে যাইতেছেন। তাঁহার দেড় বৎসরের বড় এক দাদা তখন তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বলিলেন "দাদা, শীঘ্র বাবাকে পত্র লেখ; আমি কাকার সঙ্গে লড়ায়ে যাব।" কত লোক তাঁকে কত বুঝাইল; কত লোক কত ভয় দেখাইল; কেহ বলিল এক গোলার চোটে তোমার মাথা চূর্ণ হইয়া যাইবে; কেহ বলিল সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না; কিন্তু তিনি শুনিলেন না। একবার যাহা বলিয়াছেন তাহা ফিরাইলেন না। তাঁহার পিতা তাঁহার স্বভাব জানিতেন; তিনি বড় অধিক আপত্তি করিলেন না; হোরেসিও হাসিতে হাসিতে কাকার সঙ্গে যুদ্ধে চলিয়া গেলেন। সে যুদ্ধে তাঁহার নাম বাহির হয়।

ইউরোপের উত্তরে কোথায় কি দেশ আছে তাহা তখনো সকল আবিষ্কার করা হয় নাই। কতবার কত লোক জাহাজে চড়িয়া দেশ আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন; কেহই বড় একটা কিছুই করিতে পারেন নাই। সে দেশে বড় শীত। জল পর্য্যন্ত জমিয়া যায়। কত লোক তথায় যায়, আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। যাহা হউক এই সময়ে আর একজন কাপ্তেন এক জাহাজ লইয়া এ অঞ্চলের দেশ আবিষ্কার করিতে যাত্রা করেন। নেলসন্ তাঁহাদের সঙ্গে যান। এখন তিনি ছেলেমানুষ হইলেও অনেকের জানিত লোক। তিনি কয়েকজন গোরার কর্ত্তা হইলেন।

তাহার পর কি হইল শোন। এক জায়গায় জাহাজ বাধিয়াছে; চারিদিকে বরফ, রাত্রি দুই প্রহর, অত্যন্ত কুয়াসা দিয়াছে। কাজে কাজেই বড় নজর চলে না। এমন সময় নেলসন্ একজন বন্ধুর সহিত জাহাজ হইতে কাপ্তেনের অনুমতি না লইয়া নামিলেন; তাঁহারা ভল্লুক শিকার করিবেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই এক প্রকাণ্ড ভল্লুক দেখিতে পাইলেন। উহা সর্ব্বদা বরফের মধ্যে থাকে বলিয়া ঠিক আমাদের দেশের ভালুকের মত নয়; কিন্তু খুব ভয়ানক। উভয়ে গুলি চালাইলেন, কিছুই হইল না। একটা দুটা করিয়া চারিবার বন্দুক আওয়াজ করা হইল ভালুকের কিছুই হইল না। এদিকে বারুদ কেপ ফুরাইয়া গিয়াছে; তখন সঙ্গী বলিলেন "হোরেসিও, চল জাহাজে পলাইয়া যাই।" কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না, বলিলেন "পালাব না, বন্দুকের ঘা মারিয়া ভালুকের মাথা ভাঙ্গিব।"

এমন সময় কুয়াসা ফুরাইয়া গিয়াছে। জাহাজের লোকে সকলে উঠিয়াছেন। নেলসনের বন্ধুগণ তাঁহাকে খুঁজিতেছেন। সকলে দেখিলেন যে তিনি বন্দুকের বাঁটের আঘাতে এক ভয়ানক ভালুক মারিতেছেন। জানোয়ারটা তাঁহাকে খাইতে আসিতেছে। জাহাজ হইতে কত লোক তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ বিউগিল বাজাইয়া আসিতে বলিলেন। তিনি

শুনিলেন না। ভালুক মারিয়া তবে ফিরিলেন। অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভালুক মারিয়া কি করিবে?" নেলসন্ উত্তর করিলেন "উহার চামড়া লইয়া যাইয়া বাবাকে দিব।"

বাস্তবিক, ভয় কাহাকে বলে নেলসন্ তাহা জানিতেন না। যখন তিনি খুব ছেলে মানুষ তখন এক রাখালের সহিত একদিন পাখী ধরিতে যান। খাবার সময় চলিয়া গেল। তবু তিনি ফিরিলেন না। সকলে খুঁজিতে লাগিলেন; অবশেষে দেখেন যে বালক এক নদীর তীরে একেলা বসিয়া আছে। তাঁহার ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন "একেলা বসিয়াছিলে, ভয় পাও নাই?" বালক সরল ভাবে উত্তর করিল "ভয় কাকে বলে ঠাকুরমা; ভয় কেমন জিনিস।"

আর একটী তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল। তাহা এখনো তোমাদিগকে বলা হয় নাই। তিনি

মিথ্যার দিক্ দিয়ে যাইতেন না। একদিন খুব বরফ পড়ে। আমাদের দেশে যেমন জল হয় শীতপ্রধান দেশে সেইরূপ বরফও পড়িয়া থাকে। হোরেসিও ও তাঁহার ভ্রাতাদের স্কুলে যাইবার সময় হইয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন আজ আর স্কুলে যাওয়া যাবে না। বরফে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পিতা উত্তর করিলেন, আচ্ছা বই লইয়া রাস্তায় বাহির হও, যদি না পার ফিরিয়া আসিবে। কয়েক ভাই পড়িতে যাইতে বাহির হইলেন, বড় ভাই বলিলেন "এত বরফে যাওয়া যাবে না।" কিন্তু হোরেসিও বলিলেন "তাহা হ'বে না; বাবা আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, যেমন ক'রে পারি স্কুলে যা'ব" এই বলিয়া তিনি স্কুলে চলিয়া গেলেন।

বালক বালিকাগণ! তোমাদিগকে অধিক কিছু বলিব না। তোমরা বোধ হয় নিজেই বুঝিতে পারিতেছ যে, বড় লোক হইতে হইলে ছেলাবেলা হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। "ছেলে মানুষ বই ত নই; এখন শুধু খেলে দেলে বেড়াই, পরে ভাল ভাল কাজ করিব," এমন ভাবিলে কিছুই হইবে না। যে যে বিষয়ে বড় হইতে ইচ্ছা কর এই ছেলেবেলা হইতেই চেষ্টা কর। নহিলে আর হইবে না।

নূতন-গল্প।

এক রাজা তার তিন ছেলে। বড় ছেলে গাঁজা খায়, মেজ ছেলে লাঠি হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, ছোট ছেলে বাপের কাছে বসিয়া রাজ্যের কাজ-কর্ম্ম দেখে। বড় দুটো ছোটটীকে দেখিতে পারে না।

"সোণার গাছ, রূপোর পাতা; শ্বেত কাকের বাসা তাতে!" রাজার বড় ইচ্ছা এই গাছ ছেলেরা আনিয়া দেয়। তিন ছেলে কত জায়গায় ঘুরিল। বড় দুটীর কি হইল জানা গেল না; ছোটটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক রাজার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে জন প্রাণী কিছুই নাই; সব খালি। এক ঘরে একটী মেয়ে ঘুমাইয়া আছে; তাহার মাথার কাছে রূপোর কাঠি, পায়ের কাছে সোণার কাঠি। সে পায়ের কাঠিটী মাথায় আনিল আর মাথার কাঠিটী পায়ের দিকে লইল; অমনি মেয়েটী জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, "হায়! মানুষের ছেলে তুই এখানে কেন এলি? তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে। এ বাড়ীতে রাক্ষস থাকে আমার বাবাকে খাইয়াছে, মাকে খাইয়াছে, বাড়ীর সকলকে খাইয়াছে, সে দিন দুটী রাজার ছেলে 'সোণার গাছ রূপোর পাতা, শ্বেত কাকের বাসা তাতে' এই গাছ নিতে এসেছিল, তাদেরও খেয়েছে। আমাকে যে কেন খায় নি জানিনে।" সে বুঝিতে পারিল যে মেয়ে তাহার দুই দাদার কথাই কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া কত কথাই জানিয়া লইল;—রাক্ষসগুলি সহজে মরিবে না তবে যদি কেহ ঐ পুকুরের তলায় যে স্ফটিকের স্তম্ভ আছে সেটাকে এক নিশ্বাসে ডুব দিয়া তুলিতে পারে; তার পর তাহাকে ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরে যে ভ্রমরটী আছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে তবে ঐগুলি মরিবে। রাক্ষসেরা যত লোককে খাইয়াছে, তাহাদের হাড়গুলি সবই রাখিয়া দিয়াছে। যদি কেহ রাক্ষসগুলিকে মারিয়া তার পর ঐ হাড়-গুলিতে এই সোণার কাঠি এবং রূপার কাঠি ধোওয়া জল ছড়াইয়া দিতে পারে, তবে ঐ সকল

লোক বাঁচিয়া উঠিবে। রাজার ছেলে এই কথা শুনিয়া একদিন রাক্ষসদের অনুপস্থিতিতে এই সকল কার্য্য সাধন করিল। রাক্ষসও মারিল ভাইদেরও বাঁচাইল।

আরও এক গল্প শুনিয়াছি। রাজার মেয়ে মরিয়া গেল, মুনি ঠাকুর আসিয়া রাজার নিকট বলিলেন, "রাজা তোমার মেয়েকে আমি বাঁচাইয়া দিতেছি। আমাকে একটা বড় কড়া দাও, একটা টেবিল দাও, একটা ছুরি দাও, আর জল ও আগুন দাও। রাজা সকলই দিলেন। মুনি ঠাকুর সেই মড়াটাকে কড়াতে সিদ্ধ করিয়া তার মাংস গুলি ফেলিয়া দিলেন। পরে হাড়-গুলি পরিস্কার করিয়া টেবিলে রাখিয়া তাহাতে মন্ত্র পূর্ব্বক জল ছড়াইয়া দিলেন, আর অমনি যে মেয়ে ছিল সেই মেয়ে হইয়া উঠিল।

এ সব তো গেল গল্প। সত্যি সত্যি মড়া বাঁচাইতে দেখিয়াছ? আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি। চোরা-সান্নিপাত রোগে যাহারা মরে, তাহাদের অনেককে দেশীয় শাস্ত্রীয় কবিরাজেরা বাঁচাইয়াছেন; এরূপ গল্প অনেকের মুখে আমি শুনিয়াছি।

একখানি ইংরাজি কাগজে নিম্ন লিখিত গল্পটী পড়িয়াছি।—

"বিলাতের একজন ডাক্তার একটী ছোট কুকুরের গলার শিরা কাটিয়া দিলেন; কুকুরটী দেখিতে দেখিতে রক্ত পড়িয়া মরিয়া গেল। মরিয়া গেলে পর তিন ঘণ্টা কাল একটী ঘরে কুকুরটীকে রাখিয়া দেওয়া হইল। কুকুরটী শক্ত হইয়া গেল। তার পর তাহাকে গরম জলে ফেলিয়া ক্রমাগত মাজিয়া দেওয়া হইল। হাত পা গুলি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে পর শরীরটা যেন বেশ নরম হইল, তারপর সাহেব একটা রবারের নল দিয়া তাহার পেটে তিন ছটাক রক্ত পুরিয়া দিলেন। একটা কল দিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস করান হইতে লাগিল; এবং একটা বড় কুকুরের রক্ত ঐ ছোট কুকুরটীর গায়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। এই সকল কার্য্য একবারে হইতে লাগিল। অর্থাৎ একজন সাহেব নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করাইতে লাগিলেন, একজন রক্ত দিতে লাগিলেন আর এক জন ক্রমাগত তাহার শরীরটা মাজিতে লাগিলেন। ক্রমে কুকুরটীর চক্ষু সতেজ হইল, আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে শরীরটী একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। তার পর কুকুরটী হাঁপাইতে লাগিল, চক্ষু উজ্জ্বল হইল; শেষে ফিট হইলে যেমন হয়, সেইরূপ করিতে লাগিল। তার পর ক্রমেই শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল, একটু একটু কোঁকাইতেও লাগিল। প্রথম রক্ত দেওয়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে কুকুরটী উঠিয়া বসিল। শীঘ্রই দাঁড়াইয়া তার পর হাঁটিতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যে সে রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

"সাহেবদের গরু বাছুর মারিতে আপত্তি নাই, সুতরাং ডাক্তার মহাশয় একটী বাছুরকেও ঐরূপ করিয়া দেখিলেন। সেও বাঁচিল। আর একটী ছোট কুকুরকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া আবার ঐ প্রণালীতে বাঁচাইয়া দিলেন।"

আমরা ছোট খাট রকমে এক প্রকার মরা জানোয়ার বাঁচাইয়াছি। সে হয়ত পাঠকগণের মধ্যে সকলেই এক এক বার করিয়া থাকিবেন। মাছি গুলিকে দু একটা চড় চাপড় মারিলেই তাহারা মরিয়া যাইতে রাজি হয়। একটী মাছিকে ঐরূপ করিয়া তাহাকে সহজেই পুনরায় বাঁচান যাইতে পারে। মাছিটীকে এক হাতে রাখিয়া আর এক হাত দিয়া তাহার উপর একটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেও। ঘরের একটী ছোট দরজা রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া, খুব ফুঁ দিতে থাক। দেখিবে, শীঘ্রই মাছিটী বাঁচিয়া উঠিবে।

আমাদের দেশের কথা শুনিয়াছি, সর্পাঘাতে মরা লোকগুলিকে তিন দিন চারি দিন পরে ওঝা আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া বাঁচাইয়া দিতে পারে। সত্য মিথ্যা শপথ করিতে পারি না।

শ্রী—[illegible] দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
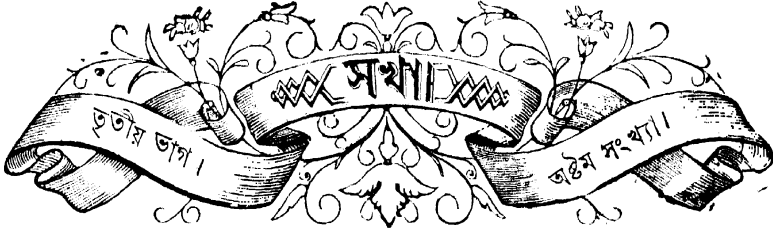
আগষ্ট, ১৮৮৫।

(প্রাপ্ত।)

শোক-সঙ্গীত।

১

কেমনে কহিব 'সখা'!—শুনে যে ঝরিছে আঁখি
"গিয়াছেন সম্পাদক আমাদের দিয়ে ফাঁকি"!
শত বজ্রাঘাত হেন, মরমে বাজিল যেন,
নাই সে "প্রমদা বাবু" এ জগতে নাই?
কেরে আজ কেড়ে নিলি আমাদের ভাই!

২

সন্ধ্যায় যে শশী ছিল তায় রাহু গরাসিল,
উজ্জ্বল জ্যোছনা, আহা না হ'তে প্রকাশ
পূর্ণিমায় অমাবস্যা একি সর্ব্বনাশ!

৩

এত যে উন্নতি আশা, স্বদেশের ভালবাসা
মঙ্গল কামনা এত, কিছুই হল না?
পাষাণ শমন তাঁরে সময় দিল না!

৪

অবোধ বালকগণে প্রাণপণে সযতনে
কে শিখাবে নবনীতি? প্রতিমাস এলে,
কে দিবে তোমাতে 'সখা'! এত মধু ঢেলে?

৫

'সখা'র উন্নতি তরে কে আজি যতন করে?
ভীষণ আষাঢ় মাস! কেন তুই এলি,
ভাঙিলি নবীন তরু না উঠিতে কলি!

৬

হায়রে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
অকালে এহেন জনে করিল হরণ,
এমন কঠিন মন তোরই শমন!

৭

প্রিয় শিশু ভাই বোন! তোদের কোমল মন
কতই ব্যথিত আজ! বলিতে না পারি,
(আমাদের বুক ফাটে, বলিব কি করি।)

৮

যে তোদের অবিরত, দিতে ছিল শিক্ষা কত
সে শিক্ষক সে বান্ধব আজ আর নাই।—
কাঁদে না পাষাণ কেবা মনে করি তাই?

৯

তিনটী বছর ধরে, তোদের কল্যাণ তরে
খেটেছেন, খাটিতেন আর (ও) কত, হায়
আজি তা ভাবিতে শুধু বুক ফেটে যায়।

১০

উৎসাহেতে পূর্ণ মন, ছিল আশা অগণন,
ধরিল নিদয় রোগ এমন সময়,
স্বদেশ বৎসল যুবা মাগিল বিদায়!

১১

কোথা সে উন্নতি তাঁ'র, মানবের উপকার,
কোথা র'ল চির সাধ ইংলণ্ড ভ্রমণ
কিছুই না হ'তে হল অকাল মরণ!!

১২

চলি গেছে মহামতি যথা সে অমরাবতী
অনন্ত শান্তির রসে হয়েছে মগন।
আঁধার এ বঙ্গভূমি বঙ্গবাসী মন।

১৩

তিন বছরের ছেলে তুমি সখা! পড়ে রলে,
এখন ভরসা যত অনাথ-পালকে
তাঁরাই নেবেন কোলে কাঙ্গাল বালকে!

১৪

দেশের রতন গুলি, কেবল পড়িছে খুলি
জ্ঞানী ধনী গুণী মানী মরিছে সবাই;
মরিলা "প্রমদা বাবু" আমাদের (ই) ভাই!

১৫

আয় আয় ভাই বোন, খুলিয়া পরাণ মন
আমরা চাহিরে ভিক্ষা বিভু পদ তলে,
রাখুন সে মহাত্মারে, স্নেহময় কোলে।

১৬

যা'ক দিন মাস বর্ষ, ভারত পাউক হর্ষ,
লভুক অভাগা 'সখা' পরম উন্নতি
ফুরাবে না আমাদের এ বিষাদ-গীতি।

অন্ধদিগকে দয়া কর।

সময় নাই, অসময় নাই, যখনই কোন সহরের বড় রাস্তায় বাহির হও তখনই দেখিতে পাও যে কত অন্ধ রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া ধূলিতে গড়াগড়ি করিয়া ভিক্ষার জন্য কাতোরক্তি করিতেছে। সমস্ত দিন না খাইয়া সকালবেলা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাস্তায় বসিয়া ভিক্ষা করে; পরে সন্ধ্যা হইলে যখন গাড়ী ঘোড়ার চলতি কমিয়া আইসে তখন যথা-সাধ্য বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ভিক্ষা করে। এইরূপ করিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু পায় তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

গ্রীষ্মকালে যখন আমরা ছাতি লইয়াও রাস্তায় চলিতে ক্লেশ পাই, তখন বিনা ছাতিতে দুই প্রহরের সময়ে পথে বসিয়া থাকা, এবং শীতকালে রাত্রিতে যখন আমরা লেপের মধ্যে শুইয়া থাকিয়াও আরাম বোধ করি না, তখন প্রায় শুধু গায়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া ভিক্ষা করা কি কষ্ট তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোন কালেই তাহাদের কষ্টের বিরাম নাই।—নির্জ্জন রাত্রিতে যখন রাস্তায় লোকের চলাচলতি কমিয়া আসি-য়াছে তখন "কানা অন্ধকে দয়া কর মা! অনাথ গরিবকে দয়া কর বাপ্!!" এই কাতোরক্তি শুনিলে কি কষ্ট হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পার। শরীরের সুখ, অসুখ, রোগ, শোকের প্রতি দৃষ্টি নাই; সব সময়েই বৃদ্ধ যুবা, বালক বালিকা, স্ত্রী পুরুষ, সকলেই এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া ভিক্ষা করিতেছে।

আবার যাহাদের ঘর দোর, আত্মীয় স্বজন নাই তাহাদের আরও কষ্ট। পরের বাড়ীতে থাকিয়া, পরের সাহায্যে পথ চলিয়া যাহা পায় তাহারও অংশ যাহারা আশ্রয় দেয় তাহা-দিগকে দিতে হয়। এই কষ্টের রোজগারের যৎ-সামান্য অংশের জন্যও পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হয়। ইহা হইতে আর কি দুঃখ আছে? যাহাদের চক্ষু নাই, চেতন জীব হইয়াও যাহারা
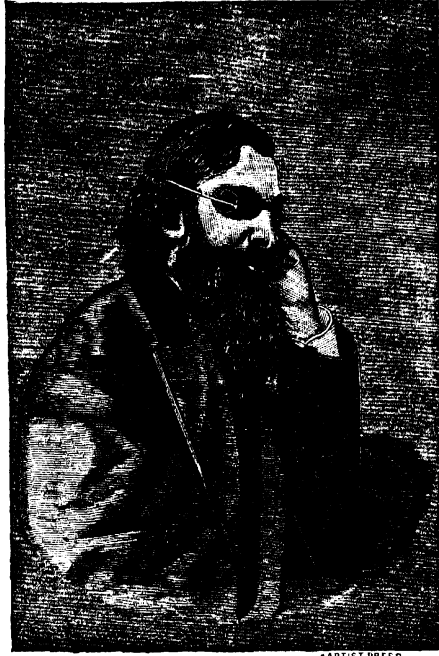
অচেতন পদার্থের ন্যায় অন্যের সাহায্য ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাহাদের মত দুঃখী আর কি কেহ আছে ?

আমাদের দেশের অন্ধদের এইরূপই দুরবস্থা। তাহাদের দুঃখ, কষ্ট দেখিবার লোক নাই। যদি এই দুঃখীদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার কোনরূপ উপায় থাকিত তাহা হইলে আজ তাহাদের এমন দুরবস্থা হইত না। অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার কথা বলিলাম বলিয়া হয়ত তোমরা কেহ কেহ বলিয়া উঠিবে যে যাহার চোক নাই সে আবার কি করিয়া লেখা পড়া শিখিবে? যাহারা অন্ধ তাহারা চিরকালই ভিক্ষা করিয়া খাইবে। আমাদের দেশে অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার কোন প্রকার স্কুল নাই, তাহাদিগকে সৎপথে রাখিয়া মানুষ করিবার কোন উপায় নাই কাজেই তাহাদের এত কষ্ট। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, রোগ শোক ভুলিয়া গিয়া, শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া কাজেই তাহারা ভিক্ষা করিতেছে। এই ভিক্ষা দ্বারাই কোনমতে কষ্টে স্বষ্টে তাহারা তাহাদের নিজের ও পরিবারের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে।

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য স্থানে অন্ধদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল, কালেজ আছে, উহা শুনিলে তোমরা হয়ত আশ্চর্য্য বোধ করিবে। বিলাতে অন্ধদের শিক্ষার জন্য, তাহাদিগকে সৎপথে রাখিয়া মানুষ করিবার জন্য কিরূপ যত্ন এবং চেষ্টা করা হয় এবং অন্ধেরা শিক্ষা পইয়া কি কি কাজ করিতেছে শুনিলে তোমরা অবাক হইবে!—

উপরে যাঁহার ছবি দেখিতেছ উনি একজন জন্মান্ধ; উনিই বিলাতে অন্ধদের দুরবস্থা দেখিয়া

তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য (Royal Normal College for the Blind) রয়াল নর্ম্মাল কালেজ নামে একটী কালেজ স্থাপন করেন। যে মহাপুরুষ নিজে অন্ধ হইয়া তাঁহার সমাবস্থাপন্ন দুঃখীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই কালেজ স্থাপন করিয়া নিজে অধ্যক্ষ হইয়া কাজ করিতেছেন তাঁহার ইতিহাস একটু বলি শুন।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের (United States) অন্তঃপাতী টেনেসে নগরে প্রায় ৫০ বৎসর হইল ফ্রান্সিস জোসেফ্ ক্যাম্বেলের জন্ম হয়; তিনি জন্মাবধিই অন্ধ। যখন অতি শিশু ছিলেন তখন সকলেই তাঁহার কিছুই হইবে না বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি কিছু না করিবার ছেলে ছিলেন না; ছেলেবেলা হইতেই সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া সময় কাটাইবার অনেক নির্দ্দোষ আমোদজনক উপায় শিখিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অন্ধেরা যেমন ছেলেবেলা হইতেই কুসঙ্গে মিশিয়া কুকাজ করিয়া সময় কাটায় এবং ভাল হইবার জন্য কখনও চেষ্টা করে না; সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সে দশা ঘটে নাই। ভাল হইবার ইচ্ছা মনে ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল।

তাঁহার বাড়ীর কিছু দূরে ন্যাস্‌ভিলি নামক সহরে অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটী কালেজ আছে, তথায় তিনি ছয় বৎসর বয়সের সময়ে ভর্ত্তি হন। তাঁহার এমনই প্রখর বুদ্ধি, তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, তিনি এক ঘণ্টার মধ্যেই বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিলেন। তোমরা ছাপান ইংরাজী অক্ষর দেখিয়া সহজেই বর্ণমালা শেখ, কিন্তু অন্ধদের শিখিবার জন্য এক প্রকার অক্ষর আছে, যাহা হাত দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া শিখিতে হয়; সুতরাং সহজেই বুঝিতে পার তাহাদের অক্ষর শেখা কত কষ্টকর।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই তাঁহার সঙ্গীত শিখিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু কালেজের সঙ্গীত শিক্ষক তাঁহার সঙ্গীত শিখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শিখাইলেন না। তিনি হতাশ না হইয়া নিজে বাটীতে শিক্ষক রাখিয়া সঙ্গীত শিখিতে আরম্ভ করিলেন,—অল্পকাল মধ্যেই তিনি সঙ্গীত এমন ভালরূপে শিখিলেন যে তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি সেই কালেজের সঙ্গীতের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হইলেন।

কেবলমাত্র সঙ্গীত শিখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তাঁহার অঙ্ক শাস্ত্র, গ্রীক ও লাটিন শিখিবার ইচ্ছা হইল। দিনের বেলায় স্কুলে অধ্যাপকের কাজ করেন বলিয়া এই সমুদয় শিখিবার সময় দিনে পাইতেন না। রাত্রিতে তাঁহার নিকট এই সমুদয় পড়িবার জন্য দুইজন লোক নিযুক্ত করিলেন,—একজন প্রথম রাত্রিতে আর একজন শেষ রাত্রিতে তাঁহার নিকট পড়িতেন; তিনি শুনিয়া শুনিয়া এই সমুদয় বিষয় উত্তমরূপে শিখিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ! তাঁহার পড়িবার ইচ্ছা এবং যত্ন ও পরিশ্রম একবার স্মরণ কর। তিনি স্কুলে কাজ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি দুই জনের সাহায্যে পড়িতেন, একজন তাঁহার সহিত রাত্রি জাগিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়াই দুইজন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পড়িবার জন্য যাঁহার এইরূপ যত্ন এবং পরিশ্রম তিনি যে বড় লোক হইবেন সে বিষয়ে কি আর কোন সন্দেহ আছে? তিনি কেবল মাত্র পুস্তক

পড়িয়া মনের উন্নতি করিতেন না; শরীরের উন্নতির জন্যও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। শরীরের উন্নতির জন্য তিনি প্রত্যহই ব্যায়াম করিতেন; তিনি যে প্রকারে শরীরের অঙ্গ চালনা করিতেন তাহা শুনিলে কখনই তোমরা তাঁহাকে অন্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। তিনি শিকার করিতেন, মৎস্য ধরিতেন, গাছে চড়িতেন, গাছ কাটিতেন, পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিতেন, এক কথায় বলিতে গেলে তিনি কোন কাজ করিতেই ভয় পাইতেন না। এই রূপে শরীরের ও মনের উন্নতি করিয়া তিনি ১৮৬৯ সালে স্ত্রী ও পুত্রের সহিত ইউরোপের যেখানে যেখানে অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য কালেজ ছিল সেই সেই স্থান পরিদর্শন করিতে বাহির হইলেন। সমুদয় স্থান ভ্রমণ করিয়া অনেক নূতন নূতন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া ১৮৭১ সালে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। মনে করিয়াছিলেন যে তিনি এই স্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি বিলাতের অন্ধদের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের জন্য কিছু করিতে কৃত সংকল্প হইলেন।

১৮৭২ সালে (Crystal Palace) স্ফটিক প্রাসাদের নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটী বাড়ী ভাড়া করিয়া অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি একটী কালেজ খুলিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই কালেজের উপর অনেক বড় লোকের দৃষ্টি পড়িল; এবং দুই বৎসর পরে একজন বড় লোকের নিকট হইতে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান প্রাপ্ত হইয়া কালেজের জন্য একটী বড় বাড়ী করিলেন। এই কালেজের নাম (Royal Normal College for the Blind) রয়াল নর্ম্মাল কালেজ রাখিলেন এবং নিজে অধ্যক্ষ হইলেন। এখনও তিনি অধ্যক্ষ আছেন। এই কালেজে অঙ্গ চালনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়; কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই ব্যায়াম করিতে হয়। ডাক্তার ক্যাম্বেল এবং তাহার পুত্রের তত্ত্বাবধানে স্কুলের ছাত্রেরা ব্যায়াম করিতে কিছু মাত্র ভয় পায় না, অনায়াসে সকল প্রকার ব্যায়াম শিখিয়া ফেলে। এখানে এমনি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যায়াম শিখান হয় যে, অন্য কোন স্থানে তাহা অপেক্ষা সুন্দর ব্যায়াম শিখান হয় কি না সন্দেহ। এই শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা ছাত্রদের শরীর বেশ সুস্থ হয় এবং কাজেই পড়া শুনা করিবার ক্ষমতাও বাড়ে। এই বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন ডাক্তার কাম্ব্যালের একজন বন্ধু তাঁহার স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া কয়েকটী দুর্ব্বল ছাত্র দেখিয়া বলিলেন যে "ইহাদিগকে যেরূপ দুর্ব্বল দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় ইহাদের কিছুই হইবে না; কেন অনর্থক ইহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়াছ?" ডাক্তার ক্যাম্বেল বলিলেন যে "নিয়মমত শরীরের অঙ্গ চালনা করিলেই দুর্ব্বল শরীর সুস্থ হইবে এবং পড়া শুনা করিবার ক্ষমতাও জন্মিবে।" কিন্তু তাহার বন্ধু এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক দিন কাটিয়া গেল; উক্ত ছেলেরা নিয়ম মত শরীরের অঙ্গ চালনা করিয়া বেশ সুস্থ হইল। ইহার পর এক দিন পূর্ব্বোক্ত বন্ধু পুনর্ব্বার স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া পূর্ব্বে যে দুর্ব্বল ছেলেদিগকে দেখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন যে "ইহারা কখনই তাহারা নহে, তাহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কাহাদিগকেও দেখাইতেছ?" ব্যায়াম করিয়া শরীরের এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে তাহাদিগকে তিনি চিনিতে পারিলেন না।

শরীরের উন্নতির দিকে যেমন এই রূপ

যত্ন করা হইত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্যও পদপেক্ষা কম যত্ন করা হইত না। প্রত্যেক শ্রেণীতেই সঙ্গীত, ইতিহাস, সাহিত্য, অঙ্ক সমুদয় নিয়ম মত শিখান হয়। এমন যত্নে শিখান হয় যে অনেক ছাত্র কালেজ হইতে বাহির হইয়া কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই কালেজে যাঁহারা নিয়মমত শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইয়াছেন তাহারা কোন অংশেই অন্যান্য স্কুলের শিক্ষিত লোকের চেয়ে কম জ্ঞানবান নহেন। বিদ্যা বুদ্ধিতে কাহারও চেয়ে কম নহেন। ধন্য তিনি যিনি দুঃখী অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য এই নূতন শিক্ষা প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন।

যাঁহাদের পয়সা কড়ি আছে তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য কালেজ আছে, সেখানে পড়িয়া তাঁহারা কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। আর যাহাদের সে রূপ সৌভাগ্য নাই তাহাদের সাহায্যের জন্যও আজ প্রায় ২৭ বৎসর হইল বিলাতে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভার সম্পাদক সম্প্রতি অন্ধ হইয়াছেন; ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে সর্ব্বদা তিনি অন্ধদের সহিত বেড়াইতেন, অন্ধদের সহিত থাকিতেন বলিয়াই অন্ধ হইয়াছেন। অন্ধ হইয়াও তিনি পরিশ্রম করিতে কাতর নহেন, সর্ব্বদাই তাহাদের উপকার করিতেছেন, বাড়ী বাড়ী যাইয়া কাপড় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া অন্ধদিগকে বিতরণ করিতেছেন, যাহার যথার্থ যে অভাব সেই অভাব দূর করিবার জন্য প্রাণ-পণে তিনি চেষ্টা করিতেছেন। এই রূপ খাটিতে খাটিতেই তাহার চক্ষু দুইটী অন্ধ হই-য়াছে। যেমন তিনি তেমন তাহার স্ত্রী; তাহার স্ত্রী ও স্বামীর সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। দুই জনেই বিনা পুরস্কারে আজ ২৭ বৎসর অন্ধ-দিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই সভা হইতে খাটিতেছেন। যাহারা কাজ কর্ম্ম করিয়া খাইতে পারে না তাহাদের সাহায্যের জন্য এই সভা স্থাপিত। এখন এই সভা হইতে প্রায় ১৫০ দেড়-শত অন্ধকে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু করিয়া নগদ দেওয়া হয়। এই সভার বার্ষিক অধিবেশনে অনেক দূর হইতে বহু সংখ্যক অন্ধেরা উপস্থিত হয়। সকলকেই বহু যত্নে আদরপূর্ব্বক খাওয়ান হয়। একটী বড় বাড়ীতে সকলে উপস্থিত হইলে তাহাদের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য প্রথমতঃ একটী সুমধুর সঙ্গীত করা হয়। ইহার পর সমুদয় আত্মীয় স্বজনের পরস্পর আলাপ হয়; বহুদিন পরে দূর দেশবাসী আত্মীয় স্বজনের কথা শুনিয়া তাহাদের যে কি সুখ হয় তাহা বলা যায় না। এই সময়ে সভার সভ্যেরা কাহার বাড়ীতে কি অভাব, কে কে আসিতে পারিল না, কেন আসিতে পারিল না এই সমুদয় অতি যত্নের সহিত জানিয়া লন।

এই রূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে তাহাদিগকে চা, রুটী, মাখন, মাংস, কমলা লেবু ইত্যাদি অনেক প্রকার সুখাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়। যাহারা বার্দ্ধক্য বা রোগ হেতু অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারে নাই তাহাদের জন্য তাহাদের আত্মীয় স্বজনের নিকট কমলা লেবু দেওয়া হয় এবং যখন সকলে বাড়ী ফিরিয়া যায় তখন তাহাদের প্রত্যেককে ৷৹ আট আনা এবং এক এক বাক্স বিস্কুট দেওয়া হয়।

যাহাদের দেখিবার শক্তি নাই, তাহারা যদি এই রূপ পরের সাহায্য না পায়, তাহা হইলে কি দের দুঃখের সীমা আছে! আমাদের দেশের

অন্ধদের যে এমন দুরবস্থা তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহাদের ভাল করিতে কেহই যত্ন করেন না। কাজে কাজেই তাহারা কোন মতে কষ্টে স্বষ্টে ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটায়। ইহাদের মত দুঃখী আর কেহ নাই। ইহারা প্রকৃতই দয়ার পাত্র। হে বালক বালিকাগণ! তোমরা যে যাহা পার ইহাদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিও।

মূল বর্ণ।

বর্ণ মধনু বিষয়ক একটী প্রস্তাব গত বর্ষের 'সখা'র ২৩ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছিল. তাহাতে এক জায়গায় লেখা ছিল যে "লাল, সবুজ আর ভায়লেট্, এই তিনটী মূল বর্ণ; আর অন্য কয়েকটী বর্ণ ইহাদের হইতে উৎপন্ন।" লাল, নীল এবং পীত, এই তিনটী মূল বর্ণ, এইরূপ বিশ্বাসই সাধারণে প্রচলিত; সুতরাং আমাদের ঐরূপ লেখাতে অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে একখানি চিঠিও পাইয়াছি। চিঠিখানি পড়িয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এবং আহ্লাদের সহিত এবিষয়ে আমরা যাহা জানি, পত্র লেখকের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাহা লিখিতেছি।

প্রথমে অবান্তর কথা দু-একটী বলা আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে 'সখা'র এই প্রবন্ধে কুলাইবে না। কিন্তু কিছু একটু বুঝাইতে চেষ্টা করার পূর্ব্বে ও আলোক সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আলোক আছে বলিয়াই আমরা জিনিসের রং দেখিতে পাই। রংটা বাস্তবিক জিনিসের নয়, রংটা আলোকের। জিনিসটা কিছু আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে না; আমরা যে সকল জিনিস দেখি, সেগুলি যদি আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ার দরকার হইত, তবে এতদিনে অন্ধ হইয়া যাইতাম! জিনিস হইতে আলো আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। সেই আলোকের যে রং, জিনিসটার ও সেই রং দেখা যায়। জিনিস হইতে আলোক দুই প্রকারে আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতে পারে। এক,—জিনিসটার ভিতর দিয়া আসিতে পারে, আর—তাহার গায় পড়িয়া উল্টিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতে পারে। আর এক কথা, ভিতর দিয়াই আসুক, আর উল্টিয়াই আসুক, জিনিসে যত প্রকারের আলো পড়ে, সাধারণতঃ তাহার সকল গুলি আমাদের চক্ষে আসিতে পারে না। আলো পড়িবামাত্র জিনিসটা তাহার কিছুটা খাইয়া ফেলে, বাকী আমাদের কাছে আসিতে দেয়। কোন জিনিস লাল আলো ছাড়া আর সকল রঙের আলো খাইয়া ফেলে, তাহাকে লাল দেখা যায়; যে জিনিস সবুজ ছাড়া আর সব আলো খায়, তাহাকে সবুজ দেখা যায়। যে জিনিস সকল প্রকারের আলোই খায়, তাহাকে কাল দেখা যায়। যে জিনিস কোন প্রকারের আলোই খাইতে জানে না, সে সাদা। জিনিসে যত আলো পড়ে তাহার সব যদি সে খাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে কাল দেখাইবে। সবুজ জিনিসে সবুজ ছাড়া আর যেরূপ আলোই পড়ুক না, সে তাহা খাইয়া ফেলিবে এবং কাল দেখা-

হইবে।* আমরা সাধারণতঃ যে আলোতে দেখি তাহা সাদা। সাদা আলো সকল প্রকারের আলোর সমষ্টি; সুতরাং তাহাতে সকল প্রকারের জিনিসই স্বাভাবিক বর্ণের দেখা যায়। সাদা জিনিস কোনরূপ আলোকই খায় না, সুতরাং তাহাতে যখন যে রঙের আলো পড়ে, তখন সেই রং দেখায়। ইত্যাদি।

লাল রঙের কাচ লাল কেন? না, তাহার ভিতর দিয়া সে কেবল লাল রঙের আলো আসিতে দেয়, আর সব খাইয়া ফেলে। সবুজ কাচের ভিতর দিয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে পারে, সেই জন্য সে সবুজ; ইত্যাদি। এখন মনে কর একখানা লাল রঙের কাচের উপর একখানা সবুজ রঙের কাচ রাখিয়া দুখানারই ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে কি দেখিবে? লালে সবুজে মিশিয়া যে রং হয়? না; সবুজ কাচখানা আলোর সব রং খাইয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে দিয়াছিল, লালখানায় তাহাও খাইয়া ফেলিল। সুতরাং কোন রংই দেখিবে না। দেখিবে কেবল কালো।

কাচের উপর আলো পড়িলে তাহার কতকটা উপর হইতেই উল্টিয়া আইসে; কিন্তু সে অতি অল্প। অবশিষ্ট আলো ভিতরে যায়। কাচে রং থাকিলে আবার এই যে ভিতরে আসিল ইহাদের কতগুলিকে সে খাইয়া ফেলে। এখন যাহারা থাকিল তাহাদের কিছু অপর পৃষ্ঠে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে, অবশিষ্ট ওপিঠে বাহির হইয়া যায়; এই দুই রকম আলোর দরুণই কাচের রং দেখা যাইবে। যত প্রকার জিনিসের রং দেখা যায়, (তাহাদের যদি নিজের আলো না থাকে) সকল প্রকার জিনিসের ভিতরেই আলো গিয়া ফিরিয়া বাহিরে আসিয়াছে ইহা নিশ্চয়; কারণ বাহির হইতে যে আলোক ফিরিয়া আইসে তাহার রঙের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।—পরিবর্ত্তন হওয়ার অর্থ এই যে, যতগুলি ছিল, তাহার কিছু খাইয়া ফেলিয়াছে। যাহার নিজের আলো নাই তাহাদ্বারা আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে।* অনেকে মনে করেন যে, যে জিনিস স্বচ্ছ নহে, তাহার ভিতরে আলো যাইতে পারে না, তবে তাহার রং হয় কি করিয়া? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, এমন জিনিস নাই, যাহা অল্প পরিমাণেও স্বচ্ছ নয়। খুব পাতলা হইলে ধাতুর পাতের ভিতর দিয়াও আলো আসিতে পারে।

এখন কাজের কথা হউক। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, নীল পীত মূল বর্ণ; তার যোগে সবুজ হইয়াছে। এখন জানিলাম, লাল সবুজ মূল বর্ণ, তার যোগে পীতের উৎপত্তি, এবং সবুজ ভায়লেট মূল বর্ণ, তার যোগে নীলের উৎপত্তি। আমাদের প্রমাণ নীল রঙের আর পীত রঙের জিনিসের চূর্ণ মিশাইয়া দেখা। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐরূপ ভাবে মিশ্রিত চূর্ণ হইতে যে আলো আইসে

---

* সরাবে লূণ মিশাইয়া তাহাতে পলতে ভিজাইয়া আলো জ্বালিলে সে আলো বিশুদ্ধ পীতবর্ণের হয়। সেই পীতবর্ণের আলোতে পীত ছাড়া অন্য রঙের জিনিস কাল দেখাইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে প্রথমতঃ ঘর সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার করিয়া লইতে হইবে।

* যাহার নিজের আলো আছে, তাহা বাহিরের আলো ছাড়াও দেখা যায়। আর অন্য আলো তাহাতে পড়িলে নিজের আলো তাহাতে মিশাইয়া দিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে।

অভ্যাসের জন্য যার রুচি ও পছন্দ খারাপ হয়ে গেছে তাদের কথা ছেড়ে দাও। নহিলে সহজ স্বভাবের গুণই এমনি যে, যা কিছু ভাল তাতেই মন টানে আর মন্দ মাত্রেই ঘৃণা হয়। যিনি মদ খান না, সচ্চরিত্র লোক, তাঁকে ঘোর মাতালেরাও ভক্তি করে। সত্যবাদী সাধু ব্যক্তিকে জুয়াচোর নীচ লোকেরাও শ্রদ্ধা করে। পাষণ্ড ডাকাতেরাও দয়ালু পরোপকারীর প্রশংসা করে।—কেন? এই জন্য।

"এই এক জিনিস সকলের চরিত্রে দেখা যায়। আর একটী আছে সেটী কি? শুধু ভালর দিকে টান থাকিলেই ত মানুষ ভাল হইতে পারে না; শুধু ক্ষুধা থাকিলেই ত আর পেট ভরে না, গায়েরও জোর হয় না। কি চাই? আহারের দ্রব্য চাই, অর্থাৎ ভাল উপদেশ চাই, ভাল শিক্ষা পাওয়া চাই। এই দুটী একত্র হ'লে তবে ভাল লোক হওয়া যায়। যদি আহার না পায়, অর্থাৎ ভাল উপদেশ না পায় তাহ'লে স্বভাব যার নির্ম্মল, যার রুচি মন্দ হইয়া যায় নাই, যার চরিত্রের ক্ষুধা আছে অর্থাৎ ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, এমন সকল বালকও খারাপ হইয়া যায়। তবে বুঝিলে যে ভাল হইতে গেলে দুই দ্রব্য চাই। শুধু ভাল হইবার ইচ্ছা থাকিলেই হয় না; ভাল উপদেশ এবং সুশিক্ষা পাওয়া চাই।"

নগেন—"কিন্তু, মহাশয়! যার যথার্থ ভাল হ'বার খুব ইচ্ছা থাকে সে ভাল উপদেশ খুঁজিয়াও লইতে পারে।"

শিক্ষক—"তা সত্য। সে সব ছেলে কখনও কুসঙ্গে যায়ই না।"

বিধুভূষণ—"আচ্ছা, ভাল হ'বার ইচ্ছা যদি স্বাভাবিক, তবে সকলে সৎ উপদেশ পাইয়াও ভাল হয় না কেন? বরং তাতে দু এক জন আরও অধিক দুষ্ট ও ভণ্ডতপস্বীর মত হইয়া ঠকাতে শিখে এও ত দেখিয়াছি!"

শিক্ষক—"এ কথাও মিথ্যা নয়। প্রথমে যখন তলোয়ার প্রস্তুত হয় তখন ত কেমন ধার, ঝক্ ঝক্ করে। তাকে যদি ভাল করিয়া ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখা হয় তা'হলে মরচে পড়ে। শেষে বেশী দিন থাকিলে এমন হয় যে তা'র দ্বারা কোপ মারিলে জিনিসটা না কাটিয়া তলোয়ার খানাই ভাঙ্গিয়া যায়। এখানেও ঠিক তাই হয়। বেশী দিনের জন্য কুসঙ্গে পড়িলেও মানুষের স্বভাবে মরিচা পড়ে তখন সে আর উপদেশ মত কাজ করিতে পারে না বরং আরও মন্দ হইয়া উচ্ছন্ন যায়।

"এখন বেশ্ বুঝিলে যে চরিত্র ভাল করিতে হইলে সর্ব্বদা ভাল ভাল কথা শুনিতে হয়, ভাল ভাল বই পড়িতে হয়, ভাল ভাল লোকের সঙ্গে বেড়াইতে হয়। নহিলে ভাল হওয়া কঠিন। কিন্তু কুলোকের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলে এর কিছুই হয় না। বরং বিপরীত দিকেই ফল হয়। সর্ব্বদা মন্দ কথা শুনিয়া মন্দ কাজ দেখিয়া নিজের স্বাভাবিক গুণের প্রতি ভালবাসা ও দোষের প্রতি ঘৃণা কমিয়া গিয়া ঠিক উল্‌টা হয়। অর্থাৎ ভাল কথার উপর কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলে শেষে লোকের মন্দ কথা ও মন্দ কাজ ভাল লাগে। দেখ কি ভয়ানক ফল! শিব গড়্‌তে বানর হয়ে যায়!

"এখন বল দেখি কুসঙ্গের আর কি দোষ?"

মাধব বলিল—"আর একটী প্রধান দোষ বোধ হয় এই যে—যে কাজে একলা থাকিলে এক গুণ উৎসাহ হয়, দশ জন একত্র মিলিলে সে কাজে একশ গুণ উৎসাহ বাড়ে। তাতে দলের মধ্যে কুকাজে উৎসাহ ও ভরসা খুব বেশী হয়।"

শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। “এটা অতি সত্য কথা। মনে কর, কয়লার উননে আগুন গম্ গম্ কচ্চে, এখন এক একটী করে জ্বলন্ত কয়লা যদি চিমটা করিয়া তুলিয়া মাটীতে আলাদা রাখা যায়, তাহ’লে একটু পরে সে গুলা নিবিয়া যায়। এখানেও ঠিক তাই। তোমরা সকলেই জান যে, একলা কোন কাজে মনে তত উৎসাহ হয় না। দুজন হলে ভরসা হয়, দশজন একত্র হলে আর উৎসাহ ও আনন্দ ধরে না। হৈ হৈ শব্দে আকাশ ফাটে। মহা হল্লা পড়িয়া যায়। কি ভাল কাজ কি মন্দ কাজ সব কাজেই দশ জন সঙ্গী পেলে কাজের সুবিধা হয়। একজন “ভয় কি?” বলিয়া উঠিলে অমনি সকলের মুখে “ভয় কি” “ভয় কি” শব্দ হইতে থাকে। এই জন্য সর্ব্বদা দেখা যায় যে, যে দুষ্ট ছেলে একাকী মন্দ কর্ম্ম করে তাহাকে শীঘ্র শুধ্রাণ যায়, কিন্তু যে দলে মিশে মন্দ কাজ করে তার পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুগণও কত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ভাল করিতে পারেন না।

“এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে অসৎ সংসর্গের যে কত দোষ দেখা যাইবে তাহার সংখ্যা নাই। তোমাদের মধ্যে যাহার ভাল হইবার একটুও ইচ্ছা আছে, সে যেন কখনও প্রাণ গেলেও মন্দ ছেলেদের দলে না মেশে। নিজের যত দোষ থাকুক সব ভাল হইবে, নিশ্চিত বলিতে পারি,—কেবল যদি দলে না মিশিয়া থাক। দলে মিশিলে আর রক্ষা নাই। সাবধান! সাবধান! সাবধান!”

তার পর সকলে “good bye, sir” বলিয়া বাড়ী গেল।

আমাদের দেশের লোকের দয়া।

যখন ১৮৫৭ সালে সিপাহিদিগের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন উন্মত্ত সিপাহিরা অনেক সাহেব বিবি, বালক বালিকাকে হত্যা করিতে থাকে। এই সময়ে আমাদের দেশের অনেকে দয়া করিয়া সাহেব বিবি ও বালক বালিকাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ ইহাদের রক্ষার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। আজ তোমাদিগকে এ বিষয়ে একটী কথা শুনাইব।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুর নামে একটী সহর আছে। সহরটী গঙ্গার ধারে। এই সহরে গবর্ণমেণ্টের অনেক সৈন্য থাকে। সিপাহি হাঙ্গামার সময় কানপুর সিপাহিদিগের একটী প্রধান আড্ডা হয়। কানপুরের নিকটে বিঠোর নামক একটী স্থানে নানাসাহেব থাকিতেন। এই নানাসাহেব সিপাহিদিগের পক্ষ হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সিপাহি যুদ্ধে নানাসাহেব কানপুরের অনেক সাহেব বিবি ও বালক বালিকাকে অবরোধ করেন। সেই সময়ে ইংরেজ সেনাপতি নানাসাহেবকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া এই নিয়মে কানপুর নানাসাহেবের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন যে, সহরে যত ইংরেজ মহিলা ও বালক বালিকা আছে, তাহারা নৌকায় চড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিবে; সিপাহিরা তাহাদের কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে

পারিবে না। নানাসাহেব প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। নানাসাহেবের সম্মতি জানিয়া, ইংরেজ মহিলারা প্রসন্ন চিত্তে নৌকায় চড়িবার জন্য আয়োজন করিতে থাকেন। একটী ফিরিঙ্গী-সন্তানের ধাত্রী এই মহিলাদিগের মধ্যে ছিল। ধাই আমাদের দেশের একটী নীচ জাতীয় হিন্দু রমণী। ফিরিঙ্গী সন্তানটীর পিতামাতা উভয়েই পূর্ব্বে হত হইয়াছিলেন, কেবল ছেলেটী হিন্দু রমণীর যত্নে রক্ষা পাইয়াছিল। পিতৃ-মাতৃহীন দুঃখী সন্তান এই দুঃখিনী নারীর দয়ায় এইরূপে জীবন ধারণ করিতেছিল।

সকলে নৌকায় চড়িয়াছে, এমন সময়ে সিপাহিরা হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে ভীত হইয়া, কেহ কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কেহ কেহ ডাঙ্গার দিকে দৌড়িতে লাগিল—চারিদিকেই একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সিপাহিরা অসময়ে ইহাদিগকে আক্রমণ করিবে, ইহা কেহই জানিতে পারে নাই; সুতরাং সকলেই সহসা মৃত্যু নিকটে জানিয়া, একবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। সিপাহিরা অনেক বিবি ও বালক বালিকাকে গুলি করিয়া বধ করিল—অনেককে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

ফিরিঙ্গী সন্তানের প্রতিপালিকা সেই হিন্দু রমণী এই ঘোরতর বিপদ দেখিয়া, ছেলেটীকে কাপড় দিয়া বুকে চাপিয়া রাখিয়া, নৌকায় চড়িবার জন্য যে সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া ডাঙ্গার দিকে ছুটিল। তাহার একটী ১৫। ১৬ বৎসরের পুত্র ছিল, সে মার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। দুঃখিনী রমণী সিঁড়ি ছাড়িয়া ডাঙ্গায় আসিয়াছে, এমন সময়ে একজন সিপাহি খোলা তরবার হাতে করিয়া, ফিরিঙ্গী ছেলেটীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু দয়াবতী রমণী সেই অনাথ সন্তানটীকে নরঘাতক সিপাহির হাতে দিল না। সিপাহি তখন ক্রোধের সহিত কহিল:—

"ছেলেটীকে আমার হাতে দাও। তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

দুঃখিনী নারী বিনয়ের সহিত কহিল:—

"আমার ছেলে তোমার হাতে দিব না। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়কেই দয়া কর।"

সিপাহি পূর্ব্বের ন্যায় সরোষে বলিল:—

"সন্তানটীকে না দিলে দয়ার আশা নাই। এখনি তরবারি দিয়া তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

দুঃখিনীর পুত্র পশ্চাতে ছিল সে কাতরভাবে কহিল:—

"মা! ছেলেটীকে দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।"

মাতা দৃঢ়তার সহিত বলিল:—"না, তাহা কখনই হইবে না। আমার ছেলেকে কখনই নরঘাতক সিপাহির হাতে দিব না।" এই কথা বলিবামাত্র সিপাহি তাহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিল। দুঃখিনী অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। আর তাহার চেতনার সঞ্চার হইল না। দয়াবতী নারী পরের ছেলের জন্য অকাতরে ধীরভাবে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

নিষ্ঠুর সিপাহী ফিরিঙ্গী ছেলেটীকে বধ করিল। কেবল সেই ধাত্রী-পুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। সিপাহি তাহার উপর কোন অত্যাচার করিল না।

ভেকের পত্র।

১

বড় এক পুকুরের ধারে
একদল ভেক বাস করে ;
রোজ এসে ঢিল ছুঁড়ে, ছেলে গুলো খেলা করে
কত ক্ষুদ্র ভেক মরে তা'দের জ্বালায়!
বড়ই আমোদ তারা পায়!!

২

ভেকগণ ভাবে মনে মনে
"কেমনে বাঁচিব মোরা প্রাণে ?"
অবশেষে যুক্তি করি', 'মিটিং' করিল ভারি ;
দাঁড়াইয়া ভেকরাজ বলিল তখন
বাম হস্ত করি উত্তোলন।

৩

"সাবধানে শুন বৎসগণ
প্রাণপণে কর 'আন্দোলন' ;
প্রতি গৃহস্থের ঘরে, কাতরে প্রার্থনা ক'রে
সবে মিলে পত্র এক করহ প্রেরণ
'ছেলেদের করিতে বারণ।'

৪

"যদিও মোদের ক্ষুদ্র প্রাণ
সুখ দুঃখ আছে তবু জ্ঞান।
অতএব দয়া ক'রে, ক্ষুদ্র আমোদের তরে
যেন আর সেই খেলা করে না কখন
যাতে ঘটে ভেকের মরণ॥"

সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

আশ্চর্য্য শিক্ষা।

বনের পাখী আপনার মনে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিতে কাহাকেও পরামর্শ দিই না। কচি শাবক মাতার পাখার নীচে আরামে থাকিয়া দিন দিন বড় হইতেছিল; দুরন্ত বালক তাহা পাড়িয়া আনিয়া বেশ যত্নে রাখিলেও তাহা ভাল কাজ মনে করি না, কিন্তু এমন বন্দী দশাতেও তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিলে কেমন সুন্দর ফল পাওয়া যায় পাঠক পাঠিকাগণ! তাহার এক দৃষ্টান্ত আজ তোমাদিগকে বলিব।

বিলাতের স্ফটিক প্রাসাদের বিষয় তোমরা 'সখা' ১ম ভাগ, ৮ পৃষ্ঠায় পড়িয়াছ। তথায় অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস থাকে। গত বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে এই যাদুঘরে একটী পাখী ছিল। উহা মানুষের মত অবিকল শব্দ করিত, হাসিত, কাশিত, হাঁচিত; সময়ে সময়ে নিশ্বাস ফেলিত ও হাই তুলিত। কেবল ইহা নয়। স্পষ্ট মানুষের মত কথা কহিত; কত কথার মানুষের মত উত্তর দিত। ইংরাজীতে "আপনি কেমন আছেন" "কোথায় যাইতেছেন" "দরজাটা দেখ" "তবে আসি" এইরূপ কত বলিত। বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, গাধা কাহারও শব্দ তাহার নিকট ফাঁক যাইবার যো ছিল না। কেহ ডাকিলেই অমনি সে নকল করিত।

এখনো গুণের কথা কিছু বলা হয় নাই। তাহার শিক্ষক যদি বলিতেন "ঘণ্টা বাজাও"; পাখী সময় নষ্ট করিত না, ধীরে আপনার চঞ্চু দিয়া ঘণ্টার দড়ী ধরিয়া নাড়িত; উপরে ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ হইত। ('চ' চিত্র দেখ)। যদি তিনি দরজার কড়া নাড়িতে বলিতেন, সে অমনি এক দ্বারের কড়া ধরিয়া খট্ খট্ করিত। ('গ' চিত্র দেখ)। তাহার এক মনিব্যাগ ছিল; টাকা কড়ি পাইলে তাহা খুলিয়া রাখিয়া দিত। ('ঘ' চিত্র দেখ)। পাখীর খাঁচার দ্বার হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটা ছোট রেলপথ পাতা হইয়াছিল। রেলের শেষাংশে একটা ছোট গাড়িতে তাহার খাবার দেওয়া হইত; পাখী তাহার দড়ী ধরিয়া রেলের উপর দিয়া আপনার ঘরে লইয়া আসিত। ('ক' চিত্র দেখ)। আর এক আশ্চর্য্য। তাহার খাঁচার নিকট এক কামাণ ছিল। প্রভু যদি তাহাতে বারুদ ও ক্যাপ দিয়া বলিতেন "এক—দুই—তিন, ছোড়" অমনি পাখী ঠোঁটে করিয়া তাহা আওয়াজ করিত। ('ন' চিত্র দেখ)। তাহার নিকট যদি

খ
গ
ঘ
ঙ
চ
ENG.BY T.N.DEB

কেহ একটা পত্র ফেলিয়া দিত, তাহা হইলে সে অতি যত্নে কুড়াইয়া লইত। আস্তে আস্তে খুলিত; এবং যেন কতই পড়িতেছে, এইরূপে কতক্ষণ থাকিত। আবার যদি কেহ তাহার নিকট বলিতেন "কি, তোমার অসুখ হইয়াছে?" অমনি সে কাতর স্বরে বলিত 'বড় অসুখ'; আর রোগীর মত কাশিত, ও মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিত। ('খ' চিত্র দেখ)। এই আশ্চর্য্য পাখীকে অনেকে দেখিয়াছেন; যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে ইহার প্রশংসা আর ধরে না। *

সক্রেটিস।

মহাত্মা সক্রেটিসের নাম কি তোমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ? ৪৬৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২৩৫৪ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশের এথেন্স নগরে ইঁহার জন্ম হয়। পূর্ব্বকালে গ্রীস দেশ জ্ঞান চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। সে সময়ে যতদূর শিক্ষা লাভ সম্ভব সক্রেটিস ততদূর শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, কালে একজন পরম বিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তখন গ্রীসে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন তাঁহারা প্রায়ই অহঙ্কারী হইতেন এবং আপনাদিগকে 'জ্ঞানী' বলিয়া পরিচয় দিতেন। সক্রেটিস যেমন পরম জ্ঞানী ছিলেন তেমনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। জ্ঞানের অভিমান কোন কালে তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। দার্শনিক সম্প্রদায়ের অহঙ্কার তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি আপনাকে 'জ্ঞানী' বলিয়া জানাইতেন না। তিনি জ্ঞানকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, কিন্তু আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

সক্রেটিস নূতন প্রণালীতে দর্শনের চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। এখন যেমন কতগুলি লোক আছে, যাহারা দিবারাত্র মুখে বড় বড় কথা বলিয়া বেড়ায়, মুখের জোরে বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিতে চায়, এবং নিজে যাহা না জানে, না বুঝে, পরকে তাহা শিখাইতে যায়, সে কালেও এইরূপ অনেক লোক ছিল। এই সকল লোকের জ্ঞানের স্পর্দ্ধা একটু খাটো করিবার জন্য এবং সাধারণ লোকের নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদ সহজে দূর করিবার জন্য, রাস্তায়, বাজারে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে, ছোট বড় সকলের সহিত সক্রেটিস আলাপ করিতেন; এবং কথায় কথায় তাহাদিগের মতামতের ভুল ধরিয়া দিতেন। যাহাতে সকলে আপনাদিগের ভ্রান্ত মত গুলি ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারে এবং চিন্তা করিয়া প্রকৃত সত্য জানিতে উৎসুক হয়, সক্রেটিস তাহাই চাহিতেন। তিনি দর্শন শিখাইবার জন্য স্কুল কালেজ খুলিলেন না, বা কোন বই লিখিলেন না। ধন কিম্বা মান লাভের প্রত্যাশায় তিনি কিছুই করিলেন না।

সক্রেটিস অতি ন্যায়বান্ পুরুষ ছিলেন। তৎকালে এথেন্সের শাসন কর্ত্তারা যিনি যখন যে অন্যায় কাজ করিতেন তিনি নির্ভয়ে তাহার নিন্দা

* বিলাতের ব্যাণ্ড অব হোপ নামক মাসিক পত্রে ইহার সবিস্তর বর্ণনা আছে।

ও প্রতিবাদ করিতেন। একদা তাহাদের কোন আদেশ নীতি-সঙ্গত বলিয়া মনে না হওয়াতে সে আদেশ পালন করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

মহাপুরুষদিগকে অনেক কষ্ট, অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। দেশের সকল লোক যখন পাপ ও কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া থাকে, তখন যে সাধু পুরুষ তাহাদিগের চক্ষু ফুটাইতে চাহেন, তাঁহাকে তাহারা শত্রু বলিয়া মনে করে। সক্রেটিসকেও অনেক দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে কতগুলি লোকের মিথ্যা অপবাদে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেশ হইতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার নিকট অন্যায় বোধ হওয়াতে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিচারকদিগের আজ্ঞানুসারে শিষ্য এবং বন্ধুগণের হাহাকার ও ক্রন্দনের মধ্যে তিনি নির্ভয় মনে, প্রফুল্ল মুখে বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। জ্ঞান, বিনয়, সচ্চরিত্রতা, উদারতা ও ন্যায়পরতার জন্য তাঁহার নাম জগতে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

সক্রেটিসের কথা।

সক্রেটিস বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নানাবিধ বিক্রেয় জিনিস রাশীকৃত দেখিয়া বলিতেন, "এখানে কত জিনিস আছে, যাহাতে আমার কোন আবশ্যক নাই।"

আণ্টিস্থিনিস নামক সক্রেটিসের একজন শিষ্য একটা ছেঁড়া পোষাক পরিয়া এমন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, যেন সকলে উহা লক্ষ্য করে। ইহা দেখিয়া সক্রেটিস বলিলেন "আমি তোমার পোষাকের ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া তোমার অহঙ্কার দেখিতে পাইতেছি।"

তরুণবয়স্কদিগকে সক্রেটিস একটী অতি সৎপরামর্শ দিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন "তোমরা মাঝে মাঝে দর্পণে আপন আপন মুখ দেখিও। যদি আপনাকে সুন্দর দেখ তাহা হইলে চরিত্রকে সৌন্দর্য্যের অনুরূপ করিতে সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিবে; যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কুৎসিৎ হও, তাহা হইলে সদ্‌গুণের আবরণে কুরূপ ঢাকিয়া রাখিবে।"

সক্রেটিসকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি গ্রন্থ রচনা করেন না কেন?" বিনয়ী সক্রেটিস বলিলেন "আমি যাহাই লিখিনা কেন, কাগজের মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক।"

সক্রেটিস সর্ব্বদাই বলিতেন "আমি এইমাত্র জানি যে আমি কিছুই জানিনা।"

সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নী বলিলেন "হায় অবিচারে (বিনা দোষে) তোমার প্রাণদণ্ড হইল।" সক্রেটিস বলিলেন "যদি দোষ করিয়া উচিত বিচারে আমি প্রাণ হারাইতাম তাহা হইলে কি তুমি সুখী হইতে?"

সরলার জীবনের এক শিক্ষার দিন।

সরলা পিতা মাতার একমাত্র সন্তান; সুতরাং বড় আদরের ধন। কিন্তু এই আদরই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। এই আদর পাইয়া সে বড় একগুঁয়ে, স্বার্থপর হইয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিত সকলের

ভালবাসার উপর তারই একমাত্র অধিকার। কাহাকেও তাহার অংশীদার দেখিলে তাহার বড় হিংসা হইত। কাহারও কোন কথা তার সহ্য হইত না।

সরলার একটী মাসতুতো বোন্ ছিল। তাহার নাম উষাবালা। সে সরলার চাইতে এক বৎসরের বড়, তাহার বয়স ১২ বৎসর। সে তাহার পিতা মাতার একমাত্র ধন। যখন সে অতি শিশু তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এখন আবার তাহার একমাত্র অভিভাবক মাতার মৃত্যু হওয়াতে সে মেস মহাশয়ের আশ্রয়ে আসিয়াছে। উষা বড় বিনয়ী। আর তার মনখানি যেন ভালবাসায় গড়া। উষার মুখে কি যে এক প্রকার সুন্দর ভাবের ছায়া আছে,যাহাতে তাহার মুখ খানিকে অতি সুন্দর দেখায়। তাই তাহাকে যে একবার দেখে সেই বড় ভালবাসে। সরলা এর পূর্ব্বে কখনও উষাকে দেখে নাই। উষার তাদের বাড়ী আসা পর্য্যন্ত তার মাসী মা ও মেস মহাশয় খুব ভালবাসেন। সেই জন্য যদিও সরলার উষাকে খুব ভাল লাগিত ও ভাল মেয়ে বলে ধারণা হইল, তবুও তাহাকে তার পিতা মাতার ভালবাসার অংশীদার দেখিয়া মনে মনে হিংসা হইত। সরলা ভাবিত "আমি বেশ একলা ছিলাম, বাবা মা আমাকেই ভাল-বাসিতেন, এ আবার এল কেন?" উষা মাসী মা মেস মহাশয়কে তাহার মিষ্ট স্বভাবের দ্বারা বশ করিয়া লইল; কিন্তু সরলা তাহাকে ধরা দিল না বরং উষার সহিত ঝগড়া করিবার জন্য সুযো-গের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সরলার পিতা উষাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম অভ্যাস না থাকাতে সে যাইতে চায় নাই। দুদিন যাইতে না যাইতে সকল মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হইল, সকলে তাকে ভালবাসিতে লাগিল। সরলাদের স্কুলে একটী সেলাইএর পরীক্ষা হইত। যে সকলের চেয়ে সুন্দর সেলাই করিতে পারিত সেই পুরস্কার পাইত। সরলা বেশ সেলাই করিতে পারিত। সরলা, উষা সকলেই পুরস্কার পাইবার জন্য সেলাই করিতে আরম্ভ করিল। সরলা এক অতি সুন্দর আসন তৈয়ার করিয়াছে। সেলাইটী দিবার এক দিন পূর্ব্বে টেবিলের উপর সেলাইটী রাখিয়া সরলা কি করিতেছে, এমন সময় উষা যেমন একখানা কাঁচি লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে অমনি কাছে এক দোয়াত কালি ছিল, উল্টিয়া সেলায়ের উপরে পড়িয়া গেল। পড়িয়া যাবা মাত্র উষা বলিয়া উঠিল"হায়! হায়! কি করিলাম! আহা! সরলা, ভাই আমি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছি। ছিঃ! আমি এত অসাবধান! আমি এখন কি করি! আহা যা করিলে ভাল করিয়া দিতে পারি আমি তাই করিব।" সরলা এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া দেখিবা মাত্র রাগে তাহার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া হাতদুখানি ঝাঁকড়াইতে ঝাঁকড়াইতে চীৎকার করিয়া বলিল "ও হতভাগী হিংসুকে মেয়ে! কি করিলে! তুমি নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিয়া কালি ঢালিয়াছ,পাছে আমি পুরস্কার পাই। আবার মিথ্যা কথা। দুষ্ট মেয়ে। তোমার পেটে পেটে দুষ্টামি। মুখে ভালমানুসি দেখাতে যাও। এইবারে সব মেয়েকে তোমার বিদ্যে বলে দিব। বক ধার্ম্মিক।" উষা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল "ভাই সত্য সত্যই আমি বড় দোষ করিয়াছি এবং বকুনি খাইবার উপযুক্ত। কিন্তু আমি কখনই ইচ্ছা করিয়া ফেলি নাই, আমি কি করব?"

এই কথা শুনিয়া সরলা রাগিয়া বলিল "তুমি আমাদের বাড়ী হতে দূর হও। তোমার মুখ

দেখ্‌তে চাই না।" ঊষা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঊষা গেলে সরলা চেয়ারে বসিয়া মুখে কাপড় দিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় কে আস্তে আস্তে তাহার কাঁদে হাত দিল। সরলা চমকাইয়া ফিরিয়া দেখে–তার "ভুপেন দাদা।" ভুপেন্দ্র-নাথের বয়স ১৯ বৎসর। তিনি সরলার বাবার এক জন বন্ধুর ছেলে। ভুপেন্দ্র তার মুখ খানি তুলিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি সরো, কাঁদ্‌ছিস্ কেন? আমার দিদিকে কে কি বলেছে?" সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দেখ দেখি, ভুপেন দাদা, ঊষা ইচ্ছা করিয়া আমার সেলাইয়ে কালি ঢালিয়া দিয়াছে।"—

ভুপেন্দ্র "দূর! একি হতে পারে। না দেখে ফেলে দিয়াছে। সে যে অতি ভাল মেয়ে।—যাঃ! আর কি হবে! তোরা না বলেছিলি আমার সঙ্গে সেই বাগানটা দেখ্‌তে যাবি।—এখন ওঠ, যা মুখ ধুয়ে কাপড় চোপড় পরে আয়।" তার পর ওদের দুই বোনকে নিয়ে ভুপেন্দ্র বেড়াইতে গেলেন। এখনও সরলার ঊষার উপর ভয়ানক রাগ আছে; সে তাহার দিকে ফিরেও চাহিতেছে না।—সেখানে গিয়া হঠাৎ কি মনে হওয়াতে ভুপেন্দ্র বাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন। যাবার সময় ঊষা সেখানে ছিল না, সে কি দেখিবার জন্য কোথায় গিয়াছিল। তাই ভুপেন্দ্র সরলাকে বলিয়া গেলেন "দেখ সরো ওদিকে যেও না আর ঊষাকে যেতে বারণ করো; ওদিকে একটা ভয়ানক সাপ্ আছে।" পরে সরলা ঊষাকে সেই দিকে যাইতে দেখিয়াও রাগে কোন কথা বলিল

না। উষা সেই দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ সাপ্‌টার লেজ মাড়ানতে সাপ্ ফোঁস্ করিয়া উঠিল। উষা তাহা টের পাইয়াই ছুটিতে লাগিল, সাপটাও তার পিছন পিছন তাড়া করিল। শেষে উষা আর পারিয়া উঠিল না, সাপ্‌টা তাহাকে আক্রমণ করিল।—অমনি "ওগো মাগো" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গোঙ্গাইতে লাগিল। সাপ্‌টা আপনার কাজ করিয়া গর্ত্তে ফিরিয়া গেল। সরলা এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে উঠায় এমন কেহ নাই। ভূপেন্দ্র আসিয়াই সকল বুঝিতে পারিলেন, ও ছুটিয়া গিয়া দেখেন উষার মুখ দিয়া ফেণা উঠিতেছে। চেতনা নাই। কাছেই বাড়ী ছিল, তাহাকে কোলে করিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেন, কিন্তু সবই বৃথা। সরলাকে সে ঘরের ভিতর যাইতে দেওয়া হয় নাই। সে একলাটী বসিয়া আপনার দোষের জন্য কাঁদিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল "যদি উষা দিদি মারা যায়, তা হলে— আমিই মারিলাম।" অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে এমন সময় ঘরের ভিতর হঠাৎ সকলের কান্না শুনিতে পাইল। ঘরের ভিতর ছুটিয়া গিয়া দেখে উষা দিদি চির জীবনের মত তাহাদের ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ভূপেন দাদা অস্থির হইয়া কাঁদিতেছেন। মা বাবা সকলেই কাঁদিতেছেন দেখিয়াই সরলা ছুটিয়া গিয়া উষার মুখের উপর পড়িয়া ভয়ানক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল " উষা দিদি! কাঁদাইয়া বিদায় দিলাম। উষা দিদি আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।" সেই দিন রাত্রেই সরলার অত্যন্ত জ্বর আসিল। সেই অসুখে অনেক দিন ভুগিয়াছিল। যখন সারিয়া উঠিল তখন সে আর সে সরলা নয়, একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। উষা দিদি তাহাকে নবজীবন দিয়া গিয়াছিল।—পাঠক পাঠিকাগণ! উষা কি তোমাদিগকেও নবজীবন দিল?

পিপীলিকা।

তোমরা সকলেই লাল, কাল—ছোট, বড় অনেক প্রকারের পিপীলিকা সচরাচর দেখিয়া থাক। ইহাদের মধ্যে এক এক প্রকারের পিপীলিকা এক এক রকম স্থানে নিজেদের বাসা নির্ম্মাণ করে। কোন প্রকার মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে বাড়ী করে এবং উপরে মাটির ঢিবি করিয়া রাখে, কোন প্রকার পুরাণ কাষ্ঠ খণ্ডের ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাস করে, কোন প্রকার গাছের উপর বাসা নির্ম্মাণ করে, কোন প্রকার টুক্‌রা টুক্‌রা কাটকুটো একত্র করিয়া তন্মধ্যে বাসা করে; পিপীলিকাদিগকে অনেক রকমের বাসা নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। এক এক শ্রেণীর পিপীলিকা এক এক রকমের বাসা নির্ম্মাণ করে।

পিপীলিকাদের মধ্যে তিন জাতি দৃষ্ট হয়; পুরুষ ('ক' চিত্র দেখ); স্ত্রী ('খ' চিত্র দেখ); এবং ক্লীব ('গ' চিত্র দেখ)। পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা অতি কম; এবং ক্লীবের সংখ্যা পুরুষ ও স্ত্রীর

সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় দশগুণ বেশী। এই ক্লীব জাতীয় পিপীলিকারাই সমুদয় কাজ কর্ম্ম করে। পুরুষ এবং স্ত্রী জাতীয়দের কোন কোন সময়ে পাখা উঠে।

ইহাদের মাটির নীচের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল অতি চমৎকার। মাটির নীচে ছোট ছোট সহরের ন্যায় পিপীলিকারা বাড়ী তৈয়ার করে। এই বাড়ী পরিষ্কার করিবার জন্য মেথর-পিপীলিকা আছে, তাহারা ময়লা দেখিতে পাইলেই টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আইসে। শান্তি রক্ষার জন্য পাহারাওয়ালা আছে, সর্ব্বদাই একজন না একজন সদর দরজায় পাহারা দেয়; কোন বিপদের আশঙ্কা দেখিলেই অমনি ভিতরে খবর দেয়, আর দলে দলে যোদ্ধাগণ বাহিরে আসিয়া আক্রমণকারীদিগের সহিত যুদ্ধ করে। গৃহটী প্রায়ই দোতালা করে; প্রত্যেক তালায় অনেক গুলি ঘর আছে। কোন ঘরে ডিম গুলি সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে সাজান থাকে, কোন ঘরে দাস দাসীরা ছোট ছোট পিপীলিকা-সন্তানদের সেবা শুশ্রূষা করে, কোন কোন ঘরে কেবল মাত্র খাবার রাখে—এক এক ঘরে এক এক রকম খাবার রাখে।

সন্তান সন্ততির উপর ইহাদের বড়ই মায়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্লীব পিপীলিকারাই সমুদয় কাজ করে। ইহারাই কোন ঘরে ডিম সাজাইয়া রাখে; কোন ঘরে ছোট ছোট পিপীলিকাদিগকে যত্নে রাখে, গা চাটিয়া গা পরিষ্কার করে, খাবার দেয় এবং বিপদ হইলে নিজেদের প্রাণ দিয়াও উহাদিগকে রক্ষা করে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে উপরের তালা হইতে নীচের তালায় সমুদয়গুলিকে লইয়া যায়; এবং দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। এরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাসে উপরে রাখিলে ডিম ও পিপীলিকা-শিশুদের অপকার হইবার সম্ভাবনা। আবার প্রাতঃকাল হইলে ডিম, সন্তান সন্ততি সমুদয়-গুলিকে উপরের তালায় লইয়া আসে। ইহাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য এইরূপ প্রত্যহই করে। রৌদ্রের উত্তাপে শরীর ভাল থাকে বলিয়াই দিনের বেলায় উপরের তালায় রাখে। দিনের বেলায় বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা বাতাস বহিলেও উপরের তালা হইতে উহাদিগকে নীচের তালায় লইয়া যায়। সর্ব্বদাই একদল পিপীলিকা ইহাই করিতেছে। এবং আর একদল খাদ্যের অন্বেষণে বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করে। খাবার পেলেই ঘরে লইয়া আসে।

কোন কোন গাছে এক রকম পোকা বাস করে; ইহাদের শরীর হইতে একরূপ রস নির্গত হয়। এই রস ছোট ছোট পিপীলিকা-সন্তানেরা বড়ই ভালবাসে এবং ইহা খাইলে তাহাদের উপকারও যথেষ্ট হয়। ক্লীব পিপীলিকা দলে দলে গিয়া এই রস মুখে করিয়া লইয়া আসে; কখন কখনও একদল এই পোকাকে টানিতে টানিতে বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দেয়। আমরা যেমন ছেলে-পিলের দুগ্ধের জন্য গরু পুসি ইহারাও সেইরূপ ইহাদিগকে পোষে। দেখ কেমন বুদ্ধি!
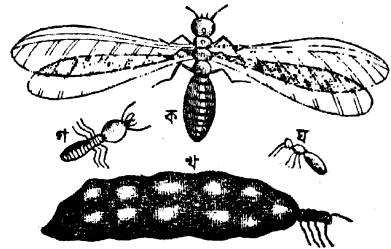
ক্লীব জাতীয়দের মধ্যে যে গুলি বলবান সেই গুলি যুদ্ধের কাজ করে ('গ' চিত্র দেখ); অবশিষ্ট

গুলি অন্যান্য সমুদয় কাজ করে ('ঘ'চিত্র দেখ)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পুরুষ ও স্ত্রীদের কোন কোন সময়ে পাখা উঠে; এই পাখা উঠার পর দলে দলে স্ত্রী পুরুষ পিপীলিকা গর্ত্ত হইতে বাহির হয়, এবং স্ত্রী পিপীলিকারা ডিম প্রসব করে, প্রসব করার পর পাখা ফেলিয়া দেয়; ইহার পর কিরূপ আকৃতি হয় ('খ' চিত্র) দেখ। পুরুষগুলির পাখা হইলে কিরূপ চেহারা হয় তাহা ('ক' চিত্র) দেখ।

একতা ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। কোন একটা ভারী দ্রব্য একটী পিপীলিকা টানিয়া লইয়া যাইতে না পারিলে বাসায় গিয়া খবর দেয় আর দু দশ জন তার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সেই জিনিসটাকে লইয়া যায়। কেহ কোন একটা জিনিস পাইলে নিজে কেবল খায় না; বাসায় লইয়া যাইয়া ঘরে জমা করিয়া রাখে, শেষে সমান ভাগ করিয়া খায়। কোন একটা বিপদ আপদে পড়িলে আর দশজনে তৎক্ষণাৎ আসিয়া সাহায্য করে। কোন একটার পীড়া হইলে বা কোন প্রকার আঘাত লাগিলে আর দশজনে আসিয়া শুশ্রূষা করে।

ইহারা আবার কখনও দলবল লইয়া যুদ্ধে বাহির হয়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় অন্য এক প্রকারের পিপীলিকাদের বাসায় গিয়া আক্রমণ করে। যুদ্ধে জিতিতে পারিলে তাহাদের সন্তান সন্ততি সমুদয় ঘাড়ে করিয়া নিজেদের বাসায় লইয়া আসে; এবং যত্নের সহিত আদর করে। শেষে তাহারা ভাল বাসার গুণে নিজেদের দাসত্ব ভুলিয়া গিয়া সকলকেই আপন বিবেচনা করে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে সমুদয় কাজ কর্ম্ম করিয়া গৃহের সুশৃঙ্খলা রাখে।

পিপীলিকার কাজে লাগিয়া থাকিবার ইচ্ছাটা বড়ই প্রবল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একটা খাদ্য দ্রব্য টানিয়া স্বীয় গর্ত্তে লইয়া না যাইতে পারে ততক্ষণ সুস্থির হয় না; কেবলি কাজ করিতেছে। অবশেষে গর্ত্তে নিয়া সুস্থির হয়। পরিশ্রম করিতে ইহারা কখনই কাতর হয় না। শীতকালে ইহারা কোন কাজ করে না; বাসায় বসিয়া কেবল ঘুমায়। অন্যান্য সময়ে পরিশ্রম করিয়া এত খাদ্য সঞ্চয় করে যে খাদ্যের অভাবে শীতকালে তাহাদের কোন কষ্টই হয় না।

এই ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হই।—(১) সর্ব্বদা পরিশ্রম করা উচিত; ইহারা যেমন গ্রীষ্মকালে পরিশ্রম করিয়া শীতকালের খাদ্য সঞ্চয় করে, আমাদেরও সেইরূপ ছেলেবেলায় পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করা উচিত যে, যৌবনকালে বিদ্যার বলে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ বয়সের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারি। (২) অধ্যবসায়ী হওয়া উচিত; একটা কাজে একবারে কৃতকার্য্য না হইলে বার বার চেষ্টা করিতে হইবে। (৩) শত্রুদিগকে ভালবাসা দ্বারা বশীভূত করা উচিত; ভালবাসার দ্বারা যেমন অপরকে বশীভূত করা যায়, কর্কশ ব্যবহার বা শাসন দ্বারা সেইরূপ করা যায় না। (৪) সকলেরই মধ্যে একতা থাকা উচিত; একজনে একটা কাজ না পারিলে দশজনে পারা যায়। বৃহৎ কোন একটী কাজ করিতে হইলে দশজনের সাহায্য লইতে হয়।

কালার ঘরে ধলা ছেলে।

(ডেনমার্ক দেশীয় একটী গল্প অবলম্বনে লিখিত)

সহরের অনেক দূরে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের এক পাশে একজন চাষা বাস করে। সে কতকগুলি পাতি হাঁস পুষিয়াছে। খিড়কীর পুকুর ধারে আমতলায় হাঁসদের থাকিবার জন্য এক যায়গা করিয়া দিয়াছে। হাঁসগুলি খায় দায় খেলিয়া বেড়ায়, রাত্রি হইলে আমতলায় নিজেদের ঘরে আসিয়া ঘুমাইয়া থাকে। একবার বর্ষাকাল, আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস হইবে, একটী পাতি হংসী ডিম পাড়িয়াছে। অনেক ডিম পাড়িয়াছিল, তাহার সকল গুলিতে তা দেয় নাই কেবল মাত্র ৬টীতে তা দিতেছে। বেচারির কি কষ্ট! আষাঢ়ান্ত বেলা—দিন গিয়াও যায় না; বেচারি দিন নাই রাত্রি নাই, বসিয়াই আছে। একা নির্জ্জনে বসিয়া থাকা কি কষ্ট সকলেই বুঝিতে পার। তাহার স্বামী পাতি হংস হাজার হোক পুরুষ, সে আপনার মনে আর দশজন হংস হংসীর সহিত পুকুরের জলে খেলিয়া বেড়াইতেছে, ভাত খাইবার জন্য "প্যাঁক্""প্যাঁক্" করিয়া গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর যাইতেছে, ছেলেদের ও কুকুরের কাছে তাড়া খাইয়া আবার পুকুরে পলাইয়া আসিতেছে। স্ত্রী যে ডিমে বসিয়া বসিয়া সারা হইতেছে সে দিকে তার বড় দৃষ্টি নাই। কেবল দিনের মধ্যে একবার কি দুবার আসিয়া দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া যাইতেছে।

কিছুদিন পরে পাতিহংসী বলিল;—"আর বাপু পারি না—দেখি দেখি হতভাগা গুলোর বাহির হইবার সময় হলো কি না?" এই বলিয়া দেখে যে সময় হইয়াছে, একটী ডিমের মুখ ভাঙ্গিবামাত্র একটী হাঁস মুখ বাড়াইল। এইরূপে ছেলে মেয়েতে পাঁচটী বাহির হইল। তখন তাহাদের শিক্ষার ভাবনা পড়িল। তারা বলে "পী" "পী" মা বলে "প্যাঁক্" "প্যাঁক্"—এইরূপে ডাকিতে শিখাইতে লাগিল। কিন্তু একটী ডিম আর ফোটে না। এমন সময়ে এক প্রতিবেশিনী হংসী একদিন বেড়াইতে আসিয়া বলিল;—"কিগো সই, তোমার ডিমে তা দেওয়া কি ঘুচ্‌বে না?" পাতি হংসী বলিল;—"আর বোন্! নিগ্রহের কথা বল কেন? একটা কাল শত্রু আর বাহিরে আস্‌তে চায় না। আমিও আর পারি না।" সমাগত হংসী বলিল "দেখি দেখি ডিমে তা দিতে ত এত দিন লাগে না।" দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"ওমা একি! এত বড় ডিমত কারুর দেখি নাই। এ ভাই তোর ডিম নয়।" শুনিয়া পাতি হংসীর মনে বড় চিন্তা হইল। "তাইত আমিও ভাব্‌ছিলাম এ কি? এতদিন লাগে কেন?" সমাগত হংসী বলিল "দেখ ভাই আমাকে কিনিয়া আনিবার পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় এক জজের বাড়ীতে ছিলাম, সেখানে আমাদের সঙ্গে কয়জন পেরু থাকিত—তাহারা খুব বড় বড় ডিম পাড়ে, আমার বোধ হয় এ পেরুর ডিম।" হংসী বলিল "যাহা হোক্ এত দিন গেছে না হয় আরও দুই দিন যাবে; দেখি কেমন ছেলে বাহির হয়—জলে লইয়া গেলেই পেরু কি না ধরা পড়িবে।" প্রতিবেশিনী চলিয়া গেল—হংসী বসিয়া বিষণ্ণ মনে তা দিতে লাগিল। ক্রমে এক প্রকাণ্ড পুরুষ হংস বাহির হইল। পাতি হাঁসের ঘরে এত বড় ছেলে কেউ কখনও দেখে নাই। হংসী দেখিয়া মনে মনে

বলিল—"পোড়া কপাল! কি একটা কদাকার প্রকাণ্ড ছেলে হইল। একে লোক-সমাজে লইয়া যাওয়াও লজ্জা!" যাহা হউক মনের ভাব মনে গোপন করিয়া হংসী কয়েক দিনের মধ্যেই ছেলে মেয়েগুলিকে সঙ্গে লইয়া পুকুরের দিকে গমন করিল; মনের অভিপ্রায়, পুকুরে তাহাদিগকে সাঁতার শিখাইয়া পাড়া পড়্সীর নিকট লইয়া যাইবে। হংসী ছানাগুলিকে একত্র করিয়া বলিল "দেখ এইবার তোমাদিগকে জলে লইয়া যাইব, জল দেখিয়া ভয় পাইও না, সাঁতার দেওয়া আমাদের জাতির স্বধর্ম্ম; প্রথমে নামিবা মাত্র তোমরা ডুবিয়া যাইবে তখন ভয় পাইও না, তৎক্ষণাৎ আবার ভাসিয়া উঠিবে; ও তখন আমার দিকে দেখিও, আমি যেমন করিয়া পা নাড়ি তেমনি করিয়া পা নাড়িবে, তাহা হইলে সাঁতার দিতে পারিবে। সেখানে তোমাদের বাবা সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছেন, দেখিতে পাইবে।" ছানাগুলি "পীঁ" "পীঁ" করিয়া সে কথায় সায় দিল। কিন্তু কদাকার ছেলেটীর বড় নিগ্রহ! এমন কি তাহার ভাই ভগিনীরা তাহাকে নড়িতে চড়িতে তামাসা করে। কেহ বলে "মরণ আর কি, হাঁটিবার ধরণ দেখ।" কেহ বলে "রাম রাম সে দিনের ছেলে, শরীরটা দেখ! যেন একটা বুড়ো।" কেহ বলে "তুই আমাদের সঙ্গে আসিস্ নে।" এই বলিয়া দুই তিন জনে তাহার ঘাড় কামড়াইয়া মাটিতে তাহার মুখ ঘষিয়া দেয়। মা ফিরিয়া "প্যাঁক্" "প্যাঁক্" স্বরে তিরস্কার করেন। বলেন "আহা ষেঠের বাছা যদি হয়েছে ত বেঁচে থাক্, তোরা কেন ওরে মারিস্।" কদাকার ছানাটী বিষণ্ণ ভাবে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পুকুরের কাছে গিয়া হংসী লম্ফ দিয়া জলে পড়িল, ছানাগুলি দেখাদেখি যেই লম্ফ দিল, অমনি তলাইয়া গেল; ভয়ে ওলট পালট খাইয়া আবার ভাসিয়া উঠিল। তখন মায়ের উপদেশ মত সাঁতার দিতে লাগিল। হংসী দেখে কদাকার ছেলেটীও বেশ সাঁতার দিতেছে, তখন দুশ্চিন্তা দূর হইল। ভাবিল "বাঁচ্লাম। আহা আমার বাছা পেরু হতে গেল কেন?" তখন হাঁসেরা ভাত খাইতে গিয়াছিল; হংসীর আর দেরি সয় না; এমন সব সুসন্তান তাহাদিগকে লোক-সমাজে পরিচিত করিয়া না দিলে মন তৃপ্ত হয় না। পুষ্করিণী হইতে পাড়ে বসিয়া ডানা ঝাড়িয়া ছানাদিগকে ডানা ঝাড়িতে শিখাইল; বলিল: "সাবধান! লোক-সমাজে যাইতেছ অসভ্যতা করিও না, গুরুজনদিগকে পা দেখাইও না, অকারণ "পীঁ" "পীঁ" করিও না। আর সেখানে একজন বড়লোকের স্ত্রীকে দেখিবে, তাঁহার পায়ে রাঙ্গা সূতা বাঁধা, তিনি বড় ঘরের মেয়ে, তাহার দাম অনেক, পাছে হারাইয়া যান বলিয়া গৃহস্থ পায়ে সূতা বাঁধিয়া দিয়াছে! তাঁহার কাছে গিয়া সভ্য ভব্য হইয়া থাকিবে।" এইরূপ অনেক উপদেশ দিয়া শাবক-সঙ্গে গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। অমনি হাঁসেরা সকলে আসিয়া ছেলেদিগকে আদর করিতে লাগিল। কেহ বলে "আহা! কি সুন্দর ছেলেগুলি!" কেহ বলে "সোণার চাঁদ" কেহ বলে "আহা বেঁচে থাক।" কিন্তু কদাকার ছানাটীকে দেখিয়া সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। বলে "একি ভাই, হাঁসের ঘরে এমন কদাকার ছেলে ত দেখি নাই।" লাল সূতা বাঁধা হংসীর বড় আদর! তিনি আর চক্ষুলজ্জা করিলেন না। বলিলেন "ও গো অমুকের মা, ও ছেলেটা কি তোমার?" "হাঁ দিদি কপাল ক্রমে ওই একটা কদাকার ছেলে হয়েছে কি

করি।” লাল সুতা বাঁধা হংসী বলিল—“ছি! এমন কদাকার ছেলে লইয়া তোমার লোক-সমাজে আসা উচিত হয় নাই, ঘরে রাখিয়া আসিতে পার নাই? সে বলিল:—“আর দিদি আমি গরিব আমার ছেলে দেখে কে? বিশেষতঃ ওদের বিড়ালটা বড় দুষ্ট।” লাল সুতা বাঁধা হংসী বলিল—“তা বলিলে কি হয়, আর আমার কাছে ওকে আনিও না।” এই বলিয়া একেবারে দৌড়িয়া আসিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া, মাটিতে তাহার মুখ ঘষিয়া দিল। মা বেচারি কি করে, বড়লোকের স্ত্রীকে কিছু বলিতে পারে না, কাজেই সহ্য করিতে হইল।

কদাকার ছানাটী এইরূপ যার তার নিকট অপমান গঞ্জনা আর সহিতে না পারিয়া মনের দুঃখে গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী এক খড়িবনের ভিতর চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল লোকালয়ে থাকিয়া গঞ্জনা সহ্য করা অপেক্ষা বনবাসী হওয়াই ভাল। সেখানে গিয়া কতকগুলি বাইল-হাঁসের সহিত তাহার আলাপ হইল। সে আপনার দুঃখের কাহিনী সমুদায় বলিল;—তাহারা মনে মনে বলিল “যে কদাকার! গঞ্জনা দিবেই ত।” যাহা হউক আতিথ্যের অনুরোধে মনের ভাব মনে গোপন করিয়া বলিল “আচ্ছা যদি আমাদের শরণাপন্ন হইয়াছ তবে এই বনে থাক, চরিয়া বেড়াও। কিন্তু কোনরূপ অভদ্রতা করিলে তাড়াইয়া দিব।” বেচারা এখানেও ভয়ে ভয়ে থাকে, একা একা বেড়ায়। যাহা হউক প্রত্যহ উঠিতে বসিতে তাড়া খাওয়াটা ঘুচিয়া গেল।

একদিন কদাকার হংস খড়িবনে নির্ভয় মনে পাতাড়ির কচি কচি ডাঁটা খাইয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে ও কি শব্দ! বন্দুকের আওয়াজ! বেচারা জীবনে ওরূপ ধ্বনি কখন শুনে নাই। শুনিয়াইত হৃৎকম্প উপস্থিত! ভাবিবার সময় না পাইতে পাইতে বাইল হাঁসের ঝাঁক উড়িয়াছে; আবার আওয়াজ, এক নিমেষের মধ্যে একটা রক্তাক্ত হাঁস তাহার সন্নিকটে খড়িবনে মরিয়া পড়িল। কদাকার হংস ভয়ে সরিতে সরিতে খড়িবনে অদৃশ্য হইয়া গেল। শেষে মনে করিল “এখানে থাকাতে বিপদ আছে; দূর হোক এ দেশটা ছাড়িয়া যাই।” খড়িবন হইতে উঠিয়া সন্ধ্যাকালে আর এক দিকে যাইবার জন্য যাত্রা করিল। পথে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি, ডানা ছিঁড়িয়া যায়, মুখ থুবড়িয়া পড়ে, আর চলিতে পারে না। অবশেষে এক বুড়ীর আগড়ের পাশ দিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল এবং ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে গিয়া এক তক্তার আড়ালে লুকাইয়া রহিল। রাত্রিটা কাটিয়া গেল। সে বুড়ীর সংসারে কেহ নাই কেবল এক পোষা শালিক পাখী আছে, সে মানুষের মত কথা কয়; আর একটী পোষা বিড়াল সে পাখী ধরে না। এই দুইটী বুড়ীর ঘরে রাজত্ব করে। সকালবেলা শালিকটী বকিতে বকিতে কোণের দিকে আসিয়া কদাকার হংসকে দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া গেল। তখন সে বিড়াল মহাশয়কে ডাকিয়া আনিল, এবং দুইজনে মিলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ করিল। যখন তাহারা তাড়াইবার উপক্রম করিতেছে তখন বুড়ী উপস্থিত হইয়া হংস দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল, আপনার সহচরদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল “তাড়াস্‌নে, থাক্, ডিম দিবে”। বিড়াল ও শালিক অগত্যা সে প্রস্তাবে সম্মত হইল; কিন্তু হংসের উপরে অপ্রসন্ন থাকিয়া গেল।

এখানে আসিয়া কদাকার হংসের বড় বিপদ

হইল। সে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বুড়ী বাহির হইবার সময় তাহাকে বন্ধ করিয়া যায়, ঘরে থাকিবার সময় চোখে চোখে রাখে। বিশেষ বুড়ীর বাড়ী হইতে পুকুর অনেক দূর, বুড়ী সেখানে তাহাকে যাইতে দেয় না। বেচারা কি করে অধিকাংশ সময় ঘরের কোণে কাটায়। এবং বড় বিষণ্ণ থাকে। একদিন শালিক তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা তুমি এত বিষণ্ণ থাক কেন?" কদাকার হংস বলিল "ভাই একটু জলে বেড়াইতে পারিনা, মনটা বড় কেমন করে।" শালিক বলিল—"কি পাগলের মত কথা কও, পাখী কি আবার জলে বেড়ায়" হংস—"হাঁ ভাই আমাদের জাত জলে বেড়ায়।" শালিক—"ঐ জন্যই ত আমরা তোমাকে ঘৃণা করি। আচ্ছা আমাদের বিড়াল একজন বহুদর্শী ও পরম জ্ঞানী লোক তাহাকে ডাকিয়া আনি, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ সে জলে বেড়ায় কি না, কিম্বা কাহাকেও বেড়াইতে শুনিয়াছে কি না। যে কথা নয় তাহা বল কেন? তোমার কোন যোগ্যতা নাই লাভের মধ্যে মিথ্যা কথা কও। তুমি না ডিম পাড়িতে পার, না মানুষের মত কথা বলিতে পার, না উনুন কাধাঁয় শুইয়া বিড়ালের ন্যায় ঘোঁড় ঘোঁড় করিতে পার। ইহার উপরে আবার মিথ্যা কথা কও।" এই বলিয়া শালিক বিড়ালকে ডাকিয়া আনিল। বিড়াল বলিল—"একি কথা! পাখী কি জলে যায়? ও কথা শুনিতে নাই!" সে দিন হইতে সে তাহাদের বিশেষ অপ্রিয় হইল। বুড়ীও দেখিল বহু দিন গেল তবু ডিম দেয় না, শেষে তাহাকে তাড়াইয়া দিল। শালিক ও বিড়াল বাঁচিল।

কদাকার হংস তাড়া খাইয়া পথে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর গিয়াছে, এমন সময় গ্রামের একদল ছেলে তাহাকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিল "ওরে ভাই বাবুদের হাঁস কি করে আসিয়া পড়িয়াছে, চল ধরে দিয়ে আসি, বক্‌সিস্ পাইব।" এই বলিয়া পাঁচ সাত জন ছেলেতে তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে ধরিল ও জমিদার বাবুদের বাড়ীতে লইয়া গেল। বাবুদের বাগানে এক পাল রাজহংস চরিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র কদাকার হংসের প্রাণটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। বাবুরা বালকদিগকে বক্‌সিস্ দিয়া তাহাকে হাঁসের পালে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। যেই তাহাকে হাঁসের পালে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; অমনি রাজহংসগণ গলা লম্বা করিয়া আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেহ বলিল "আহা এমন সুপুরুষ কোথা হইতে আসিল।" কদাকার হংস নিজের আদর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং মনে মনে কত তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের সঙ্গে পুকুরের জলে গিয়া নির্ম্মল জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"বাঃ আমিও যে রাজহংস।" সে পাতি হাঁসদিগের গঞ্জনা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যথাসময়ে একটী রাজহংসীর সহিত তাহার বিবাহ হইল। পরে জানা গেল যে, একটী দুষ্ট বালক একটী রাজহংসের ডিম চুরি করিয়া ঐ চাষার পাতি হাঁসের বাসায় রাখিয়া আসিয়াছিল।

উপদেশ;—গুণের আদর গুণী লোকেই করিয়া থাকে।
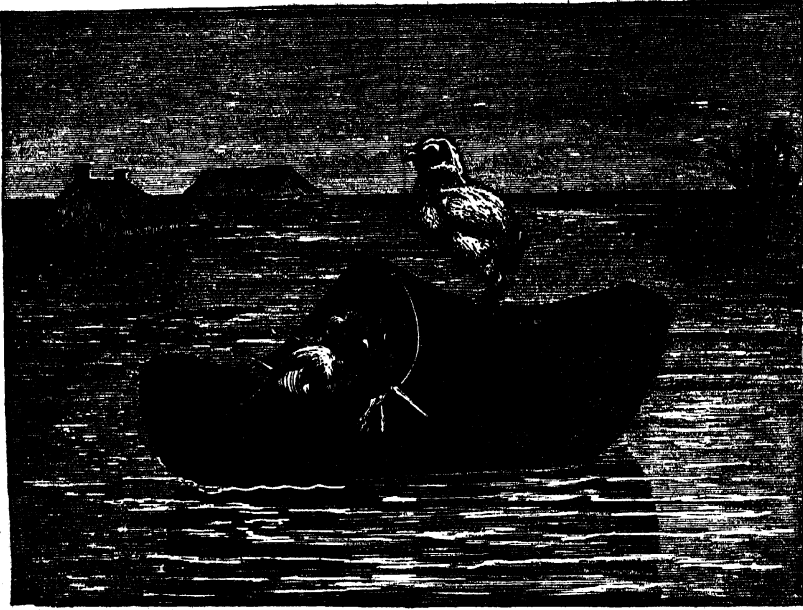
(এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

সাধের নৌকা।

সামাল সামাল, ওই ডেকে আসে বাণ,
দেশ ছেয়ে আসে ধেয়ে জল কাণে কাণ!
নিমেষে নিমেষে বাড়ে কে কোথা পালায়,
তরাসে সকল জীব হাবু ডুবু খায়।
ঘর দোর পড়ে গেল ভেসে যায় চাল,
ডুবিল গাছের গোড়া জেগে আছে ডাল।
জলে জলে একার্ণব যে দিকেতে চাই,
পৃথিবী সাগর হ'লো এ বড় বালাই!
হেনকালে দেখ চেয়ে সাধের নৌকায়,
চড়িয়া কয়টী শিশু সুখে ভেসে যায়।
এক ভায়া বসেছেন ছত্রির উপরে;
কয় জন দেখিছেন বসিয়া ভিতরে।
টানে পড়ে ছোটে তরি, হু হু করে ধায়,
আরামেতে কয় জনে বসিয়া তাহায়।
এমন অপূর্ব্ব তরি কে দেখেছে কবে?
এ তরির ইতিহাস শুন কিছু তবে।
আছিল কৃষক এক মুরগী পুষিত,
পরিয়া কাঠের জুতা কাদাতে চষিত।
আসিলে বন্যার জল কে কোথা ছুটিল,
মুরগী শাবক ছাড়ি কোথা পলাইল!
ছানাগুলি জলে পড়ি না দেখে উপায়,
অবশেষে লম্ফ দিয়া উঠিল জুতায়।
এলো জল ভাসে জুতা নৌকার মতন,
আরোহী হইল তাতে এই কয় জন।
বড়রা ডুবিয়া মলো; ছোটরা বাঁচিল,
ভাসিতে ভাসিতে তরি ডাঙ্গাতে লাগিল।

সময়ের সদ্ব্যবহার।

ভদ্রলোক হইতে তোমার, আমার সকলেরই ইচ্ছা করে; ঘরে বসিয়া আছি হঠাৎ একেবারে কতকগুলি টাকা পাইলাম আর অমনি বড়লোক হইয়া গেলাম এইরূপই অনেকেরই ইচ্ছা। কিন্তু এরূপ ইচ্ছা প্রায়ই সফল হয় না।—

দুই রকম লোককে সচরাচর সকলে বড়লোক বলে। এক, যাহাদের অনেক টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি আছে তাহাদিগকে; আর যাহারা বিদ্যাতে ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে বড়লোক বলা যায়।

দ্বিতীয় প্রকারের বড়লোকেরই মান, সম্ভ্রম পৃথিবীতে বেশী। সময়ের মূল্য বুঝা চাই; সময় অপব্যয় করিলে কি ক্ষতি হয় এবং কাজে লাগাইলে কি উপকার হয় ইহা না বুঝিলে এই প্রকারের বড় লোক হওয়া যায় না।

যেমন কোন একটী ক্ষেত্র কোনরূপ চাষ না করিয়া যদি ফেলিয়া রাখা হয় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রটী অতি শীঘ্রই পতিত হইয়া যায় অথবা কাঁটা গাছ, জঙ্গল কেবলমাত্র উৎপন্ন করে; আর যদি পরিশ্রম করিয়া মাটি চাষ করিয়া তাহাতে ভাল বীজ বপন করা যায় তাহা হইলে উত্তম শস্য উৎপাদন করে। সেইরূপ যাঁহারা বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা মনের উন্নতির দিকে চেষ্টা না করেন, বৃথা গল্প করিয়া সময় কাটান, তাহাদের মনে কাঁটা গাছরূপ কুভাব উদয় হয় এবং ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মনকে নানা প্রকার পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে; আর যিনি সময়ের মূল্য বুঝিয়া ছেলেবেলা হইতেই বৃথা সময় না কাটাইয়া পরিশ্রম সহকারে বিদ্যা উপার্জ্জনের দ্বারা মনের উন্নতি করেন তিনিই শেষে বিদ্যা বুদ্ধির গুণে বড়লোক হন।

সময় অমূল্য, একবার সময় নষ্ট করিলে, আর তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না। যদিও প্রথমে সময় বৃথা কাটাইয়া পরে কঠিন পরিশ্রম করিয়া প্রথমে যে কাজ করা উচিত ছিল তাহা করা যাইতে পারে, কিন্তু কে বলিতে পারে যে অত দিন বাঁচিয়া থাকিয়া পরিশ্রম করিবার সময় সকলেই পাইবে? মানুষের জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী; এখন হাসিতেছি, খেলিতেছি, কাল হঠাৎ মরিয়া যাইতে পারি। কোন কালেই সময়ের অপব্যবহার কোন মতেই করা উচিত নহে। পরে কঠিন পরিশ্রম করিব এখন বৃথা আমোদ করি, কখনই এরূপ ভাবে সময় কাটান উচিত নহে।

সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইলে সর্ব্বদা কোন না কোন কাজে মনকে নিযুক্ত রাখিতে হয়। যাহারা কোন কাজ কর্ম্ম করে না, কেবলমাত্র শুইয়া বসিয়া সময় কাটায় তাহাদের মনে প্রথমতঃ কুচিন্তার উদয় হয়, পরে কুকাজ করিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রবল হয়। মন্দ হওয়া বড় সহজ, ইচ্ছা করিলে যত শীঘ্র মন্দ হওয়া যায় কিন্তু বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে, ইচ্ছা করিলে তত শীঘ্র ভাল হওয়া যায় না। কাজেই যাহাদের কোন কাজই থাকে না তারাই অতি সহজে মন্দ হইয়া পড়ে। কোন কাজ না থাকিলেই নিজের সময় কাটাইবার জন্য প্রথমতঃ পরের নিন্দা ভাল লাগে, পরের কুৎসা বলিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, শেষে পরের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা হয়, অনেক মন্দ কাজ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং ক্রমশঃ ঘোর পাপী হইতে হয়। নিষ্কর্ম্মা লোকদের নিকট একদিন এক বৎসর

বলিয়া বোধ হয়। এই দীর্ঘ সময় কাটাইবার জন্য কোন প্রকার অন্যায় কাজ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আলস্যই পাপের মূল। আর যাহারা সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত তাহারা কুচিন্তা করিবার সময়ও পায় না। সময়ের সদ্ব্যবহারে যেমন বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া বড় লোক হওয়া যায় তেমন স্বভাবও নির্ম্মল থাকে।

পৃথিবীতে গণ্যমান্য ব্যক্তি হইতে যদি চাও তাহা হইলে ছেলেবেলা হইতে সময়ের সদ্ব্যবহার কর; বৃথা সময় নষ্ট করিও না। বৃথা আমোদ, আহ্লাদ, গল্প পরিত্যাগ করিয়া ভাল ভাল পুস্তক পড়িয়া বিজ্ঞ হইবার চেষ্টা কর।

উচ্চ বংশে যাহাদের জন্ম তাহাদের বুদ্ধি বেশী, তাহারাই যত্ন করিলে লেখা পড়া শিখিতে পারেন আর নীচ জাতীয়দের সন্তানেরা চেষ্টা করিলেও সেইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস অনেকেরই আছে। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতে পারে যে যাহাদিগকে আমরা 'ছোটলোক' বলি তাহারাও সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া লেখা পড়ায় শ্রেষ্ঠ হইয়া বড়লোক হইয়াছেন।

ছোট বড় সব জাতিতেই সময়ের উচিত ব্যবহার করিলে বড় লোক হইতে পারে। এই পথে জাতি বিচার নাই। যিনি সময়ের মূল্য বুঝিয়া পরিশ্রম সহকারে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবেন তিনিই বড়লোক হইবেন।

যদি বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় লোক হইতে চাও তাহা হইলে ছেলেবেলা হইতেই সময়ের সদ্ব্যবহার কর।

ধাঁধা।

জুন মাসের ধাঁধার উত্তর।

আট সেরী ভাঁড়ের তৈল দ্বারা পাঁচ সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিয়া পাঁচ সেরী ভাঁড় হইতে তিন সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিল। তিনসেরী ভাঁড়ের তৈল আটসেরীতে রাখিয়া পাঁচ সেরী ভাঁড়ের তৈল তিনসেরীতে রাখিল। এখন আট সেরী ভাঁড়ে ছয় সের ও তিন সেরী ভাঁড়ে দু সের রহিল। তৎপর আট সেরী ভাঁড়ের তৈল দ্বারা পাঁচ সেরী ভাড় পূর্ণ করিল এবং আট সেরী ভাঁড়ে এক সের তৈল রহিল। পাঁচ সেরী ভাঁড়ের তৈল দ্বারা তিন সের ভাঁড় পূর্ণ করিল,এখন আট সেরী ভাঁড়ে এক সের, পাঁচ সেরী ভাঁড়ে চারি সের এবং তিন সেরী ভাঁড় পূর্ণ রহিল। এখন তিন সেরী ভাঁড়ের তৈল আট সেরীতে ঢালিল; সুতরাং আট সেরীতে চারি সের ও পাঁচ সেরী ভাঁড়ে চারি সের রহিল। দুই জনেরই সমান হইল।

নূতন।

১। হস্ত পদ নাহি তার নাহি বাক শক্তি,
কৌশলেতে কথা কয় বুঝে কার শক্তি।
পবন সমান হয় তাহার গমন,
বিদ্যুৎ আকার তার সমস্ত লক্ষণ।

২। এক জমিদারের ১৮টী ঘোড়া ছিল; মরিবার সময়ে উইল করিয়া গেলেন যে তাঁহার প্রথম পুত্র $\frac{1}{2}$ একার্দ্ধ পাইবে; দ্বিতীয় পুত্র $\frac{1}{3}$ এক-তৃতীয়াংশ পাইবে; এবং তৃতীয় পুত্র $\frac{1}{9}$ এক নবমাংশ পাইবে। মৃত্যুর পর একটী ঘোড়া মরিয়া গেল। উইলের 'এক্সিকিউটার' কি প্রকারে ঘোড়া ভাগ করিবেন?

অক্টোবর, ১৮৮৫।

মহাভারতের উপদেশ।

দুইটী গল্প।

আমাদের দেশের বালকেরা প্রাচীনকালে যেরূপে বিদ্যাভ্যাস করিত, তাহা একবার বলিয়াছি। তখন বালকদের বাবুগিরি ছিল না। কেহ গাড়ীতে বা পাল্কীতে চড়িয়া স্কুলে আসিত না। সকলেই গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। এই ব্রহ্মচর্য্যের কথা 'সখা'র পাঠকদিগকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আজ এ সম্বন্ধে দুইটী গল্প বলিতেছি।

পূর্ব্বকালে অয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তিনটী শিষ্য ছিল। অদ্য আরুণি ও উপমন্যুর কথা বলিব। পূর্ব্বে বালকেরা কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইত, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ আত্ম-সংযম অভ্যাস করিত, সরল চিত্তে কিরূপে গুরুর আদেশ প্রতিপালনে যত্নশীল হইত, এবং নানা কষ্ট সহিয়া কিরূপে গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিত, তাহা এই কথায় জানা যাইবে।

আয়োদধৌম্য বড় একটা সদয়প্রকৃতি ছিলেন না। শিষ্যেরা কতদূর কষ্ট সহিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে শিষ্যদিগকে অনেক কঠোর কাজে নিযুক্ত করিতেন। শিষ্যগণ ছেলেবেলা হইতেই পরিশ্রমী ও কষ্ট-সহিষ্ণু হয় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি এক দিন আরুণিকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে বলিলেন। আরুণি গুরুর আদেশে ক্ষেত্রে যাইয়া আলি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অনেক যত্ন করিয়াও আলি বাঁধিতে পারিল না। তখন নিজে সেই খানে শুইয়া জলের পথ রোধ করিল। এইরূপে অনেক সময় গেল; আরুণি আর কিছুতেই সেইখান হইতে উঠিল না। আলি বাঁধিতে অক্ষম হওয়াতে গুরুর আদেশ প্রতিপালন জন্য নিজেই আলি স্বরূপ হইয়া তথায় শুইয়া রহিল। পরে কোন সময়ে গুরু অপরাপর শিষ্যদিগকে আরুণির কথা জিজ্ঞাসিলে তাহারা কহিল, "আরুণি আপনার আদেশে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে গিয়াছে।" গুরু কহিলেন, "যেখানে আরুণি গিয়াছে, চল আমরাও সেখানে যাই।" আয়োদধৌম্য সেইখানে উপস্থিত হইয়া আরুণিকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস আরুণি, কোথায়

গিয়াছ, আমার কাছে আইস।” আরুণি গুরুর কথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া আসিয়া অতি বিনীতভাবে গুরুকে কহিল, “ক্ষেত্র হইতে যে জল বাহির হইতেছিল, তাহা কিছুতেই বারণ করিতে পারি নাই, এজন্য আমি নিজে শুইয়া সেই জলরোধ করিয়াছিলাম। এখন আপনার কথায় উঠিয়া আসিলাম। অভিবাদন করি, আর কি আদেশ পালন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।” আয়োদধৌম্য শিষ্যের এইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও গুরুভক্তি দেখিয়া কহিলেন, “বৎস তুমি যথাসাধ্য আমার আদেশ পালন করিয়াছ, তোমার মঙ্গল হইবে। সমস্ত বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার আয়ত্ত হইয়া উঠিবে। তুমি শস্যক্ষেত্রের আলি ভেদ করিয়া উঠিয়াছ, এজন্য আজ হইতে তুমি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিবে।” আরুণি এইরূপে সেবা শুশ্রূষায় গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট বর পাইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর একটী শিষ্য ছিল। এখন সেই উপমন্যুর কথা বলিতেছি। গুরু উপমন্যুকে গোচারণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উপমন্যু সমস্ত দিন গোরু চরাইয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে আসিত; এবং অতি বিনীতভাবে গুরুকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত। একদিন গুরু তাহাকে মোটা সোটা দেখিয়া কহিলেন, “বৎস উপমন্যু, তোমাকে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি, এখন কি খাও, বল।” উপমন্যু কহিল, “গুরুদেব! এখন আমি ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করি।” ইহা শুনিয়া গুরু কহিলেন, “দেখ, ভিক্ষাতে যাহা পাও, আমাকে না জানাইয়া তাহা তোমার আহার করা উচিত নয়।” উপমন্যু গুরুর এই কথায় পরদিন হইতে ভিক্ষায় যাহা পাইত সমুদয় গুরুর কাছে আনিয়া দিত। গুরু সমুদয়ই নিজে লইতেন। তাহাকে খাইতে কিছুই দিতেন না। উপমন্যু ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া গুরুর আদেশে পূর্ব্বের ন্যায় গোরু চরাইতে লাগিল। একদিন গুরু তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় মোটা সোটা দেখিয়া কহিলেন, “বৎস, তুমি ভিক্ষায় যাহা পাও, সমুদয় আমি লইয়া থাকি, তোমাকে কিছুই খাইতে দিই না; অথচ তোমাকে মোটা দেখিতেছি, এখন কি খাও, বল।” উপমন্যু কহিল, “একবার ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই আনিয়া আপনাকে দিই, আর একবার কয়েক মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়া নিজের উদর পূরণ করিয়া থাকি।” গুরু কহিলেন, “দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম নয়, তুমি নিজে দুইবার ভিক্ষা করিলে গৃহস্থ আর কাহাকেও ভিক্ষা দিবে না। ইহাতে অপর ভিক্ষুকদিগের কষ্ট হইবে, তোমারও লোভ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব তুমি আর কখন দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করিও না।” উপমন্যু গুরুর এই আদেশে দ্বিতীয় বার ভিক্ষা করিতে নিরস্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্ট চিত্তে গোচারণ করিতে লাগিল। গুরু দেখিলেন—উপমন্যু কৃশ না হইয়া ক্রমেই বেশী মোটা হইতেছে; এজন্য তাহাকে আর একদিন কহিলেন, “বৎস! তোমার সমস্ত ভিক্ষান্ন লইয়া থাকি, আমার আদেশে তুমি দ্বিতীয় বার ভিক্ষাও কর না, অথচ তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলকায় দেখিতেছি; এখন কি আহার কর, জানিতে ইচ্ছা করি।” উপমন্যু কহিল, “গাভীগণের দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।” গুরু কহিলেন, “দেখ, আমি তোমাকে দুগ্ধ পান করিতে অনুমতি করি নাই, আমার অনুমতি না লইয়া

দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে।” উপমন্যু ইহাতে লজ্জিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না। এদিকে গুরু তাহাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিয়া আর একদিন কহিলেন, “বৎস, আমি তোমাকে দুগ্ধ পান করিতে নিষেধ করিয়াছি, অথচ তোমাকে স্থূলকায় দেখা যাইতেছে, এখন কি আহার কর?” উপমন্যু কহিল, “গো-বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিয়া মুখ হইতে যে ফেণ বাহির করে, আমি তাহা পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।” গুরু ইহা শুনিয়া কহিলেন, “ইহাতে গো-বৎসগণের অত্যন্ত কষ্ট হয়, অতএব ফেণ পান করাও তোমার উচিত নয়।” উপমন্যু গুরুর এই আদেশ পাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় গোরু চরাইতে লাগিল। সে গুরুর আদেশে ভিক্ষান্ন খাইত না, দ্বিতীয় বার ভিক্ষাও করিত না; এখন গাভীর দুগ্ধ পান ও দুগ্ধের ফেণ খাইতেও বিরত হইল। এইরূপে অনাহারী হইয়া গোরু চরাইতে চরাইতে উপমন্যু একদিন ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়া পড়িল। নিকটে একটী আকন্দ গাছ ছিল, ক্ষুধার জ্বালায় উপমন্যু তাহার পাতা খাইল; সেই আকন্দ গাছের কটু তিক্ত পাতা খাওয়াতে তাহার চক্ষুর দোষ জন্মিল। উপমন্যু অন্ধ হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটী কূপে পড়িয়া গেল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় উপমন্যু গোরু চরাইয়া আয়োদধৌম্যের নিকট উপস্থিত হইত। কিন্তু কূপে পড়িয়া যাওয়াতে সেদিন সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে যাইতে পারিল না। গুরু উপমন্যুকে দেখিতে না পাইয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, “উপমন্যু এখনও আসিতেছে না, আমি তাহাকে আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি। বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে; এই জন্য ফিরিতেছে না, চল আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।” ইহা কহিয়া গুরু শিষ্যগণের সহিত বনে যাইয়া “বৎস উপমন্যু, কোথায় গিয়াছ” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। উপমন্যু কূপ হইতে গুরুর স্বর শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “গুরুদেব! আমি কূপে পতিত হইয়াছি।” আয়োদধৌম্য ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে উপমন্যু পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—“আকন্দ পাতা খাওয়াতে অন্ধ হইয়া কূপে পড়িয়া গিয়াছি।” গুরু কহিলেন, “দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব কর। তাঁহারা তোমার চক্ষুদান করিবেন।” উপমন্যু গুরুর আদেশে সংযত চিত্তে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের স্তব করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার যুগল স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেইখানে আসিয়া উপমন্যুকে কহিলেন, “আমরা তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়া এই পিষ্টক দিতেছি, ভক্ষণ কর।” উপমন্যু কহিল, “আপনাদের কথা অবহেলা করা উচিত নয়, কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক খাইতে পারি না।”

ইহা শুনিয়া অশ্বিনীতনয় দ্বয় কহিলেন, “পূর্ব্বে তোমার গুরুও আমাদিগের স্তব করিয়াছিলেন। আমরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি পিষ্টক দিয়াছিলাম, তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা খাইয়াছিলেন। তোমার গুরু যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর।” উপমন্যু কাতরস্বরে বলিল, “আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক খাইতে পারিব না।” অশ্বিনীকুমার যুগল কহিলেন, “তোমার এইরূপ অসাধারণ গুরুভক্তি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার চক্ষু লাভ হউক। কখনও যেন তোমার কোন অম

জল না হয়।” উপমন্যু এইরূপে চক্ষু রত্ন পাইয়া গুরুর কাছে আসিয়া অতি বিনীতভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। গুরু প্রীত হইয়া কহিলেন, “দেববৈদ্যগণ যেরূপ কহিয়াছেন, সেইরূপ তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সমস্ত বেদ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অধিকারী হও।” এইরূপে উপমন্যুর পরীক্ষা সমাপ্ত হইল।

দুই ভাই।

মৃত ও সুরেন দুই ভাই এক রবিবারে বসিয়া গল্প করিতেছে। নানা প্রকার কথা বার্ত্তা হইতেছে:—‘স্কুলের অমুক ছেলেটী বড় ভাল, কিন্তু তার একটা দোষ, সে অহঙ্কারী; কারও সঙ্গে মন খুলে কথা কয় না। অমুক মাষ্টারটী বড় মারেন, ভারি রাগী, একদিন অমৃতকে মারিতে গিয়াছিলেন, দূর হইতে সুরেন তা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল’—ইত্যাদি ইত্যাদি কত সব কথা হইতেছিল। এমন সময়ে মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মা—“কি কথা হইতেছে, অমৃত?

অমৃত—“এই সব স্কুলের কথা আর ছেলেদের কথা, আর কিছু না।”

মা—“মিছামিছি সময়টা নষ্ট করা কি ভাল?”

সুরেন—“তা, মা! আজ ত আর স্কুলের পড়া নাই; মাষ্টার মহাশয়ও আসিবেন না?”

মা—“আজিকার পড়া নাই বা থাকিল? আর মাষ্টার মহাশয় না এলে কি পড়িতে নাই? এই আমি একখানা ভাল বই দিয়া যাচ্ছি, সেইখানা দুজনে পড়িতে পারিবে ত?”

অমৃত—“কি বই মা? সহজ ত?”

মা—“হাঁ খুব সোজা, আর ভাল ভাল গল্প ও উপদেশ আছে।”

সুরেন—“তা হলে দাও মা, এখনি দাও। আমি ভাল গল্প ও ভাল কথা শুনতে কি পড়্‌তে বড় ভাল বাসি।”

মা তাঁর ঘর থেকে বইখানি আনিয়া দিলেন ও তাঁহাদিগকে পড়িতে আরম্ভ করাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দুটী ভাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া এক মনে বইখানি সমাপ্ত করিল। সুরেন তখন বলিল—“দেখ, দাদা! মা যদি না আস্‌তেন, তা হলে, আমরা কত কি বাজে কথাতেই আজ সকালবেলাটা কাটাতেম, আর এ কেমন চমৎকার কথা পড়িতে পেলাম! আমাদের মতন মা কিন্তু আর কারও নাই! ও বাড়ীর কেশব আর দুলাল সমস্ত দিনটা খেলা করিয়া বেড়ায়; কৈ, তাদের মা ত এমন ক’রে বই পড়্‌তে দেন না? এবার অবধি আমাদের স্কুলের পড়া হয়ে গেলেই মার কাছ থেকে এক একখানা ভাল বই নিয়ে প’ড়ব, কেমন দাদা?” অমৃত ঘন ঘন ঘড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে কথাগুলি শুনিল; তার পর বলিল “হাঁ ভাই! চল এখন স্নান করিগে, দেখ বেলা ১০টা বাজে।”—“তাই ত! ওঃ! এর মধ্যে এত বেলা হয়েছে? আমি তা কিছুই জান্‌তে পারি নাই। চল যাই।” উভয়ে পুস্তক খানি যত্ন করিয়া রাখিয়া স্নান ও আহারাদি করিতে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে বাহিরের বাড়ীতে

ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ঘোড়াটীকে দুজনে বড় ভালবাসে। অনেকক্ষণ ঘোড়াটীর গায়ে পায়ে, গলায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, আর নিকটে সইস্ ভাত রাঁধিতেছিল, তাহার মুখে ঘোড়ার কত কথা শুনিতে লাগিল; কত রকমের ঘোড়া আছে, কোন্ জাতের ঘোড়ার কি কি গুণ, কত দাম ইত্যাদি কত কথা! তার পর দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া ফুল বাগানের দিকে গেল। গোলাবাড়ী পার হইয়া বাগানের ছোট দরজাটীতে যেই পা দিয়েছে, অমনি দেখে যে একটা কি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। সুরেন কুড়াইয়া লইল। অবাক! এ ওর মুখপানে চাহিতে লাগিল; আর কাগজখানা দেখিতে লাগিল—একখানা পাঁচ টাকার নোট!

ফুলবাগানে যাওয়া আর হ'ল না। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আসিতে পরামর্শ করিতে লাগিল—কি করা যায়? "মার কাছে লইয়া যাইতে হইবে।—যার নোট হারাইয়াছে নিশ্চয়ই তিনি সন্ধান করিয়া তাহাকে দিবেন।" অমনি একছুট। অনেক অনুসন্ধান করা হইল, নোট যে কাহার তা কেহ বলিতে পারিল না। শেষে মা বলিলেন—"যখন কার নোট ঠিক হইল না, তখন ও তোমাদেরই হইল। তোমরা যা ইচ্ছা করিতে পার।" দুজনের আর আনন্দ ধরে না। নোট পাইয়া দুজনে পড়িবার ঘরে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, কিরূপে এই পাঁচটী টাকা খরচ করা হইবে। কতই বুদ্ধি আসিতে লাগিল, আবার তখনি "না সুবিধা হইবে না" "না, ওটা ভাল হয় না" মনে হইতে লাগিল। কোনটাই ঠিক মনের মত হইল না। অমৃতের ইচ্ছা, নিজেদের জন্য কোন পছন্দ মত ভাল জিনিস কিনে; সুরেন সে কথায় কাণ দেয় না, বরং বিরক্ত হয়—"কেন? আমাদের যা দরকার বাবাকে মাকে বলিলেই ত উচিত মনে করিলে তাঁহারাই কিনে দেন? সে জন্য এ টাকা খরচ করিতে হলে ত এক রকম বাবাকেই দেওয়া হয়। সে হবে না; এ টাকা কোন ভাল কাজে খরচ কর্ত্তে হবে।" তখন অমৃত বলিল, "ঠিক বলিয়াছ, সকালে বৈথানিতে যে পড়িলাম 'কুড়াইয়া পাওয়া অর্থ নিজের দরকারে খরচ করিতে নাই, কেন না তাহাতে আমার কোন অধিকার নাই। যে যাহা পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন না করে, তাহাতে তাহার যথার্থ অধিকার হয় না।' ঠিক কথা! এতক্ষণ আমার মনে ছিল না। এ টাকা ভাল কাজেই খরচ করিতে হইবে।" সুরেনের এ সব কিন্তু মনে ছিল, তাই সে এতক্ষণ ঐ কথা বলিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে স্থির হইল যে তাহাদের ক্লাশে গোপাল নামে যে ছেলেটী পড়ে তার বাপের পক্ষাঘাত রোগ হওয়া অবধি সে ভিক্ষা করিয়া স্কুলের বেতন দেয়, কিন্তু বৈ শ্লেট কিনিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া পড়িবার বড়ই অসুবিধা হয়; ঐ টাকাতে তাহার সমস্ত বৈ ও একখানি শ্লেট, কিছু কাগজ, কলম ও কালি কিনিয়া দিতে হইবে। উভয়ের মন এখানে মিলিল। তখনি বাজারে গিয়া সমস্ত কিনিল, ও তা ছাড়া দুটী টাকা যে বাকী ছিল তাহাতে তাহার জন্য দুটী জামাও কিনিল।

"যাহা ভাল কাজ তাহা মনে উদিত হইবা মাত্রই করিয়া ফেলা উচিত" এই উপদেশ তাহারা মার মুখে প্রায় হাজার বার শুনিয়াছে; কাজেই তখনি সমস্ত সামগ্রী কিনিয়া ফেলিল। কিন্তু তার পর এক বড় গোলে পড়িয়া গেল। গোপালদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছে। কিন্তু

কেমন যে লজ্জা করিতে লাগিল; বাড়ীতে যাইতে আর পারে না। গায়ে কাঁটা দিতেছে, বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া উঠিতেছে, আর সমস্ত প্রাণটা যেন কেমন করিতেছে। একজন বৈ কথানি, আর একজন জামা ও শ্লেট কাগজ প্রভৃতি হাতে করিয়া তাহাদের পাঁচীলের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া উপরের দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট কামড়াইতেছে, আর পথের দিকে চাহিতেছে। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; আর সে রাস্তাটা কিছু গলির মতন, তাই সেখান দিয়ে এখন একজনও লোক চলিতেছে না। নহিলে তাহারা সেখানে দাঁড়াইতে পারিত না। ছেলে মানুষ কি না? ভাল কাজ করিবে, উপকার করিবে—কেমন লজ্জা হইতেছে। হইতেই পারে।

এ অবস্থায় কিন্তু তাদের বেশীক্ষণ থাকিতে হয় নাই। গোপাল একটা বাটী হাতে করিয়া বাজারে যাইবার সময় বাহিরে আসিয়া দেখে যে দুটী ভাই পথের পাশে ঐরূপে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া সে আশ্চর্য্য বোধ করিল। এদিকে তাহারাও গোপালকে দেখিবামাত্র চম্‌কাইয়া উঠিল; বুকের ভিতর দুজনেরই যেন বড় বড় ঢেঁকি পড়িতে লাগিল "ধড়াস্‌ ধড়াস্‌"। তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল, গলা আট্‌কাইয়া গিয়াছে, কথা বাহির হইল না—সামগ্রীগুলি সমস্ত গোপালের সম্মুখে রাখিয়া দুজনে খুব শীঘ্র হন্ হন্ ক'রে চলে গেল; যাইবার সময়ে সুরেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কেবল বলিয়া গেল যে, "এ গুলি তোমার জন্য।" আহা! কি সুন্দর!!

ক্রমশঃ

নিদ্রালু ননীগোপাল।

আর দিন নাই এস ননী ভাই
পরশু পরীক্ষা হবে;
রজনী জাগিয়া বসিয়া বসিয়া
পড়ি মন দিয়া সবে।
এই কথা বলি ননীরপুতলি
ননীগোপালেরে ধরি;
বিমল সরল বালকের দল
বসাইল যত্ন করি।
পড়িতে বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া
ঘুমে হল ননী সারা;
মুখে পড়ে লাল ভাসে দুটী গাল
মুদিত নয়ন তারা।
পণ্ডিত মশায় ধরিয়া তাহায়
তুলে দেয় বারে বারে;
কেতাব খুলিয়া পড়ে গেঙ্গাইয়া
কিন্তু বুঝিবারে নারে।
পাঠে যেই জন নাহি দেয় মন
তার কি স্মরণে থাকে?
পড়ার বেলায় ঘুমে ধরে তায়,
মাঝে মাঝে নাক ডাকে।
হইল না পড়া ছাড়ি চূড়া ধড়া
হাতে লয়ে মোমবাতি;
চলে ননী ঘরে শুইবার তরে
না হইতে সন্ধ্যা রাতি।
ঘুমে আঁখি ভরা মুখটী হাঁ করা
ফেলি জুতা খালি পায়;
কাছা কোঁচা খোলা যেন বোম ভোলা,
টলিতে টলিতে যায়।

দেখো ভাই ননী খোঁকা ধনমণি
পড়িও না যেন ঢলে;

হাঁ করিতে আর হবে না তোমার!
যাও মার কাছে চলে।

অদ্ভুত কৌশল।

যদি সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপ না থাকিত তাহা হইলে আমরা বাঁচিতাম না, আর কেবল তাহাই নহে এ পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর ও মনোহর পদার্থ আছে, তাহার কিছুই থাকিত না, হয়ত এ জগতেরই সৃষ্টি হইত না। সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপ আমাদিগের জীবন ধারণের যেমন এক প্রধান উপায় তেমনি সুখেরও এক প্রধান কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, সূর্য্য যে আলোক ও উত্তাপ এখন দিতেছে, তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া আছি এবং নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতেছি। আবার পাঠক পাঠিকা শুনিয়া হয়ত অবাক্ হইবে যে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যখন তোমার বুড়ো ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদারও জন্ম হয় নাই, হয়ত যখন মানুষেরই জন্ম হয় নাই, তখন সূর্য্য যে আলোক ও উত্তাপ দিয়াছে, সে আলোক এবং উত্তাপও তোমার নানা প্রকার সুখের জন্য সঞ্চয় হইয়া আছে। কি আশ্চর্য্য কৌশলে পরমেশ্বর সেই আলোক ও উত্তাপ তোমার সুখের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, আজ তাহারই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

পাথুরে কয়লা তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। ইংরাজিতে ইহাকে 'কোল' বলে; আমাদের দেশে 'পাথুরে কয়লা' বলে। পাথরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া যে ইহাকে পাথুরে কয়লা বলা হয় তাহা নহে; বোধ হয় পাথরের মত কঠিন, পাথরের মত ওজনে ভারি এবং কতকটা পাথরের মত দেখ্‌তে এই জন্যই পাথুরে কয়লা বলে। বাস্তবিক ইহার পাথরের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই; আর শুধু 'কয়লা' বলিলে কাঠ পোড়াইলে যে কয়লা হয় তাহাই মনে হইতে পারে, এ জন্যও পাথুরে কয়লা বলা হয়। ইংরাজিতে দুইএরই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, পাথুরে কয়লাকে 'কোল্' বলে এবং কাঠের কয়লাকে 'চারকোল্' বলে।

অনেকের ধারণা আছে যে পাথর যেমন পাহাড় হইতে কাটিয়া আনে, পাথুরে কয়লাও তেমনি পাথুরে কয়লার পাহাড় হইতে কাটিয়া আনে। বাস্তবিক তাহা নহে। কয়লা খনি হইতে কাটিয়া আনিতে হয়। বিলাতে, আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে বড় বড় কয়লার খনি আছে। আমাদের দেশেও রাণিগঞ্জ, গিরিধি প্রভৃতি স্থানে বড় বড় খনি আছে। মাটির অনেক নীচে এই সমস্ত কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া যায়। দুই তিন হাত মাটি খুঁড়িলেই যে কয়লার খনি বাহির হয় তাহা নহে। প্রথম স্তরে স্তরে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে হয়, তার পর বালির স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, সে গুলি খুঁড়িলে কর্দ্দমের স্তর বাহির হয়, তার পর অনেক সময় পাথরের স্তরও দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গুলি খুঁড়িয়া ফেলিলে তখন কয়লার স্তর বাহির হয়। ইহার এক একটী স্তর অনেক দূর ব্যাপিয়া থাকে। আমেরিকার এক স্থানে সাত শত ত্রিশ মাইল দীর্ঘ এবং একশত আশি মাইল প্রস্থ কয়লার খনি বাহির হইয়াছে; সমস্ত ইংলণ্ড ইহার অপেক্ষা ছোট। এখন ভাবিয়া দেখ এক একটী

কয়লার খনি কত বড়। এই সমস্ত খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করিতে কত লোক নিযুক্ত করিতে হয়, কত প্রকার বাষ্পীয় কল নিযুক্ত ও কত পরিশ্রম করিতে হয় তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কি উপায়ে কয়লা সংগ্রহ হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমরা বলিব না; গত বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠা, সম্পাদকের দ্বিতীয় পত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। কয়লা কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং আমাদের কি কি উপকারে আসে, সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাথুরে কয়লার সঙ্গে পাথরের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে এ জিনিসটা কি? যদি দুই কথায় ইহার উত্তর দিতে হয় তাহা হইলে এই বলা যাইতে পারে যে পাথুরে কয়লা উদ্ভিদের রূপান্তর মাত্র। যে কাঠ পোড়াইলে কয়লা বা 'চারকোল্' হয়, এও সেই কাঠ; তবে ভিন্ন প্রকার অবস্থায় থাকাতে ভিন্ন আকার এবং ভিন্ন নাম হইয়াছে মাত্র। উদ্ভিদই যে কয়লার মূল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সময় গাছের পাতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ ও লতা পাওয়া গিয়াছে, যাহার আকার ঠিক রহিয়াছে, কিন্তু এখন আর পাতা অথবা লতা নাই; এখন সে গুলি কয়লা হইয়া গিয়াছে, অথচ আকারের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা যে কয়লা দেখিতে পাই তাহাতে কোন চিহ্ন হয়ত থাকে না, কিন্তু খনি হইতে যখন প্রথম কয়লা সংগ্রহ করা হয়, তখন অনেক উদ্ভিদের চিহ্ন ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া নয়শত চৌত্রিশ রকমের উদ্ভিদ এ পর্য্যন্ত কয়লার মধ্যে পাইয়াছেন। কখন কখনও বড় বড় গাছও দেখা গিয়াছে, কিন্তু এখন আর তাহা গাছ নাই, কয়লা হইয়া পড়িয়াছে। কি রকমে কয়লা তৈয়ার হয় তাহা এখন বলিতেছি। জলা স্থান, হ্রদ ও নদী প্রভৃতির মধ্যে প্রথম গাছের পাতা, ছোট গাছ, লতা এবং বড় বড় গাছ পড়িয়া জমিতে থাকে। জলে ঢাকা থাকে এজন্য বাতাসের সঙ্গে কোন সংশ্রব থাকে না। ক্রমে এই গুলি পচিতে থাকে, এবং খানিকটা কাল হইয়া যায়, কিন্তু তখনও উদ্ভিদের আকার বজায় থাকে। ক্রমে বালি ও মাটির স্তর ইহার উপর জমিতে থাকে, এবং ক্রমে এই মাটির স্তর পুরু হইয়া উঠে। এই মাটির স্তরের চাপে ক্রমে ঐ জলমধ্যস্থ পদার্থগুলি জমাট বাঁধিতে থাকে, এবং ক্রমে রাসায়নিক যোগে রূপান্তরিত হইয়া কঠিন ও ভারি হয়; তখন ইহাকে পাথুরে কয়লা বলা যায়। এক স্থানে যে একটী মাত্র স্তর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; যে প্রকার লিখিত হইয়াছে, ঐ প্রকার এক স্তর তৈয়ার হইলে উহার উপরে যে মাটির স্তর থাকে পুনরায় তাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় বৃক্ষাদি জমিতে থাকে, ক্রমে সে গুলি কয়লায় পরিণত হয়, এইরূপে অনেক স্তর হইতে দেখা যায়। ইহা যে দুই এক বছরেই হয় তাহা নহে; এক একটী স্তর তৈয়ার হইতে সহস্র সহস্র বৎসর দরকার হয়। এই কয়লার দ্বারা মানুষের যে কত উপকার হইতেছে, মানুষ যে কত সুখভোগ করিতেছে গণনা হয় না। এই কয়লার সাহায্যে, আমরা বাড়ী আলোকে সাজাইতেছি, আমাদিগের খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করিতেছি। বড় বড় সহর ইহার সাহায্যে রাত্রিতে দিনের মত আলোকিত হইতেছে। ইহারই সাহায্যে রেল গাড়ীতে ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাইতেছি। ইহারই সাহায্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, কাপড় বোনা হইতেছে, লক্ষ রকমের কল চলিতেছে ও মানুষের নানা সুখ বিধান করিতেছে। আবার দেখ

লক্ষ লোক এই কয়লার খনিতে নিযুক্ত হইয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, বোধ হয় তোমরা জান যে, যে কয়লা দ্বারা আমাদের রন্ধনের কাজ হয় তাহা ঠিক খনির কয়লা নহে। খনির কয়লা হইতে গ্যাস্ ও আল্কাতরা বাহির করিয়া লইলে যাহা থাকে, তাহাই আমাদের রন্ধন কাজে লাগে, এবং ইহাকে ইংরাজিতে 'কোক্' কহে। একটা হাঁড়ির মধ্যে এক খণ্ড আদৎ কয়লা রাখিয়া হাঁড়িটার মুখ আঁটিয়া, হাঁড়ির গায়ে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটা নল বসাইয়া যদি আগুনের উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে নলের মুখ হইতে ধূমের ন্যায় এক রকম জিনিস বাহির হইতেছে। ইহাকেই গ্যাস্ কহে, এবং জ্বালাইলে সুন্দর আলো হয়। গ্যাস ভিন্ন ইহা হইতে আগুনের উত্তাপে আল্কাতরা বাহির হয়। এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাকে 'কোক্' কহে। পাঠক পাঠিকাগণ! যে কয়লার সাহায্যে তোমাদের গৃহ আলোকিত করিতেছ, সুমিষ্ট খাদ্য তৈয়ার করিতেছ, যাহার সাহায্যে বিদেশের বন্ধু বান্ধবদিগকে এক মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইতেছ, যাহার সাহায্যে এত সুখভোগ করিতেছ, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল এই কয়লার উত্তাপ ও আলোক দিবার শক্তি। এ উত্তাপ ও আলোক দিবার শক্তি কোথা হইতে আসিল? শুনিলে অবাক্ হইবে যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য যে আলোক ও উত্তাপ দিয়াছে, এ সেই উত্তাপ এবং সেই আলোক। কাঠ পোড়াইলে যে উত্তাপ ও আলোক দেখা যায় তাহাও সেই সূর্য্যের উত্তাপ ও সূর্য্যের আলোক। বৃক্ষ সূর্য্যের যে উত্তাপ ও আলোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তুমি তাহাকে পোড়াইতেছ তখন সেই উত্তাপ ও আলোক তোমাকে দিতেছে। আর সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৃক্ষেরা যে আলোক ও যে উত্তাপ সূর্য্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং পরমেশ্বর যে অদ্ভুত কৌশলে তাহা তোমার সুখের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরে সূর্য্যের সেই আলোক ও উত্তাপ ভোগ করিতেছ, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ইহা কি ঈশ্বরের অদ্ভুত কৌশল নহে?

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

লক বালিকাগণ! আজ যে মহাত্মার ছবি অপর পৃষ্ঠায় দেখিতেছ উহাঁকে কি তোমরা চেন? নিশ্চয় চেন; যখন পাঁচ বৎসরের সময় তোমাদের বর্ণ পরিচয় হয় তখন হইতে ইহাঁর সহিত পরিচয় হইয়াছে। ইনি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়, বলিতে মনে কত সুখ হইতেছে। কেন না হইবে? এত বড় লোক যে দেশে জন্মে, এরূপ লোককে যাহারা আমাদের লোক বলিতে পারে তাহারা কেন না সুখী হইবে? বাস্তবিক ইনি যে আমাদের দেশে জন্মিয়াছেন, এজন্য আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল।

আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত বড় লোক তোমরা তাহার কিছুই জান না। তোমরা ছেলে মানুষ, কি করিয়াই বা জানিবে? যত বড় হইবে ততই ইহাঁর গুণাবলী শুনিবে। তোমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস প্রভৃতি

পড়িয়াছ, এই মাত্র জান; এবং হয়ত শুনিয়াছ যে ইনি এদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই মাত্র জানাইলে ইহাঁর কিছুই বলা হইল না; ইহাঁর মহত্ত্ব কিছুই প্রকাশ করা হইল না। ইহাঁর ভিতরে যে মনুষ্যত্ব আছে, যে অসাধারণ মহত্ত্ব আছে, আমাদের ভাষার এমন কোন শব্দ নাই যে, তাহা দ্বারা আমরা তোমাদিগকে ভাঙ্গিয়া বলি। একটা দাঁড়ি পাল্লার এক দিকে যদি একটা মোণ চাপাইয়া দেও ও অন্য দিকে যদি একটা ছটাক চাপাইয়া দেও তাহা হইলে সে দাঁড়িপাল্লার যে দশা হয় আমাদের সহিত ইহাঁর তুলনা করিতে গেলেও সেই দশা ঘটে। আমাদের ১০০ জনকে এক পাল্লায় দিয়া ইহাঁকে আর দিকে দিলেও সমান হয় না। ইহাঁর জীবন-চরিত কিছু বলি শুন।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার দিবা

দ্বিপ্রহরের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলি জেলার অধীন বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কলিকাতা সহরে সামান্য বিষয় কর্ম্ম করিয়া অতি কষ্টে নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। এরূপ শুনা যায় দশ টাকা মাত্র তাঁহার মাসিক আয় ছিল। এই সামান্য আয়ে তাঁহাকে বাড়ীর ব্যয় ও কলিকাতার নিজের ব্যয় চালাইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স যখন ৮।৯ বৎসর তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আনিলেন। ১০৲ টাকা মাসিক আয়ে একে নিজের ব্যয় চলা দুষ্কর তাহাতে আবার পুত্রটীকে আনা হইল; ইহাতে পিতা ও পুত্র উভয়কে কিরূপ ক্লেশে দিন কাটাইতে হইত, তাহা তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পার। সেই নবম বর্ষীয় বালক স্নেহময়ী মাতার কোল ছাড়া হইয়া আসিয়া কলিকাতায় ঘোর দারিদ্র্যে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া থাকেন, সে সময়ে তিনি তরকারির মুখ প্রায় দেখিতে পাইতেন না; প্রায় ভাতে ভাত ও কখন কখনও লবণ দিয়া ভাত খাইয়া থাকিতে হইত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে আনিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেই বালকের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাস্তবিক জগদীশ্বর তাঁহাকে আশ্চর্য্য মানসিক তেজ ও প্রতিভা দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন; তিনি যে শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন, সেই শ্রেণীতেই বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইতে লাগিলেন। তাঁহার বালককাল হইতেই লোকে বুঝিতে পারিল যে এ ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে একটা অদ্বিতীয় লোক হইবে।

যাহা হউক ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি কালেজের পাঠ সমাপন পূর্ব্বক যশস্বী হইয়া বাহির হইলেন। সেই সময়ে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কালেজ নামে একটী কালেজ ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে ৫০৲ টাকা বেতনে সেই কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ পাইলেন। এই খানে কর্ম্ম করিবার সময় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ বৎসরের এপ্রেল মাসে তিনি সংস্কৃত কালেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে আবার কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে কর্ম্ম করিয়া পুনরায় সংস্কৃত কালেজে আসিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের কাজ করিবার সময় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কি না এই প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। এদেশের বালিকাদিগের অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হয়, অনেক বালিকা শৈশবেই বিধবা হয়; তাহাতে আবার কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে সে আর বিবাহ করিতে পায় না। তাহাকে চিরজীবন পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। পরের গলগ্রহ হইয়া, লোকের তাড়া খাইয়া, দশজনের গঞ্জনা সহিয়া বিধবাদিগকে যেরূপে দিন যাপন করিতে হয় তাহা স্মরণ করিলে কাহার না হৃদয়ে দয়া হয়? বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের দুঃখ দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কিনা, এইরূপ বিবাহ দেশে প্রচলিত

করা উচিত কিনা এই চিন্তাতে রত হইয়াছিলেন। এই খানেই তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারা যায়। দেশের হাজার হাজার লোক প্রতিদিন স্বচক্ষে বিধবাদিগের কত যাতনা দেখিতেছে, কিন্তু তাহারা দেখিয়া উপেক্ষা করে; বিদ্যাসাগর মহাশয় উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এই তাঁহার মহত্ত্ব। দুঃখিনী বিধবাদের জন্য কি করি?—এই চিন্তাতে তাঁহার মনের শান্তি গেল। তিনি রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না। তিনি দিন দিন এই চিন্তায় এতদূর নিমগ্ন হইলেন যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন। সে সময়ে তাঁহার পরিশ্রম যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়েতে বাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রে যখন যাও, দেখিবে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তক রাশির মধ্যে নিমগ্ন; মনোযোগ সহকারে কেবল বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন ও গভীর রূপে শাস্ত্রের বিচারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। একবার এক মুষ্টি অন্ন মুখে দিবার জন্য বাহিরে যাইতেন, তদ্ভিন্ন সমুদয় সময় শাস্ত্র পাঠে যাপন করিতেন। এখন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাশীকৃত হাতে লেখা পুথী পড়িয়া তাঁহাকে এক একটী বচন সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম ও পাঠের পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তিনি শাস্ত্রের বচন তুলিয়া প্রমাণ করিলেন যে, বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হওয়াতে দেশ মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। এমন আন্দোলন প্রায় দেখা যায় না। চারিদিকে হুলস্থূল। হাটে বাজারে, পথে ঘাটে যেখানে সেখানে এই চর্চ্চা। পথ ভিখারিগণ বিধবা বিবাহের গান গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" এই গান পেড়ে বুনিয়া ধুতি প্রস্তুত করিতে লাগিল। ওদিকে দেশের প্রাচীন কালের কুসংস্কার যাহাদের মনে প্রবল ছিল তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, দেশের শত্রু, ধর্ম্মের উচ্ছেদকর্ত্তা বলিয়া কত কটূক্তি করিতে লাগিল। ঠিক যেন বোধ হইল বিদ্যাসাগর মহাশয় হঠাৎ একটা কোন দ্বার খুলিয়া দেশ মধ্যে এক প্রকাণ্ড ঝড় আনিয়া ফেলিলেন। এই ঝড়ে সকলে কাঁপিয়া গেল; যে তাঁহার বন্ধু ছিল সে গা ঢাকা দিল; যে সহায় ছিল সে দূরে পলাইল; যাহারা বিধবা বিবাহের সপক্ষ বলিয়া নাম দিয়াছিল তাহাদের অনেকে গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গেলেন; তাঁহাকে একঘরে করিবার জন্য সমাজের লোক ধর্ম্মঘট করিতে লাগিল। কিন্তু এত যে ওলট পালট হইয়া গেল, ইহার মধ্যে এক জন লোক কেবল কাঁপিলেন না; একটু নুইলেন না; একবার দমিলেন না। তিনি বিদ্যাসাগর। তাঁহার মুখে একটু ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। যে দিন কলিকাতা সুকীয়াষ্ট্রীটে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিবাহ করেন তখন আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ওঃ সে দিনের কি ব্যাপার! দেখিবার জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই হাত অন্তর পাহারা রাখিতে হইয়াছিল; নতুবা দুষ্ট লোকে বোধ হয় তাঁহাকে ও বরযাত্রীদিগকে মারিত; বিদ্যা- অন্য লোক মুখে বলে, কা[illegible]

সাগর মহাশয়ের যে কথা সেই কাজ। তিনি বীরের ন্যায় স্বকর্ত্তব্য সাধনের জন্য দাঁড়াইলেন, দেশ শুদ্ধ লোকের ভ্রূকুটির প্রতি একবার দৃষ্টি-পাতও করিলেন না। দেশের পণ্ডিতেরা তাঁহার প্রথম প্রচারিত গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তিনি তাহার উত্তর দিয়া দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রচার করিলেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ বিচারশক্তি প্রকাশ পাই-য়াছে। অদ্যাবধি কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারে নাই।

তোমাদিগকে বলি শুন, এমন বীর পুরুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যে প্রতিজ্ঞার বলে বাল্যকালের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞার বলে দেশ শুদ্ধ লোকের শত্রুতার উপরে জয় লাভ করি-লেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি সহজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উপায় করিলেন; উপক্র-মণিকা ও কৌমুদী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ পাইলেন। উভয় কার্য্যের বেতন একত্র করিয়া তাঁহার মাসিক বেতন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা হইল। এই সময়ে তাঁহার চেষ্টাতে উক্ত কয়েকটী জেলার পল্লীগ্রামে অনেক স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। এক দিকে তিনি যেমন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগি-লেন, আর এক দিকে বালকদিগের সুপাঠ্য গ্রন্থ সকল রচনা করিতে লাগিলেন। বর্ণপরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী প্রভৃতি প্রচারিত হইল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চাকরী তাঁহার অনেক দিন পোষাইল না। তিনি ঘোর দারিদ্র্য ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন বটে কিন্তু দরিদ্র হইলে লোকের যে নীচতা হয় সে নীচতা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি কখনও আত্ম-মর্য্যাদা ভুলেন নাই; কখনও সামান্য স্বার্থের অনু-রোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠীতে লেখে নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙ্গিবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই ত বলে মানুষ। নতুবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবন ধারণ করাত শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহা-পুরুষকে আমরা এত ভালবাসি; আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাঁহার অপেক্ষা ঐ দরিদ্রের সন্তান বিদ্যাসাগর বড় লোক নহেন। যে স্বকর্ত্তব্য সাধনে সাহসী সেই মানবকুলে রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এই হিসাবে এক-জন বড় রাজা।

যাহা হউক কে কোথায় দেখিয়াছ এক জন গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে একটী ৫০০৲ শত টাকার চাকরী পাইয়া এক কথায় তাহা ছাড়িতে পারে? কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত লোকের মনে অর্থের লোভ থাকে না। ধন সম্পদের প্রতি এ সব মহাত্মার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। যে মনুষ্যত্বের অগ্নি ইহাঁদের মনে নিরন্তর জ্বলিতে থাকে, তাহার নিকট ধনসম্পদ তৃণ অপেক্ষাও হীন। ডিরেক্টর ইয়ং সাহেবের অধীনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্ম করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতেন না। তিনি তাঁহার প্রতি কিছু অপমান সূচক ব্যবহার করেন। বিদ্যাসাগরের তেজস্বী অন্তরে সেই ব্যবহার শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি ৫০০৲ শত টাকাকে পাঁচ শত খোলার কুচির ন্যায় জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় পরি-ত্যাগ করিলেন। সাংসারিক লোকে কত ভয় দেখাইল, খাবে কি? পরিবে কি? চলিবে

ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহাদের এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, স্বাধীনতা হারাইলে পশু পক্ষীরাও ঠিক আমাদের মত কষ্ট পায়।

ছেলে-খেলা।

ছোট ছোট ছেলেগুলি দেখিতে সুন্দর।
আলো করে থাকে যেন গৃহস্থের ঘর॥
ফুটন্ত ফুলের মত ফুলের বাগানে।
হাসিছে খেলিছে সদা প্রসন্ন বয়ানে॥
সুকুমার তনুখানি কেমন নির্ম্মল।
চাঁদমুখে চক্ষু দুটী করে ঢল ঢল॥
তরল চপল অতি জীবনের গতি।
কিন্তু খেলিবার কালে বড় স্থির মতি॥
ডাকিলে না দেয় সাড়া খেলায় পাগল।
খেলা ছাড়ি থাকিতে না পারে এক পল॥
দিনমানে তিল মাত্র নাহি অবসর।
নিরলসে নানা খেলা খেলে নিরন্তর॥
কি কাজ করিব বলি ভাবে না কখন।
করে নিত্য নব নব খেলার সৃজন॥
কভু ঘোড়া হয়ে পিঠে চড়ায় অপরে।
কখন আপনি চাপে অন্যের উপরে॥
কখন পুকুর খোঁড়ে বাঁধে পথ ঘাট।
কখন ঠাকুর গড়ি পড়ে পূজা পাঠ॥
ছেলের কল্যাণে প্রতি গৃহস্থের ঘরে।
বার মাসে তের পর্ব্ব দেখে সব নরে॥
কিন্তু ভাই কর খেলা তাহে ক্ষতি নাই।
মাঝে মাঝে কিছু কিছু পড়া শুনা চাই॥
তোমাদের সঙ্গে চাহে খেলিবারে কবি।
পড়িয়া সখার পদ্য, দেখি তার ছবি॥ *
এ বড় মজার খেলা নূতন প্রকার।
আমোদের সঙ্গে হয় জ্ঞানের সঞ্চার॥
তার সঙ্গে নীতি শিক্ষা আপনা আপনি।
মাই খেয়ে বাড়ে যথা খোকা যাদুমণি॥

মাইকেল ফ্যারাডে।
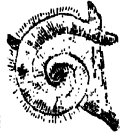
অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ কত বড় হইতে পারে, চেষ্টা ও যত্নদ্বারা, সহায়হীন দরিদ্র সন্তান, নিজ অবস্থার কতদূর উন্নতি করিতে পারে, ফ্যারাডের জীবনচরিত পাঠ করিলে, তাহা বেশ বুঝা যায়। অতি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, অধ্যবসায়ের গুণে ফ্যারাডে জগতে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইংলণ্ডে তিনি সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। তিনি স্কুল বা কালেজে নিয়ম মত লেখা পড়া শিখেন নাই, তাঁহার ধন সম্পত্তিও ছিল না; কেবল নিজ চেষ্টা ও যত্নে তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর এই মহাত্মার জন্ম হয়। লণ্ডন নগরের কোন একটী পল্লিতে

* গত সংখ্যার সচিত্র পদ্য দেখ।

এক আস্তাবলের উপরে কয়েকটী ঘর ভাড়া করিয়া তাঁহার পিতা থাকিতেন, এবং সামান্ত কর্ম্মকারের কাজ করিয়া কোন মতে সংসার চালাইতেন। এই দুর্দ্দশার মধ্যে যখন ফ্যারাডের জন্ম হয় তখন কে ভাবিয়াছিল যে, এক সময়ে তিনি ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি হইবেন? ফ্যারাডের পিতা মাতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ত সামান্য কর্ম্মকারের কার্য্য করিতে হইত, সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহারা ধনী ছিলেন। ফ্যারাডের পিতা মাতা অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন; এবং পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় ফ্যারাডে এই ধর্ম্মভাব পিতা মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। অর্থাভাবে তাঁহারা সন্তানকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারেন নাই, কিন্তু ধার্ম্মিক পিতা মাতা বাল্যকাল হইতেই সন্তানকে উত্তমরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ফ্যারাডে ক্রমে বড় হইলেন। পিতার সামান্য উপার্জ্জনে ব্যয় কুলায় না দেখিয়া

এগারো বৎসরের বালক ফ্যারাডে এক পুস্তক বিক্রেতার দোকানে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ সংবাদ পত্র বিলি করা তাঁহার সেই সময়ে প্রধান কাজ ছিল। শুনা যায় ফ্যারাডে তখন একটুও লেখা পড়া জানিতেন না, এমন কি অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। সংবাদ পত্র বিলি করিবার জন্য বাহির হইয়া রাস্তায় চলিতে চলিতে তিনি ঐ সংবাদ পত্রের সাহায্যে অক্ষর চিনিলেন, এবং অধ্যবসায়ের গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই পড়িতে শিখিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার এইরূপ যত্ন ও আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজ কার্য্যে অবহেলা করিতেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্য দক্ষতা গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ঐ পুস্তক বিক্রেতার দোকানে যে কেবল পুস্তক বিক্রয় হইত তাহা নহে, পুস্তক বাঁধান কার্য্যও হইত। ফ্যারাডে এখন এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বলিতে গেলে এই দপ্তরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই ফ্যারাডের উন্নতির পথ খুলিয়া গেল। তাঁহার যে সমস্ত পুস্তক বাঁধিতে হইত, তাহার মধ্যে কয়েকখানি বিজ্ঞানের পুস্তক ছিল; বিজ্ঞান শিখিবার জন্য স্বভাবতই তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বিজ্ঞানের পুস্তক দেখিয়া ফ্যারাডের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অবসর সময়ে, এবং কখন কখন কাজ করিতে করিতেও একাগ্র হইয়া এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়াই লোকে বড় লোক হয়, এইরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণেই লোকের উন্নতি হয়। এইরূপে কয়েকখানি বই পড়িয়া ফ্যারাডের জ্ঞান পিপাসা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি কেবল বই পড়িয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত বক্তৃতা হইত তাহাতে নিয়ম মত তিনি উপস্থিত হইতে লাগিলেন। একাগ্র চিত্তে সেই সমস্ত বক্তৃতা শুনিতেন, এবং তাহার সারাংশ লিখিয়া আনিতেন। এই সমস্ত এত সুন্দর হইত যে ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞানবিৎ সার হাম্‌ফ্রে ডেভি তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফ্যারাডে নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, কোন মতে তাঁহাদের দিনপাত হইত। একদিন ফ্যারাডের ইচ্ছা হইল যে তিনি একটী বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন, কিন্তু তাহাতে অনেক টাকার দরকার! ফ্যারাডে সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না, তিনি কষ্ট করিয়া যাহা কিছু বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা কয়েকটী সামান্য সামান্য জিনিস কিনিয়া একটী কল তৈয়ার করিলেন। বালকের বুদ্ধি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। ঐ দিন এক ব্যক্তি কার্য্য উপলক্ষে ঐ দোকানে আসেন, তিনি বালকের এই প্রকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এবং বিজ্ঞান শিখিবার জন্য এরূপ আগ্রহ দেখিয়া 'রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসন্' নামক বিলাতের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। ফ্যারাডের উন্নতির পথ ক্রমে পরিষ্কার হইতে লাগিল। তাঁহার প্রভু তাহাকে এই বিজ্ঞান চর্চ্চায় উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ফ্যারাডে বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দপ্তরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার মনে এক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। পুস্তক বাঁধা আর তাঁহার ভাল লাগিল না। ফ্যারাডের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য দপ্তরীর কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন ইহা কখনও সম্ভব নহে। ফ্যারাডে কোন পথে যাইবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা তাঁহার

জীবনের প্রধান কার্য্য, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। ফ্যারাডে তখন অন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য জীবন সমর্পণ করিবেন ইহা স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার পথেও বিঘ্ন অনেক। ফ্যারাডে দরিদ্র দপ্তরী; কোন মতে দিন কাটিয়া যাইতেছে, এ অবস্থায় এই সামান্য সম্বলটুকু পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া যদি তিনি বিজ্ঞান আলোচনায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে সংসার চলিবে কি প্রকারে? আর তিনি সহায় সম্বল শূন্য; কেইবা তাঁহাকে সেরূপ সুযোগ করিয়া দিবে? কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়। ফ্যারাডে অনেক চিন্তার পর এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি যে সমস্ত বিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনিতেন, তাহার সারাংশ লিখিয়া রাখিতেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইগুলি সমস্ত একত্র করিয়া তিনি পুস্তকাকারে লিখিলেন। বিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি আবশ্যকীয় চিত্র ও ইহাতে তিনি নিজে চিত্রিত করিলেন। তার পর সার হাম্‌ফ্রে ডেভির নিকট ঐ পুস্তকখানি এবং তাহার সহিত একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। পত্রখানিতে নিজের মনের ভাব পরিষ্কার করিয়া লিখিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাঁহার যে ঐকান্তিক ইচ্ছা তাহা ইহাতে লিখিলেন, এবং তাঁহার সেই সময়ের যে অবস্থা তাহাও লিখিয়া দিলেন। ডেভি সেই পুস্তকখানি পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন, ফ্যারাডের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইলেন; এবং তাঁহার পত্রখানিতে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছাও বুঝিতে পারিলেন। ফ্যারাডের উন্নতির পথ আরো প্রশস্ত হইল;—তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনে, উইলিয়ম পেইনের স্থানে, ডেভির সহকারী নিযুক্ত হইলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্র সকল পরিষ্কার রাখা এবং তাহার তত্ত্বাবধান করা ফ্যারাডের প্রধান কার্য্য ছিল। এবং ইহাতে তাঁহার নিজ উন্নতির অনেক সুবিধা হইয়াছিল। অবসর পাইলেই এই সমস্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে তিনি নানা প্রকার বিজ্ঞানের পরীক্ষায় নিযুক্ত হইতেন, এবং নূতন নূতন পরীক্ষার দ্বারা নিত্য জ্ঞানের বৃদ্ধি করিতেন। এই যুবকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, এ যুবক সামান্য নহে, একদিন ইংলণ্ডে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইনি অদ্বিতীয় হইবেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ডেভি বিজ্ঞান আলোচনার জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন, ফ্যারাডেও তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত হন। সকলেই তাঁহার গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি উন্নতির চরম-সীমা প্রাপ্ত হন। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সর্ব্ব প্রধান পদলাভ করেন; এবং সেই বৎসরেই কোন ধর্ম্ম-প্রচারকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় হইতে ফ্যারাডে নিয়মিত রূপে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে থাকেন; গণ্য, মান্য, ধনী, বিদ্বান, সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। তাঁহার প্রধান গুণ এই ছিল যে, অতি গুরুতর বিজ্ঞানের বিষয়গুলি অতি সহজে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, এমন কি বালকেরা পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহার বক্তৃতা বুঝিতে পারিত।

এক দিন বক্তৃতা-গৃহ হইতে বক্তৃতা করিয়া

আসিবার সময়ে তাঁহার হস্ত হইতে একটী জিনিস মেজেতে পড়িয়া যায়। সমস্ত ঘর তখন অন্ধকার। জিনিসটী পড়িবা মাত্রই ফ্যারাডে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার একটী শিষ্য বলিল "আজ অন্ধকারে অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক কি? কল্য উহা পাওয়া যাইবে।" ফ্যারাডে হাস্য করিয়া বলিলেন "আমি যাহা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করি তাহা কখনই অসম্পূর্ণ রাখি না; অদ্য ইহা না করিলে আমার জীবনে যাহা কোন দিন ঘটে নাই তাহাই হইবে।" বহু কষ্টের পর জিনিসটী প্রাপ্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

এইরূপ যাঁহার প্রত্যেক সামান্য কাজের জন্যও অদম্য অধ্যবসায় তিনি যে অদ্বিতীয় হইবেন তাহাতে আর কি কোন সন্দেহ আছে?

কিন্তু ফ্যারাডে কেবল বিজ্ঞানের বক্তৃতায় যে নিযুক্ত ছিলেন তাহা নহে। পিতা মাতার নিকট হইতে বাল্যকালে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলেন নাই। তিনি নিয়মিতরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। যাঁহারা মনে করেন বিজ্ঞান শিখিলে নাস্তিক হইয়া যায়, তাঁহারা ফ্যারাডের জীবনচরিত পাঠ করুন। দেখিবেন গভীর বিজ্ঞানের সঙ্গে কেমন ধর্ম্মভাব একত্রে রহিয়াছে। মানুষের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক ফ্যারাডের তাহা সমস্তই ছিল। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উদার ছিল, তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন, সকল সময়েই তাঁহার মন প্রফুল্ল। ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে থাকিলে যেমন জ্ঞানের বৃদ্ধি হইত, তেমনি অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভও হইত। তিনি যাহা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন,তাহাতেই চিরজীবন নিযুক্ত ছিলেন। একদিকে বিজ্ঞানের আলোচনা, অন্যদিকে ধর্ম্ম প্রচার; জীবনে একদিনও তিনি ইহা ভুলেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন্ পান, এবং তাঁহাকে উপাধি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ফ্যারাডে জানিতেন যে,এ পৃথিবীর মান, সম্ভ্রম, উপাধি এ সমস্ত কিছুই নহে; এই জন্য তিনি উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। বাস্তবিক যে ব্যক্তি বড়, উপাধিতে তাঁহাকে আর বড় করিতে পারে না। কেবলমাত্র মাইকেল ফ্যারাডে বলিলে সমস্ত পৃথিবীর লোক যাঁহাকে চিনিতে পারে, তাঁহার আর উপাধির আবশ্যক কি?

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৫ আগষ্ট ৭৬ ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময়ে ফ্যারাডের মৃত্যু হয়। এই মহাত্মার মৃত্যুতে ইংলণ্ড এক প্রধান রত্ন হারাইয়াছে।

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।*

(পিতা মাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।)

আমরা এই পৃথিবীতে যে মুহূর্ত্তে পদার্পণ করিয়াছি সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমাদের পিতা মাতার আর বিশ্রাম নাই। সেই দিন হইতে আমাদের যদি কোন একটা সামান্য বিপদ হয় তাহা হইলেই তাঁহারা একেবারে

* এ বৎসর যাঁহারা রচনায় পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম সেপ্টেম্বর মাসের সখায় প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানাভাবে সমুদায় রচনাগুলি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র একটী রচনা প্রকাশিত হইল। স-সং।

ভাবিয়া আকুল হন। শৈশবকাল হইতে যদি তাঁহাদের যত্নে প্রতিপালিত না হইতাম তাহা হইলে আজ আর আমরা সংসারে দাঁড়াইবারও একটা স্থান পাইতাম না। আমরা এ সংসার অরণ্যের নূতন পথিক, আমরা ইহার কণ্টক বৃক্ষকে গোলাপ বৃক্ষ বলিয়া ধরিতে যাই, চোরা বালিকে শক্ত মাটি ভাবিয়া তাহারই উপর পা দিয়া দাঁড়াইতে যাই, বিপদকে আমরা সম্পদ মনে করি। যদি আমাদের পিতা মাতারা আমাদের প্রতি পদে পদে সতর্ক করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের কি দশা হইত? যদি বাল্যকাল হইতে পিতা মাতারা আমাদের সংশিক্ষা না দেন, সদুপদেশ না দেন, তাহা হইলে বড় হইয়া কি আমরা কখন সুখ-ভোগ করিতে পারি? যে ব্যক্তি ক্রোধ হিংসা বা অন্য কোন রিপুর পরবশ সে যদি বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার নিকট রিপু দমন করিতে শিক্ষা না করে, তাহা হইলে সে কোন কালেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। * * * * মাতার ন্যায় আমাদিগকে কে অত ভালবাসিতে পারে? কাহার হৃদয়ে অত স্নেহ? খেলিতে খেলিতে ছুটিয়া আসিয়া "মা" "মা" করিয়া যখন আমরা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরি, তখন আমাদের হৃদয় কিরূপ সুখে কিরূপ আনন্দে উথলিত হইয়া উঠে? দুঃখে, কষ্টে, ভয়ে, বিপদে মাতার মত অটল আশ্রয় আর কোথায় পাইব? কে আর অমন নির্ম্মল শান্তি আমাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিবে? মাতার যে স্নেহ যে ভালবাসা তাহা অখণ্ড, অতুলনীয়, স্বর্গীয়। ইহা দেবের দুর্লভ। বন্ধুর প্রেমে স্বার্থপরতা আছে, * * * * * কেবল পিতা মাতার প্রেমের ন্যায় নিরভিমান নিঃস্বার্থ প্রেম আর কোথাও নাই।

পিতাই বা আমাদের জন্য কত না কষ্ট স্বীকার করেন? দিন নাই, রাত্রি নাই তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কতই না পরিশ্রম করিতেছেন! কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান না করিয়া বিপদকে তুচ্ছ করিয়া আমাদের সুখ সচ্ছন্দের জন্য আপনার জীবন যেন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের মুখে একটী হাসি ফুটাইবার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটী কাঁটা সরাইবার জন্য তিনি যে কতদূর সহ্য করেন তাহা আমাদের বুঝিবারও ক্ষমতা নাই। পিতা মাতা বিপদ দেখিয়া পিছু-পা হন না, সন্তানকে অযোগ্য বা অকৃতজ্ঞ দেখিয়াও তাঁহাদের ভালবাসা হ্রাস পায় না। ইহাঁরা সন্তানের সুখের নিমিত্ত সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারেন, সকল স্বার্থই ত্যাগ করিতে পারেন। সন্তানের গৌরবে তাঁহারা নিজে গৌরবান্বিত হয়েন, এবং সন্তান সম্পদ ভোগ করিলে, তাঁহাদের মনে হয় যেন তাঁহারা নিজেই সুখ ভোগ করিতেছেন। যদি তাহার নামে কোন বিশেষ অপবাদ হয় তথাপিও তাঁহারা তাহাকে সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই ভাল বাসেন। সমস্ত জগৎ যদি তাহাকে পরিত্যাগ করে তাঁহারাই তাহার সমস্ত জগৎ হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন।

আমরা পিতা মাতার ভালবাসা হইতে ঈশ্বরের স্নেহ ধারণা করি ও তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখি। * * * * * পিতা মাতার ঋণ আজীবন ধরিয়া শুধিলেও শোধ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এ ঋণ পরিশোধ করিতে কি আমরা চেষ্টা করিব না?

ছেলেবেলায় কিছু আমাদের ঋণ পরিশোধ করিবার সময় নহে, তখন আমাদের ঋণ করিবার কাল। আমাদের ছেলেবেলার কর্ত্তব্য পিতা

মাতার কথা শুনা। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বুঝেন; তাঁহারা যাহা করেন সকলই আমাদের ভালর জন্য। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে আমার হয়ত কোন একটা কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু পিতামাতারা অনুমতি দিলেন না। তখন সহজেই ক্ষুণ্ণ হই। কিন্তু কিছু দিন পরে বুঝিতে পারি যে সেই কার্য্য করিলে আমার অমঙ্গল হইত। এইরূপ পিতামাতারা যখন তিরস্কার করেন আমরা অনেক সময় রাগ করি, কিন্তু আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাঁহারা যে তিরস্কার করেন সে আমাদেরই ভালর জন্য। আমরা একটা মন্দ কাজ করিয়াছি, ভবিষ্যতে তাহা যাহাতে আর না করি সেই বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিবার জন্যই তাঁহারা আমাদের ভৎর্সনা করেন। তাই বলি বাল্যকালে আমরা অজ্ঞান; সেই জন্য পিতামাতাকে পথপ্রদর্শক করিয়া তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলা উচিত, তাঁহাদের আদেশানুযায়ী কার্য্য করা উচিত, তাঁহাদিগকে ভক্তি মিশ্রিত ভয় করা উচিত। তাহার পর আমরা যখন বড় হইব, সাংসারিক কার্য্যের ভার যখন আমাদের হস্তে ন্যস্ত হইবে যখন পিতামাতারা বৃদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহাদের সহিত আমাদের আর এক সম্পর্ক হইবে, তখন আমরা তাঁহাদের পিতা মাতা হইব, তাঁহারা আমাদের সন্তান হইবেন। পূর্ব্বে তাঁহারাই আমাদিগকে যেরূপ যত্নে লালন পালন করিতেন, এ সময় আমরা যদি সেইরূপ যত্নের সহিত তাঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারি, আমরা যদি তাঁহাদের সহায় সম্বল হইয়া ধর্ম্মপথে মন রাখিয়া আপনাদের ব্যবহারে তাঁহাদের সুখী করিতে পারি, তাঁহাদের সুখের জন্য আপনাদের স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারি তবেই আমাদের জীবন সফল হয়, জীবন পবিত্র হয়। আমাদের ঋণ পরিশোধ করা আমাদের সাধ্য নহে; কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করা হয়।

শ্রীসরলা দেবী,
বয়স ১২ বৎসর ১১ মাস।

দুই ভাই।

(শেষাংশ।)

এইরূপে দুটী ভাই দ্রব্যগুলি দিয়া চলিয়া গেলে গোপালের মন যে কিরূপ হইল, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতেই পারিতেছ। সে ভাব প্রকাশ করা যায় না। এক এক খানি করিয়া দেখিল যে, তাহার আবশ্যকীয় সকল পুস্তকই আছে। নিতান্ত দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া জামাদুটী দেখিয়া খুব আহ্লাদ হইল বটে, কিন্তু পড়ার কষ্ট যে দূর হইল এ আনন্দ আর তাহার ধরে না। পিতার রোগ হওয়া অবধি সংসারের কত যে কষ্ট তাহা নিজে দেখিতেছে; মা মনের দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছেন, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনে অনেক দিন অবধি ইচ্ছা হইয়াছে যে, লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে এবং শীঘ্র শীঘ্র

কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতার কষ্ট দূর করিবে। এই ইচ্ছা হওয়ায় ভদ্রলোকদের নিকট স্বয়ং যাইয়া ভিক্ষা করিয়া স্কুলের বেতন দিত, এবং পাড়ার একটী ছেলের বাড়ীতে গিয়া তাহার বৈ দেখিয়া পড়িয়া আসিত। তাহার পড়াশুনার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন এবং সাহায্য করিতেন। এক্ষণে বৈগুলি পাইয়া বাড়ী বসিয়া পড়া হইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পড়িতে পড়িতে যদি আবশ্যক হয় পিতার সেবাও করিতে পারিবে, এই আশা মনে হইল ও আনন্দে তাহার মন একেবারে পূর্ণ হইল। সে বৈ, শ্লেট, কাগজ, কলম, জামা ও অন্য সমস্ত দ্রব্যগুলি লইয়া বাড়ীর ভিতর মাকে বাবাকে দেখাইতে লাগিল। দুটী ভাইএর দয়া ও সৎইচ্ছার বিষয় শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং কৃতজ্ঞতার অশ্রুজল তাঁহাদের চক্ষে দেখা দিল। হৃদয়ের সহিত অগণ্য ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রব্যাদি তুলিয়া রাখিলেন।

এদিকে সন্ধ্যার মধ্যেই অমৃত ও সুরেন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল। এখন রাত্রি প্রায় আটটা বাজে, পিতা আহারে বসিয়াছেন তাহারাও তাঁহার পাশে বসিয়া আহার করিতেছে। মা সেইখানে থাকিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দিতেছেন ও বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন ও শুনিতেছেন। কখনও তাহারা পিতার সঙ্গে একত্রে না হইলে আহার করে না, কখনও তাঁহাদের আহারের সময় মা অন্য স্থানে থাকেন না; তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করেন ও তাঁহাদের কথা শুনেন। এরূপ করাতে তাঁহারা বড়ই সুখে থাকেন। যথার্থই পরিবারটী যেন স্বর্গের দেবতাদের মত।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল "ও পাড়ার গোপালের মা আসিয়াছেন।" অমনি অমৃতের জননী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। আর এদিকে—? অমনি ভাই দুটীর মুখে কেমন এক আশ্চর্য্য লজ্জা ও আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, তাহারাই বুঝিল আর কেহই দেখিতে পাইল না। আবার সেই রকম বুক ধড়াশ্ ধড়াশ্ করিতে লাগিল। "কিরূপ হইবে কে জানে?" তাহারা খাওয়া প্রায় বন্ধ করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিল, আর আঙ্গুল দিয়া মিছামিছি কি যেন করিতে লাগিল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই মার সঙ্গে গোপালের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই অমৃত ও সুরেন দুজনকে কত যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা আর কি বলিব? পিতা বাড়ী ছিলেন না, এ সমস্ত বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই; জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" গোপালের মা তখন তাঁহার দুঃখের অবস্থা সমস্ত বর্ণনা করিয়া তার পর বলিলেন "আহা! আপনাদের ধন্য দয়া! দীন হীন দুঃখীর প্রতি যে আপনারা মুখ তুলিয়া চাইয়া দেখেন এর তুল্য মহৎ কার্য্য আর কি আছে? আহা! গোপাল আমার "বৈ বৈ" করিয়া সারা হইতেছিল, বৈগুলি পাইয়া যে তার কি আহ্লাদ হইয়াছে তা আর বলিতে পারি না। সে সে গুলি একবার বুকে রাখিতেছে, একবার চুম খাইতেছে, আর এখনও পড়িতেছে। আমরা আপনাদের দয়াতে যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইয়াছি তা আর কি বলিয়া জানাইব? আনন্দে আমাদের হৃদয় পূরে গিয়েছে। আহার করিতে বসিতেছিলাম, কিন্তু এ আনন্দ ও এ কৃতজ্ঞতা আপনাদের না জানাইয়া আহার করা অনুচিত মনে করিয়া তাই মনের কথা বলিতে আসিয়াছি। ছেলে দুটী দীর্ঘজীবী হউক, আপ-

নারাও মনের সুখে থাকুন আর এমনি ক'রে দীন দুঃখীর উপকার করুন।"

বালক দুটী লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল। জননী বুঝিতে পারিলেন, আর তাই একটু একটু হাসি তাঁহার মুখে শোভা পাইতেছিল। পিতা কিছুই ত বুঝেন নাই, কাজেই অবাক্ হইয়া একবার স্ত্রীর দিকে একবার পুত্রদের দিকে চাহিতে লাগিলেন। শেষে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি গোপালের জন্য বৈ পাঠাইয়া দিয়াছিলে কি?" তিনি বলিলেন—"না, আমি জানিওনা যে গোপালের বৈ আছে কিনা, আর কি কি বৈ পড়ে তাও জানি না।—"

অমনি ব্যস্তভাবে গোপালের মা বলিয়া উঠিলেন—"সে কি? তবে ছেলেরা সে সব নূতন বৈ, কাগজ, শ্লেট, জামাদুটো—সব শুদ্ধ প্রায় ৫ পাঁচ টাকার জিনিস, কোথা পেলে? তাইত? আমরা মনে করেছিলাম যে আপনারা বুঝি ওদের হাতে দিয়ে সেগুলি দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? ওমা! আমার যে ভয় হচ্ছে! কেন বাবা তবে তোমরা মা বাপ্‌কে না ব'লে এমন কাজ কর্লে?"

মা বলিলেন—"চিন্তা কি? আপনি অমন করেন কেন? ওরা বেশ কাজই করেছে। আমি বড় সুখী হলেম। ওদের যে এরূপ বুদ্ধি হয়েছে, এর চেয়ে আর আমার সৌভাগ্য কি হতে পারে?" এখনও অমৃতের পিতা কিছু বুঝিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন যে—"আমি আজ প্রাতে দীন দুঃখীকে দয়া করা উচিত এই উপদেশ পূর্ণ একখানি বৈ ছেলেদের পড়িতে দিয়াছিলাম। সেখানি পড়িয়া উহাদের কেমন উপকার হইল তাই পরীক্ষা করিবার জন্য, ওরা দুপুর বেলা যেমন বাগানে যাবে অমনি পথের উপর পাঁচ টাকার একখানা নোট রাখিয়া এলাম। নোট পাইয়া যদি না বলিত, তাহা হইলে ভয়ানক দুঃখিত হইতাম আর খুব রাগ করিয়া বকিতাম। তা দেখি যে পাইয়াই নোটখানি আমার কাছে আনিল ও যার নোট হারাইয়াছিল তাহাকে দিতে বলিল। বড় খুসী হলেম ও একটু সন্ধান ক'রে কারও নয় প্রমাণ হলে বলিলাম, 'ইহা দ্বারা তোমরা যা ইচ্ছা করিতে পার এ তোমাদেরই।' এখন আরও আনন্দিত হলেম যে নোটের অতি উত্তম ব্যবহারই হইয়াছে।"

আহ্লাদে অমৃতের পিতা একেবারে গলিয়া গেলেন, তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। চক্ষে জল আসিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটে অমৃত বসিয়াছিল, তাহাকে কোলে বসাইয়া জড়াইয়া ধরিলেন। অমৃত খুব কাঁদিতেছিল, বাবার কোল হইতে নামিয়া আরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমায় না বাবা! আমায় না! আমি বড় হ'লে কি হয়? সুরেন আমার বড় ভাই। সুরেনকে কোলে করুন। আমি বড় নীচ, আমি বড় নীচ। আমি এ টাকার দ্বারা নিজেদের জন্যই কিছু পছন্দমত জিনিস কিনিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। আমি বড় নীচ। আমি এ আদরের উপযুক্ত নই। সুরেনই এই ভাল কাজের মূল, তাকে খুব আদর করুন, সে আমার দাদা। আমি বড় নীচ।"

পুত্রের এই সরল সত্যপ্রিয়তা ও সাধুভাব দেখিয়া তিনি অমৃতকে আরও আদরের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিলেন ও আনন্দাশ্রুতে তাহার মুখ ভাসাইয়া দিলেন। সুরেনকে তাহার মা কোলে লইয়া বার বার মুখে চুম্বন করিতে লাগি-

লেন ও বলিতে লাগিলেন "ধন্য আমাদের জীবন যে এমন পুত্র পাইয়াছি। দশ বছরের ছেলে তুমি বাবা, তোমায় এর মধ্যে এমন বুদ্ধি হইয়াছে?"—

সুরেন মার মুখ দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। নিজের সুখ্যাতি সে এত শুনিবে কিরূপে? যে লজ্জায় গোপালদের বাড়ীতে গেল না, গোপালের সহিত দেখা হইলেও যে জিনিসগুলি দিয়াই সুখ্যাতি পাইবার ভয়ে ও লজ্জায় হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিল, সে কি কখন মার মুখে এত প্রশংসা শুনিতে পারে?

গোপালের মা দেখিয়া শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইল এ পৃথিবীতে বুঝি আর তিনি নাই, স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে বসিয়া আছেন! প্রশংসা শুনিতে সুরেনের অনিচ্ছা দেখিয়া বলিলেন "কেন বাবা! তুমি ভাল কাজ করিয়াছ, তার প্রশংসা নেবে না কেন?" বালক বিনীতভাবে বলিল—"সে কি মা! আমি কি ভাল কাজ করিয়াছি? গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত মার কাজ! সকালবেলা বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছিলাম, মাই ত সেই হিত কথার বৈখানি পড়িতে দিলেন? নহিলে ত এ বুদ্ধি আমাদের হইত না। আবার শুধু বুদ্ধি হ'লেই বা কি হবে? দেখুন দেখি, সেই বুদ্ধি কাজে দেখাবার সুবিধার জন্যে আমাদের সোনার মা কেমন আবার একখানি নোট সুমুখে ধরে দিলেন, নহিলে কি হত? সমস্তই তাঁর কাজ! সমস্তই মার কাজ! ওগো, এমন মা আর কারও নাই, কারও হয় না। আমাদের যেমন মা এমন আর হয় না।" এই বলে মার গলা জড়াইয়া বুকের ভিতর মাথা দিয়া রহিল।

উটপক্ষী।

আজকাল উপরে যে পক্ষিটীর ছবি দেখিতেছ উহাকে সকলেই "অচ্ট্রিচ্" বলিয়া ডাকেন। ইহার ইংরাজী নাম 'ostrich'; এবং এই নাম দ্বারাই এই পক্ষিটী সকলের নিকট পরিচিত। ইহার বাঙ্গলা নাম উট পক্ষী। প্রাচীনকালে অ্যারিষ্টটল, প্লিনী প্রভৃতি বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাকে (camel bird) উট পক্ষী কহিতেন।

উট জন্তুর সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে উট-পক্ষী কহে। যেস্থানে উট পাওয়া যায়, সেই স্থানে উট-পক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায়। উটের ন্যায় ইহার বুকের হাড় অতি কঠিন ও শক্ত এবং শয়ন করিবার সময় উটের ন্যায় বুকে ভর করিয়া শয়ন করে। উটের ন্যায় ইহার শরীরের মধ্যভাগ অতিশয় বৃহৎ। উভয়ের অবয়ব, চলন ও ভাবভঙ্গী প্রায় একই রকম। উভয়ে গলা টান্ করিয়া মস্তক উচু রাখে। উটেরা চলিবার সময়ে চারি পা প্রায় একত্র করিয়া চলে; এবং উট-পক্ষীরা চলিবার সময়ে ১০।১২ হাত অন্তর পা ফেলে। উটেরা চারি পায়ে যত টুকু যায়গা অধিকার করে; উট পক্ষীরা দুই পা দ্বারাই প্রায় ততটুকু স্থান অধিকার করে। এজন্য ইহাদিগকে দূর হইতে উটের দল বলিয়া সময়ে সময়ে মানুষের ভ্রম হয়। প্রভেদের মধ্যে এই যে উট-পক্ষীর দুই পা এবং

শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই পাখায় ঢাকা, আর উটের চারি পা এবং শরীর ছোট ছোট রোমে আবৃত।

প্রাচীনকালে উট-পক্ষী পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইত। শুনা যায় যে পুরাকালের রাজারা উট-পক্ষীর ডিম্ব প্রজার নিকট হইতে উপঢৌকন পাইতেন। এক্ষণে কেবল আফ্রিকা দেশেই উট-পক্ষীর সংখ্যা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসে। একদলের সংখ্যা চারি কিম্বা পাঁচটীর বেশী নহে। ইহারা অতি দ্রুত চলিতে পারে, এমন কি এক

ঘণ্টায় ২৬ মাইল চলিতে পারে। অতি কষ্টভোগ কালে গাভী যে প্রকার চীৎকার করে, ইহাদের স্বাভাবিক ডাক সেই রকম। কোন কোন উট-পক্ষীর শব্দ সিংহের গর্জ্জনের ন্যায় শুনা গিয়াছে।

উট-পক্ষীরা যাহা পায় তাহাই ভক্ষণ করে, এমন কি একটি পাখী একবার তামা ভক্ষণ করিয়া মরিয়া যায়। মত্ত অবস্থায় ইহারা পাথর, বালি, হাড় এবং ধাতুজ দ্রব্য সকল ভক্ষণ করে। কিন্তু বীজ, জাম প্রভৃতি ছোট ছোট ফল, গাছের পাতা এবং ফড়িং ইহাদের স্বাভাবিক খাদ্য।

একটি পুরুষ পক্ষীর ২।৩টি স্ত্রী থাকে। তাহারা সকলেই একস্থানে স্তূপাকার করিয়া ডিম্ পাড়ে। ডিম পাড়িবার জন্ত কোন প্রকার বাসা নির্ম্মাণ করে না; একটু বালি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করে এবং এই গর্ত্তের মধ্যেই ডিম রাখিয়া তা দেয়। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ে এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ডিমে তা দেয়। যদি ডিম ফুটিতে দেরী হয়, তবে পুরুষ পক্ষী রাগান্বিত হইয়া, বুকের চাপে ডিম ভাঙ্গে এবং তাহা হইতে ছানা বাহির করে। এই প্রকারে ছানাগুলি জন্মিবার সময় বিশেষ কষ্ট পায়।

ইহাদের পাখা দ্বারা ইউরোপের এবং আমেরিকার ভদ্র মহিলারা নানা প্রকার বেশভূষা করেন। বড় বড় যুদ্ধে যে সমুদায় বীরপুরুষ জয়ী হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহারা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ উট-পক্ষীর পাখা মস্তকে ধারণ করেন। এই পাখার এত আদর এবং এত কাট্‌তি যে প্রত্যেক বৎসরেই প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার মূল্যের পালক আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়। এই সমুদয় কারণে উট-পক্ষী শিকার করিবার জন্ত নানাপ্রকার কৌশল ব্যবহৃত হয়। লিবিয়া দেশে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যরূপে উট-পক্ষী শিকার করা হয়। একজন লোক ধনুর্ব্বাণ সঙ্গে লইয়া একটি মৃত উট-পক্ষীর চর্ম্মে সমস্ত শরীর আবৃত করে। গলার চামড়ার মধ্যে এক হাত দিয়া ঠিক উটপক্ষী যেমন ঘাড় উচু করিয়া যায় ইহারাও সেইরূপ যায়। ঠিক উট-পক্ষীর ন্যায় চলিয়া বেড়ায়; কখন ঘাড় নিচু করে, কখন বা গলা টান্ করিয়া মুখ উচু করে, আবার কখন বা ছট্ ফট্ করিয়া পাখা নাড়ে। এই প্রকার বেড়াইতে বেড়াইতে উট-পক্ষীর দলে মিশে। উট-পক্ষীরা প্রতারণা বুঝিতে পারে না। শিকারী যখন কোন পাখীর অতি নিকটে উপস্থিত হয় তখন তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। পাখী চীৎকার করিতে করিতে পড়িয়া যায়; শিকারী কিন্তু আবার উট-পক্ষীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই প্রকার একে একে সমুদায় পাখী বধ করে।

মরক্কো দেশে শিকারীরা ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করে। শিকারীরা এক দল উট-পক্ষীর পিছু পিছু ঘোড়া চালায়। এবং আর এক দল উটপক্ষীরা যে দিক দিয়া যাইবে সেই পথে লুকাইয়া থাকে। উটপক্ষীরা বৃত্তাকারে দৌড়ায় শিকারীরা ইহা জানিয়াই পূর্ব্বোক্ত ভাবে দুই দল দুই স্থানে থাকে। শেষোক্ত দলের নিকট উট-পক্ষীরা উপস্থিত হইলেই শিকারীরা তীরের দ্বারা এই পক্ষীদিগকে বিনাশ করে। কোন কোন স্থানে উট-পক্ষীরা যেখানে জল খাইতে যায় সেই স্থানে শিকারীরা লুকাইয়া থাকে; যেই পক্ষীরা জল খাইতে আসে আর অমনি শিকারীরা তীর দিয়া এই নিরপরাধী পক্ষীদিগকে বধ করে। আবার কোন কোন স্থানে শিকারীরা উট-পক্ষীরা যেখানে ডিম পাড়ে সেই স্থানে গিয়া ডিমগুলি সরাইয়া নিজেরা বালীর নীচে

লুকাইয়া থাকে। কেবল মাত্র চক্ষু দুইটী বাহিরে রাখে। যেমন পক্ষীগুলি ডিমে তা দিতে আসে আর অমনি তাহাদিগকে বধ করে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে ইহাদিগের বংশ ধ্বংস করা হইতেছে।

কোন কোন জাতি এই পক্ষীর ডিম খায়। মাংস পর্য্যন্তও বাদ যায় না। পূর্ব্বকালে রোম-নগরে এই পক্ষীর মাংসের বড় আদর ছিল। শুনা গিয়াছে এক রাজা একদিন এক মহোৎ-সবের জন্য ৬০০ এই নির্দ্দোষী পক্ষীর প্রাণবধ করাইয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে আফ্রিকায় এক্ষণে কলে উট-পক্ষীর ডিমে তা দেওয়া হয়। কলে যে সমুদায় ছানা হয় তাহারা বেশ সবল এবং সুস্থ হয়, তাহাদিগকে অতি যত্নে পালন করিতে হয়। মাতার নিকট থাকিলে তাহারা যে ভাবে বাস করে, তাহাদিগকে ঠিক সেই ভাবে রাখা হয়।

পূর্ব্বে উট-পক্ষীর পৃষ্ঠে মানুষ বেড়াইত। রোমের মহিলারা গৃহ-পালিত উট-পক্ষীর পৃষ্ঠে চড়িয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেন। এখনও কোন কোন স্থানে ইহার উপর মানুষ চড়িয়া বেড়ায়। ইহা দ্বারা কোন কোন স্থানে গাড়ীও টানা হয়।

উট-পক্ষী প্রায়ই ধবল রঙ্গের দেখিতে পাওয়া যায়। দুই তিন প্রকারের উটপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক জাতি এক এক প্রকার রঙ্গের হয়।

নীতি কথা।

১। একখণ্ড লৌহ ফেলিয়া রাখিলে মরিচা ধরিয়া তাহা নষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ব্যবহার করিলে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। দেখ, ব্যব-হৃত চাবিগুলি কেমন পরিষ্কার। সেইরূপ পরি-শ্রম অপেক্ষা আলস্য মনুষ্যের শরীরকে অধিক বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য করে।

২। পরিশ্রম সৌভাগ্যের দ্বার-স্বরূপ। দরিদ্রতা আলস্যের চির-সহচর।

৩। বর্ত্তমান কালে যে কাজ করা যাইতে পারে ভবিষ্যতে করিব বলিয়া তাহা ফেলিয়া রাখিও না। কেননা বর্ত্তমান তোমার আয়ত্বা-ধীন, কিন্তু ভবিষ্যতের উপর কি কখন নির্ভর করিতে পার? "করিবার যাহা, আশু কর তাহা, বিলম্ব উচিত নয়।"

৪। ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়। কোন কার্য্য একবারে সম্পন্ন করিতে না পারিলে ভগ্নোৎসাহ হইও না; পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

৫। ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না। ইচ্ছা হইতে প্রতিজ্ঞা জন্মে. এবং প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইলে কার্য্য-সিদ্ধি নিশ্চিত।

৬। একটী সংস্কৃত শ্লোকে কথিত আছে, হস্তী দেখিলে সহস্র হস্ত দূরে, ঘোটক দেখিলে শতহস্ত দূরে, এবং শৃঙ্গবিশিষ্ট জীবদিগ হইতে দশ হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু দুর্জ্জন-দিগের সহিত দেখা হইলে সেস্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কুসংসর্গ যে উন্নতির ভয়ানক প্রতিবন্ধক তাহা কে অস্বীকার করিবে?

৭। তুমি কিরূপ লোকের সহিত বাস করিয়া থাক জানিতে পারিলে তোমার স্বভাব কিরূপ আমি বলিতে পারি। সংসর্গ দোষে কত সাধু-ব্যক্তির স্বভাব বিকৃত হইয়াছে কে গণনা করিবে?

৮। ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা, পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিরা যেরূপ একাগ্র চিত্তে সর্ব্ব প্রকার বিলাসের ভাব দূর করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেন, অধ্যয়নকালে ছাত্রদিগের সেইরূপ একাগ্র ও সুখস্পৃহাশূন্য হওয়া আবশ্যক। কবি বলেন

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?"

৯। শারীরিক সুস্থতার জন্য যেরূপ যত্ন করিয়া থাক, মানসিক সুস্থতার প্রতিও সেই-রূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্রোধ, হিংসা, প্রভৃতি মনের ব্যাধি-স্বরূপ। এতদ্দ্বারা বিকৃত হইলে, মনের ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং বিদ্যোপার্জ্জনের পক্ষে ভয়ানক প্রতিবন্ধক জন্মায়।

১০। শুধু বিদ্যালাভ করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে না। স্বভাব বিশুদ্ধ হওয়া চাই। দুর্জ্জন বিদ্যালঙ্কৃত হইলেও ঘৃণার পাত্র। মণিবিশিষ্ট সর্প কি ভয়ানক নহে?

সততা।

আমাদের দেশের অন্ধদের জীবন ভিক্ষার উপরই নির্ভর করে; কিন্তু বিলাতে অন্ধ ব্যক্তি-দের অবস্থা অন্যরূপ, তাহারা লেখা পড়া শিখিয়া বা অন্য কোন প্রকার কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একটী অন্ধ বালিকার সততা সম্বন্ধে একটী গল্প বলি।

বিলাতে সময়ে সময়ে ভয়ানক কুয়াশা হয় এবং এইজন্য দিন রাত্রির মত হয়। দিনে বাতি না জ্বালাইলে কিছুই দেখা যায় না। যে সময়ে দিনের বেলায় শ্রমজীবীদের বাতি জ্বালাইয়া কাজ কর্ম্ম করিতে হয় সেই সময়ে কোন কোন জিনিসের দর চড়িয়া যায়। বাতি জ্বালাইতে যে অতিরিক্ত খরচ হয় তাহা পোষাইবার জন্যই চড়া দরে জিনিস বিক্রী করিতে হয়। একবার এইরূপ কুয়াশার সময়ে একটী অন্ধ বালিকা ঝুড়ি বুনাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অন্ধের দিন রাত্রি সবই সমান। কুয়াশার জন্য তাহার বাতি ক্রয় করিতে হয় নাই এবং কাজে কাজেই অতিরিক্ত খরচও কিছুই হয় নাই।

কুয়াশার জন্য তখন বিলাতে ঝুড়ীর দর চড়িয়া গিয়াছে। চড়া দরে ঝুড়ী বিক্রী করিয়া যে অতিরিক্ত লাভ হইয়াছিল তাহা এই অন্ধ বালিকাটী এক ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল "এ অতিরিক্ত লাভ আমার প্রাপ্য নহে; কারণ কুয়াশার জন্য আমার বাতি জ্বালাইতে হয় নাই। এ অতিরিক্ত লাভ পরের কল্যাণ সাধনার্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত।" এই রূপ যাহার সততা তিনিই ধন্য।

গরিব হইয়াও যদি সাধু হওয়া যায় তাহা হইলে লোকের নিকট গণ্য মাণ্য হওয়া যায়। সকলেরই সৎ হইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমচেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সকলের জীবনে দুইটী উদ্দেশ্য থাকা উচিত; প্রথম উদ্দেশ্য লেখা পড়া শিখিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করা. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সৎ পথে থাকিয়া সাধুভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চেষ্টা করা।

সেপ্টেম্বর মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। টেলিগ্রাফ্।

২। ১ম পুত্র ৯টী; ২য় পুত্র ৬টী এবং ৩য় পুত্র ২টী ঘোড়া পাইবে।
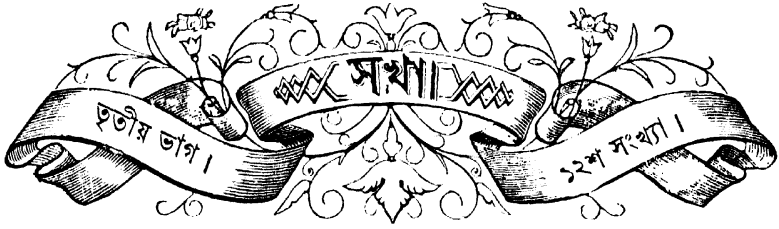
ডিসেম্বর, ১৮৮৫।

শিশুর হাসি।

(১)

হাসরে আবার ছেলে হাস একবার,
হাসি মুখখানি তোর বড় ভালবাসি ;
ফেলিয়া ঘরের কাজ তাই বার বার,
দেখিবারে আসি তোর আহ্লাদের হাসি।

(২)

অমল বদনে দুটী কমল নয়ন
আনন্দে যখন আহা করে ঢল ঢল ;
নিরখি সে শোভা হয় পুলকিত মন,
আহ্লাদে ফুটিয়া উঠে হৃদয় কমল।

(৩)

মধুর অধরে মিষ্ট আধ আধ স্বরে
কি বল তখন, কিছু বুঝিতে না পারি ;
কিন্তু সেই সুধা রব হৃদয় ভিতরে
ঢালি দেয় শত ধারে যেন শান্তি বারি।

(৪)

ধরিয়া তোমায় বক্ষে পরম যতনে
জাগিয়া পোহাই নিশা রোগের সময় ;
অনাহারে থাকি কভু অম্লান বদনে,
তোমা লাগি মার প্রাণে সব দুঃখ সয়।

(৫)

কিম্বা তোর হাসি মাথা চাঁদ মুখখানি
না হেরিলে ভয়ে প্রাণ করে রে ক্রন্দন ;
না শুনিলে একদিন ও মুখের বাণী,
অন্ধকার জ্ঞান হয় সকল ভুবন।

(৬)

হাসি হাসি কর খেলা শুইয়া শুইয়া,
কও কথা মৃদু মৃদু পাখীর মতন ;
আদরে ও মুখ খানি চুম্বন করিয়া
স্নেহ ভরে বার বার দিই আলিঙ্গন।

(৭)

কোথাকার হাসি এই, কি ভাবের ভাষা
না জানি ভিতরে তোর আছে কোন জন !
যত দেখি শুনি তত বাড়ে যে পিপাসা,
এ নয় অন্যের খেলা খেলে নিরঞ্জন।

ফুল।

খন রাত্রি ভোর হয়, পাখীগুলি বাগানে কেমন সুন্দর গান গাহিতে থাকে; এই সময়ে আমার ঘুম ভাঙ্গে ভাঙ্গে অথচ ভাঙ্গে না, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারি যে সরোদিদি আর পিসীমা বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া যান। একটু পরে আমিও উঠি; সরোদিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি যে, সে আর পিসীমা ফুলের বাগানে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিতেছে। আমি সরোদিদির আঁচল ধরিয়া পিছু পিছু যাই আর নিচুতে যে সকল ফুল ফুটে, তার দু একটা দৌড়িয়া তুলি।

কিন্তু প্রত্যহ দেখি যে পিসীমা ফুলগুলি একখানি পরিষ্কার তামার বাসনে রাখেন; এবং ঐ গুলি দিয়া গম্ভীর ভাবে শিবপূজা করেন। আর সরোদিদি ফুলগুলি দিয়া দুই ছড়া মালা গাঁথে; একছড়া গলায় পরে আর একছড়া নিজে খোপায় পরে।

আমি অনেকদিন ভাবিয়াছি একই ফুল দুই কার্য্যে ব্যবহার হয় কেন? আমি ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া একদিন পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি ফুলগুলি মিছামিছি নষ্ট কর কেন? গাছে থাকলেত বাগানের কেমন শোভা হয়; আর না হয় আমাদের দিও আমরা দুই ভাই বোন মালা গাঁথিয়া গলায় পরিব।"

পিসীমা প্রথমে হাসিয়া বলিলেন "বাছা বড় হও, বুঝিবে ফুল কি জিনিস।" এই বলিয়া একটী গোলাপফুল হাতে ধরিলেন এবং তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল তখন "ভগবান্, তুমিই ধন্য" বলিয়া সেই তামার বাসনে অতি ধীরে ফুলটী রাখিলেন। আমি ভাবিলাম একি! ফুল দেখিয়া পিসীমা কান্দিলেন কেন?

যাহাহউক আমি তখনই সরোদিদির নিকট যাইলাম; যাইয়া দেখি সে কি একখানা বই পড়িতেছে আর ফুলের মালা হাতে ধরিয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছে। আমি অবাক হইলাম, ভাবিলাম ফুল কি এমনই পদার্থ যে পিসীমা দেখিতে দেখিতে কান্দিয়া ফেলিলেন আবার সরোদিদিও ফুল দেখিয়া এমনি অন্যমনস্ক হইয়াছে যে আমি ঘরে ঢুকিয়াছি তাহা টেরও পেলে না! করি কি, সরোদিদি বলিয়া ডাকিলাম। ডাকিবা মাত্র সে এমন ভাবে আমার দিকে চাহিল যেন সে ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেছিল। আমি ঐ ফুলের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও বলিলাম। সরোদিদি যে বই খানা পড়িতেছিল তাহার পাতা খুঁজিয়া এই কথা কয়টি পড়িল।

"কিন্তুরে কুসুম! আর্য্যসুতগণে
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে,
ঠিক ব্যবহার, সেই রে তোমার
সেই রে সদ্গতি ভাবি মনে মনে;
এমন পবিত্র এমন কোমল
দেবপদ ভিন্ন কোথা যাবে বল?
তোমার মহিমা মানব জানেনা
তব গুণগ্রাহী সুধু দেবগণে।"

আর বলিল "দেখ বিজয় আমি স্কুলে এই বইখানি পড়ি। আজ এই কয়টি কথা যখন পড়িলাম, তখন ভাবিলাম হায়! আমাদের চক্ষু নাই। প্রত্যহ ফুল বাগানে ঘুরিয়া বেড়াই, কত ফুল তুলি, মালা গাঁথি, গলায় পরি, তবু ফুলের জন্ম কেন তাহা বুঝিলাম না।" এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল আর ফুলের মালা এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

আমি সরোদিদির ঐ কথা কয়টি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। যখনই ফুল বাগানে যাই তখনই ঐ কথা কয়টির অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করি। অনেক দিবস চিন্তা করিয়া এখন বেশ বুঝিয়াছি যে পিসীমার কাঁদিবার কারণ আছে। আমি যত জিনিস দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে ফুলই সর্ব্বাপেক্ষ সুন্দর। ফুল কাহারও আদর চায় না। সে আপনমনে ফুটে আবার আপনি শুকাইয়া যায়। ফুল দেখিলে চোখের তৃপ্তি হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও তৃপ্তি হয়। ফুলের জন্ম মালার জন্য নহে, সরোদিদির খোপার জন্যও নহে। ফুল কোথায় না আছে? সকল দেশে সকল সময় ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। এমন সুন্দর জিনিস যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে সর্ব্বত্র ইহা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে। সে কারণটি যখনি ভাবি তখনই পিসীমার চোখের জল আর সরোদিদির সেই কেমন এক ভাব মনে পড়ে আর ভাবি যিনি সরোদিদির বইতে এমন সুন্দর কথা কয়টি লিখিয়াছেন তিনি আমাদের পূজনীয়, তিনি আমাদের শিক্ষা-কর্ত্তা। আমি যখনই ফুলের নিকট যাই তখনই যেন সে আমাকে হাসিয়া হাসিয়া বলে "বিজয়, দেখ আমি কেমন সুন্দর, আমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কত সুন্দর তাহা সহজেই বুঝিতে পার। আবার দেখ তাঁহার কেমন দয়া, তিনি তোমাদের তৃপ্তির জন্য এমন সুন্দর জিনিসকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাখিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে কখন ভুল'না।"

"মা তো তবে মরিয়া যায়?"

প্রতিভার বয়স ১০ বৎসর। সে স্কুলের মধ্যে একটী ভাল মেয়ে, পড়া শুনায় তার মত আর একটীও নাই বলিলে হয়। দেখিতে বড়ই সুন্দর—যে তাহাকে এক দিন স্কুল থেকে আস্‌তে দেখে সেই অবাক্ হয়ে খানিক ক্ষণ চেয়ে থাকে। এমন শান্ত মূর্ত্তি, এমন হাসি হাসি মুখখানি, এমন সুগোল চক্ষু দুটী, ক্লাশের অন্য মেয়েদের আর কাহারও নাই। সকল মেয়েদের সঙ্গে কেমন ভালবাসা! চমৎকার! দেখিতেও যেমন স্বর্গের দেবতাদের মেয়ের মত, গুণেও তেমনি। গ্রামের মধ্যে প্রতিভার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এমন রত্ন আর কোথা নাই! আহা! ধন্য তার মা, যাঁর ভাগ্যে এমন মেয়ে পরমেশ্বর দিয়াছেন। তাহারই মুখ চেয়ে বিধবা পতির শোক ভুলিয়া আছেন।

কাহারও সুখ্যাতি করা বড় সুখের কাজ। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্য সে যে কাহারও দোষের কথা প্রকাশ করে। সত্যের জন্য কিন্তু আমরা

আজ এক দিকে যেমন প্রতিভার গুণ গুলির প্রশংসা করিলাম, যদি তেমনি আবার তাহার যে একটি ভয়ানক দোষ ছিল সেটী না বলি তা হলেত ঠিক উচিত হয় না। তাই বলিতে হইল। অল্প বয়সে পিতা মরিয়া যাওয়ায় প্রতিভা মার বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। এজন্য মা তাহাকে একেবারে আপনার প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। ভোরে উঠিয়া আগে খাবার প্রস্তুত করিয়া তাহাকে উঠাইতেন। মুখ হাত ধুয়াইয়া দিয়া ভাল কাপড় পরাইয়া বাড়ীর পাশের ফুল বাগানটীতে বসিয়া তাহাকে আপনি খাবার খাওয়াইয়া দিতেন। তার পর পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতে আসিলে তাহাকে পড়িতে পাঠাইয়া দিয়া ভাত খাওয়ানের আয়োজন করিতেন। পড়া হইলে আপনি খাওয়াইয়া ধুয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিতেন ও যতক্ষণ দেখা যাইত বাড়ীর ছাত থেকে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তারপর অন্য গৃহকর্ম্ম করিয়া ও আপনি আহার করিয়া ছুটী হইবার সময়ে আবার ছাতে বসিয়া কখন প্রাণের ধন বাড়ী আসিবে সেই অপেক্ষা করিতেন। মা কোথায় না ছেলে মেয়েকে ভাল বাসে?—কিন্তু প্রতিভার মা তাকে যে কি চক্ষে দেখেছেন সে বলা যায় না, সে আর কেহ বুঝিতেই পারে না। এত আদরের বলিয়া প্রতিভাকে কেহ কখন কোন কারণে তিরস্কার করিতে পাইত না। পড়া শুনা উত্তম হইত বলিয়া বিদ্যালয়েও কখন শাস্তি পাইতে হইত না। এজন্য সে কিছু বেশী একগুঁয়ে হইয়া পড়িয়াছিল। যা ধরিত তা চাই ই চাই, না হলে কাহারও নিস্তার নাই। বুঝাইলেও বুঝিবে না, বলিলেও শুনিবে না,—ভয়ানক আবদার! এজন্য মাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। মধ্যে মধ্যে রাগে এমনি অজ্ঞান হইয়া যাইত যে মাকে মারিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া রক্তপাতই করিয়া দিত। মুঠা করিয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া দিত। তবুও মা কিছু বলিতেন না। যা চাহিত, দিতেন আর নির্জ্জনে কাঁদিতেন। তাঁহাকে শাসন করিতে বলিলে বলিতেন "জ্ঞান হইলেই ভাল হইয়া যাইবে। যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে চির দিন ওরূপ বুদ্ধি থাকিবে না।" কি আশ্চর্য্য! যে মেয়ে অন্য সময়ে এমন মধুময় কথা বলে, এমন চমৎকার পড়া করে, সমবয়স্কা বালিকাদের সঙ্গে এমন ভালবাসা যার,—সেই আবার বাড়ীতে এমন! এদিকে মা না হলে যার এক দণ্ড চলে না, মার হাতে না হলে যার খাওয়াই হয় না, মা ভাত মেখে দিবেন, মাছ বাছিয়া দিবেন, কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইবেন,—এ না হইলে যার এক দিন চলে না, সেই সোণার পুতুলই আবার রাগ হলে যেন আর একজন! যেন ঘাড়ে কি ভূত চাপে! আশ্চর্য্য!

উপরে যে দোষের কথা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা দৈ পড়িলেই সব দুধ নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ সকলেই প্রতিভার প্রতি বিরক্ত ও তাহার চরিত্রের জন্য খুব দুঃখিত হইতেছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বেচারা কি করিবে? অনেক দিনের অভ্যাস যায় না; আর যাবার জন্য মাও কোন বিশেষ চেষ্টা করেন না। তার মনে হইত মাকে ঐ রকম করিয়াই ব্যবহার করা উচিত। অন্যায় প্রেম! আশ্চর্য্য কু-বুদ্ধি!!

সে দিন এক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্কুলের ছুটীর পর বিমলাদের বাড়ীতে যাবার কথা আছে। মাকেও বলিয়া আসিয়াছে। স্কুলের ছুটী হইলে বিমলা প্রতিভার গলাটী জড়াইয়া মনের আনন্দে

আপনাদের বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। পথে যে মেয়ের সঙ্গেই দেখা হয় সেই আসিয়া প্রতিভার সোণার হাত ধরিয়া এক গাল হাসিয়া বলে "কি ভাই! আজ যে আমাদের পাড়ায়?" প্রতিভাও মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করে—"আজ ভাই! বিমলার মা যেতে বলেছেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

বিমলাদের বাড়ী বড় দূরে নয়। সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে সেখানে পৌছিল। বিমলার মা প্রতিভাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। কতক্ষণ কোলে করিয়া ঘন ঘন মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন ও পড়ার কথা ও মার কথা সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রতিভাও স্বাভাবিক নম্র মধুর ভাবে সমস্ত কথার উত্তর দিল। তার পর তিনি দুজনকে গা হাত পা ও মুখ ধোয়াইয়া এবং মুছাইয়া দিয়া খাবার দিলেন। খাওয়া হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুজনকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীর নিকট বেড়াইতে গেলেন। বাগানের এক পার্শ্বে একটী ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর। সেই ঘর হইতে কে যেন কান্নার মত স্বরে গান করিতেছে। প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কে, খুড়ীমা?" খুড়ীমা বলিলেন "ও একটা পাগল মেয়ে।" তখন প্রতিভার তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। তিন জনেই আস্তে আস্তে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে পাইয়াই পাগলী বলিয়া উঠিল "কে ও? মা আস্‌ছে? এস এস। আমার মা এস। একি? এক—দুই—তিন? তিন মা? এক হারিয়ে তিন পেলাম? হাঁগা? তোমরা কি আমার মা গা? সত্যি করে বল, তিন জন কি মা? তিন জনই?—কৈ, না, না। আমার মা তোমাদের মত নয়। তাঁর চেহারা কি ও রকম? আমি সন্ধ্যা-বেলা চিন্‌তে পারি নি। আমার মা স্বর্গের মা।

আহা! মা গো! মা!
ওগো আমার মা!

কোথায় তুমি মা?
আমি যাব মা! ”—

বিমলা ও তাহার মা জান্‌তেন, তাঁদের কাছে পুরাতন কথা; সুতরাং তাঁরা কেবল চেয়ে রইলেন আর শুন্‌লেন। প্রতিভা আর কখন এ রকম দেখে নাই, শুনেও নাই। সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার গায় কাঁটা দিল, সে কাঁদিতে লাগিল।

পাগলী তার পর ঘরের মেজেতে শুইয়া পড়িল। “এই খানে মা আমার শুয়ে থাক্‌তেন! আহা! এ যে আমার রাজ অট্টালিকা। ঠাক্‌রুণ গো, তোমরা কি এমন বাড়ীতে কখন থাক্‌তে পাও? ইস্! তা আর হয় না। তোমাদের কি আমার মত মা আছে? এমন বিছেনা? হা! হা!

আমার মা হেথা আছেন
আমার মা সেথা আছেন
আমার মা স্বর্গে গেছেন
আমায় ডেকে নে যাবেন।”

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। পাগলীর অবস্থা দেখে প্রতিভার প্রাণ গলিয়া গেল। তাহার চক্ষু দুটীর জলে গাল ভাসিয়া গেল। গাল বহিয়া গড়াইয়া চক্ষের জল বুকে পড়িতে লাগিল। সে দিকে মনই নাই। কেবলই পাগলীর শুষ্ক আলুথালু ধুলা মাখা চুল, শাদাপানা ছাইএর মত ক্ষীণ শরীর, পরিধানের কাল ছেঁড়া নেকড়া খানি,—এই সব দেখিতে বালিকা নিমগ্ন। খুড়ীমা ডাকিলেন। চক্ষু মুখ মুছিয়া প্রতিভা চুপ্‌টী করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পথে যাইতে যাইতে পাগলীর কথা সব বলিতে লাগিলেন। কেমন সে মায়ের বড় আদুরে মেয়ে ছিল, কেমন তাহার মা তাহাকে ভাল বাসিত, তার পর জ্বর হইয়া মা মরিয়া গেল, আর সেই অবধি মেয়েটী পাগল হইয়া গিয়াছে। পাড়ার লোক দয়া করিয়া কিছু কিছু খাবার দিয়া যায়। তাই ইচ্ছা হইলে একটু খায়। আর দিন রাত পড়িয়া কাঁদে আর “মা মা” করে।

একটীও কথা না কহিয়া প্রতিভা সমস্ত শুনিল। “মা তো তবে মরিয়া যায়?” তাহার মনে হইল। রাত্রে বাড়ী আসিল। মা কোলে করিলেন, কোলের ভিতর মাথা লুকাইল, প্রায় অর্দ্ধেক রাত অবধি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া খুব কাঁদিল। মা কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কত বুঝাইলেন; কোন ফল হইল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তার পর দিন থেকে প্রতিভা ২। ১ দিন অবধি মার মুখ পানে তাকাইতে পারিত না, স্কুলে যাইত না, কেবলই কাঁদিত। শেষে সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল। আর কখন মার মনে কষ্ট দেয় নাই। পাগলীকে দেখিয়া পাগলীর অবস্থা হইতে কেমন শিক্ষা পাইল। এখন প্রতিভা সোণার প্রতিমা, সকল প্রকারেই স্বর্গের দেবী।

প্রকৃত বন্ধু।

ন এক ধনী সওদাগরের একটী মাত্র পুত্র ছিল; তাহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন এবং ছেলেবেলা হইতেই তাহার শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন।

পিতার আন্তরিক ভালবাসা এবং যত্ন সত্বেও পুত্রের পড়া শুনার দিকে মন আকৃষ্ট হইল না; সৎপথে থাকিয়া জ্ঞান উপার্জ্জনের দিকে মতি হইল না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকারের বদ লোক বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। পিতা এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন এবং এক দিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন:—"এই সংসারে প্রকৃত বন্ধু বড়ই দুর্লভ; প্রকৃত বন্ধুর অভাবে সুখী হওয়া যায় না। এই যে এত টাকা কড়ি দেখিতেছ, যদি তুমি মিতব্যয়ী না হও তাহা হইলে উহা সমস্তই উড়িয়া যাইবে; এবং টাকা কড়ির দ্বারা যত সুখ পাইতেছ সমুদয়ই ফুরাইবে। কিন্তু তুমি যদি প্রকৃত বন্ধু পাও তাহা হইলে চিরকালই তাহার সঙ্গে সুখে থাকিবে। টাকা কড়ি, ধন সম্পত্তি সমস্তই ব্যবহার দোষে তোমা হইতে বিচ্ছেদ হইতে পারে, কিন্তু তোমার প্রকৃত বন্ধু চিরকালই তোমার বন্ধু থাকিবেন; সম্পদে, বিপদে সকল সময়েই তোমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিবেন। অতএব তুমি সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এক জন প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া লও। গৃহে বসিয়া এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; এই জন্য তোমাকে বলি যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়া নানা দেশীয় লোক জনের সহিত আলাপ পরিচয় কর। যত তোমার বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইবে ততই তোমার জ্ঞান অধিক হইবে এবং তুমি অনায়াসেই অনেক লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া লইতে পারিবে। আমার ইচ্ছা যে তুমি আমার এই উপদেশ শুন এবং এখনই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।"

পুত্র পিতাকে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল; এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে এত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া পিতা বলিলেন "তুমি যে এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে আমি তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।" পুত্র নম্রভাবে উত্তর করিল "আপনি আমাকে একটী প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া লইবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি যখন এত অল্প সময়ের মধ্যেই ৫০ পঞ্চাশ জন বন্ধু পাইয়াছি তখন দেশ দেশান্তরে আর যাইবার দরকার কি?"

পিতা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "যাহাদিগকে তুমি বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছ তাহারা কখনই প্রকৃত বন্ধু নহে; মাতালেরা বোতলে যতক্ষণ মদ থাকে ততক্ষণ বোতলের কত প্রশংসা করে এবং যেই মদ নিঃশেষিত হয় আর অমনি বোতলটী মাটিতে ফেলিয়া দেয়। ইহা তুমি বোধ হয় নিজেই দেখিয়াছ। যতক্ষণ তোমার টাকা কড়ি থাকিবে ততক্ষণ অনেকেই তোমার প্রকৃত বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিবে। যাহাদিগকে তুমি প্রকৃত বন্ধু বলিতেছ তাহাদিগকে কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ?" পুত্র

পিতার এই কথাগুলি শুনিয়া কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল "আপনি কেন সন্দেহ করিতেছেন? আমি যাঁহাদিগকে বন্ধু বলিতেছি তাঁহারা আমার সম্পদের সময়ে যেমন ব্যবহার করিবেন বিপদের সময়েও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিবেন, আপনি ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন।"

পিতা বলিলেন:—"আমার ৬০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে; আজ বাদে কাল মরিতে হইবে; প্রকৃত বন্ধু পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু মনের মত প্রকৃত বন্ধু মিলিল না। তুমি এত অল্প বয়সেই কেমন করিয়া বলিতেছে যে পঞ্চাশ জন বন্ধু পাইয়াছ তাহা বুঝি না। প্রকৃত বন্ধু কি রূপ করিয়া পরীক্ষা করিতে হয় তাহার একটী উপায় আমি বলিতেছি।" এইবলিয়া তিনি একটী ভেড়া মারিয়া তাহার অধিকাংশ রক্ত তাহার পুত্রের কাপড় চাদরের উপর ছিটাইয়া দিলেন। মৃত ভেড়াটী একটী বড় থলেয় পুরিয়া পুত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন; এবং এইরূপ অবস্থায় বন্ধুদের বাটীতে গিয়া কি কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। পুত্র এইরূপ অবস্থায় রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে তাহার সর্ব্বপ্রধান বন্ধুর বাটীতে প্রথম যাইয়া উপস্থিত। বাটীর দরজায় গিয়া বন্ধুর নাম ধরিয়া ডাকামাত্র বন্ধু শশব্যস্তে আসিয়া হাজির। বন্ধুকে দেখিয়া বলিলেন "আমাদের পরিবারের সহিত অমুকের সহিত যে শত্রুতা আছে তাহা তুমি জান, এই মাত্র ভাই তাহার সহিত কোন বিষয় লইয়া ঝগড়া হয়, ঝগড়ার পর হাতাহাতী হয় এবং তাহার পর শেষে কি দাঁড়াইল অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতেছ। পুলিসের লোক জানে যে উক্ত ব্যক্তির সহিত আমাদের শত্রুতা আছে, আমাদের আসিয়াই প্রথম ধরিবে। আমি উক্ত ব্যক্তির শরীরটা থলেয় করিয়া আনিয়াছি। এই মৃত শরীরটা তোমার বাটীতে পুঁতিয়া রাখ।"

বন্ধু সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন। অনেক ভাবিয়া—চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী বড়ই সঙ্কীর্ণ; আমরাই স্বচ্ছন্দে থাকিবার স্থান পাই না, তাহার পর কেমন করিয়া মৃত শরীরটার স্থান দিই? বিশেষতঃ তোমাতে এবং আমাতে যে বন্ধুত্ব আছে তাহা সকলেই জানে; পুলিসে তোমার বাড়ী মৃত দেহ না পাইলেই আমার বাড়ী অনুসন্ধান করিতে আসিবে। তাহা হইলেইত চক্ষুস্থির! তোমার প্রাণ দণ্ডের সহিত আমারও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এমত অবস্থায় আমি তোমার এই মাত্র উপকার করিতে পারি যে তুমি যে এ কু-কাজ করিয়াছ ইহা আমি আর কাহাকেও বলিব না।"

ধনীর সন্তান অনেক অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না দেখিয়া অন্য একজন বন্ধুর বাটীতে যাইয়া হাজির হইলেন। সেখানেও এইরূপ উত্তর। এইরূপে পঞ্চাশ বাড়ীতে ঘুরিলেন কেহই সাহায্য করিলেন না; কোন স্থানেই সাহায্য না পাইয়া বাটী আসিয়া পিতার নিকট সমুদয় খুলিয়া বলিল "যাঁহাদিগকে ভাবিয়াছিলাম যে সুখে দুঃখে সমভাবে কাজ করিবেন আজ দেখিলাম তাঁহাদের মধ্যে কেহই আমাকে এই কল্পিত বিপদের সময়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না।" পিতা তৎপরে বলিলেন "যাহাদিগকে দুঃখে সাহায্য করিতে দেখিবে না তাহাদিগকে বন্ধু বলিও না। যেমন সোণা ভাল কি মন্দ আগুনের দ্বারা পরীক্ষা করা যায় সেইরূপ বন্ধু ভাল কি মন্দ বিপদে না পড়িলে বুঝা যায় না। যে সুখের সময়ে ও দুঃসময়ে বন্ধুর কাজ করিবে সেই বন্ধু;

অতএব এখনি যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া জানিয়াছ তাহাদিগকে ত্যাগ কর, প্রকৃত বন্ধু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও বন্ধু বলিয়া ভাবিও না।" *

আকাশ।

বড় ভালবাসি আমি দেখিতে তোমায়,
হে আকাশ! তব রূপে নয়ন জুড়ায়!
যখন যে দিকে আমি করি বিলোকন,
নূতন নূতন রূপে ভুলাও নয়ন!
প্রভাত সময়ে যবে তরুণ-তপন,
মনোহর বেশে আসি দেন দরশন,
নব রবি রাঙ্গা-ছবি হৃদয়ে লইয়া
মুখ ভরা হাসি টুকু অধরে টিপিয়া;
কি সুন্দর ভাব খানি দেখাও তোমার,
অবাক হইয়া আমি দেখি বার বার!

আবার যখন আহা সেই সে তপন,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি শিশুর মতন,
খেলা ধূলা করি সারা দিবসের শেষে,
ধীরে ধীরে আসি আহা আলু থালু বেশে
ঢুলিয়া পড়েন তব কোলের ভিতরে,
আদরেতে লও তুমি হৃদয়েতে ধ'রে!
তখন তোমার সেই অপরূপ বেশ,
দেখিয়া নয়নে মোর না পড়ে নিমেষ!

ঘোরতর অন্ধকারে ঘিরি সমুদয়,
যখন রজনী আসি হয় হে উদয়,
সুনীল সুন্দর বক্ষ করিয়া বিস্তার,
থরে থরে পর কিবা তারকার হার!
ঝক-মক করে তারা হীরকের প্রায়,
দেখিয়া সেরূপ আহা নয়ন জুড়ায়!
অবাক্ হইয়া আমি প্রফুল্ল-অন্তরে,
এক দৃষ্টে সেই রূপ দেখি প্রাণ-ভ'রে!

আবার যখন তব হৃদয়ে বসিয়া,
হাসে পূর্ণ-শশী খানি সুধা-বরষিয়া,
শোভার সাগর যেন উথলিয়া উঠে,
সুন্দর সুনীল কান্তি আরো যেন ফোটে!
তখন তোমার সেই মুখ-ভরা হাসি,
আমিত দেখিতে ভাই বড় ভালবাসি!
ভুলে যাই আপনারে—ভুলি এ ভুবন,
কেবল তোমার রূপ করি দরশন!

ক্ষণ-কাল মেঘ-জাল আসিয়া যখন,
তোমার হৃদয়ে বসি করেন গর্জ্জন,
ঝলকে ঝলকে ছোটে বিদ্যুৎ-কিরণ,
ঝম্ ঝম্ রবে বৃষ্টি হয় বরিষণ;
তখন তোমার সেই গম্ভীর মূরতি,
নিরখিয়া হয় মন পুলকিত অতি!
সে শোভার কাছে যেন কিছু নহে আর;—
নয়ন ভরিয়া আমি দেখি বার বার!

কে তোমারে এত রূপ করিয়া প্রদান,
শোভার-ভাণ্ডার করি করিল নির্ম্মান?
অনন্ত তাঁহার কীর্ত্তি, আশ্চর্য্য কৌশল!
তুমিই আকাশ তার পরিচয় স্থল!
অনন্ত শরীরে তব, সুস্পষ্ট-ভাষায়,
তাঁহার মহিমা কথা লেখা গায় গায়!

* ইতালী দেশস্থ কোন একটী গল্প অবলম্বনে লিখিত।

পুরুষ প্রধান তিনি সকলের সার;
বার বার নমস্কার চরণে তাঁহার!

আহা! কি দুঃখ!

আহা! ভালুক! তোমার কি দুঃখ! তোমার দুঃখ দেখে যে আমার বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। মনের দুঃখে চুপটী করিয়া বসে আছ; তোমার সে চতুরতা, সে বীরত্ব কোথায়? যে বীরত্বে এক সময়ে তুমি মানুষকে প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল করিতে, গাছে উঠিলেও তাহার নিস্তার থাকিত না, তুমি পিছনে পিছনে গিয়ে তাহাকে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে, সেই বীরত্ব এখন কোথা গেল? যে চীৎকারে একদা তুমি গগন ফাটাইতে, বন কাঁপাইতে, সেই ভয়ানক গোঙান চীৎকার এখন কোথায়? যে নখে এক সময়ে গাছ ছিঁড়িয়া, চিরিয়া, শত খণ্ড করিয়া ফেলিতে সেই নখ তোমার এখন কে এমন ভোঁতা করিয়া দিল? আহা! চক্ষু দুটী মুদিয়া কি ভাবিতেছ? সেই প্রাচীন কালের সুখের কথা, স্বাধীন অবস্থায় যখন বনে বনে বেড়াইতে, তখনকার সুখের কথা কি মনে পড়িতেছে? তাই দুটী চক্ষু বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছ? আহা! চিন্তায় এমনি মগ্ন হইয়াছ যে একটা হতভাগা বানর তোমার পিঠে চড়িয়া ঘাড়ের চুল ধরিয়া টানিতেছে, তাও টের পাইতেছ না? উপুড় হইয়া বসিয়া আছ, যেন গায়ে জোর নাই, মনে তেজ নাই, বুকে সাহস নাই, প্রাণে কিছু উৎসাহ নাই, যেন 'জন্তুটী' হইয়া বসিয়াছ। নিষ্ঠুর লোক, তোমার দুঃখে কষ্ট পায় না, আবার তোমাকে মারিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। ছিঃ! তোমার অসহায় অবস্থা দেখেও মানুষেরা আহ্লাদ পায়, পয়সা দেয়, দুঃখ হয় না।

নির্দ্দোষী ভাল মানুষ তুমি। মানুষের পাড়া হইতে যে কত দূরে থাক তার ঠিক নাই; পাছে তোমার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে মানুষের বাড়ীর ত্রিসীমায় যাও না। নিজের দেশে বনের মধ্যে এটা ওটা খেয়ে নির্জ্জনে প্রাণ ধারণ কর। হিংস্র-স্বভাব দুষ্ট মানুষ তাও সহিতে পারে না। কত ফিকির করিয়া তোমায় ধরিয়া আনে, জ্বালাতন করে, পিঁজরায় বন্ধ করিয়া রাখে, কত যন্ত্রণা দেয়! শেষে তুমি নিরুপায় হইয়া আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া মানুষের দাসত্ব স্বীকার কর। আহা! কি করিবে বল? পেটে ত খেতে হবে। দুরন্ত মানুষ কথা না শুনিলে খেতে দেবে না, তাই মরে মরেও তার কথা শুনে নেচে নেচে বেড়াও। দেখ ভালুক! তোমার অবস্থা দেখে কার না দুঃখ হয়? যার হয় না সে ভাল লোক কখনই নয়। তোমার এই প্রকার দুরবস্থা দেখিলে যার কষ্ট হয় না সে কখনই ভদ্রলোক নয়। বাঘ, কি গোখরো বা কেউটে সাপ, কি ডাকাত এদের সাজা হলে তত দুঃখ হয়না; কেননা এরা অপরাধী, মানুষের হানি করে। তুমি কিন্তু সহজে কারও হানি কর না; মানুষ আজ কাল তোমায় জ্বালাতন করে, তোমার

আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসে। তাই বাগে পেলে তুমি তাহাকে মারিতে ছাড়না, তবুও বাঘের মত তুমি মানুষের বাড়ী চড়াও করিতে জান না। মানুষ তোমার দেশে গিয়ে তোমার অনিষ্ট করিবে, আর তুমি কিছু বলিবে না? একি কখন হয়? এত ভাল মানুষ কেও আর নাই। কিন্তু তবু দুরন্ত লোক এত তোমার মত শান্ত পশুকে মিছামিছি ক্লেশ

দেয়। পেটের জন্য, সামান্য দুটা পয়সার লোভে বন থেকে তোমায় ধরে এনে আহা! কি যন্ত্রণাই না দেয়?

তুমি যখন নাচ, ভালুক! সকলে হাসে; বলে ভালুকটা কেমন নাচিতে শিখিয়াছে। আমি কিন্তু হাসি না। আমার মনে হয় না যে তুমি নাচিতেছ; মনে হয় যে মনের দুঃখে তুমি ছট্ ফট্ করিতেছ। যখন তোমার নাকের দড়ি ধরিয়া তোমায় দুরন্ত মানব টানে, সেই হেঁচকা টানে তোমার নাকে যে কি লাগে তা লোকেরা বুঝিতে পারে না। আমি তা বুঝি, তাই তোমার দুঃখের "আঁ আঁ" শব্দে আমার বড় কষ্ট হয়। তোমার মুখ দিয়া জল গড়াইতে থাকে; চক্ষু, নাক সব স্থান দিয়ে দুঃখের জল বাহির হয়, সেটা কেউ দেখে না। লোকে বলে ভালুক নাচে। আহা! যার এত যাতনা, তার কি নাচ আসে? আমাকে যদি কেহ আমার বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে ঐ রকম শাসিত করে, বলে "নাচো নাচো নাচো" তাহ'লে কি আমি নাচি? খুব মারে যখন তখন কি করি, উঠিয়া ঐ রকম করে লাফাই; কিন্তু মনে মনে এ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় চিন্তা করি। ভালুক! আমার মনে হয় তুমি ঠিক ঐ রকম কর। কাঁদিতে কাঁদিতে "আঁ আঁ আঁ" শব্দে ধেই ধেই ক'রে লাফাও আর মনে মনে তোমার চালককে গালাগালি দাও। কোন ক্ষমতা নাই নহিলে তুমি তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে, সন্দেহ নাই।

দেখ ভালুক! তোমার নাচে কিন্তু অনেকের উপকার হয়। সেই যে সেদিন তুমি সেই বাবুদের বাড়ীর উঠানে লাঠি কাঁধে করিয়া থপ্ থপ্ করিয়া নাচিতেছিলে,—ঘাড়টী বাঁকাইয়া, ঘুমুরের তালে তালে প্রকাণ্ড ভুঁড়িটী নাড়িয়া নাড়িয়া সেই যে নাচিতেছিলে, আর মাঝে মাঝে "আঁ আঁ" করিয়া নাকীস্বরে শব্দ করিতেছিলে—সে দিন বড়ই উপকার হইয়াছিল। সেই বাবুটীর আকার ও তোমারই মতন, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, আর আপাদ মস্তক তোমারই মতন লোম গায়। মদ খেয়ে বাবু মশাই প্রায়ই তোমার মতন নৃত্য গীত করেন, আর পাশে থেকে তাঁহার সঙ্গীরা তাল দেয়। সেদিন কিন্তু তোমার নাচটা দেখে অবধি তাঁর ঘৃণা হয়ে গেছে। একজন সঙ্গী বলিয়াছিল "ভালুকটা আমাদের বাবুর মতন ঠিক নাচে।" সেই মনের ঘৃণায় তখনি তিনি তাদের দূর করে দিলেন, নাকে কানে খত লিখে দিলেন যে আর কখন মদ খাবেন না। এখন তিনি বেশ ভাল হয়েছেন। তাই বলেছিলাম তোমার দ্বারা অনেকের উপকার হয়। আমাদের হতভাগা দেশে তোমার মতন অনেক বাবুতেই নৃত্য করেন, তাঁদের যদি একজনকে ভাল করিতে পার তাহলে তোমার দুঃখভোগ অনেক সফল হয়।

ঘণ্টার মধ্যে দু চারিবার তোমার জ্বর হয়; কেন ভালুক? এদেশের জলবায়ু কি তোমার সহ্য হয় না? তোমাকেও কি ম্যালেরিয়া ধরেছে? তা যাই হউক, কিন্তু আমার মনে হয় যে ওটা কেবল তোমার যন্ত্রণায় হয়। পেটের দায়ে নাচ, খেলা কর, চালকের কথা শুন, কিন্তু যেই মনে পড়ে যে কি ছিলে আর কি হয়েছ, অমনি যাতনার জ্বালায় অস্থির হও আর ধূলায় লুটাইয়া রোদন কর; তাই ক্ষোভে, রাগে, দুঃখে তোমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে। তোমার এত দিনের পরাধীনতাতেও পুরাণ স্বাধীনতার সুখ ভুলাইতে পারে নাই, যখনই মনে হয় তখনই তোমাকে একেবারে পাগল করিয়া ফেলে। আর কত লোক যে চিরদিন পরের অধীন হইয়া অতি নীচ দাসত্ব

করিতেছে অথচ এক দিনের জন্যও তাদের মনে একটু ধিক্কার হয় না, ঘৃণাবোধ হয় না, লজ্জা হয় না, ক্ষোভ রাগ তোমার মত কিছুই হয় না। ভালুক, তুমি এই বিষয়ে কত মানুষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

তোমার পিঠের উপরের ও বানরটা কি নির্ব্বোধ! ওটাও তোমার মত স্বাধীনতা হারাইয়া দাস হইয়া রহিয়াছে, অথচ সে দিকে লক্ষ্য নাই, দিব্য খেলা আমোদ করিয়া বেড়াইতেছে, তোমার এ যন্ত্রণা দেখিয়াও শিখিতেছে না, গাধাটার মত নীচ ও অধম হইয়া পোষ মানিয়া রহিয়াছে। আবার উল্টে তোমার পিঠের উপর চড়িয়া ঘাড়ের চুল গুলো ছিঁড়িতেছে। আহা! বানর ত বানর! কোন বোধ নাই। দাস হইয়া আবার আমোদ! ছি! আর ওরই বা দোষ কি দিব? মানুষদের মধ্যেই কত লোক অমনতর আছে। চাকর, গোলাম হইয়া আছে অথচ প্রভুর খোসামোদ করিবার জন্য কত খেলাই খেলে। আবার অন্য পরাধীন লোকদের মনে কত কষ্ট দিয়া বাহাদুরী করে। দূর হোক, আর দুঃখ করিতে পারি না। ভালুক! আমি আর তোমার কষ্ট দেখিতে পারি না। ঢোল বাজাইয়া ও বাঁশীর শব্দ করিয়া তোমায় যখন নাচাইতে আসিবে আমি তখন সেখানে থাকিব না। তোমার কষ্ট যদি দূর করিতে পারিতাম তাহলেও একটা উপকার করিতে পারিতাম; তা যখন পারিব না, তখন কেবল দুঃখ দেখে আর "আহা! কি দুঃখ!!" বলে লাভ কি? পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে, কেহ যেন কখন কাহারও কাছে ওরূপ নীচ দাসত্ব না করে।

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

একটী সহজ কথা।

এক সময়ে আমাদের দেশে মেয়েরা লেখা পড়া শিখিত না। তখন তাহারা কেবল বাড়ীর কাজ করিত, ও সকলেরই সেবাতে জীবন কাটাইত। লেখা পড়া শেখার যে কি সুখ, কি অপূর্ব্ব আনন্দ, কি পবিত্রতা, তাহা কিছুই জানিত না। অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া সময় কাটাইত। তখনকার একটী মেয়ে আর এখনকার একটী মেয়ে পাশাপাশি দাঁড় করাইলে সহজেই চিনা যায়। একজন শান্ত, নম্র, ধীর বটে, কিন্তু মুখে যেন বোকামী নির্ব্বুদ্ধিতা মাখান, হাবা গোবা ভাল মানুষটী, কিছু জানে না, যেন ননীর পুতুলটী; তাকে চারুপাঠের ভাল ভাল কথা বল, হাঁ করিয়া শুনিবে আর অবাক্ হইয়া থাকিবে। আর একজন চালাক, চতুর, স্বাধীন-প্রকৃতি, বুদ্ধি ও প্রফুল্লতা যেন এক সঙ্গে বাস করিতেছে; চক্ষু বাহিরের জিনিস দেখিতেছে, কিন্তু মন যেন অন্য কোথায় কোন গভীর বিষয়ের চিন্তা করিতেছে। কত প্রভেদ! এজন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া অবশ্য উচিত; আর যাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় আমাদের দেশে বালিকাদিগের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথাও মনে পড়ে—আর অমনি ভয় হয়! মনে হয় যে লেখা পড়া যাহারা শিখিতেছে তাহাদের

মধ্যে অনেক মেয়েরা প্রায়ই একটু স্বার্থপরতা ও ঔদাস্যভাব পাইতেছে। অবশ্য সকলে নয়, কেহ কেহ, হয়ত অনেকেই হইতেছে। আমরা এমন অনেক মেয়ে দেখিয়াছি যাহারা পড়ার জন্য বাড়ীর কাজ কর্ম্মে ঔদাস্য বা তাচ্ছীল্য দেখায়; তাহারা কিছু স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে। নিজেদের ভাল খাওয়া, ভাল পোষাক, ভাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এ সকলের দিকে তাদের বেশী নজর; কিন্তু বাড়ীর সকলকে কিসে সুখী করিব, নিজের অসুবিধা হলেও অন্য সকলকে কিসে ভাল খাওয়াব, ভাল রাখিব, সে দিকে তাহাদের তত আর দৃষ্টি দেখা যায় না। এটী কিন্তু বড়ই আক্ষেপের কথা। করুণা পড়িতেছেন আর তাঁর ছোট বোন্‌টী ক্ষুধায় আকুল হইয়া কাঁদিতেছে; মা রান্নাঘরে ব্যস্ত, কাজেই উঠিতে পারিতেছেন না। সে সময়েও যে করুণা উঠিয়া ভগিনীটীকে খাওয়াইয়া তার পর গিয়া পড়িবেন, এ আর তাঁর ঘটিতেছে না। নিষ্ঠুরভাবে ভগিনীর কান্না দেখিতেছেন আর মাথা-মুণ্ডু পড়িতেছেন। কাজেই বাপ বাড়ী আসিয়া সমুদয় শুনিয়া রাগ করিলেন। আরও শুনিলেন যে, তাঁর বড় স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে—নম্রতা নাই, বিনয় নাই, শান্তভাব নাই, গরিবের মত চাল চলন নাই, বড় মানুষের মেয়েদের সঙ্গে বেড়াইয়া তাঁদের মত পোষাকাদির দিকে নজর পড়িতেছে—এ সব কথা শুনিয়া তাঁর বাপ কাজেই সব বৈ কাড়িয়া লইয়া তাঁহার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

একি কম দুঃখের কথা? কিন্তু এ রকম ঘটনা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের অভিভাবকেরা (একেইত তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার শত্রু) মেয়েদের লেখা পড়া শিক্ষার বিপক্ষে অনেক নিন্দা করেন। আজ তাই আমরা প্রিয় পাঠিকাগণকে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন কোন ক্রমেই তাঁহাদের কেহই উক্তরূপ দোষে না পড়েন। যে বিদ্যার লক্ষ্য উন্নতি, বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, নিজের সুখ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া পরকে সুখী করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করা; সেই বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যদি তাহার বিপরীত ফলই লাভ করিতে হয়, তবে যে সে বিদ্যাশিক্ষা করা অপেক্ষা না করাও ভাল! এটী অতি সহজ কথা। কিন্তু মানুষ সহজ কথা আবার যত সহজে ভুলিয়া যায়, এমন আর অন্য কথা নয়। এজন্য আমরা আজ ভাল করিয়া এ কথাটী সকলকে মনে করিয়া দিতেছি, যেন সকলে প্রত্যেকের জীবনের ও চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখেন;—স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক নম্রতা, বিনয়, হৃদয়ের কোমলতা ও পরের ভাল করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং লেখা পড়ার গুণে আরও বাড়িতেছে কি না? লোকের দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু কর্ণ জুড়াইতেছে কি না? লোকে বলিতেছে কিনা "আহা! মেয়েটী যেন স্বর্গের! লেখা পড়ার উপর আমি বড় চটা ছিলাম, এই মেয়েটীকে দেখে কিন্তু আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে"—ইহা প্রত্যেকেরই দেখা উচিত। ভরসা করি, কথাটী মনে রাখিয়া আমাদের প্রিয় পাঠিকাগণ চলিতে পারিবেন। আমরা ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে আরও ভাল ভাল পরামর্শ দিব মনে করিয়াছি।

সত্যের বল।

(বালকের রচনা।)

প্রায়ই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলেন। এবং ছোট ছোট পাঠক পাঠিকা দিগের মধ্যেও বোধ হয় অনেকে এরূপ করেন। কেন করেন যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা হইলে হয়ত এই উত্তর পাওয়া যাইতে পারে যে, মারখাবার ভয়ে বা কাহারও কাছথেকে বকুনী খাবার ভয়ে মিথ্যা-কথা বলেন। সত্য কথার ক্ষমতা কত,এতে মানুষকে কেমন দেবতার মত করে এবং একটা সত্য কথা বলিলে পরে কত আনন্দ পাওয়া যায়, এবং দোষ করিয়া যদি তাহা প্রকাশ করা যায় তাহা হইলে কেমন সেই দোষটা একেবারে চলিয়া যায়, আর মানুষ কেমন ভাল হইয়া যায় এই বিষয়ে একটী গল্প বলিতেছি।

প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর হইল দিল্লী নগরে একজন মুসলমান চোর বাস করিত; সে এমন পাকা চোর ছিল যে তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে এবং হয়ত সহজে বিশ্বাসও করিবে না। সে বড় বড় আমীর, ওমারও, মহা মহা বাদ্‌সাহের বাটীতেঢুকে টাকা কড়ি, ভাল ভাল জিনিস পত্র সব চুরি করিত। মহা মহা বাদ্‌সার বলিবার মানে এই যে তখন মুসলমানেরা ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন সেই জন্য তাহারাই খুব টাকা-ওয়ালা লোক ছিলেন। যাহা হউক তাকে কেহই ধরিতে পারেনা। সকলে ভারি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। কার বাড়ীতে কখন কি করে তার ঠিক নাই; সকলেই শশব্যস্ত।

একবার সে মন্ত্রীর বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়াছে। ঘরে ঢুকিবামাত্র লোক জনের সাড়া শব্দ পেয়ে যেমন তাড়া তাড়ি পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে পালাবে অমনি পড়েগিয়ে তার মাথায় ভয়ানক আঘাত পাইল।

সেই জন্য সে ভয়ানক পীড়িত হইল; সে তখন যে কত কাতোরক্তি করিত তাহা আর বলা যায় না। অনেক সময়ে দুঃখের সহিত বলিত যে, "যদি আমি এরূপ না করিতাম তাহা হইলে আর আমার এমন দুর্দ্দশা হইত না।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল "যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই তাহা হইলে আর কখন এরূপ কাজ করিব না।" যাহা হ'ক সে সে যাত্রায় কোন মতে রক্ষা পাইল। এবং আগেকার মত বলবান হইয়া উঠিল এবং প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চুরি করিতে লাগিল।

একদিন সে একটা লোককে খুন করে। খুন করিবার সময় তাহার কাতরোক্তি ও চিৎকার শুনিয়া তাহার মনে কেমন যেন ভয়ানক কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; এবং কিছুতেই সেই যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক দরবেশের (ধাম্মিক লোক) নিকট যাইয়া সব কথা খুলিয়া বলিল এবং তার পা জড়াইয়া ধরিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে সেই দরবেশের অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি তাহাকে সর্ব্বদা সত্য কথা কহিতে ও ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পড়িতে বলিলেন এবং তাহাতেই সে ভাল হইতে পারিবে এইরূপও বলিলেন।

সে ঐ কথা শুনিয়া তদনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। খুব সকালে, দুপরবেলা,

ও সন্ধ্যার সময় নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিল। এক দিনও তার নামাজ কামাই যাইত না; এবং সর্ব্বদা সত্য কথা বলিত।

এক দিন সে এক জনের বাটীতে চুরি করিতে গিয়াছে এর মধ্যে রাত্রি ভোর হইয়া গেল। তখন কি করে, তার নামাজ না পড়িলেই নয়? 'যা হবার তা হবে'এইরূপ ভাবিয়া সে নামাজ পড়িতে লাগিল; তার চীৎকারে গৃহকর্ত্তা আসিয়া দেখেন যে একজন অপরিচিত লোক ঘরের ভিতর চীৎকার করিতেছে; তখনি ত তাকে চোর বলিয়া রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হইল; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন তুমি উহাদের বাটীর ভিতরে ঢুকিয়াছিলে?"সে দরবেশের কথা মনে করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বলিল 'চুরি কর্ত্তে'। রাজা একথা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন যে, চুরি ক'রে কি কেউ কখন স্বীকার করে? আর বিশেষ চোরের যখন প্রাণ দণ্ড হয় তাহা জানিয়া শুনিয়া এ লোকটা যখন স্বীকার করিতেছে তখন অবশ্য আর কিছু বিশেষ কারণ আছে। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঠিক করিয়া বল নইলে তোমাকে শূলে দেওয়া হইবে।" চোর তথাপি স্থির হইয়া বলিল "চুরি কর্ত্তে গিয়াছিলাম ইহার মধ্যে সকাল হওয়াতে ধরা পড়িয়াছি।" রাজা তথাপি বিশ্বাস করিলেন না—ভাবিলেন বুঝি কোন দরবেশ তাহাকে ছলনা করিতেছেন। এই মনে করিয়া রাজা সেই চোরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন"প্রভু আপনি কে? কৃপা করিয়া এই অভাগাকে বলুন।" তখন সেই কঠিন হৃদয় চোর নিজের পা ছাড়াইয়া বালকের ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আত্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত করিল ও পাগলের ন্যায় বলিয়া উঠিল "উঃ আমি কি মহাপাপী; সত্যের মর্ম্ম বুঝিতাম না; ঈশ্বরকে মনে করিতাম না; সত্য যে কি ধন তাহা চিনিতাম না, সত্য গ্রহণ করিতাম না। আমি একটী সত্য কথা বলিয়া সম্রাট দ্বারা পূজিত হইলাম ও দরবেশ আখ্যা প্রাপ্ত হইলাম" এই বলিয়া রাজাকে বলিল "মহারাজ আমাকে শূলে দেন,আমার আর বাঁচিয়া পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করা কোন মতেই উচিত নহে; আমাকে শূলে দেন।"

রাজা তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তৎপরে সে এক জন বাস্তবিক দরবেশ হইয়া রাজবাটীতে বাস করিতে লাগিল আর তাহার দৃষ্টান্ত দ্বারা যত চোর সাধু হইল; এবং মিথ্যাবাদী ধার্ম্মিক হইয়া গেল।

আগামী বৎসরের পুরস্কারের বিজ্ঞাপন।

আগামী বৎসরে 'সখা'র গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে ১০০৲ মূল্যের পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। সর্ব্বোচ্চ পুরস্কারের মূল্য ১০৲ দশ টাকা; এবং সর্ব্ব নিম্ন পুরস্কারের মূল্য ২৲দুই টাকা মাত্র।

যাঁহারা রচনা ও চিত্র বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহারাই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। পরীক্ষার বিষয় ও সময় 'সখা'য় যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে।

'সখা'র গ্রাহক ভিন্ন অন্য কেহ পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। যাঁহারা পুরাতন গ্রাহক আছেন, তাঁহারা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইয়া দিলে পরীক্ষা দিতে পারিবেন না।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন

কার্য্যাধ্যক্ষ।

১নং বেনেটোলা লেন সখা যন্ত্রে শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

চতুর্থ ভাগ।

১৮৮৬।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ, কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN."

কলিকাতা

২ নং বেনেটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

সূচীপত্র
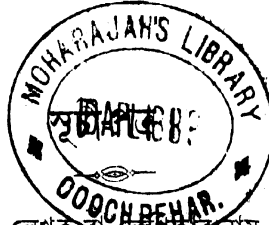
বিষয়	লেখক বা লেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক।
৺অক্ষয়কুমার দত্ত।	সীতানাথ নন্দী বি, এ,	৯৪
অতলস্পর্শ	ভুবনমোহন রায়	১৩৯
অবাধ্যতার প্রতিফল	কুমারী স্নেহলতা দেবী	৫৬
আখ্যানমালা	অন্নদাচরণ সেন	২১
আবদারে ছেলে (সচিত্র পদ্য)	সম্পাদক	১০
আশ্চর্য্য কর্ত্তব্যপরায়ণতা	ললিতমোহন দাস	৪৭
উকিলের পরামর্শ	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	৫৪
উভয় সঙ্কট (সচিত্র পদ্য)	বিহারীলাল গুহ	১৮৬
কর্ত্তব্য পরায়ণ পুত্র	কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু	১৬১
কলের জাহাজ (সচিত্র)	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	৮১, ১০০
কুকুরের চাতুরী	সম্পাদক	১৫
কেমন ছবি এঁকেছি (সচিত্র)	ভুবনমোহন রায়	২৯
গরিলা (সচিত্র)	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ,	৭৪, ৮৩
গ্লটন্ (সচিত্র)	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	১৮০
গুরুদ্দরবার (সচিত্র)	সম্পাদক	৪৪
চতুর্থ বর্ষ	ঐ	১
চন্দ্রমুখীর সাজা	ঐ	২৫
চীনের গল্প (সচিত্র)	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	১০
চোর বিড়াল (পদ্য)	শ্রীমতী মাঃ	২৮
জানোয়ারের বুদ্ধি	সম্পাদক	১৭৬, ১৭৭
জোয়ার ভাঁটা (সচিত্র)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	৩৮, ৫৯
জোসেফ ম্যাট্‌সিনি (সচিত্র)	সম্পাদক	৩১, ৪৯
ঢাকাই মস্‌লিন (সচিত্র)	দেবেন্দ্রনাথ ধর	১২৪, ১৩৪, ১৪৮
দীপশিখা	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	১৮২
দুটী বোন (সচিত্র)	নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫১
ধাঁধা		১৬, ৩২, ৪৮, ৮০, ৯৫, ১১২ ১৪৪, ১৭৬
ধ্রুবোপাখ্যান	শ্রীমতী কিরণশশী চট্টোপাধ্যায়	১৫২
নাক ও চোকের বিবাদ (পদ্য)	বিপিনবিহারী সেন	১৪
নানা প্রসঙ্গ (সচিত্র)	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	৭১, ৮৬, ১০৩, ১৭১

সূচীপত্র।

নারার বীরত্ব	...	ললিতমোহন দাস	...	৬৯
পরেশ ও তাহার পিতা	...	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	...	১৭৮
পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	...	সম্পাদক	...	১৫৫
পূর্ণিমা ও অমাবস্তা (সচিত্র)	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	...	১৭
প্রকাশের পরিবর্ত্তন	...	শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	...	১৮৪
প্রকৃত ঘটনা	...	জনৈক বঙ্গ মহিলা	...	১১৮
প্রবাল কীট (সচিত্র)	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	...	৬৫
প্রবাল দ্বীপ (সচিত্র)	...	ঐ	...	৯৭
পৃথিবীর গোলত্ব (সচিত্র)	...	ঐ	...	১১৩
ফুলের সাজি	...	ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭৮, ৯১	১১০, ১২০, ১৫০, ১৭৩
বনলতা	...	ভুবনমোহন রায়	...	১৮০
বর্ষশেষ	...	ঐ	...	১৯২
বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর	...	সম্পাদক	...	৬
বেলুন (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	...	২৩, ৪১, ৭৩
ভাই বোন্ (পদ্য)	...	শ্রীমতী মাঃ	...	১৩৩
ভিখারিণী মেয়ে (পদ্য)		ঐ	...	৮৫
ভোঁদড় (সচিত্র)	...	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	...	৬২
ভোলানাথের ধাঁধা (সচিত্র পদ্য)	...	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	...	১১৯
মন পরীক্ষা	...	অন্নদাচরণ সেন	...	৩২
মশা (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	...	১৫৯
মহাত্মা নেল্‌সনের গল্প	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	...	১৬৩
মাতার প্রশ্ন	...	বিপিনবিহারী সেন	...	৭৭
মুদ্রাযন্ত্র (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	...	১৬৬
রামকান্তের ঘোড়া (সচিত্র)	...	সম্পাদক	...	৬৮
রেড়ির গাছ (সচিত্র)	...	দেবেন্দ্রনাথ ধর	...	২
লণ্ডন মেলা (সচিত্র)	...	ঐ	...	১০৭
শাক্যমুনির ক্ষমা	...	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	...	৩১
শিশুর আমোদ (সচিত্র পদ্য)	...	নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১০৫
শ্যামচাঁদের পাচদশা (সচিত্র)	...	সম্পাদক	...	১৪২
সতীশ সকলের অপ্রিয় কেন ?	...	শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	...	১৫৫
সার উইলিয়ম জোন্স (সচিত্র)	...	সম্পাদক	...	৮৮
সাধের খেলা (সচিত্র পদ্য)	...	ভুবনমোহন রায়	...	১৩৮
স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	...	সম্পাদক	...	১২৯
স্নেহলতার দয়া	...	ভুবনমোহন রায়	...	১৬৮
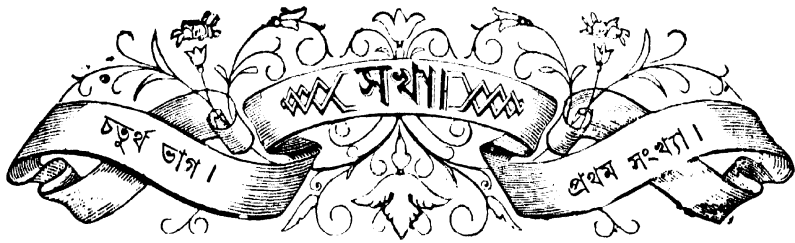
জানুয়ারি, ১৮৮৬।

চতুর্থ বর্ষ।

আমাদের "সখা" ঈশ্বর কৃপায় তিন বছর পার হইয়া চারি বছরে পা দিল। কিন্তু এই বছরে "সখা" ইহার পরম বন্ধু, ইহার পিতা মাতাকে হারাইয়াছে। আমাদের দেশে পিতৃ মাতৃহীন শিশুকে সকলে ভাল বাসে, সকলেই বলে 'আহা! মাখেকো ছেলে, ওকে কেউ কিছু বলিস্ নে।' এই বলিয়া পাড়ার সকল মেয়েরা তাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া যান; যাঁর ঘরে যা কিছু মিষ্ট সামগ্রী থাকে একটু হাতে দেন, হয়ত কোলে করিয়া তার মুখে একটী চুম্বন করেন। জগদীশ্বরের কি দয়া, সংসারে যে শিশু মা হারা হয়, সে একটী মা হারাইয়া কত মা পায়! পাড়ার সকল মেয়ে তার মায়ের অভাব পূর্ণ করেন। পাড়ার ছেলেরাও তাকে কত যত্ন করে। খেলিতে খেলিতে কেহ তাহাকে মারিলে দশটী ছেলে তাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। সকলেই বলে "আহা ওকে মারিস্ নে, ওর মা নেই।" আজ আমরা জগদীশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ অন্তরে বলিতেছি যে আমাদের "সখা" পিতা মাতা হারাইয়া সকলের কাছে অধিক আদর পাইতেছে। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, যে প্রমদাচরণ "সখা"র জন্য দেহ মন প্রাণ সঁপেছিল, যে প্রমদাচরণ না খাইয়া ইহাকে খাওয়াইয়াছে, না পরিয়া ইহাকে পরাইয়াছে, ইহার জন্য শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিয়াছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, লোকের কাছে ছুটাছুটী করিয়াছে, নিজের অল্প আয়ে আপনি ক্লেশে থাকিয়া "সখা"কে ভাল করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছে, ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিয়াছে, সেই প্রমদাচরণ যখন গেল, তখন শিশু "সখা"কে আর কে দেখিবে? হাজার হউক পরে কখনও মায়ের মত যত্ন করিতে পারে না। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে আমাদের সে দুর্ভাবনা দূর হইতেছে। এখন দেখিতেছি দশ জনের উপকারের জন্য যার জন্ম হয়—সে ছেলেকে ঈশ্বর বাড়াইয়া থাকেন। দিন দিন তার উন্নতিই হয়। আমাদের "সখা"ও ঈশ্বর কৃপায় বাড়িতেছে। বাঙ্গলা দেশের বালক বালিকাদিগের উন্নতি সাধন করিবার জন্য "সখা"র জন্ম হইয়াছে। "সখা" গুরুর মত বালক বালিকাদিগের কাছে যায় না, কিন্তু বন্ধুর মত যায়। ছেলে হইয়া ছেলেদের সঙ্গে মিশে। আমরা "সখা"কে বলিয়া দিয়াছি যে, ছেলেরা যখন খেলা করিবে তখন "সখা" সেখানে যাইবে, যখন দশজন বালক বালিকা

একত্র বসিয়া গল্প করিবে, তখন সেখানে "সখা" যাইবে, ও বন্ধুভাবে কাছে বসিয়া ভাল কথা শুনাইবে। যাহাতে সকলের সুপথে মতি হয় এমন কথা শুনাইবে। "সখা" বালক বালিকাদের পরম উপকারী বন্ধু, এই জন্যই সকলে "সখা"কে এত ভাল বাসেন। পাড়ার দশটী ছেলের মধ্যে একটী ছেলে যদি সৎ হয়, যার সঙ্গে মিশিলে উপকার আছে, তবে বাড়ীর কর্ত্তারা বাড়ীর ছেলেদিগকে সেই ছেলের সঙ্গে মিশিতে দেন; এবং তাকে আদর করিয়া বাড়ীতে ডাকিয়া আনেন ও বলেন তুমি আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদা আসিবে ও আমাদের ছেলেদের সঙ্গে মিশিবে। দেশের ভদ্রলোকেরা সেইরূপ আমাদের "সখা"কে আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং বলেছেন "ও 'সখা' তুমি আমাদের বাড়ীতে এস, ও 'সখা' তুমি আমাদের বাড়ীতে এস।" ছেলেদের ত কথাই নাই। তারা যেন "সখা"র পথ চাহিয়া থাকে, কখন "সখা" আসিবে। যেই "সখা" বাড়ীতে প্রবেশ করে, অমনি বাড়ী শুদ্ধ ছেলে "সখা"কে লইয়া কাড়াকাড়ি করে। এ বলে "সখা আমার" ও বলে "সখা আমার"। আমরা এই সকল বালক বালিকাকে বলিতেছি "সখা" তোমাদের সকলেরই। যদিও "সখা" আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, তবু এ "সখা" তোমাদেরই। "সখা" তোমাদের ভাই; তোমাদের উপকারের জন্যই "সখা"র জন্ম হইয়াছে। ঈশ্বর করুন যেন ইহার দ্বারা তোমাদের উপকার হয়।

আজ "সখা"র জন্ম দিন। ছেলেদের জন্ম দিনে বাড়ীতে সকলেই আনন্দ করে। কিন্তু আজ আমরা "সখা"কে বাহিরে যাইবার জন্য কাপড় পরাইতেছি, আর প্রমদাচরণের জন্য চক্ষের জল ফেলিতেছি। "সখা"র একটু আদর দেখিলে যে প্রমদাচরণ স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইত, সেই প্রমদাচরণ আজ নাই। এখন যদি আমরা "সখা"কে ভাল করিয়া মানুষ করিতে পারি তবেই সে শোক নিবারণ হয়। অতএব পাঠক পাঠিকা তোমরা নূতন বছরে "সখা"কে সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন "সখা" প্রমদাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে।

অবশেষে যাঁহারা কৃপা করিয়া "সখা"তে লিখিয়াছেন, যাঁহারা ইহার উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহারা ইহার হইয়া অপরকে দুটো কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা নিজ নিজ বাড়ীতে ইহাকে স্থান দিয়াছেন, যাঁহারা মনে মনে ইহার শুভ ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই সকলকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এবং যিনি সকল প্রকার শুভ সংকল্পের চির সহায়, সেই পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমরা নববর্ষে আবার শিশুদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেছি।

রেড়ীর গাছ।

পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা রেড়ীর গাছ হয় ত দেখিয়াছ। এই রেড়ীর বিচি ঘানিতে বা কলে পিষিয়া যে তৈল বাহির হয় তাহাকেই আমরা সচরাচর রেড়ী বা ভেরেণ্ডার তৈল বলিয়া থাকি। রেড়ীর বিচি দুই প্রকার, ছোট ও বড়। ছোট বিচির তৈল

উৎকৃষ্ট ; ইহাই পরিষ্কার করিলে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে 'কাষ্টর অইল' বলা হইয়া থাকে। লোকে এই তৈল জোলাপের জন্য খায়। বড় বিচি হইতে যে নিকৃষ্ট তৈল বাহির হয় তাহাই পোড়াইবার জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু রেড়ীর তৈল যে আরও কত প্রকার কাজে লাগে তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। বিলাতে অনেক দোকানদার আছেন, তাঁহারা পরিষ্কার রেড়ীর তৈলের সহিত নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া মাথার চুলে লাগাইবার জন্য সুগন্ধি তৈল, সাবান ও পমেটম প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া থাকেন। আফ্রিকা দেশের নিগ্রো জাতি এই তৈলে রন্ধন করিয়া থাকে এবং আমাদের দেশে উড়ে জাতির অনেকেও গায়ে মাখিবার বা রন্ধন করিবার জন্য রেড়ীর তৈল ব্যবহার করে। রঙ্গীন বস্ত্রের রং উজ্জ্বল করিবার জন্য, ছিট কাপড়ের রং পাকা করিবার জন্য এবং "মরক্কো লেদার" নামক প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান চামড়া প্রস্তত করিবার জন্যও এই তৈল বিস্তর খরচ হয়। ইহা ভিন্ন কলের গাড়ি, কাপড়ের কল, বড় বড় কলের চাকা প্রভৃতি ভাল চলিবার জন্যও এই তৈল লাগান হয়। রেড়ীর গাছের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, যদি কোন ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এই গাছের বেড়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার শস্যে কখনও কোন প্রকার পোকা ধরে না। পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা ভারতবর্ষেই রেড়ীর চাষ অধিক, এই জন্য আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, রুষিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, সিংহল, চীন, মরীচ ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় ৩০।৩২ লক্ষ টাকার তৈল এবং ১১।১২ লক্ষ টাকার বিচি রপ্তানী হয়।

এতক্ষণ রেড়ীর বিচির তৈল সম্বন্ধেই অনেক কথা বলা হইল, কিন্তু তৈল ছাড়া আর একটী বিশেষ কাজের জন্য যে ভারতবর্ষে রেড়ীর চাষ হইয়া থাকে তাহা বলা হয় নাই। এই গাছ হইতে এক রকম মোটা ও মজবুত রেশম তৈয়ার হইয়া থাকে, উহাকে এরী এণ্ডী বা এরীণ্ডী রেশম বলে। আসাম দেশের অনেক স্থলে এবং বঙ্গদেশের কোন কোন জেলায় এইরূপ বিস্তর রেশম প্রস্তত হয়। ইহাতে পরিবার কাপড়, গায়ের চাদর প্রভৃতি কত রকম কাপড় হয়। এরী সুতা এতদুর মজবুত যে একজন লোক একখানি এরী সুতার কাপড় আমরণ ব্যবহার করিয়াও ছিঁড়িতে পারে না। কিন্তু রেশম কেমন করিয়া জন্মে? পাঠক পাঠিকাগণ! পর পৃষ্ঠায় এই যে দুইটী সুন্দর পতঙ্গের ছবি দেখিতেছ ইহারাই এই রেশম প্রস্তত করিয়া থাকে। এই পতঙ্গ কেমন করিয়া জন্মে তাহা কি জান? ভগবানের কেমন আশ্চর্য্য নিয়মকৌশলে ইহাদের জন্ম হয়, এবং ইহাদের জন্মাইবার উদ্দেশ্য কি তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়!

যে দুইটী পতঙ্গের ছবি দেওয়া হইল ইহাদের একটী পুরুষ ও অপরটী স্ত্রী। স্ত্রীজাতীয়ের শরীরের আয়তন পুরুষদিগের অপেক্ষা কিছু বেশী। পশু, পক্ষী কিম্বা কীট মাত্রই যেমন জন্মাইবার পর তাহাদের নির্দ্দিষ্ট খাদ্য খায় এবং শাবক প্রসবের পরেও বাঁচিয়া থাকে এই পতঙ্গ দেহের গতি সেরূপ নয়। ইহারা জন্মিবার তিন চারি দিন পরে গাছের ডাল ও পাতায় কতকগুলি রাশীকৃত * ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়। যে কয় দিন বাঁচে কোন খাদ্য খায় না। ডিমগুলি গাছের ডাল পালায় ছোট ছোট মুক্তার মত ঝুলিতে থাকে। এই ডিম হইতে ক্রমে খুব ছোট কৃমির আকারে এক

* এক একটী পতঙ্গের ডিম্বের সংখ্যা ৪০০ হইতে ৫০০।

রেড়ীর পতঙ্গ—পুং জাতীয়।
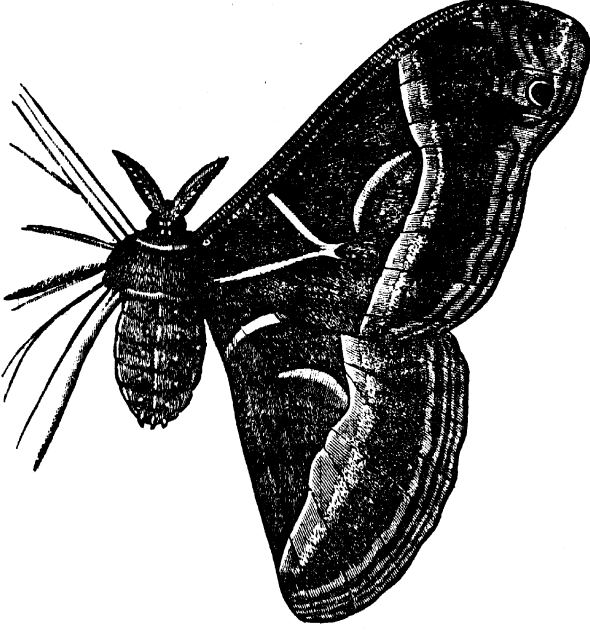
রেড়ীর পতঙ্গ—স্ত্রী জাতীয়।
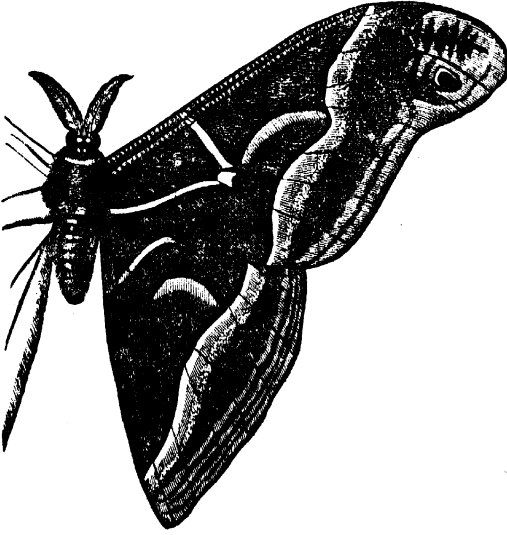
রকম পোকা বাহির হয়। প্রথম অবস্থায় পোকাগুলি দেখিতে খুব ছোট বটে, কিন্তু বড় হইলে এক একটী সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে। ছোট পোকাগুলি ৪ বার খোলোষ ছাড়িবার পর তবে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। খোলোষ ছাড়িবার অর্থ কি জান? পোকাগুলি যেমন শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে তাহাদের গায়ের চামড়া তত শীঘ্র বাড়ে না, সুতরাং শরীরটা বড় আর শরীরের আবরণটা ছোট হইয়া আসিলেই আবরণটী আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। বড় হওয়া পর্য্যন্ত পোকাগুলি কেবল পাতা খাইয়া বাঁচে। শেষ অবস্থায় অর্থাৎ চারিবার খোলোষ ছাড়িবার পর পঞ্চম বারে ইহাদের ক্ষুধা এত বাড়ে যে, তাহারা প্রথম অবস্থা হইতে চতুর্থ অবস্থা পর্য্যন্ত যতগুলি পাতা খায় এখন তাহার চারি গুণ পাতা খাইয়া ফেলে এবং এই খানেই তাহাদের খাওয়ার কার্য্য শেষ হয়। এখন ইহারা চুপ করিয়া এক জায়গায় বিশ্রাম করে। ইহাদের শরীরের উভয় পার্শ্বে ৯টী করিয়া ছিদ্র আছে। এক একটী ছিদ্রের কাছে একটী করিয়া গাঁটের মত ভাগ। ঐছিদ্র সকলের দ্বারা তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন হয়। যাহা হউক পোকাগুলি বিশ্রাম করিবার অল্পক্ষণ পরেই মাকড়সার মত মুখের দুই দিক হইতে এক প্রকার লালা বাহির করিতে থাকে, যাহা বাতাস লাগিলেই সূক্ষ্ম কেশের মত সূতায় পরিণত হয় এবং দুই গাছি সূতা আঠাময় হওয়াতে পরস্পর যুক্ত হইয়া যায়। এই সূতাকেই আমরা রেশম বলিয়া থাকি। এক একটী পোকার মুখ হইতে এত লালা বাহির হয় যে, সূতা প্রস্তুত করিতে করিতে ক্রমে পোকাগুলি সেই সূতার মধ্যেই চাপা পড়ে। এই অবস্থার নাম গুটী। গুটীর মধ্যেই পোকাগুলির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় যে দুইটী সুন্দর পতঙ্গের ছবি দেখিয়াছ এই গুটীর মধ্যেই পরমেশ্বরের সৃষ্টিকৌশলে তাহাদের জন্ম হয়। একটী পোকা হইতে মনুষ্যের অগোচরে কেমন মেরুদণ্ড, পাখা ও পা যুক্ত এক পতঙ্গ জন্মায়! কিন্তু নির্দ্দয় মানুষের হাতে পড়িয়া কত লক্ষ লক্ষ পতঙ্গই না মারা যায়! গুটীর ভিতর পতঙ্গ দেহের অবয়ব পূর্ণ হইলেই উহারা মুখ হইতে আবার এক রকম লালা বাহির করে যাহা দ্বারা কঠিন গুটীর মুখের দিকটী নরম হইয়া আইসে এবং ঐ নরম দিকটী কাটিয়া তাহা হইতে পতঙ্গ বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু গুটী ভেদ করিয়া পতঙ্গ বাহির হইলে তাহা হইতে মানুষের পয়সা রোজকার ভাল রকম হয় না। ভেদ করা গুটী হইতে সূতা তুলিবার সময় লম্বা লম্বা সূতা না হইয়া টুকরা টুকরা সূতা বাহির হয়। এই জন্য নির্দ্দয় মানুষ পয়সা রোজকারের খাতিরে গুটী ভেদ করিবার পূর্ব্বে গুটীগুলিকে লইয়া মধ্যস্থিত প্রায় সমস্ত পতঙ্গের প্রাণ বিনষ্ট করে। পরে সূতা পাইবার জন্য কেবলমাত্র কতকগুলি গুটী যত্নে রক্ষা করে; এই হইতেই কালে পতঙ্গ বাহির হয় এবং আবার ডিম দিয়া মরিয়া যায়।

রেড়ীর পতঙ্গ দুই প্রকার, শাদা ও সবুজ। শাদা হইতে লাল এবং সবুজ হইতে শাদা রেশম তৈয়ার হয়। ইহাদের গুটীর আকার ঠিক একটী আমড়ার আঁটির মত। গুটীর বাহিরের সূতা $\frac{১}{১৫০০}$ ইঞ্চি এবং ভিতরের সূতা $\frac{১}{১১৫০}$ ইঞ্চি মোটা। গুটীর উপরিভাগ খুব শক্ত,—সূতা সকল জমাট হইয়া থাকে,—এজন্য প্রথমে গুটীগুলাকে ক্ষারের জলে কিছুকাল ভিজাইয়া নরম করিতে হয় পরে হাতে করিয়া তুলা পিঁজার মত ইহা হইতে রেশম তুলিয়া চরকায় সূতা কাটিতে হয়। উত্তর আসামে এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ে বিস্তর ভেরেণ্ডা

গাছ জন্মে এবং আসামে যত এরিণ্ডী রেশম জন্মায় এমন অপর কোথাও নয়। সেখানকার ধনী, মধ্যবিত্ত ও অসভ্য পাহাড়ী লোকদিগের অনেকেই এই সূতা ব্যবহার করে। রেড়ীর রেশমের সূতা লামঞ্জিষ্ঠা ও নীলবড়ি প্রভৃতি দ্বারা রং করিয়া সেই রঙ্গীন রেশম নানা প্রকার রেশমী কাপড়ের জন্য অথবা মোটা মোটা সূতার কাপড় বা চাদরের উপর ফুল কাটিবার জন্য খরচ হয়। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে গয়া, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, দিনাজপুর, পুরী, পূর্ণিয়া, রংপুর ও সাহাবাদ জেলা সকলেও অনেক রেড়ীর রেশম তৈয়ার হইয়া থাকে। ডিম ফুটিয়া কীটের জন্ম হইতে গুটি বাঁধা পর্য্যন্ত ৩০ দিনের অধিক সময় লাগে না সুতরাং রেড়ীর পতঙ্গ হইতে বৎসরে ১২ বার রেশম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এক সের রেশমী সূতার দাম ৸০ আনা হইতে ১৲ টাকা।

পাঠক পাঠিকাগণ! দেখ্‌লে ত, যে সামান্য গাছ বনে জঙ্গলে কত জন্মায়, যাহাকে অনাদর করে হয়ত কত লোকে নষ্ট করে তাহা হইতেই মানুষের কত উপকার হয়। এত দিন তোমরা হয়ত অনেকেই ভেরেণ্ডার তৈল ছাড়া গাছের আর কোন গুণ জানিতে না; বল দেখি আজ তোমরা সেই সামান্য গাছ সম্বন্ধে কত নূতন কথা শিখিলে! এইরূপে আমাদের খাওয়া পরা বা নিত্য খরচের এক একটী জিনিসের গুণাগুণ ভাল করিয়া জানিয়া রাখিলে তোমাদের জ্ঞান কেমন বৃদ্ধি হয় এবং ভবিষ্যতে তোমরা কত কাজের লোক হতে পার। পরমেশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সকলই আমাদের উপকারের জন্য। আমরা যে ঘাস পায়ে মাড়াইয়া চলিয়া যাই তাহা দ্বারা পৃথিবীর কত কল্যাণ সাধিত হয় একবার তাহা ভাবিলে কেনা আশ্চর্য্যান্বিত হয়?

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর।

ত বর্ষে আমরা তোমাদিগকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত কিছু বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার গুণের কথা সমুদয় বলা হয় নাই। যে গুণের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে বিখ্যাত, সেটী দয়া। জগতের দীন দুঃখী, কাঙ্গাল, দরিদ্রদের বন্ধু এমন অল্পই আছে। জগতের দুঃখীদের দুঃখের কথা শুনিয়া কতবার যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষে জল পড়িতে দেখিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে সংখ্যা করিয়া বলিতে পারি না।

অনেক দিন হইল আমাদের বাসাতে পাড়ার একটী বালিকা খেলিতে আসিত। মেয়েটীর বয়স তখন আট কি নয় বৎসর। মেয়েটী অতি সুশ্রী ছিল, তাহার মুখখানি এমন সুন্দর যে দেখিলেই ভাল বাসিতে হয়। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাসাতে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে আসিতেন। একদিন তিনি সেই বালিকাটীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ বেশ মেয়েটী, কার মেয়ে হে!" আমরা বলি-

লাম"মহাশয় ওটী পাড়ার একটি নাপিতের মেয়ে। ওটী বিধবা।" যেই এই কথা বলা হইল, অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এত হাসি খুসি আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন, সে হাসি তাঁহার মুখ হইতে পলায়ন করিল; এবং আমরা দেখিলাম তাঁহার দুই চক্ষে দুইটী জলধারা গড়াইতেছে। তিনি মেয়েটীকে বলিলেন—"আয় মা আয়, আমার কাছে আয়," এই বলিয়া সেই নাপিতের মেয়েটীকে নিজ কোলে বসাইলেন, ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। আমরা কি স্বর্গের দৃশ্যই যে দেখিলাম, তাহা এই ১৬। ১৭ বৎসর পরে তোমাদিগকে ভাঙ্গিয়া বলিতে পারি না। তিনি সেই মেয়েটীকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইতে আদেশ করিয়া গেলেন। তদনুসারে পরদিন আমরা মেয়েটীকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইলাম। অপরাহ্নে দেখি, মেয়েটী পরম আদর লাভ করিয়া দুই জোড়া নব বস্ত্র পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তৎপরে তাঁহারই আদেশ ক্রমে আমরা বালিকাটীর পড়া শুনার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি এমন সময় তাহার মাতা তাহাকে লইয়া কোথায় সরিয়া গেল।

আর এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতার এক রাজাদের বারাণ্ডাতে বসিয়া বাড়ীর কর্ত্তাদের সহিত গল্প করিতেছেন। রাত্রি দুই চারি দণ্ড হইয়াছে। এমন সময়ে একটী পথভিখারী রাজাবাবুদের দ্বারে আসিয়া ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিতেছে। তাহার চীৎকারে বাবুদের বড়ই বিরক্তি হইতেছে। অমনি দ্বারবান গলা ধাক্কা দিয়া প্রহার করিতে করিতে তাহাকে দূরে লইয়া চলিল। ধনীর দ্বারে দরিদ্রের এই নিগ্রহ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। অমনি রাজা বাবুদের নিকট বিদায় লইয়া নামিয়া আসিলেন ও সেই পথভিখারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে বলিলেন—"দেখ্, তুই যদি আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করিস্ ত তোকে আমি একটা টাকা দি।" সে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন;—"তুই প্রতিজ্ঞা কর্ যে এ বাড়ীতে আর ভিক্ষা করিতে আস্‌বি না।" এই বলিয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়া কোন জাতি বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ নয়। বর্দ্ধমানে যখন এপিডেমিক জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব হয় তখন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর শুনিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন নাই। নিজের ব্যয়ে এক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া এবং শত শত লোকের মত ঔষধ ও পথ্য লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে গেলেন; এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর গরিব লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা অনেক সময় দেখিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক গাড়িতে করিয়া রাশীকৃত সাগুদানা, ও ঔষধ লইয়া ঘুরিতেছেন, হয় ত একটী মুসলমানের ছেলে তাঁহার কোলে কিম্বা একাসনে বসিয়া আছে। সে সময়ে তাঁহার পর-হিতৈষিতা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছিল।

একবার একটী ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসে। সেই রমণী উপরে আসিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বসিবার আসন দিয়া সবে এই কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন যে, "সহরে বড় বড় ইংরাজ

আছে, তাদের কাছে তোমরা কেন যাও না।” এমন সময়ে দেখিলেন স্ত্রীলোকটী অতিশয় হাঁপাইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে সে অনাথা বিধবা, তাহার পুত্র কন্যা অনেকগুলি, উপায় কিছু নাই। ইহার উপরে আবার তাহার শ্বাস কাশ হইয়াছে। অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন ও পরে তাহাকে সমুচিত অর্থ সাহায্য করিয়া বিদায় করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার কথা কি বলিব। সচরাচর দেখিতে পাই, লোকে যাহার প্রতি বিরক্ত থাকে, যাহার চরিত্র দেখিয়া ঘৃণা করে তাহাকে আর দয়া করিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি আশ্চর্য্য দয়া, যাহার চরিত্র দেখিয়া তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন তাহার অথবা তাহার স্ত্রীপুত্রের দুঃখের কথা শুনিলেও সুস্থির থাকিতে পারেন না। কলিকাতার একটী বড় মানুষের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুতা ছিল। ঐ বড়মানুষের একটী বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র পিতার সহিত বিবাদ করিয়া ও অন্যান্য অনেক অন্যায় কাজ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। সেই কারণে পিতার সহিত তাহার আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। সেই যুবক সপরিবারে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসে। আমাদের সহিত বালক কাল হইতে তাহার আত্মীয়তা ছিল, সুতরাং কলিকাতায় পৌঁছিয়া আমাদের বাসাতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কলিকাতায় আসিয়া তাহার পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এমন কি তাহার বাঁচার আশা ছাড়িতে হইল। এই গুরুতর পীড়াতে পড়িয়া সে যুবক একদিন বলিল—“তোমরা যদি পার, আমার পিতাকে একবার ডাকিয়া আন।” তাহার পিতার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল না। একে অপরিচিত, তাহাতে বড়মানুষ—আমাদের কথায় গরিবের কুটীরে কুপুত্রকে দেখিতে আসিবেন কেন? অপার ভাবনায় পড়িলাম। অবশেষে নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গিয়া ধরিলাম। তিনি ত প্রথমে আমাদিগকে তিরস্কার করিলেন, পরে বলিলেন “সে অতি অসৎ, সে পিতার সহিত অতিশয় উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছে, আমি তাহার চরিত্রের জন্য তাহাকে ঘৃণা করি, আমি কি করিয়া গিয়া তাহার পিতাকে ধরিব?” আমরাও ছাড়িবার পাত্র নই। অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের স্নেহের দায়ে সেই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর দিন তাহার পিতাকে লইয়া আমাদের বাসাতে আসিলেন। পিতা পুত্রে দেখা হইল; বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঁচিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ও তাহার রোগের শুশ্রূসার জন্য একটী পয়সাও নাই, অমনি তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। আমাদিগকে বলিয়া গেলেন “দেখিও উহার স্ত্রীপুত্রের যেন ক্লেশ হয় না, এবং চিকিৎসার যেন ত্রুটী হয় না, এজন্য কিরূপ খরচের প্রয়োজন আমাকে জানাইও।”

আজ এই পর্য্যন্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার বিষয়ে এরূপ গল্প অনেক আছে। যদি জানিতে পারি এই সকল গল্প “সখা”র পাঠক পাঠিকার ভাল লাগিতেছে, তাহা হইলে পরে আরও প্রকাশ করা যাইতে পারে।

খোকা মণি বড় খুসি, গাল ভরা হাসি
দেখে যা পাড়ার লোক কত শোভা রাশি!

সুন্দর মায়ের কোলে সুন্দর সন্তান!
কবি বলে, এই শোভা স্বরগ সমান।

আবদারে ছেলে।

সুন্দর খেলনা দেখে অন্য শিশু হাতে,
অবোধ শিশুর লোভ পড়িল তাহাতে।
দুই শিশু, হিত-কথা কেহই বোঝেনা,
এক জন যাহা চায় অন্যে তা ছাড়েনা।
হলো যে বিষম জ্বালা, কাঁদিল সন্তান,
কতই বুঝান মাতা, নাই দেয় কাণ।
মা তারে চাপেন বুকে, করেন চুম্বন,
লক্ষ্মী ছেলে, সোণামণি, বাপ, যাদু ধন,
কত কি বলেন মাতা, কোলেতে করিয়া,
এঘর ওঘর করে বেড়ান ঘুরিয়া।
এটী ওটী সেটী দেন তার হাতে তুলে,
আবদারে ছেলে মার কিছুতে না ভুলে।
আধ ভাষে সেই বুলি, সেই অশ্রু ঝরে,
'কি দিয়ে ভুলাই,' মাতা ভাবেন অন্তরে।
অবশেষে কাকাতুয়া আছিল যথায়
লইয়া প্রাণের ধনে চলেন তথায়।
এত যে ক্রন্দন তার, এত আবদার,
কি আশ্চর্য্য, পাখী দেখে কিছু নাহি আর!
মা বলেন,—"কাকাতুয়া," পাখী তাই বলে;
যে দিকে পেয়ারা যায় সেই দিকে চলে।
খোকা মণি বড় খুসি, গাল ভরা হাসি
দেখে যা পাড়ার লোক কত শোভা রাশি!
সুন্দর মায়ের কোলে সুন্দর সন্তান!
কবি বলে এই শোভা স্বরগ সমান।

চীনের গল্প।

আমি একখানা বড় মজার বই পড়িয়াছি। পড়িবার সময় পাঠক পাঠিকারা যদি কাছে থাকিতেন, তবে কত আমোদই পাইতেন। পড়িয়াছি, আর দুঃখ করিয়াছি, কাছে বসিয়া শুনিবার জন্য অধিক লোক নাই। বই খানাতে চীন দেশী লোকের কথা লেখা আছে। চীন দেশটা কোথায়, তাহা হয় তো তোমাদের অনেকেই জান। আর চীনেমানুগুলিকেও হয় তো অনেকেই দেখিয়াছ। সেই যে সাদা লোকগুলি; সেই যে, চ্যাপ্টা মুখ, খাঁদা নাক, মিট্‌মিটে চোখ, লম্বা টিকী, জুতো তৈরি করে, ছুতোরের কাজ করে, ওয়াং কোওং ওয়াঙ্‌ চু করিয়া কথা বলে, আফিম খায়, সেই লোকগুলি। চীনের লোকেরা খুব প্রাচীন কালে সভ্য হইয়াছিল। এরাই প্রথম অক্ষর কাটিয়া ছাপ তুলিতে শিখে। এরাই বারুদের সৃষ্টি করে। একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হইত বলিয়া এরা অনেক দিন হইল ঐ দেশ আর চীন দেশের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড দেয়াল দিয়া ফেলিল। সে এমনি দেয়াল যে তেমন আর পৃথিবীতে নাই। আমাদের দেশে এখনও অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস আছে যে, যত কল সব চীন দেশে তৈরি হয়। চীন দেশের লোকের মতন পৃথিবীর আর কোন জাতি এত ভাল ঘুড়ি উড়াইতে পারে না।

সেই পুস্তক খানাতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। এক একটা কথা এমনি হাসিবার

যে, পড়িবার সময় যে কত হাসিয়াছি তাহার তো কথাই নাই, এখন আমার 'চীনেমান্' গুলিকে দেখিলেই হাসি পায়। আগে চীনদেশী ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব, তার পর ইচ্ছা আছে মাঝে মাঝে চীন দেশী গল্পের ঝুড়ি খুলিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে আমোদ দিব।

বেটা ছেলেটী জন্মিলে চীন দেশী বাপ মা বড় খুসী হন, আর খুব ধুমধাম করেন। মেয়ে ছেলেটী যদি হইল তবে তাঁহারা বড় দুঃখিত। সেখানে মেয়েদের বড় অনাদর। অনেক পরিবারে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত রাখা হয় না; অনেক গুলি মেয়ে হইলে তাহাদিগকে ডাকা হয় 'একের নম্বর', 'দুয়ের নম্বর' ইত্যাদি। কোন কোন জায়গায় মেয়ে জন্মিলে পর তিন দিন তাহাকে মেজেতে ন্যাকড়া পাতিয়া তাহার উপর ফেলিয়া রাখা হয়। ইহার অর্থ, মেয়ে বড় হইলে ঐরূপ আদর পাইবে।

তিন দিনের হইলে ছেলেটীকে স্নান করান হয়। সেই স্নানের জলে বাপ মা কত জিনিসই মিশাইয়া দেন, মনে করেন ইহাতে ছেলে ভাগ্যবান্ হইবে। তার পর আর কিছু জল দিয়া ছেলেটীকে ধোওয়া হয়। এই জলে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মুদ্রা আর রূপা ফেলিয়া দেন—ছেলের খুব টাকা কড়ি হইবে। গায়ের রং ভাল হইবে বলিয়া ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার সাদা অংশটা গায়ে মাখাইয়া দেন। শেষে পেঁয়াজ দিয়া তাহার পাছায় আঘাত করা হয়; ইহাতে ছেলে খুব চালাক হইবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে লাল সূতা দিয়া তাহার হাত দুখানি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন কয়েক মাস ধরিয়া হাত এইরূপে বাঁধা থাকে। এরূপ করিলেই আর বড় হইয়া দুষ্টু ছেলে হইতে পারে না, আর ভয় পাইয়া হাত পা ছুড়িতে পারে না। দড়ীটা খুব লম্বা থাকে, সুতরাং ছেলে ইচ্ছামত হাত নাড়িতে পারে। মাঝে মাঝে হাতে পয়সা বাঁধিয়া দেন—এর কারণ, যদি ভূত টুত ছেলেটীকে উৎপাত করিতে আসে, তবে এই পয়সাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবে।

অল্প দিন পরেই ক্ষুর দিয়া ছেলের মাথার চুল চাঁছিয়া ফেলা হয়। তবেই চুল শীঘ্র শীঘ্র উঠে। চুল এক ইঞ্চি দু ইঞ্চি লম্বা হইলে বেশ করিয়া তাহাকে একটী ছোট ল্যাজের আকারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। টুপীতে একটী ছিদ্র থাকে, তাহার ভিতর দিয়া ল্যাজটী বাহির হইয়া থাকে।

মেয়ে ছেলের বেলা এ সব যত্ন কিছুই করা হয় না। অনেক স্থানে মেয়ে হইলেই তাহাকে মারিয়া ফেলে। তাহাদিগকে কেহ চায় না, তাহাদের আবার কে খাইতে দিবে! সাধারণতঃ তাহাদের বাবারাই এই নৃশংস কাজ করিয়া থাকে। গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেয়। অনেক নিষ্ঠুর লোক তাহাদের নবজাত মেয়েগুলিকে পোড়াইয়া মারে। অনেক ধনী লোক ও মাঝে মাঝে মনে করেন যে তাঁহাদের ঢের মেয়ে হইয়াছে, আর দরকার নাই। এর পর মেয়ে হইলে তাঁহারাও ঐরূপ মারিয়া ফেলেন।

এক জন কামারের ক্রমে দুইটী মেয়ে হইয়া দুইটীই নিতান্ত শিশু অবস্থায় মরিয়া গেল। কিছু দিন পর আর একটী মেয়ে হইল। বাপ মা মনে করিল যে এ আর কিছুই নয়,—একটা ভূত বার বার আসিয়া তাহাদিগকে উৎপাত করিতেছে। এটা কখনও ভাল ভূত নহে। এইরূপ যুক্তি করিয়া কামার অনেকগুলি কাঠ সংগ্রহ করিয়া

একটা বড় আগুন করিল, আর মেয়েটীকে তাহাতে ফেলিয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। শেষে তাহার শরীরের অঙ্গারগুলি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

আর একটী শিশু মেয়ের মা তাহাকে সমস্ত রাত্রি মেজেতে ফেলিয়া রাখিল। সকালে মেয়ের বাবা আসিয়া দেখিয়া তাহাকে ডুবাইয়া মারিবার জন্য জল আনিতে গেল। এর মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া এ সব দেখিল। সে মেয়েটীর বাবাকে বলিল 'তুমি একে মারিও না, একটু অপেক্ষা কর।' এই কথা বলিয়া সে এক জন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারিকার কাছে গিয়া খবর দিল। তিনি আসিয়া মেয়েটীকে নিতে চাহিলেন। মেয়ের বাবা তাহাতে কোন আপত্তি করিল না, সে ভাবিল আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি। বিবি তাহাকে লইয়া আসিলেন, এবং তাহাকে খুব যত্নে মানুষ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেয়েটী শীঘ্রই মরিয়া গেল।

ছেলে মেয়ে মরিয়া গেলে চীন দেশী লোকেরা মনে করে যে ছেলের বাবা অথবা তাহার পিতামহ কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছিল এবং তাহা দেয় নাই; সুতরাং সেই লোকটা মরিয়া ইহাদের ঘরে আসিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এত দিন তাহাদের পয়সা খরচ করাইয়া, তাহাদের অন্ন ধ্বংস করিয়া, এখন চলিয়াগিয়াছে। সুতরাং ছেলের অসুখ হইলে তাহাকে খুব যত্ন করা হয়, কিন্তু মরিয়া গেলেই মনে করে যে ঐরূপ একটা ভূত আসিয়াছিল, তাহাকে যত শীঘ্র ফেলিয়া দেওয়া হয় ততই ভাল। মৃত দেহটী বাড়ীর বাহিরে লইয়া যাইবার সময় তাহারা বাড়ী ঝাড়ে এবং পট্‌কা পোড়াইয়া ও ঘণ্টা বাজাইয়া ভূত তাড়াইতে চেষ্টা করে।

ছেলে মেয়ে হাটিতে শিখিলেই তাহাদিগকে কাজ করিতে শিখান হয়। চীন দেশের ছেলে মেয়েদিগকে এত বেশী কাজ করিতে হয় যে, বেচারীরা খেলা করিবার সময় পায় না। ছেলে বয়সেই বুড়াদের মত তাহাদের মুখ ব্যস্ত ও গম্ভীর হইয়া যায়। ৬।৭ বছর বয়স হইলে তাহাদিগকে পড়িতে শিখান হয়। চীন দেশে আমাদের ন্যায় অক্ষরের সাহায্যে শব্দ প্রস্তুত করিবার রীতি নাই। সেখানে প্রত্যেকটী কথার জন্য এক একটা নূতন চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। তোমাদের অনেকেই বাজার হইতে পট্‌কা কিনিয়া আনিয়া থাকিবে। পট্‌কার বাক্সের উপরে লাল কাগজে সোণার অক্ষরে কতকগুলি কি আঁকা থাকে তাহা দেখিয়া তোমরা হয় তো মনে করিয়া থাকিবে যে, ঐ বুঝি চীন দেশীয় কোনরূপ গাছের অথবা জাহাজের ছবি। কিন্তু বাস্তবিক উহারা এক একটী অক্ষর। ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে, ঐ প্রকার চেহারা বিশিষ্ট ততগুলি অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় হইলে তার পর মনে করিতে পার যে, ছেলের বর্ণ পরিচয় হইল। সুতরাং তাহাদের অক্ষর পরিচয় হইতেই জীবন যায়।

১৪।১৫ বছরের হইলে ছেলেকে স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। স্কুলে যাওয়ার পর হইতে সে খেলা করিতে পারিবে না। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া স্কুলে যাইবে আর সন্ধ্যার সময় তাহার ছুটী হইবে। তার পর কিরূপ গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতে হইবে তাহা চেহারা দেখিয়াই বুঝা যাইতে পারে। চেহারার একটী বিষয় নিয়া বোধ হয় তোমাদের কিছু গোলমাল লাগিয়াছে; উহাতে একটী থলিয়া আর একটী নল থাকিবার উদ্দেশ্য হয় তো অনেকেই বুঝিতে পার নাই। থলিয়াটীর ভিতর কি কি আছে আমি ভাল করিয়া জানি

না, তবে একটী দেশলাইয়ের বাক্স এবং কিঞ্চিৎ আফিম আছে একথা বলিয়া দিতে পারি। হাতের নলটী আফিম খাইবার যন্ত্র। ঐ জিনিসটী চেহারায় উঠিয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পার মাষ্টার মহাশয় ইহার কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; এবং ঐরূপ ব্যবহারের পর মাষ্টার মহাশয়ের মাথা কত দূর পরিষ্কার থাকে তাহাও একবার অনুমান করিয়া লইবে।

তোমরা পাঠ বলিবার সময় মাষ্টারকে সম্মুখে করিয়া পাঠ বলিয়া থাক; চীন দেশীয় ছাত্রদিগকে মাষ্টারের দিকে পৃষ্ঠ দেশ রাখিয়া পড়া বলিতে হয়। নহিলে মাষ্টার মহাশয় মনে করেন যে তাঁহার হাতের বই দেখিয়া ফাঁকি দিবে। ইহাতে তিনি যে ভয় করেন তাহারই সহায়তা হয়। কেমন করিয়া হয় বলিব না। চীন দেশের স্কুলে সচরাচর শাস্তি দেওয়ার নিয়ম নাই। নিল ডাউন করিয়া রাখা, মাথায় টোকা দেওয়া ইত্যাদি শাস্তি মাঝে মাঝে দেওয়া হইয়া থাকে। কখন কখন পূর্ণ এক কড়া জল তাহার মাথায় রাখিয়া তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলা হয়; এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়িলেই বেত খাইবার নিয়ম। সহজে যদি উপকার না হইল তবে মাষ্টার মহাশয় এক খণ্ড কাঠ লইয়া তাহার হাতে এবং পীঠে আঘাত করেন। তাহাতেও যদি না শুধরাইল তবে মাষ্টার মহাশয় এক বাঁশ লইয়া তাহার সাহায্যে ছাত্রকে সংশোধন করেন।

মেয়েদের জন্য স্কুল অতি অল্পই আছে। সাধারণতঃ মেয়েদিগকে স্কুলে দেওয়াই হয় না।

নাক ও চোকের বিবাদ।

"কার তরে চশমার হয়েছে সৃজন,"
এই লয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব করে দুই জন।
নাক বলে "তিল মাত্র বুদ্ধি আছে যার,
সে বুঝিবে চশমার দেখিয়া আকার।
অবশ্যই মোর তরে চশমা সৃজন,
নতুবা তাহার কেন এমন গঠন।
আমার উপরে কিবা খাপে খাপে বসে;
হাটো, ছোটো, উঠো বসো, কভু নাহি খসে!
আমাকে ছাড়িয়া শোভা থাকে কি তাহার,
আমাতে বসিলে তার কেমন বাহার।"
চোক বলে, "আমি যদি পাতা নাহি খুলি?
কি হেতু মানুষ তবে পরিবেরে ঠুলি?"
জলিয়া উঠিল নাক অগনি সমান,
রক্তিমা বরণ হ'লো রাগে কম্পমান।
"কেন মিছে এত কথা, বকিতেছ তুমি,
তোমা হতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠতর আমি;
আমি যদি নাহি থাকি, চলে কি ধরণী?
নিশ্বাস ঠেকিয়া লোক, মরিবে এখনি।
ফুলের গৌরব যত আমা হতে হয়;
গোলাপ, আতর, মান আমা হতে পায়;
আমি যদি নাহি থাকি, মানব নিচয়
কেমনে সুগন্ধি দ্রব্য করিবে নির্ণয়;
তুই বিনা বাঁচে জীব কাণা কহে তারে,
যা যা চোক্ কেবা তোরে পুছে এ সংসারে?"

জবাফুল সম চোক, হইল শুনিয়া,
থর থর কাঁপে পাতা, থাকিয়া থাকিয়া।
বলে—"নাক, কার কাছে করিস্ বড়াই,
দিন রাত কাছে থাকি অগোচর নাই।
ও দুটো বিবর তোর নর্দ্দমার মত,
কফ, শর্দ্দি জলকত বহে অবিরত;
নিদ্রা কালে তোর ডাকে ত্রাস লাগে প্রাণে,
ভাবিবে কলুর ঘানি যে বা নাহি জানে।
বলিলি মানের কথা এই তোর মান,
নাক মলা দিয়ে লোকে করে অপমান।
যার তুই, সেও তোকে কভু নাহি ছাড়ে,
শর্দ্দি হ'লে তোরে মলে যেথা সেথা ঝাড়ে।
বাক্য ব্যয়ে কাজ নাই, পাতা না মেলিব,
তোমার বড়াই কত, এখনি দেখিব।"
"তথাস্তু" বলিয়া নাক ছিদ্র বন্ধ করি,
বসিল রাগিয়া তবে, বিসম্বাদ করি।

বাধিল বিষম গোল, উঠিল ক্রন্দন রোল,
আর আর ইন্দ্রিয় ভিতরে;
"কিহল" "কিহল" ধ্বনি, হঠাৎ শ্রবণে শুনি,
ভয় হ'ল মানব অন্তরে।
আঁধারেতে কোন খানে পড়িয়া মরিবে প্রাণে
পদ তাই চাহেনা চলিতে;
সুমিষ্ট কি তিক্ত হায়, মুখেতে আনিয়া দেয়,
জিভ তাই চাহেনা খাইতে।
কিছু না বুঝিতে পারে, এক ছেড়ে আর ধরে,
হাত বলে একি হ'ল দায়;

কাণেরা বসিয়া দূরে, সঠিক বুঝিতে নারে,
ভাবিল পরাণ বুঝি যায়।
মুখ দিয়া পথ খুলে, নিশ্বাস সজোরে চলে,
হাঁ করিয়া রহিল আনন;
পেট বলে একি হল, অনাহারে প্রাণ গেল,
কেন আজি ঘটিল এমন।
রসনা ডাকিয়া তবে, বলিল ইন্দ্রিয় সবে,
এস ভাই কি দেখিছ আর!
এ বিবাদ ঘরে ঘরে, একারণে সবে মরে,
শালিসিতে করিবে বিচার।
সবে তাতে দিল সায়, নাক চোক সে সভায়,
রাজি হয়ে জানাল সম্মতি;
প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে, বসিল ইন্দ্রিয় সবে,
ধীরভাবে করিতে যুকতি।
মিটে গেল গোল পলাইল রোল,
সভায় সবার মতি,
সবে মিলে কাণে প্রধান আসনে,
বসাইল সভাপতি।
ছিদ্র খুলে দিয়া, বিনয় করিয়া,
বলে নাক খাঁট স্বরে;—
"শুন সবে ভাই, যার নাক নাই
কেমনে চশমা পরে?
তাই দ্বন্দ্ব করি, চশমা আমারি,
বিচার করিব মিলি,
নত করে ঘাড়, সভার বিচার,
লইব সঠিক বলি।"
পাতা দিয়ে খুলে, চোক এসে বলে,
"শুন শুন মোর যুক্তি,
যুক্তি শুনে সবে, বিচার করিবে
নির্দোষীরে দিবে মুক্তি।
দৃষ্টি হলে কম; করে উপশম,
এগুণ চশমা ধরে;
তাইত সকলে, দৃষ্টি ক্ষীণ হ'লে,
যতনে চশমা পরে।
দুপক্ষ শুনিয়া, বিচার করিয়া,
বল যাহা সত্য মোরে।"
দাঁড়াইয়া তবে, সুগম্ভীর রবে,
সভাপতি বলে জোরে;
শুন শুন সভাজন সভার বিচার,
অপরাধী নাকে আজি দিতেছি ধিক্কার।
দৃষ্টি ক্ষীণ চোক তরে, চশমা মানব পরে,
নাক শুধু নত ভাবে করিবে বহন,
নতুবা শরীর তার হইবে কর্ত্তন।

কুকুরের চাতুরী।

একটী ভদ্র লোকের কুকুর সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন এক বাড়ীতে রাত্রে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। কুকুরটী সঙ্গে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা আহারাদি করিতেছেন, কুকুরটী এক পাশের অন্ধকার ঘরে ঘুমাইয়া আছে। তিনি বাড়ী যাইবার সময় কুকুরটীকে দেখিতে পাইলেন না; ভাবিলেন, সে বুঝি চলিয়া গিয়াছে। একা ঘরে ফিরিয়া গেলেন। ওদিকে গৃহস্থের ভৃত্যেরা বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া সেই ঘর বন্ধ করিয়া নিদ্রা গিয়াছে। গভীর রাত্রে কুকুরের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া সে ভয়ানক বিপদে পড়িল। বাহিরে যাইবার পথ পায় না। যাহোক অনেক কষ্টে একটী জানালা আঁচড়া-

ইয়া খুলিয়া প্রায় একতলা সমান উচু জায়গা হইতে বাহিরে পড়িয়া সে দিন ঘরে গেল। তার পর আর একদিন রাত্রে তার প্রভুর সেই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। কুকুর ও তাহার সঙ্গে গিয়াছে। কিন্তু সে দিন ভদ্রলোকটী আসিবার সময় নিজের লাঠি ও টুপি খুজিয়া পান না। আলো ধরিয়া এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে করিতে দেখেন যে কুকুরটী লাঠি ও টুপিটী লইয়া গিয়া তাহার উপরে পা দুখানি রাখিয়া ঘুমাইতেছে। তখন বুঝিতে পারিলেন যে পূর্ব্ব রাত্রে ফেলিয়া যাওয়াতে সে এবারে ঐ যুক্তি খেলিয়াছে।

ধাঁধা।

নূতন।

১। তিন অক্ষরে এমন একটী স্থানের নাম কর যাহার প্রথম ও দ্বিতীয় একত্রে লইলে এমন একটী দ্রব্যের নাম হয় যাহা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছে এবং প্রথম ও তৃতীয় লইলেও সেই একই দ্রব্যের নাম; বলত সেই স্থানের নাম কি?

২। ৪০ জন লোক এক নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কতগুলি কায়স্থ ও কতগুলি মুসলমান। নিমন্ত্রণ কর্ত্তা ৪০ খানা পাতা দ্বারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ৩ খানা, কায়স্থকে ২ খানা এবং প্রত্যেক তিনজন মুসলমানকে এক খানা করিয়া দিয়া বসাইয়া দিলেন। এখন এই নিমন্ত্রণে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কতগুলি কায়স্থ ও কতগুলি মুসলমান উপস্থিত ছিল বল দেখি?

৩। এক দিন চন্দ্র বনের ধারে বেড়াইতেছিল, এমন সময় তাহার দাদা একটী র আনিয়া তাহার সহিত যোগ করিয়া দিলেন; দিবা মাত্র সে এক প্রকার শব্দ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিল। বলত কেমন করে?

৪। নানা বর্ণ ধরি আমি একই শরীরে।
কারো সঙ্গে নাহি থাকি মেঘ নীরে॥
ভানু বিপরীত দিকে যদি মেঘ হয়।
তখনি জানিবে সবে আমার উদয়॥

৫। ঘরে ঘরে নৃত্য করে, দেখিতে না পাই।
সর্ব্বক্ষণ তার কার্য্য রাত্রি দিবা নাই॥
স্মরণেতে ভয় হয় পরশনে নয়।
মিত্র কিন্তু হয় সেই, লোকে শত্রু কয়॥

৬। মাংস নাই, হাড় নাই আঙ্গুল আছে তার,
বল দেখি শিশু ভাই কি নাম তাহার।

৭। এক বর্ষ ধরে মোর কতই আদর,
এক বর্ষ পরে সবে করে অনাদর।
মোর মতে কার্য্য করে এক বর্ষ ধরে,
সময় হইলে গত, নাহি গ্রাহ্য করে।

৮। কি এমন আছে যাহা দেখিয়াছে সবে,
কিন্তু তাহা আর কেহ দেখিতে না পাবে।
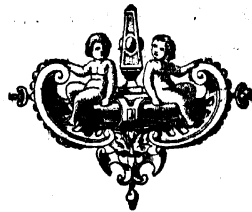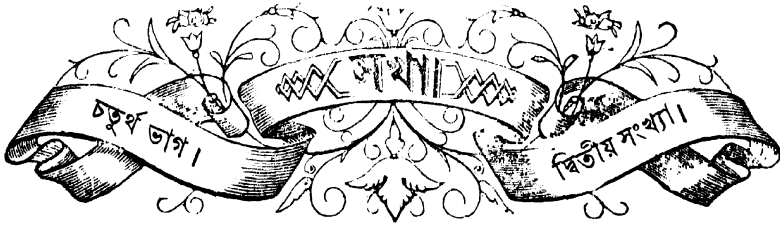
ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা।

রাত্রিকালে পূর্ণিমা তিথিতে আকাশের কেমন শোভা হয়! কিন্তু আবার যে দিন অমাবস্যা তিথি, সে দিন রাত্রি কি ভয়ানক অন্ধকার!

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, পূর্ণিমার রাত্রিতে যে সুন্দর চাঁদ দেখা যায় অমাবস্যার রাত্রিতে সে কোথা যায়? এ কথা কি কখন মনে উদয় হয়? আবার মধ্যে কয়দিন চন্দ্রের আকার ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া হইয়া শেষে একেবারে অদৃশ্য হয়; এবং অমাবস্যার পরে আবার ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি হইয়া পুনরায় পূর্ণচন্দ্র দেখা দেয়। প্রায় একমাসে একবার পূর্ণচন্দ্র হইতে কমিয়া অমাবস্যা ও অমাবস্যার পর হইতে বাড়িয়া পূর্ণিমা দেখা যায়। ইহার কারণ বোধ হয় তোমরা মনে মনে ভাবিতে পার নাই। আজ আমরা সহজ করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। প্রকৃতির মধ্যে এই রকম হাজার হাজার আশ্চর্য্য কাণ্ড সর্ব্বদাই আমরা দেখি। যিনি এই গুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন তিনিই বিদ্বান ও বড় লোক হইয়া থাকেন।

শিশু যে চাঁদকে "আই আই" বলিয়া হাত নাড়িয়া থাকে, লোকেও যে চাঁদকে নহিলে সুন্দর জিনিসের তুলনা দিতে পারে না, সেই শোভার আকর পূর্ণ-শশী কি? তোমরা এত কচি ছেলে নও যে, ঠাকুর মা তোমাদের চোকে ধূলি দিয়া বুঝাইয়া দিবেন—"চাঁদ একটা দেবতা" বা "চাঁদ স্বর্গের বাতি" ইত্যাদি। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারিদিকে এক বৎসরে ঘুরিয়া আসে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ইউরেনস্, নেপ্‌চুন্, প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহগণ যেমন ক্রমাগত সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় এক মাসে ঘুরিয়া বেড়ায়। চন্দ্র যদি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিত, তাহা হইলে উহার নাম ও গ্রহ হইত। কিন্তু একটী গ্রহের চারিদিকে বেষ্টন করে বলিয়া উহার নাম "উপগ্রহ" হইয়াছে। কখনও ভুলিওনা যে চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। উহা উপগ্রহ। অন্যান্য গ্রহগণের মধ্যেও কয়েকটীর উপগ্রহ আছে। বৃহস্পতির চারিটী উপগ্রহ আছে, শনির চারিদিকে আটটী উপগ্রহ পরিভ্রমণ করে, ইউরেনসের অন্ততঃ চারিটী, নেপ্‌চুনের একটী। ইহারাও চন্দ্রের মত স্ব স্ব গ্রহের চারিদিক বেষ্টন করে।

এইবার একটী কথা বলিব, তাহা হয়ত

তোমরা বিশ্বাস করিবে না। আর নয়ত বিশ্বাস করিলেও আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইবে। সে কথাটী এই যে,—চাঁদের আলো নাই, উহার নিজের একটুও আলো নাই! তোমরা বলিবে "সে কি? চাঁদের আলো নাই? সমস্ত পৃথিবী যে আলো করে, তাহার আলো নাই? চাঁদ কি তবে চুরি করিয়া আলো আনে?" আমরা বলিব যথার্থই চাঁদ চোর। ঐ যে আলো, ঐ যে হাসি,—উহার একটুও চন্দ্রের নিজের ধন নহে। সবটুকুই সূর্য্যের কাছ হইতে ধার করা। আমাদের পৃথিবীর যেমন নিজের আলো নাই, চন্দ্রও ঠিক তাহারই মত। ঠিক পৃথিবীর মত মাটি, পাহাড়, পর্ব্বত, গহ্বর, এই সকলে চন্দ্র পরিপূর্ণ। প্রভেদ এই যে সেখানে গাছ পাতা নাই—মানুষ প্রভৃতি জন্তু নাই, আর এ রকম বাতাস নাই। সে যাহাই হউক, কথাটা এই যে, চন্দ্র ঠিক পৃথিবীর মত জ্যোতির্ব্বিহীন জড়পিণ্ড, উহার আলো বা তেজ কিছুই নাই।

তবে চন্দ্র পূর্ণিমার রাত্রিতে তত আলো কোথায় পায়?—সূর্য্যের নিকট হইতে। পৃথিবী নিজে জ্যোতি-হীন হইলেও মধ্যাহ্নকালে যেমন সূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, উহার গাছ পাতা, পথ ঘাট, মাঠ প্রান্তর, পর্ব্বত সাগর, নদী হ্রদ সমস্তই যেমন এক কালে আলোকিত হইয়া ধপ্ ধপ্ করিতে থাকে, চন্দ্রের পক্ষেও ঠিক তাই। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বটে, কিন্তু সূর্য্যেরও আলো পায়। এই আলোকে চন্দ্রের জমি আলোকিত হইয়া ঝক্ মক্ করিতে থাকে। পৃথিবীর চারিদিকেই যেমন সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, যখন যেদিকে পড়ে সেইদিকে দিন হয় আর তাহার বিপরীত দিকে রাত্রি থাকে; চন্দ্রেরও যে দিকে যখন সূর্য্যকিরণ পড়ে সেই দিকে চন্দ্রের দিন, আর অন্য দিকে চন্দ্রের অন্ধকার রাত্রি। এখন বুঝিয়া দেখ, চন্দ্রের যেদিকে দিন হয় সেই দিকের আলো আমরা দেখিতে পাই। এই আলোককে জ্যোৎস্না বলে। একটী অন্ধকার গৃহের দ্বারের নিকটে রৌদ্রে একখানা ভিজা শ্লেট্ রাখিলে দেখিবে ঐ শ্লেটের ভিতর হইতে রৌদ্রের আভা ঘরের ভিতরে গিয়া লাগে ও তথায় একটা আলো হয়। এইরূপ আলোর নাম "প্রতিফলিত আলোক"। বাহিরে রৌদ্র থাকিলে ঘরের পাশের রাস্তা দিয়া যে সকল লোক চলে, তাহাদেরও প্রতিফলিত আলোক ঐ ঘরের দেয়ালে পড়িতে দেখা যায়। চন্দ্রের আলোক ও ঠিক ঐরূপ। চন্দ্রের উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে উহা উজ্জ্বল হয় এবং ঐ আলোকে সমস্ত চন্দ্র মণ্ডল আলোকময় হইয়া উঠে। তখন আর বুঝা যায় না যে, চন্দ্রের নিজের আলোক নাই।

উপরে বেশ বুঝা গেল যে চন্দ্রের আলো পরের। চন্দ্রের যে ভাগ সূর্য্যালোকে আলোকিত হয় তাহারই আলো আমরা দেখি। চন্দ্রে যদি মনুষ্য থাকিত তাহা হইলে আমাদের পৃথিবীকেও তাহারা ঐরূপ আলোকিত দেখিতে পাইয়া মনে করিত পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু বস্তুতঃ উহা তাহাদের ভ্রম হইত সন্দেহ নাই।

ভাল, যদি সূর্য্যের আলোকই চন্দ্রের আলোকের কারণ এবং সূর্য্যও ত প্রতিদিন আছে, তবে পূর্ণচন্দ্র একদিন বৈ আর দেখিনা কেন? এ প্রশ্ন তোমরা এখন করিবেই করিবে। আমরা ক্রমে তাহার উত্তর দিব। প্রথমে একটী কথা মনে করিতে হইবে। পৃথিবীর যেমন বার্ষিক গতি দ্বারা ইহা আপন মেরুদণ্ডে গাড়ীর চাকার মত একদিনে একবার ঘুরে; চন্দ্রেরও এই উভয় প্রকার গতি আছে। চন্দ্র প্রায় একমাসে পৃথিবীকে বেষ্টন করে, আবার ঠিক সেই সময়েই
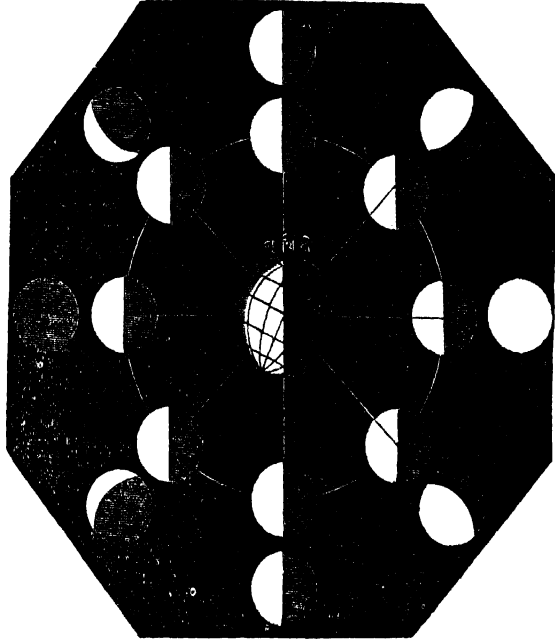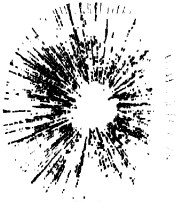
উহা আপন মেরুদণ্ডে একবার আবর্ত্তন করে। এই জন্য একটী বড় বিশেষ ঘটনা হয়। তাহা এই—আমরা পৃথিবী হইতে চন্দ্রের একটী মাত্র দিক দেখিতে পাই, কিন্তু উহার সকল দিকই সূর্য্যের দিকে ফিরে। এ বিষয়টী উদাহরণ ভিন্ন বুঝান যাইবে না। মনে কর ঘরের মধ্যে একটী গোল টেবিলে তুমি বসিয়া আছ, আর ঐ ঘরের কোণে গোপাল রহিয়াছে। আমি তোমার দিকে ফিরিয়া টেবিলটীর চারিধারে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছি। তা'হলে তুমি একবারও আমার পশ্চাৎ দিক দেখিতে পাইবে না, কিন্তু গোপাল আমার সকল দিকই দেখিতে পাইবে। বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিও। এখানেও ঠিক তাহাই হয়। গোপাল যেন সূর্য্য, তুমি পৃথিবী, আর আমি চন্দ্র। অর্থাৎ চন্দ্র এমনভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে পৃথিবীর দিকে তাহার একভাগ মাত্র থাকে, উহার আর আধ খানা পৃথিবী হইতে কখনই দেখা যায় না। কিন্তু সূর্য্যের দিকে চন্দ্রের সকল ভাগই ফিরিতে পারে। ইহাতে কি হয়, বুঝিতেই ত পারিতেছ :—সূর্য্যের আলোকে চন্দ্রের সকল দিকই পর পর আলোকিত হয়, কিন্তু আমরা চিরকাল পূর্ণিমা দেখিতে পাই না। চন্দ্রের যে আধ খানা আমাদের দিকে ফিরান, যে দিন সূর্য্যের আলোকে সেই দিকটা সমস্ত আলোকিত হয় সেই রাত্রিতে আমরা গোল চাঁদ খানি আলোকিত দেখিয়া তাহার নাম দিই পূর্ণিমা। আর যে দিন ঠিক বিপরীত দিকে সূর্য্যকিরণ পড়ে সে দিন আমরা

চন্দ্রের আলোকিত অংশের একটুও দেখিতে পাই না; সব টুকু আলোকিত অংশ আমাদের বিপরীত দিকে থাকে। সেই দিন সমস্ত রাত্রি অন্ধকার থাকে, আমরা বলি অমাবস্যার রাত্রি। এই দুটী দিন ছাড়া যে দিন চন্দ্রের আলোকিত অর্দ্ধাংশের যেটুকু আমাদের দিকে থাকে, সে দিন সেইটুকুই আমরা দেখিতে পাই। তাই বলি প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ইত্যাদি।* এ সকল দিনেও চন্দ্রের সেই অর্দ্ধভাগ পৃথিবীর দিকে থাকে, কিন্তু চন্দ্রের ত আর নিজের আলোক নাই, তাই ঐ অর্দ্ধভাগের যেটুকু সূর্য্যের আলো পায় সেই টুকুই দেখিতে পাই, বাকী টুকু দেখা যায় না। যেমন দিনের বেলা নক্ষত্র সকল আকাশেই থাকে অথচ, সূর্য্যের উজ্জ্বলতর কিরণে বায়ুমণ্ডল আলোকিত হয় বলিয়া ঐ সকল ক্ষুদ্র তারা দেখা যায় না; তেমনি চন্দ্রের খানিকটা ভাগের উজ্জ্বল আলোতে অন্ধকারময় ভাগটা দেখাই যায় না। তবু অমাবস্যার ২।১ দুএক দিন পরে যে কাস্তের মত সরু চাঁদ পশ্চিমদিকে উঠিতে দেখিয়াছি, তাহার উপরে অল্প আলোকিত চন্দ্রের অবশিষ্ট ভাগও দেখা যায়। ইহাতেই বুঝিতে পার যে চন্দ্রকে যে রাহুতে গ্রাস করে তাহা এই অন্ধকার বৈ আর কিছু নয়।

একটা অন্ধকার ঘরে একটী বাতি জ্বাল, ঐ বাতিটী তোমার পশ্চাতে রাখ, এবং তোমার সম্মুখে কিছু দূরে একটা বড় মাটির গোলা ধর। তাহলে ঐ গোলার সমস্ত গোল অংশটী তুমি আলোকিত দেখিবে। পূর্ণিমার দিনেও তাই হয়। সূর্য্য পশ্চিমে (অর্থাৎ পশ্চাতে) অস্ত গেল, আমাদের সম্মুখে (অর্থাৎ পূর্ব্বে) গোল হইয়া চন্দ্র উঠিতেছে। এই দিন চন্দ্রের যে ভাগ আমাদের দিকে থাকে, সূর্য্য তার সমস্তটাই আলোকিত করিতে পারে। আবার যদি তুমি ঐ গোলাটীর যে দিকে এখন আছ, ঠিক তাহার উল্টা দিক দিয়া গোলাটীর প্রতি চাও, দেখিবে যে তাহার সমস্তটা অন্ধকার হইয়া আছে; যেদিকটাতে বাতির আলো পড়িয়াছে সেদিকের সমস্তটাই তোমার বিপরীত দিকে। অমাবস্যার রাত্রে তাই হয়। তখন পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্র ও চলে, আবার সূর্য্য পূর্ব্বে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রও উদয় হয়। সেদিন চন্দ্র ঠিক পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে থাকে। তাই ঐ মাটির গোলার মত চন্দ্রেরও আলোকিত অংশ আমাদের বিপরীত দিকে থাকে। তৃতীয়তঃ—ঐ বাতি তোমার পশ্চাতে রাখিয়া গোলাটীকে যদি ঠিক তোমার বাম বা দক্ষিণ (ডান) দিকে একটু দূরে রাখিয়া দাও, তবে দেখিবে যে আলোকিত অংশের অর্দ্ধেক ভাগ তুমি দেখিতেছ, তাহার আকার ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রের মত। সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে ঠিক এইরূপ ঘটে। ঐ দিনে যখন সূর্য্য অস্ত যায় তখন চন্দ্র মাথার উপরে থাকে; মনে রাখিও এই তিথি অমাবস্যার পর। পূর্ণিমার পর সপ্তমীতে সূর্য্য উদয় হইবার সময়ে

---

* ছবি দেখ। মাঝ খানে পৃথিবী। তাহার চারিধারে চন্দ্র। পোনের দিনের ছবি দিলে অনেক গুলি হইয়া যাইত আর তোমরা ভাল বুঝিতে পারিতে না, তাই আট দিনের ছবি দেওয়া হইয়াছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার "দু সা'র চন্দ্র কি করিয়া হইল?" ইহার অর্থ এই :— ভিতরের সা'রটাতে চন্দ্রের যে অংশে আলো পড়িতেছে তাহা দেখান হইয়াছে। চন্দ্রের যে দিক পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে ঐ আলো সেই দিকের যে অংশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে আমরা তাহাই দেখিতে পাই; তাহার চেহারাটা কিরূপ দেখিতে হয়, বাহিরের সা'রে তাহাই আঁকা হইয়াছে। এক পাশে যে ছবিটি আঁকা হইয়াছে, তাহা সূর্য্য।

চন্দ্র মাথার উপর থাকে, সে দিন চন্দ্রও সূর্য্যের মধ্যে আধখানা আকাশ তফাৎ। কাজেই ঐ দিনে চন্দ্রের আকার ঐরূপ দেখা যায়। তা ছাড়া অন্য অন্য দিনেও যেরূপ কম বেশী দেখায়, আস্তে আস্তে ঐ গোলাটীকে তোমার চারিদিকে চন্দ্রের মত ঘুরাইলেই বুঝিতে পারিবে। যে পাঠক পাঠিকা সত্য সত্যই এরূপ করিয়া না দেখিবেন তিনি কখনই পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন না। আর পরীক্ষা দ্বারা বুঝিলে অতি সহজ হইয়া যাইবে। জ্ঞানলাভের জন্য যদি একটু কষ্ট করিতে হয় তাহাতে ভীত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। এই টুকু বুঝিতে পারিলে ক্রমে আমরা আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব; যদি এ বিষয়ে কাহার কোন সন্দেহ থাকে এবং শিক্ষক বা অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি তাহা দূর না হয় তবে তিনি আমাদিগকে লিখিলে সাধ্যমত তাহার উত্তর দিব।

আখ্যান মালা।

নং ১

আরব দেশে একটী গল্প আছে যে, একদিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইতেছে এমন সময়ে একটী উট ঝড় বৃষ্টিতে বহু কষ্ট পাইয়া একজন গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় পাই-বার জন্য বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছিলেন; উট যাইয়া বলিল— "মহাশয়! আমি সমস্ত দিন ঝড়ে ও বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছি, এখন আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটু স্থান দেন তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই।" গৃহস্বামী উত্তর করিলেন "আমার ঘরের স্থান বড়ই সংকীর্ণ; আমার থাকিবার স্থানই নাই, কেমন করিয়া তোমার মত অত বড় জীবের স্থান আমার ঘরে দিই?" উট কাতর স্বরে বলিল "সমস্ত শরীর আমি আপনার ঘরে রাখিতে চাহি না; কেবল আমার মুখটী রাখিবার স্থান দিন?" গৃহস্বামী উটের কাতরোক্তি শুনিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া উটের মুখ ঘরের ভিতর রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উট আবার বলিল "আমার মুখ খানি বেশ সুখে আছে কিন্তু আমার সমস্ত শরীরটা জলে ভিজিয়া অসাড় হইতেছে; যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও একটু স্থান দেন তাহা হইলে শরীরের অর্দ্ধেকটা ঘরে রাখিয়া একটু সুখে থাকিতে পারি।" বৃদ্ধ গৃহস্বামী উটের দুঃখে গলিয়া গেলেন এবং তাহার কথায় সম্মতি দিলেন। উট ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সমস্ত শরীরটী ঘরে রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল; ছোট ঘরে দুই জনে কিছু কাল বহু কষ্টে রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। তখন গৃহস্বামী উটকে বলিলেন—"ঝড় বৃষ্টি এখন থামিয়া গিয়াছে, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি হইতেছে মাত্র। এখন তুমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও, আমি আমার কাজে প্রবৃত্ত হই।" উট এই কথায় বলিল "তোমার যদি কষ্ট হয় তুমি বাহিরে যাইতে পার, আমার বাহিরে যাইবার কিছুই দরকার নাই।"

এই গল্পটী অনেক কালের, তবে ইহা হইতে যে গভীর উপদেশ পাওয়া যায় তাহার জন্যই এই

পারে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাতাসের চাইতে হাল্‌কা অন্য কোন জিনিস দিলেও ঐরূপ হইবে। তিনি কাপড়ের একটা বেলুন প্রস্তুত করিলেন। বেলুনের ভিতর হইতে বাতাস যেন পলাইতে না পারে, এই জন্য তাহাতে বেশ করিয়া ভাল আটা মাখাইয়া দিলেন। এই বেলুনের ভিতর জলজান বায়ু পুরিয়া তাহাকে শূন্যে উড়াইবেন সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পারিস্‌ নগরে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, '২৭ এ আগষ্ট (১৭৮৩) আমি একটা প্রকাণ্ড গোলাকার জিনিস শূন্যে ছাড়িয়া দিব; আর সে
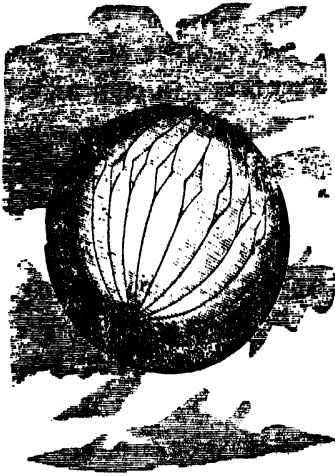
আপনা আপনি উর্দ্ধে চলিয়া যাইবে।' যে স্থান হইতে উড়াইবার কথা হইল, ২৭এ আগষ্ট সেখানে লোকে লোকারণ্য। যাহারা সেখানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই চার্ল্‌স্‌ সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে পক্ষী ফড়িং ছাড়া আর কোন জিনিস আপনা হইতেই উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। চার্ল্‌স্‌ সাহেবের গোলাকার জিনিসটা যখন উঠিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম উপদেশ প্রদানের যুক্তিও স্থির করিয়া আসিয়াছিল। নিরূপিত সময়ের একটু পূর্ব্বেই অনেকে অধৈর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন ছাড়িবার সময় হইল তখন যে দড়িদ্বারা বেলুন বাঁধাছিল তাহা খুলিয়া দেওয়া হইল; আর দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড জিনিসটা তিন হাজার ফিটেরও বেশী উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। দর্শকগণের মনে তখন কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ফ্রান্স্‌ দেশের একটী ছোট গ্রামে বেলুনটী পড়িল। সেখানকার লোকেরা মনে করিল, এটা না জানি একটা কি? উচ্চ হইতে নীচে পড়িবার সময় সকল জিনিসই লাফায়; বেলুনটাও সেইরূপ লাফাইতে লাগিল। সহরে যে বেলুন উড়ান হইয়াছে, এ গ্রামের অধিবাসিগণ তাহা জানিত না; সুতরাং এ সব দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে এ জানোয়ারটা একটা মস্ত পাখী বই আর কিছুই নহে। চারিধারে গণ্ডী করিয়া লোকের সার দাঁড়াইয়াছে; বুকের ভিতর একটু একটু গুর্‌ গুর্‌ করিতেছে। ইচ্ছা আছে জানোয়ারটীকে দুই একটা খোঁচা দিয়া তামাসা দেখে, কিন্তু সাহস হইতেছে না—পাছে ঠোক্‌রায়! শেষে কয়েকজন সাহসী লোক অনেক কষ্টে কোমর বাঁধিয়া অনেক বার অগ্রসর এবং অনেকবার পশ্চাৎপদ হইয়া অল্পে অল্পে তাহার কাছে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে খুব সাহসী সে খোঁচা দিবার উপযোগী একটা যন্ত্র হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। একবার এদিক একবার ওদিক হইতে সেই যোদ্ধা বিস্তর সংগ্রাম-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। শেষে সাহসে

নির্ভর করিয়া প্রাণপণে জানোয়ারের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিল; অমনি সেটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে লাগিল, আর যে দুর্গন্ধ—গ্রামবাসীরা রণে ভঙ্গ দিল। কিছু কাল পরে জানোয়ারটা যেন খুব গুট্‌কাইয়া গেল; তখন তাহারা মনে করিল যে এবারে আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে। অবিলম্বে জানোয়ারকে বন্দী করতঃ গ্রামবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন ইহা এতাবৎ কাল অপরিজ্ঞাত জন্তু বিশেষের চর্ম্ম।”

প্রথম বারেই এইরূপ সুন্দর ফল লাভ করিয়া চার্ল্‌স্‌ সাহেবের সাহস বাড়িল। তিনি আর
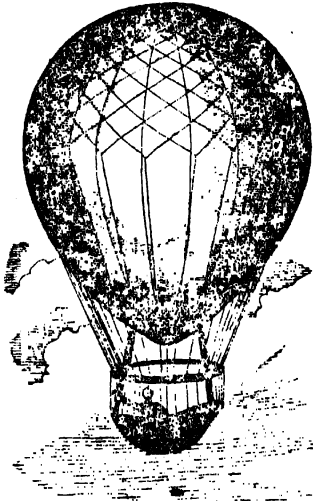
একটা বেলুন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশে উঠিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

ক্রমশঃ।

চন্দ্রমুখীর সাজা।

একজন ভদ্রলোক জানোয়ার পুষিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাড়ীতে তিন চারিটী কুকুর, একটী বানর, দুই তিনটী খরগোস, ও অনেকগুলি বিড়াল ছিল। ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে জায়গা বড় বেশী নয়। একটী ছোট উঠানে তাঁহার পালিত পশুগুলিকে সর্ব্বদাই খেলিতে হইত; সুতরাং তাহারা সকলে এক সঙ্গে খেলা করিত। সে বাড়ীতে কেহ বেড়াইতে আসিলে, আশ্চর্য্য হইয়া বলিত; বাঃ! বানর কুকুর বিড়াল খরগোসে একত্র খেলাইতে কখনও দেখি নাই।

সকলের বড় কুকুরটীর নাম ভুলো। সে একটী প্রকাণ্ড বিলাতি কুকুর, কিন্তু বড় ভাল মানুষ। সে বেচারা তাহার সঙ্গীদের অনেক উপদ্রব সহ্য করে। বানরটী তাহাকে কখনও কখনও ঘোড়া করে, তার ঘাড়ে চড়িয়া বসে, কখনও তাহার লেজ ধরিয়া টানে, কখনও তার কাণ মলিয়া দেয়। আবার কখনও বা আদর করে। ভুলো চারি হাত পা ছড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে, আর বানরটী তার উকুন বাছিয়া দেয়; তাহার লেজটী উলটিয়া পালটিয়া পরীক্ষা করে, তাহার তল পেট চুলকাইয়া দেয়, ভুলোর তাহাতে বড় আনন্দ। বানরটীর নাম মহাবীর। ভুলো মহাবীরের প্রতি বড় কৃতজ্ঞ। সে মাঝে মাঝে ভাল ভাল খাবার জিনিস পাইলে নিজে না খাইয়া মুখে করিয়া মহাবীরকে আনিয়া দেয়। বিড়ালগুলির মধ্যে একজন গিন্নী, অন্য গুলি তার ছেলে মেয়ে। তাহারা সেই বাটীতেই জন্মিয়াছে। মহাবীর তাহাদের সকলকেই কোলে পীঠে করিয়া মানুষ

করিয়াছে। ছানাগুলি যত দিন ছোট থাকে, মহাবীর তাহাদিগকে বড় ভাল বাসে। সর্ব্বদাই একটী না একটী ছানা বগলে থাকে। ছানাগুলির এমনি অভ্যাস হয় যে, তাহার মায়ের মুখে যেমন সুখে ঝোলে, মহাবীরের বগলেও তেমনি আরামে থাকে। মধ্যে মধ্যে মহাবীর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দুধের ঢাকা খুলিয়া ছানাগুলিকে দুধ পান করান। দুই একবার এইরূপ ধরা পড়াতে, তাঁহার কোমরের দড়ি প্রায় খুলিয়া দেওয়া হয় না। ছানাগুলি বড় হইলে মহাবীরের আর ততটা ভাল বাসা দেখা যায় না; তখন আর দিন রাত্রি বগলে করিয়া বেড়ান না কিন্তু তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকে। তাহারা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করিলে মহাবীর তৎক্ষণাৎ গিয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দেন।

খরগোস গুলি পথে ঘাটে লোহিত বর্ণ চক্ষু উল্টাইয়া শুইয়া থাকে; বিড়ালের ছানাগুলি তাহাদের লম্বা লম্বা কাণ লইয়া খেলা করে, তাহাতে তাহাদের বিরক্তি নাই। বিড়ালদের গিন্নীও কখনো কখনো আসিয়া খরগোস গিন্নীর কাছে শুইয়া লেজটী নাড়িয়া ছানাদিগকে খেলা দিয়া থাকেন।

কুকুরদের মধ্যে সকলের ছোট একজন আছে, তাহার নাম "পেমা"। সে কিছু লোভী। অন্য সময়ে সে বেশ খেলা করে, বেশ লাফায়, বেশ ছুটা-ছুটী করে। বিড়ালের ছানাদের মুখের কাছে খেউ খেউ করিয়া তাহাদের ছোট ছোট হাতের থাবার প্রহার খাইতে ভাল বাসে। মহাবীরের কাঠের ঘরের ছিদ্রের ভিতর মুখের অগ্রভাগ পুরিয়া দিয়া কৌতুক করে। এ সকল বেশ, কিন্তু আহারের সময় সে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে। যখন সে ক্ষুধাতে খেঁকি হইয়া থাকে, এবং আহার করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার নিকট যায়, কাহার সাধ্য! দশ হাতের মধ্যে একটী পায়রা চরিতে আসিলে তাহাকে তাড়া করে। তখন কাহারও নিস্তার নাই; ছোট বড় জ্ঞান নাই; সকলকেই কামড়াইতে যায়। এই জন্য তাহাকে স্বতন্ত্র খাবার দেওয়া হয় এবং তাহার সঙ্গীদের কেহই তাহার নিকটে যায় না। বেচারা ভুলো ভাল মানুষ, সে রাক্ষসের মত তাড়াতাড়ি নাকে মুখে কতক গুলো গিলিতে পারে না। এই জন্য পেমার জ্বালায় তাহাকে কখনও কখনও আধ পেটা থাকিতে হয়। কোন কোন দিন পেমার নিজের খাবারে পেট ভরে না, সে তাড়াতাড়ি আপনার খাবার খাইয়া ফেলিয়া ভুলোর পাত্র আক্রমণ করে, ভুলো বেচারা যখন দেখে যে ছোট ভাইটীর পেট ভরে নাই, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছে, অমনি মুখটী সরাইয়া লয় ও নিজের খাবার তাহাকে খাইতে দেয়।

এইরূপ কয়জনে সুখে বাস করিতেছে, একদিন কর্ত্তা বাবু একটী সুন্দর বিড়াল আনিলেন। তাহার রূপ অতি চমৎকার। চক্ষু দুটীতে যেন মাণিক জ্বলিতেছে; লোমগুলি নরম নরম, গলাতে পুঁতীর মালা, পেটের তলাটী মেজে-ণ্টার দিয়া রঙ্গান। দেখিলেই বোধ হয় বড় সুখী বিড়াল, যেন ননির পুতুলটী। ভিতরকার কথা এই, সেটী এক আঁটকুড়ো ঘরের বিড়াল। একটী বিধবা স্ত্রীলোক তাহাকে পুষিয়াছিলেন। তাঁহার আর কেহই ছিল না; সুতরাং দুধটুকু সরটুকু ঘরে যখন যাহা হইত সমুদায় "চন্দ্রমুখী" পাইত। ঐ বিধবা তাহাকে চন্দ্রমুখী বলিয়া ডাকিতেন। চন্দ্রমুখী সর্ব্বদাই লেপ ও বালিশের উপরে শয়ন করিয়া ঘোঁড় ঘোঁড় করিত। একটী দিনের জন্য কাদাতে পা দেয় নাই, বৃষ্টিতে ভিজে নাই। বৃষ্টি

আসিলে সে লেজটী গুটাইয়া পা ছুখানি পাতিয়া ঘরের দ্বারে বসিয়া বৃষ্টি দেখিত ও মাঝে মাঝে গা, হাত, পা চাটিত, জলের ত্রিসীমায় যাইত না। চন্দ্রমুখীর রুচিটী নবাবের মত হইয়াছিল। সে ছোটলোকের মত ডাল ভাত খাইতে পারিত না, ডাঁটা নাক দিয়া শুকিতও না; হয় দুধ না হয় মাছ দিয়া ভাত খাইত,তাও মাখিয়া না দিলে তাহা স্পর্শ করিত না। বিধবা নিজে মাছ খাইতেন না, কিন্তু চন্দ্রমুখীর জন্য ভাল ভাল মাছ কিনিয়া আনিতেন; সুতরাং চন্দ্রমুখী একলা ঘরের একলা মেয়ে, সে সেই সমুদায় মাছ একলা খাইত। এই রূপে সুখে স্বচ্ছন্দে চন্দ্রমুখীর দিন যাইতেছিল, হঠাৎ বিধবাটীর গুরুতর পীড়া হইয়া মৃত্যু হইল। সুতরাং চন্দ্রমুখী পরের হাতে পড়িল। আমাদের কর্ত্তা বাবুটী বড় জানোয়ার-ভক্ত; সুতরাং ঐ বিড়ালটী যত্ন করিয়া বাড়ীতে আনিলেন। কিন্তু আনিয়া যেই উঠানে ছাড়িয়া দিলেন, ভাবিলেন ভুলো ও মহাবীরের সহিত পরিচয় করিয়া দিবেন, অমনি চন্দ্রমুখী আর এক মূর্ত্তি ধরিল। ভুলো নিকটে আসিবা মাত্র লেজ ফুলাইয়া ও গায়ের লোম খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, পেমা নবাগত বন্ধুর সহিত কৌতুক চলিবে কিনা পরীক্ষা করিবামাত্র তাহাকে থাবা মারিল, এবং অন্য বিড়ালগুলিকে দেখিবামাত্র গর্জ্জন করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। গৃহস্বামী দেখিলেন বড় বিপদ; তাঁহার শান্তির সংসারে অশান্তি আসিল। ভাবিলেন সময়ে চন্দ্রমুখী একটু ভদ্রতা শিখিবে। দুই চারিদিন তাহাকে দূরে দূরে রাখিলেন, অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে সঙ্গীদের সহিত কোন ক্রমেই মিশিতে চাহিল না। পেমা খেলানে বালক, তাহার অগম্য স্থান বাড়ীতে ছিল না। চন্দ্রমুখী কোন কোণে বা বিছানার পার্শ্বে শুইয়া আছে পেমা সেখানে আসিত; আর চন্দ্রমুখী তাহাকে থাবা মারিয়া অপমান করিয়া তাড়াইত। গৃহস্থ মধ্যে মধ্যে সকলের খেলা দেখিবার জন্য সকলকে ঘরের মধ্যে আনিতেন, তখন চন্দ্রমুখী জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং বাড়ীর মধ্যে একপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিয়া থাকিত।

ক্রমে চন্দ্রমুখীর আরও অনেক বিদ্যা প্রকাশ পাইল। একটী খাঁচাতে গৃহস্থের একটী পাখী ছিল, তিনি তাহাকে স্নান করাইয়া মধ্যে মধ্যে মাটিতে রৌদ্রে বসাইয়া রাখিতেন। চন্দ্রমুখী তাহাকে ধরিবার জন্য খাঁচার উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়িত। গৃহস্থ দেখিয়া বলিতেন—হাঁ তাইত কোন গুণ নাই, এটীত বেশ আছে! চন্দ্রমুখীর দ্বিতীয় বিদ্যা চুরি করা। সে দুধের ঢাকা খুলিয়া মধ্যে মধ্যে চুরি করিয়া দুধ খাইত।

এক দিন চন্দ্রমুখীর স্বার্থপরতার প্রতিফল ফলিল। সেই দিন গৃহস্থ খেলা করিবার জন্য ঘরের মধ্যে পশুগুলিকে আনিবামাত্র চন্দ্রমুখী জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে দিন তাহার এত অসহ্য হইল যে, সে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাইবে মনে করিল। কিন্তু যেই যাইবার জন্য পথে বাহির হইল অমনি তীরের বেগে এক বিলাতি কুকুর আসিয়া একেবারে তাহার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল। সে কুকুরটী নিজের প্রভুর সহিত পথ দিয়া যাইতে ছিল, সে বড় দুরন্ত। চন্দ্রমুখীর বিপদ সূচক আর্ত্তনাদ উঠিবা মাত্র ভুলো গৃহের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া যখন দেখিল চন্দ্রমুখীকে বিনাশ করিতেছে, আর যেন তাহার উৎসাহ হইল না। সে নিজে বিলাতী কুকুর, গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল,

মনে করিলে চন্দ্রমুখীকে শক্রমুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত, কিন্তু তাহার যেন সে উৎসাহ হইল না। সে আসিয়া দেখিয়াই দূরে দাড়াইয়া রহিল ও আবার বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। গৃহস্বামী চন্দ্রমুখীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পান নাই; কেবল ভুলো হঠাৎ ছুটিয়া গেল কেন এই বলিয়া কারণ জানিবার জন্য দ্বারের দিকে যাইতেছিলেন, দেখিলেন ভুলো ফিরিয়াছে, তখন তিনিও ফিরিলেন। অবশেষে চাকরেরা চন্দ্রমুখীর রক্তাক্ত মৃত দেহ আনিয়া উপস্থিত করিল। গৃহস্থ বড় একটা দুঃখিত হইলেন না, বলিলেন "স্বার্থপর বিড়ালটা আচ্ছা সাজা পাইয়াছে।" চন্দ্রমুখী যে মরিল তাহাতে কাহারও এক বিন্দু কষ্ট হইল এরূপ বোধ হইল না। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, "আচ্ছা যে ভুলো সে দিন পেমাকে বাঁচাইবার জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে সে আজ কিছু বলিল না কেন?" ভুলো মনে মনে ভাবিল "যে আমাদিগকে দেখিতে পারেনা, তাহার জন্য মরিব কেন?"

এইত দেখিলে চন্দ্রমুখীর দশা। ভুলোর মৃত্যু শয্যার ছবি একবার দেখ। কিছুদিন পরে বেচারা ভুলোর কি এক প্রকার পীড়া হইল; আহার করিতে চায় না, সর্ব্বদা বমন করে, যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে; গায়ের লোম গুলি ঝরিয়া যাইতে লাগিল; পোকার কামড়ানিতে সর্ব্বদা মাটিতে গা ঘষিত, বাড়ী শুদ্ধ সকলের অসুখ। পেমা আগে বুঝিতে পারে নাই, ভাবিয়াছিল বুঝি সুখ করিয়া শুইয়া আছে। কিন্তু শেষে যখন বুঝিল যে ভুলো পীড়িত তখন আর কাছ ছাড়েনা, সর্ব্বদা আসিয়া শুঁকিয়া থাকে। মহাবীর বড় অপ্রসন্ন। গৃহস্বামীর ত কথাই নাই, তিনি স্বয়ং স্বহস্তে সাবান দিয়া ভুলোর গা পরিস্কার করিয়া দেন; তাঁহার কন্যাগণ পোকা বাছিয়া দেয়; তাঁহার গৃহিণী ভুলোর মুখে চুম্বন করেন, বলেন—"বাপধন! তোমার কি হয়েছে? অমন করে পড়ে আছ কেন।" যে সময়ে ভুলোর প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিল, তখনকার কি ভাব! সমুদায় পশুগুলি বিষণ্ণ বদনে চারি দিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, গৃহস্থের চক্ষে জলধারা বহিতেছে; বাটীতে ছেলে মেয়ে মরিলে বাটীর লোক যেমন কাঁদে তেমনি গৃহস্থের পত্নী ও কন্যাগণ কাঁদিতেছেন। স্বার্থপর চন্দ্রমুখীর মরণে কেহ একটী নিশ্বাসও ফেলে নাই; আজ ভুলোর মৃত্যুতে কত লোকের চক্ষে জল পড়িতেছে।

চন্দ্রমুখী ও ভুলো, এই দুই জনের মধ্যে পাঠক পাঠিকাগণ কাহাকে অধিক ভাল বাসিলেন জানিলে সুখী হইব।

(প্রাপ্ত।)

চোর বিড়াল।

১

এক বাটী দুধ রেখে ভাঙা ডালা-তলে,
"ঘোষ পিসী" গিয়াছে কোথায়।
"সুসময়" বুঝি পুশি চুপে চুপে চলে,
উপনীত হইল তথায়।

২

এদিক ওদিক চেয়ে লোক নাহি হেরি
বিড়ালের কি আনন্দ আজ।
"জয় জনার্দ্দন!" বলি চক্ চক্ করি
আরম্ভিল আপনার কাজ!

৩

"চক্ চক্" সব গেল, আধা দুধ যায়
হায় হরি! পাপীর কপালে
সুখ ভোগ কখনই চিরস্থায়ী নয়,
তাই চারু এল হেন কালে!

৪

চারু সে "দুরন্ত ছেলে" জল খেতে এসে
দেখিল সকল পাতি আড়ি,
নিকটে আছিল লাঠি তাই লয়ে ক'সে
মারে এক দোহাত্তিয়া বাড়ি!

৫

"মেও মেও" করে পুশি বাটী ছেড়ে যায়
বড়ই লেগেছে গায়ে ব্যথা,
রাগ ক'রে কতবার চারু পানে চায়
হতভাগা কেন এল হেথা!

৬

ভাবে পুশি চারু গেলে বুঝিব আবার
নাহয় সহিব আর বাড়ি
কেমনে ভুলিব আহা! ও দুদের তার
কেমনে যাইব বাটী ছাড়ি?

৭

চারু বলে, চোর পুশি! কি সাহস তোর,
দিন দু পহরে কর চুরি?
আর এক বাড়ি দিয়ে ঘুচাইব জোর
চোরে আমি বড় ঘৃণা করি!

৮

শোনেনি বোঝেনি যেন, এইরূপে পুশি
মধুর করুণ গীতি গায়;
তবু চারু চলে যাবে ভেবে মহা খুসি!
তবু সেই বাটী পানে চায়!

৯

হেনকালে—যে কুকুরে চারু ভালবাসে
সেই এসে উঠানে ডাকিল
কুকুরে হেরিয়া চারু স্নেহভরে হাসে
দুদ টুকু তারে নিয়ে দিল।

১০

তখন নিরাশ চিতে বিড়াল বুঝিল
"পাপ আশা,—তাই পুরিল না!
চোর বলি চারু মোরে এতই মারিল
আর আমি চুরি করিব না।"

১১

দু একটী ছেলে আছে বিড়ালের মত
দিবা নিশি কত সাজা পায়
আপনার দোষে হায় রোগ ভোগে কত
তবু তারা চুরি ক'রে খায়।
আমারে মনের কথা চুপে চুপে কও
পাঠক পাঠিকা! ভাই তোমরা তো নও?

কেমন ছবি এঁকেছি?

য়ারাম কলিকাতার সিটি স্কুলে পড়ে। পাঠকদিগের মধ্যে যাহারা সিটি স্কুলে পড় তাহারা জান যে সিটি স্কুলে চিত্র বিদ্যা (drawing) শিক্ষা

দেওয়া হয়। আমাদের গয়ারাম কখনও চিত্রের ক্লাসে যায় না, চিত্র কাহাকে বলে তাহাও জানে না; অথচ তাহার মনে মনে একটা ভারি অহঙ্কার আছে যে, সে ইচ্ছা করিলেই ভাল ছবি আঁকিতে পারে। গয়ারামের সকল দিকেই এই রকম; সে ক্লাসে বসিয়া পড়ার সময় গল্প করে, শিক্ষক পড়া জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ করিয়া থাকে, একটী কথাও বলিতে পারে না; শিক্ষক তিরস্কার করেন, সে চুপ করিয়া শুনে। অথচ তার মনে মনে অহঙ্কার আছে যে, সে সব জানে; তবে যে শিক্ষকের নিকট প্রত্যহ সে গালি খায় সে তাহার কপালের দোষ। একদিন তাহাদের ক্লাসের নরেন্দ্র একটা ঘোড়ার ছবি আঁকিয়াছিল; ছবি খানি এত সুন্দর হইয়াছিল যে, সকলেই তাহাকে খুব প্রশংসা করিল, এমন কি শিক্ষক মহাশয় পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের গয়ারামেরও বড় সাধ হইল, সে ছবি আঁকিয়া সকলের প্রশংসা লইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গয়ারাম কখনও ছবি আঁকে নাই, কিন্তু তাহার বিশ্বাস, সে ইচ্ছা করিলেই ছবি আঁকিতে পারে; এখন এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সে ছবি আঁকিতে বসিল; নরেন্দ্র ঘোড়া আঁকিয়া বাহবা লইয়াছে, গয়ারামের ইচ্ছা হইল সে মানুষের ছবি আঁকিয়া আরও অধিক প্রশংসা লইবে। যে কখনও ছবি আঁকে নাই, সে যে একেবারেই মানুষ আঁকিবে তাহা কত অসম্ভব তাহা সহজেই বুঝিতে পার; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি গয়ারামের অহঙ্কার বড় বেশী, তাই সে একেবারেই মানুষ আঁকিতে

বসিয়াছে। বাঃ! কি চমৎকার ছবিই হয়েছে! যেমন বিদ্যে, তেমনিই হয়েছে। ক্লাসের ছেলেরা ত হো হো ক'রে হেসে হাত তালি দিতে লাগিল।

আমাদের গয়ারামের বুদ্ধি একটু মোটা, সে ঠাট্টা বুঝিল না, ভাবিল বুঝি তাহারা বাহবা দিতেছে। আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যদি গয়ারামের মত কেহ থাক তবে দেখিয়া শেখ। শুধু ছবি আঁকা কেন, সকল দিকেই এই রকম গয়ারাম দেখিতে পাওয়া যায়। নিজে যাহা জান না তাহার অহঙ্কার করিও না, গয়ারামের মত তোমা-

কেও দেখিয়া সকলে হাসিবে। নিজের যাহা আছে তাহা অপেক্ষা আপনাকে বড় মনে করিও না, করিলে পদে পদে ঠকিবে; প্রশংসা পাইবার জন্য কোন কাজ করিবে না, প্রশংসার আশায় কাজ করিলে তাহাতে কখনও প্রশংসা পাওয়া যায় না। তার পর ভাল ছবিই আঁকিতে চাও, আর ক্লাসের সকলের চেয়ে পড়া শুনাতেই ভাল হইতে চাও, বা খুব বড় পদ পাইয়া সকলের মান্য গণ্য হইতে চাও, দশ জনের এক জন হইতে চাও, তবে কয়েকটী কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহাই করিতে চাও, প্রথমতঃ খুব আগ্রহ,—ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা দরকার; তার পর সেই কাজ করিবার নিমিত্ত যত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকা দরকার। তার পর যাহা করিবে গোড়া হইতে আরম্ভ করিবে, একেবারেই গাছের ডগায় উঠা যায় না, পত্তন ভাল না হইলে কোন কাজই হয় না। তার পর আরও একটী চাই, সেটী ধৈর্য্য; ব্যস্ত হইলে কোন কাজ হয় না, ধীরে ধীরে কাজ করিতে হয়, একবারে না হইলে দশ বার চেষ্টা করিতে হয়; এইরূপে তবে লোকে বড় লোক হয়। নতুবা আমাদের গয়ারামেরও যে দশা তোমাদেরও সেই দশা হইবে।

শাক্য মুনির ক্ষমা।

শাক্য সিংহ বলিতেন, "মূর্খতা বশতঃ কেহ যদি আমার প্রতি মন্দ আচরণ করে, তৎপরিবর্ত্তে আমি তাহাকে প্রেমের শীতল আশ্রয় প্রত্যর্পণ করিব। তাহা হইতে যত অন্যায় ব্যবহার আসিবে, আমা হইতে ততই সদ্ভাব বাহির হইতে থাকিবে। এই সদনুষ্ঠানের সুঘ্রাণ আমার পক্ষে সর্ব্বদা সুফলপ্রদ, কিন্তু নিন্দুকের বিদ্বেষ বচনের মন্দ ফল তাহারই নিকট পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে।"

"সদ্ভাবের দ্বারা অসদ্ভাব জয় করিতে হইবে" এই উপদেশ তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়া কোন দুষ্ট লোক একবার তাঁহাকে অপমান করে; তাহার অপমান করা শেষ হইলে মুনিবর দুঃখের সহিত বলিলেন, বৎস! কোন ব্যক্তি কাহাকে কোন সামগ্রী উপহার দিবার কালে যদি ভদ্রতার নিয়ম বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে এইরূপ বলিবার রীতি আছে যে, 'তুমি ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও।' পুত্র, এক্ষণে তুমি আমার অবমাননা করিলে, কিন্তু আমি তোমার কুব্যবহার গ্রহণে অসম্মত হইতেছি; তোমার নিজ দুঃখের কারণ এই ব্যবহার তুমি ফিরাইয়া লও। যেমন ঢাকের সহিত শব্দ এবং বস্তুর সহিত ছায়া অবস্থিতি করে, পরিণামে দুরাচারীর পশ্চাতে তেমনি দুঃখই নিশ্চয় অনুসরণ করিবে। আকাশের দিকে চাহিয়া থুথু ফেলিলে তাহা দ্বারা স্বর্গ যেমন কলঙ্কিত হয় না, দুষ্ট লোকের নিন্দা অপমানে তেমনি সাধুর কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না।" মুখের একটী কটু কথা সহ্য করিতে না পারিয়া কত লোক ক্রোধে পাগল মত হয়। কিন্তু শাক্যের কেমন আশ্চর্য্য ক্ষমা গুণ! তিনি জ্বলন্ত ক্রোধানলে ক্ষমার জল ঢালিয়া দিতেন, এবং শান্তভাবে লোকের কটু বাক্য সহ্য করিতেন।

মন পরীক্ষা।

একজন লোক মনে মনে যাহা ভাবিতেছে আর একজন তাহা বলিয়া দিতে পারে; তোমরা বোধ হয় ইহা কল্পনাও করিতে পার না।

বিলাতে অনেক লোক আছেন যাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন; সম্প্রতি একজন সাহেব এখানে আসিয়াছেন, তিনি মনের কথা বলিয়াদিতেছন। যে কোন লোক যে কোন বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হউন না কেন, তিনি তাহা বলিয়া দিতে পারেন। এ বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য এখানে অনেক সভা হইয়া গিয়াছে; এবং যাঁহারা মন পরীক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই মনের কথা উক্ত সাহেব ঠিক বলিয়া দিয়াছিলেন। এ বড় আশ্চর্য্য ক্ষমতা! কি করিয়া এইরূপ পারা যায় আমরা তাহা বলিতে অক্ষম।

তোমাদিগকে একটী সংকেত শিখাইয়া দিতেছি; তোমাদের মধ্যে কেহ একটী অঙ্ক মনে ভাবিলে তোমরা এই সংকেত অনুসারে তাহা অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারিবে।

মনে কর তুমি এবং নেপাল একস্থানে খেলা করিতে বসিয়াছ; তুমি নেপালকে একটী অঙ্ক ভাবিতে বল এবং সে যে অঙ্ক ভাবিবে তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিতে বল এবং গুণফলের সহিত ১ যোগ করিতে বল। যোগফলকে আবার তিন দিয়া গুণ করিয়া যাহা মনে মনে ভাবিয়াছে তাহা দ্বারা যোগ করিতে বল; যোগ ফল যাহা হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে এবং তুমি মনে মনে শেষের অঙ্কটি বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহাই বলিয়া দিবে 'যে তুমি ইহা ভাবিয়াছ।'

দৃষ্টান্তঃ :—

মনে কর নেপাল ভাবিয়াছে ১১

১১ × ৩ = ৩৩

৩৩ + ১ = ৩৪

৩৪ × ৩ = ১০২

১০২ + ১১ = ১১৩

১১৩ হইতে শেষের অঙ্কটি অর্থাৎ ৩ মনে মনে বাদ দিলেই ১১ থাকিল।

অনেক প্রকার উপায় আছে যাহা দ্বারা পরে যে অঙ্ক মনে ভাবিতেছে তুমি তাহা বলিয়া দিতে পার। একটী নিয়ম মাত্র এবারে প্রকাশিত হইল। ইহা ভিন্ন অন্য কোন নিয়ম কেহ আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহা প্রকাশ করিব। এবং যাঁহারা ঠিক উত্তর দিতে পারিবেন তাঁহাদের উত্তর ধাঁধার উত্তরের সহিত পরিগণিত হইবে।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। কানন; ২। ব্রাহ্মণ ৫ জন, কায়স্থ ৮ জন ও মুসলমান ২৭ জন; ৩। ইন্দু + র = ইন্দুর; ৪। রামধনু; ৫। মৃত্যু; ৬। দস্তানা; ৭। নূতন পঞ্জিকা; ৮। গতকল্য।

নূতন।

১। বলত ৪৫ কে কিরূপ ভাবে সাজাইলে ৪৫ হইতে ৪৫ বিয়োগ করিলে ৪৫ অবশিষ্ট থাকিবে?

২। উত্তর করয় শুধু কে আছে এমন
কোন প্রশ্ন কাহাকেও না করে কথন।

মার্চ্চ, ১৮৮৬।
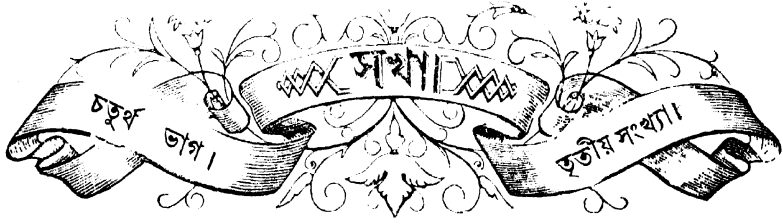
জোসেফ ম্যাট্‌সিনি।

খার পাঠক পাঠিকা! যে মহাত্মার ছবি আজ তোমরা দেখিতেছ, ইনি আমাদের দেশের লোক নন। তোমরা কি ইটালী দেশের নাম শুন নাই? শুনিয়াছ বৈ কি? ভূগোলে নিশ্চয় পড়িয়াছ। যদি না পড়িয়া থাক, তবে ইহাঁর এই জীবন-চরিত পড়িবার পূর্ব্বে একবার এটলাস খানি খুলিয়া ইউরোপের ম্যাপটী দেখ। ঐ ম্যাপে ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে তিনটী উপদ্বীপ দেখিবে, তাহার সকলের পশ্চিম ধারেরটী স্পেন ও পোর্টুগাল; মাঝেরটী ইটালী ও সকলের পূর্ব্বটী গ্রীস দেশ। এই ইটালীদেশ দেখিতে বিলাতী শিকারীর বুট জুতার ন্যায়। ইটালী দেশে অন্বেষণ করিতে করিতে টাইবার নামে এক নদী ও তাহার তীরে রোম নামে এক নগর দেখিতে পাইবে। আগে অনুসন্ধান কর, আমরা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিতেছি।

পাইলে কি? ঐ রোম নগর এক সময়ে ভুবন-বিজয়ী ছিল। রোমের লোকদিগকে রোমান বলিত। রোমানগণ সাহসে ও পরাক্রমে জগতের সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাদের সাহস ও দেশ-হিতৈষিতার অনেক আশ্চর্য্য গল্প আছে, যাহা শুনিলে তোমরা অবাক হইয়া যাইবে, এবং স্বদেশকে কিরূপে ভাল বাসিতে হয়, তাহা বুঝিতে পারিবে। সে সকল গল্প শুনিতে শুনিতে তোমাদের মাথার চুল দাঁড়াইয়া উঠিবে। কিন্তু এবার সে সকল গল্প করিতেছি না। মনোযোগ পূর্ব্বক যদি তোমরা 'সখা' পড়, ক্রমে সে সব শুনিতে পাইবে। যাহা হউক রোমানগণ অতিশয় সাহসী, বীর ও দেশ-হিতৈষী জাতি ছিল। তাহারা অপর জাতির দাসত্ব সহ্য করা দূরে থাকুক, নিজেদের রাজাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। রোমে রাজা ছিল না; প্রজারাই আপনারা রাজ্য শাসন করিত। ক্রমে রোমানেরা দেশ বিদেশ জয় করিয়া জগতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তখন ইটালীর বড় সৌভাগ্যের অবস্থা ছিল। রোমের নামে জগতের সকল দেশ কাঁপিয়া যাইত। ইটালী কোন বিদেশীয় রাজার অধীন ছিল না। কিন্তু কাল ক্রমে ইটালীর সে সুখের দিন চলিয়া গেল। ইটালীবাসীগণ ধনী, সুখ-প্রিয়, পাপাসক্ত হইয়া পড়িল; তাহাদের বীরত্ব ও পরাক্রম চলিয়া গেল। অবশেষে তাহারা অপর জাতির অধীন হইয়া পড়িল। ইটালীর উত্তরে অষ্ট্রিয়া নামে একটী দেশ দেখিবে। ঐ দেশের লোকেরা আসিয়া ইটালীর অনেক দেশ অধিকার করিল। ইটালীর

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে দুই একজন দেশীয় রাজা রহিল তাহারাও নিস্তেজ, হীন-সাহস, অপদার্থ হইয়া রহিল।

এইরূপে পরাধীন হইয়া কয়েক শত বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখন আমাদের প্রিয় জন্ম-ভূমির যেরূপ অবস্থা, তখন ইটালীর সেইরূপ অবস্থা ছিল। পরাধীনতার অনেক ক্লেশ, সে সব ক্লেশ তোমরা বড় হইলে বুঝিতে পারিবে। সেই

ক্লেশে ইটালী দেশের লোকের মন বহু শত বৎসর ধরিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সেই দেশে অনেক লোক পরাধীনতা হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পরাধীনতাতে দেশের অধিকাংশ লোকের মন এতদূর নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল যে,ঐ সকল দেশ-হিতৈষী লোক দেশের লোকের সাহায্য না পাইয়া যুদ্ধে হারিয়া দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। এইরূপে জোসেফ ম্যাট্‌সিনির জন্মিবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ইটালীদেশে স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের ক্ষোভে কাল কাটাইতেছিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে এক এক দল লোক বিদেশী রাজাদের দাসত্ব হইতে আপনাদের দেশকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধনে প্রাণে নিধন প্রাপ্ত হইতেছিল।

এমন সময়ে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত জিনোয়া নগরে জোসেফ ম্যাট্‌সিনির জন্ম হইল। তাঁহার পিতা ঐ নগরের একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার মাতা অতি ধীর-প্রকৃতি ও সদাশয়া রমণী ছিলেন। তাঁহার সদগুণে সকলে মোহিত হইত। সন্তানদের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল, কিন্তু জোসেফের প্রতি তাঁহার কিছু বিশেষ ভালবাসা ছিল। শৈশবাবস্থায় জোসেফের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। এমন কি ৫।৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি দাঁড়াইতে শিখেন নাই। তাঁহাকে একটা ঘেরা চৌকিতে বসাইয়া তাঁহার মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। ছেলেটার শরীর বড় দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কিছু দিন পড়িতে দিবেন না মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু শিশু ম্যাট্‌সিনির পড়াতে এমন অনুরাগ ছিল যে,তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে আপনার ভগিনীদের পড়া শুনিয়া শুনিয়া ও তাহাদের সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে বেশ পড়িতে শিখিলেন। এক দিন একজন আত্মীয় তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন যে, সেই পাঁচ ছয় বছরের ছেলে নিজের চৌকির উপরে চারিদিকে বই ও ম্যাপ ছড়াইয়া নিমগ্ন-চিত্তে তাহা পাঠ করিতেছে, দেখিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। যদি সেই বালককে কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন তুমি কি উপহার চাও,অমনি তিনি বলিতেন আমি বই চাই। বই তাঁহার এত প্রিয় ছিল।

ম্যাট্‌সিনির ছেলেবেলার আর একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ ভিক্ষুক দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসিল। জননী দেখিলেন ঐ বৃদ্ধকে দেখিয়া ছেলে আর নড়ে না, কেবল হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। মনে করিলেন বুঝি ছেলে তাহার পাকা দাড়ি, ছেঁড়া কাঁথা ও ভিক্ষার ঝুলি দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। এই ভাবিয়া ফিরিয়া যেমন ম্যাট্‌সিনির হাত ধরিয়া আনিতে যাইবেন, অমনি ম্যাট্‌সিনি তাঁহার হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঐ বৃদ্ধের কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার মুখে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন ও মাতাকে বলিতে লাগিলেন,—"মা ইহাকে কিছু দেও, মা ইহাকে কিছু দেও।" বুড়টার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল "মা! ঈশ্বর তোমার ছেলেকে বাচাইয়া রাখুন, এ ছেলে গরিবকে বড় ভাল বাসিবে।"

ক্রমে ম্যাট্‌সিনির বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্কুলে দিলেন। ম্যাট্‌সিনি স্কুলে পড়িবার সময় খুব মন দিয়া লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেম। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি

দেখিয়া শিক্ষকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। ম্যাট্‌সিনির প্রকৃতি অতি সৎ, নম্র, সাহসী, ও পরোপকারী ছিল; এই সকল গুণে তিনি সকলের প্রিয় হইলেন। ম্যাট্‌সিনি সুশিক্ষিত হইয়া কলেজ হইতে বাহির হইলেন; এবং ওকালতি করিবার জন্য চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার যেমন বয়স বাড়িল সেই সঙ্গে তাঁহার মন আর একদিকে গিয়া পড়িল। দেশের লোকের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে বড় ক্লেশ হইত। তিনি দেশের পরাধীনতার কথা ভাবিয়া চক্ষের জল ফেলিতেন। বিদেশীয় লোকে দেশের প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, ইহাতে তাঁহার প্রাণে এত কষ্ট হইত যে, তিনি মনের দুঃখে ভাল কাপড় পরিতেন না, কোন আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন না, লোকের সঙ্গ ভাল লাগিত না, একেলা একেলা থাকিতেন এবং কিসে দেশের উদ্ধার হয় এই চিন্তা করিতেন। সেই সময়ে ইটালী দেশে যুবকদিগের এক অতি গোপনীয় সভা ছিল, তাহার সভ্যেরা স্বদেশকে পরাধীনতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শপথ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। 'স্বদেশের উদ্ধার জন্য যদি প্রাণ দেওয়া আবশ্যক হয় তাহাও দিব' তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি গোপনে ঐ দলের সভ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা তাহা জানিতেন না। রাজারা এইরূপ দলকে বড় ভয় করিতেন ও তাহার মধ্যে কাহাকেও ধরিতে পারিলে কঠিন শাস্তি দিতেন।

ম্যাট্‌সিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া উৎসাহের সহিত স্বদেশের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ সেই দলের একজন বিশ্বাস-ঘাতক লোক তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। এই ঘটনা ১৮৩০ সালে ঘটে। ম্যাট্‌সিনির বয়স তখন ২৫ বৎসর। তাঁহাকে ধরিয়া এক নির্জ্জন কারাগারে অনেক দিন কয়েদ করিয়া রাখা হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি জেল-খানাতে বসিয়াই দেশের উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন এ ব্যক্তিকে ইটালীতে কয়েদ করিয়া রাখাতেও বিপদ আছে; সুতরাং তাঁহাকে দেশের বাহির করিয়া দিল। তিনি ফ্রান্স দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আর দেশে ফিরিয়া আসিবার যো নাই; পিতা মাতা ভাই ভগিনী কাহারও মুখ দেখিবার আশা নাই; ইটালী রাজ্যে একখানি পা বাড়াইবার হুকুম নাই। কিন্তু ফ্রান্স দেশে আসিয়াও ম্যাট্‌সিনি অলস হইলেন না। স্বদেশের উদ্ধার কিসে হইবে এই চিন্তাতে দিন রাত্রি ব্যস্ত হইলেন। তিনি যেমন স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া আসিয়াছিলেন এইরূপ তাঁহার সমবয়স্ক আরও অনেকগুলি যুবক তাড়িত হইয়া সেই সময়ে ফ্রান্স দেশে বাস করিতেছিলেন। ম্যাট্‌সিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া "নব্য-ইটালী" নামে এক সভা স্থাপন করিলেন ও ঐ নামের একখানি খবরের কাগজ বাহির করিলেন। ঐ সভাতে প্রবেশ করিতে হইলে সভ্যদিগকে শপথপূর্ব্বক প্রাণ, মন, ধন সমুদায় দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। ম্যাট্‌সিনি সর্ব্ব প্রথমে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইলেন, তৎপরে আরও অনেক ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া সভ্য করিলেন। এই সকল সংবাদ ইটালী দেশে প্রচার হইলে রাজাদের প্রাণে ভয় জন্মিল; কিন্তু দরিদ্র প্রজারা আনন্দ করিতে লাগিল। সে দেশের গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ম্যাট্‌সিনির কাগজ সে দেশে

প্রচার না হয়, কেহ না পড়িতে পায়। কিন্তু কোথা হইতে যে শত শত কাগজ বিলি হইয়া যায় কেহ ধরিতে পারে না! ঐ সকল কাগজ গোপনে গোপনে বিলি হয়, লোকে পড়ে, গবর্ণমেণ্ট কোন রূপেই বারণ করিতে পারে না। হাজার হাজার যুবক ম্যাট্‌সিনির সভার সভ্য হইতে লাগিল। তখন গবর্ণমেণ্টের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন ম্যাট্‌সিনি ফ্রান্স দেশে থাকিলেও নিস্তার নাই। তখন ফ্রান্স দেশের রাজা লুই ফিলিপ্‌কে এই অনুরোধ করা হইল যে, তিনি ম্যাট্‌সিনিকে ফ্রান্স দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, রাজায় রাজায় বন্ধুতা না রাখিলে চলে না সুতরাং ফ্রান্সের রাজা তাহাই করিলেন। ম্যাট্‌সিনি ফ্রান্সেও থাকিতে পাইলেন না! ফ্রান্স দেশ পরিত্যাগ করিয়া সুইজরল্যাণ্ড দেশে গমন করিলেন। সেখানেও তাঁহার বিশ্রাম নাই; সেখানে নানা দেশের তাড়িত লোকদিগকে একত্র করিয়া নব্য-ইউরোপ নামক আর একটী সভা করিলেন। ঐ সভাতে নানা জাতীয় লোক ছিল, সেখানেও তিনি নূতন স্বাধীনতার জলন্ত ভাব সকলের মনে প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অত্যাচারী গবর্ণমেণ্ট এখানেও তাঁহাকে সুখে থাকিতে দিল না। ইটালী গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে সুইজরল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল।

এই সময় তাঁহার বড় ভয়ানক দশা উপস্থিত হইল। কষ্টে দুঃখে দুর্ভাবনায় তাঁহার শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল; তিনি স্বদেশের উদ্ধারের বিষয়ে যে আশা করিতেছিলেন, সে বিষয়ে এখন সন্দেহ জন্মিতে লাগিল; তাঁহার নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু যাঁহারা ছিল, তাঁহারাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল; যাহারা শপথ পূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে লাগিল। এই অবস্থায় ঘোর যাতনাতে তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার মনের অন্ধকার আবার সরিয়া গেল। তিনি সুইজরল্যাণ্ড দেশ হইতে তাড়িত হইয়া জগৎ বিখ্যাত ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

ইংলণ্ডে যে তিনি কি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন তাহার বর্ণনা হয় না। তাঁহাকে যখন স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিল, তখন তাঁহার পিতা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি, যদি বিদেশীয় রাজাদের নিকট একটু ঘাড় হেঁট করিতেন তাহা হইলেই স্বদেশে সুখে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। এজন্য তাঁহার পিতা চটিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন "ইটালীতে কি আর যুবক কেহ নাই; ইটালী কি তাহাদের স্বদেশ নয়, দেশের জন্য তাঁহার এত ছটফটানি কেন?" হায়! সংসারাসক্ত পিতা বুঝিতে পারিলেন না, পুত্রের প্রাণে কি আগুন জ্বলিয়াছে। তিনি ম্যাট্‌সিনির প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "যাক্ মরুক গিয়ে, আমি তাঁহার খরচের টাকা দিব না।" এই বলিয়া খরচ পত্র বন্ধ করিলেন। সংসারে ম্যাট্‌সিনির মা না থাকিলে বিদেশে অনাহারেই তাঁহার মৃত্যু হইত। তাঁহার জননী ও ভগিনী গোপনে আপনাদের টাকা হইতে তাঁহার খরচ পত্রের মত টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা তাহা জানিতেন না। এই টাকা পাঠাইবার সময় তাঁহার মাতা ও ভগিনীদিগকে অতিশয় ক্লেশে থাকিতে হইত। ওদিকে ম্যাট্‌সিনি যে টাকা পাইতেন, তাহা এক জনের মত, কিন্তু

তিনি সেই এক জনের টাকাতে তাঁহার ন্যায় আরও দুইটী তাড়িত যুবকের ব্যয় চালাইতেন। তাঁহাকে আধপেটা খাইয়া অত্যন্ত ক্লেশে থাকিতে হইত। ইংলণ্ডে তাঁহার এক এক দিন এতদূর কষ্ট হইয়াছে যে, তাঁহাকে গায়ের জামা ও পায়ের জুতা পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইয়াছে। ইহাতেও তিনি একদিনের জন্য দমিয়া যান নাই; একটী দিনের তরেও স্বদেশের উদ্ধারের চিন্তা করিতে ভুলেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া তিনি নিরাপদে বাস করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহাও হইল না। তাঁহার দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ডাকঘর হইতে তাঁহার চিঠি পত্র খুলিয়া পড়িতেন ও ইটালীর গবর্ণমেণ্টকে সেই সংবাদ দিতেন। ওদিকে ইটালীতে তাঁহার বন্ধু বান্ধবের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ হইল।

(ক্রমশঃ।)
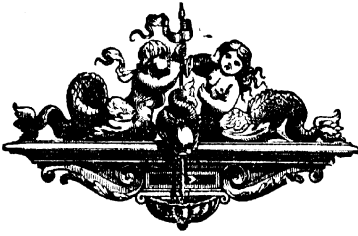
জোয়ার ভাঁটা।

অনেক পাঠক পাঠিকা কলিকাতার নিকটে অথবা অন্য কোন স্থানে গঙ্গাতীরে বাস করেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন যে, প্রতিদিন দুইবার করিয়া গঙ্গার জল বাড়ে ও কমে; লোকে ইহাকে জোয়ার ভাঁটা বলে। এখন জিজ্ঞাসা করি এই যে, রোজ দুবার করিয়া গঙ্গার জল বাড়ে ও কমে কেন? স্নান করিবার সময়ে হয়ত কত দিন ভাঁটার সময় কাদার উপর দিয়া অনেক দূর গেলে তবে জল পাওয়া যায়, আর কতদিন অমনি একেবারে গঙ্গার কানে কানে জল থৈ থৈ করিতেছে দেখিয়া বড় আনন্দ হয়; তাহার কারণ তোমরা কখন কি জানিবার চেষ্টা করিয়াছ? পাঠক পাঠিকাদিগকে আমরা একটী অনুরোধ করিতেছি। যাঁহার সম্মুখে যে বিষয় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে, তিনি যদি কাহার নিকট তাহার কারণ জানিতে না পারেন, তবে যেন আমাদিগকে লিখেন, আমরা উপযুক্তমত তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

এখন আমরা জোয়ার ভাঁটা কেন হয়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যাঁহাদের বাড়ী ত্রিবেণীর উত্তর, তাঁহারা গঙ্গার জোয়ারের জল বড় দেখিতে পান না; সেখানে গঙ্গার জল কেবল সাগরের দিকেই চলিতে থাকে, ভাঁটার জলের মত সে সকল স্থানের জল কেবল দক্ষিণ মুখে চলে। আর যত দক্ষিণ দিকে আসা যায়, গঙ্গাতে ততই জোয়ারের তেজ দেখা যায়। তাহার অর্থ বুঝা কঠিন নয়। জোয়ার যে কেবল ভাগীরথীতেই দেখা যায় তা মনে করিও না। গঙ্গা, মেগ্না, সিন্ধু, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, মহানদী প্রভৃতি যত নদী ভারতবর্ষে আছে এবং তা ছাড়া সমস্ত পৃথিবীর যত নদীর কথা ভূগোলে পড়িয়াছ, তাহাদের প্রায় সমস্ত গুলিতেই জোয়ার হয়। কিন্তু কেবল সাগরের নিকট কিয়ৎ দূর পর্য্যন্ত জোয়ারের জোর চলে, তার পর নদী সকল

একটানা। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ যে গঙ্গা ও অন্যান্য সব নদীর জোয়ার সাগরের উপর নির্ভর করে। নদী সকল সাগরে পড়ে, এজন্য যতক্ষণ সাগরের জল নদীর মুখ অপেক্ষা নীচু, ততক্ষণ নদীর জল সাগরেই পড়িবে। কিন্তু যদি কোন কারণে সাগরের জল নদীর জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সাগরের জল নদীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারেনা। তখন নদীর জলের গতি ফিরিয়া যায়। এতক্ষণ যে জল সাগরের দিকে যাইতেছিল, তাহা এখন বিপরীত দিকে চলিবে। এই বিপরীত প্রবাহের নামই নদীর জোয়ার।

এখন বুঝিলে যে সাগরের জলে জোয়ার হওয়ায় জল ফুলিয়া উঠে এবং ঐ উচ্চ জল নদীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই নদীতে জোয়ার হয়। কাজেই এখন এই প্রশ্ন মনে উঠিবে—যে সাগরে জোয়ার কেন হয়? আমরা এইবার তাহার উত্তর দিব।

সমুদ্রই পৃথিবীর অধিক ভাগ ব্যাপিয়া আছে। সমস্ত পৃথিবীকে চারি ভাগ করিলে, প্রায় তাহার তিন ভাগ জলে ঢাকা, আর এক ভাগের কিছু বেশী স্থল দেখা যাইবে (ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ দেখ।) এই সমুদ্রভাগ যে কত গভীর তাহার এখনও সকল স্থানে ঠিকানাই হয় নাই। হিমালয় পর্ব্বত যে এত উচ্চ, তাহার মত পর্ব্বত ও সাগরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারে এবং তাহার উপরে ও অনেক জল থাকে। এই অতল অকূল জলরাশি পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে কেন?—সকলেই জান যে পৃথিবী নিজ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা উহাকে টানিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মনে কর যদি আর একটা প্রকাণ্ড গ্রহ পৃথিবীর নিকটে আসিয়া জলটাকে টানিত, তাহা হইলে ঐ জল আর স্থির থাকিতে পারিত না। এখন দেখ পৃথিবী এই রূপে জলে আবৃত হইয়া আছে, আর আকাশের সমস্ত গ্রহ ও উপগ্রহ, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি সকলেই জলস্থলময় পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে। সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটে বলিয়া উহার আকর্ষণই খুব বেশী হইবে। সূর্য্যটা একটা অতি প্রকাণ্ড জিনিস, সুতরাং সে দূরে থাকিলেও চন্দ্রের পরেই তাহার আকর্ষণ। নক্ষত্র সকল এত দূরে আছে যে মনে ধারণা করাই যায় না। সুতরাং কেবল চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণই অনুভব করা যায়। পৃথিবীর যে সমস্ত অংশ স্থলময় তথায় কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; কেননা স্থল কঠিন। কিন্তু যে সকল ভাগ সাগরে আবৃত, তথায় এই আকর্ষণের কার্য্য বেশ দেখা যায়। যখন যে সাগরের উপর এই আকর্ষণ কার্য্য করে, অর্থাৎ যাহার উপর সূর্য্য বা চন্দ্র উদিত থাকে, তথাকার জল তরল বলিয়া ঐ টানের জোরে একটু উপরদিকে ফুলিয়া উঠে। এই ফুলিয়া উঠার নাম জোয়ার হওয়া। কোন কঠিন পদার্থের এক দিক ধরিয়া টানিলে সেই সঙ্গে তাহার সমস্তটাই আসে; কিন্তু তরল জিনিসের যেখানটা টানা যায় সেখান হইতেই খানিকটা সরিয়া আসে। জোয়ার হওয়ারও কারণ সেইরূপ। পৃথিবীর জল ও স্থল উভয়ই আকৃষ্ট হয়। স্থল কঠিন বলিয়া তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া যায়; কিন্তু সমুদ্রের অগাধ জল ত সেরূপ কঠিন নহে, কাজেই সূর্য্য বা চন্দ্র আকর্ষণ করিলে খানিক পরিমাণে সেই দিকে উচু হইয়া উঠে, তাই সেখানে তখন জোয়ার হয়।

যখন যে সাগরের ঠিক উপরে সূর্য্য ও চন্দ্র

উদয় হয়, তখন তথায় জোয়ার হয়, বুঝিলে। আবার সেই সঙ্গে একই সময়ে, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে যে সাগর, সেখানে ও জোয়ার হয়। তাহার কারণ বুঝা তত সহজ নয়। তবু মন দিয়া শুন। আকর্ষণের একটী নিয়ম আছে জান, তাহার দ্বারা যে বস্তু যত দূরে থাকে তাহার প্রতি আকর্ষণ ও তত কম হয়। এখন, পৃথিবী যে কেমন প্রকাণ্ড তা তোমরা জান। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর এক দিক ও তাহার বিপরীত দিকের মধ্যে যে দূরত্ব তাহার নাম উহার ব্যাস। মনে কর কলিকাতা হইতে যদি একটা পাৎকূয়া খুঁড়িয়া যাওয়া যায় তবে ক্রমে উহা পৃথিবীর মধ্যস্থল ভেদ করিয়া উহার অপরদিকে গিয়া বাহির হইবে। পৃথিবীর এই ব্যাস প্রায় ৮০০০ আট হাজার ক্রোশ; সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, একটা জিনিসকে চন্দ্র সূর্য্য কলিকাতায় যত জোরে আকর্ষণ করে, পৃথিবীর অপরদিকে কলিকাতার বিপরীত ভাগে থাকিলে সে বস্তুকে আর তত জোরে আকর্ষণ করিতে পারেনা।

ভাল। এখন দেখ, যখন চন্দ্র সূর্য্য আটলাণ্টিক মহাসাগরের কোন স্থানে উদয় হইয়াছে ও তথায় জোয়ার দেখা যাইতেছে, তখন ঠিক তাহার বিপরীত দিকের সাগরে যে জল আছে, সে জলকে কখনই আটলাণ্টিক মহাসাগরের জলের মত জোরে আকর্ষণ করিতে পারে না, নিশ্চয়ই কম জোরে টানিবে, কেননা উহা ৮০০০ ক্রোশ দূরে আছে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের জলের অপেক্ষা পৃথিবীর কেন্দ্রে আকর্ষণের বল কম, আবার কেন্দ্রের অপেক্ষাও আটলাণ্টিকের বিপরীত দিকের সাগরের জলকে কম জোরে টানিতেছে। কাজে কাজেই, কম টান পাওয়ায় ঐখানকার জল পৃথিবীর গা হইতে একটু ঝুলিয়া পড়িবে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য যেদিকে আছে তাহার উল্টাদিকে ফুলিয়া উঠিবে। এই ফুলিয়া উঠা আর কিছুই নয়, ঐস্থানের সমুদ্রের জোয়ার। এইরূপে আমরা দেখিলাম যে একই সময়ে দুই স্থানে জোয়ার হয়।

বিষয়টী এত কঠিন যে ছবি না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারিবে না। ছবিতে—(ক) সূর্য্য বা চন্দ্র। প—পৃথিবীর কেন্দ্র। (পৃথবী যেন চারি দিকেই সমুদ্রে বেষ্টিত) স-ফ-স-ব—সমুদ্রের উপরিভাগ। তোমরা সকলেই 'সখা'তে আকর্ষণের বিষয় পড়িয়াছ। একটী নিয়ম আছে যে, যে বস্তু যত দূরে থাকে তাহার প্রতি অন্য বস্তুর আকর্ষণ তত কম হয়। আর যে বস্তু যত নিকটে থাকে তাহার আকর্ষণ তত বেশী হয়। এখানে দেখিতেছ যে ব নামক স্থানটী প অপেক্ষা সূর্য্য বা চন্দ্রের অধিক নিকটে। ফ নামক স্থানটী আবার প অপেক্ষাও অধিক দূরে। সুতরাং সূর্য্য বা চন্দ্রের স্থানটীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলে আকর্ষণ করিতেছে, প কে তাহাঅপেক্ষা কম আকর্ষণ করিতেছে, ফ কে আরও কম। বেশ্; এখন তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে ফ, ব, দুইটী স্থান, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে প আছে। ব হইতে প যত দূরে, প হইতে ফ ঠিক তত দূরে। ক ব কে টানিল, ব একটু অগ্রসর হইল; প কে ক একটু কম জোরে টানিল, সুতরাং প ব এর সমান অগ্রসর হইতে পারিল না; সুতরাং পূর্ব্বে প ও ব এর মধ্যে যে ব্যবধান টুকু ছিল, এখন তাহা একটু বাড়িল! এইরূপে প ও ফ এর মধ্যস্থিত দূরত্বটা ও ক এর আকর্ষণে বাড়িবে। সুতরাং ক আসিয়া প ফ ব কে টানিয়া এই করিল যে ইহা-

দের দূরত্ব একটু বাড়িল। প পৃথিবীর কেন্দ্র। পৃথিবীটা কঠিন জিনিস কি না, সুতরাং কেন্দ্র যে দিকে নড়িল, সমস্ত পৃথিবীই সেই দিকে নড়িল। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ যে, ব যদি কেন্দ্র হইতে বেশী দূরে আসিয়া থাকে, তবে ভূপৃষ্ঠ হইতে প বেশী দূরে আসিয়াছে। সেইরূপ, ফ হইতে ভূপৃষ্ঠ একটু সরিয়া গিয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, এই দুই স্থানে সমুদ্রের গভীরতা বাড়িয়াছে—অর্থাৎ জোয়ার হইয়াছে।
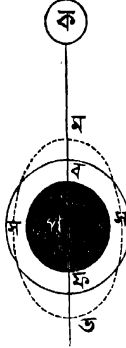
কিন্তু এই যে দুই স্থানে জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, এজল কোথা হইতে আসিল? ছবি দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ যে, ঐ ফুট ফুট আকারের গোল রেখাটাই তখনকার জলের সীমা রেখা। অর্থাৎ স স নামক যে দুইটী স্থান চন্দ্র বা সূর্য্যের ঠিক নীচেও নয় বিপরীত দিকেও নয়, সেই দুই পাশের দুটী স্থান হইতে জল সরিয়া আসিয়া ম ও ভ নামক স্থান দুইটীর জোয়ারের জল যোগাইয়াছে। তজ্জন্য স স নামক ঐ দুই পাশের জল খুব কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ ঐ দুই স্থানে ভাঁটা পড়িয়াছে।

আজ আমরা এই টুকু বুঝিতে পারিলাম যে, চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণই জোয়ার ভাঁটার কারণ। এবং এক সময়ে দুই স্থানে জোয়ার ও দুই স্থানে ভাঁটা হইয়া থাকে। তাহার পর আজিকার শেষ কথা এই যে, পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টায় একবার আপনি ঘুরে, এজন্য উহার প্রত্যেক স্থান এক দিবসের মধ্যে একবার চন্দ্র ও সূর্য্যের দিকে ফিরে; সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই, সকল মহাসাগরেই প্রতি দিনে দুই বার জোয়ার ও দুই বার ভাঁটা হইয়া থাকে। আরও অনেক কথা আছে, সে সমুদয় পরবারে আবার বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বেলুন।

বাতাসের চাইতে হাল্কা জিনিস ভিতরে পূরিয়া দেওয়াতেই বেলুন উপরে উঠে, এই কথা তোমরা পূর্ব্বেই শিখিয়াছ। এখন তোমাদিগকে আরো কতগুলি কথা বলিব।

মনে কর অনেক দূর উঠিয়া বেলুন আর উঠিতে চাহিতেছে না। তখন যদি তোমার আরো উঠিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি করিবে? তাহার সঙ্কেত বলি, শুন। বেলুনে চড়িবার পূর্ব্বে কয়েক বস্তা বালি বেলুনে তুলিয়া দিতে হয়। বেলুন যখন আর উঠে না, তখন এর একটী বস্তা খুলিয়া কিঞ্চিৎ বালি ফেলিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই বেলুন একটু হাল্কা হইল, এখন আর কিছু দূর নিরাপদে উঠিবে। এইরূপে যখন বালির বস্তা ফুরাইয়া যাইবে, তখন তোমার নামিয়া আসার যোগাড় দেখাই ভাল। অনেক সময় কোন সমুদ্রের উপর আসিয়া বেলুন পড়িয়া যাইবার যোগাড় করে। সমুদ্রে পড়িলে কি হয়, তা ত জানই; সুতরাং তখন বাধ্য হইয়া উপরের লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কখন কখন আবার ইহাতেও কুলায় না, তখন একটী দুইটী করিয়া সঙ্গের জিনিস পত্র পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে হয়। তাহাতেও যদি না কুলাইল তবেই বিপদ।

আচ্ছা, মনে কর এমন হইল যে, বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহাতে সুবিধা মনে কর না; তখন যদি আর উঠিতে ইচ্ছা না হয়, কিম্বা যদি নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় তখন কি করিবে? তখনকার জন্য দুই প্রকারের ব্যবস্থা আছে। ১ম—বেলুনের গায় একটী ছিদ্র করিয়া
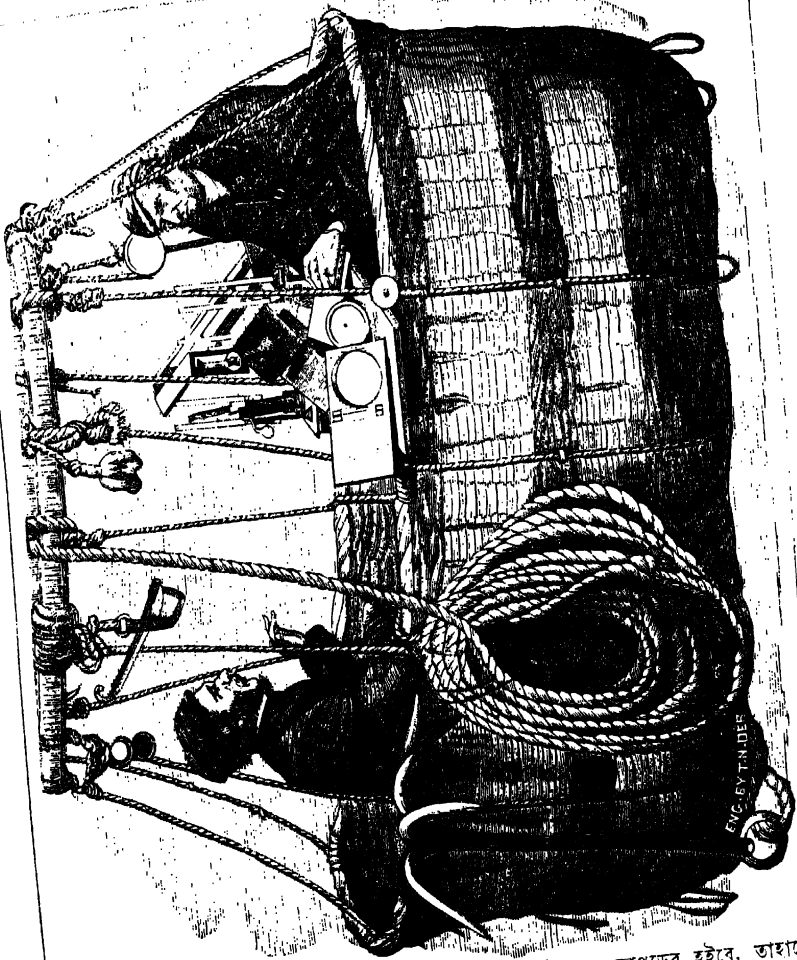
দিতে পারিলেই ভিতরের হাল্কা জিনিসটা বাহির হইয়া যাইবে, তখন বেলুনটীকে বাধ্য হইয়া নামিতে হইবে। অনেক সময় বেলুনটীকে উপরে রাখিয়াই নিজে নামিবার যোগাড় করিতে হয়। তাহার জন্য দ্বিতীয় উপায়টী উত্তম।

দ্বিতীয় উপায়।—কাপড়ের একটা মস্ত ছাতা কর। ছাতাটা শুধু কাপড়ের হইবে, তাহাতে শিক্ বাঁট দিতে হইবে না। ছাতার মাঝখানটায় একটা গোল ছিদ্র রাখ—ছিদ্রটা যেন খুব বড় হয়। তার পর ছাতার চারিধারে লম্বা দড়ি বাঁধিয়া সমস্ত গুলি দড়ির মাথা একত্র করিয়া বাঁধ। যেখানে দড়ির মাথা গুলি বাঁধিয়াছ, সুবিধা হইলে সেখানে

বসিবার কোন রূপ উপায় কর। এই যন্ত্রটীও বেলুনে তুলিয়া লইতে হয়। নামিতে ইচ্ছা হইলে যেখানে বসিবার উপায় করিলে, সেই স্থানটা অবলম্বন করিয়া বেলুনের সহিত ছাতার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হয়। বাতাসে ছাতাটা আপনা আপনি ফুলিয়া উঠে। তখন ধুপ্ করিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না।

ছাতার মাঝখানে ঐ ছিদ্রটী না থাকিলে ছাতা ভয়ানক দুলিত, ও তোমার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হইত। ঐ ছিদ্রটী থাকাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ দুলিবার কোন ভয় থাকে না। (বল দেখি কেন এরূপ হয়?)

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, লোকে কেবল মাত্র আমোদের জন্যই বেলুনে উঠে। অনেকে আমোদের জন্য বেলুনে উঠে বটে, কিন্তু তা ছাড়া বেলুনে উঠাতে অনেক উপকার হয়; বড় ছবিটী দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। ঐ ছবিতে যে দুইজন লোক বসিয়া আছেন, তাঁহাদের একজন গ্লেশার আর একজন কক্স্‌ওয়েল সাহেব। ইঁহারা ইংলণ্ডের দুইজন বৈজ্ঞানিক। পৃথিবী হইতে কত উর্দ্ধে বাতাসের অবস্থা কিরূপ, জানিবার জন্য ইঁহারা বেলুনে চড়িয়াছেন। গ্লেশার সাহেবের সম্মুখে বাতাস পরীক্ষা করিবার উপযোগী যন্ত্র গুলি সাজান রহিয়াছে। একটী যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় যে "এত" উর্দ্ধে উঠা হইয়াছে। অন্য একটী যন্ত্র বলিয়া দিতেছে যে সেখানকার বাতাসে "এত" জলীয়বাষ্প আছে। আর একটী বলিতেছে যে সেখানকার বাতাস "এত" গরম—ইত্যাদি।

আমরা একস্থানে বলিয়াছি যে "বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহা সুবিধা মনে কর না।" ইহার অর্থ হয়ত অনেকেরই বুঝিতে একটু গোল হইয়াছে, সুতরাং অত্যন্ত উচ্চে উঠিলে যে যে অসুবিধা হয়, তাহার দু একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। কিছু উপরে উঠিলেই দেখিবে শ্বাস ফেলিতে একটু কষ্ট হয়—বাতাস যেন কমিয়া গিয়াছে। এই অসুবিধাটা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এর চাইতে আরো উপরে উঠিলে দেখিবে তোমার গায়ের চামড়া ফাটিয়া যাইতেছে। আরো উপরে উঠিলে তোমার নাকের লোমকূপ গুলি দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত বাহির হইবে। তাই বলিতেছিলাম অধিক উপরে উঠিলে অসুবিধা হইবে।
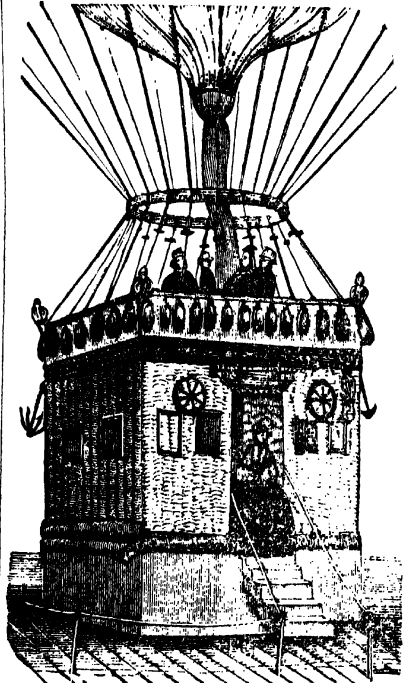
একটা গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। নেডার নামক এক সাহেব খুব যোগাড় যন্ত্র করিয়া একটা প্রকাণ্ড বেলুন প্রস্তুত করিলেন। (ছবি দেখ,) তাহার ভিতরে

কত কিছু ব্যাপারেরই আয়োজন হইল; সাহেব মনে করিলেন গরু হারাইলে ইহার ভিতর তাহাও পাওয়া যাইবে। সকলে শসব্যস্ত হইয়া তামাসা দেখিতে আসিল; মনে করিল "এটা যখন শূন্যে উঠিবে তখন না জানি একটা কি ব্যাপারই হয়।" "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া", বেলুনটা কত দূর উঠিয়াই পড়িয়া গেল। যাহারা তামাসা দেখিতে গিয়াছিল তাহারা বাড়ী আসিয়া হাসিতে লাগিল।

গুরু-দরবার।

তোমরা কি পঞ্জাব দেশের নাম শুনিয়াছ? ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী দেশ আছে, তাহার নাম পঞ্জাব। "পঞ্চ" ও "আপ" এই দুইটী শব্দ হইতেই বোধ হয় ঐ শব্দটী হইয়াছে। "পঞ্চ" শব্দের অর্থ পাঁচ ও "আপ" শব্দের অর্থ জল। ইহার অর্থ এই এদেশে পাঁচটী নদী প্রবাহিত। ঐ পাঁচটী নদী সিন্ধু নামক নদীর শাখা। ঐ পাঁচটীর নাম, বেয়া, শৎলেজ্, রাবী, চেনাব ও ঝেলম। তোমরা ভারতবর্ষের ম্যাপ খুলিয়া এই দেশটী ও ঐ নদীগুলি ভাল করিয়া দেখিবে।

এই পঞ্জাব দেশে নানক নামে একজন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। আমাদের দেশে নবদ্বীপ নগরে চৈতন্য জন্মিয়া যে সময়ে হরিনাম প্রচার করেন, প্রায় তাঁহার সম সম কালে, অর্থাৎ এখন হইতে তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নানকের জন্ম হয়। নানক একজন সামান্য লোকের ছেলে ছিলেন। অতি বালক কাল হইতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য তাঁহার ভাল লাগিত না, তিনি কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে চিন্তা করিতেন; এবং ধর্ম্ম বিষয়ে দেশের লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া শোক করিতেন। অবশেষে তিনি বিষয় কার্য্য ছাড়িয়া কেবল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, একমাত্র পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে তোমরা প্রীতি কর, সকল পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার ছাড়। ক্রমে নানকের অনেক শিষ্য জুটিল। ঐ শিষ্যদের নাম এখন শিখ। শিষ্য শব্দ হইতেই শিখ শব্দ হইয়াছে। নানক এই শিখদিগের প্রথম গুরু। তাঁহার পর আরও নয় জন গুরু পর পর জন্মিয়াছেন। এই শিখগণ অতিশয় সাহসী। আগে ইহারা কেবল ধর্ম্ম প্রচারই করিত, অতি শান্ত স্বভাব ছিল; কিন্তু মুসলমান রাজাদের দৌরাত্ম্যে ইহারা সুস্থির হইতে পারিত না। মুসলমান রাজারা ইহাদের গুরুদিগকে ধরিয়া অপমান করিত; এবং কাহাকে কাহাকেও প্রাণে হত্যা করিয়াছিল। সেই জন্য ইহাদের একজন গুরু ইহাদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হুকুম করেন। তদনুসারে শিখগণ সাহসী বীর ও যুদ্ধ-প্রিয় জাতি হইয়া পড়িল। ক্রমে পঞ্জাব দেশ শিখেরই রাজ্য হইল। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা যখন পঞ্জাব দেশ জয় করিবার চেষ্টা করেন, তখন রণজিৎ সিংহ নামে একজন শিখরাজা পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। তিনি বিক্রমে বাস্তবিক সিংহের সমান ছিলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্র অনায়াসে জয় করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু পঞ্জাব দেশ জয়

করিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হইয়াছিল। শিখদিগের বিক্রমে ইংরাজদিগকে অস্থির হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে শিখগণ হারিয়া গেল ও পঞ্জাবদেশ ইংরাজের রাজত্ব হইল। পাঠক পাঠিকা! তোমরা যদি শিখদের ইতিহাস হাতে পাও, পড়িয়া দেখিও তাঁহাদের বীরত্ব দেখিয়া মনে আনন্দ হইবে। যাহা হউক এই শিখ জাতির সবিশেষ বিবরণ বলা অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম-মন্দিরের বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

পঞ্জাব দেশে যে সকল বড় বড় সহর আছে, তাহার মধ্যে অমৃতসহর নামে একটী বড় সহর আছে। ম্যাপে ঐ সহরটী দেখিবে। পঞ্জাবের সহরগুলি আমাদের দেশের সহরগুলির মত নহে। এই যে কলিকাতা সহর, ইহার চারিদিক খোলা; অর্থাৎ সকল দিক্ দিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। পঞ্জাবের বড় বড় সহরগুলি এইরূপ নয়। সমুদয় সহরটী প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত, এবং সহরে প্রবেশের জন্য কতকগুলি "গেট" আছে; তাহাকে সংস্কৃতে তোরণদ্বার বলে। সে দ্বার গুলি বন্ধ করিবার উপায় আছে। গেট গুলি যদি বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে সমুদয় সহরটী যেন একটী কোন বড় পরিবারের প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীর ন্যায় হইয়া পড়ে। পূর্ব্বকালে শত্রুকুলের আক্রমণের ভয়ে, নগর গুলিকে এইরূপ প্রাচীর বেষ্টিত করা হইয়াছিল। ইহাতে একটী প্রধান অনিষ্ট হইয়াছে। কালক্রমে সহরের লোক সংখ্যা যত বাড়িয়াছে সকলকে ঐ সহরের ভিতরেই ঠেলাঠেলি করিয়া, মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইয়াছে। স্থানের অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়াতে বাড়ীর উপর বাড়ী,তার উপর বাড়ী,এই করিতে করিতে রাস্তাগুলি বড় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি অনেক রাস্তাতে একখানি পাল্কী যাইবারও যো নাই। সুতরাং সহরের মধ্যে বাতাস পাওয়া দুষ্কর, ও সহরগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়াছে। এই কারণে এই সকল সহরে ওলাউঠা প্রভৃতি জন্মিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক লোক মারা যায়। পরিষ্কার বায়ু যে স্থানে যাইতে পারে না, সে স্থান ত্বরায় অস্বাস্থ্যকর হয়। পঞ্জাবের সহর গুলিতে তাহা দেখা যায়।

যাহা হউক অমৃতসহর এইরূপ একটী সহর। কিন্তু অমৃতসহরের একটী গুণ আছে, ইহা প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত হইলেও ইহার রাস্তা গুলি প্রকাণ্ড এবং সহরের জল বায়ু অতি চমৎকার। অমৃতসহরের জলের এমনি গুণ যে আমরা প্রাতে সেখানে গিয়া বৈকালে বুঝিতে পারিলাম যে নূতন স্থানে আসিয়াছি; শরীরে এত স্ফূর্ত্তি বোধ হইতে লাগিল। এই অমৃতসহর নগর যে জন্য প্রসিদ্ধ তাহা এখন বর্ণনা করিব। এই অমৃতসহরে শিখদের আদিগুরু নানক অনেক সময় থাকিতেন, তখন ইহা এত বড় সহর ছিল না। সামান্য স্থান ছিল। এই নগরে একটী উদ্যান ও একটী সরোবর আছে, তাহার নাম অমৃত-সর; সেই সরোবরের নামে এই সহরের নাম হইয়াছে। ঐ সরোবরের মধ্যস্থলে পাষাণ নির্ম্মিত একটী মন্দির আছে। তাহার উপরিভাগ সুবর্ণের পাত দিয়া মোড়া। এই জন্য ইহাকে স্বর্ণ-মন্দির বলে। পাষাণ নির্ম্মিত একটী সেতু অর্থাৎ পুল আছে, যাহা দিয়া ঐ মন্দিরে যাইতে হয়। সেই পুলটী দিয়া মন্দিরের নিকটে গেলে, দেখা যায় যে, যে সকল মার্ব্বেল প্রস্তর দ্বারা সেতুটী ও মন্দিরটী নির্ম্মিত, তাহার অধিকাংশে অতি উৎকৃষ্ট কাজ। অনুসন্ধান করিলেই জানা যায় যে, মুসলমানদিগের সমাধিমন্দির ও ধর্ম্ম-

মন্দির হইতে হরণ করিয়া আনিয়া ঐ মন্দিরে বসান হইয়াছে। এক সময়ে মুসলমান রাজাগণ যেমন হিন্দুদের দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ প্রস্তত করিয়াছিলেন, মহারাজা রণজিৎসিংহ মুসলমানদিগের মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার প্রস্তর হরণ করিয়া অমৃতসহরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ দিয়াছেন।
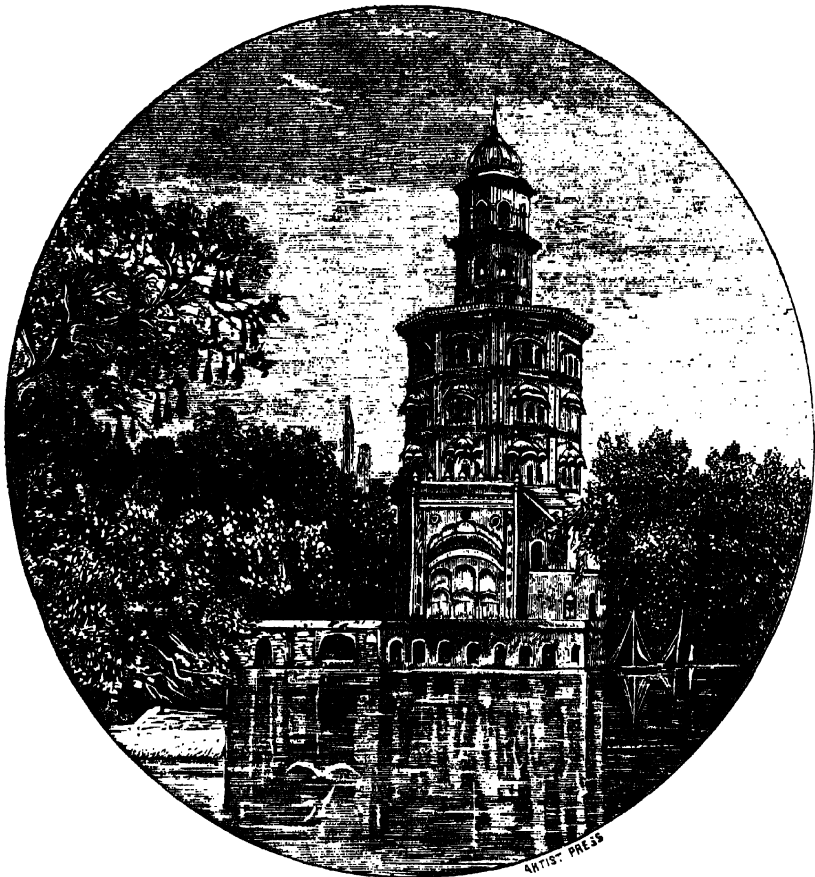
যাহা হউক এই স্বর্ণ-মন্দির, এই সরোবর ও ইহার সংলগ্ন উদ্যান—এই সকলকে পঞ্জাবীরা গুরু-দরবার বলে। অর্থাৎ ইহা গুরু নানকের দর-বার, বসিবার স্থান ছিল। ইহা শিখদিগের একটী প্রধান তীর্থ-স্থান। এই স্বর্ণ-মন্দিরে গুরুদিগের রচিত সংগীতের এক খানি পুস্তক আছে, সেই পুস্ত-ককে শিখেরা দেবতার ন্যায় পূজা করে। তাহার ভোগ দেয় ও আরতি করে; তাহাকে চামর দিয়া বাতাস দেয়। এই গুরু-দরবারে ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা উৎসব চলিতেছে। কি প্রাতে, কি সায়ংকালে, কি দিবা দ্বি প্রহরে, যখন যাও

লোকের ভিড়। সেখানে সমস্ত দিন কেবল ধর্ম্মের চর্চ্চা। সমস্ত দিন গান চলিতেছে; নানক গানের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; এই জন্য শিখগণ অত্যন্ত সংগীত-প্রিয়। গুরু-দরবারে সমস্ত দিন গান চলিতেছে। একদল গায়ক উঠিয়া যাইতেছে,আর এক দল আসিতেছে, সংগীতের আর বিরাম নাই। বৈকালে সেখানে এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। কোথাও একজন লোক দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম কথা বলিতেছে, দশজন দাঁড়াইয়া শুনিতেছে; কোথাও একটী স্ত্রীলোক একখানি গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতেছে, দশজন বসিয়া শুনিতেছে; কোথাও তিনজন সুগায়ক উপবেশন করিয়া ভক্তিরসপূর্ণ গান সকল গাইতেছে, দলে দলে লোক স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে; কোথাও বা একজন বৃদ্ধ বসিয়া আপনার মনে বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছে, তাহার শ্বেত বর্ণ দাড়ি বহিয়া চক্ষের জল পড়িতেছে, অনেক গুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুগ্ধ হইয়া তাহা দেখিতেছে; কোথাও বা একজন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে; এইরূপে প্রতিদিন বৈকালে সেই বাগানটীতে কেবল ধর্ম্মের চর্চ্চা চলিয়া থাকে। আর কোন কথা নাই। ছোট বড়, পুরুষ স্ত্রীলোক ভেদ নাই। সকলেরই ধর্ম্ম বিষয় বলিবার অধিকার আছে। যাহার যে মত, প্রচার কর নিষেধ নাই; শুনিয়াছি কেবল মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিষেধ আছে। নতুবা আর যাহার যাহা ইচ্ছা, প্রচার কর। সকলেই কাণ পাতিয়া শুনিবে। শিখেরা এক দিকে যেমন সাহসী আর একদিকে তেমনি বিনীত। তুমি দুইটী ধর্ম্মের কথা বল, তোমার পায়ের জুতা বহিয়া দিবে ও ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিবে। গুরুদরবারের বাগানে বেড়াইতেছ, অমনি হয় ত দেখিবে একজন দীর্ঘকায় বীর পুরুষ একখানা পাখা হস্তে আসিয়া তোমাকে বাতাস করিতেছে, কেহ বা তোমাকে মসলা উপহার দিতেছে। গুরু-দরবার এইরূপ স্থান। পাঠক পাঠিকা! তোমরা যদি বড় হইয়া কখনও দেশ ভ্রমণ কর,তাহা হইলে অমৃতসহরে গিয়া এই গুরু-দরবার দেখিও, ইহা দেখিবার উপযুক্ত স্থান।

আশ্চর্য্য কর্ত্তব্য পরায়ণতা।

বালক বালিকাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করা একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, মিথ্যা কথা না বলা, পরস্পরের সহিত সদ্ব্যবহার করা, পিতা মাতা গুরু জনের আদেশ প্রতিপালন করা, তাহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করাও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

তোমার নিকট যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহা সম্পন্ন করিতে তোমার প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে তাহা করিতেই হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য যে সামান্য লোকে প্রাণ পর্য্যন্তও সমর্পণ করে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি।

"অনেক বৎসর গত হইল ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি চেতহাম (Chietham) নামক গ্রামের নয় মাইল

দূরবর্ত্তী কোন এক স্থান হইতে ট্যালবার্ট নামক একজন অল্প বয়স্ক ইংরাজ যুবক ডাক আনয়ন করিত। শীত কালে ইউরোপের অনেক স্থান বড়ই ভয়ানক, জলাশয়, পুষ্করিণী, নদনদী সকলের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, মেঘ হইতে যে সকল জল পড়ে তাহাও পড়িতে পড়িতে জমিয়া যায়, তুষার সকল বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। এই শীত কালেরএক দিন রাত্রে যথন সমস্ত স্থান বরফে আবৃত, তখন সেই বালক অশ্বে আরোহণ করিয়া ডাক লইবার জন্য উপস্থিত হইল। পোষ্ট মাষ্টার তাহাকে দেখিয়া বলিলেন;—"এই প্রকার দুর্দ্দিন আমরা শীঘ্র দেখি নাই—আমার মতে তোমার ইহার মধ্যে যাওয়া সঙ্গত নহে।" ট্যালবার্ট উত্তর করিল;—"ইহার মধ্য দিয়া না গেলে কল্য প্রাতে চেতহামের লোকেরা কি প্রকারে চিঠি পত্র পাইবে?" পোষ্টমাষ্টারের বারণ না শুনিয়া ট্যালবার্ট চিঠির ব্যাগ তাহার নিকট হইতে লইয়া পিঠের উপর ঝুলাইয়া দিল; এবং অশ্বারোহণ করিয়া চলিয়া গেল। এক মাইল দুই মাইল যতই যাইতে লাগিল ততই শীতে জড়ীভূত হইতে লাগিল।

এদিকে চেতহামে কয়েকজন লোক ট্যালবার্টের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন; আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছে,চাঁদ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। এক জন বলিলেন,

"ট্যালবার্ট বোধ হয় আসিবে না"

"সম্ভবতঃ না; কয়টা বাজিয়াছে, আসিবার সময় কি অতীত হইয়াছে?" আর এক জন বলিলেন, "আসিলে শীঘ্রই পৌঁছিবে।"

এই প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় অশ্ব প্রবেশ করিল; পোষ্ট মাষ্টার ট্যালবার্টের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "এই প্রকারেই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। তোমার ব্যাগ দাও এবং ভিতরে আসিয়া গরমহও। কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন কোনও উত্তর পাইলেন না।

অবশেষে দেখা গেল যে যুবক পথেই শীতে মরিয়াছে। পরের সুবিধার জন্য সে প্রাণত্যাগ করিল।"

উপরোক্ত গল্পটী ইংরাজী একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ কোন ঘটনা সামান্য লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইলে বোধ হয় কেহই কোন সংবাদ লইতেন না।

ভ্রম-সংশোধন।

গতবারের সখায় ১৮ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভে, ২৮ পংক্তিতে "পৃথিবীর যেমন বার্ষিক" স্থানে "পৃথিবীর যেমন দুই প্রকার গতি আছে, বার্ষিক গতির দ্বারা এক বৎসরে উহা সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে এবং আহ্নিক" পড়িতে হইবে।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। ৯+৮+৭+৬+৫+৪+৩+২+১=৪৫
১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯=৪৫

৮+৬+৪+১+৯+৭+৫+৩+২=৪৫

২। প্রতিধ্বনি।

নূতন।

১। বলত এমন প্রাণী কি আছে যে, প্রাতঃকালে চারিপায়ে, দুই প্রহরের সময়ে দুই পায়ে এবং সন্ধ্যাকালে তিন পায়ে হাঁটে?

স্থানাভাব বশতঃ মন পরীক্ষার কৌশল এবারে দেওয়া গেল না, অন্যবারে দেওয়া যাইবে।

এপ্রিল, ১৮৮৬।

জোসেফ ম্যাট্‌সিনি।

ম্যাট্‌সিনি ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তোমরা গত বারে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছ। ইংলণ্ডে তিনি ১৮৪১ সাল হইতে ১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন। এই ৭ বৎসর তিনি কি চুপ করিয়াছিলেন? আপনার দেশের প্রতি যার এতদূর ভাল বাসা সে ব্যক্তি কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? স্বদেশে তাঁহার ন্যায় যে সকল স্বদেশ-হিতৈষী যুবক পড়িয়াছিলেন তিনি গোপনে তাহাদিগকে চিঠি পত্র লিখিয়া সর্ব্বদা পরামর্শ দিতেন। তাহা ছাড়া তিনি আর একটি কাজ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে লণ্ডন নগরে অনেকগুলি গরিব ইটালীয় কারিকর বাস করিত। তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়া খাইত। তাহাদের মধ্যে অনেকের বয়স অল্প, লেখা পড়া না জানাতে, ও সর্ব্বদা কুসঙ্গে থাকাতে, তাহাদের স্বভাবচরিত্র বড় মন্দ হইয়া যাইতেছিল, ম্যাট্‌সিনি স্বদেশের লোককে বড় ভাল বাসিতেন, তাই তাহাদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় দুঃখ হইল। তিনি তাহাদের জন্য একটী স্কুল খুলিলেন। ঐ স্কুল রাত্রিকালে বসিত। সেখানে তিনি ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু বিনা বেতনে তাহাদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। যাহারা কিছু জানিত না তাহারা লেখা পড়া শিখিতে লাগিল, যাহারা কুসঙ্গে বেড়াইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, তাহারা ভাল কথা শুনিয়া ও ভাল বাসা পাইয়া শুধ্‌রাইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে সাত বৎসরে অনেক গরিব লোককে মানুষের মত করিয়া দিলেন। জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদের এত আনন্দ হইল যে, তাহাদের অনেকে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া এইরূপ গরিবদের জন্য অনেক স্থানে স্কুল করিল।

আগুন যেমন ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠে, তেমনি ইটালীর যুবকদিগের মনে যে স্বদেশ-হিতৈষিতার আগুন এত দিন ধোঁয়াইতেছিল, তাহা ১৮৪৮ সালে দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিল! এক স্থানের অনেক গুলি লোক স্বদেশকে পরাধীনতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রথমে ক্ষেপিয়া উঠিল। এই খবর যত দূর যায় তত দূর দলে দলে লোক ক্ষেপিয়া উঠে। ভদ্র লোকের ছেলেরা সকল কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে স্বদেশ রক্ষার জন্য সৈন্য দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অষ্ট্রীয়া দেশবাসীগণ ইটালীর রাজা ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব রক্ষা করা ভার হইল। ইটালীয় যুবকেরা তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। কিন্তু এই জয়ের সুখ বেশী দিন থাকিল না। মিলান দেশের

একজন রাজার প্রতারণাতে শত্রুপক্ষ আবার জয় লাভ করিল। ম্যাট্‌সিনি দুঃখিত হইয়া আবার সুইজরল্যাণ্ডে গমন করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে রোম নগরের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে নগরের প্রভু পোপ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, রোমবাসী প্রজাগণ রাজাকে তাড়াইয়া নিজেরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। ম্যাট্‌সিনি চির দিন প্রজার পক্ষ, তিনি শুনিবামাত্র রোম নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রোমে প্রজাগণ রাজত্ব করিতে লাগিল। নগরবাসীগণ তিন জন প্রধান ব্যক্তিকে পছন্দ করিয়া তাহাদের প্রতি দেশ রক্ষার ভার দিলেন। ম্যাট্‌সিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। শত শত ভদ্রবংশীয় যুবক সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু আবার এক নূতন শত্রু দেখা দিল। ফরাসি দেশের রাজা লুই নেপোলিয়ান রোমের তাড়িত প্রভু পোপের পক্ষ হইয়া রোমবাসীদিগকে পরাজিত করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া রোমকে পরাস্ত করিল। ম্যাট্‌সিনি আবার সুইজরল্যাণ্ডে গমন করিলেন।

এই সময় হইতে ইটালীদেশে যে আগুন জ্বলিল তাহা আর নিবিল না, আজ এদেশ বিদ্রোহী হয়, কাল ওদেশ বিদ্রোহী হয়, এইরূপে প্রজারা কেবল আপনাদের দেশকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৫৭সালে দক্ষিণ ইটালীর নেপল্‌স নামক নগরবাসীগণ বিদ্রোহী হইয়া আপনাদের রাজাকে তাড়াইয়া দিল এবং নিজেরা দেশ শাসন করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী নামক একজন বীর পুরুষ নেপল্‌স জয় করিয়া দিলেন। তিনি নেপল্‌সের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি হইয়া দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ম্যাট্‌সিনি নেপল্‌সে ফিরিয়া আসিলেন এবং গ্যারিবল্ডীকে অন্যান্য দেশকে অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইমানুয়েল নামক মিলান দেশীয় রাজার হস্তে নেপল্‌স রাজ্যের ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। ম্যাট্‌সিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এ দিকে ইটালী দেশে ক্রমে এক একটী দেশ অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে লাগিল এবং ভিক্টর ইমানুয়েল প্রায় সমুদয় ইটালীর রাজা হইলেন।

ম্যাট্‌সিনির মনে বরাবর দুইটী ইচ্ছা প্রবল ছিল, প্রথম ইচ্ছা যে ইটালীর সকল দেশ এক হইয়া এক জাতি হইবে, দ্বিতীয় ইচ্ছা যে ইটালীতে প্রজাগণ স্বদেশ শাসন করিবে, কোন রাজার অধীন হইবে না। তাঁহার প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে ইটালীর এক একটী দেশ বিদেশীয়দের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল এবং এক রাজার অধীন হইল। সমুদয় দেশে এক স্বাধীনতার ভাব ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছাটী পূর্ণ হইল না। তিনি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া আবার ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরে সিসিলী নামক দ্বীপের লোকেরা প্রজাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি আর এক বার সিসিলী দ্বীপে আসিলেন। কিন্তু এইবারে একজন প্রবঞ্চক তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। তাঁহাকে আবার কারাগারে বদ্ধ করিল। কিন্তু তখন ইটালী দেশের লোক তাঁহাকে এত ভালবাসে যে, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। পাছে তাঁহাকে কষ্ট দিলে দেশে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়— এই ভয়ে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে কারাগারে ক্লেশ দিতে পারিত না। এমন কি, কিছু দিন পরে

তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। তিনি আবার উৎসাহের সহিত তাঁহার মত প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর পরিশ্রম করিবার পর ১৮৮২ সালে তিনি আর একবার ইংলণ্ডে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল; শরীরের সেইরূপ অবস্থায় আল্পস্ পর্ব্বত পার হওয়াতে, তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মিল। এই পীড়াতে কিছু দিন কষ্ট পাইয়া তিনি ১৮৮২ সালের ১৮ই মার্চ্চ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! মানুষ আপনার দেশকে কতদূর ভাল বাসিতে পারে দেখিলে ত? বেচারা চির জন্মটা দেশ ছাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন; কত বার প্রাণসংশয় হইল; দুইবার কয়েদ হইলেন; বিদেশে পরের মধ্যে কত কষ্ট পাইলেন; তবু স্বদেশের প্রতি তাঁহার ভালবাসা কমিল না বরং দিন দিন বাড়িতে লাগিল। স্বদেশকে পরের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিব এই ইচ্ছার জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরের প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা ছিল, তোমরা তাহা শুনিলে, গরিবের প্রতি কত দয়া ছিল তাহাও দেখিলে। যখন তিনি স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া ইংলণ্ডে ছিলেন, তখনও তিনি কেমন নিজের দেশের গরিব লোকদিগকে একত্র করিয়া পড়াইতেন। এমন লোক দেশে জন্মিলে দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়। তোমরা যাহাতে ইহাঁর মত হইতে পার সেই চেষ্টা কর।

দুটী-বোন্।

(১)

মধুর বসন্ত কাল
দিবা অবসান প্রায়,
রাঙ্গা রবি-ছবি খানি
ধীরে ধীরে চলে যায়।

(২)

মধুর বহিছে বায়ু
শীতল করিছে কায়,
ডালে বসি কত পাখী
সুমধুর গান গায়।

(৩)

দেখিয়া এ সুসময়
দুটী মেয়ে হাসি হাসি
হাত ধরা-ধরি করি
বাগানে বসিল আসি।

(৪)

সরলা সুশীলা বালা
বড় ভাব দু-জনায়,
দুটী ফুল গাঁথা যেন
একটী বোঁটার গায়।

(৫)

দেখি শোভা, দুটী বোনে
মহা পুলকিত-কায়,
বসিয়া বকুল-তলে
পরমেশ-গুণ গায়।

(৬)

পরেতে সুশীলা উঠি
হাসি হাসি মুখে বলে,

"আজ দিদি প্রাণ-ভ'রে
তোমারে সাজাব ফুলে।"

(৭)

এত বলি ছুটে গিয়া,
আঁচল-ভরিয়া কত
তুলি ফুল সযতনে
সাজাইল মনোমত।

(৮)

করতালি দিয়া তবে
হাসিয়া হাসিয়া কয়,
"আহা মরি দিদি আজ
কি শোভা হ'য়েছে হায়।"

(৯)

এত বলি সরলারে
ঘিরি ঘিরি বার বার
করতালি দিয়া দিয়া
গান করে, নাচে আর।

(১০)

সরলা উঠিয়া তবে
মধুর মধুর-হাসে,
বলে "বোন তোমারেও
সাজাইব মন-আশে।"

(১১)

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া
কত শত ফুল তুলে,

থরে থরে সযতনে
সাজাইয়া দিল চুলে।

(১২)

গড়িয়া ফুলের বালা
পরাইয়া দিল করে;
গাঁথিয়া ফুলের-হার
গলে দিল থরে থরে।

(১৩)

হাসিয়া হাসিয়া তবে
আনি দুটী চাঁপা ফুল,
ধীরে ধীরে দুটী কাণে
পরাইয়া দিল দুল্।

(১৪)

হ'লে সাজ মনোমত
মুখ-খানি ধরি করে,
সোহাগের চুম দিয়া
বলিল মধুর-স্বরে।

(১৫)

"আহা মরি সুশীলারে,
কি শোভা হ'য়েছে তোর।
চিনিতে না পারি আমি
এই কি সুশীলা মোর?

(১৬)

চল বোন, চল চল
মায়েরে দেখাব আজ,
কতই হবেন সুখী
দেখিয়া তোমার সাজ।"

(১৭)

এত বলি সুশীলার
হাত খানি ধরি করে,
হাসি হাসি মুখ দুটী
চলিল দুজনে ঘরে।

(১৮)

মায়েরে ডাকিয়া বলে,
"দেখ মা এসেছে কারা
চিনিতে কি পার তুমি
তোমার মেয়ে কি এরা?"

(১৯)

হাসিয়া মা আসি কাছে
চুমিলেন গলা ধরি,
বলিলেন "মেয়ে নয়
আকাশের দুটি পরী!"

(২০)

শুনিয়া মায়ের কথা
লাজে মাথা নত ক'রে
মুখেতে মধুর হাসি
দুজনে পলায় ঘরে!

(২১)

আহা এই দুই বোনে
কি সুন্দর ভালবাসা!
দেখিলে জুড়ায় আঁখি
মেটেনা মনের আশা!

(২২)

সরলা সুশীলা মত
তোমরাও হও বোন্,
ভাল বাস পরস্পরে
পিতা মাতা সুখে রোন্!

উকিলের পরামর্শ।

ইউরোপ মহাদেশের মানচিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলে বিলাতের ঠিক দক্ষিণে সমুদ্রপারে যে দেশ দেখিতে পাইবে উহার নাম ফ্রান্স বা ফরাসিদেশ। এই দেশের উত্তর পশ্চিমাংশে, লয়ার নদীর তীরে ন্যাণ্ট্স্ নামে একটী বড় সহর আছে। ইহা ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। এই সহরটী সমুদ্রের উপকূল হইতে ১৩।১৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে। কিন্তু মানচিত্রে অল্প স্থানের মধ্যে অনেক দেশ, নগর, গ্রাম, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র দেখাইতে হয়। কাজেই প্রকৃতপক্ষে যাহা ১৩।১৪ ক্রোশ, মানচিত্রে তাহা দুই এক অঙ্গুলি মাত্র। তোমরা যদি ম্যাপে ন্যাণ্ট্স্ নগর বাহির করিতে চাও তবে ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমে যেখানে লয়ার নদী সমুদ্রের সহিত মিশিতেছে সেই থান হইতে ঐ নদীর কাল দাগের উপর দিয়া তোমাদের সরু সরু আঙ্গুলের এক কি দেড় আঙ্গুল পূর্ব্ব দিকে আসিলেই ন্যাণ্ট্স্ নগর দেখিতে পাইবে। এই ন্যাণ্ট্স্ সহর সমুদ্র হইতে যতদূর, ন্যাণ্ট্স্ হইতে উত্তর দিকে তাহার কিছু কম দ্বিগুণ পথ চলিয়া গেলে রেন্ নামে একটী ক্ষুদ্র সহর দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি তাহা উহারই সন্নিকটে ঘটিয়াছিল।

রেন্ কলিকাতার মত আধুনিক সহর নহে। সহরটী বহু কালের। এই স্থানটী ভাল ভাল উকিলের আবাসস্থল বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। এমন কি ইহার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম সমূহের লোকদিগের ধারণা এই যে, উক্ত সহরে গেলেই কোন উকিলের নিকট গিয়া যাহাহউক একটা পরামর্শ লওয়া অত্যাবশ্যক।

একদিন বার্নার্ড্ নামক একজন কৃষক কোন কার্য্যোপলক্ষে রেন্ সহরে গিয়াছিল। কার্য্য শেষ হইলে পর সে মনে মনে ভাবিল, "এখনও যে সময় রহিয়াছে তাহাতে আমি আরও দুই তিন ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করিতে পারি। তবে এমন সুযোগ ছাড়ি কেন? কোন ভাল উকিলের নিকট একটা পরামর্শ লইয়া যাই।"

বার্নার্ড্ রেন্ নগরে ফয় নামক উকিলের বিশেষ সুখ্যাতি শুনিয়াছিল। সকলে বলিত যে, তিনি যে পক্ষে থাকেন সে পক্ষের জয় নিঃসন্দেহ। কৃষক তাঁহার পরামর্শ লওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তাঁহার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে পর উকিল তাঁহাকে আপনার বসিবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কৃষক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহাশয়ের অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি। অদ্য সহরে আসিবার দরকার হওয়াতে ভাবিলাম, আপনার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব।"

উকিল বলিলেন, "তুমি বোধ হয় কাহারও নামে নালিশ করিতে চাও?"

সরল প্রকৃতি কৃষক উত্তর করিল, "না, মহাশয়! আমার কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ নাই।"

উকিল। "তবে বুঝি কোন বিষয় আশয় বখ্‌রা করিবার জন্য পরামর্শ চাই?"

কৃষক। "না মহাশয়! যাহাদের এক কূয়া হইতে জল খাইতে হয় তাহাদের কি ভাগাভাগি করিলে চলে? আমাদের বংশে কখনও বিষয় ভাগ হয় নাই।"

উকিল। "তবে কি কোন বিষয় কেনা বেচা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিয়াছ?"

কৃষক। "না, মহাশয়! আমার এত টাকা নাই যে বিষয় কিনি, আর আমি এত গরিব হইয়া পড়ি নাই যে, বিষয় বেচিতে হইবে।"

উকিল মহা ফাঁপরে পড়িয়া অবশেষে বলিলেন, তবে তুমি কি চাও, স্পষ্ট করিয়া বল দেখি।"

কৃষক উত্তর করিল,"সে ত আপনাকে আগেই বলিয়াছি। আমি আপনার পরামর্শ চাই। অবশ্য আমি আপনার ন্যায্য ফি দিতে প্রস্তুত আছি।"

কৃষকের ভাব গতিক দেখিয়া উকিলের মুখে একটু হাসি আসিল। অবশেষে তিনি কাগজ কলম হাতে লইয়া কৃষককে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

এতক্ষণে উকিল তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া, কৃষক বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে বলিল,"আমার নাম পিটার বার্নার্ড্।"

"তোমার বয়স কত বৎসর?"

"সাড়ে সাত গণ্ডা কি আট গণ্ডা।"

"তোমার পেসা?"

"সে কি?"

"তুমি কি কাজ কর্ম্ম কর?"

"ওঃ! তার নাম পেসা? তাই বলুন না। আমি চাস বাস করি।"

উকিল মহাশয় কাগজে দুই ছত্র কি লিখিয়া, কাগজ খানি মুড়িয়া সেই অদ্ভুত মক্কেলের হস্তে দিলেন।

কৃষক কাগজখানি পাইয়া বলিল, "ইহার মধ্যেই হইয়া গেল? ভাল, ভাল, আচ্ছা মহাশয়! আমাকে কত দিতে হইবে?"

"তিন ফ্রাঙ্ক (প্রায় দেড় টাকা)।"

উকিল বুঝিয়াছিলেন কিছু মূল্য না লইলে তাঁহার দত্ত পরামর্শের উপর তাঁহার মক্কেলের কখনই শ্রদ্ধা হইবে না। অযত্নলব্ধ পদার্থের প্রতি লোকের বড় একটা আদর দেখা যায় না।

কৃষক উকিলকে তিন ফ্রাঙ্ক দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সে যে রেন্ সহরে আসিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ উকিলের পরামর্শ গ্রহণের সুবিধা ছাড়ে নাই, এই ভাবিয়া তাহার মনে যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

বার্নার্ডের বাড়ী ফিরিতে চারিটা বাজিল। পথশ্রমে তাহার শরীর বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে মনে করিল, "আজি আর কোন কাজ কর্ম্ম করিব না। অবশিষ্ট সময় বিশ্রাম করিতে হইবে।"

বার্নার্ডের শুষ্ক ঘাসের ব্যবসায় ছিল। আজি দুই দিন হইল মাঠের সমস্ত ঘাস কাটা হইয়া গিয়াছে। ঘাস শুকাইতেও বাকী নাই। ঘরে তুলিলেই হয়। এক জন কৃষাণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঘাস ঘরে তুলিয়া গাদা করা হইবে কি না। বার্নার্ডের পত্নী সেই সময়ে স্বামীর নিকটে বসিয়াছিল। সে কৃষাণের কথা শুনিয়া বলিল, "সে কি? এই সন্ধ্যা কালে ঘাস তুলিতে হইবে? কালিও ত ঘাস তোলা হইতে পারে, তবে আর এই অবেলায় কষ্ট করিবার দরকার কি?"

কৃষকের মন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। একবার মনে হইল, ঘাস তুলিলেও হয়, আবার আলস্য বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে তাহার স্মরণ হইল যে, তাহার পকেটে উকিলের পরামর্শের কাগজখানি আছে।

এই কথা স্মরণ হইবা মাত্র সে বলিয়া উঠিল, "একটু থাম। আমার কাছে উকিলের পরামর্শ

আছে। এ বড় সাধারণ পরামর্শ নয়। ইহার জন্য আমার তিন ফ্রাঙ্ক খরচ হইয়াছে। আমাদের এখন কি করা কর্ত্তব্য, ইহা হইতে নিশ্চয়ই জানা যাইবে।" এই বলিয়া বার্নার্ড্ পত্নীর হস্তে উকিলের লেখা কাগজখানি দিয়া বলিল, "তুমি এই লেখাটা পড় দেখি। আমার চেয়ে তুমি হাতের লেখা ভাল পড়িতে পার।"

কৃষক পত্নী কাগজখানি খুলিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা পাঠ করিল।

আজি যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা ফেলিয়া রাখিও না।

"ঠিক কথা!" বলিয়া বার্নার্ড্ উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল যেন সহসা অন্ধকারের মধ্যে আলোক আসিল। "আয়রে ছেলেরা সকলে মাঠে যাই। লোকে যে বলিবে, 'বার্নার্ড্ তিন ফ্রাঙ্ক খরচ করিয়া পরামর্শ আনিয়া তাহার মত কাজ করিল না' তাহা কখনই হইবে না। আমি উকিলের পরামর্শ মত চলিব।"—এই বলিয়া বার্নার্ড্ মহোৎসাহে মাঠের দিকে চলিল। তাহার দৃষ্টান্তে সকলেই কাজে লাগিয়া গেল। শীঘ্রই সমস্ত ঘাস ঘরে তুলিয়া গাদা করা হইল। পরে যাহা ঘটিল তাহা দ্বারাই বার্নার্ডের সদ্বিবেচনা ও উকিলের বহুদর্শিতা বেশ বুঝা গেল।

ঐ রাত্রিতেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হওয়াতে নদীর জল বাড়িয়া পথ ঘাট মাঠ প্লাবিত করিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া কৃষকগণ দেখে যে,যে সকল শুষ্ক ঘাস মাঠে পড়িয়াছিল সব ভাসিয়া গিয়াছে। যাহাদের ঘাস এইরূপে নষ্ট হইয়া গেল তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল। বার্নার্ডের ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে আর যাহাদের জমি ছিল সকলেরই অত্যন্ত ক্ষতি হইল, কেবল বার্নার্ডের কোন ক্ষতি হয় নাই।

এই ঘটনা হইতে উকিলের প্রদত্ত উল্লিখিত পরামর্শের উপর তাহার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। সকল কার্য্যেই সে উকিলের পরামর্শ মত চলিতে লাগিল। ইহার ফল এই হইল যে, অতি অল্প দিনের মধ্যে বার্নার্ড্ তৎপ্রদেশের এক জন সমৃদ্ধিশালী কৃষকের মধ্যে পরিগণিত হইল।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমাদিগকে কি বলিয়া দিতে হইবে যে প্রত্যেক কার্য্যে উপরিলিখিত উকিলের পরামর্শ অনুসারে চলা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য?

অবাধ্যতার প্রতিফল।

প্রথম অধ্যায়।

ঠাকুরমা ও নাতি, নাতিনী।

রায়পুরের দক্ষিণ পাড়ায় নদীর ধারে এক খানি অতি ছোট কুঁড়ে ঘর আছে। সেই ছোট বাড়ীখানির কাছেই আর কোন বাড়ী দেখা যায় না। এ বাড়ীটী দেখিতে অতি সুন্দর। যদিও বাড়ী থানি অতি ছোট, কিন্তু খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; বাড়ীর সামনে একখানি অতি সুন্দর ফুলের বাগান, আর বাড়ীর ভিতরে গৃহস্থের প্রয়োজনীয়

শাক সবজীর বাগান। এই ছোট কুটীর খানিতে বড় বেশী লোক থাকেন না। এক বৃদ্ধা ও তাহার দুটী নাতি নাতিনী, এই তিন জন সেই কুটীরে থাকেন। এই বৃদ্ধাটী অতি সৎ, ধর্ম্ম-পরায়ণা এবং বুদ্ধিমতী। কিরূপে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা দিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। কিরূপে তাহাদের সৎপথে রাখিতে হয় তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকই জানেন। যেমন গুণবতী ঠাকুরমা নাতি নাতিনী দুটীও তেমনি হইয়াছে। এমন ঠাকুরমার কাছে শিক্ষা পেলে কে আবার না ভাল হয়? নাতি-টীর নাম অভয়, বয়স ১৩ বৎসর; নাতিনীটীর নাম কুসুম, সে দশ বৎসরের মেয়ে। ইহাদের দুজনের স্বভাব অতি ভাল।

কুসুমের মন খানি যেন দয়া মায়ায় গড়া। সে কখন কোন রূঢ় কথা বলে না, আর একটী উচ্চ কথা শুনিতেও পারে না। যদি কেহ তাহাকে বকে, অমনি সে কাঁদিয়া ফেলে। কাহার নিষ্ঠুর ব্যবহার তার প্রাণে বড় লাগে। সে কোন প্রকার অন্যায় সহ্য করিতে পারে না। পাছে কোন অন্যায় করে সেই জন্য সে সর্ব্বদাই ভীত। দাদা যদি কোন অন্যায় কাজ করে তবে সে কাঁদিতে বসে। আর কিসে দাদাকে ও ঠাকুর-মাকে সুখী করিতে পারে কেবল সেই ভাবনা ভাবে। ঠাকুরমা কোন কাজ করিতে গেলে, অমনি ছুটিয়া যায় ও বলে "ঠাকুর মা তুমি সর আমি করি, তুমি বসে বসে দেখ। তুমি এতদিন করেছ এখন আমার পালা; আমি এখন বেশ কাজ কর্‌তে পারি, না ঠাকুর মা?" কুসুমের কথাগুলি বৃদ্ধার প্রাণে যেন মধু ঢেলে দেয়। মনে মনে বলেন "তুমি চিরদিন বেঁচে থেকে এমন মিষ্টি কথা বল; আমি শুনে প্রাণ জুড়াই।" অভয়ও খুব ভাল ছেলে। সে সাহসী, পরিশ্রমী, মিষ্টভাষী এবং সত্যবাদী। কিন্তু তাহার দোষের মধ্যে সে খেলার ঝোঁকে কখন কখন ঠাকুর মার কথা অবহেলা করে। সেজন্য তাহার অধিক কিছু শাস্তিও পেতে হয় না। কারণ তার ঠাকুর মা নাতি নাতিনী দুটীকে প্রায় বকেন না। যদি কখন কিছু বলিতে হয় তাহা অতি মিষ্ট কথায় বলেন। তবে কুসুম কখন কখন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে "দাদা তুমি ঠাকুর মার কথা শোন না কেন? আহা! তাতে ঠাকুর মার মনে কত কষ্ট হয়। ঠাকুর মা ত ভাল কথাই বলেন।" তখন অভয় বলে "না না! আমি আর কর্‌ব না। তুই কথায় কথায় অত কাঁদিস্ কেন? তোর কান্নার জ্বালায় বাঁচা ভার। তোর দোষের মধ্যে এই প্রধান দোষ।" কুসুম মনে মনে ভাবে "তাইত আমি কি বড় কাঁদি, আর কাঁদিব না।"এই যে বাড়ীর সাম্‌নের বাগানটী ইহা অভয় ও কুসুমের শ্রমের ফল। তারা দুটী ভাই বোনে প্রত্যহ বিকালে বাগানে খাটে। কুসুম পুকুর হতে ছোট কলসী করে জল এনে এনে বাগানে দেয়। অভয় মাটি খোঁড়ে ও গাছ বসায়। কুসুম বাগান পরিষ্কার করে। বাস্তবিকই বাগানটী দেখিতে যে কি সুন্দর তাহা আর বলি-বার নহে। রোজ কত ফুল যে ফোটে তাহা বলা যায় না।

গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাবেলা কেমন বেল, যুঁই ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠে। কুসুম রোজ ফুল তুলিয়া ঠাকুরমাকে দেয়। আবার এক দিন কুসুম ফুল তুলিয়া ঠাকুর মাকে সাজা-ইতে যায় "ঠাকুরমা তোমায় ফুল দিয়া সাজাই, চুল বেঁধে দি, আমার ভাল কাপড় পর তোমায় কেমন দেখায় দেখি। তোমায় খুব সুন্দর দেখাবে। তুমি পর পর, দুটী পায় পড়েছি।" ঠাকুর মা তার

কথা শুনে হাসিয়া বলেন—"দুর পাগ্‌লী দিদি আমায় পরতে নাই। লোকে দেখ্‌লে হাস্‌বে। তুমিই পর। আমার কাজ নাই।" এইরূপ কুসুম সর্ব্বদাই ঠাকুরমাকে সুখী করিতে চায়। পাঠক পাঠিকাগণ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পার ইহাদের মা বাপ নাই কি? আহা! তোমাদের শুন্‌লে বড় দুঃখ হবে, যখন এই ছেলে মেয়ে দুটী অতি ছোট তখন ইহাদের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তখন কুসুম কেবল দশ মাসের মেয়ে। বৃদ্ধার প্রাণে যে কি ব্যথা লেগেছে তাহা এ পৃথিবীতে কেহ জানে না। তাঁর একমাত্র ধন তাঁকে এ সংসারে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুসুমের মা অতি লক্ষী মেয়ে ছিলেন। বৃদ্ধা বধুকে যে কি ভাল বাসিতেন তাহা বলিবার নয়। কুসুমের মার মৃত্যুর দুই তিন মাস পরেই তাঁহার পুত্রেরও মৃত্যু হয়। উঃ! এত শোক কি তাঁর সহ্য হয়! তাঁর প্রাণ যে কত কাঁদে তাহা কেহ জানে না। উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, কেবল তাঁদের দুজনের কথা মনে পড়ে। কিন্তু প্রাণের দুঃখ প্রাণে চেপে রেখে হাসিমুখে বেড়াতে হয়। চোখের জল ফেলিবার সুযোগ তাঁর নাই। ওচোখে দুই ফোঁটা জল দেখিলে ভাই বোন্‌ অস্থির হইয়া উঠে। "ও ঠাকুরমা কাঁদ কেন, ও ঠাকুরমা কেঁদ না" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলে। ঠাকুরমা তাদের চোখের জল দেখে অতি কষ্টে নিজের চোখের জল চোখেই থামাইয়া রাখেন। যখন বালক বালিকা দুটী ঘুমাইয়া পড়ে, তখন তাহাদের ঘুমন্ত পবিত্র মুখে বার বার চুম্বন করেন, আর হাত দুটী যোড় করিয়া ইষ্ট দেবতার কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। মনে মনে ভাবেন "হায়রে এরা যদি না হত,তবে আমার আঁধার প্রাণে মাঝে মাঝে কে আলো এনে দিত? এদের ব্যবহার কি চমৎকার! এদের যত্নে, ভালবাসায় আমি কত সুখী। হায়! হায়! এরা অতি দুঃখী, কখন বাপ মায়ের ভালবাসা পায় নাই। এরা কাহাকেও চেনে না। আমিই এদের সর্ব্বস্ব। এরা আমাকে ছাড়া আর কাকেও জানে না। আহা! এরাও কি দুঃখী! বাছারা যে দুঃখী তাহা আদবেই বুঝে না। যত দিন এই ভাবে যায় তত দিনই ভাল, বুঝ্‌লে বড় কষ্ট পাবে। আমার ত এক দণ্ড এ পৃথিবীতে বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। এখনই মরিলে আর এক তিল বাঁচিতে চাই না; কিন্তু বাছাদের কথা ভাব্‌লে মনে হয়, আমি হাজার কষ্ট পাই না কেন, আমি গেলে এদের দশা কি হবে। বাপ্‌রে কাজ নাই, যতদিন ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন তত দিন এদের সেবা করে সুখী হই।"

অভয় ও কুসুম দুজনার চোখ সর্ব্বদাই ঠাকুরমার উপর। আর ঠাকুরমার চোখ তাদের দুজনের উপর।

এক দিন বিকালে অভয় বাগানের কাজ কর্‌ছে আর ঠাকুরমার সঙ্গে গল্প কর্‌ছে; তখন ঠাকুরমা দরজায় বসে চর্‌কাতে সূতা কাট্‌ছেন। ঠাকুর মা নাতিতে কথা হওয়াতে ঠাকুরমা বলিলেন "দাদার আমার সব ভাল, সব দিকেই সোণার চাঁদ। কেবল দোষের মধ্যে মাঝে মাঝে আমার কথায় অবহেলা করে।"

অভয়। "ঠাকুরমা আমি আর কখন তোমার কথায় অবহেলা কর্‌ব না। তুমি যখন যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। আমি ত তোমায় কষ্ট দিবার জন্য ইচ্ছা করে করি না—অমনি হয়ে পড়ে।"

ঠাকুরমা। "আচ্ছা দাদা! তোমায় আর কিছু বল্‌ছি না। দেখ যেন কথা রাখ্‌তে পার। আর যেন কালই কথা ভাঙ্গিতে না হয়।"

অভয়। "না ঠাকুরমা! আর হবে না। তুমি দেখ আমি রাখি কি না।"

ঠাকুরমা শুনে সুখী হলেন। আর কিছু বলিলেন না। পাঠক পাঠিকাগণ আমরাও দেখিব অভয় কেমন করে তাঁর কথা রাখে।

জোয়ার ভাঁটা।

(২য় পাঠ।)

ত বারে দেখা গিয়াছে যে, চন্দ্র বা সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার ভাঁটা হইয়া থাকে। আজ ঐ বিষয়ের আরও অনেক গুলি কথা লিখিব। মন দিয়া পড়।

"পূর্ণিমা ও অমাবস্যা" নামক যে বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পড়িয়াছ যে, পূর্ণিমার দিন সূর্য্য যখন পশ্চিমে অস্ত যায় চন্দ্র তখন বড় গোলাকার থালাটীর মত পূর্ব্ব দিকে উদয় হইতে দেখা যায়। আবার অমাবস্যার দিন যখন সূর্য্য অস্ত যায় চন্দ্রও সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়, রাত্রির মধ্যে আর দেখা দেয় না। এরূপ কেন হয়, তা তোমরা সহজেই বুঝিতেছ। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার আপনি ঘূরে, সেজন্য ঐ সময়ের মধ্যে সূর্য্যকে পৃথিবীর চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে দেখা যায়। সূর্য্য সমস্ত সৌর জগতের কেন্দ্র ও পৃথিবীর সম্বন্ধে স্থির। এজন্য উহা আজ ১২টার সময়ে মাথার উপর থাকে, কালও ১২টার সময়ে ঠিক মাথার উপর আসিবে। কিন্তু চন্দ্র সেইরূপ স্থির নহে; উহা পৃথিবীর চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, এজন্য আজ সন্ধ্যা বেলা যদি মাথার উপর দেখা যায়, কাল ঐ সময়ে মাথার খানিকটা পূর্ব্ব দিকে থাকিবে, পরশু আরও একটু,—এইরূপ। এই জন্য সূর্য্য ও চন্দ্র একত্রে চিরকাল থাকে না। এক মাসের মধ্যে এক দিন একত্রে থাকে, ঐ দিন অমাবস্যা, তার পর হইতে ক্রমে পেছিয়া পড়ে ও অবশেষে পূর্ণিমার দিন ঠিক বিপরীত দিকে উপস্থিত হয় এবং আরও ১৫ দিনে আবার একত্র হইয়া থাকে।

চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই সমুদ্র ও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, কিন্তু বল দেখি কাহার আকর্ষণের বল অধিক? নিশ্চয়ই বলিবে—সূর্য্যের। কেন না উহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক লক্ষ (১৪ লক্ষ) গুণে বড়, আর চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট। সুতরাং ইহাই মনে হওয়া সম্ভব যে সূর্য্যের আকর্ষণে উৎপন্ন জোয়ার অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণে যে জোয়ার উৎপন্ন হয় তাহা অনেক কম হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, বরং বিপরীত; চন্দ্রাকর্ষণেই জোয়ারের তেজ অধিক। আশ্চর্য্য হইও না, ধীরভাবে শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।—গতবারেই দেখিয়াছ যে, আকর্ষণের মোট পরিমাণে জোয়ার হয় না। ধরাতলের এক অংশের উপর চন্দ্র বা সূর্য্যের যে আকর্ষণ তাহার অপেক্ষা দূরবর্ত্তী অপর কোন অংশের উপর উহাদের আকর্ষণের যে অল্পতা তাহারই উপর জোয়ার নির্ভর করে। এই নিয়মটী জোয়ার নিয়মের মূল। আবার বলি,—পৃথিবীর এক ভাগের জলকে

চন্দ্র বা সূর্য্য যত বলের সহিত আকর্ষণ করে, যদি তদ্বিপরীত দিকের জলকেও ঠিক সেই পরিমাণ বলের সহিত আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে জোয়ার ভাঁটা হইতই না। কেবল এই দুই স্থানে আকর্ষণের পরিমাণ কম বেশী হয় বলিয়াই জোয়ার হইয়া থাকে। ইহা তোমরা গত বারের ছবিতেই বুঝিবে।

উক্ত কম-বেশীর উপরই যদি জোয়ার নির্ভর করিল, তবে সহজেই বুঝা যায় যে সূর্য্যের আকর্ষণে যদি এই তফাৎ চন্দ্রাকর্ষণের অপেক্ষা বেশী হয় তবে সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার বেশী হইবে। আর যদি চন্দ্রাকর্ষণে এই তফাৎ অধিক হয় তবে উহাতেই জোয়ার বেশী হইবে। বাস্তবিক শেষটী ঠিক। অর্থাৎ ক যদি সূর্য্য হয়, তবে ব নামক স্থানটীতে সূর্য্যের যত বল, তাহা অপেক্ষা ফ নামক স্থানটীতে উহার আকর্ষণের বল কম (দূর বলিয়া) মনে কর এই তফাৎ যেন A। তার পর, ক যদি চন্দ্র হয়, তবে ব নামক স্থানে উহার আকর্ষণের বল যত, তাহা অপেক্ষা ফ স্থানটীতে কম। মনে কর এই তফাৎ B। এখন কথাটী এই যে A বেশী, কি B বেশী? যদি A বেশী হয় তবে সূর্য্যের আকর্ষণে বেশী জোয়ার হইবে, আর যদি B বেশী হয় তবে চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার বেশী হইবে। দেখা যায় যে B বেশী। সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ার বেশী প্রবল হইয়া থাকে।
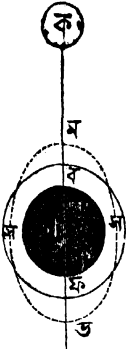
তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা এত ছোট অথচ উহার আকর্ষণের তারতম্য (তফাৎ) বেশী কেন হয়? তাহার কারণ এই যে, চন্দ্র পৃথিবীর খুব কাছে আছে কিন্তু সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত। মোটামুটি এইটুকু বুঝাইয়াই আমাদিগকে থামিতে হইবে। আর উহার সূক্ষ্ম কারণ বুঝাইবার চেষ্টাও করিব না, কেন না সে গুলি একটু কঠিন ও জটিল। বড় হইয়া আপনারা বুঝিতে চেষ্টা করিও। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিব, সেই তুলনায় একটা মোটা রকমের ধারণা করিতে যত্নবান হও। মনে কর ব নামক একটী বালককে ২০টী টাকা দিলাম, আর ফ নামক আর একটীকে ১৫টী টাকা দিলাম, তাদের তফাৎ ৫৲ টাকা হইল। আর তুমি ব কে ৫০০ টাকা দিলে আর ফ কে ৪৯৯৲ টাকা দিলে তাদের তফাৎ ১৲ একটী টাকা হইল। এখানে তোমার চেয়ে টাকা আমি অনেক কম দিলাম সত্য, কিন্তু তাদের মধ্যে তফাৎ আমার ৫৲, আর তোমার ১৲টাকা মাত্র। অর্থাৎ উপরিলিখিত Bটী A অপেক্ষা বেশী। কাজেই চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ারের তেজ বেশী হয়।

এখন, আর একটী দরকারী কথা বুঝিতে পারিবে। তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে জোয়ারের যত তেজ অধিক হয় অন্য তিথিতে তত হয় না। ষষ্ঠী সপ্তমীতেও জোয়ার হয়, কিন্তু সে জোয়ার তত বেগবান্ নহে। তাহার কারণ কি?

চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই পৃথিবীর চারিদিকে সর্ব্বদা রহিয়াছে। উহারা যেখানেই থাকুক, পৃথিবী ও সাগরের কোন না কোন অংশকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণে যে জোয়ার হয় তাহাকে "সৌর জোয়ার" বলা যায়, আর চন্দ্রের আকর্ষণে উৎপন্ন জোয়ারকে "চান্দ্র জোয়ার" বলে। এই উভয় প্রকারের জোয়ারই সদা সর্ব্বক্ষণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোথাও

না কোথাও উৎপন্ন হইতেছে। যে সাগরের উপর যখনিই সূর্য্য উপস্থিত হয়, সেখানে ও তদ্বিপরীত ভাগে তখনই "সৌর জোয়ার" উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ যেখানে যখনই চন্দ্র থাকে সেখানে ও তার বিপরীত দিকে তখনই "চান্দ্র জোয়ার" উৎপন্ন হয়। এবং তাহাদের উভয় পার্শ্বভাগে "সৌর ভাঁটা" ও "চান্দ্র ভাঁটা" যথাক্রমে হইয়া থাকে। কিন্তু "চান্দ্র জোয়ার" "সৌর জোয়ার" অপেক্ষা অধিক প্রবল দেখা যায়। "সৌর জোয়ার" স্বতন্ত্র ভাবে দেখাই যায় না।

অমাবস্যার দিন চন্দ্র ও সূর্য্য এক দিকে থাকে, এজন্য "চান্দ্র জোয়ার" ও "সৌর জোয়ার" একত্র উৎপন্ন হয় ও দেখা যায়। তখন উহার বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; নাম—"ভরা কটালের জোয়ার"। আবার পূর্ণিমার দিনও চন্দ্র এবং সূর্য্য পরস্পর বিপরীত দিকে এক রেখায় অবস্থিতি করে, সুতরাং সে দিন চন্দ্রের নীচে সাগরের জোয়ার ও সূর্য্যের বিপরীত দিকের জোয়ার একত্র মিশে, এবং চন্দ্রের বিপরীত সাগরের প্রবল জোয়ার ও সূর্য্যের নীচের জোয়ার একত্র মিলিত হয়। এজন্য সে দিনও "ভরা কটালের জোয়ার" খুব প্রবল হইয়া থাকে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পর হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য ক্রমে এক রেখা হইতে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে এজন্য ক্রমে ঐ দুই জোয়ারও একত্র মিলিত অবস্থা হইতে সরিয়া যায়। ক্রমে ষষ্ঠী সপ্তমী তিথিতে সৌর ও চান্দ্র জোয়ার পরস্পরের ঠিক বিপরীত দিকে কার্য্য করে। অর্থাৎ চান্দ্র জোয়ার যেখানে হয় সেইখানে সৌর ভাঁটা পড়িয়া যায় আর সৌর জোয়ারের স্থানে চান্দ্র ভাঁটা পড়ে। কিন্তু এই বিপরীত কার্য্যে (পূর্ব্বে যে কারণ বুঝাইয়াছি তাহার জন্য) চন্দ্রেরই জিৎ হয়। চান্দ্র জোয়ারটাই দেখা যায়, সৌর জোয়ার দেখাই যায় না। কিন্তু চন্দ্রের জোয়ারেরও সেই সময়ে খুব কম জোর হইয়া থাকে। ইহাকেই মাঝীরা "মরা কটালের জোয়ার" কহে। ছবি দেখ।
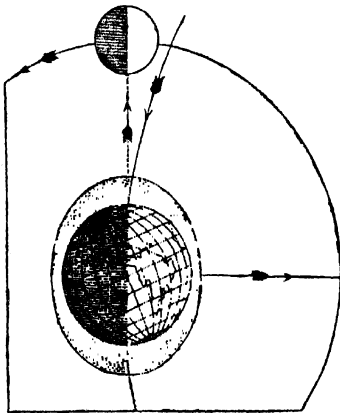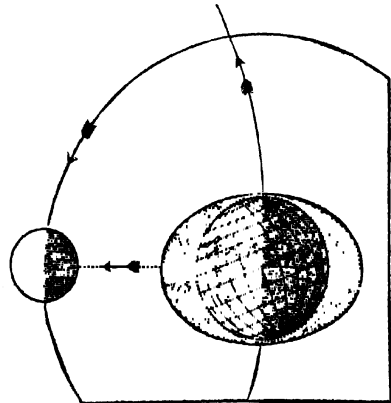
-সূর্য্য-

আর একটী কথা। বান্ ডাকে কেন? ভরা কটালের যখন ভাঁটা পড়ে, তখন খুব নীচে জল নামিয়া আসে। নদীর খোলের ভিতরে জলটুকু যেন মিলাইয়া থাকে, অথচ খুব জোরে সাগরের দিকে জল চলিতে থাকে। এমন সময়ে সাগরে প্রবল বেগে ভরা কটালের জোয়ার উঠিয়া সাঁ সাঁ

করিয়া ছুটিয়া নদীর মুখে প্রবেশ করে। এইখানে মহা গোল হয়। ভীষণ বেগে সাগরের প্রবল জোয়ারের জল নদীতে প্রবেশ করিতে যায়, নদীর খোলটীও ভাঁটাতে একেবারে খালি হইয়া রহিয়াছে। কাজেই ছোট একটী জলের পাহাড়, কি উচ্চ একটী জলময় দেয়াল যেন কল কল— সোঁ সোঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সুমুখে যা পায় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ভাসাইয়া ডুবাইয়া, তোলপাড় করিয়া বান্ ডাকে। কি ভয়ানক! কলিকাতার ষাঁড়াষাঁড়ীর বান্ দেখিবার জন্য কত লোক তীরে দাঁড়ায়। মাঝীরা সব ভয়ে আকুল হইয়া আপন আপন নৌকা লইয়া গভীর জলে গিয়া দাঁড়ায়; কেন না, সেখানে কিনারা অপেক্ষা বানের তেজ কম। যেখানে বড় চড়া পড়িয়াছে, সেই থানেই বানের তেজ খুব ভয়ানক।

জোয়ার সম্বন্ধে তোমাদিগকে আর একটী মাত্র কথা বলিব। নদীতে জোয়ার আসিলে জল যেমন সাঁ সাঁ করিয়া উপর দিকে চলিতে থাকে, সাগরে কিন্তু সেরূপ হয় না। তথায় জল কেবল জোয়ারের সময় উচ্চ হইয়া ফুলিয়া উঠে আর ভাঁটার সময় নীচু হইয়া পড়ে। এই উঁচু নীচু হওয়া আর স্রোতের মত চলা খুব তফাৎ। ইহা ঠিক যেন শস্যক্ষেত্রের ঢেউএর মত। ধান্যক্ষেত্রে বাতাস লাগিলে গাছগুলি যেমন ঢেউ খেলায় কিন্তু চলে না, সাগরের জলে জোয়ারের গতিও ঠিক সেই রকম। সেখানকার জল সেইখানেই থাকে, তথাকার জাহাজও সব ঠিক থাকে কেবল একবার খানিকক্ষণ জলটা উচ্চ হইয়া উঠে আর খানিক সময় নীচু হইয়া পড়ে। কেবল চড়াতে বা নদীর মুখেই জোয়ারের জল বেগবান হইয়া গতিপ্রাপ্ত হয়।

ভোঁদড়।

অনেক স্থানেই ভোঁদড় দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকেই কলিকাতার পশুশালায় গিয়াছ; সেখানে একটা গোল চৌবাচ্ছায় যে কয়েকটা ভোঁদড় রাখা হইয়াছে তাহাদের কাছে ১০।১৫ মিনিট দাঁড়াইয়াছ কি? আমি যত দিন সে গুলিকে দেখিতে গিয়াছি, এক দিনও তাহাদের কোনটাকে স্থির হইয়া বসিতে দেখি নাই। একবার ডুব দেওয়া আর কিছু দূর গিয়া মুখ ভাসাইয়া পুনরায় ডুব দেওয়া,—কাযের মধ্যে তো এই; ইহা লইয়াই বেচারারা এত ব্যস্ত যে দেখিলে বোধ হয় ঐ জলটুকুর প্রত্যেক পরমাণুর সহিত তাহাদের পরিচয় থাকার উপরই ব্রহ্মাণ্ড নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা দেখিয়া হয় ত মনে করিয়াছ যে ঐরূপ করিয়া তাহারা জলের ভিতর মাছ খোঁজে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মাছ খুঁজিতে হইলেও ঐরূপ করা সম্ভব বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় কেবল আমোদ করিবার জন্যই ইহারা ঐরূপ করিয়া থাকে।

ভোঁদড়গুলি অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। স্বাধীন অবস্থায় তাহাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী জলার ধারে পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া যখন খেলা করে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন পৃথিবীতে তাহাদের চাইতে সুখী জীব আর নাই। আমি বন্য ভোঁদড়ের খেলা কখনও স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে তাহার চাইতে আমোদজনক দৃশ্য

বড় অধিক নাই। দিনের বেলায় কিন্তু ইহারা তত মন খুলিয়া আমোদ করিতে পারে না; সূর্য্য অস্ত গেলেই তাহাদের আনন্দের সময় হয়। তাহাদের খেলার একটা বেশ নিয়ম আছে। প্রথমে সংগীত, তার পর ব্যায়াম। কোন কোন সময় ব্যায়াম এবং সংগীত এক কালেই চলিতে থাকে। তাহারা কোন্ রাগিণী কোন্ তাল অবলম্বন করিয়া কি গান গায়, তাহা আমি বলিতে সক্ষম নহি; তবে ব্যাপারটা কিরূপ হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। অনেক ছেলের গান গাইবার একটা বাতিক আছে। তাহাদের গানে পৃথিবীর সকল প্রকারের রাগিণী এবং সকল প্রকারের তালই এক সময়ে ব্যবহার হয়। মনে কর এইরূপ কুড়িজন ছেলে তিন রাত্রি বাহিরে বসিয়া চ্যাঁচাইল, আর হিম লাগিয়া তাহাদের গলা বসিয়া গেল——এখন কথা কহিতে গেলে কেবল একটা সাঁই সাঁই শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এখন যদি এই কুড়িজন ছেলে রাত্রিতে নদীর ধারে কোন নির্জ্জন বনে গিয়া গান গায়, আর ম্যাও ম্যাও করে, আর শেয়ালের ডাক ডাকে, আর কাশে, আর নাকে কাঠি দিয়া ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করিয়া হাঁচে, তবে ভোঁদড় পরিবারের গানের কতকটা নকল করিতে পারে। ইহাদের ব্যায়াম উল্টাবাজি। তোমাদের ব্যায়াম-শিক্ষক হয়ত তোমাদিগকে দুই তিনজনে মিলিয়া মাটির উপর উল্টাবাজি করিতে হইলে কিরূপ করিতে হয় তাহা বলিয়া দিয়াছেন। না দিয়া থাকিলেও আমাদের দেশী বাজিকরদিগকে ঐরূপ করিতে অবশ্যই দেখিয়াছ। ভোঁদড়েরা ২০। ২৫টা মিলিয়া একটা পিণ্ডের আকার ধারণপূর্ব্বক ঐ বাজি করে। তবে তোমাদের উল্টাবাজিতে আর তাহাদের উল্টাবাজিতে একটু তফাৎ আছে। তোমরা সমান জমির উপর উল্টাবাজি কর, তাহারা ডাঙ্গার উপর হইতে উল্টাবাজি করিয়া গড়াইয়া জলে পড়ে।

আমি যখন খুব ছেলে মানুষ ছিলাম, তখন

আমাদের বাড়ীতে একটী ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীর কাছে অনেক ভোঁদড় আছে। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে ভোঁদড়ের প্রতিহিংসা লইবার বৃত্তিটা বড় প্রবল। কাহারও উপর কোন কারণে চটিলে তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। ঐ ভদ্রলোকটীর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি প্রায়ই রাত্রিতে ছোট নৌকায় উঠিয়া মাছ ধরিতে যাইতেন। এক দিন নৌকার সম্মুখে একটা ভোঁদড় দেখিতে পাইয়া তাহাকে এক খণ্ড বাঁশ দিয়া গুঁতা মারিলেন। গুঁতা খাইয়া ভোঁদড়টা ক্যাঁচম্যাচ করিয়া উঠিল; আর অমনি নৌকার চারি ধারে কতকগুলি ভোঁদড় মাথা জাগাইল। তিনি বলিয়াছেন যে "সৌভাগ্যের বিষয় সেখানে অনেকগুলি ভোঁদড় ছিল না, সুতরাং তাহারা নৌকা আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই, নতুবা সে দিন তাঁহার প্রাণ লইয়া ঘরে আসাই দায় হইত।"

ভোঁদড়েরা মাছ ধরিয়া খায়; মাছ ধরিতে ইহারা এত পটু যে, কোন কোন দেশের জেলেরা ইহাদের সাহায্যে মাছ ধরিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করে। ভোঁদড়ের সাহায্যে মাছ ধরাটা খুব সহজ ব্যাপার মনে করিও না। ভোঁদড় মাছ ভাল ধরিতে পারে সত্য; কিন্তু ধরিলে কি হইবে, পেটুক দুষ্টু ছেলের হাতে সন্দেশ দিলে যেরূপ হয়, অশিক্ষিত ভোঁদড়ের উপর মাছ ধরিবার ভার দিলেও সেইরূপই হয়। ভোঁদড় মাছ পাইলেই খাইয়া ফেলে। খাইতে খাইতে পেট ভরিয়া গেলেও মাছ ধরিতে ছাড়ে না। পেট ভরিলে মাছ খায় না, কিন্তু ধরিয়া তাহাকে দাঁতে টুক্‌রা টুক্‌রা করে। সুতরাং তখন ভোঁদড় মাছ না খাইলেও ওরূপ জন্তুকে মাছ ধরিতে দিয়া মৎস্যব্যবসায়ীর লাভ অতি অল্পই হয়।

ভোঁদড়কে দিয়া মাছ ধরাইবার ইচ্ছা থাকিলে খুব ছোট ছানা ধরিয়া আনিতে হয়। সেই ছানাকে মাছ খাইতে দিবে না; কেবল নিরামিষ খাওয়াইয়া তাহাকে পুষিবে। ভোঁদড় সহজেই কুকুরের মতন পোষ মানে। কোন জিনিস ছুড়িয়া ফেলিলে কুকুরের ন্যায় ভোঁদড়ও তাহা আনিয়া দিতে শিখিতে পারে। প্রথমতঃ তাহাকে ঐরূপে নানাপ্রকারের জিনিস আনিয়া দিতে শিখাইতে হয়। এই বিষয়টা খুব ভালরূপ শিক্ষা হইলে শুক্‌নো মাছ দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। মাছের ছালের ভিতর খড় পূরিয়া তাহাদ্বারা প্রথমতঃ পরীক্ষা করিলে আরো ভাল হয়। শুক্‌নো মাছ আনিয়া দিতে শিক্ষা হইলে অর্থাৎ যদি দেখ যে ভোঁদড় সেই শুক্‌নো মাছটাকে খাইয়া ফেলিবার মত কোন ভাব প্রকাশ না করে —তাহা হইলে তাহাকে মরা মাছ আনিতে দিবে। মরা মাছের পাঠ ভালরূপ শিক্ষা হইলে তাহাকে নির্ভয়ে জলে ছাড়িয়া দিতে পার।

ভোঁদড়ের লোম অতি কোমল। এই জন্য অনেক লোকে ভোঁদড় মারিয়া তাহার ছাল বিক্রয় করে। সেই ছালে বড়লোকের পা রাখিবার আসন তৈয়ারি হয়; আরো অনেক জিনিস তৈয়ারি হয়।

অনেক স্থানে দেখিয়াছি নদীর পার ঢালু হইলে ছেলেরা তাহাকে জল দিয়া পিছল করিয়া লয়, এবং তাহার উপর দিয়া জলে পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া খেলা করে। কানাডা দেশীয় ভোঁদড়গুলিও এই খেলা জানে। সেখানে ঢালু ও মসৃণ বরফের উপর উপুড় হইয়া ভোঁদড়গুলি খেলা করিয়া থাকে। অনেক সময় তাহারা এইরূপে ৪০ হাত পর্য্যন্ত পিছ্‌লাইয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—স্থানাভাব বশতঃ এবারে 'বেলুনের প্রবন্ধ' প্রকাশিত হইল না।

মে, ১৮৮৬। বৈশাখ, ১২৯৩।

প্রবাল কীট।

পলাকাটি তোমরা কি দেখ নাই? সেই যে লাল লাল ছোট ছোট ফুলের মত গাঁথিয়া লোকে মালা করে। ফকিরদিগের গলাতে অনেক সময় দেখা যায়। ঐ পলাকাটি কিরূপে জন্মে তাহার বিবরণ কি জান? প্রথমে সেই দ্বীপনির্ম্মাণকারী প্রবালের বিষয় কিছু বলিব; পরে লাল পলাকাটি সংগ্রহের বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে।

তোমরা সকলেই জান যে পুকুরে মাছই কেবল থাকে না, অন্য অনেক রকম পোকা মাকড়ও জলের মধ্যে বাস করে। কত প্রকারের ঝিনুক, শামুক, গুগ্‌লী ও অন্যান্য নানা রকম কীট জলে থাকে। নদীর জলেও সেইরূপ হাঙ্গর, কুম্ভীর ও বড় বড় মাছের সহিত লক্ষ লক্ষ রকমের জীব বাস করিয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে যে কত রকম জীব জন্তু আছে কে তাহার গণনা করিতে পারিবে? একদিকে যেমন প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত তিমি মাছ সকল সাগরের মধ্যে ডুবিয়া, ভাসিয়া, খেলিয়া বেড়াইতেছে আর একদিকে আবার ক্রমে ছোট হইতে আরও ছোট, অবশেষে এত ছোট ছোট কীটাণু অসংখ্য অসংখ্য একত্রে বিচরণ করে যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাস্তবিক সাগর পরমেশ্বরের এক অতি অদ্ভুত সৃষ্টি!

প্রবাল কীট সাগরের জলের এইরূপ এক জাতীয় কীটবিশেষ। তাহাদের মধ্যে আবার নানা জাতীয় কীট দেখা যায়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার চারুপাঠে কয়েক জাতীয় কীটের ছবি দিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে অনেক জাতি দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কীট; এমন কি অনেক অংশে ইহাদিগকে কীট না বলিয়া উদ্ভিদ বলিলেও বলা যায়। কীটদিগের দেহের গঠন প্রণালীর মধ্যে রীতিমত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে, তাহাদের দেহে রক্ত সঞ্চালনের ও শ্বাস প্রশ্বাসের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা দেখা যায় কিন্তু ইহাদের প্রায়ই তাহা নাই। ইহাদের পাকস্থলীর গঠন ও কার্য্যপ্রণালী ঠিক কীটদিগের মত নয়, এবং কীটদিগের স্নায়ু ও শিরাসমূহের যেরূপ সুব্যবস্থা দেখা যায় ইহাদের দেহমধ্যে তাহারও কোন চিহ্ন দেখা যায় না। প্রবাল জাতীয় কীটগুলি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কীট, অথবা কেহ কেহ বলেন যে কীট ও উদ্ভিদের মাঝামাঝি এক প্রকার সৃষ্ট বস্তু।

উপরে একটী প্রবাল কীটের ছবি দেওয়া গেল। এই জাতীয় কীটেরাই দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। অন্যান্য যে সকল কীট ইংলণ্ড বা অন্য দেশে সচরাচর দেখা যায় তাহারা দ্বীপ নির্ম্মাণ করিতে পারে না। তাহাদের ঐ টবের মত কঠিন আবরণটী থাকে না। তাহাদের শরীরের সমস্তই একটা শক্ত মাংসের মত বা রবারের মত পদার্থে নির্ম্মিত। অর্থাৎ ঝিনুক বা শামুকের দেহ যেরূপ চট্‌চটে ও শক্ত মাংসের দ্বারা তৈয়ারী, সাধারণতঃ এই সকল কীটেরও তাই। তাহারা শৈবালাদির ন্যায় এক স্থানেই চিরদিন লাগিয়া থাকে। কোন কারণে স্থানচ্যুত হইলে শামুকেরা যেমন নিজেদের দেহ কুঞ্চন করিতে করিতে চলে, ইহারাও সেইরূপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাটি বা পাথরের গা বহিয়া বহিয়া যাইতে পারে। শামুকের যেমন দুটী শুঁড় থাকে, ও মাঝখানে একটা বড় রকমের গর্ত্ত থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ অনেকগুলি শুঁড় (লেবুফুলের মত, ছবি দেখ) থাকে ও মধ্যস্থলে একটু বড় রকমের একটী গর্ত্তও দেখা যায়। ঐ গর্ত্তটা ইহাদের মুখ আর শুঁড়গুলি ইহাদের ইন্দ্রিয়ের মত। যদি একটু কিছু কঠিন বস্তু তাহাতে লাগে, অমনি সমস্ত শুঁড়গুলি ঝাঁ করিয়া বুজিয়া যায়, আর কীটকে তখন জন্তু বলিয়াই বুঝা যায় না; মনে হয় যেন একটা ছোট দোয়াৎ কি অন্য কিছু পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ মুখের মধ্যে যে সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীট বা অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী পড়ে তাহাই ইহাদের আহার হয়। মুখ দিয়া ক্রমে পেটের ভিতর প্রবেশ করে ও তথায়ই হজম হইয়া খাদ্যের সারভাগ দুধের মত এক রকম জিনিস হইয়া কীটের শরীর পোষণ করে; অবশিষ্ট অসার ভাগ মুখ দিয়াই আবার বাহিরে আসে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাধারণতঃ এই সকল কীটের দেহ কেবল রবারের মত এক প্রকার কঠিন মাংসে নির্ম্মিত। ইহারা কিন্তু দ্বীপ নির্ম্মাণে সমর্থ হয় না। তাহাদের মধ্যে এক জাতের কীটের অঙ্গের নিম্নভাগে এক এক প্রকার কঠিন আবরণ হয় (ছবি দেখ) ইহারাই যথার্থ প্রবাল দ্বীপ নির্ম্মাণকারী কীট। ইহাদের শরীরে দুধের মত যে এক প্রকার পোষণকারী পদার্থ থাকে তাহার সাহায্যে সাগরের লোণা জল হইতে ঐ প্রকার কঠিন আবরণ প্রস্তুত হয়। মানব শিশুদিগের দেহে যেমন রক্তের সাহায্যে দুধ হইতে হাড় প্রস্তুত হয়, ইহাদেরও সেইরূপ দুগ্ধবৎ রক্তের সহিত সাগরের জলের যোগে এই কঠিন আবরণ হইয়া থাকে। ছবিতে যে কীটটী দেখিতেছ তাহার নিম্নের ঐ টবের মত বস্তুটীই এই আবরণ। তদুপরি শুঁড় ও মুখ এবং তাহার মধ্যে উহার উদর ও অন্যান্য অংশ। লাল প্রবাল আর এক জাতীয়।

এইরূপে প্রবালকীট জীবন ধারণ করে। ইহাদের বংশবৃদ্ধির প্রণালীও আশ্চর্য্য। তিন প্রকারে প্রবালকীটদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এক একটা কীট অসংখ্য ডিম্ব প্রসব

করে ; ঐ সকল ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া ছড়াইয়া পড়ে ও নানা স্থানে পড়িয়া নূতন নূতন কীট হইয়া লাগিয়া থাকে ও ক্রমাগত উক্তরূপে বাড়িয়া উঠে ও আবার প্রত্যেকটা অসংখ্য ডিম পাড়ে! এইরূপে অসংখ্য কোটি প্রবাল কীট জন্মিতেছে, ও বাড়িতেছে। আবার কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, একটা কীট হঠাৎ দুভাগে বিভক্ত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং উহার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্র কীট হইয়া দাঁড়ায়। তোমরা অনেকে পুরুভূজের কথা চারুপাঠে পড়িয়াছ, তাহার অঙ্গের কোন অংশকে ছিন্ন করিলেই তাহা আবার একটী স্বতন্ত্র পুরুভূজ হইয়া উঠে। সেই রূপ একটা প্রবাল দুখানা হইয়া দুটা আলাদা আলাদা প্রবাল রূপ ধারণ করে। আবার সেই দুটা চারিটা হয় ইত্যাদি। এইরূপে, আরও এক উপায়ে প্রবালেরা বর্দ্ধিত হয়। গাছে যেমন কুঁড়ি হয় ; ইহাদেরও সেইরূপ কুঁড়ি হইতে দেখা যায়। একটা প্রবালের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কুঁড়ি হইয়া তাহাদের প্রত্যেকটী আবার স্বতন্ত্র কীট হইয়া উঠে, কিন্তু তাহারা ছড়াইয়া যায় না। প্রথমটীর গায়ে লাগিয়া থাকে। এইগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। গাছের ডালে পানার মত হইয়া চারিদিকে কুঁড়ি বিস্তার করে এবং চমৎকার দেখায়। বোধ হয় তোমরা এই আকারের প্রবাল অনেক স্থলে দেখিয়া থাকিবে। এই রূপে ডিম ছড়াইয়া, ফাটিয়া ও কুঁড়ি ফুটাইয়া একটী মাত্র প্রবাল অল্প সময়ের মধ্যে কত গুলির উৎপত্তি করে একবার ভাবিয়া দেখ। বস্তুতই এই কীটেরা যদিও আকারে অতি ক্ষুদ্র, তবু এইরূপ নানা উপায়ে এতই অসংখ্য কীট এক স্থানে জমা হয় যে দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এইরূপে তাহাদের দেহ একত্র জমা হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ হইয়া রহিয়াছে।

প্রবাল কীট যখন মরিয়া যায়, তখন উহার শুঁড় গুলি ক্রমে পচিয়া গলিয়া পড়ে ; ভিতরের অন্যান্য নরম অঙ্গও থাকে না। কেবল নিম্নের এই কঠিন আবরণটী মাত্র মাটি বা পাথরের গায় শক্ত হইয়া লাগিয়া থাকে। তখন উহার আকার নীচের ছবির মত দেখায়।

দেখ প্রবাল কীট জীবিত অবস্থায় যেমন সুন্দর, মরিলেও তেমনি সুন্দর ; তবে মৃত্যুর পর পৃথিবীর কত উপকার হয় তাহা পরে বুঝিবে।

প্রবালকীটদিগের দ্বীপ নির্ম্মাণ বুঝিতে গেলে আগে নিম্নলিখিত মত তাহাদের কয়েকটী প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। বিশেষ মন দেওয়া চাই। (১) ইহারা অধিক শীতে বাঁচে না। যে সকল স্থানে খুব শীতকালেও অন্ততঃ ৬৮° ডিগ্রী উত্তাপ থাকে, সেই সব স্থানে ইহারা বাস করে। তাহাতে দেখা যায় যে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে প্রায় ৩০° ডিগ্রী (অর্থাৎ ২১০০ মাইল দূর) পর্য্যন্ত দুটী রেখা টানিলে তাহাদের মধ্যে যে ভূভাগ হয়, ইহারা তাহারই মধ্যে দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যভাগে, আরব ও পারস্য উপসাগরে এবং ভারত বর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত অংশেই ইহাদের খুব আধিপত্য। (২) ইহারা বেশী গভীর

জলে বাঁচে না। ৯০ ফিট গভীর জলেই তাহাদের সাধারণের জীবনের উপযোগী স্থান, কখন কখন ১২০ কি ১৮০ ফিট নিম্নেও বাঁচে, কিন্তু তাহার নীচে আর প্রবাল জীবিত থাকে না। (৩) নদীর মোহানার কাছে ইহারা থাকে না; কারণ ঘোলা জল ও লবণ শূন্য জল তাহাদের জীবনের বিরোধী। (৪) ইহারা ঢেউ বড় ভাল বাসে এজন্য যেখানে ও যেদিকে সাগরের খুব তুফান বেশী, সেইখানে ও সেই দিকে খুব আনন্দে ইহারা বাড়ে। (৫) যেখানে জোয়ারের সময় জল উঠে না, তত উচ্চ স্থানে বাঁচে না অর্থাৎ ইহারা জলজন্তু; জল না পাইলে মরিয়া যায়। ক্রমশঃ।

রামকান্তের ঘোড়া।

রামকান্তের ঘোড়া!

পক্ষীরাজ ঘোড়া আর তালপত্র সিপাই,
শুনেছত সকলেই, কভু দেখ নাই।
ওই দেখ অশ্বপৃষ্ঠে রামকান্ত বীর,
নবাবের মত বসে আনন্দে অস্থির!
ঘন ঘন কশাঘাত হেট হেট মুখে
লম্বা লম্বা পা দুখানি দোলাইয়া সুখে;
তোমরা অনেক ঘোড়া দেখিয়াছ সবে,
এমন মজার ঘোড়া কে দেখেছ কবে?
যেমন ঘোড়ার রূপ তেমনি সোয়ার,
ঠমকে ঠমকে চলে আনন্দ অপার।

রামকান্তের মাষ্টার।

সহসা পশ্চাতে কেহ কাণ পাকড়িল,
"কে রে" বলে রামকান্ত ফিরিয়া দেখিল;
দেখে সেই রুদ্রমূর্ত্তি ইস্কুলের ঘরে,
যাহার হুঙ্কারে প্রাণ কাঁপে থর থরে;
উড়িল অর্দ্ধেক প্রাণ মুখে কথা নাই,
কাণ নিয়ে টানাটানি এবড় বালাই!
ইস্ক্রুপের মত পেঁচ যত লাগে কাণে,
হাঁ করে রামকান্ত সেই টানে টানে।
সোয়ার পড়িল ধরা ঘোড়া দুইখান;
দ্রুতপদে দুইজনে করিছে প্রস্থান।
উলটি পালটি উঠি দুই শিশু ধায়,
ছট্ ফট্ রামকান্ত কাণের জ্বালায়।
হে শিশু! এরূপ ঘোড়া তুমি যদি চাও,
তবে কাণ মলে মলে কাণটা পাকাও।

নারীর বীরত্ব।

তোমরা হয় তো জান ইংরাজের পূর্ব্বে মুসলমানেরা আমাদের দেশের রাজা ছিলেন; তাঁহাদের রাজত্ব কালের কথা আজ তোমাদিগকে কিছু বলিব।—

ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতনা বীর প্রধান স্থান। রাজপুতনার মধ্যে আবার মিবারে যত বীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন প্রদেশে এক সময়ে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। এখানে যুবা বীরত্ব দেখাইয়াছেন, রমণী গৃহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে শত শত যবন প্রাণ হারাইয়াছে; অনেক সময় শত্রুদিগকেও তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। ছোট ছোট বালক বালিকাগণও আপনার দেশ হইতে শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ হারাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে কত শত মহাত্মা আত্মত্যাগ, প্রভুভক্তি ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন!

উদয় সিংহ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বাল্য-জীবন আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ। উদয় সিংহের পিতার নাম রাণা সঙ্গ (মিবারের রাজাদিগকে রাণা বলে)। রাণা সঙ্গ যখন মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে হত হন, তখন উদয় সিংহের বয়স ৪। ৫ বৎসরের অধিক হইবে না। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর তিন জন মিবারে রাজত্ব করেন; তৃতীয়ের নাম বনবীর, ইনি দাসীপুত্র, ইহাঁর মিবারের সিংহাসনে কোন প্রকার অধিকার ছিল না। কিন্তু উদয় সিংহ নাবালক, তাই সকলে কয়েক বৎসরের জন্য বনবীরকে মিবারের সিংহাসন প্রদান করেন। প্রথমতঃ বনবীর রাজা হইতে অস্বীকার করেন কিন্তু শেষে নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মত হন।

বনবীর যে দিন মিবারের রাজা হইলেন সেই দিন হইতেই তাঁহার মনোমধ্যে কুবুদ্ধি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সততই চিন্তা করিতে লাগিলেন কি করিলে তাঁহার সেই ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয়, কি করিলে তিনি আজীবন রাজ-ক্ষমতা ভোগ করিতে পারেন। অনেক চিন্তার পর ঠিক করিলেন যে, রাণা সঙ্গের নাবালক পুত্র উদয় সিংহকে কোন প্রকারে বিনাশ করিয়া তাঁহার পথের কণ্টক দূর করিবেন।

একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় বনবীর তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একে একে রাণা সঙ্গের পরিবারস্থ লোকদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তখন একজন চাকর যে গৃহে বালক উদয়সিংহ শয়ন করিয়াছিলেন তথায় প্রবেশ করিল, এবং শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীর নিকট সমস্ত ঘটনা বলিল। ধাত্রী তাহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; কি প্রকারে এই উপস্থিত বিপদ হইতে রাণা সঙ্গের বংশ রক্ষা করিবে ভাবিতে লাগিল। বালক উদয় সিংহ নিদ্রিত ছিলেন, এই বিপদের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। ধাত্রী ভৃত্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটী ঝাঁকার ভিতরে নিদ্রিত বালককে রাখিয়া তদুপরি কতকগুলি আবর্জ্জনা

দিয়া ঝাঁকা ভৃত্যের মস্তকোপরি উঠাইয়া দিল এবং তাহাকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিল। ভৃত্য নিদ্রিত বালককে মাথায় করিয়া রাজ বাড়ীর বাহিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেল। সৌভাগ্য বশতঃ বালকের রাজ বাড়ীর মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এই ধাত্রীর নাম পান্না। উদয় সিংহের সমবয়স্ক পান্নার একটী পুত্র ছিল। ধাত্রী মিবারের রাজপুত্রকে এই প্রকারে চোরের মত গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া উদয় সিংহের বিছানায় স্বীয় পুত্রকে শোয়াইয়া রাখিল। কিয়ৎকাল পরে বনবীর রক্তাক্ত কলেবরে তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং বালক উদয় সিংহ কোথায় শুইয়া আছেন ধাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, কেবল মাত্র ইঙ্গিত করিয়া যে শয্যায় স্বীয় পুত্রকে শোয়াইয়া রাখিয়াছিল তাহা দেখাইয়া দিল। উন্মত্ত, পাষণ্ড, নারকী বনবীর রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার আশায় হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া দাসী-পুত্রকে উদয় সিংহ মনে করিয়া স্বীয় হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা বিনাশ করিল। ক্ষমতা-প্রিয় রাজা এই প্রকার বিগর্হিত কার্য্যে বিষন্ন হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রফুল্লচিত্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

পাঠক পাঠিকাগণ! ধাত্রীর প্রভুভক্তির বিষয় তোমরা শুনিলে। এখন যাহার জন্য পান্না তাহার পুত্রকে হারাইল তাহার পরিণাম কি হইল তাহাই অতি সংক্ষেপে বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বনবীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলে পর দাসী স্বীয় হৃদয়ের ধন মৃত পুত্রকে লইয়া বাটীর বাহিরে গেল এবং কোন একস্থানে তাহার সৎকার করিয়া ভৃত্যের সঙ্গে গিয়া মিশিল। ধাত্রী এবং ভৃত্য উদয় সিংহকে সঙ্গে লইয়া অনেক ভদ্রলোকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল, কিন্তু কেহই বনবীরের ভয়ে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে আশা শাহ নামক এক বণিকের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলে তিনি অগত্যা আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। পান্না সেখানে থাকিলে পাছে বনবীর উদয় সিংহের পলায়ন জানিতে পারে এই ভয়ে সে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে লাগিল।

উদয় সিংহ আশা শাহ বণিকের গৃহে লালিত পালিত হইয়া ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। মিবারের সৈন্য সামন্তগণ এবং ভদ্র লোক সকল উদয় সিংহের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কোন কোন ঘটনায় বনবীরের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন একক্ষণে সুযোগ পাইয়া বনবীরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎস্থানে উদয় সিংহকে স্থাপন করিলেন। উদয় সিংহ ১৩ বৎসর বয়সে পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মিবারের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু মিবার শাসনের উপযুক্ত গুণ তাঁহার কিছুই ছিল না। কোন প্রকারে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিলেন।

এই সময়ে আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া মিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে উদয় সিংহ পরাজিত হইয়া মুসলমানদিগের নিকট বন্দী হন। তাঁহার জনৈক পত্নী মিবারের রাণা মুসলমানদিগের নিকট বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; আপনাদিগের সৈন্য সামন্তদিগকে ভৎর্সনা করিলেন এবং অবশেষে কতক গুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য মুসলমান যোদ্ধা সেই বীররমণীর অস্ত্রাঘাতে হত হইল; স্বয়ং আকবর সাহ

বীর-নারীর অসাধারণ যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হন। রাণা মুক্ত হইলেন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠবীর আকবর সাহ একজন রাজপুত রমণীর নিকট পরাজিত হইলেন। আরও অনেকবার মুসলমানেরা রাজপুত রমণীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছেন।

আকবর সাহ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার মিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ভীরু উদয় সিংহ আকবরের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া মিবার অরক্ষিত ছিল না; চতুর্দ্দিক হইতে রাজপুত নৃপতিগণ স্বীয় স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া মিবার রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; মিবার বীর পরিপূর্ণ হইল। যে সকল বীর নানা স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পুত্ত ও জয়মল্ আশ্চর্য্য বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখাইয়াছিলেন। পুত্তের মাতা যবনদিগের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া স্বীয় সন্তানকে আপন হস্তে যুদ্ধসজ্জায় সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন; পুত্রের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে যে আপনার বংশ একেবারে লোপ হইবে, তাহা একবারও চিন্তা করিলেন না। কেবল মাত্র সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাইয়া মাতা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; নিজে পুত্রবধূ সহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে আরো অনেক মহিলা ছিলেন। অদ্য সকলে সুন্দর সুন্দর ভূষণ ও অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে কঠিন লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়াছেন; সুকুমার শরীরে কঠিন লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। যাঁহারা কোন দিন গৃহের বাহির হন নাই তাঁহারা অগণিত যবন সৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক যবন বীর এই রমণীদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুতগণ মাতা স্ত্রী ও ভগিনীদিগের অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশল দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা আকবরের অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে রাজপুতদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া রমণীগণ স্বীয় স্বীয় অসিদ্বারা নিজ নিজ মস্তক ছেদন করিলেন।

তোমাদিগকে আর একটী কথা বলিব। এই যুদ্ধে যে সকল ব্রাহ্মণ হত হইয়াছিলেন তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত একত্রে ওজন করিয়া ৭৪॥ মণ হইয়াছিল। তোমরা অনেকেই পত্রপৃষ্ঠে ৭৪॥ লিখিয়া থাক তাহার অর্থ এই—যে কেহ ঐ পত্র খুলিবে তাহার যতগুলি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত একত্র করিলে ৭৪॥ মণ হয় ততগুলি ব্রাহ্মণহত্যার পাপ হইবে।

নানা প্রসঙ্গ।

(১)

একটী ছোট দীপের নীচে একটী বড় দীপ ধর। ছোট দীপটী নিবিয়া যাইতে চাহিবে কেন, জান? দীপ জ্বলাতে অঙ্গারাম্ল নামক এক প্রকার বায়ু জন্মে সেই বায়ু প্রদীপের শিখার মুখ হইতে বেগে উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। বাতাসে অম্লজান নামক বায়ু আছে, তাহা আছে বলিয়াই

আগুন জ্বলিতে পারে। বড় দীপটী ছোট দীপের নীচে ধরিলে, তাহা হইতে অঙ্গারাম্ল বায়ু উঠিয়া ছোট দীপটীকে ঘিরিয়া ফেলে, আর বাতাসের অম্লজান আসিয়া তাহাকে জ্বালাইতে পারে না। কাজেই সে নিবিয়া যায়।

ছোট দীপটী নিবিয়া যাওয়া মাত্রই তাহার জ্বলন্ত পলিতাটী আনিয়া বড় দীপের নীচে (খুব কাছে, কিন্তু একটু ব্যবধান রাখিয়া) ধর; যেন, ছোট দীপের পলিতা হইতে যে ধূম এখনও বাহির হইতেছে তাহা বড় দীপটায় লাগিতে পারে। এখন দেখিবে বড় দীপ হইতে একটু আগুন নামিয়া আসিয়া ছোট দীপটীকে পুনরায় জ্বালাইয়া দিবে। ইহাতে এই বুঝা যায় যে পলিতা হইতে যে ধোঁয়া গিয়া বড় দীপটার গায় লাগিয়াছিল, তাহাতে এমন কিছু জিনিস ছিল যাহা জ্বলে। এই জিনিসটা পলিতার ভিতর হইতেই বাহির হইতেছিল; অত্যন্ত গরম লাগিলেই জিনিসটা বাহির হয়। এই জিনিসটা শূন্যে উঠিয়া যাইবার সময় জ্বলে, আর তাহাকে আমরা দীপের শিখা বলি। গরমে এই জিনিসটা বাহির হইয়া গেলে অনেক সময় আর কতগুলি জিনিস পড়িয়া থাকে, তাহাকে আমরা অঙ্গার, ভস্ম ইত্যাদি নাম দিই।

কাঠের কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয় না, পাথর কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয়। যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, কাঠ জ্বলিবার সময়ই সেই জিনিসটা ফুরাইয়া গিয়াছে—তার পর কয়লা পাইয়াছ। কাজেই কাঠের কয়লায় সেই জিনিসটা নাই, আর তাহা জ্বলিবার সময় শিখাও দেখা যায় না। পাথর কয়লায় কিন্তু সেই জিনিসটা আছে, সুতরাং পাথর কয়লা জ্বলিবার সময় শিখা দেখা যায়। পাথর কয়লার এই পদার্থটা কৌশল ক্রমে বাহির করিয়া তাহা দ্বারা কলিকাতার রাস্তায় রাত্রিকালে আলো দেওয়া হয়। তাহাকে তোমরা গ্যাসের আলো বল। পাথর কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করিয়া ফেলিলে যাহা থাকে, তাহার নাম কোক্ কয়লা। কোক্ কয়লা হইতে পাথর কয়লার ন্যায় শিখা বাহির হয় না। তাহার কারণ এই যে, যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, তাহার অধিকাংশ অগ্রেই বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দুই পয়সা দিয়া সাহেবদের তামাক খাইবার একটা চীনা মাটির পাইপ ক্রয় কর। তাহার বাটীটীর ভিতরে একখণ্ড পাথর কয়লা পূরিয়া বাটীর মুখ অতি উত্তম রূপে শিব গড়িবার মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দেও। এখন সেই কয়লাপূর্ণ পাইপের মাথাটী আগুনে ফেলিয়া দেও, নলটী যেন আগুন হইতে বাহির হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে ঐ নলের মুখে আগুন দিলে সুন্দর গ্যাসের আলো জ্বলিবে।

এই গুলি তোমরা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কেবল আমরা বলিতেছি বলিয়া ভাল মানুষের মত মানিয়া লইবার কোন প্রয়োজন নাই। ছোট দীপ আর বড় দীপের পরীক্ষাটী করিবার সময় দেখিবে যেন ছোট দীপটী বড় দীপ অপেক্ষা অনেক ছোট হয়, আর দীপগুলি যেন না কাঁপে।

---

(২)

অনেক দিন হইল একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক আয়র্লণ্ড দেশ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটী ছেলে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া নানা স্থানে লইয়া গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া সাহেব ঐ ছেলেটীকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিলেন।

সাহেব মদ খাইতে ভাল বাসিতেন সুতরাং পকেট হইতে একটী বোতল বাহির করিয়া তাহাকে কিছু মদ খাইতে দিলেন; ছেলেটী মদ খাইতে চাহিল না। সাহেব তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন তোমাকে আট আনা দিব, তুমি খাও। সে খাইতে অস্বীকার করিল। তারপর সাহেব এক টাকা, তারপর ক্রমে দশটাকা দিতে চাহিলেন, ছেলেটী কোন মতেই মদ খাইতে রাজি হইল না। সে অতি গরিব ছেলে, তাহার গায়ের জামা ছেঁড়া ছিল, কিন্তু সে এত প্রলোভনেও বিচলিত না হইয়া পকেট হইতে একটী মেডেল বাহির করিল; সেটী মদ্যপাননিবারিণী সভার মেডেল। সেই মেডেলটী সাহেবকে দেখাইয়া বলিল "আমি মদ খাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনার যত টাকা আছে তাহা সমস্ত দিলেও আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না"। এই ছেলেটার বাপ অত্যন্ত মদ খাইতেন; শেষে মদ্যপান নিবারিণী সভার যত্নে তিনি মদ খাওয়া ছাড়িয়া ভাল লোক হইয়াছিলেন। মরিবার সময় এই মেডেলটী তিনি ছেলেটীকে দিয়া গিয়াছিলেন। বালকের কথা শুনিয়া সাহেব মদের বোতল নিকটবর্ত্তী একটা পুকুরে ফেলিয়া দিলেন, এবং "নিজে আর কখনও মদ খাইব না" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, যাহাতে অন্যেরাও মদ না খায় সেই চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

বেলুন।

মাঘ মাসের সখায় বেলুনের একটা ছবি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে একটা নঙ্গর আঁকা ছিল। কেহ কেহ আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন "ঐ নঙ্গরটা ওখানে কেন আসিল?"

নঙ্গরটা ওখানে নঙ্গরের কার্য্য করিতেই আসিয়াছে। নৌকার নঙ্গর জলে ফেলিলে নৌকা যেমন আর চলিতে পারে না, বেলুনের নঙ্গরও সেইরূপ। অনেক সময় বাতাসে ঠেলিয়া বেলুনটাকে এমন স্থানে লইয়া যাইতে চাহে যে বেলুনের আরোহী তাহা পছন্দ করেন না। তখন ঐ নঙ্গর নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিয়া যদি নঙ্গরটাকে নিম্নস্থ কোন গাছ বা অন্য কিছুতে আট্‌কাইয়া দেওয়া যায় তবেই বেলুন আর চলিয়া যাইতে পারে না।

সম্প্রতি পারিস নগরে এক প্রকার বেলুন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে জাহাজের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা সেই খানে চালাইয়া নেওয়া যায়। এই বেলুনের আকৃতি ময়রার দোকানে যে চম্‌চম্ বিক্রী হয় তাহার ন্যায়। চম্‌চম্‌টাকে থালের উপরে যে ভাবে কাৎ করিয়া রাখে এই বেলুনও শূন্যে ঠিক্ সেই ভাবে থাকে। বাতাসের ভিতর দিয়া চলিবার সময় যাহাতে বিশেষ বাধা না পায় তাহার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। এই চম্‌চমের এক মাথায় একটী হা'ল। আরোহীদের বসিবার দোলা চম্‌চমের গায় ঝুলিতেছে।

সেই দোলায় বেলুন চালাইবার কল। কলটী তাড়িতের বলে চলে। এই বেলুন চালাইতে তিনটী লোকের আবশ্যক। একজন হা'ল ধরে; আর একজন কল চালায়; আর একজন বালির বস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখে———অর্থাৎ বেলুন নামিয়া পড়িতে চাহিলে বালির বস্তা খালি করিয়া তাহাকে হাল্‌কা করে।

গরিলা।

আফ্রিকা দেশে গরিলার বাড়ী। গরিলারা বনে থাকে। সে সকল বনে মানুষের বড় একটা চলা ফেরা নাই। সভ্য লোকেরা তো সে স্থানে যাইতে চাহেনই না, সে দেশবাসী অসভ্যেরাও গরিলার ভয়ে সেই সকল বন হইতে দূরে থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যদিগের মধ্যে হনুমান মহাশয় যেরূপ ছিলেন, সেদেশী জন্তুদের মধ্যে গরিলাও সেইরূপ। রামায়ণে হনুমানের কথা যাহা পড়িয়াছি তাহাতে তাহার উপর এক প্রকার ভাল ভাবই জন্মিয়াছে। আমি অনেক সময় ভাবিয়া থাকি যে হনুমান এত বড় লোক (থুড়ি, বড় বাঁদর) ছিলেন, কিন্তু হনুমান বলিলে আমরা এত চটি কেন? এ বিষয়ে হনুমান বেচারার একটু বিশেষ দুর্ভাগ্যই ছিল বলিতে হইবে, নতুবা হনুমান খাইয়াছেন বলিয়া কলার মৌখিক আদর কমিল কেন? মৌখিক বলিতেছি, কারণ খাইতে দিলে কাহারও যত্নের ক্রটি দেখা যায় না। যাহা হউক এ বিষয়টী আমার আলোচনার সামগ্রী নহে। আমি গরিলাদের কথা বলিতেছি, তোমরা তাহাতে মনোযোগ দেও। আমি বলিতেছিলাম হনুমান খুব মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু গরিলা এত প্রধান জীব হইলেও তাহার আচার ব্যবহার গুলি ভাল নহে।

জাতিতে হুকু—নিবাস আফ্রিকা; এই দুই বিষয়ের মধ্যে বিশেষ আশাপ্রদ কিছুই নাই। এর পরেই চেহারা। এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব, যে ছবিখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে, আমরা মানুষ, সুতরাং আমরা সুন্দর, আর গরিলা হুকু, সুতরাং সে কুৎসিত। সুন্দরই হউক আর কুৎসিতই হউক, দেখিতে যে অত্যন্ত ভয়ানক সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গরিলা যে বনে বাস করে, সেই বনে এক প্রকার বাদাম জন্মে; এই বাদামই গরিলার প্রধান আহার। এই বাদাম এত শক্ত যে, একটা হাতুড়ি দিয়া খুব জোরের সহিত ঘা না মারিলে তাহাকে ভাঙ্গা যায় না। ইহারই আধ মণ ত্রিশ সের পরিমাণ অক্লেশে উদরস্থ করিয়া গরিলা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই বিষয়টী ভাবিলেই ইহাদের শরীরে যে কি ভয়ানক বল তাহা বুঝিতে পার। এর পর আবার তাহার স্বভাবটী। সেটী বাঘ ভল্লুকেরও অনুকরণের সামগ্রী। গরিলার দেশের লোকেরা তাহার নামেই ভয় পায়। ইহাদের উৎপাতের সম্বন্ধে বিস্তর গল্প বলা হইয়া থাকে। একবার নাকি এক দল গরিলাতে আর সে দেশের কতকগুলি

মানুষেতে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে গরিলারা জয়লাভ করিল, এবং কতকগুলি মানুষকে ধরিয়া লইয়া গেল। কয়েক দিন পরে এই লোকগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিল ;—গরিলারা তাহাদের পায়ের আঙুল ছিঁড়িয়া রাখিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে !

সে দেশীয় লোকের বিশ্বাস যে গরিলারা এক কালে মানুষই ছিল। কালক্রমে তাহাদের আচার ব্যবহার অধোগামী হওয়াতে তাহারা অসভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ ঘৃণাজনক আকার পাইয়াছে।

পুরুষ গরিলার হাতে অনেক সময় একটী ছোট মুগুর থাকে। সে দেশের লোকেরা বলে যে এই মুগুর লইয়া গরিলা হাতীর সহিত যুদ্ধ করে। তোমরা মনে করিতে পার যে হাতী নিরীহ ভালমানুষ, তাহার সঙ্গে গরিলার শত্রুতা হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? কারণ বিশেষ কিছুই নাই, কিন্তু গরিলা মনে করে যে যথেষ্ট কারণ আছে। হস্তীর এক অপরাধ—গরিলা যাহা খায়, সেও তাহা খায়। হস্তীর বৃহৎ শরীর দেখিলেই গরিলা ভয় পায়, হয়ত মনে করে যে এত বড় জানোয়ারের আহারের পর তাহার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এই কারণেই সে হাতীর উপর এত চটা। এই কারণেই সে হাতী দেখিবামাত্র লাঠি হাতে তাড়া করে। প্রাণপণে হাতীর শুঁড়ের উপর একটী আঘাত করিলে আর দ্বিতীয় আঘাতের দরকার হয় না, হাতী ফ্যাঁ ফ্যাঁ শব্দ করিয়া পলায়ন করে।

সে দেশের লোকেরা হাতীর হাড় খুঁজিতে মাঝে মাঝে বনে যায়। তখন তাহাদের একটী ভয় বড়ই প্রবল থাকে—পাছে জঙ্গলে কখনও একটা গরিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গরিলা পথের ধারে গাছের পাতার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। দৈবাৎ কোন হতভাগ্য লোক যদি সেই পথ দিয়া যায়, তবে আর তাহার রক্ষা নাই। দুই পায়ে গাছের ডাল শক্ত করিয়া ধরিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে হাত বাড়াইয়া তাহাকে গাছে তুলিয়া লয়, তাহার পরক্ষণেই দুই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড বলের সহিত তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরে আর তাহার পাঁজর চূর্ণ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়।

মাঝে মাঝে কেহ কেহ গরিলা মারিতে চেষ্টা করেন। এক গুলিতে যদি গরিলা মরিল, তবে ভালই। কিন্তু যদি গুলি খাইয়াও তাহার শরীরে প্রাণ থাকে, তবেই বিপদ। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। একবার একটা গরিলা মরিবার সময় একটা বন্দুকের নল বাঁকাইয়া এবং দাঁতে চ্যাপ্টা করিয়া ফেলিয়াছিল।

ডুশেলু নামক এক সাহেব গরিলার কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য আফ্রিকায় গিয়াছিলেন, তিনি প্রকাণ্ড এক গ্রন্থে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই পুস্তকে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প লেখা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমাদিগকে তাহার দুই একটার অধিক উপহার দিতে সাহস পাইতেছি না। উইনউড্-রীড্ নামক এক সাহেব ডুশেলুর কিছু পরে আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। ডুশেলুর কথাগুলি কতদূর সত্য তাহা জানিবার জন্য তিনি বিস্তর অনুসন্ধান করেন। ডুশেলুর পুস্তকে যে সকল লোকের উল্লেখ আছে, তিনি তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের সহিত এ সম্বন্ধে অনেক আলাপ করেন; তাহাতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ডুশেলুর সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। রীড সাহেব গরিলার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া তারপর গরিলা সম্বন্ধে দুই একটী গল্প বলিয়া আমরা শেষ করিব।

ক্রমশঃ।

মাতার প্রশ্ন।

সরোজিনী আর বিজয় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তাহাদের মার নিকট গল্প শুনিয়া থাকে। তিনিও গল্প বলিতে ভাল বাসেন; কিন্তু প্রত্যেক গল্প শেষ হইলেই তাহাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আজ আগ্রহের সহিত মাতা তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, ছোট ছোট দুইটী গল্প বলিতেছি, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর ঠিক চাই, নতুবা আর গল্প শুনিতে পারিবে না।

প্রথমটী শুন :—রামা বলিয়া একটী ধূর্ত্ত শেয়াল মধুপুরের বনে বাস করিত। তাহার একটী ছোট ভাই ছিল; সে অত্যন্ত ধার্ম্মিক। এক দিন দুই ভাই শিকারে বাহির হইল, ছোট ভাই একটী পাখী ধরিল, কিন্তু বড় ভাই কিছুই পাইলেন না। রামা একটু লজ্জিত হইল কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া উঠাতে মনে মনে ভাবিল "কোন মতে চালাকি করিয়া পাখীটি লইতে পারিলে আমার খোরাকের যোগাড় হয়।"

শেয়ালদের মধ্যে একটী বেশ নিয়ম আছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে সকলকেই তাহাদের গুরুর নাম করিয়া আটবার প্রণাম করিতে হয়। রামা দেখিল যে তাহার ছোট ভাই সে দিন গুরুর নামে প্রণাম করে নাই, সুতরাং তাহার পুরোহিতের নিকট নালিস করিলে পাখীটি সে পাইতে পারে।

ঘটনাক্রমে পথেই পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামা তৎক্ষণাৎ তাহার নালিস রুজু করিল। ছোট ভাই পাখীটি মাটিতে রাখিয়া, মৃদুস্বরে বলিল "আমি বাড়ী যাইয়াই প্রণাম করিব।" পুরোহিতও "এত দেরীতে," "এত দেরীতে" বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র, রামা পাখীটি মুখে ধরিতে গেল। কিন্তু পুরোহিত মুখভঙ্গি করিয়া রামাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাপু হে, তুমি কখন প্রণাম করিয়াছ, শুনি ?"

উপরের দিকে চাহিয়া রামা বলিল "কি বলেন মশাই, আমি কি কখন ভুলি; রাত্র শেষ না হতেই আমি প্রণাম করিয়াছি।" "এত শীঘ্র," "এত শীঘ্র" বলিয়া পুরোহিত আবার চীৎকার করিল এবং বলিল "তোমরা দুজনের কেহই পাখীটি পাইতে পার না, কারণ যথা সময়ে কেহই উপাসনা কর নাই; অতএব ইহা পুরোহিতের প্রাপ্য;" এই বলিয়া পুরোহিত পাখীটি লইয়া চলিয়া গেলেন। রামারা দুই ভাই বোকা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

বিজয়, বল দেখি গল্পটী শুনিয়া কি উপদেশ পাইলে ?

বিজয়। "অতি চালাকের গলায় দড়ি।" রামা যদি সরল মনে পাখীর ভাগ চাহিত, তবে ছোট ভাই, বড় ভাইকে না দিয়া কখনই খাইত না। আমার মতে মনের ভাব সরলভাবে জানান উচিত; কখন প্রকৃত ভাব গোপন রাখিয়া, কাজ করা উচিত নয়।

মাতা। বেশ; সরো বল।

সরোজিনী। নিজে পাপী অথচ পরের পাপ বাহির করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া পাগলের কার্য্য। রামার এটা বুঝা উচিত ছিল যে, সে নিজে দোষী, নালিস করিলে তাহার পাওয়ার কি অধিকার ? তারপর ছোট ভ্রাতার উপর ভালবাসা দূরে থাকুক, এমন দ্বেষ! আমি তো বিজয়ের উপর এমন নীচ, জঘন্য ভাব কখনও প্রকাশ করি নাই; ঈশ্বর না করুন কখন করিবও না।

মাতা। উত্তর ঠিক্‌ হইয়াছে। আর একটী শুনঃ—বেলা শেষ হইয়াছে। সূর্য্য তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া বিদায় লইবার জন্য পশ্চিমে গিয়াছেন ; এদিকে চন্দ্র তাহার কার্য্য করিবার জন্য পূর্ব্বে উদয় হইতেছেন। এমন সময় সূর্য্য গম্ভীর ভাবে চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"আচ্ছা বল দেখি লোকে তোমার প্রতি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কেন ? সমস্ত দিন আমি পরিশ্রম করিয়া কিরণ প্রদান করি এবং শীত কালে, শীত বিনাশ করি ; রাত্রের আঁধার নষ্ট করিয়া লোকজনের কত সুবিধা করি, তথাপি তুমি যখনি তোমার ঐ মুখ খানি প্রকাশ কর অমনি পৃথিবীর সকলেই গীত গাইয়া তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তোমার মহিমা কীর্ত্তন করে।"

চন্দ্র বলিল ভাইঃ—"তোমার কীর্ত্তি চোখের উপর রহিয়াছে এবং তুমি দিনের বেলাই জীবের উপকার কর। আমি ভাই অতি সামান্য কার্য্য করি এবং যা কিছু করি তাহা অতি অল্প লোকেই জানে।"

"তথাপি লোকে তোমাকেই প্রশংসা করিবে।" এই বলিয়া সূর্য্য রাগান্বিত হইয়া, চক্ষুলাল করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন।

বলত এ গল্প হ'তে কি উপদেশ পাইলে ?

বিজয়। চন্দ্র নিজের কার্য্যের প্রশংসা চায় না, তাই লোকে তাহার প্রশংসা করে। আর সূর্য্য যদিও চন্দ্র অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী উপকার করেন, তথাপি তাহার লালমুখ দেখিয়া কেহই প্রশংসা করে না। যে নম্র এবং বিনয়ী সে সকল স্থানেই আদর পায়।

সরোজিনী। তাইত ; যদি কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অভিলাষ থাকে, তবে নীরবে এবং বিনয়ের সহিত কার্য্য করাই উচিত। কেনা জানে যে চন্দ্রের গৌরব সূর্য্য হইতে, তথাপি বড়কর্ত্তা আদর পান না আর তাঁর ভৃত্য সকলের নিকট পূজনীয়। মিষ্ট মুখে শাক দিলেও মহা আদরে লইতে ইচ্ছা করে, আর কটুমুখে ক্ষীর সর দিলেও, তাহা পদাঘাতে দূরে ফেলিতে ইচ্ছা করে।

মাতা। তোরা যদি বেঁচে থাকিস্‌ তবে মানুষ হবি।

ফুলের সাজি।

প্রথম অধ্যায়।

পিতা ও কন্যা।

দীননাথ নামে এক দরিদ্র বালক হিন্দুদিগের রাজত্ব কালে গৌড় নগরের নিকট প্রসাদপুর গ্রামে বাস করিত। সে অতি শিশুকালে কৃষি ও উদ্যান কার্য্য শিখিবার জন্য রাজধানী আগমন করিয়া গৌড় রাজের প্রমোদ কাননে একটী সামান্য মালির কার্য্য পাইয়াছিল। সুচরিত্র, কার্য্য-পটুতা এবং অমায়িকতা গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যে রাজা ও রাজ্ঞীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজা যেখানে যাইতেন দীননাথকে তাঁহার সঙ্গে লইতেন। এই রূপে রাজার সহিত নানা দেশে ও নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কিরূপে ভদ্র সমাজে কথা বার্ত্তা কহিতে হয়, কিরূপ রীতিতে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা দীননাথ উত্তম রূপে শিখিয়াছিল। অনেক দিন রাজসংসারে অকলঙ্কিত অবস্থায় কাটাইলে মহারাজা তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহা-

কে কোন উচ্চপদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে সে মনে করিলে গৌড় রাজার ভাণ্ডার-রক্ষক হইতে পারিত, কিন্তু সাধু দীননাথ রাজধানীতে উচ্চপদ লাভ করিতে ইচ্ছা না করিয়া পল্লীগ্রামে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ভৃত্যপ্রিয় রাজা বিনা খাজানায় তাহাকে একটী গ্রামের পত্তনীদার করিলেন। এবং প্রতি বৎসর তাহার প্রয়োজনীয় শস্য ও কাষ্ঠ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই রাজদত্ত উপহার পাইবার কিছুপরে সে জ্ঞানদা নামে কোন সচ্চরিত্র রমণীকে বিবাহ করিল। তাহার যাহা আয় ছিল তাহাতে তাহাদের সকল অভাবই পূর্ণ হইল। যাহার মনে দুরাকাঙ্ক্ষা ,তাহারই অধিক কষ্ট; স্পৃহাহীন দীননাথ আপনার অবস্থাতে পরম পরিতুষ্ট ছিল বলিয়া তাহার কোন ক্লেশ ছিল না। ভিতর বাড়ীতে চার খানি মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ। দীননাথের পত্নী প্রতিদিন আপনি ঐ সকল গৃহ মার্জ্জনা করিতেন; তাঁহার জন্য উঠানে একটি কুটাও পড়িতে পাইত না। দেয়াল গুলি গোময় ও মৃত্তিকা লেপনে চক্ চক্ করিত। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখ, সকল দ্রব্যই পরিষ্কার ভাবে সাজান আছে। জ্ঞানদা সামান্য খড়িকাকেও যথাস্থানে রক্ষা করিত। পল্লীগ্রামে ধনী,নির্ধন প্রায় সকলেরই শয্যা অতিশয় মলিন,কিন্তু জ্ঞানদা শয্যাগুলি নিজে কাঁচিয়া পরিস্কার করিত। বাহির বাড়ীতে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ খানির পাশে একটী পরিস্কার কাম্‌রা ছিল, এই চণ্ডীমণ্ডপ খানি অতি পরিস্কার। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটী উঠান, উঠানে বেল, মল্লিকা, যুই, গোলাপ, গন্ধরাজ, রজনী গন্ধ প্রভৃতি ফুলের গাছ।

দীননাথ এই সকল গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখিত ও গ্রীষ্ম কালে প্রতিদিন গাছের গোড়ায় জল সেচন করিত। ফলতঃ বাড়ী দেখিলে বুঝা যাইত যে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী সুরুচি সম্পন্ন। খিড়্‌কিতে বেশ একটী বাগান, বাগানের অর্দ্ধভাগে ভাল ভাল, আম, নারিকেল, কাঁঠাল, নিচু, গোলাপ জাম প্রভৃতি সুস্বাদু ফলের গাছ রোপিত ছিল, তাহাদের ফলও প্রচুর পরিমাণে হইত। বাগানে একটী ঘাট বাঁধান পুস্করিণী, পুস্করিণীর ধারেও কতকগুলি ফলের গাছ ছিল। বাগানের অপর অংশে দীননাথ নিজ হাতে শাক শব্‌জি করিত। এইরূপ পল্লীগ্রামে দীননাথ পত্নীর সহিত পরমসুখে কাল কাটাইত।

ভাগ্য চিরকাল সমান থাকে না। দীননাথের পত্নী জ্ঞানদা কিছুদিন সুখে গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করিল। স্ত্রীর বিয়োগে তাহার যে গুরুতর শোক হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনোরমা নামে একটী কন্যা ব্যতীত বৃদ্ধের আর কেহই ছিল না। তাহার পত্নীর অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র মনোরমাই জীবিত ছিল। আর সকলে শৈশবেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; মনোরমার আকার তাহার মার ন্যায়। বাল্যকালে মনোরমা অতিশয় সুশ্রী ছিল; যত তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল, বিনয়, সততা ও দয়াগুণে ভূষিতা হইয়া বালিকা আরও সুন্দর হইতে লাগিল। তাহার পিতাও তাহাকে প্রাণের সহিত স্নেহ করিতে লাগিল। বালিকাও পিতাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না। সে ফুল বড় ভাল বাসিত, ও স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিলে বিমুগ্ধ হইত। এখন মনোরমার তের বৎসর বয়স, এই সময়েই তাহাকে তাহাদের বাড়ীর সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। তাহার মার মত সেও ঘরগুলি পরিস্কার রাখিত; তাহার ঘর গুলি ঝর্ ঝরে,বাসন

গুলি পরিষ্কার এবং অন্যান্য সামগ্রী দেখিলে নূতন বলিয়া বোধ হইত। মনোরমা তাহার পিতার সঙ্গে উদ্যানে কার্য্য করিত, বাগানের কাজ করিতে সে কখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িত না। যে সময়ে সে পিতার সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত, সে সময়ে দীননাথ নানা প্রকার চমৎকার গল্প বলিত বলিয়া, মনোরমা পরিশ্রম করিয়া ক্লেশ বোধ করিত না। কখন কখন সে গল্প শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল হইত যে পিতা কখন বাগানের কাজ করিতে ডাকিবেন তাহারই অপেক্ষা করিত। মনোরমা বাল্য কাল হইতেই বৃক্ষ লতার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে শিখিয়াছিল। কোন স্থানে একটী নূতন চারা বা ফুল দেখিলে মনোরমার উল্লাসের আর সীমা থাকিত না। দীননাথ তাহার কন্যার এই মনোগত ভাব বুঝিয়াছিল; এবং প্রতিবৎসর নানা স্থান হইতে মনোরমার জন্য নূতন গাছ, বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিত। একটী নূতন চারা রোপিত হইলে, মনোরমা প্রতিদিন তাহাতে জল সেচন করিত এবং প্রতিদিন সেই চারাটী কতদূর বৰ্দ্ধিত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিত। গাছে কুঁড়ি ধরিলে কবে ফুল ফুটিবে সতৃষ্ণ চক্ষে তাহারই অপেক্ষায় থাকিত। আহা! যখন, হরিত বর্ণ গাছ গুলিতে ফুল দেখা দিত তখন মনোরমার আহ্লাদ আর দেখে কে? একদিন দীননাথ কহিল "মনোরমে, বাগানের কাজ কত চমৎকার, ইহার ন্যায় পবিত্র ও নির্দ্দোষ আমোদ আর নাই, লোকে কত দাম দিয়া তাহাদের পুত্র কন্যার জন্য কাপড় ও গহনা কিনিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহাদের অনেক অল্প ব্যয়ে তোমায় নূতন নূতন চারা ক্রয় করিয়া দি। বল দেখি, তাহাদের পুত্র কন্যারা অধিক আনন্দ পায়, না তুমি অধিক পাও।"

সে বলিল, "বাবা, কাপড় বা গহনায় এত আমোদ নাই, যখনই একখানা ভাল নূতন কাপড় পরা যায় তখনই একটু আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু সে আহ্লাদ অধিকক্ষণ থাকে না। কিন্তু একটী চারা স্বল্প মূল্য দিয়া বাগানে বসাইলে নিত্য নূতন আমোদ। বাবা! বলিতে কি জগতের আর কোন আনন্দই ইহার সহিত তুলনা হয় না।"

দীননাথ কন্যার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ক্রমশঃ।

ধাঁধা।

গত মার্চ্চ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। মনুষ্য।

নব বর্ষের ধাঁধা।
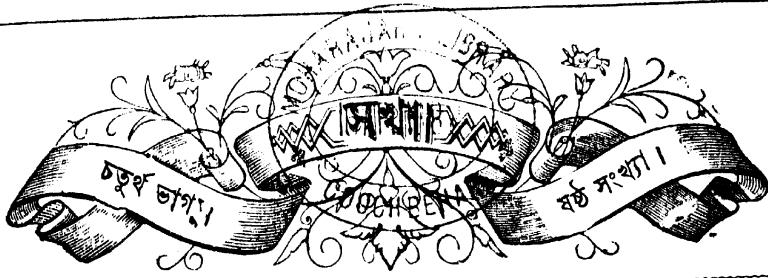
জুন, ১৮৮৬।

কলের জাহাজ।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় কলের জাহাজ দেখিয়াছ; এবং কেহ কেহ হয়ত কলের জাহাজে চড়িয়াছ। কিন্তু কে কোথায় এবং কবে প্রথমে ইহার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সংবাদ বোধ হয় অনেকেই রাখ না। আমরা এই প্রবন্ধে সেই বিষয় তোমাদিগকে কিছু বলিব।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অন্তর্গত পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া প্রদেশে কলের জাহাজের উদ্ভাবন কর্ত্তা রবার্ট ফুল্টনের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই ছবি আঁকিতে ও নানা রকমের কল প্রস্তুত করিতে ভাল বাসিতেন; কিন্তু প্রথম প্রথম ছবি আঁকিয়াই তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। তখনকার প্রসিদ্ধ চিত্রকর মেঃ ওয়েষ্টের নিকট হইতে ভালরূপে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং সেইখানে থাকিবার সময়, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলের জাহাজ চালাইবার একটী উপায় মনে মনে বাহির করেন। তখন তাঁহার বয়স আটাইশ বৎসর মাত্র। তাহার পর হইতে তিনি অবসর পাইলেই এই বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা ও অনুসন্ধান করিতেন। তের বৎসর কাল এইরূপে কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে তিনি ফ্রান্সেও গিয়াছিলেন। ফ্রান্সে তখন প্রথম নেপোলিয়ন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই দেখিয়া, ১৮০৬

খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফুল্টন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইংলণ্ডে থাকিবার সময় তিনি ব্রিজওয়াটারের ডিউককে খাল কাটাইবার উৎকৃষ্ট প্রণালী সম্বন্ধে পরামর্শ দেন এবং মারবল প্রস্তর চিরিবার জন্য এক কলের করাত, ছাল্‌টির সূতা পাকাইবার ও কাছি প্রস্তুত করিবার কল, এবং যুদ্ধের সময় বিপক্ষদিগের জাহাজ বিনষ্ট করিবার জন্য এক প্রকার টরপিডো প্রস্তুত করেন।

সে যাহা হউক ঠিক্ কোন্ সময়ে যে বাষ্পের বলে জাহাজ চালাইবার কথা প্রথমে ফুল্টনের মনে উদয় হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মনে মনে যে পন্থা স্থির করেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া বিশ্বাস ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে কিছু চেষ্টা হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মেঃ লিভিংষ্টন নামক এক ব্যক্তি নিউইয়র্কের পার্লিয়ামেণ্ট হইতে এই অনুমতি পান যে, যদি তিনি এক বৎসরের মধ্যে এমন একখানি পোত প্রস্তুত করিতে পারেন যাহা বাষ্প বা আগুনের বলে ঘণ্টায় অন্ততঃ চারি মাইল করিয়া চলিবে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে কুড়ি বৎসর কাল নিউইয়র্কের অধীনস্থ নদী সাগরাদিতে তিনি ভিন্ন আর কেহ ঐরূপ পোত চালাইবার অধিকার পাইবে না। যখন লিভিংষ্টন প্রথমে এই প্রার্থনা করেন তখন যিনি নিউইয়র্কের পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহাকে যে কত উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু লিভিংষ্টন প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার পর লিভিংষ্টন ইউনাইটেড্ ষ্টেটের প্রতিনিধি স্বরূপে ফ্রান্স গমন করেন। সেইখানে ফুল্টনের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। উভয়ের উদ্দেশ্য এক বলিয়া ক্রমে এই আলাপ বন্ধুতায় পরিণত হইল এবং তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া পুনরায় ঐ বিষয়ের জন্য চেষ্টা করিতে মনস্থ করিলেন। ফুল্টনের উপর সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফুল্টন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়াই তিনি ৮৬ হাত দীর্ঘ, ১২ হাত প্রশস্ত ও ৫ হাত উচ্চ একখানি প্রকাণ্ড নৌকা গঠন আরম্ভ করিলেন। নৌকা কতক প্রস্তুত হইলে দুই বন্ধুতে দেখিলেন যে তাঁহারা যত মনে করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ চাই। এই জন্য তাঁহারা তাঁহাদের কারবারের এক তৃতীয়াংশ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সকলেই মনে করিয়াছিল যে তাঁহাদের কলের জাহাজ চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, এই জন্য কেহ সাহস করিয়া অংশ কিনিতে অগ্রসর হইল না। সে যাহা হউক ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ঈষ্ট রিভার (পূর্ব্ব নদী) নামক নদীতে এই বৃহৎ পোত ভাসান হইল। তাহার পর তাহার উপর বাষ্পীয় কল খাটান হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে অনেকে কোনরূপ বাষ্পীয় কলই দেখে নাই। তাহারা হাঁ করিয়া এই সমস্ত কাণ্ড দেখিতে লাগিল। ক্রমে কল বসান শেষ হইল। জাহাজের দুই পার্শ্বে প্রায় ৩১ হাত পরিধি বিশিষ্ট দুই চাকা ঝুলান হইল; তাহাতে জল টানিবার জন্য সারি সারি তক্তা লাগান। লোকে সন্দেহ মিশ্রিত কৌতূহলের সহিত এই মহা ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। পরে যখন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় নূতন কলের জাহাজ ক্লারমণ্ট, নিউইয়র্ক নগরের কর্টল্যাণ্ড

ষ্ট্রীটের নিকট হইতে আরোহী লইয়া দেড় শত মাইল দূরস্থিত আল্‌বানি নামক স্থানে যাত্রা করিবে, তখন সকলেই অবিশ্বাসের হাসি হাসিতে হাসিতে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, ঐ জাহাজে করিয়া আল্‌বানি যাইতে সম্মত হইতে পারে এমন নির্ব্বোধ কেহ আছে কি না।

মানুষ সহজে কোন একটা নূতন ব্যাপারে হাত দিতে চায় না। কলম্বস যখন প্রথমে আট্‌লাণ্টিকের পরপারে গিয়া স্থল আবিষ্কার করিবার কথা উত্থাপন করেন তখন লোকে তাঁহাকে কতই না উপহাস করিয়াছিল ; সাহায্যের জন্য তাঁহাকে কত দেশ বিদেশেই না ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনায় সপ্রমাণ হইল, কলম্বসের ভুল কি তাঁহাকে যাহারা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল তাহাদের ভুল। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে কেবল কলম্বসের নাম করিলাম। কিন্তু ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা নূতন কিছু বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় অনেকেই অপরের নিকট হইতে সাহায্য ও উৎসাহের পরিবর্ত্তে বিপক্ষতা ও উপহাস ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। অনেক লাঞ্ছনা, অনেক কষ্টভোগ করিয়া তবে তাঁহারা আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলের জাহাজের উদ্ভাবক ফুল্টনের বেলাও তাহাই হইয়াছিল। ক্লারমণ্ট নামক কলের জাহাজ প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার উপর আবার সাধারণের উপহাস। তাঁহার অতুল অধ্যবসায়ের শেষ ফল কি হইল তাহা আমরা পরে পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইব।

গরিলা।

ডুশেলু সাহেব নিম্ন লিখিত গল্পটী বলিয়াছেন।—"আমরা একটা অন্ধকারময় উপত্যকার দিকে চলিলাম। গ্যাম্বো (ডুশেলুর আফ্রিকা দেশীয় ভৃত্য) বলিয়াছিল, সেখানে শীকার (গরিলা) মিলিবে। * * * আমাদের দলের লোকেরা পৃথক হইয়া চলিল। গ্যাম্বো আর আমি একত্র থাকিলাম। একজন সাহসী লোক একা একদিক পানে চলিল, সে মনে করিয়াছিল সেই দিকে গেলে গরিলা পাওয়া যাইবে। অবশিষ্ট তিন জন অন্য এক দিকে চলিল। এইরূপে পৃথক হইয়া আমরা একঘণ্টা কাল ছিলাম, এমন সময়ে গ্যাম্বো আর আমি আমাদের অতি অল্পদূরে একটা বন্দুকের শব্দ শুনিলাম। তার পরক্ষণেই আর একটা আওয়াজ হইল। আমরা অবিলম্বে সেই দিক লক্ষ্য করিয়া চলিলাম; আমরা মনে করিয়াছিলাম যে একটা মরা গরিলা দেখিতে পাইব। এই সময়ে ভয়ানক শব্দে বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গ্যাম্বো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আমার বাহু ধরিল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম, মনে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বেশী দূর যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, আমরা যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই হইয়াছে। যে বেচারা সাহস করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে সেই স্থানে পতিত দেখিলাম। তাহার রক্তে সেইস্থান ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রথমে বোধ হইয়াছিল যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার নাড়িভুঁড়ি পেট ফাটিয়া বাহির হইয়া

পড়িয়াছে। পাশেই বন্দুকটা পড়িয়া আছে—বন্দুকের কাঠের অংশটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নলটা চ্যাপ্ট্যা হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। গরিলার দাঁতের দাগ তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমরা তাহাকে তুলিলাম। আমার কাপড় ছিঁড়িয়া তাহার ঘায় পটি বাঁধিয়া দিলাম। একটু ব্রাণ্ডি খাইতে দিলে পর তাহার চৈতন্য হইল—অতি কষ্টে সে কথা কহিতে লাগিল। সে বলিল যে হঠাৎ সে গরিলাটার সামনে পড়িয়া গিয়াছিল; তখন সেটা পলাইতে চেষ্টা করে নাই। সেটা একটা মস্ত পুরুষ গরিলা; দেখিতে ভয়ানক হিংস্র বলিয়া বোধ হইল। জঙ্গলের সে স্থানটা অন্ধকার ছিল, বোধ হয় অন্ধকারের জন্য তাহার লক্ষ্য ঠিক হয় নাই। সে বলিল যে সে খুব মনোযোগ পূর্ব্বক সন্ধান করিয়াছিল, এবং কেবল মাত্র আটফিট দূর হইতে গুলি করিয়াছিল। গুলিটা এক পাশে লাগিয়াছিল। গুলি খাইয়াই সেটা বুক চাপড়াইতে লাগিল আর ভয়ানক রাগিয়া তাহার দিকে আসিতে লাগিল। দৌড়িয়া পালান তখন অসম্ভব, দশ পা যাইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। সে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় বন্দুক ভরিল। পুনরায় গুলি করিবার জন্য যেই সে বন্দুক উঠাইতেছিল, অমনি গরিলাটা তাহার হাত হইতে সেটাকে কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। পড়িবার সময় সেটা ছুটিয়া গেল। তারপর ভয়ানক শব্দ করিয়া সেই জানোয়ারটা তাহার পেটে আঘাত করিল। সেই আঘাতেই পেট কাটিয়া নাড়িভুড়ির কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। রক্তাক্ত শরীরে সে মাটিতে পড়িয়া গেল। গরিলাটা তাহাকে ছাড়িয়া বন্দুকটাকে ধরিল—ইহা দেখিয়া সে বেচারা মনে করিল যে বুঝি বন্দুক দিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে। কিন্তু গরিলা বোধ হয় সেটাকেও শত্রু মনে করিয়াছিল—সুতরাং সে তাহাকে দাঁতে চিবাইয়া চ্যাপ্টা করিয়া দিল।”

আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—“আমরা নিঃশব্দে যাইতেছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর তখনই একটা স্ত্রী-গরিলাকে দেখিলাম। একটী অতি শিশু গরিলা তাহার বুকে ঝুলিয়া দুধ খাইতেছে। মাতা তাহার পিঠ চাপড়াইতেছিল আর স্নেহের সহিত তাহাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। দেখিয়া আমার এত ভাল বোধ হইল এবং আমার প্রাণে এত লাগিল যে আমি সহসা গুলি করিতে চাহিলাম না। আমি ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় আমার সঙ্গের একজন শীকারি তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল, সেটা অমনি পড়িয়া গেল। মাতা পড়িয়া গেলে ছানাটী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল আর চীৎকার করিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। আমি সেই স্থানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া বেচারা তাহার মায়ের বুকে মাথা লুকাইল। ছানাটী চলিতেও পারিত না; কামড়াইতেও শিখে-নাই; সুতরাং আমরা সহজেই তাহাকে ধরিতে পারিলাম। আমি সেটীকে লইয়া চলিলাম; সঙ্গের লোকেরা তাহার মায়ের শরীরটা বাঁশে করিয়া বহিয়া আনিল। যখন আমরা গ্রামে আসিলাম, তখন আর এক দৃশ্য দেখা গেল। লোকেরা মরা গরিলাটাকে মাটিতে রাখিল, আমি ছানাটীকে কাছে রাখিলাম। তাহার মাকে দেখিবামাত্র সে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে গেল এবং দুধ খাইতে চেষ্টা করিল। দুধ না পাইয়া হয়ত মনে করিল যে একটা কিছু

হইয়াছে। তখন সে অতিশয় দুঃখের সহিত ‘হু হু হু’! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আমার প্রাণে বড়ই দুঃখ হইল। সে দুধ ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারিত না, আমিও দুধের যোগাড় করিতে পারিলাম না। সুতরাং দুইদিন পরে বেচারা মরিয়া গেল।” পশুদের প্রতি কি নির্দ্দয় ব্যবহার! সখার পাঠক পাঠিকা শুনিয়া হয়ত তোমাদের মনে ঘৃণা জন্মিতেছে। ঘৃণা জন্মিবারই কথা।

ভিখারিণী মেয়ে।

১

দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায়।
কে গাইছে পথে বসি এমন সময়—
না না না আমারি ভুল, গান ও তো নয়;
আপন প্রাণের ব্যাথা ক’য়ে,
কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে!

২

কত দুখে—আহা রে! না জানি
শুকায়েছে সোণামুখ খানি!
ছেঁড়া বাস যুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়,
কত দিন তেল বুঝি মাখেনি মাথায়!
আমার স্নেহের ভাই বোন!
কি ব’লে সে কাঁদে ঐ শোন।

৩

“এ জগতে কেউ মোর নাই
আমি হায় ভিখারিণী তাই;
লোকের দুয়ারে যাই ভিক্ষা দে’মা’ ব’লে,
ঘর নাই, তাই রেতে থাকি তরুতলে!
কিছু আর নাহিক সম্বল
সবে ধন নয়নের জল।

৪

“ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
এ দুখিনী নীরবে তাকায়;
ঘৃণা করে পাছে, ভেবে কথা বলি নাই,
তারা কেউ নয় মোর আপনার ভাই!—
তাই তারা আমাকে ডাকে না,
মোর কথা ভুলেও ভাবে না!

৫

“ত্রিসংসারে কে আছে আমার
কে মোরে ভাবিবে আপনার
আপনা আপনি কাঁদি, কেউ নাহি শোনে,
আমারে জগতে বুঝি কেউ নাহি চেনে!
এ দেশে তো এত আছে লোক
মোর তরে কেবা করে শোক?”

৬

“হায় বিধি, আমার কপালে
মরণ আছে কি কোন কালে?—
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মাও গেছে, চলে
একা আমি পড়ে আছি এত সব ব’লে;
ধনী, গুণী তাড়াতাড়ি মরে
আমাদের যমেও না ধরে!

৭

“তিন দিন ভাত নাই পেটে
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে!

আকাশে উঠিছে মেঘ, উড়িছে পরাণ;
যদি আসে ঝড় জল, কোথা পাব স্থান?
এই মাত্র ভিক্ষা দাও হরি!
আজি যেন একেবারে মরি।

৮

"দারুণ দুঃখের জ্বালা সয়ে
বেঁচে আছি আধ-মরা হয়ে,
এখন বাসনা শুধু মরণ মরণ!
মরণের কোলে থাকি করিয়া শয়ন।
এ জগতে কেউ যার নাই
মরণ! তুমি রে তার ভাই!" !!

৯

কচি মুখে এ বিষাদ গান
শুনে কার ফাটে না পরাণ!
বালক বালিকা আয় মোরা ছুটে যাই,
দুঃখিনীর আঁখি জল যতনে মুছাই;
ওরে যার দয়া নাহি হয়,
কেনরে সে দেহ ভার বয়!

১৯

চল চল ওর হাত ধরে
আমরা আনি গে ডেকে ঘরে;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই
কেউ হব বোন মোরা, কেউ হব ভাই
তাহ'লে ও বেদনা ভুলিবে;
তাহ'লে ও কতই হাসিবে!

নানা প্রসঙ্গ।

নং ১

দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল।

এক একটা জানোয়ারের এক এক প্রকার দুর্ব্বলতা থাকে। একজন শুনিল যে গায়ের পিরাণ খুলিয়া ফেলিবার মতন করিয়া পা উল্টাইয়া মাথার উপর পর্য্যন্ত আনিয়া, তার পর মাথা নোওাইয়া পেছনের দিকে হাঁটিয়া কুকুরের কাছে গেলে বড় ভয়ানক কুকুরটাও ভয় পায়। এই ব্যক্তির প্রতিবেশীর একটী স্থন্দর ফলের বাগান ছিল। প্রতিবেশী অতিশয় কৃপণ স্বভাব ছিল। তাহার বাগানের দরজায় আবার এক প্রকাণ্ড কুকুর বাঁধা থাকিত। স্থতরাং ফলগুলি দেখিয়া তাহার ক্ষুধাই বাড়িত, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি হইবার কোন আশা ছিল না। সে কুকুর সম্বন্ধে এই কথা শুনিয়াই ভাবিল যে এইবার প্রতিবেশীর ফলের বাগানে যাইতে হইবে। যাহা ভাবিল, কাজেও তাহাই করিল। আস্তে আস্তে কুকুরের দিকে পশ্চাৎপাদ হইতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল বুঝি কুকুর পলাইয়াছে—বুঝি এইবার বাগানের ভিতর আসিয়াছি। কুকুর কিন্তু ভয় পায় নাই; তাহার গলায় বাঁধা শিকলটা লম্বা ছিল না বলিয়া সে এতক্ষণ চুপ্ মারিয়াছিল। উল্টোদিকে উল্টোদিকে হাঁটিতে হাঁটিতে যাই ইনি তাহার কাছে আসিয়াছেন, অমনি সে ইহাঁর পাছা হইতে একবারের জলযোগের মতন এক টুকরা মাংস কামড়াইয়া লইল।

অন্যায় কাজ করিতে গেলে তাহারই শাস্তি পাওয়া যায়।

নং ২

আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব।

একজন স্পানিয়ার্ড আফ্রিকা দেশে পাখী মারিতে গিয়াছিল। পাখী শীকার করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একটা সিংহ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পশুরাজের মুখভঙ্গী দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে কেবল মাত্র কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার আগমন হয় নাই। তাহার বন্দুক পাখী মারিবার জন্য প্রস্তুত করা ছিল। ইহা ভিন্ন আর গুলি বারুদ তাহার সঙ্গে ছিল না। গুলি করিলে সিংহ মরিবে না, কেবল মাত্র বিপদ বাড়িবে। সুতরাং সে অন্য উপায়ে রক্ষা পাইবার পথ দেখিতে লাগিল। তাহার মাথার টুপিতে অনেকগুলি উটপক্ষীর পালক বাঁধা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে টুপী মুখে করিয়া লইল। পালকগুলি কেশরের মতন হইয়া তাহার বুক মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে চক্ষু দুটী মিট মিট করিতে লাগিল। এইরূপ চেহারা করিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া সিংহের দিকে যাইতে লাগিল। সিংহ ভাবিল যে এরূপ জানোয়ারতো সে কোন দিন খাইতে যায় নাই;—তবে বা এটাই তাহাকে খাইতে আসিল। সুতরাং এরূপ 'কিম্ভূত কিমাকারের' সামনে অধিকক্ষণ থাকা নিতান্তই আশঙ্কাজনক মনে করিয়া সে ইহাপেক্ষা নিরাপদ স্থানে যাইবার পন্থা দেখিল।

একজন লোক নানা প্রকার শব্দ ও "বিদ্‌ঘুটে" মুখভঙ্গী করিতে পারিত। এই লোকটাকে একবার সিংহে তাড়া করিল। সে বেচারা প্রাণপণে দৌড়িয়াও দেখিল যে আর বাঁচিবার আশা নাই, এবারে নিশ্চয়ই সিংহ তাহাকে ধরিবে। এমন সময় সে হঠাৎ থামিল। থামিয়াই সিংহের দিকে তাকাইল—আমরা যে রকম করিয়া একে অন্যের পানে তাকাই সেরূপ করিয়া তাকাইল না, সিংহের দিকে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া মাথা নোওাইয়া দুই ঠ্যাঙের মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া তাকাইল; আর তখন মুখের এমনি একখানা চেহারা করিল যে তেমন চেহারা আর সে কখনও করে নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভয়ানক শব্দগুলির ভিতর হইতে বাছিয়া, যে শব্দটী সকলের চাইতে অস্বাভাবিক, সেই শব্দটী করিল। সিংহ থামিল এবং একটু চিন্তান্বিত হইল; আর এক মুখ বিকৃতি, আর এক চীৎকার—সিংহ ভয় পাইল এবং ফিরিল। আর এক চীৎকার—সিংহ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

হঠাৎ কোন স্থানে বিপদে পড়িলে ভয়ে জড়সড় না হইয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় মনে মনে ভাবা উচিত।

নং ৩

অভিমানী রাজপুত্র।

রুষিয়ার যুবরাজের পুত্র সকালে উঠিয়া মুখ ধুইতে চাহিতেন না। একদিন তাঁহার মাষ্টার আসিয়া নালিশ করিল "ছোট কর্ত্তা মুখ ধুইতেছেন না।"

যুবরাজ বলিলেন "বটে? আচ্ছা দেখা যাবে, এর পর সে কেমন করিয়া মুখ না ধুইয়া থাকে।"

রাজপরিবারের ছেলে বুড়ো সকলকেই পাহারাওয়ালারা সেলাম করিবে, এরূপ নিয়ম। পর দিন চারি বৎসরের শিশু কর্ত্তাটী মাষ্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলেন। একজন পাহারাওয়ালার কাছ দিয়া তাঁহারা গেলেন; সে তালগাছপানা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সেলাম করিল না।

যুবরাজের ছেলেকে সকলেই সেলাম করিয়া থাকে, সুতরাং তিনি ইহাতে একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। একটু পরেই তাঁহারা আর একজন পাহারাওয়ালার নিকট দিয়া গেলেন। এই ব্যক্তিও কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। যুবরাজনন্দন অত্যন্ত চটিয়া মাষ্টারকে বলিলেন। এইরূপ বেড়াইবার সময় অনেক সিপাহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কেহই তাঁহাকে সেলাম করিল না। তিনি দৌড়িয়া যুবরাজের কাছে গিয়া বলিলেনঃ—

"বাবা! বাবা! তোমার বরকন্দাজগুলিকে চাবুক মার। আমি যাইবার সময় এরা আমাকে সেলাম করিতে চাহে না।"

যুবরাজ বলিলেন "বাছা, তাহারা ভালই করে। পরিষ্কার সিপাহীরা কখনও অপরিষ্কার ছোট কর্ত্তাকে সেলাম করে না।" এর পর হইতে যুবরাজনন্দন প্রত্যহ প্রাতে স্নান করিতেন।

যুবরাজপুত্রের অভিমানই তাহার কু-স্বভাব সংশোধন করাইল।

সার উইলিয়ম জোন্স।

দেখার পাঠক পাঠিকা! মানুষ নিজের পরিশ্রম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও যত্নের গুণে কত উন্নতি করিতে পারে তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত আজ তোমাদিগকে দেখাইব। তোমরা কি সার উইলিয়ম জোন্সের নাম শুনিয়াছ? তিনি প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। এখন হাইকোর্ট নামে কলিকাতাতে যে সর্ব্বপ্রধান আদালত আছে তখন তাহার নাম সুপ্রিম কোর্ট ছিল, তিনি তাহারই একজন বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু বড় পদস্থ লোক ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার জীবনচরিত তোমাদিগকে বলিতে যাইতেছি তাহা নহে। তিনি নিজ পরিশ্রমে কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন তাহাই দেখান উদ্দেশ্য।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে উইলিয়ম জোন্সের জন্ম হয়। তাঁহার বয়স যখন তিন বৎসর মাত্র তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার সুশিক্ষিতা মাতার উপরেই তাঁহার শিক্ষার ভার পড়ে। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি একজন অসাধারণ বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক ছিলেন। অতি শৈশব কাল হইতে তিনি উইলিয়ম জোন্সের পাঠে রুচি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। জোন্স যখন দুই তিন বৎসরের বালক তখন কোন নূতন বিষয় দেখিয়া তাহার বিবরণ জানিবার জন্য মাতার নিকট আসিলেই তিনি বলিতেন "পড়, পড়িলেই জানিতে পারিবে।" মায়ের মুখে এইরূপ বার বার শুনিয়া শিশু জোন্সের পড়াতে অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল। ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে স্কুলে দিলেন। ১৭৬৪ সালে তিনি স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। অক্সফোর্ডে পড়িবার সময় তিনি এত পরিশ্রম করিতেন, এবং নিজের ক্লাসের পাঠ্য বিষয়ের অপেক্ষা এত অধিক বিষয় শিক্ষা করিতেন যে, তাহা দেখিয়া তাহার একজন শিক্ষক সর্ব্বদা বলিতেন "জোন্সকে যদি বস্ত্রহীন করিয়া একাকী মরুভূমির মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবু সে একটা বড়লোক হইয়া উঠিবে।"

বালক কাল হইতেই তাঁহার নানা ভাষা শিক্ষা করিবার দিকে মনের ঝোঁক ছিল। অক্সফোর্ডে

তিনি গ্রীক ও লাটীন ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন নিজের যত্নে ইটালীয়, স্পেনীস, পোর্ত্তুগীজ ও ফরাসিস্ এসকল ভাষাও শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার এতদূর আগ্রহ ছিল যে তিনি এই সময়ে আলিপো নগরবাসী একজন লোককে অনেক টাকা বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার নিকট পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেন।

একদিকে এত ভাষা শিখিতেন তাহা বলিয়া যে তাঁহার কালেজের পাঠের কোন ব্যাঘাত হইত তাহা নহে; সেখানেও অতি উৎকৃষ্ট রূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৭৬৫ সালে তিনি ইংলণ্ডের একজন ধনী সন্তানের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া জর্ম্মনি দেশে গমন করেন। সেখানে অবস্থিতি কালে জর্ম্মণ ভাষা অতি উৎকৃষ্ট রূপে শিক্ষা করেন। জর্ম্মনি দেশ হইতে তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন তখন পারস্ত ভাষায় লিখিত নাদির শাহের একখানি জীবন চরিত সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইংলণ্ডে আসিয়া সেই বই খানি ফরাসি ভাষাতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়া অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। দিন দিন তাঁহার যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া লোকে চমৎকৃত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল কাজের মধ্যে জোন্সের প্রাণে একটী বাসনা প্রবল ছিল। সেইটী কিরূপে চরিতার্থ হইবে তিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতেন। সেটী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা। অবশেষে তাঁহার সে বাসনাও পূর্ণ হইল। ১৭৮৩ সালে তিনি কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। সে সময়ে কেহই সহজে বিলাত হইতে এদেশে আসিতে চাহিত না। এখন সুয়েজ যোজককে কাটিয়া দেওয়াতে যেমন ২০।২১ দিনের মধ্যে জাহাজ এদেশে পৌঁছে তখন সেরূপ ছিল না। তখন জাহাজ সকলকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে হইত। তাহাতে আবার তখন কলের জাহাজ ছিল না, জল বায়ুর অবস্থা দেখিয়া জাহাজ সকলকে আস্তে আস্তে আসিতে হইত। আসিতে অনেক দিন লাগিত ও পথে অনেক ক্লেশ হইত। এখন এদেশে অনেক ইংরাজ আসিয়াছেন এবং তাঁহারা সহর গুলিকে অনেক স্বাস্থ্যকর করিয়াছেন। এখন এক জন ইংরাজ আসিলে তাঁহার থাকিবার অসুবিধা হয় না। তখন এ দেশে ইংরাজ ছিল না বলিলে হয়। ইংলণ্ডের লোকের এই ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষে গেলে ফেরা দুর্ঘট সুতরাং বিলাতে করিয়া খাইতে পারিলে কেহ আর এদেশে আসিতে চাহিত না। উইলিয়ম জোন্স ইংলণ্ডে থাকিতেই যেরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাতে সেখানে থাকিলে তাঁহার করিয়া খাইবার অপ্রতুল হইত না। কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার বাসনা এত প্রবল ছিল যে ঐ পদ পাইবা মাত্র তিনি আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন এবং ঐ বৎসর অর্থাৎ ১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া পোঁছিলেন। আসিবার সময় তাহাকে সম্মান পূর্ব্বক 'সার' উপাধি দেওয়া হইল।

এখানে আসিয়া তাঁহাকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির কাজ করিতে হইত। তখন সুপ্রিম কোর্টের কাজ কর্ম্ম বড় জটিল ছিল। বিচারপতিদিগের সুবিচার করিবার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। এখানকার জল বায়ু অতিশয়

অস্বাস্থ্যকর ছিল, তাহাতে গুরুতর শ্রম করিতে হইত, ইহাতে সার উইলিয়ম জোন্সের শরীর বার বার অসুস্থ হইয়া পড়িত। কিন্তু তথাপি তিনি নানা ভাষা শিক্ষা করিতে ছাড়িতেন না। যাহা একটু সময় পাইতেন তাহা সংস্কৃত শিক্ষাতে দিতেন। আদালত যখন বন্ধ হইত তখন তিনি মনের আনন্দে সংস্কৃত পড়িতেন। তিনি পূর্ব্বদেশীয় ভাষা সকলের চর্চ্চার উন্নতি করিবার জন্য "এসিয়াটিক্ সোসাইটী" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। ঐ সভা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ শুনা যায় হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী নগরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে এক মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সার উইলিয়ম নাকি তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ১৭৯৪ সালে তিনি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন। ১৭৯৪ সালে মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইল, ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। এতদ্দ্বারা বিচার কার্য্যের অনেক সাহয্য হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুরুতর শ্রম অধিক দিন সহিল না। তাহার শরীর ত্বরায় রুগ্ন হইয়া পড়িল। ১৭৯৪ সালে কোন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম ৪৮ বৎসরের অধিক হয় নাই। একজন ইংরাজের পক্ষে ৪৮ বৎসর যৌবন কাল বলিয়া গণ্য; সুতরাং তিনি অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করিয়াছেন। আরও দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

তাঁহার জীবন চরিত লেখক বলেন যে, কতকগুলি বিশেষ গুণে সার উইলিয়ম জোন্স এত উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গুণ এই ছিল যে তিনি উন্নতি করিবার সুবিধা ও সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না, সকল কাজের মধ্যে তাঁহার আত্মোন্নতির দিকে প্রখর দৃষ্টি থাকিত। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিতেন অন্যে যাহা করিয়াছে আমি কেন তাহা করিতে পারিব না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সদ্‌গুণ এই ছিল যে তিনি সময় বিভাগ করিয়া যে সময়ে যে কাজ করিবার তাহা করিতেন, এই কারণে দশ কাজের মধ্যে তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত হইত না। এই সকল গুণ থাকাতে তিনি আশ্চর্য্য উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার সম কালে তাঁহার ন্যায় এত ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিল না বলিলে হয়।
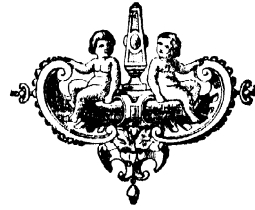
ফুলের সাজি।

প্রথম অধ্যায়।

গত সংখ্যার পর।

দীননাথ গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময়ে মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া বাগানের পার্শ্বস্থিত প্রান্তরের নিকট একটী বটবৃক্ষতলে বসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিত। বালিকা পিতার পার্শ্বে বসিয়া নিবিষ্ট

চিত্তে পিতার কথা শুনিত এবং পিতা কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিত।

একদিন সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে করিতে বৃদ্ধ তাহার কন্যাকে বলিল, "মনোরমে ভাবিয়া দেখ দেখি ঈশ্বরের কি অপার দয়া! এই সূর্য্য এতক্ষণ প্রখর রশ্মি বিস্তার করিয়া জগৎকে দগ্ধ করিবেন, ইহাঁর দ্বারা পরমেশ্বর জগতের কত উপকার করাইতেছেন। তাঁহারই প্রসাদে শস্য-ক্ষেত্রে শস্য, বৃক্ষে ফুল ও ফল জন্মিতেছে। তিনি মানবকে যে কত ভালবাসেন তাহা মানুষ ধারণা করিতে পারে না। আমাদের সুখের জন্য তাঁহার কি অদ্ভুত চেষ্টা! বৎসে তোমার কি এমন দয়াময় হরিকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয় না?"

মনোরমা। হাঁ বাবা, আমি আগে এই সকল ভাবিয়াছিলাম, যখনই আমরা কোন বিপদে পড়ি, তখনি তিনি আমাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন। আমার পীড়া হইলে তুমি যেমন কিসে আমি আরোগ্য হব তাহারই জন্য ব্যস্ত থাক ঈশ্বরও তেমনি জগৎশুদ্ধ লোকের জন্য ব্যস্ত।

এই কথা বলিয়া সে দৌড়িয়া গিয়া একটী বড় গোলাপ লইয়া পিতাকে উপহার দিল।

দীননাথ ফুল পাইয়া কহিল "মনোরমে, গোলাপ ফুল দেখিতে কেমন সুন্দর, এই ফুলটী যেন বিনয়ের প্রতিকৃতি, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটী সুন্দর ফুল আছে সেটী লজ্জাশীলা সচ্চরিত্রা বালিকার সুকোমল বদনমণ্ডল। বিনয়ী বালিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল। এই গোলাপটীতে কর্দ্দম লাগিলে, ইহা যেমন শ্রীহীন হইয়া পড়ে, বালি-কার মুখে লজ্জা ও বিনয় না থাকিলে তাহাও বিশ্রী দেখায়। দেখিও যেন তোমার মুখে মলি-নতা না স্পর্শ হয়।

আর দুটী একটী কথা বলিলেই মনোরমার বাগানের অধ্যায় শেষ হয়। মনোরমার পিতা উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে কন্যার জন্মদিনে একটী আম্র বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, গাছটী মনোরমার বড় প্রিয়, সে যত্নের সহিত প্রতিদিন তাহাতে জল সেচন করিত। গাছটী যেন দেখিতে একটী গোলাপের তোড়া। আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি তাহার পূর্ব্ব বৎসরে মনোরমার গাছে এত আম হইয়াছিল যে তাহার আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু এ বৎসর মনো-রমা দেখিল যে বৃক্ষটী শুকাইয়া যাইতেছে, তখন সে দুঃখিত মনে পিতাকে বলিল "হায় আমার এমন চমৎকার আম্রের গাছটী মরিয়া যাইতেছে।"

দীননাথ বলিল, মা রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ সহিতে না পারিয়া গাছটী শুষ্ক হইয়া যাই-তেছে। পাপের প্রভাবে মানবগণও এই রূপে শুষ্ক হইয়া যায়। যাহাদের উপর কত আশা, কত ভরসা এমন বুদ্ধিমান্ যুবকেরাও পাপাসক্ত হইয়া অকালে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। কেবল যুবকেরা কেন অনেক রমণীও অল্প বয়সে পাপপ্রলোভনে পড়িয়া শেষে আপ-নার জীবনকে নষ্ট করিয়া ফেলে। অত-এব সাবধান! সর্ব্বদা প্রলোভন হইতে দূরে অবস্থিতি করিবে। প্রলোভন নিকটস্থ হইলে তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিবে। বৎসে, সাবধান কখন মন্দ কার্য্য বা চিন্তা করিও না। সর্ব্বদা কায়মনে পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বর আমাদের পরম সহায়। দেখ, তুমি তোমার গাছটীর দশা দেখিয়া যেমন দুঃখিত হইতেছ, আমার যেন তোমায় বিপথগামিনী দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে সেইরূপ দুঃখ করিতে করিতে চিতা-

রোহণ না করিতে হয়।

বৃদ্ধ বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার কথাগুলি মনোরমার প্রাণের মধ্যে বিদ্ধ হইল, সে কথাগুলি চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিল।

সাধু পিতার সহিত সহবাসে মনোরমার মন দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ দীননাথ তাহার বৃক্ষ সকলের শোভা দেখিয়া মোহিত হইত বটে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কন্যার সাধুতায় তাহার মন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হইত। ঈশ্বর প্রসাদে দীননাথের এত যত্নে কন্যাপালন ব্রত সুফল প্রদান করিল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্মদিনের উপহার।

মনোরমা ও তাহার পিতা যে গ্রামে পরম সুখে কালক্ষেপণ করিত, সেই গ্রামে গৌড়েশ্বরের একটী বাগানবাড়ী ছিল। এই বাগানে রাজা, রাজমহিষী ও তাঁহাদের একমাত্র কন্যা হেমলতা গ্রীষ্মকালে বাস করিতেন। রাজধানীতে অনেক লোকের সমাগম বলিয়া গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামে বাস করা অত্যন্ত সুখজনক। একদিন মনোরমা কোন পুষ্করিণী হইতে কতকগুলি পদ্মফুল তুলিয়া তাহার দুই ছড়া মালা গাঁথিয়া বাড়ী আসিতেছে এমন সময়ে অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে রাজকুমারী তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি, মনোরমার হস্তে মনোহর পদ্মমালা দেখিয়া, তাহাকে ডাকিবার জন্য কোন পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিলেন। পরিচারিকা মনোরমার নিকট আসিয়া তাহাকে রাজকন্যার আহ্বান জানাইল। মনোরমা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, অগত্যা ধীরে ধীরে পরিচারিকার সঙ্গে রাজকুমারী হেমলতার নিকট উপস্থিত হইল।

হেমলতা দেখিতে সুশ্রী, তাঁহার হৃদয় অহঙ্কারশূন্য। তিনি মনোরমার পবিত্র মুখখানি দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে অভিলাষিণী হইলেন। ধন্য সরলতা, ধন্য পবিত্রতা, তোমরা দরিদ্র কন্যাকে রাজকুমারীর মনহরণ করাও, কুরূপাকে সুন্দরী কর, মূর্খকে জগৎমান্য করাও!

হেমলতা বলিলেন, "ভাই তোমার নাম কি? তোমার বাড়ী কোথায়?"

মনোরমা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কুমারি আমি আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত দীননাথের কন্যা, আমার নাম মনোরমা, এই উদ্যানের অনতিদূরেই আমার পিতার বাসস্থান, যদি কৃপা করিয়া এই মালা ছড়াটী গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।"

এই বলিয়া সে এক ছড়া মালা তাঁহার করে অর্পণ করিল। হেমলতা পরম আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে রাজমহিষী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হেমলতার মুখে মনোরমার বিষয় জানিয়া ও তাঁহাকে সুশীলা দেখিয়া পরম আনন্দিতা হইলেন। মনোরমা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হাতের অপর

মালা ছড়াটী তাঁহার পদতলে স্থাপন করিল।

রাজমহিষী মনোরমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য পাঁচটী মুদ্রা বাহির করিলেন।

মনোরমা সবিনয়ে কহিল "মা আমি কি পুরস্কার না লইয়া এই মালা আপনাদিগের চরণে উপহার দিলে আপনারা তাহা গ্রহণ করিবেন না?"

মহিষী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "মনোরমে, হেমলতা পদ্মফুলের মালা বড় ভালবাসে, যতদিন ফুল পাইবে তত দিন প্রত্যহই হেমের জন্য এক এক ছড়া মালা আনিবে।"

মনোরমা "যে আজ্ঞা," বলিয়া উত্তর দিল, সে দিন হইতে প্রতিদিন সে মালা আনিয়া রাজকুমারী হেমলতাকে প্রদান করিত। হেমলতা, মনোরমার কথায় ও ব্যবহারে ক্রমশঃ এত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন যে, তাহাকে পাইলে অন্যে ছাড়িতেন না। তিনি, তাহাকে রাজপরিবারের মধ্যে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু মনোরমা তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিল। সে পিতার সঙ্গে থাকিয়া ও কথোপকথন করিয়া ও তাহার সেবা করিয়া যে বিমল সুখ পাইত তাহা রাজভবনে কোথায় মিলিবে? এইরূপে দেখিতে দেখিতে অনেক দিন অতিবাহিত হইল। হেমলতার সঙ্গিনীরা, রাজকুমারীকে মনোরমার প্রতি অনুরক্তা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইল।

ক্রমশঃ।

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা হয়ত আজও শোন নাই যে তোমাদের দেশের একটী অতি প্রাচীন হিতৈষী বন্ধু ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তোমরা বোধ হয় আজও বিস্মৃত হও নাই যে অক্ষয় বাবু কে? বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সচিত্র জীবনী আমরা তোমাদিগকে গত বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে উপহার দিয়াছি। তিনি গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি ৩ টার সময়ে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি এরূপ রুগ্ন হইয়াছিলেন যে তিনি যেন জীবিত অবস্থায়ই মৃত্যুর কোলে শয়ান ছিলেন। তাঁহার সামাজিক জীবন এক প্রকার লোপ হইয়াছিল বলিলেই হয়, তিনি এক প্রকার সাধারণ লোকের নিকট মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা কি জান তিনি তোমাদের জন্য, তোমাদের জন্মভূমির জন্য কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তোমরা আজ কাল কত ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে পাও, কত ভাল ভাল সংবাদপত্র দেখিতে পাও, তোমরা কত নীতিপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গল্প, কত বিজ্ঞানের কথা পড়িতেছ, তোমরা সখা পাইয়াছ কিন্তু তোমরা কি জান কোন্ মহাত্মার প্রসাদে তোমরা এই সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াছ? অক্ষয় বাবুর পূর্ব্বে তোমাদের দেশে এ সকলের সূত্রপাতও হয় নাই—তিনিই এ সমস্ত প্রথমে দেশে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে দেশে যে সমস্ত ছিল তাহার বিষয় আর তোমাদিগকে জানিয়া কাজ নাই, অশ্লীল কথা, অশ্লীল গল্প, অশ্লীল ভাবই

তাহার প্রাণ। যে কয়েকখানি সংবাদপত্র ছিল তাহাদের অবস্থাও তদনুরূপ। সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাতে কিছুই থাকিত না— থাকিত কেবল সাধারণের কুরুচির স্রোতকে সহায়তা করিবার জন্য কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গল্প ও ব্যক্তিগত গালিগালাজ। অক্ষয় বাবু সর্ব্বপ্রথমে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সাহায্যে এই জাতীয় কুরুচির স্রোতকে বাধা প্রদান করেন। তাঁহারই অসাধারণ সত্যানুরাগ, তাঁহারই অসাধারণ নৈতিক চরিত্রের মহিমা দেশের দুরবস্থাকে অনেক উন্নত করিয়াছিল তাই আজ তোমরা এই সকল সুখের অধিকারী হইয়াছ। মহাত্মা রাজা রামমোহনের পর দেশত পুনরায় কুপথে যাইতেছিল, অক্ষয় বাবুই এমত সময় বাঙ্গালা সাহিত্যে নৈতিক শক্তি প্রদান করিয়া দেশকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে দেশে বিজ্ঞানের নাম পর্য্যন্ত ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনিই দেশীয় লোকদিগকে বিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। তিনিই বুঝাইয়া দিলেন যে বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ না হইলে দেশের দুরবস্থা দূর হইবে না, দেশ কখনই উন্নত হইবে না। কিন্তু তিনি আর যে একটি জিনিস দিয়া গিয়াছিলেন তাহার নিকট এসকলও অতি সামান্য। তিনি আমাদিগকে মানুষ হইতে শিখাইয়া গিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ভাব ও স্বাধীন কার্য্যের ইচ্ছা মানবের অন্তরে প্রবিষ্ট না হইলে মানুষ যে মানুষ হইতে পারে না, মানুষ যে কেবল অপরের হস্তে পুত্তলিকা তাহা তিনি আমাদিগকে বিশেষ রূপে শিখাইয়া গিয়াছেন। যে স্বাধীনতার জন্য আজ আমরা লালায়িত যে স্বাধীন ভাব দেশে প্রবেশ করিয়া আজ কাল দেশীয় যুবকদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে সেই স্বাধীন ভাব সর্ব্ব প্রথমে বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের মনে প্রবিষ্ট হয়। আজ তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন আইস ভাই বোন্, আজ আমরা তাঁহার স্মৃতি আমাদের প্রধান অলঙ্কার করিয়া হৃদয়ে ধারণ করি।

ধাঁধা।

—:o:—

গত বারের সচিত্র ধাঁধার উত্তর।

১। নব বরষে থাক হরষে
সখা পড়গো কষে

নূতন ধাঁধা।

১। ১ হইতে ৯ কে এমন তিন লাইনে বসাও যে লম্বভাবে, পাশাপাশি বা কোণাকোণী ভাবে অঙ্কগুলি যোগ করিলে যোগ ফল ১৫ হইবে।

নূতন প্রকারের ধাঁধা।

উপরোক্ত ছবিটী অবলম্বন করিয়া একটী রচনা লেখ; যাহার রচনা ভাল হইবে তাহার রচনা সখায় প্রকাশিত হইবে।
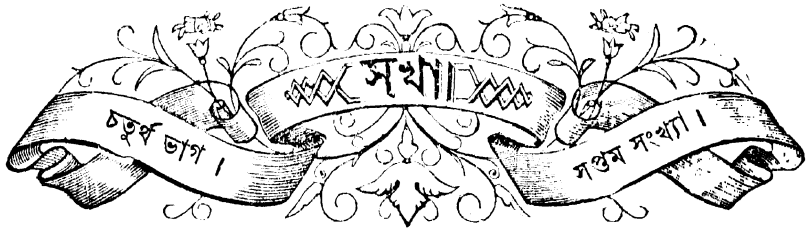
জুলাই, ১৮৮৬।

প্রবাল দ্বীপ।

ত মে মাসের সখাতে প্রবাল কীটদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। এবারে উহারা যে আশ্চর্য্য দ্বীপ সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া জগতের কত কল্যাণ করিতেছে, তাহাদের বিবরণ কিছু দিব। ঐ সকল কীট দ্বীপ নির্ম্মাণ করে, একথা বলা ঠিক নহে। উই পোকারা বল্মীক নির্ম্মাণ করে, বাবুই পাখী চমৎকার কৌশলে বাসা নির্ম্মাণ করে, বীবরেরাও অতি আশ্চর্য্য বাস-স্থান নির্ম্মাণ করে, এবং মানুষেরা আপনাদের বুদ্ধি কৌশলে কত কি অদ্ভুত পদার্থ সকল প্রস্তুত করিয়া থাকে; কিন্তু এই সকল কীট সে রূপে কিছুই করে না। ইহাদের কর্ত্তৃত্ব এক-টুও নাই। দ্বীপ নির্ম্মাণকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর। ইহাদের দেহের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা তিনি আপ-নিই দ্বীপ প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহারই আশ্চর্য্য কৌশল সর্ব্বত্র দেখা যায়। এখানেও তাই।

যে সকল ডাকাত বা খুনী আসামীর চির-জীবনের মত দ্বীপান্তরিত হওয়ার সাজা হয় তাহাদিগকে ভারত মহাসাগরের আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে চালান দেওয়া হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। ঐ সকল দ্বীপের অনেকগুলি প্রবালকীটদিগের দেহের পূর্ব্ব লিখিত কঠিন অংশে নির্ম্মিত। মালদ্বীপ, লাক্ষা-দ্বীপ প্রভৃতি ভারত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যেও বিস্তর দ্বীপ-পুঞ্জ এই রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাল দ্বীপ-গুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর; কোথাও একটী দ্বীপ বা সাগরের ধারের কোন দেশের কিনারায় সাদা ধপ্ ধপ্ কর্চ্ছে। প্রবাল দেহ রাশি জোয়ারের সময়ে সব ডুবিয়া যায়; চারিদিকে নীল জল অসীম, অকূল, উপরে অনন্ত নীল আকাশ, আর সুমুখে শুভ্রবর্ণ প্রবাল দেহ সকল ভাঁটার সময়ে যখন উচ্চ হইয়া দেখা দেয়, তখন কি চমৎকারই শোভা হয়! কল্পনা করিলেও প্রাণে কত আনন্দ হয়!

প্রবাল কীটের দেহ দ্বারা যে নূতন জমি প্রস্তুত হয়, তাহা তিন প্রকার। এক প্রকার দেখা যায় যে, তাহারা কোন দ্বীপের চারিদিকে বা উপকূলস্থিত কোন দেশের ধারে ধারে বাস করে। ঐ দ্বীপ বা দেশের যে যে দিকে নদী নাই এবং বাতাস বহিয়া জলে খুব ঢেউ হয় ও সাগরের স্রোত খুব প্রবল, সেই দিকেই প্রবাল দিগের বাস করিবার বড় সুবিধা হয় ("প্রবাল কীট" দেখ।) তাহারা মনের আনন্দে বাড়িতে থাকে। এক দল মরিয়া যায়, আর এক দল

তাহাদের কঙ্কালময় দেহের উপরে বসিয়া আবার আনন্দে জীবন কাটায় ও প্রত্যেকে শত শত নূতন কীট উৎপন্ন করিয়া আপনারা প্রাণত্যাগ করে। এইরূপে দলে দলে প্রবাল কীটেরা যখন উপর্য্যুপরি বাড়িতে থাকে, তখন ক্রমে ঐ প্রবাল-নিবাস উচ্চ হইয়া উঠে। অবশেষে যখন এমন হয় যে, তাহাদের দেহ ভাঁটার সময়ে জল ছাড়াইয়া উঠে আর জোয়ারে ডুবিয়া যায়, তখন তাহাদের কিছু ক্লেশ হইতে আরম্ভ হয়। কেন না যতক্ষণ জলের উপরে থাকে ততক্ষণ তাহারা মৃত প্রায় হইয়া যায়। ক্রমে এই রূপে উপরের কীটগুলি প্রাণত্যাগ করে ও জলাভাবে তাহাদের দেহের উপর আর অন্য কীট জন্মিতে পারে না। সুতরাং তাহার উচ্চতা ঐ অবধিই এক প্রকার বন্ধ হয়। তবু বাতাসে ও স্রোতের জোরে জীবিত বা মৃত প্রবাল-দেহ বিস্তর ভাসিয়া বা চালিত হইয়া তাহার উপর পড়ে ও ক্রমে ঐ স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইতে থাকে। এবং যত ঘাস ও অন্যান্য ছোট ছোট চারা গাছ জন্মিয়া জমি শক্ত হইয়া উঠে, ততই উহা স্থায়ী হইতে থাকে। এই প্রকারের প্রবাল নির্ম্মিত স্থানকে ইংরাজীতে Fringing Reef বা উপ-কূলস্থ প্রবালাবাস কহে। (ছবি দেখ) ক—একটী দ্বীপ, তাহার চারিধারে খ—শ্বেতবর্ণ প্রবালাবাস দ্বারা ঘেরা, তার পর সাগর। মাডাগাস্কার দ্বীপ ও আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে এই জাতীয় প্রবালাবাস বহু-দূর ব্যাপিয়া আছে।

(২ য়তঃ) আর এক জাতীয় প্রবালাবাস দেখা যায়, তাহা আর একটু আশ্চর্য্য। তাহা দ্বীপ বা দেশের গায়ে লাগিয়া থাকে না। উপ-কূল হইতে অনেক দূরে চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে। এই জাতীয় প্রবালাবাস হইতে উপ-কূল ৫।১০ কখন কখন ২০।৩০ মাইল দূরে থাকে। মধ্যে যে জলভাগ তাহার গভীরতা খুব অল্প, তথায় স্রোত ও তুফান কম এবং তাহার তলা হইতে মাটি তুলিলে তাহাতে প্রবালদিগেরই মৃত দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জলভাগের পর প্রবালদিগের বাসস্থান চারিদিকে ঘিরিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব ভাগে উপকূল হইতে প্রায় ২০।৩০মাইল দূরে ১২০০মাইল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রকাণ্ড একটী প্রবা-লাবাস আছে। তথা হইতে উপকূল পর্য্যন্ত ঐ যে ২০।৩০ মাইল সাগর, তাহার গভীরতা এত কম যে তাহাকে সাগর না বলিয়া Inner passage অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী জল-প্রণালী কহে; বস্তুতই উহার
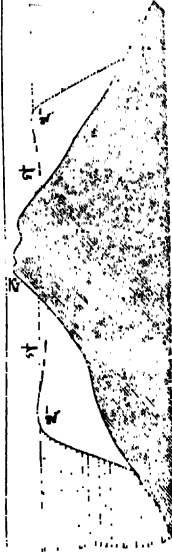
গভীরতা কোথাও ১০০ হাতের অধিক নহে, বরং অনেক স্থলে কম। কিন্তু ঐ প্রবালাবাসের বাহিরেই সাগরের গভীরতা একে-বারে অনেক বেশী। এরূপ কেন হয় পরে বলিব। এই জাতীয় প্রবাল নির্ম্মিত স্থানকে ইংরাজীতে Barrier Reef বারীয়ার রীফ্ কহে। (ছবি দেখ); ক—দ্বীপ, খ—এই জাতীয় প্রবালা-বাস, গ—মধ্যস্থ জলপ্রণালী, দুই পার্শ্বে অতলস্পর্শ সাগর।

(৩য়তঃ) উপরে যে দুই জাতীয় প্রবালাবাস বর্ণিত হইল, তাহারা কেহই বাস্তবিক প্রবাল দ্বীপ নহে। কিন্তু যথার্থই লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, চেগোস্ দ্বীপপুঞ্জ, কেরোলাইন দ্বীপপুঞ্জ, লো দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অনেক স্থানে প্রবাল দ্বীপের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহারা যথার্থই দ্বীপ। চারিদিকে অকূল সাগর, মধ্যে ১০০ শত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রবালদের নির্ম্মিত গোলাকার দ্বীপ। এই জাতীয় দ্বীপ বড় আশ্চর্য্য। ইহারা অন্যান্য দ্বীপের মত নহে। ইহাদের সকলেরই মধ্যস্থলে এক একটী প্রকাণ্ড হ্রদ বা জলাশয়, আর তাহারই চারিদিকে জমি। একটা থালায় জল রাখিয়া তাহাতে একটী সোণার বালা রাখিলে যেমন হয়, চারিদিকে জল ভিতরেও জল মাঝখানে উচ্চ সোণার বালা ;—তেমনি চারিদিকে নীল সাগর, মাঝখানে দ্বীপের ভিতরেও সাগরের জল স্থানে স্থানে ভাঙ্গা পথদিয়া প্রবেশ করিতেছে ও খেলিতেছে, আর তাহারই চারিদিকে কোথাও আধ পোয়া,কোথাও একপোয়া (অর্দ্ধ মাইল)চওড়া প্রবাল দ্বীপ উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর নারিকেল গাছ ও অন্যান্য চারা গাছ সকল হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে,আবার মানুষ তথায় ঘর বাড়ী করিয়া বাস করিতেছে ! কি আশ্চর্য্য ! (ছবি দেখ।)

এই জাতীয় প্রবালাবাসই বস্তুতঃ প্রবাল-দ্বীপ ;—ইংরাজীতে ইহাদিগকে Atoll কহে। ইহাদের ভিতরের যে হ্রদ তাহার গভীরতা অত্যন্ত অল্প, কিন্তু বাহিরের দিকে সাগরের গভীরতা হঠাৎ অপরিমেয়।

এখন তিন জাতীয় প্রবালাবাস কিরূপ তাহা বুঝিলে। কিন্তু কিরূপে ইহারা যে নির্ম্মিত হয়, তাহা বুঝা তত সহজ নহে। বড় বড় পণ্ডিতেরা নানা উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। কথা এই যে, ঐ সকল কীট যদি ৯০ হইতে ১৮০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর জলের নীচে না বাঁচে, (মে মাসের সখা দেখ,) তবে এই অতলস্পর্শ সাগরের মধ্যে কোথা হইতে ও কিরূপে এত বড় বড় দ্বীপ Atoll নির্ম্মাণ করিল ? কিরূপেই বা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব্ব উপকূলে ও অন্যান্য স্থানের "বারীয়ার রীফ" গুলি প্রস্তুত করিল ? উপকূলস্থিত প্রবালাবাস বুঝা খুব সহজ। কিন্তু আর দুই জাতীয় দ্বীপ কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, একথা কোন পণ্ডিতই প্রথমে স্থির করিতে পারেন নাই। কত লোকে কত রকম কথা আন্দাজ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঠিক কথাটী কেহই বলিতে পারিলেন না। প্রবাল দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী হ্রদই বা কোথা হইতে আসিল, আর তাহার জলই বা এত কম গভীর কেন, তাহারও কোন মীমাংসা হইল না। শেষে Charles Darwin প্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেব যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই ঠিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ডারউইন সাহেব বলেন যে, শেষোক্ত দুই জাতীয় প্রবালাবাসই প্রথমে উপকূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ক্রমে বহু কালে ঐরূপ আকার লাভ করিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে মনে কর

একটী দ্বীপের চারি দিকে উপকূলে প্রবালেরা বাস করিল, ক্রমে বেশ সুন্দর ১ম ছবির মত একটী প্রবালাবাস নির্ম্মিত হইয়া কিছু কাল রহিল। তাহার পর, যে কারণে প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের নানা স্থান ক্রমশঃ নীচু হইয়া বসিয়া যাইতেছে, সেইজন্য হয়ত ঐ দ্বীপটীও ক্রমে নীচু হইয়া যাইতে লাগিল। দ্বীপ যত নীচু হইতে লাগিল প্রবালেরাও আবার তত উচ্চ করিয়া আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যেদিকে স্রোত ও বাতাসের ঢেউ বেশী সেই দিকের প্রবালেরা বাড়িতে লাগিল, এজন্য প্রবালাবাসের সাগরের দিক উহার দ্বীপের দিক অপেক্ষা উচ্চ হইতে থাকিল। কাজে কাজেই ক্রমে মাঝ খানটা খালি পড়িয়া গেল। ইহাই ঐ দ্বীপ ও ঐ প্রবালাবাসের মধ্যস্থ জল প্রণালী Inner passage রূপে দাঁড়াইয়া গেল। আর পূর্ব্বের উপকূলস্থ প্রবালাবাস এক্ষণে Barrier Reef শ্রেণীতে পরিণত হইল। (২য় ছবি দেখ)।
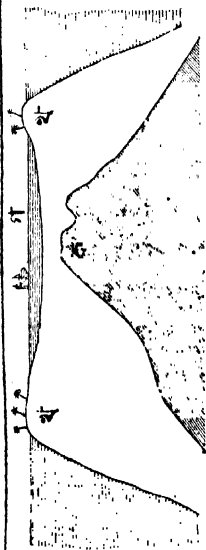
ক্রমে যত দ্বীপটী আরও বসিয়া গেল ততই প্রবালেরা চারিদিক ঘিরিয়া সাগরের দিকে উচু হইতে লাগিল, আর মাঝের জলপ্রণালী ততই বাড়িয়া বাড়িয়া বেশী স্থান দখল করিতে লাগিল। অবশেষে যখন সমস্ত দ্বীপটী ডুবিয়া গেল তখন মধ্যে একটী হ্রদ জন্মিল, আর তার চারিদিকে গোলাকার

প্রবালদের বাসস্থান, (Atoll) তাহার চারিদিকে নীল সাগর। এইরূপ "বারীয়ার রীফ্" ক্রমে Atoll অর্থাৎ প্রবাল দ্বীপে পরিণত হয়। (ছবি দেখ)।

ক—দ্বীপটী একেবারে জলের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে; খ—প্রবালনিবাস তাহার চারি ধারে ছাইয়া ফেলিয়াছে ও উপরে গোল হইয়া দেখা দিয়াছে; ছবিটী তাহারই মাঝ খান দিয়া জল চিরিয়া যেন দেখান হইয়াছে। গ—মধ্যের হ্রদ। ইহার গভীরতা অতি কম। দুই পার্শ্বে অতলস্পর্শ সমুদ্র।

পরমেশ্বর! তোমার অপার মহিমা! কত ক্ষুদ্র কীটানু দিয়া তুমি কি আশ্চর্য্য কার্য্যই করিয়া লইতেছ!

কলের জাহাজ।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে নিউ ইয়র্ক নগরের যেখান হইতে জাহাজ ছাড়িবার কথা ছিল, তাহার নিকটস্থ গৃহ সকলের ছাদ, জেঠী, নদীতীর প্রভৃতি সমুদয় স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ বারজন যাত্রীর উপযুক্ত আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সকল আসনগুলিই পূর্ণ হইয়া গেল।

জাহাজের সম্মুখদিকে খালাসীদিগের জন্য ডেক্ বা পাটাতন; পশ্চাৎদিকে আরোহীদিগের ক্যাবিন্। কল কারখানা সমস্ত খোলা; যাহার ইচ্ছা সে দেখিতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই কলে আগুন দেওয়া হইয়াছিল। সেই কারণে চিম্‌নি দিয়া কৃষ্ণবর্ণ ধূম উত্থিত হইতেছিল। যে সকল জোড়ের মুখে একটু আধটু ফাঁক ছিল তাহা হইতে ষ্টীম্ (বাষ্প) উঠিতে ছিল। ফুল্‌টন স্বয়ং ডেকের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে খালাসী-দিগকে নানাবিধ আদেশ করিতেছেন। জন-কোলাহল ভেদ করিয়া তাঁহার স্বর সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে। চারিদিকের উপহাস বিদ্রূপ ও নিরাশার কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি ধীর ও বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

সমুদয় আয়োজন ঠিক্ হইলে, কল চালাইয়া দেওয়া হইল; কলের জাহাজ ক্লারমণ্ট জেঠী হইতে আস্তে আস্তে সরিতে লাগিল। পরে যখন জাহাজ ঘুরিয়া নদীবক্ষে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তীরস্থ দর্শকগণেরা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যাত্রিগণের কণ্ঠ হইতে সেই জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। ফুল্‌টন কিন্তু নীরব। তাঁহার চেষ্টা এতদিনে সফল হইল এই আনন্দে, তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কেবল তাঁহার বিস্ফারিত নয়নের জ্যোতিতে সেই আনন্দ প্রকাশিত হইতেছে।

ক্লারমণ্ট, ওয়েষ্ট পয়েণ্ট নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে তত্রত্য দুর্গের সৈন্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। নিউবর্গ নগরে জাহাজ পঁহুছিলে দেখা গেল সেখানে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে। জলে স্থলে, নৌকায় ও নদীতীরস্থ পাহাড়ে লোক ধরে না। একখানি খেয়া নৌকা হইতে অনেকগুলি মহিলা হাসিতে হাসিতে রুমাল ঘুরাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া ফুল্‌টনের অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। তিনি মাথা হইতে টুপি তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ইহাই অদ্যকার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য।"

ফুল্‌টন তাঁহার এক বন্ধুকে আল্‌বানি যাত্রা সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে, যাওয়া আসা উভয় সময়েই বায়ু প্রতিকূল ছিল; সুতরাং কেবল বাষ্পীয় বলেই জাহাজ চালাইতে হইয়াছিল। তথাপি স্রোতের প্রতি-কূলে যাইবার সময় এই দেড় শত মাইল পথ যাইতে ৩২ ঘণ্টা এবং আসিবার সময় অনুকূল স্রোত বশতঃ ৩০ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। নদীতে অন্যান্য যে সকল জাহাজ ও নৌকা চলিতেছিল, ক্লারমণ্ট সে সমুদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

আমরা একটী গল্প বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। গল্পটী সত্য। যিনি এই গল্পটী বলিয়াছেন তিনি স্বয়ং ইহার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন।

প্রথম বারের যাত্রায় আল্‌বানি হইতে নিউ ইয়র্কে ফিরিবার সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া ফুল্‌টনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনার নাম বোধহয় মিষ্টার ফুল্‌টন?"

"হাঁ, মহাশয়।"

"আপনি কি এই জাহাজ লইয়া নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া যাইবেন?"

"আজ্ঞা, হাঁ; ইচ্ছা ত সেইরূপ।"

"আমি কি আপনাদের সঙ্গে যাইতে পারি?"

"ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন।"

তাহার পর ঐ ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাড়া কত লাগিবে?"

ফুল্‌টন যাহা বলিলেন তিনি তাহাই প্রদান করিলেন। কিন্তু ফুল্‌টন অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে নিষ্পন্দ ভাবে ঐ টাকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া ভদ্রলোকটী মনে করিলেন, বুঝি ভ্রম-ক্রমে কম টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ঠিক্ হইয়াছে কি?"

এই প্রশ্নে ফুল্‌টনের চমক ভাঙ্গিল। তিনি মুখ তুলিয়া ঐ ভদ্রলোকটীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। আমার এত দিনের চেষ্টার প্রথম পুরস্কার আপনার প্রদত্ত এই টাকা। সেইজন্য এই টাকা পাইয়া আমার গত জীবনের সমুদায় কষ্ট একেবারে স্মৃতিপথে উপস্থিত হওয়াতে আমি সেই চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম। আমার বড় ইচ্ছা ছিল আপনাকে কিছু জলযোগ করাইয়া এই ঘটনা স্মরণীয় করি। কিন্তু আপাততঃ আমি এরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাও আমার সাধ্যাতীত। কিন্তু আশা করি আমাদের পরস্পর আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, এবং তখন আর আমার এদশা থাকিবে না।"

চারি বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ফুল্‌টনের কারবারের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ক্লারমেণ্টর নূতন শ্রী ও নূতন নাম (নর্থ রিভার) হইয়াছে। কার অব্ নেপচুন ও প্যারাগণ নামক আর দুই খানি জাহাজ গঠিত হইয়াছে এবং নিউ ইয়র্ক হইতে আল্‌বানি পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে কলের জাহাজ গতায়াত করিতেছে। সেই সময়ে একদিন উক্ত ভদ্রলোকটী উহার একখানি জাহাজে আল্‌বানি যাত্রা করেন। তিনি ক্যাবিনের মধ্যে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বোধ হইল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। পরে তাঁহার স্মরণ হইল যে, ঐ ভদ্রলোকটী মিষ্টার ফুল্‌টন। কিন্তু তিনি কোন কথা না ভাঙ্গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে ফুল্‌টনের আসনের নিকট দিয়া যাইবার সময় উভয়ের চক্ষু মিলিত হইল। অমনি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

"আমি জানিতাম এ আর কেহ নহে, আপনি। আপনার আকৃতি আমি আজিও ভুলি নাই। এবং যদিও আমি এখনও ধনবান্ হইতে পারি নাই, তথাপি এখনও আপনাকে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

জলযোগের আয়োজন হইল। আহারের সময় ফুল্‌টন সাধারণের উপহাস, বিদ্রূপ, নিজের আশা, ভয়, বিঘ্ন, বিপদ প্রভৃতি সমস্ত বিগত বিষয় শীঘ্র শীঘ্র অথচ উজ্জ্বলভাবে বর্ণন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার চেষ্টা অবশেষে কেমন করিয়া সফল হইল, তাহাও বর্ণনা করিলেন। সমুদায় কথা শেষ করিয়া তিনি এই বলিয়া উপসংহার করিলেন,—

"আপনার সহিত আল্‌বানিতে প্রথম সাক্ষাতের বিষয় অনেকবার আমার মনে হইয়াছে। এবং যখনই সে কথা মনে হয়, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তখন আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাও উজ্জ্বলভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়। আমার তখন বোধ হইয়াছিল যে, আজি অবধি আমার দুঃখের অবসান হইতে চলিল; অন্ধকারের পর আলোক দেখা দিল। আজিও

আমার ঐ কথা মনে হয়। কারণ, আমা দ্বারা যে জনসমাজের উপকার হইবে, আপনিই, প্রথমে আপনার কার্য্যদ্বারা তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন।"

ঐ ভদ্রলোকটী নিজে এই গল্পটী বলিয়া গিয়াছেন।

আজি প্রায় আশি বৎসর হইল প্রথম কলের জাহাজ চলিতে আরম্ভ হয়। তাহার পর এ সম্বন্ধে কত উন্নতি হইয়াছে! আজি কালি প্রায় এমন সমুদ্র বা গভীর নদী নাই যেখানে কলের জাহাজ যায় না। কলের জাহাজে ডাকের চিঠি আসিতেছে, কলের জাহাজে যাত্রী যাতায়াত করিতেছে, মাল আসিতেছে; আবার দুই দেশে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন কলের জাহাজে করিয়া লড়াই পর্য্যন্ত হয়। প্রতিকূল বায়ু বা স্রোত ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। ইহা ঈশ্বর সৃষ্ট প্রাকৃতিক বল ও মনুষ্যবুদ্ধির কীর্ত্তি-স্তম্ভ রূপে চতুর্দ্দিকে আপনার মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

—•—

নানা প্রসঙ্গ।

নং ৪

সাহসী বালক।

এক দিন আমরা * স্কুলে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম আমাদের সমপাঠী একটী বালক নিকটস্থ মাঠের দিকে একটা গরু লইয়া যাইতেছে। পথে একদল ছেলের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। ঐ দলের জ—ঠাট্টার বিষয় পাইলে কখনও ছাড়িত না। জ—বলিয়া উঠিল "কিহে! দুধের দাম কত? বলি উ—তুমি কোন্ ঘাস খাও? গরুর শিঙ্গে যে সোণাটুকু আছে তাহার দাম কত? ওহে, তোমরা দেখ! যদি নূতন "ফ্যাশন্" দেখিতে চাও,তবে এই জুতা জোড়াটার পানে তাকাও"।

উ—একটু হাসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিল, তারপর মাঠের চারিধারে যে বেড়া ছিল তাহার দরজা খুলিয়া গরুটীকে ভিতরে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলে আসিল। বিকালে স্কুলের ছুটীর পর গরুটীকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, কোথায় নিল আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না। দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া সে রোজই এই কাজ করিতে লাগিল।

এই স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই ধনীর সন্তান। ইহাদের কতকগুলি আবার এমন মূর্খ ছিল যে, গরু মাঠে লইয়া গিয়াছিল বলিয়া উ—কে ঘৃণা করিত।

ইহারা উ—র মনে কষ্ট দিবার জন্য নানা রকম বিশ্রী কথা বলিত। উ—তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া সে সকল সহ্য করিত। একদিন জ—বলিল—

"কিহে উ—তোমার বাবা কি তোমাকে গোয়ালা করিতে চাহিতেছেন নাকি?"

উ—বলিল—"ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছু নয়, তবে দেখো যেন কেঁড়ে ধুইয়া তাহাতে খুব বেশী জল রাখিয়া দিও না।"

সকলে হাসিল। উ—কিছু মাত্র অপ্রতিভ

* এই "আমরা" অবশ্য সখার "আমরা" নহে।

না হইয়া উত্তর করিল “তার কোন ভয় নাই। আমি যদি কোন দিন গোয়ালা হই, তবে খাঁটী ওজনে খাঁটী দুধ দিব।”

এই কথাবার্ত্তার পরদিন স্কুলের পরীক্ষার “প্রাইজ” দেওয়া হইল। তাহাতে নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ “প্রাইজ” দিলেন। উ—আর জ—উভয়েই খুব ভাল নম্বর পাইয়াছে; পড়া শুনায় তাহারা সমকক্ষ। পুরস্কার বিতরণ শেষ হইলে অধ্যক্ষ বলিলেন যে আর একটী পুরস্কার আছে, সেটী একটী সোণার মেডেল। এই পুরস্কারটী সচরাচর দেওয়া হয় না। ইহাতে অনেক টাকা লাগে বলিয়া যে দেওয়া হয় না তাহা নহে, পুরস্কারের উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যায় না বলিয়াই দেওয়া হয় না। পুরস্কারটী সৎসাহসের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। তিন বৎসর হইল প্রথম শ্রেণীর একটী ছেলে একটী গরিব বালিকাকে জল হইতে উঠাইয়া বাঁচাইয়াছিল, তাহাকে এই পুরস্কারটী দেওয়া হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ তার পর উপস্থিত সকলের অনুমতি লইয়া একটী ছোট গল্প বলিলেন।

“অনেক দিনের কথা নয়; কতক গুলি বালক রাস্তায় ঘুড়ী উড়াইতেছে, এমন সময় একটী ছেলে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। ঘোড়াটা ভয় পাইয়া ছেলেটীকে ফেলিয়া দিল। তাহাতে সে এত আঘাত পাইল যে, কয়েক সপ্তাহ তাহাকে শয্যাগত থাকিতে হইল। যাহাদের জন্য এই বিপদ ঘটিল তাহারা কেহই আহত ছেলেটীর সঙ্গে গেল না। কিন্তু একটী ছেলে দূর হইতে এই ঘটনা দেখিয়াছিল, সে যে কেবল আহত ছেলেটীর সঙ্গে সঙ্গে গেল এমন নহে, কিন্তু শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে থাকিল।

“এই ছেলেটী শীঘ্রই জানিতে পারিল যে আহত বালকটী একটী গরিব বিধবার নাতি। বিধবার এক গরু আছে, সেই গরুর দুধ বিক্রী করিয়া সে সংসার চালায়। বিধবা বৃদ্ধ এবং খোঁড়া; এই নাতিটী ছাড়া, তাহার গরু মাঠে নিয়া দেয় এমন লোক নাই। সেই নাতিটী আঘাত পাইয়া এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। বালক বলিল ‘আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি আপনার গরু মাঠে লইয়া যাইব।’

“কিন্তু এই খানেই তাহার সৎকার্য্যের শেষ হইল না। ঔষধের জন্য টাকার আবশ্যক হইল। বালক বলিল, ‘মা আমাকে বুট কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন; সম্প্রতি আমার বুট না কিনিলেও চলে।’ বিধবাটী বলিল ‘তাহা হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের ঘরে এক জোড়া জুতা আছে। আমার নাতির জন্য কিনিয়াছিলাম, সে পরিতে পারে না। তুমি যদি এই গুলি কিন, তাহা হইলেই বেশ হয়।’ বালক সেই কুৎসিত জুতা জোড়া কিনিল এবং এখনও সে তাহা পরিতেছে।

“স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা দেখিল যে এক জন ছাত্র একটা গরু লইয়া যাইতেছে; সুতরাং তাহার উপরে হাসি এবং বিদ্রূপ বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহার গরুর চামড়ার জুতা দুইটার উপর তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে প্রফুল্ল চিত্তে বীরের ন্যায় সেই মোটা চামড়ার জুতা পরিয়া বিধবার গরু চালাইতে লাগিল। অন্যেরা তাহাকে যে সকল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, এই বালক তাহার কথা ভাবিলও না। ভাল কাজ করিতেছে, ইহা মনে করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিল। গরু চালাইবার কারণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে সে চেষ্টা করে নাই, কারণ সৎকার্য্য

করিয়া গর্ব্ব করাটা তাহার ভাল লাগিত না। ঘটনা ক্রমে তাহার শিক্ষক কাল এ সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন।

"এখন আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই বালকের আচরণে কি আপনারা প্রকৃত বীরত্ব দেখিতে পান নাই? উ—বাবু তুমি ব্ল্যাক্ বোর্ডের পেছনে পলাইওনা বিদ্রূপের সময় তুমি ভয় পাও নাই, প্রশংসার কালে ভয় পাইলে কেন?"

উ—নত মুখে জড় সড় হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল।

সেই কুৎসিৎ জুতা দুইটা এখন তাহার পায়ে কেমন শোভা পাইল। তাহার মাথায় মুকুট দিলেও হয়ত তেমন সাজিত না। মেডেল তাহাকে দেওয়া হইল, সকলে আনন্দে উচ্চ করতালি দিতে লাগিল। অন্যান্য যে সকল ছেলেরা উ—কে বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহারা এখন যারপর নাই লজ্জিত হইল, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিল।

(অনুবাদিত)

শিশুর আমোদ।

সুন্দর বাগান খানি নয়ন রঞ্জন
নানাজাতি তরু লতা কেড়ে লয় মন!
সু-নীল আকাশ প্রায় শোভার আকর,
শ্যামল দূর্ব্বার দল শোভে থরে থর!
সুন্দর হরিণ-শিশু দেখরে তথায়,
আপন মনেতে ওই চরিয়া বেড়ায়।
সু-নীল ফিতায় বাঁধা গলায় ঘুমুর,
ঝুণু ঝুণু রবে কিবা বাজিছে মধুর!
কচি কচি ঘাস গুলি খুঁটে খুঁটে খায়,
থেকে থেকে চারিদিকে ফিরে ফিরে চায়।
জানে বুঝি কোন ভয় নাহিক হেথায়,
প্রফুল্ল মনেতে তাই চরিয়া বেড়ায়!

কে ওই শিশুটি সাঁজো-ফুলের মতন!
কাহার সোণার যাদু আদরের ধন?
আ মরি কি সুবিমল কমল বদন!
ননীর পুতুল কিরে সুন্দর এমন?
ধরেছে দুধের বাটি কচি হাত দুটী,
হেলিয়া দুলিয়া শিশু আসে গুটী গুটী!
কচি কচি মুখ খানি সুধা হাসি তায়,
কি শোভা হ'য়েছে ওরে কে দেখিবি আয়!

হরিণের কাছে শিশু আসিয়া আদরে
"আয়" "আয়" ব'লে ডাকে সুমধুর স্বরে!
চমকি হরিণ-শিশু চাহিয়া দেখিল,
নিমেষে শিশুর কাছে ছুটিয়া আসিল।
সোহাগে বুকের মাঝে মাথাটি রাখিয়া
কত ভাবে ভালবাসা জানাইল গিয়া।

শিশুমণি হরিণের গলাটি ধরিয়া;
কতই আদর করে মুখে চুম দিয়া!
দুধের বাটিটী নিয়ে দিল তার মুখে,
চুক্ চুক্ খায় পশু মহা মন-সুখে!
দেখিয়া বাড়িল রঙ্গ শিশুর অন্তরে,
নেচে নেচে করে গান আধ আধ স্বরে!
সরল হৃদয় ভরা বিমল আমোদ,
পৃথিবীর নহে এত হয় হেন বোধ!
আয় আয় কেরে তোরা দেখিবি নয়নে,
স্বর্গের বিমল ছবি শিশুর বদনে!

পশু পক্ষিগণে হেন দয়া করে যারা।
মরুভূমে ঢালে যেন অমৃতের ধারা!

লণ্ডন-মেলা।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা অনেকেই হয়ত খবরের কাগজে পড়ে থাক্‌বে অথবা লোক মুখে শুনে থাক্‌বে যে, গত [illegible]মাস হইতে লণ্ডন নগরে একটী প্রকাণ্ড মেলা আরম্ভ হইয়াছে। মেলার নাম দেওয়া হইয়াছে "ঔপনিবেশিক ও ভারতবর্ষীয় প্রদর্শনী।" অর্থাৎ ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত এই ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর আর আর জায়গায় যে সকল উপনিবেশ আছে, সেই সকল স্থানের কৃষি, শিল্প ও শ্রমজাত দ্রব্যাদি এক জায়গায় সংগ্রহ করিয়া এই মেলায় দেখান হইতেছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লোকে এমন মেলার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ইংরেজী ১৮৫১ সালে আমাদের ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগত স্বামী সর্ব্ব প্রথমে তথায় একটী প্রকাশ্য মেলা খুলেন। তারপর উঁহার দেখাদেখি গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা রাজ্যে আরও অনেকগুলি ছোট বড় মেলা হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ১৮৭৮ সালের পারিস-মেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও জমকাল। যাহা হউক পারিসের ন্যায় বড় রকম মেলা যেখানে যেখানে হইয়াছে সে সকল স্থানেই ভারতবর্ষ ও ব্রিটীশ উপনিবেশ সমূহের শিল্প দ্রব্যাদি দেখান হইয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ডের খুব অল্প সংখ্যক লোকেই সে সমস্ত দ্রব্য দেখিয়াছেন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক শিল্পী ও ব্যবসায়ী। ভারতবর্ষের শিল্প-নৈপুণ্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। এখানকার ও অপরাপর স্থানের শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া তাহার অনুকরণে সস্তা জিনিস তৈয়ার করিয়া আপনাদের ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য ইংলণ্ডের লোকদিগের বড়ই ইচ্ছা। সুতরাং ইংরেজ শিল্পীগণ যাহাতে বহুদূর দেশে না যাইয়া আপনাদের দেশে বসিয়া নানা স্থানের শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও অভাব পূরণ করিতে পারেন তাহার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ আল্‌বার্ট লণ্ডনে একটা মেলা খুলিয়াছেন। তাহাতে ভারতবর্ষের অনেক জিনিস দেখান হইয়াছে। তারপর অন্যান্য মেলায় এখানকার যত জিনিস দেখান হইয়াছে তাহাদের ব্যবহার ও ইতিহাস সম্বন্ধে সমস্ত কথা কেবল পুস্তক আকারে বিলাতের লোকেরা পাঠ করিয়াছেন। এবারে কিন্তু ভারতবর্ষের কথা আরও ভাল করিয়া জানিবার জন্য অনেক প্রকার নূতন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এবারে বঙ্গদেশ হইতে দুইজন ও বোম্বাই হইতে একজন শিক্ষিত ভারতবাসী লণ্ডনে যাইয়া সেখানকার লোকদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। এ ছাড়া এখানকার অনেকগুলি ভাল ভাল কারিকর সেখানে যাইয়া দোকান খুলিয়াছেন। তাঁহাদের দোকানে কার্পেট, বারাণসী শাড়ী, কাঠের উপর খোদাই করা নানা প্রকার জিনিস, পিতলের বাসন, মাটির বাসন ও সোণারূপার গহনা প্রভৃতি কত রকম জিনিস তৈয়ার হইতেছে। শিক্ষিত ইংরেজ কারিকরগণ তাহার হাটহদ্দ দেখিয়া লইতেছেন। এখন বোধহয় অনেকে বুঝিতে পারিতেছ যে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া এক একটী মেলা খুলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য কিছুই নহে কেবল পাঁচ জাতির দেশের জিনিস এক জায়গায় জমা করিয়া পরস্পরের শিল্পনৈপুণ্যের তুলনা করা ও অপর জাতির নিকট হইতে যাহা কিছু শিখি-

বার আছে তাহা শিক্ষা করিয়া আপনাদের উন্নতি, কল্যাণ ও সুখ বৃদ্ধি করা। ইংরেজেরা এইরূপ মেলা দ্বারা যে উপকার লাভ করেন আমরা তাহার কি বুঝিব? যদি বুঝিতাম তবে আজ আমাদের এত দুঃখ থাকিত না, যাহা হউক এ সকল কথা আর অধিক করিয়া আজ বলিতে চাহি না।

ভারতবর্ষের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর বসতি, এরূপ পৃথিবীর আর কোনও রাজ্যে দেখা যায় না। ইংরেজগণ যতগুলি জাতির উপর রাজত্ব করিতেছেন এতগুলি জাতির উপর রাজত্ব করাও পৃথিবীর অপর কোন সুসভ্য জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু যাহাদের উপর ইংরেজের অধিকার তাহাদের সকল শ্রেণীর লোকের চেহারা পর্য্যন্তও অনেক ইংরেজ দেখেন নাই। যাঁহারা বিলাত ছাড়িয়া কখনও ভারতে আসেন নাই তাঁহারা এখানকার লোকদিগকে কেমন করিয়া দেখিবেন? বাস্তবিক আজকাল এদেশ হইতে যাঁহারা বিলাতে কৃষি, আইন, শিল্প, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন সেই সকল সুসভ্য ও শিক্ষিত বাঙ্গালী, পার্সী, বা মুসলমান যুবকগণ ভিন্ন অপর কাহারও মুখ বিলাতের ইংরেজগণ কখনও দেখিতে পান না। সেই জন্য একদিকে যেমন ভারতবর্ষের নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য লণ্ডন মেলায় সংগ্রহ করিয়া সকলকে দেখান হইতেছে; অপর দিকে এখানকার নানা স্থানের মানুষ চিনিবারও একটী বেশ সুন্দর উপায় বাহির করা হইয়াছে। আসাম অঞ্চলের নানাপ্রকার পাহাড়ী জাতি, ছোটনাগপুরের অর্দ্ধসভ্য জঙ্গলবাসী, শিখ, পঞ্জাবী, গোরক্ষ ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি সৈনিকদলভুক্ত বীরগণ; এবং ব্রহ্মদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের অধিবাসী প্রভৃতি অনেকগুলি পুরুষ ও রমণীর পূর্ণাবয়ব মাটির প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া মেলা স্থলে সাজান হইয়াছে। এইরূপ প্রায় দুইশতেরও অধিক চেহারা ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে পাঠান হইয়াছে। বিলাতবাসীরা ঐ সকল চেহারা দেখিয়া বড়ই খুসী হইয়াছেন। সেখানকার বড় বড় খবরের কাগজে ঐ সকল চেহারা ছাপা হইতেছে। আমরাও পাঠক পাঠিকাদিগকে দেখাইবার জন্য আন্দামান দ্বীপের পুরুষ ও রমণীর একখানি ছবি দিলাম। সকলে দেখ দেখি এমন কদাকার ও অসভ্য জাতির ছবি আর কখনও দেখেছ কি না।

যাহাদের চেহারা দেওয়া হইল উহাদিগকে ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। উহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েও অনেকগুলি আসিয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে ইহাদিগের সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলি, শুন।—

আন্দামানবাসীদিগের গায়ের রং কেমন কাল তাহা বোধ হয় অনেকে ছবি দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছ। আফ্রিকার নিগ্রো বা কাফ্রিদিগের অপেক্ষাও যেন ইহারা একটু বেশী কাল। মাথার চুলও কাফ্রিদের মত খুব ঘন। আবার গায়ের গন্ধ এমনি ভয়ানক যে বেশীক্ষণ ইহাদের কাছে দাঁড়ান যায় না। ইহারা প্রায় উলঙ্গবেশে বনে বনে বেড়ায়। লজ্জা নিবারণ করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলে কখন কখন কোমরে কেবল মাত্র গাছের পাতা বা ছাল জড়াইয়া কোন মতে একটু কৌপিনের মত আচ্ছাদন ব্যবহার করে। ইহাদের অলঙ্কারের মধ্যেও বেশীর ভাগ গাছের পাতা লতা এবং শামুক, গুগ্‌লি, সমুদ্রের কীট অথবা ছোট ছোট হাড়ের মালা। ইহারা তীরধনুকের সাহায্যে বনের পশু মারে

ও তাহাদের মাংসে উদরের জ্বালা নিবারণ করে। কাঁচা মাংসে ইহাদের অরুচি নাই, সুতরাং মাংস রাঁধিবারও বড় দরকার করে না; আবার শুনা যায় যে নরমাংসও ইহাদের নিকট পার পায় না। কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে ইহারা তাহার মাংস খাইয়া ফেলে, তাহার মাথার খুলিটী যত্নের সহিত অঙ্গে বহিয়া বেড়ায় এবং তাহার হাত পায়ের সরু সরু হাড়ে কোন রকম অলঙ্কার অথবা বাজাবার বাঁশী তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করে। নেশায় ইহারা এত পটু যে, যে মদ খুব চড়া, যাহার একগুণ খাইলে এ দেশের বড় বড় মাতালেরা ঢলিয়া পড়ে, আন্দামানীরা অবলীলাক্রমে তাহার তিন গুণ পান করে। সর্ব্বক্ষণ নেশা করিয়াও ইহাদের আশা মিটে না। ধূমপানেও ইহারা খুব মজপুত। তামাক বল, চুরট বল, যত দাও ততই টানিবে। বলিতে কি নেশা ক'রে ক'রে ইহাদের এক এক জনের প্রকৃতি এমনই হ'য়ে পড়ে যে, সে চব্বিশ ঘণ্টা কেবলই অলস ভাবে জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকা ভিন্ন জীবনে আর কোনও সুখ চাহে না। এক কথায় বলিতে কি ইহাদের চাল চলন দেখিয়া ইহাদিগকে রাক্ষস অথবা নররূপী পশু ভিন্ন আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না।

আন্দামানবাসীরা যখন কলিকাতায় ছিল তখন চৌরঙ্গীতে একদিন ইহাদের নাচ হয়। সে নাচের মাঝে মাঝে কেবল ভয়ানক লাফা-

লাফি, মুখে একরূপ বিকট চীৎকার এবং বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় নাই।

ফুলের সাজি।

(৯৪ পৃষ্ঠার পর।)

একদিন হেমলতা মনোরমাকে বলিল, "মনোরমে কাল আমার জন্মতিথিপূজা, তুমি প্রত্যুষে উঠিয়াই এখানে আসিবে, তোমার কাল আমাদের বাড়ী ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ রহিল। মনোরমা বলিল "রাজকুমারি আপনার দয়ার গুণে আমি দিন দিন আকৃষ্ট হইতেছি আপনার যেরূপ অভিলাষ তাহাই হইবে।" সে সে দিন বাড়ী গিয়া পিতাকে আগেই রাজকন্যার জন্মতিথি ও তদুপলক্ষে তাহার নিমন্ত্রণের কথা জানাইল। তখন দীননাথ কহিল, "তবে তুমি সকালেই আমার জন্য রন্ধন করিয়া রাজকুমারীর নিমন্ত্রণে যাইবে, কিন্তু সাবধান আমরা গরিব, আমাদের সহিত রাজ পরিবারের সম্বন্ধ বিপদশূন্য নহে, আমি বহুদিন রাজ সংসারে কর্ম্ম করিয়া বেশ জানি যে, যাহারা আজ রাজা বা মহিষীর প্রিয়পাত্র, তাহারা আবার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের চক্ষুশূল।" মনোরমা কহিল "সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ করিবার কারণ নাই, হেমলতার গুণের তুলনা নাই, আমি তাহার স্বভাব ও আচরণে বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়াছি। বাবা, আমি তাঁহাকে তাঁহার জন্মদিনে কি উপহার দিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

দীননাথ। মা, আমরা দরিদ্র, কি উপহার দিয়া রাজতনয়ার সন্তোষ বিধান করিতে পারি বল? আমি বলি অন্য কিছু না দিয়া সে দিন আমি যে ফুলের সাজিটী তৈয়ার করিয়াছিলাম, উত্তম উত্তম ফুল দিয়া সাজাইয়া সেই সাজিটী রাজকন্যাকে উপঢৌকন দেও, মূল্যবান বস্ত্র বা অলঙ্কার অপেক্ষা ইহা অধিক মনোনীত হইবে সন্দেহ নাই।

মনোরমা। বাবা, আমিও এক একবার ভাবিতেছিলাম যে, আমাদের বাগানের উত্তম উত্তম ফুলগুলি তুলিয়া রাজকন্যাকে উপহার দিব। আমায় তুমি যে সাজিটী দিয়াছ তাহার চমৎকার গঠন, তাহাতে কত কাজ; আমি ও তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহাই উপযুক্ত বোধ করিতেছি।

আজ হেমলতার জন্মতিথিপূজা, রাজ-উদ্যান জনাকীর্ণ; তোরণ হইতে প্রত্যুষে নহবৎ ধ্বনি হইতেছে। উদ্যান পথের দুই পার্শ্বে মঙ্গল ঘট ও কদলী বৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। উদ্যানে আজ সমস্ত উৎসবময়, কাহারও মুখে নিরানন্দ নাই। রাজ প্রসাদ পাইব বলিয়া দাস দাসীরা আজ মহাআনন্দিত। উদ্যান বাড়ী পুষ্প ও পত্রে সজ্জিত এবং সুগন্ধ ধুনা ও গুগ্গুলের গন্ধে রাজভবন যেন একটী দেবভবন হইয়াছে।

মনোরমা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সমুদায় গৃহকর্ম্ম সমাপন করিল। এবং তাহাদের উদ্যান হইতে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট গোলাপ, বেল, যূথিকা প্রভৃতি কুসুম সাজি

ভরিয়া তুলিল। কতকগুলি চমৎকার মালা গাঁথিয়া, তাহার মধ্যে "রাজকুমারী হেমলতার জন্য" লিখিল। এইরূপে সাজিটী অত্যন্ত মনোহর হইল। যখন স্নানান্তে দাসিগণ হেমলতার বেস বিন্যাস করিয়া দিতেছে তখন মনোরমা তাঁহার নিকট আসিয়া সাজিটী স্থাপন করিল, হেমলতা সাজিটী দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। কুমারী আজ কত ভাল বস্ত্র ও অলঙ্কার পাইয়াছেন কিন্তু কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

হেমলতা বলিলেন "মনোরমে তোমাদের বাগানে দেখ্‌ছি আজ আর একটী ফুলও রাখ নাই, এ সাজিটী কে বুনেছে, আহা! ইহার কারু কার্য্য অতি চমৎকার! মনোরমা কহিল "সাজিটী আমার পিতার হস্ত-নির্ম্মিত।"

রাজ কুমারী মনোরমাকে লইয়া মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং আনন্দের সহিত মনোরমার সাজিটী মাতাকে দেখাইয়া বলিলেন, দেখ মা, এটী কি মনোহর উপহার! আমিত কখন এমন চমৎকার সাজি দেখি নাই, আহা! এই ফুলগুলি আমাদের বাগানের ফুলের অপেক্ষা অনেক বড়।

রাজমহিষীও এই উপঢৌকন দেখিয়া মনে মনে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন "যথার্থই এমন রমণীয় ফুল কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ফুলগুলি পূর্ণ বিকসিত ও সুগন্ধের আধার। এই সাজিপূর্ণফুল দেখিলে মনোরমার মনের সুন্দর ভাব ও রুচি বেশ বুঝা যায়। মনোরমা! একটু এখানে অপেক্ষা কর আমরা এখনি আসিতেছি" এই বলিয়া রাজ মহিষী হেমলতাকে গৃহান্তরে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। গৃহান্তরে গমন করিয়া রাজমহিষী কন্যাকে বলিলেন, "হেম আজ তুমি মনোরমাকে কিছু উপহার না দিয়া কখনও ছাড়িও না। বল দেখি তাহাকে কি উপহার প্রদান করিলে ভাল হয়?" হেমলতা বলিলেন,—মা, আমার সেই নূতন বারাণসী শাড়ী খানি দিলে হয় না? সেখানি আমি একবার মাত্র পরিয়াছিলাম।

রাজমহিষী হেমলতার কথায় অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন, হেমলতা মনোরমার নিকট গমন করিয়া কোন পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন "আমার গৃহ হইতে আমার সেই নূতন বারাণসী শাড়ীখানি আনিয়া দেও, মনোরমাকে উপহার দিব। মায়া কুমারীর কথা শুনিয়া ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, রাণী মা এ কথা জানেন? হেমলতা ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন "সে কথা তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই, কাপড় এখানে আন।"

মায়া আর কথা কহিল না, মনে মনে গজরাইতে গজরাইতে গৃহ হইতে কাপড় আনিতে গেল। যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল, রাজকন্যার ব্যবহৃত বস্ত্র কেবল আমারই প্রাপ্য। কোথা হইতে একটা চাষার মেয়ে আসিয়া আমার সে অধিকার লোপ করাইতেছে। রাজকন্যা আমাদের সঙ্গে আর তেমন কথা কহেন না। কেবল শুইতে বসিতে মনোরমা মনোরমা, যদি আমি ইহার শোধ লইতে পারি তবে জানিব আমার নাম "মায়া"। সে এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে বারাণসী কাপড় খানি হেমলতাকে আনিয়া দিল। হেম কাপড় লইয়া মনোরমার হস্তে দিয়া কহিলেন "ভাই তোমায় আমার প্রদত্ত এই উপহারটী গ্রহণ করিতে হইবে। সরলা মনোরমা রাজকন্যার আগ্রহ দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা গ্রহণ করিল। মনোরমা গৃহে

প্রত্যাগমন করিল। মায়া সমস্ত দিন ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল। সেই দিন বৈকালে যখন হেমলতা কেশ বন্ধন করিতেছেন তখনও তাহার ক্রোধের উপশম হয় নাই, ক্রোধভরে কেশবন্ধন করিতে করিতে একবার একটু জোরে রাজকন্যার কেশ টানিল। তিনি মায়ার মনোভাব কথঞ্চিৎ বুঝিয়া বলিলেন "মায়া তুই কি মনোরমাকে কাপড় দিয়াছি বলিয়া রাগ করিয়াছিস্ ?"

মায়া মনের ভাব চাপিয়া বলিল, আপনি যাহা করিবেন তাহাতে আমার আবার রাগ কি ?

মনোরমা বাড়ী গিয়া আগে পিতাকে রাজকুমারীপ্রদত্ত কাপড় দেখাইল; তাহার মুখে আনন্দ ধরে না। কিন্তু দীননাথ কাপড় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল না ; সে তাহার পক্ক কেশযুক্ত মস্তক নাড়িয়া কহিল, বাছা এখন বোধ হইতেছে যে, ঐ ফুলের সাজি রাজবাড়ী না লইয়া গেলেই ভাল হইত। রাজ কন্যার প্রদত্ত উপহার বলিয়া আমি ইহাকে সম্মান করিতেছি সত্য, কিন্তু তোমাকে এই উপহার পাইতে দেখিয়া অনেকে ঈর্ষাপরবশ হইবে ; আর পাছে তুমি এই কাপড় পরিয়া মনে মনে গর্ব্বিতা হও ইহাও আমার বড় ভয় হইতেছে। সাবধান যেন এই কাপড় পরিধান করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া না পড়।

বিনয়, লজ্জা, সত্যকথা ও মিষ্ট কথাই বালিকার যথার্থ অলঙ্কার।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

২	৯	৪
৭	৫	৩
৬	১	৮

গতবারের নূতন প্রকারের ধাঁধার উত্তর অনেকেই দিয়াছেন ; কাহারও রচনা প্রকাশযোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। উক্ত ছবিটী অবলম্বন করিয়া একটী রচনা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি মধ্যে যদি কেহ উক্ত ছবি অবলম্বনে একটী রচনা পাঠান, এবং তাহা যদি মনোনীত হয়, তাহা হইলে তাঁহার রচনাই প্রকাশিত হইবে।

নূতন।
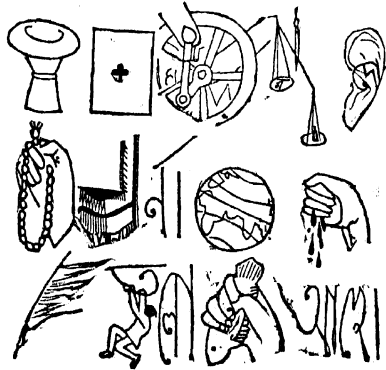
পড় দেখি ?
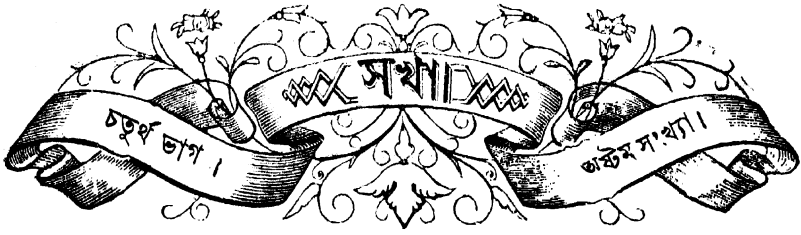
আগষ্ট, ১৮৮৬।

পৃথিবীর গোলত্ব।

তোমরা সকলেই ভূগোলসূত্রে পৃথিবী যে গোল তার তিনটী প্রমাণ পড়িয়াছ; বেশ্ করিয়া মুখস্থ করিয়াও রাখিয়াছ; কিন্তু ঐ বিষয়ে উত্তম রূপ বোধ না হইলে সুবিধা নাই। কিছুদিন হইল আমি একখানি বাঙ্গালা বৈ দেখিয়াছিলাম তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা, একজন বিদ্বান ভট্টাচার্য্য, নানা শাস্ত্র হইতে বচন তুলিয়া ও নিজের গভীর তর্কযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই পৃথিবী কখনও গোলাকার নহে এবং দধি সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র প্রভৃতি যত সমুদ্র আছে, তাহাদের তীরে ৪০ লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি!—যখন এই বৈ খানা দেখিলাম তখন মনে হইল যে এত বিজ্ঞান ও সুশিক্ষার মধ্যেও এ প্রকার বৈ ছাপা হয় আর পড়া হয়। কি জানি যদি তোমাদের মধ্যে সেই রকম কোন পণ্ডিতের সম্মুখে প হইলে হয়ত তোমাদের বিশ্বাস টলি পৃথিবী গোল নয় হয়ত বলিয়া বসি বিষয়ে শুদ্ধ তিনটী প্রমাণ মুখস্থ চলিবে না। বেশ্ করিয়া কথাটা বুঝা দরকার। তাই আজ আমরা এই বিষয়ে কিছু খুলিয়া লিখিব মনে করিয়াছি। মন দিয়া বুঝিয়া পড়িলে ও মনে রাখিলে কেহ আর ঠকাইতে পারিবে না।

আচ্ছা মনে কর পৃথিবী গোল নয়। একটা সীমাবিহীন বা খুব বড় ময়দানের মত কেবল লম্বা চওড়া জমী। তাহা হইলে কি ভুল হয় দেখা যা'ক। এই রকম উল্টা দিক দিয়া বিচার করিলে সুবিধা হয়। যেমন তোমাদের গ্রামের বড় মাঠটা, পৃথিবী যদি তেমনি হয় ত কি দোষ?—বেশ্। তোমাদের বাড়ীর ছাতটা খুব বড় তার এক ধারে আল্‌শের কাছে শুয়ে তোমরা গল্প ক'রছ। এখন হঠাৎ এক ধারের আল্‌শের কাছে যদি একটা প্রদীপ জ্বালা যায় তা কি তোমরা দেখিতে পাবে না? অবশ্য পাবে। এমন কি, ছাতের ও পাশে যদি একটা জোনাকি পোকা থাকে তাও দেখিতে পাও। কিন্তু একটা বড় জালার এক

অন্য

পৃথিবীকে আমরা মাঠের মত সমান ধরিয়াছি। তাহা হইলে তাহারও একদিকে যদি আগুন জ্বালি তবে সব জায়গা থেকে দেখা যাবে। তাহা হইলে পূর্ব্বদিকে যখন সূর্য্য উঠিবে তখন যেমন আমরা দেখিতে পাইব, পৃথিবীর সব স্থান থেকেই সব লোকে এক সঙ্গে দেখিতে পাইবে। তোমরা বলিয়া উঠিবে "তাত পাবেই, যতক্ষণ গাছ পালার আড়ালে থাকিবে ততক্ষণ সকলে দেখিতে পাইবে না। যেই ভাল করিয়া উচ্চ হইয়া আকাশে উঠিবে; অমনি পৃথিবী শুদ্ধ লোকে এক সঙ্গে সূর্য্য দেখিতে পাইবে সন্দেহ কি?" কিন্তু, সমস্ত পৃথিবীর লোক এক সঙ্গে সূর্য্যকে উঠিতে দেখে না, এক সঙ্গে অস্ত যাইতেও দেখে না। আমাদের দেশে যখন প্রথম সূর্য্য দেখা দেয়, সেই ভোর বেলা যখন আমরা উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া পড়িতে বসি, আমাদের পশ্চিমে যাদের বাড়ী,—যত দূর দেশে তারা তত পরে সূর্য্যকে উঠিতে দেখে, আর তত পরে অস্ত যাইতেও দেখে; আর আমাদের পূর্ব্ব দিকে যাদের বাড়ী,—যত দূরে তারা তত আগে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিতে পায়। তোমরা জান ইংলণ্ড দেশ আমাদের দেশের পশ্চিমে অনেক দূরে; এই জন্য আমাদের এখানে যখন সূর্য্য উঠে, তখনও সেখানকার লোকেদের [illegible] বেলা দুই প্রহর [illegible] সূর্য্য [illegible] লাগে বা শীঘ্র হয়। ম্যাপে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে সকল রেখা টানা থাকে তাহাদিগের দ্বারা ডিগ্রীর মাপ জানা যায়। বিষুব রেখার কাছে এক এক ডিগ্রী প্রায় ৭০ মাইল দূরে দূরে থাকে। আর এই এক ডিগ্রী দূরে যে সকল দেশ তাহাদের মধ্যে সময়ের তফাৎ ৪ মিনিট। অর্থাৎ আমাদের কলিকাতা হইতে যে স্থান ১ ডিগ্রী পশ্চিমে সেখানে কলিকাতা অপেক্ষা ৪ মিনিট পরে সূর্য্য উঠিয়া থাকে। যে স্থান কলিকাতা হইতে ১৫ ডিগ্রী পশ্চিমে তথায় ৬০ মিনিট বা এক ঘণ্টা পরে সূর্য্য দেখা যায়। আবার যে নগর কলিকাতা হইতে ১৫ ডিগ্রী পূর্ব্ব দিকে তথায় সূর্য্য কলিকাতার ১ ঘণ্টা আগে উঠে। বোধ হয় এখন সব যায়গার সঙ্গে তুলনা করিতে শিখিলে।

যাহা হউক দেখা গেল যে পূর্ব্ব দিকে যখন সূর্য্য আকাশে দেখা যায়, তখন সমস্ত পৃথিবীর সব লোক একবারে সূর্য্য দেখিতে পায় না। কেন পায় না? পৃথিবী মাঠের মতন হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইত। তা যখন হয় না স্পষ্ট জানিতেছি (একস্থান থেকে আর এক স্থানে টেলিগ্রাম করিলেই জানা যায়) তখন কেমন করিয়া বলিব যে পৃথিবী মাঠের মত। নিশ্চয়ই পৃথিবী তেমন নহে। নিশ্চয়ই তবে অন্য রকম হবে। কলিকাতা ও ইংলণ্ডের মধ্যের ভূভাগ জালার পিঠের মত নিশ্চয়ই উঁচু, নহিলে এরূপ কেন হইবে?

[illegible]পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যে সমতল নহে, জালার [illegible]ার আরও একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। [illegible] সকলেই পড়িয়াছ। যখন কোন [illegible]র কিনারা হইতে দূরদেশে যাত্রা [illegible] তথায় অল্প ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাক,

তবে বড় আশ্চর্য্য দেখিবে যে, প্রথমে জাহাজের লোক জন সব দেখা যাবে, ক্রমে যতই দূরে যাইবে ততই অল্প অল্প অস্পষ্ট বোধ হইবে। দূরের দ্রব্য কখনই নিকটের জিনিসের মত পরিস্কার দেখা যায় না। কিন্তু তখনও জাহাজের সবটা বেশ্ দেখিতে পাবে। ক্রমে যখন এক ক্রোশেরও বেশী দূরে গিয়া পড়িবে, তখন জাহাজের তলাটা যেন খানিকটা ক্ষয় হইয়া বা জলের মধ্যে ডুবিয়া গেল বোধ হইবে। ক্রমে আরও একটু একটু করিয়া অনেকটা অদৃশ্য হইবে। শেষে জাহাজের কাষ্ঠ বা লৌহময় খোল-টুকুর আর কিছুমাত্র দেখা যাবে না, কেবল মাস্তুল ও পাল দেখা যাইবে। আরও দূর—শেষে বড় মাস্তুলের আগাটুকু ঝিক্ ঝিক্ করছে, তার পর, ঐ যা—কিছুই না। এইরূপে জাহাজ খানার নীচে থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্তটা অদৃশ্য হইয়া যায় কেন? অনেক দূর বলিয়াই কি এরূপ হয়? না, হ'তে পারে না। কেননা দূরের জিনিস ছোট দেখায় বটে, অস্পষ্টও দেখায় সত্য; কিন্তু তাহার সমস্ত অবয়বটাই ঐরূপ ছোট ও অস্পষ্ট দেখা যায়। কোন অংশই অদৃশ্য হয় না। তার পর আরও প্রমাণ এই যে, দূরের ছোট ও অস্পষ্ট দেখান বন্ধ করিবার জন্য যে দূরবীক্ষণযন্ত্র আছে
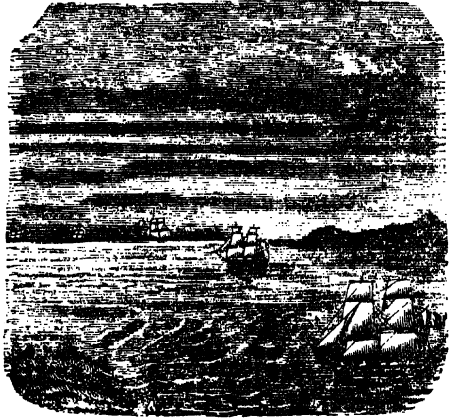
তাহা দ্বারা খুব দূরের দ্রব্যও কাছে এবং বড় ও স্পষ্ট দেখা যায়। তুমি যদি ঐ যন্ত্র দ্বারাও জাহাজ খানার দিকে দেখ, তাহা হইলেও ঠিক ঐরূপ দেখিবে। অস্পষ্ট ও ছোট দেখাইবে না কিন্তু ঠিক বোধ হবে যেন জাহাজের তলা থেকে উপর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে *। তোমার ও জাহাজের মধ্যের জলভাগ যদি মাঠের মত সমতল হইত তাহা হইলে কখনই এইরূপ একটু একটু করিয়া জাহাজের নিম্ন অবয়ব গুলি ও

* এক কিম্ভূত ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, পৃথিবী সমতল হইলেও নাকি এইরূপই দেখা যাইবে। তিনি অনেক মাথা ঘুরাইয়া ইহার পক্ষে যুক্তিও দিয়াছেন, সে বড় চমৎকার যুক্তি—তোমরা মনোযোগ দিয়া শুন। উপরকার বায়ুর চাইতে নীচেকার বায়ু বেশী ঘন, তা তোমরা অনেকেই জান। আচ্ছা দূরের বস্তু অস্পষ্ট দেখা যায় কেন? না সাম্‌নের বায়ুতে দৃষ্টিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে রোধ করে বলিয়া। অনেক দূরের জিনিস হইলে অনেক বায়ু সাম্‌নে পড়ে, সুতরাং আরো অস্পষ্ট দেখা যায়। বাতাসটা যদি আরো ঘন হইত, তবে এর চাইতে কাছের জিনিসই ঐরূপ অস্পষ্ট দেখা যাইত। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন যে মাস্তুলের আগাটা আমরা সকলের চাইতে পাতলা বাতাসের
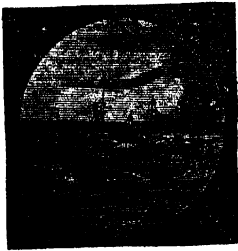
অবশেষে সমস্তটা অদৃশ্য হইত না। নিশ্চয়ই ঐ মধ্য ভাগের জল জালার পিঠের মত ঈষৎ ফুলিয়া আছে। ঐ ফুলা এত কম যে হঠাৎ চক্ষে দেখা যায় না কিন্তু এই বিষয়টা ভাবিয়া দেখিলেই নিঃসন্দেহ বুঝা যাইবে যে ঐরূপ ফুলো নিশ্চয়ই আছে। গঙ্গায় স্নান করিবার সময়ে চক্ষু জলের কাছে রাখিয়া দূরের নৌকা দেখিলেও ঐরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তোমরা বরং চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

এই পরীক্ষাটীর দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সাগরের জল মাঠের মত সমতল নহে, খুব প্রকাণ্ড একটা জালার পিঠের মত। আর পৃথিবীর ম্যাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সমস্ত পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ ভাগ জল আর এক ভাগ মাত্র স্থলে আবৃত। সেই ৩ ভাগ অর্থাৎ বার আনা অংশ জলের যেখানে ঐ পরীক্ষা করা যাক না কেন, ঐ একইরূপ ফল দেখা যাইবে। অর্থাৎ পৃথিবীর বার আনার আকার যে জলের মত, তাহা ঠিক হইল। বাকী যে যে চারি আনা স্থল তাহারও আকার ঐরূপ। প্রমাণ করাও কঠিন নহে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "বেড্‌ফোর্ড লেবেলে" তাহার বেশ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ওয়ালেস্ নামক একজন সাহেব "ক" "খ" "গ" নামে ১৩ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণ তিনটী সমান উচ্চ খুঁটি ঠিক সোজা করিয়া (তিন) ৩ মাইল অন্তর অন্তর বসাইলেন। জমী যদি ঠিক সমতল হয়, তাহা হইলে ঐ তিনটী খুঁটিরই মাথা সমান থাকিবে। কিন্তু তিনি "ট" নামক এক দূরবীক্ষণ যন্ত্র এমন ভাবে বসাইলেন যে তাহাতে "ক" ও "গ" খুঁটির মাথা ঠিক সমান রেখায় দেখা যায়। তখন দেখা গেল যে "খ" খুঁটিটার মাথা ঐ রেখার ৫ ফীট উপরে আছে। ইহা বেশ ধীর ভাবে বুঝিলেই দেখিতে পাইবে যে, যেখানে "খ" পোতা ছিল সেখানকার মাটি ক ও গ এর তলা অপেক্ষা ৫ ফীট উঁচু। অর্থাৎ ঐ স্থানটা জালার পিঠের মত উঁচু বা ফুলা। ঐ ফুলা এত কম যে চক্ষু দ্বারা বুঝা যায় না।

ভিতর দিয়া দেখি সুতরাং সেটা সকলের চাইতে স্পষ্ট দেখা যায়। তার নীচের অংশটা তার চাইতে ঘন বাতাসের ভিতর দিয়া দেখি, (কারণ উপরের বাতাসের চাইতে নীচের বাতাস ঘন—যতই নীচে আসিতেছি বাতাস ততই ঘন হইতেছে।) সুতরাং সেটাকে মাস্তুলের আগার চাইতে অস্পষ্ট দেখি। এই কারণে তার নীচের স্থানটুকু আরো অস্পষ্ট দেখি। এইরূপে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া জাহাজের নীচের অংশ একবারে অদৃশ্যই হইয়া যায়। (ছবি দেখ) কিন্তু ক্রমশঃ
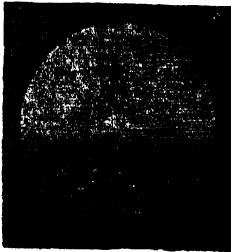
ঝাপসা হইয়া অদৃশ্য হওয়া আর একটা কিছুতে ঢাকা পড়িয়া অদৃশ্য হওয়া, এই দুয়েতে যে কি তফাৎ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমি আশা করি তোমাদের মধ্যে এত বোকা কেহ নাই। সমুদ্রে যে জাহাজের নীচের অংশ অদৃশ্য হয় তাহা ক্রমশঃ ঝাপসা হইয়া নহে; কারণ অদৃশ্য অংশ যে জলে ঢাকা পড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পণ্ডিত মহাশয় ঘরের কোণে বসিয়া বুদ্ধি খাটাইয়াছিলেন কাজেই বাস্তবিক ঘটনার সহিত মিলিয়া উঠে নাই। পণ্ডিত মহাশয় পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকটী যুক্তি লইয়াই এই প্রকার এক একটা কাণ্ড করিয়াছেন। সবগুলির কথা শুনিলে পাছে গল্পের বিড়ালের মত হাসিতে হাসিতে তোমাদের পেট ফাটিয়া যায়, এই ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।

থাকে, পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া দেখিলেও চারিদিকে ঐরূপ গোল রেখা দেখা যায়। পৃথিবীর যে স্থান হইতেই দেখ সর্ব্বত্রই ঐরূপ দেখা যাইবে। এই একটী বিশেষ

এই রূপে শত শত পরীক্ষা যারপরনাই যত্ন ও সাবধানতার সহিত করা হইয়াছে। সকল বারেই একই রূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কখনই ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অর্থাৎ পৃথিবীর জল ভাগ এবং স্থলভাগ দুইই জালার পিঠের মত ফুলা, মাঠের মত সমতল নহে।

কিন্তু পৃথিবী যে বর্ত্তুল বা ভাঁটার মত গোলাকার জড় পিণ্ড, তাহা এখনও প্রমাণ হইল না। কেবল দেখা গেল যে থালার মত সমতল নহে। গোলাকার পিণ্ড মাত্রেরই এমন একটী গুণ আছে যাহা অন্য আকারের পিণ্ডের নাই। সেটী এই যে—উহাকে যে দিক দিয়াই দেখনা কেন, গোল দেখাইবে। মনে কর গোল থালা; ঠিক সম্মুখ হইতে দেখিলেই উহাকে গোল দেখায়, নহিলে নয়। মনে কর হাঁসের ডিম; সরু দিকটা সুমুখে ধরিয়া দেখিলেই গোল দেখায় কিন্তু লম্বা দিকটা সুমুখে ধরিলে আর গোল দেখায় না। কিন্তু একটা ভাঁটা বা কামানের গোলা; তাকে যে দিকে যেমন করিয়া ধর গোল দেখাইবেই দেখাইবে। পৃথিবীর ও তাই। যেখানেই দাঁড়াও না কেন, চারিদিকে চাহিলেই গোলাকার দেখাইবে প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইলে গোল একটী রেখা দেখা যায় সেই খানে; মাঠ ও আকাশ যেন মিশিয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকেই "হোরাইজন" (HORIZON) বলে। এই দৃষ্টি সীমা রেখা বা হোরাইজন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা গোলাকার। যত উপরে উঠা যায় ততই এই বৃত্ত (circle) আকারে বড় হয় কিন্তু গোলই

প্রমাণ যে পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বা ভাঁটার মত গোল।

আরও একটী অকাট্য প্রমাণ আছে। তাহাও তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ। নাবিকেরা এক নির্দ্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া যদি ক্রমাগত চলিতে থাকে তবে, নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পুনরায় আপনাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহার মধ্যে একটীবারও তাহাদিগকে দিক পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। পৃথিবী ঠিক গোল না হইলে কখনই এরূপ হইতে পারিত না।

তার পর, আমেরিকাতে টেলিগ্রাফ্ করিলেই জানা যায় যে ঠিক যখন আমাদের দেশে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, সেখানে তখন ঠিক উদয় হইতেছে; এইরূপ কেমন করিয়া হয়? আমেরিকা মহাদেশ যে আছে, তাহাতে তোমাদের সন্দেহ নাই। তবে কিরূপে ঐরূপ ঘটে? আমেরিকা ঠিক আমাদের নীচে বা বিপরীত দিকে আছে না বলিলে আর এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। নতুবা আর আমাদের দুপর বেলায় তাহাদের দুপর রাত্রি আর আমাদের রাত্রে তাদের দিন কিরূপে হইবে?

সেই রূপ চন্দ্র গ্রহণের সময় পৃথিবীর গোলাকার ছায়া যে চন্দ্রের উপরে পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে তাহা তোমরা জান কিন্তু কি কারণে ওরূপ হয় তাহা অত্যন্ত কঠিন। অন্য সময়ে সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পৃথিবী যে গোল তার আরও অনেক গুরুতর প্রমাণ আছে, কিন্তু সখার পাঠক পাঠিকাগণের তাহা বোধগম্য হইবে না বলিয়া এখানে সেগুলি দেওয়া গেল না।

প্রকৃত ঘটনা।
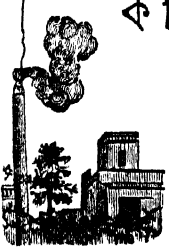
কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী পরিবার বাস করিত। সেই পরিবারের এরূপ কিছু কিছু সদ্গুণ ছিল যে তাহাদের নিকটে যে কোন ঝি, চাকর থাকিত তাহারা তাহাদিগকে ভুলিতে পারিত না; তাহাদের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তাহাদের বাটীতে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। একটী পুরাতন ঝি এক দিন তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তাহাদের বাটীতে আসে। সেই পরিবারের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটীর বয়স ৬ বৎসর; ঐ বালক স্বভাবতঃ বড় আলাপ-প্রিয় ছিল। এমন কি যখনই তাহার পিতা মাতার কোন বন্ধু বান্ধব বাড়ীতে আসিতেন তখনই সেই বালক আপনা হইতেই তাহাদের সঙ্গে একটী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতিয়া লইত। কাহাকে বা ছেলে, কাহাকে বা মেয়ে বলিত এবং কাহাকে বা মাসী, পীসি ও দিদি বলিয়া ডাকিত। বালকের মধুমাখা কথায় ও সুমিষ্ট আলাপে সকলেই মোহিত হইয়া যাইত। পুরাতন ঝিটী বাড়ী আসিলে বালক তাহার সহিত নানা কথায় তাহাকে তুষ্ট করিতে লাগিল, তখন তাহার পিতা বাড়ী ছিলেন না, মাতা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সন্তান কি আলাপ করিতেছে এবং পাছে ঐ সামান্য স্ত্রীলোকের নিকট হইতে কোন অন্যায় কথা শিক্ষা করে সেই জন্য তাহার কর্ণ সেই দিকেই ছিল। দেখিতে দেখিতে আকাশ অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং ক্রমে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অসুবিধা দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোকটী অজ্ঞানতা বশতঃ বিধাতার নিন্দা করিয়া একটা কটু কথা প্রয়োগ করিল। ৬ বৎসরের বালকের সরল প্রাণে বিধাতার নিন্দা সহ্য হইল না; সে অতি গম্ভীর স্বরে বলিল আমরা প্রতিদিন যে দেবতার উপাসনা করি তুমি সেই দেবতাকে নিন্দা করিতেছ? তুমি ত বড় দুষ্ট, ঈশ্বরকে নিন্দা! তাঁহার প্রতি কটু কথা! এইরূপ তিরস্কার করিয়াও বালক ক্ষান্ত হইল না, অমনি তাহার মাতাকে ডাকিয়া বলিল মা দেখ ঝি কি বলিতেছে। বালকের এই সব কথায় স্ত্রীলোকটী একটু লজ্জিতা হইয়া বলিল না না আমি দেবতাকে নিন্দা করি নাই, বৃষ্টিকে বলিয়াছি। এই কথায় বালক অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিল, আবার মিথ্যা কথা! প্রথমে দেবতাকে নিন্দা আবার মিথ্যা কথা! বাবা বাড়ী আসুন তোমার সব কথা বলিয়া দিব। বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল।

পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা এই বিবরণটী পাঠ করিয়া ঐ বালকের মত সৎসাহসী ও সত্য-প্রিয় হও এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

ভোলানাথের ধাঁধা।

শ্লেট খানি ল'য়ে, বসি ভোলানাথ,
কসিছেন আঁক-পাতি ;
গম্ভীর বদন, নীরব নির্জ্জন,
কাছে নাই কোন সাথী।

এক পাশে অই, অঙ্কের সে বই,
রহিয়াছে খোলা-পাতা;
কসিছেন যাদু, কতই যতনে,
ঘেমেছে কপাল মাথা।
কত শত বার, গুণিছেন তবু,
মিলিছেনা অঙ্ক আর,
ঘরের চাতালে, মেঝের দেয়ালে,
চাহিছেন বারে বার।
গুণিছেন পুনঃ, করিয়া যতন,
তথাপিও নাহি মেলে,
এ কিরে আপদ, বিষম বিপদ,
ভাবিছেন ভোলা-ছেলে।
একবার শ্লেট, ফেলিয়া মাটিতে,
মুটো বেঁধে ধ'রে চুল,
গুণিছেন ধীরে, মনোযোগ দিয়ে,
তবু ছাই যায় ভুল!
আবার তুলিয়া, কোলেতে করিয়া,
সাবধান হ'য়ে অতি,
গুণেন যতনে, কত প্রাণপণে,
আবার যে সেই গতি!
টেনে টেনে কাণ, হ'য়ে গেল লাল,
কিছুতেই রক্ষা নাই,
মেলেনাক তবু, ছাই পোড়া আঁক
এ কিরে জঞ্জাল ভাই!
অবশেষে বাবু, করিলেন স্থির,
নিশ্চয় কেতাবে ভুল,
নহিলে কেনবা, হইবে এমন,
কেতাব (ই) অনর্থমূল!
তানয় তানয়, ওহে ভোলা ভাই,
দেখ দেখি ভাল ক'রে?
আন দেখি বই, দেখিব এখনি,
কাহার কে ভুল ধরে?
এই দেখ চেয়ে, পাঁচে আর ছয়ে,
কিছু তব ভেদ নাই,
সেই সে কারণে, এতই জঞ্জাল,
পড়েছ ধাঁধায় তাই!!!—

ফুলের সাজি।

তৃতীয় অধ্যায়।

(১১২ পৃষ্ঠার পর)

মনোরমা আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া একবার কাপড়খানি পরিধান করিল এবং তথন যত্নের সহিত আবার তাহা পাট করিয়া সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিল। সে সিন্ধুকে কাপড় রাখিয়া বাহিরে পিতার নিকট আসিতে না আসিতেই দেখিল রাজকুমারী হেমলতা তাহার ঘরের দিকে দ্রুতপদে আসিতেছেন। রাজকুমারীর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; সর্ব্ব শরীর ভয়ে কম্পিত হইতেছে। মনোরমা মনে মনে ভাবিল এ কি? রাজকন্যা আমাদের বাড়ীতে এলেন কেন? এর মধ্যে এমন কি হইল। সে এই ভাবিয়া রাজকন্যাকে যেমন তাহাদের কুটীরে আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিতেছে অমনি হেমলতা তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন,

মনোরমা তুমি করেছ কি? আমার মার হীরার আংটী কোথায়? তুমি ভিন্ন ত ঘরে আর কেহই ছিল না, তবে সে আংটী গেল কোথায়? শীঘ্র আংটী আমায় দেও, আমি ও মা এখন এ কথা প্রকাশ করি নাই, পাছে গোল হইয়া পড়ে তাই আমি নিজে খিড়্কীদোর দিয়া তোমাদের বাড়ী আসিলাম। শীঘ্র দেও, না দিলে বড় গোল বাঁধিবে।

মনোরমা ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে বলিল, "রাজকুমারি, দিব্য করিয়া বলিতেছি যে আমি অঙ্গুরীয় দেখি নাই। চুরির কথা দূরে থাকুক যাহা আমার নয় আমি তাহা স্পর্শ করিতেও পারি না। আমার পিতা পরের দ্রব্যে লোভ করিতে নাই বলিয়া চিরকাল ধরিয়া শিক্ষা দিতেছেন।"

বৃদ্ধ দীননাথ গৃহের মধ্যে রাজকন্যাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এবং তৎপরে ঐ গোলমাল শুনিয়াই উদ্যান-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রবিষ্ট হইয়া যখন সমুদায় ঘটনা অবগত হইল তখন ভয় ও বিস্ময়ে তাহার কথা বাহির হইল না। কেবল "একি" বলিয়া চেতনাহীনের ন্যায় তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরে উত্তর করিল, "মনোরমে তুমি জান চুরি করার কি শাস্তি, চুরি করিলে রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ রাজদণ্ডই ইহার প্রচুর শাস্তি নহে, অন্তর্যামী ভগবান সকল দেখিতেছেন, জানিতেছেন, তিনি পাপীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তুমি প্রলুব্ধ হইবার সময় কি আমার উপদেশ বাক্য একবারও মনে কর নাই? যদি যথার্থই তুমি অঙ্গুরীয় অপহরণ করিয়া থাক ত অস্বীকার করিও না, যাঁহাদের দ্রব্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর, তোমার দোষ মোচনের এক্ষণে ইহাই একমাত্র উপায়; দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলে তোমায় রাজমহিষী ক্ষমা করিতে পারেন।"

মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা আমি তোমার কাছে শপথ করিয়া ও ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি আংটী দেখি নাই। যদি আমি পথে যাইতে যাইতে কোন জিনিস কুড়াইয়া পাই, তাহা যাহার দ্রব্য তাহাকে যতক্ষণ না দি ততক্ষণ কোন মতে সুস্থির হইতে পারি না।"

পিতা বলিল "দেখ মনোরমে, রাজকুমারী তোমায় রাজদণ্ড হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। ইনি তোমার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত, তোমায় এই কিছু অগ্রে কেমন চমৎকার উপহার দিয়াছেন। তোমার ইঁহার নিকট মিথ্যা বলা কখনও উচিত নহে। তুমি ইঁহাকে প্রতারণা করিলে তোমার নিজের ঘোর অনিষ্ট হইবে। এখনও বলিতেছি নিজের অপরাধ স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজকন্যা তোমার জন্য অনুরোধ করিয়া তোমার দণ্ডবিধান মার্জ্জনা করাইবেন। আমার কথা রাখ, সত্য বল।"

মনোরমা কহিল "বাবা তুমি বেশ জান যে আমি জন্মাবধি কখন কাহারও এক কপর্দ্দক অপহরণ করি নাই, কখনও কাহার গাছের একটী ফল বা এক আঁটী ঘাসও ছিঁড়িতে ভরসা করি নাই। একটী মহামূল্য অঙ্গুরীয়ের কথা আর কি বলিব। বাবা আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি ত জান আমি কখনও তোমার কাছে মিথ্যা বলি নাই।"

দীননাথ কন্যার কথায় আশ্চর্য্য হইল বটে তথাপি বলিল "মা তোমার বৃদ্ধ পিতার মুখের

দিকে একবার চাহিয়া দেখ, আমার এই অন্তিম কালে আমায় এ দুঃখ দিও না। আমার এ দুঃখানল নিবাও, অন্তর্যামী বিধাতার নিকট অপরাধ স্বীকার কর, স্বর্গরাজ্যে অসরল মিথ্যাবাদী চোরের স্থান নাই, তিনি বর্ত্তমান, তিনি তোমার হৃদয় দেখিতেছেন, দোষ থাকে এখনও বল, আত্মাকে অধঃপাতিত করিও না।"

মনোরমা তখন করযোড়ে সকাতরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "অন্তর্যামী হরি! আমার অন্তর তুমি দেখিতেছ, আমি যে নির্দ্দোষী তাহা তুমি জান, কৃপা করিয়া আমায় এ বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

দীননাথ তখন কন্যা যে যথার্থ নির্দ্দোষী তাহা বেশ বুঝিল, কহিল "মনোরমে আমি বেশ বুঝিলাম তুমি আংটী চুরি কর নাই; তাহা হইলে, ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া রাজনন্দিনী ও তোমার বৃদ্ধ পিতার নিকট কখন এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। আমার আর সন্দেহ নাই, এখন আমার মন স্থির হইল। মা স্থির হও, নির্দ্দোষীর ভয় নাই। পৃথিবীতে একটি জিনিসকে আমি বড় ভয় করি সেটী পাপ। কারাবাস বা মৃত্যু ইহার কাছে কিছুই নহে। যদি পাপী না হই আর জগতের সকলে আমাদের পরিত্যাগ করে বা আমাদের বিপক্ষ হয়, তাহাতেও ভয় নাই; অভয়দাতা পরমেশ্বর আমাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। শীঘ্র বা বিলম্বে তোমার এই দোষ অলীক বলিয়া নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়া দিবেন।"

রাজকন্যা হেমলতা এতক্ষণ একমনে তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন, বৃদ্ধের শেষ কথা শুনিয়া তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। দেখ মনোরমার পিতা, আমি আপনাদের এই সকল কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতেছি মনোরমা আংটী লয় নাই; কিন্তু ঘটনা চক্রটী ভাবিয়া দেখিলে মনোরমা ভিন্ন আর কাহার প্রতি সন্দেহ হইতে পারে না। মার বেশ মনে আছে, যে মনোরমা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি আংটী বিছানার উপর রাখিয়াছিলেন, আমি ও মা, বাহিরে পরামর্শ করিতে গেলে, মনোরমা ভিন্ন সেখানে আর কেহই ছিল না। আমি পর্য্যন্তও বিছানার কাছে যাই নাই। মনোরমা ও আমি, মার ঘর হইতে বাহির হইবার পর মা যেমন আংটী পরিতে যাইবেন, আর তাহা দেখিতে পাইলেন না। মা তন্ন তন্ন করিয়া সমুদয় ঘর দেখিলেন, খুঁজিবার সময় তিনি কাহাকেও গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মা দুই তিনবার এইরূপে খুঁজিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। এই ঘটনায় আংটী কে নিয়াছে বোধ হয়?

মনোরমার পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জানি না ঈশ্বর আমাদিগকে কেন এই পরীক্ষায় ফেলিলেন, তাঁহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে?" এই বলিয়া বৃদ্ধ উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া সকাতরে বলিল "হরি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার দয়া থাকিলে কোন ভয় থাকে না।

হেমলতা বলিলেন "আমার জন্মতিথির উৎসব বেশ আনন্দে হইল, আর এখানে থাকিয়া কি হইবে, যাই। মা এখনও মনোরমার হিতার্থে কাহারও নিকট একটী কথাও বলেন নাই। কিন্তু আর কথা গোপন থাকে না, বাবাও অপরাহ্ণ সময়ে রাজধানী হইতে এখানে আসিবেন কথা আছে। ঐ আংটীটী তিনি আমার জন্মদিনে মাকে উপহার দিয়াছিলেন; মা আমার জন্ম

তিথির দিন আংটী পরিয়া থাকেন। আজ মার হাতে অঙ্গুরীয় না দেখিলে তখনি তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। মা মনে করিতেছেন যে, আমি মনোরমার নিকট হইতে অঙ্গুরীয় লইয়া যাইব। এই বলিয়া হেমলতা চুপ করিল। গৃহ কয়েক দণ্ডের জন্য একেবারে নিস্তব্ধ রহিল। কিছু ক্ষণ পরে হেমলতা বলিলেন, তবে এক্ষণে বিদায়, আমি যথাসাধ্য মনোরমার দোষ কাটাইব কিন্তু সকলে বিশ্বাস করিবে কি না সন্দেহ। এই বলিয়া রাজকন্যা চলিয়া গেলেন, দুঃখে ও মনোকষ্টে পিতা ও কন্যা কেহই তাহার সমাদর করিতে পারিল না।

দীননাথ অধঃদৃষ্টিতে গৃহের মধ্যে বসিয়া রহিল, কষ্টে তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, মনোরমা পিতার চরণতলে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বাবা, আমি তোমার পা ছুইয়া বলিতেছি আমি ইহার কিছুই জানি না।" পিতা তাহার চিবুক ধরিয়া কহিল মা তুমি নির্দ্দোষী, অসরল পাপীরা কখন এমন সরল ও পরিষ্কার কথা কহিতে পারে না।

মনোরমা বলিল "বাবা এখন উপায় কি? না জানি আমাদের কি দশাই ঘটে। যদি কেবল আমাকেই দণ্ড ভোগ করিতে হয় তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমার জন্য যদি তোমায় কোন ক্লেশ পাইতে হয় তাহা হইলে আমার সহ্য হইবে না, তুমি ভাল থাকিলে বাবা আমার আর শত ক্লেশও ক্লেশ বোধ হইবে না।

দীননাথ কহিল "মা হরির চরণে পড়িয়া থাক, আকুলিত হইও না, তাঁহার ইচ্ছা বিনা কেহ আমাদের একগাছি চুলও নষ্ট করিতে পারিবে না। যাহাই কিছু সকলই তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ঘটিতেছে। এই ঘটনাও তাঁহার অভিপ্রেত— যখন তাঁহার অভিপ্রেত তখন ইহা উপযুক্ত ও শুভ ফলপ্রদ; ইচ্ছাতিরিক্ত ফল কি কখন এ জগতে সম্ভবে? অতএব, ভয় করিও না এবং কখনও সত্যকে পরিত্যাগ করিও না। রাজকর্ম্মচারীরা তোমায় যতই কেন ভয় প্রদর্শন করুক না, তাহারা তোমায় যতই কেন প্রলুব্ধ করুক না, তুমি সত্য হইতে কখনই একচুল বিচলিত হইও না, এবং তোমার বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করিও না। তোমার বিবেক সাধু হইলে কারাগারে ক্লেশ থাকিবে না। আমাদিগকে সম্ভবত পৃথক হইতে হইবে সুতরাং আমি আর তোমায় সান্তনা করিতে পারিব না; মা! এখন তুমি আমায় ছাড়িয়া জগতের যিনি পিতা সেই পরমপিতার শরণাপন্ন হও তিনি মনে সান্ত্বনা দিবেন। কেহই তোমায় তাঁহার নিকট হইতে পৃথক করিতে সক্ষম হইবে না।"

একি! দেখিতে দেখিতে গৃহের দ্বারে চারিজন রাজপুরুষ দেখা দিল। তাহাদের উগ্রমূর্ত্তী দেখিয়া মনোরমা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া পিতার চরণ জড়াইয়া ধরিল। "ইহাদিগকে বিযুক্ত কর" এই মেয়েটাকে শিকলে বাঁধিয়া কারাগারে নিক্ষেপ কর—বৃদ্ধকে হাজত ঘরে লইয়া যাও" এই বলিয়া প্রধান রাজকর্ম্মচারী অপর রাজপুরুষদিগকে আজ্ঞা দিল, ও দীননাথের বাড়ীর চারিদিকে পাহারা নিযুক্ত করিল, কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না এবং তন্ন তন্ন করিয়া সমুদায় গৃহ অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

হায়! কঠিন হৃদয় রাজপুরুষগণ সবলে পিতার নিকট হইতে মনোরমাকে ছাড়াইয়া লইয়া তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল, তখন তাহাকে

দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। মনোরমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, কিন্তু নির্দ্দয় রাজকর্ম্মচারীরা তাহাকে সেই অবস্থাতেই লইয়া গেল। মনোরমা ও তাহার পিতাকে বন্ধন করিয়া পথ দিয়া লইয়া যাইবার সময় দলে দলে লোক আসিয়া পথের দুই পার্শ্ব ছাইয়া ফেলিল। আংটী চুরির গল্প দাবাগ্নির ন্যায় তখনই গ্রামের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানা লোকে নানা কথা কহিল। নিরীহ দীননাথ ও মনোরমার দুঃখে অনেক ঈর্ষাপরবশ ব্যক্তি সুখ বোধ করিল এবং তাহারা নানা বিদ্রূপ বাক্যও প্রয়োগ করিতে লাগিল। দীননাথ ও তাহার কন্যা নিজ নিজ শ্রমবলে সুখে বাস করিত তাহা দেখিয়া যে অলস ও কুমনা লোকের ঈর্ষা হইবে তার আর বিচিত্র কি? তাহাদের একজন বলিল "এখন বুঝা যাইতেছে দীননাথ কোথা হইতে এত ধন পাইয়াছে? এই জন্য ইহারা অন্য গ্রামবাসীদের অপেক্ষা বড়মানুষী করিয়া কাটাইত।" হায়! কি ভ্রম, পরিষ্কার থাকিলেই আমাদের দেশের লোক বড়মানুষী দেখে!

কিন্তু প্রসাদপুরস্থ অনেকেই তাহাদের দুঃখে যথার্থ দুঃখিত হইল এবং তাহাদের এই দশা দেখিয়া নয়ন-জল সম্বরণ করিতে পারিল না, তাহারা ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "হায়, আমাদের কি মন্দ কপাল, আমাদের একজন সৎ প্রতিবাসীর অদৃষ্টে শেষে এই ঘটিল। কেহই স্বপ্নে ইহার এই দশা ভাবে নাই। বোধ হয়, ইহারা নির্দ্দোষী। ঈশ্বর ইহাদিগকে রক্ষা করুন।"

তৃতীয় অধ্যায়

সমাপ্ত

ঢাকাই মসলিন্।

ঢাকার মসলিন্ বস্ত্র ভারতবাসীর অতিশয় গৌরবের সামগ্রী। ফরাসী ও ইংরেজগণ তাঁহাদের কলে অনেকরকম সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঢাকার প্রাচীন অধিবাসী বসাকবংশীয়দিগের হস্ত নির্ম্মিত মাকড়সার জালের মত পাতলা মসলিনের নিকট সে সকল বস্ত্র আজিও সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। শাদা, ডুরে এবং জামদানী বা ফুলদার অনেক প্রকার কাপড় বহুশতাব্দী হইতে ঢাকা নগরীতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে কিন্তু এই সকল শ্রেণীর বস্ত্রের মধ্যে একমাত্র সূক্ষ্ম শাদা মসলিনের জন্যই ঢাকার নাম পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। সুসভ্য রাজ্য মাত্রেই এ বস্ত্র আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত যেখানে যত প্রকাশ্য মেলা খুলা হইয়াছে সে সকল স্থানেই ইহা সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছে।

ভারতে মুসলমানদিগের রাজত্ব কালেই ঢাকার মসলিন্ বস্ত্র ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমানগণ অত্যন্ত ভোগবিলাসী জাতি। পূর্ব্বকালের মুসলমান নবাব ও বাদশাহগণের পোষাক তৈয়ারির জন্য অথবা দিল্লীর রাজসভা সাজাইবার জন্য ঢাকাই মসলিন্ বড়ই আদরের বস্ত্র ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে তাঁহার পত্নী নুরজাহানের যত্নে এই ব্যবসায়ের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তখনকার তিন গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া এক খণ্ড খুব পাতলা মসলিন্ বা মল্‌মল্‌খাস ৪০০৲ টাকার কমে প্রস্তুত হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের

এক গজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মল্‌মলের দাম কত? সচরাচর ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। কি আশ্চর্য্য অবনতি!! পূর্ব্বে ঢাকার বসাক বংশীয়গণের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেকেই এই সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন কিন্তু এখন দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের দিন দিন অবনতিতে তাঁহাদের বংশধরেরা নিরাশ হৃদয়ে সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন শুনা যায় সমস্ত ঢাকার মধ্যে নবাবপুরে হরিমোহন বসাক নামে এক জন মাত্র শিল্পী আছেন যিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে সক্ষম।

পুরাকালের ঢাকাই মসলিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রচলিত আছে। শুনা যায় সে কালের একটী ভাল থান লম্বাদিকে অনায়াসে একটী আংটীর মধ্যে গলিয়া যাইত। ১৬৬৬ খৃঃঅব্দে ট্র্যাভারনিয়র নামক কোন এক ভ্রমণকারী বলিয়া গিয়াছেন যে, একদা পারস্য রাজের দূত ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় উটপক্ষীর ডিম্বাকৃতি একটী মুক্তাখচিত নারিকেল খোলের ভিতর ৩০ গজ লম্বা একটী পাগড়ীর থান পূরিয়া পারস্যরাজকে উপঢৌকন দিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে যে ঢাকাই মসলিনের অধিক উন্নতি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বস্ত্রের প্রচলিত নাম গুলিই বিশেষ প্রমাণ। "সওগাতি" অর্থাৎ সওগাৎ দিবার উপযুক্ত, "শরবতী" (বোধ হয় শরবৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন), "মল্‌মল্‌খাস" অর্থাৎ খাস মল্‌মল্‌ বা রাজার ব্যবহারের উপযুক্ত মল্‌মল্‌, "আব-রোআন" অর্থাৎ প্রবাহিত জল, "সব-নম" বা সান্ধ্য-শিশির এবং "বাফৎ-হাওয়া" বা হাওয়া কাপড় ইত্যাদি যতগুলি কবিত্ব পূর্ণ প্রাচীন নাম শুনা যায় এ সকল গুলিই মুসলমানগণের প্রদত্ত বলিয়া বোধ হয়। এই বস্ত্রের গুণ এই যে, নদীবক্ষে বা শিশির-সিক্ত স্থানে ইহা বিছাইয়া দিলে ঐ জল ও শিশিরের সহিত ইহা এমনি মিশাইয়া যায় যে হঠাৎ আর উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না অথবা গায়ে এক খানি কাপড় থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া বেশ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্মতা হেতুই বোধ হয় নামদাতাগণ এই বস্ত্রকে কখন জল, কখন শিশির এবং কখনও বা বায়ুর সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমানদিগের রাজ্য নাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইংরেজদিগের রাজ্য গ্রহণের কয়েক বৎসর পর হইতেই ভারতের এই সুন্দর বস্ত্র ব্যবসায় দিন দিন অবনত হইয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এ দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল তখন তাঁহাদের অধীনে বঙ্গদেশের যে যে স্থানে ভাল কাপড় তৈয়ার হইয়া থাকে সেই সেই স্থানে দুই একটী করিয়া কুঠী ছিল। ঐ সকল কুঠীতে দেশীয় শিল্পীগণ কর্ম্ম করিয়া নানা প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের কারখানা সমূহে প্রস্তুত সমস্ত কাপড় এবং দেশের অন্যান্য কারিকরদিগের হস্ত নির্ম্মিত বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা করিতেন এবং বিস্তর কাপড় জাহাজে করিয়া আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া তদ্দারা অনেক ধন সঞ্চয় করিতেন। এই সময়ে এখানকার বস্ত্র এতদূর প্রচলিত ছিল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও আর আর সওদাগরগণ তখন বৎসরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার শুদ্ধ ঢাকাই বস্ত্র (মসলিন্, জামদানী প্রভৃতি) ক্রয় করিতেন। যাহা হউক এ সুখের অবস্থা বড় অধিক দিন ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অবস্থা অনেক অবনত হইয়া পড়ে। ১৮০৭ সালে ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ১শত টাকার

কাপড় বিক্রয় হয় মাত্র। এখন সেই অবস্থা দিন দিন আরও এত অবনত হইয়াছে যে, আজ কাল বৎসরে আন্দাজ ৩ লক্ষ টাকার অধিক কাপড় কাটে না।

এখন আমাদের দেশে বিলাতী কলের কাপড় এতই প্রচলিত হইয়াছে যে, দেশীয় বস্ত্র আর কেহ কিনিতে চায় না। আবার দেখ ভাল রকম দেশীয় বস্ত্র যাহা কিছু এখন তৈয়ার হয় সে সমুদয়ই প্রায় বিলাতী সূতায় তৈয়ার হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া এ কালের অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশের লোকেরা হয়ত কখন সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে নাই। ইহা ভুল কথা। হইতে পারে আমাদের ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের হাড়ে হাড়ে যখন বিলাতী সভ্যতা প্রবেশ করে নাই—যখন এদেশের লোক মাত্রেই শুদ্ধ ধুতি চাদর পরিয়া বাবু সাজিত—চোগা, চাপকান, পিরান, কোট, পেণ্টুলন প্রভৃতি যখন এদেশে প্রচলিত ছিল না—তখনকার চলনসই দেশী বস্ত্রের জন্য যে সকল দেশী সূতা ব্যবহার করা হইত তাহা আজ কালের বিলাতী সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম হইত না। ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহা আবার আরও সত্য কথা যে, এ দেশে ঢাকাই মসলিনের ন্যায় বহুমূল্য বস্ত্রের জন্য যে দেশী সূতা বহুকাল হইতে আজ পর্য্যন্তও তৈয়ার হইতেছে তাহা আবার জগতের অপর কোন জাতি প্রস্তুত করিতে পারে না। ঢাকার আশেপাশে তন্তুবায়-শ্রেণীর অশিক্ষিতা রমণীগণ আস্না তুলা হইতে দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে যে সূক্ষ্মতম সূতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহার নিকট ইংরেজের কলে প্রস্তুত খুব ভাল সূতাও দাঁড়াইতে পারে না। ইহা হইতে আমাদের আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে ? ইংরেজেরা ইহা শিক্ষা করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কত বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, বড় বড় মেলার সময় এদেশের সূতা লইয়া গিয়া ইউরোপীয় নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূতার সহিত তুলনা করিয়া কাহার কিরূপ পাক, কোন্ সূতা কত সরু ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অনুবীক্ষণ লইয়া ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু হায়! তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তুলা হইতে সূতা ও সূতা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৬ রকম ছোট বড় দেশীয় যন্ত্র আবশ্যক। এই সকল যন্ত্র দড়ি, বাঁশ, বাখারি, বেত, লোহা ও শরকাটি প্রভৃতি যৎসামান্য সামগ্রীতেই তৈয়ারি হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারা সামান্য হইলেও আজি পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের কলের তাঁত এ দেশের তাঁতকে হারাইতে পারে নাই।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, আগেকার ন্যায় আজ কালের ঢাকাই মসলিন্ বেশী দামী হয় না। কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহারই বা তুলনা কোথায় ? এখনকার এক তোলা আসনা তুলার সূতার মূল্য সূক্ষ্মতা ভেদে ৭৲ হইতে ১৮৲ টাকা। মসলিনের জন্য এক রতি ওজনের সূতা সচরাচর ১৪০ হইতে ১৭৫ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ইহাপেক্ষাও সরু করা যাইতে পারে। আধসের তুলা হইতে ১২৫ ক্রোশের ও অধিক লম্বা সূতা বাহির করা হইয়াছে। রমণীগণের কোমল হস্তে কেমন করিয়া সূতা তৈয়ার হয় তাহা নিম্নে বলা যাইতেছেঃ—

প্রথমতঃ খানিকটা তুলা লইয়া তাহাতে পাতার কুচি বা মাটি প্রভৃতি যাহা কিছু জড়িত থাকে তাহা খুব যত্ন করিয়া বাছিতে হয়। তারপর বোয়াল মাছের চোয়ালের দন্তপাটি দ্বারা তুলাটুকু

ঢাকাই মসলিন্ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র সমূহের নাম ও তাহাদের চিত্র।

১ম—সূতা গাঁথা।

২য়—ফেটি বাঁধা।

৪র্থ—সানা বিন্ধন।
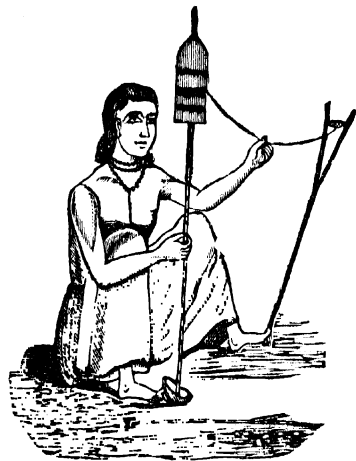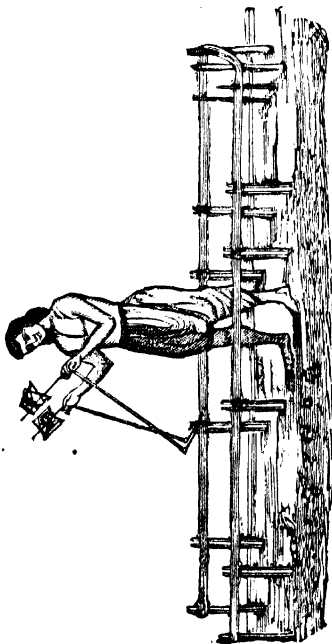
৩য়—টানা তৈয়ারি।
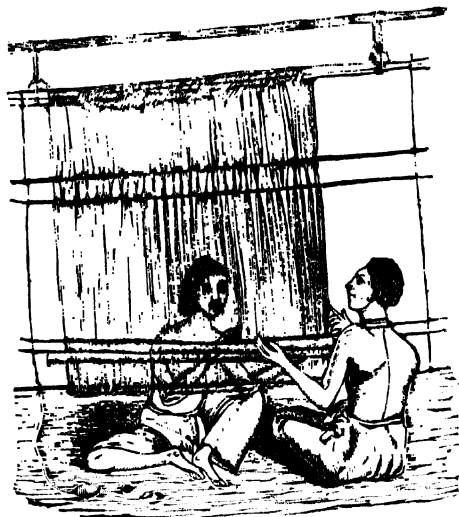
আস্তে আস্তে আঁচড়াণ হয়। বোয়াল মাছের দাঁতগুলি ছোট, ঘন ঘন ও একটু বাঁকা। ইহাতে বেশ চিরুণীর মত কাজ করে। তুলা আঁচড়াণ হইলে একখানি পাতলা চাল্‌তা কাঠের তক্তার উপর বিছাইয়া তাহার উপর দিকে একটী সরু লোহার শলা এরূপ ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া চালান হয় যে, বিচি না ভাঙ্গিয়া কেবল তাহা হইতে তুলা আলাদা হইয়া পড়ে। এই তুলাকে ছোট ধনু যন্ত্রে ধুনিতে হয়। এই ধনুর জন্য তাঁত, মুগা রেশম, কলার সূতা অথবা বেতের সূতা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তুলা ধুনা হইলে একটি মোটা রকম কাঠের দণ্ডে উহা আল্‌গা করিয়া জড়াইয়া অবশেষে দণ্ডটী মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তুলাপিণ্ডকে দুই খানা তক্তার মধ্যে ফেলিয়া চাপিতে হয়। তারপর এই তুলাকে আবার পেন কলমের মত ছোট ছোট গালামাথান শর কাটিতে জড়াইতে হয় ও সর্ব্বশেষে ঐ কাটিগুলিকে কুঁচিয়া মাছের কোমল ও মসৃণ ছালে ঢাকিয়া রাখা হয়। এক একটী গালার কাটি জড়ান তুলাকে "পুনী" বলে। ইহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিলে সূতা কাটিবার সময় কোন রকম ময়লা ধরে না।

তুলা হইতে কেমন করিয়া সূতা কাটিতে হয় তাহা প্রথম চিত্রে দেখান গেল। ৩০ বৎসরের অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকগণই সূক্ষ্ম সূতা কাটিয়া থাকেন। শুষ্ক বায়ু ও উত্তাপের সময় তুলার আঁইশ টানিতে গেলে ছিঁড়িয়া যায়, এজন্য শীতকালে সকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে বেলা ১০টা এবং অপরাহ্ণে ৩।৪টা হইতে সূর্য্যাস্তের আধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাল সূতা কাটিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু অধিক দামী সূতা সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ঘাসের উপর শিশির থাকিতে থাকিতে প্রস্তুত করা হয়। কখন কখন বায়ুর শুষ্কতা নিবারণের একটী সহজ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। একটা প্রশস্ত জলপাত্র নিম্নদেশে রাখিয়া তাহার উপর সূতা কাটা হয়। তাহা হইলে জল হইতে যে বাষ্প উঠে তাহা দ্বারা তুলাকে কতকটা নরম রাখে। সূতা কাটিবার জন্য এই কয়েকটী দ্রব্যের আবশ্যক। ১ম "পুনী", ইহার কথা উপরে বলা গিয়াছে। (২য়) মোটা সূঁচের মত একটী ১০ হইতে ১৪ ইঞ্চি লম্বা লোহার "টেকো"। ইহার নিচের দিকে একটু উপরে একটী মাটির ছোট গোলাকার বর্ত্তুল বা চক্র থাকে। এরূপ ভারি জিনিস তলায় না থাকিলে টেকোটী কখনই একবার মাত্র হাতে করিয়া ঘূরাইয়া দিলে কিয়ৎকাল উহা আপনি আপনি ঘুরিত না। (৩য়) একখণ্ড শাঁক। ইহার উপরদিকটী মাটির দ্বারা ঢাকা। টেকো ঘুরাইবার সময় এই শাঁকের উপর তাহার নিম্ন ভাগটী রাখা হয়। (৪র্থ) ছোট একটা পাথর বাটি। এই বাটিতে খড়ির গুড়া থাকে। হাত যাহাতে তেলা না হয় তজ্জন্য বারবার এই খড়ির গুড়া হাতে লাগান হয়।

দ্বিতীয় চিত্রে নাটাইয়ে করিয়া সূতার ফেটি বান্ধা, তৃতীয় চিত্রে কাপড়ের টানার জন্য সূতা তৈয়ারি করা ও চতুর্থ চিত্রে সানার ভিতর সূতা পরান প্রভৃতি দেখান গেল। এ সকলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও আর কয়েকটী চিত্র আমরা পরে দিব।

স্থানাভাব বশতঃ এবারে গত বারের ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা প্রকাশিত হইল না।

অক্টোবর, ১৮৮৬।

পরলোক-গত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! পূজার সময় সমুদায় বঙ্গদেশের লোক যখন আমোদ কোলাহলে মত্ত ছিল, তখন আমাদের দেশের একটী রত্ন আমরা হারাইয়াছি। আমরা গত দুই বৎসরের মধ্যে তোমাদিগকে কত দুঃখের সংবাদই দিলাম। যাঁহারা দেশের মুখশ্রী স্বরূপ ছিলেন, এরূপ এত লোক যে এত অল্প সময়ের মধ্যে হারাইব তাহা আমরা জানিতাম না। ইঁহাদের অকাল-মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা তোমাদিগকে বলিয়া জানাইতে পারি না।

আজ যাহাঁর মৃত্যু সংবাদ লইয়া তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি তাঁহার নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবে। ইহাঁর নাম রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইহাঁর প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস তোমরা অনেকে পড়িয়া থাকিবে; অথবা ইহাঁর রচিত "মিত্র বিলাপ" নামক কবিতা পুস্তকও তোমরা পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে তোমরা তাহাঁর যে পরিচয় পাইয়াছ, তাহা অতি সামান্য। তাঁহার যে অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও সদগুণ ছিল তাহার অল্পই ঐ সকল গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। বলিতে কি তাঁহার যে কত বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, তাহা দেশের অনেক বড় বড় লোকেও জানিতেন না। ইহার কারণ এই, তিনি আপনার গুণ সকল বিনয়ের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেন। কত লোক দেখিতে পাই, যাহারা একগুণ থাকিলে দশগুণ দেখায়; যে বিদ্যা নিজের নাই, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করে; মান সম্ভ্রম লাভ করিবার জন্য কত কৌশল কত ফন্দি করে; পদস্থ লোক-দিগের সহিত মিশে ও তাঁহাদের তোষামোদ করে; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বালকের ন্যায় সরল স্বভাব ও বিনীত ছিলেন, সামান্য লোকের ন্যায় বেড়াই-তেন, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত না যে তিনি এত বড় লোক।

অনুমান ১৮৪৬ সালে নদীয়া জেলার একটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ৮ বৎসর বয়সের সময় রাজকৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়, তদবধি তাঁহার ভ্রাতা, ইস্কুল সমূহের সুবিখ্যাত ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তাঁহার অভি-ভাবক ছিলেন। বালককাল হইতে রাজকৃষ্ণ পাঠে অতিশয় মনোযোগী ছিলেন। ধীর শান্ত স্বভাব, ও পাঠে মনোযোগী হওয়াতে তিনি সকলের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তিনি যখন

কালেজে পড়েন তখনই তাঁহার সুখ্যাতি দেশে রাষ্ট্র হইয়াছিল। সকলেই বলিত ঐ বালকটী কালেজের ছাত্রদিগের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রে অদ্বিতীয়। আমরা তখনই তাঁহার অশেষ প্রশংসা শুনিতে পাইতাম। তিনি যখন (Philosophy) অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, উপাধি লাভ করেন, সেই উপাধি দিবার দিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধিনায়ক সার হেনরি মেইন তাহাকে প্রকাশ্য সভার মধ্যে বলিয়া দিলেন দর্শন বিষয়ে তিনি (রাজকৃষ্ণ) যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ও সুদক্ষ ছাত্রের পক্ষেও প্রশংসনীয়।

এই যশ ও অভিনন্দন লইয়া রাজকৃষ্ণ কালেজ হইতে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে উকীলের কাজ করিবেন। কিন্তু তাহা তাঁহার পোষাইল না। পোষাইবে কেন? নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করিয়া নানা শাস্ত্র পাঠ করাতে যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ, ওকালতি কার্য্য তাঁহার জন্য নয়। রাজকৃষ্ণ ত্বরায় সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিলেন। তিনি উচ্চ প্রোফেসারের পদ পাইয়া জেনেরাল এসেম্বি কালেজ, পাটনা কালেজ, কটক কালেজ, বহরমপুর কালেজ, প্রেসিডেন্সি কালেজ প্রভৃতি অনেক কালেজে কাজ করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার গভীর বিদ্যা, অসাধারণ বুদ্ধি ও নানাশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার চরিত্রের সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কালেজে পড়িবার সময় আমরা যেমন তাঁহার যশ শুনিয়াছিলাম, শিক্ষকতা করিবার সময়ও সেইরূপ যশ শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ ও বন্ধুতা হইল। আলাপ হইয়া তাঁহার চরিত্রে যে সাধুতা দেখিতে পাইলাম, তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি যেন তাহার নিকট সামান্য বোধ হইতে লাগিল। এমন প্রবল জ্ঞান-পিপাসা আমরা অতি অল্পলোকেরই দেখিয়াছি। মানুষ যাহা জানিতে পারে, ও যাহা জানিলে মানুষের উন্নতি হয় এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহা প্রিয়-বন্ধু রাজকৃষ্ণ জানিতে উৎসুক হইতেন না। জানিবার জন্য তাঁহার এতদূর ব্যগ্রতা হইত যে যতক্ষণ বিষয়টা পড়িয়া শেষ না করিতেন ততক্ষণ যেন আহার নিদ্রা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইত। কোন একটী নূতন বিষয়ে এক খানি পুস্তক কলিকাতার কোন বন্ধুর হাতে আসিয়াছে, খবর পাইলে তিনি তাহা পাঠ করিবার জন্য হয় ত দশবার তাঁহার বাড়িতে হাঁটাহাটী করিতেন। বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা হইলে কেবল সেই কথা। আমরা তাঁহার সঙ্গে আধ ঘণ্টা বসিয়া এত নূতন বিষয় শিক্ষা করিতাম, যাহা দুইমাস পড়িয়াও শেখা যায় না। আজ বঙ্গদেশ একটী অমূল্য ধন হারাইয়াছেন, আমাদের সে দুঃখ ত আছেই, তাহার উপরে আজ এই দুঃখে চক্ষে জল আসিতেছে, এমন বন্ধু হারাইয়াছি যাঁহার সহিত আলাপেও জ্ঞান বৃদ্ধি হইত।

দেশের কত লোকে ত প্রোফেসার হয়, বড় চাকুরী করে, মোটা মোটা মাহিয়ানা পায়। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সে চাকুরীতেই বদ্ধ থাকে। তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। খান, দান, পরিবারের গহনা গড়ান, ছেলে মেয়ের শিক্ষা দেন; না কোন নূতন জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করেন, না কোন প্রকারে সঞ্চিত জ্ঞানকে দেশের কাজে লাগান। আমাদের রাজকৃষ্ণ সে ধাতুর লোক ছিলেন না।

তিনি শিক্ষকতা কাজে রত থাকিবার সময় ফরাসি, উর্দ্দু, উড়িয়া, সংস্কৃত, আসামী, জর্ম্মান, পারসী, লাটিন ও পালি প্রভৃতি ভাষা শিখিয়াছিলেন। ফরাসি-দর্শনকারদিগের গ্রন্থ সকল পড়িবার জন্য এত ব্যাগ্রতা ছিল যে ফরাসি ভাষা না শিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। একদিকে যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে সেই জ্ঞানের ফল দেশবাসিদিগকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সে সময়ে "বঙ্গর্শন" নামে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা ছিল। রাজকৃষ্ণ ঐ পত্রিকার একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তাহাতে অনেক গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলি পড়িয়া অনেকে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের যে এত সুখ্যাতি হইয়াছিল তাঁহার লিখিত প্রস্তাবগুলি তাহার এক প্রধান কারণ।

উড়িষ্যাতে তিনি যখন কর্ম্ম করিতেন, তখন কিসে উড়িষ্যাবাসিদিগের উন্নতি হয় সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতেন; এবং সে দেশীয় ছাত্রদিগকে লইয়া নানা প্রকার সভা করিয়া তাহাদিগকে সৎ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। আমরা বলিয়াছি সকল প্রকার জ্ঞান লাভে তাঁহার যত্ন ছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। যাহাতে বিজ্ঞান চর্চ্চা দেশ মধ্যে প্রবল হয় ইহা তাঁহার প্রাণগত ইচ্ছা ছিল। কেবল তাহা নহে,"এসিয়াটিক সোসাইটী" নামে এদেশে একটী সভা আছে। অনেক বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় লোক তাহার সভ্য। প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করা এই সভার উদ্দেশ্য। রাজকৃষ্ণ প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনাতে এত অনুরাগী ছিলেন যে এই সভার সভ্য হইয়াছিলেন। এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য পালী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর হইল তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটী বড় কাজ পাইয়াছিলেন। তাহাতে মাসে ৭০০৲ শত টাকা পাইতেন। দেশীয় সংবাদপত্র সকলের প্রধান অংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা,ও যত আইন প্রস্তুত হয় তাহার অনুবাদ করা,তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। ইহাতে তাঁহাকে গুরুতর মানসিক শ্রম করিতে হইত। আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে তাঁহার শরীর যেন অবসন্ন, মন যেন স্ফূর্ত্তি-হীন হইয়া আসিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, শ্রমটা কিছু অতিরিক্ত করিতে হয়। এই গুরুতর শ্রম করিয়াও তিনি জ্ঞান চর্চ্চা হইতে একটী দিনের জন্য বিরত হন নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে ধর্ম্ম-বিষয়ে চিন্তা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্ম-বিষয়ে আলাপ করিতেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম কিরূপে বর্দ্ধিত হয়, চিত্তশুদ্ধি কিরূপে লাভ করা যায়, এই সকল চিন্তা করিতেন। তিনি যখন এই সকল বিষয়ে প্রস্তাব করিতেন তখন তাঁহার শিশুর ন্যায় সরলতা ও বিনয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। পূজার কিছু দিন পূর্ব্বে সহর ত্যাগ করিবার সময় কথা হইল যে শীঘ্র আসিয়া আবার সাক্ষাৎ হইবে ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু হায়! আর সাক্ষাৎ হইল না। রাজকৃষ্ণ তাঁহার পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একাকী সংসারের ভার বহন করিবার জন্য রাখিয়া, তাঁহার বিধবা পত্নী ও পিতৃহীন বালক বালিকাদিগকে শোকসাগরে ফেলিয়া, আমাদের ন্যায় বন্ধুগণকে

বিচ্ছেদ দুঃখে নিমগ্ন করিয়া ও বঙ্গভূমিকে ক্ষতি গ্রস্ত করিয়া ৪১ বৎসর মাত্র বয়সে ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। এ ক্ষতির আর ত্বরায় পূরণ হইবে না।

ঢাকাই মস্‌লিন।

আমরা গত দুইবারে এই মস্‌লিন সম্বন্ধে সুতা কাটা হইতে তাঁতে কাপড় বুনা পর্য্যন্ত চিত্র সহিত দেখাইয়াছি। * এবারে অবশিষ্ট দুইটি চিত্র দেখান যাইতেছে :—

৭ম চিত্র।

* গত বারে ভ্রম বশতঃ ৫ম চিত্রের স্থলে ৬ষ্ঠ চিত্রটি এবং ৬ষ্ঠ চিত্রের স্থলে ৫ম চিত্রটি দেখান হইয়াছে।

৭ম চিত্র—পাশাপাশি দুইটি "ভাটি" দেখান হইয়াছে। বামদিকেরটি শুদ্ধ ভাটির চিত্র এবং ডাইনদিকেরটি ভাটিতে কাপড় সাজান হইলে কিরূপ দেখিতে হয় তাহার চিত্র, পাঁড়াগায়ে হয়ত অনেক ধোপার ভাটি দেখিয়া থাকিবেন সেইজন্য আমরা আর তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম না। তবে এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ঢাকাই মস্‌লিন যেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র তদনুরূপ সতর্কতার সহিত এই কাপড় ধোয়া আবশ্যক। সুতরাং ধোপারা অন্যান্য কাপড় যেমন দুইএকবার মাত্র ভাটি করিয়া পাটে আছড়াইয়া পরিষ্কার করে মস্‌লিন বস্ত্র সেরূপ না করিয়া ক্রমাগত ১০।১২ বার ভাটি করা হয় এবং পাটে খুব অল্প পরিমাণেই আছড়ান হয়। আবুল ফজেল নামক কোন এক ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে সোণারগাঁ বা সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত কাটারাসুন্দা নামক স্থানের জলই মস্‌লিন ধুইবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। ইদানীং নারায়নদিয়া হইতে তেজগাঁ পর্য্যন্ত সচরাচর কাপড় ধোয়া হইয়া থাকে। পুরাকালে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী সওদাগরদিগের আমলে তেজগাঁয়ে অনেকগুলি কাপড় ধুইবার আড্ডা ছিল কিন্তু সেই সমস্ত বিদেশীয় দিগের কুঠি নষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত তেজগাঁয়ের অধিকাংশ স্থল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

উপরে বলা গিয়াছে যে, মস্‌লিন্ বস্ত্র ১০।১২ বার ভাটিতে চড়ান আবশ্যক। প্রতি রাত্রে কাপড় ভাটি করিয়া পরদিন উহা ক্ষারজল মাখাইয়া রৌদ্রে শুখাইতে হয়। এইরূপে ১০।১২ দিন গত হইলে শেষ ভাটির পরে কাপড়গুলি পরিষ্কার জলে ধুইতে হয়। এই সময় জলের সহিত লেবুর রস মিশান বড় দরকার। তাহা হইলে কাপড়ের শ্বেত বর্ণের উজ্জলতা বৃদ্ধি হয়। থান প্রতি একটি

করিয়া বড় লেবুর রস হইলেই চলে। শাদা কাপড়ের জন্য যেমন লেবু তেমনি কার্পাস ও মুগা (রেশম) মিশ্রিত কাপড় সমূহের জন্য লেবুর রস ও চিনি ব্যবহার করা হয়; কারণ, শুনা যায় চিনিতে রেশমের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। জুলাই হইতে নবেম্বর এই কয়মাস মস্‌লিন ধুইবার উপযুক্ত সময়। যে কাপড় যত বার ভাটি করা হইবে তাহা সেই পরিমাণে শাদা ও পরিষ্কার হইবে এবং ধোপ দিবার খরচাও সেইমত বাড়িবে। এইজন্য ১০০ থান কাপড় ধুইতে ও পাট করিতে ৩০৲ টাকা

৮ম চিত্র।

হইতে কখন কখন ১৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত পড়তা পড়ে।

৮ম চিত্র—পাটে আছড়াইবার সময় মস্‌লিনের সূক্ষ্মতর সূতাগুলি অনেক সময় স্থানে স্থানে এলোমেলো হইয়া পড়ে। কাপড় ধোয়া হইলে সেই স্থানভ্রষ্ট সূতাগুলিকে কেমন করিয়া দোরস্ত করা হয় তাহাই এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। একদিকে জমির উপরে দুটি গোঁটার সহিত সংলগ্ন একটি "নরদ" বা দণ্ডে দুইজন কাপড়ের থানটি গুটাইয়া ধরিয়া আছে অপর দিকে আরএকজন ঐ থানের খানিকটা বিস্তার করিয়াছে, মধ্যস্থলে চতুর্থ ব্যক্তি যেখানে যেখানে উহার সূতা হেলাগুছা হইয়া গিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া দিতেছে।

পাটে আছড়াইবার সময় অনেক সূতা ছিড়িয়াও নষ্ট হইয়া যায়। রিফুগারেরা সেই সূতার পরিবর্ত্তে নূতন সূতা লাগাইয়া দেয়। রিফুগারিতে ঢাকার মুসলমানেরা যেমন ওস্তাদ এমন প্রায় অপর কাহাকেও দেখা যায় না। একজন সুদক্ষ রিফুগার ২০ গজ লম্বা একটি সূক্ষ্ম মস্‌লিন থান হইতে একগাছি ছেঁড়া বা মোটা সূতা বাহির করিয়া তাহার স্থানে ঠিক সেইরূপ লম্বা আর একগাছি ভাল ও সূক্ষ্ম সূতা পরাইয়া দিতে পারে!! ঢাকায় এইরূপ অনেকঘর রিফুওয়ালা আছে। ইহাদের অনেকেই আফিম খায় এবং শুনা যায় নেশার ঝোঁকেই উহারা উত্তমরূপ কাজ করিতে পারে।

(ফুলের সাজি)

চতুর্থ অধ্যায়।

মনোরমাকে রাজপুরুষগণ যখন পথ দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। নির্দ্দয় রাজকর্ম্মচারিগণ সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। ক্রমে যখন তাহার চেতনা হইল, তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল। প্রকৃত ঘটনা একে একে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল এবং সে বুঝিল "সে কারাগারে বন্দিনী"। অশ্রুজলে তাহার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরিতাপ ও ক্রন্দন করিয়া, মনোরমা কতক সুস্থির হইয়া, বিপদভঞ্জন হরিকে সকাতরে ডাকিতে ডাকিতে শীঘ্রই তৃণশয্যার উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রার কি আশ্চর্য্য শক্তি! পুত্রশোকাতুরা জননী, পতিবিয়োগ-আকুলা সতী, এবং রুগ্ন শয্যায় পীড়িত ব্যক্তিও [illegible] হইয়া সকল যাতনা ভুলিয়া যান। মনোরমা যতক্ষণ নিদ্রিতা ছিল ততক্ষণ সে তাহার সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছিল।

মনোরমা জাগ্রত হইয়া দেখিল রজনী ঘোর অন্ধকারে দিক সকল আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? আমি কি সত্য সত্যই কারাগারে বন্দিনী, অথবা আপন গৃহে শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। না, আমার এ স্বপ্ন নহে, এই যে আমার হস্ত "শৃঙ্খলাবদ্ধ" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনোরমা শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল—"এখন আর আমার উপায় নাই, হরি তোমার চরণমাত্র আমার ভরসা, কৃপা করিয়া একবার এই কারাগারের মধ্যে তোমার কন্যার দশা দেখ। তুমি সকলের অন্তর দেখিতে পাও, আমার যে কোন দোষ নাই তাহা তুমি বেশ জানিতেছ। ঠাকুর আমায় এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমার পিতাকে রক্ষা কর, এবং তাঁহার মনে সান্ত্বনা প্রদান কর, তিনি কুশলে থাকিলে আমার অনেক ক্লেশের হ্রাস হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে পিতার কথা মনে পড়িয়া তাহার নয়নজল প্রবলবেগে বহির্গত হইতে লাগিল। আর কথা সরিল না, নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমী তিথির অন্ধকার ক্রমে হ্রাস হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্তিকর চন্দ্রের উদয়ে দিক সকল আলোকিত হইল। গভীর রজনী,—জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, ঝিল্লিদিগের ঝিঁ ঝিঁ শব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ, বৃক্ষশাখায় জোনাকি পোকারা উড়িয়া এ ডাল ও ডাল করিতেছে, যেন শত শত মাণিক্য এক স্থানে একত্র হইয়াছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলা ঘেউ ঘেউ করিতেছে। আকাশে নক্ষত্রগণের প্রভা কমিয়া গেল, কেহ কেহ অদৃশ্য হইল। যে মনোরমা অন্য সময় গভীর রজনীতে নিদ্রাভঙ্গের পর আপনাদের গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় বসিয়া চন্দ্র দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিত; উন্মুক্ত বায়ু সুগন্ধ বহন করিয়া যে মনোরমার সেবা করিত আজ সে কারাগারে। মনোরমার কারাগৃহের গবাক্ষ দিয়া চন্দ্রালোক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মনোরমা সেই আলোর সাহায্যে দেখিল কারা-

গারের দেয়ালগুলি, ঘরের কোণে একটা মাটির ভাঁড় ও একখানা পিতলের থাল, এবং তাহার বিছানাটী কেবল কতকগুলি বিচালিমাত্র।

মনোরমা জানালার কাছে বসিয়া চাঁদ দেখিতে লাগিল, দেখিল চাঁদখানি যেন বেগে ছুটিয়া যাইতেছে, যাইতে যাইতে চাঁদ মনোরমাকে পরিহাস করিবার জন্যই যেন কখনও বা মেঘের ভিতর লুকাইতেছে, আবার মেঘের আর এক দিক দিয়া মুখ বাড়াইতেছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে মনোরমাও কখন দুঃখিত ও কখন উল্লাসিত হইতে লাগিল। সে বাল্যকাল হইতে চাঁদ দেখিতে ভালবাসিত সেই জন্য চাঁদ দেখিতে পাইয়া তাহার কারাক্লেশের অৰ্দ্ধেক বিস্মৃত হইয়া গেল। সে আপনাপনি কহিল "সুধাকর! আমি যেমন তোমায় ভালবাসি তুমিও কি আমায় সেইরূপ ভালবাস। তোমার ভালবাসা আমি বুঝিতেছি, না হইলে এই নির্জ্জন কারাগারে আসিয়া তুমি আমায় এত সুখী করিতে না। তোমায় আজ এত মলিন দেখিতেছি কেন, তুমিও কি আমার দুঃখ দেখিয়া, আমায় বন্দিনী দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছ? আমি যে এই দশায় পড়িয়া এইরূপ ভাবে তোমায় দেখিব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুমি কি বলিতে পার আমার পিতা এখন কোথায় আছেন; তিনি নিদ্রিত না জাগ্রত? তিনিও কি আমার ন্যায় বিলাপ করিতেছেন? ইচ্ছা হইতেছে এখন তাঁহাকে একবার দেখি। চাঁদ! আমার পিতাকে একবার বল আমি তাঁহার জন্য কত ব্যাকুলিত হইয়াছি।"

মনোরমা এইরূপ বলিতে বলিতে হঠাৎ একটী সুন্দর গন্ধ পাইল। একি কোথা হইতে এ গন্ধ আসিতেছে। অনেকক্ষণ পরে সে দেখিল সকালে বাড়ীতে সে যে যুঁইফুল গুলি তুলিয়া কাপড়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এ তাহারই গন্ধ। মনোরমার কাছে আজ জড়বস্তুগুলি যেন চেতন হইল। তাহারা যেন শুনিতে পায়, সে এইভাবে কথা কহিল, বলিল,—"তোমরা এখন আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমরাত কোন দোষ কর নি যে কারাগারে আসিবে। তবে কি তোমরা আমায় এত ভালবাস, যে আমার সহিত কারাবাস যাতনা ভোগ করিতেছ। হায় যখন আমি আজ সকালে এই ফুলগুলি তুলিয়াছিলাম তখন কে ভাবিয়াছিল যে অদ্য রাত্রে আমার এই দশা ঘটিবে! যখন রাজকুমারী হেমলতার জন্য মনের মত ফুল দিয়া সাজি সাজাইয়াছিলাম তখন কে মনে করিয়াছিল আজ আমার হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে। বাবা যে সর্ব্বদা বলিতেন পৃথিবীর সমস্তই অলীক ও ক্ষণস্থায়ী, কেবল ঈশ্বরই সত্য, তাহা ঠিক কথা, তখন কথাটী বুঝিতে পারিতাম না—এখন বেশ বুঝিতেছি।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার সে কাঁদিতে লাগিল। খানিকক্ষণ বালিকাসুলভ ক্রন্দন করিয়া কতকটা স্থির হইল। সে বাল্যকাল হইতে পিতার কাছে শিখিয়াছিল, যে বিপদে পড়িলে হরিকে ডাকিতে হয়, তাহা হইলে হরি বিপদ ভঞ্জন করিয়া দেন। তাই আজ মনোরমা ক্ষণে ক্ষণে কেবল ঈশ্বরকেই ডাকিতে লাগিল। কত কি বলিয়া ডাকিল তাহার ঠিকানাও নাই—নিয়মও নাই কেবল সরলভাবে বালক ধ্রুবের মত হরিকে ডাকিল। কখনও বা পিতার কথা ভাবিয়া নয়ন জলে আপনার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল।

এই সময়ে একখানি কাল মেঘে চাঁদটী ঢাকিয়া ফেলিল। মনোরমা আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার যে টুকু আনন্দের ভাব

উদিত হইয়াছিল তাহাও নিভিয়া গেল। সে ভাবিল চাঁদ যেমন মেঘের নীচে চিরদিন ঢাকিয়া থাকিবে না নির্দ্দোষীর প্রতি মিথ্যা অপবাদও সেইরূপ অধিক দিন থাকিবে না। দয়াময় হরি অসত্যের আঁধারে সত্যকে আবৃত রাখেন না, পিতার এই কথাটীও ঠিক। আমি যে নির্দ্দোষী নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তাহা প্রকাশ হইবে এই চিন্তায় সে মনে বল পাইল।

এইরূপ বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে মনোরমা আবার ঘুমাইয়া পড়িল, আহা তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে কত সহ্য হইবে! জগদীশ্বর আর তাহার কষ্ট দেখিতে পারিলেন না। দুঃখহারিণী নিদ্রাকে তাই বালিকার সান্ত্বনার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মনোরমা প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে একস্বপ্ন দেখিল যে, সে যেন কোন অভিনব ও রম্য উদ্যানে চাঁদের আলোকে বেড়াইতেছে। বাগানের শোভার কথা বর্ণনা করা যায় না, মনোরমাও এত উজ্জ্বল চাঁদও দেখে নাই। তাহার পিতা সেই বাগানে বেড়াইতেছেন। সে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে—পিতার চরণে পড়িল। পিতা তাহাকে আদর করিয়া তুলিলেন, আর অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখে নয়নজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত—

ধ্রুবোপাখ্যান।

অতি প্রাচীন কালে এ দেশে উত্তান পাদ নামে এক রাজা ছিলেন। সুনীতি ও সুরুচি নামে তাঁহার দুই রাণী ছিল। বহু বিবাহের জঘন্য প্রথা এখনও এদেশে প্রচলিত আছে। সুনীতি অতি ধর্ম্ম পরায়ণা, পতিব্রতা, ক্ষমাবতী, বিনয়ী,ও সকল গুণবিশিষ্টা; স্ত্রীলোকের যত গুণ থাকিতে হয় সুনীতির তাহা ছিল। সুরুচি অহঙ্কৃত, হিংসুক, উদ্ধত স্বভাব, রাগী, কর্কশ ভাষিনী এবং অভিমানিনী ছিলেন। সুরুচি সুনীতিকে ভাল বাসিতেন না ও তাঁহাকে অতিশয় হিংসা করিতেন;—ও সর্ব্বদাই সুনীতির নামে রাজার কাছে দোষ গাইতেন। কিছুদিন পরে অল্প বুদ্ধি রাজা সুরুচির বশীভূত হইয়া সুনীতিকে অরণ্যে পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে নরপতি উত্তান পাদের মহিষী সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সুনীতি সেই প্রাণ ধন ধ্রুবকে দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া অরণ্য মধ্যে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যখন সুনীতি দুঃখ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, তখন ধ্রুব আসিয়া মা, মা, বলিয়া কোলে বসিয়া আধ আধ বাক্যে খেলিবার ঘটনা গুলির পরিচয় দিতেন; সুনীতি বালকের আধ আধ বচনে সকল দুঃখ ভুলিয়া তাহাকে কোলে লইতেন। ধ্রুব পাঁচ বৎসরের হইল। একদিন ধ্রুব ঋষি-কুমারদের সহিত খেলা করিতেছেন এমন সময় একটী বালক বলিল, ভাই ধ্রুব! তুমি উলঙ্গ হইয়া খেলা করিতে আসিয়াছ, আমরা তোমায়

লইয়া খেলিব না; কাপড় পরিয়া এস তবে তুমি খেলিতে পাইবে। তখন বালক বিষণ্ণ বদনে দুঃখিনী জননীর নিকট গিয়া কহিল;—"মা! আমার কাপড় নাই বলিয়া কুমারগণ আমার সহিত খেলা করিবে না, আমার কাপড় দেও।"

সুনীতি আপনার কাপড় হইতে একটু ছিঁড়িয়া দিলেন, সেই কাপড় লইয়া ধ্রুব মাথায় বাঁধিয়া খেলিবার স্থলে গেলেন। ঋষিকুমারগণ দেখিবামাত্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বোকা ছেলে কাপড় কি মাথায় বাঁধে? তখন তাহাদের মধ্যে একজন বলিল এস ধ্রুব আমি তোমায় কাপড় পরাইয়া দি। এই বলিয়া সেই ছেড়া নেক্‌ড়া খানি পরাইতে গিয়া দেখিল সেখানি এত ছোট যে কোন মতে পরান যায় না। সে ধ্রুবকে বলিল, ধ্রুব ইহা অপেক্ষা বড় কাপড় লইয়া আইস। ধ্রুব ছুটিয়া গিয়া বলিল মা, আমায় বড় কাপড় দেও। দুঃখিনী মাতা নিজ কাপড়ের আর একটু ছিঁড়িয়া দিলেন। ধ্রুবও কাপড় লইয়া বালকদিগের নিকটে গেলেন। বালকেরা বলিল তুমি রাজার পুত্র হইয়া কাপড় পরিতে পাওনা; ধ্রুব বলিল ভাই আমার কি পিতা আছেন? আমি ত মা বই কিছুই জানি না। তাহারা বলিল মহারাজ উত্তান পাদ তোমার পিতা; চল তোমার পিতার কাছে যাই তাহা হইলে তিনি উত্তম বসন দিবেন। এই বলিয়া বালকগণ ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজ বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন মহারাজ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। ধ্রুবের সুন্দর মুখ খানি দেখিবামাত্র রাজারও মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি মনে ভাবিলেন আমি অবিচারে যে শিশু সন্তান সহিত সুনীতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম এই সেই বালক। আমার অঙ্গ সৌষ্ঠব বালকের মধ্যে অনেক আছে। ইহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে এই সেই সুনীতির পুত্র। এই মনে ভাবিয়া মহারাজ ধ্রুবকে স্নেহ ভরে কোলে করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিলেন। ধ্রুবও পিতার কোলে উঠিতে গেলেন। এমন সময়ে হিংসুক সুরুচি আসিয়া রাগভরে ধ্রুবকে বলিলেন; "অবোধ বালক তুমি অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত হইয়া এ বৃথা উচ্চ মনোরথ করিতেছ কেন? আমার উদরে তুমি জন্ম গ্রহণ না করিয়া তোমার এই বৃথা উচ্চ আশা করা তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তুমি নিতান্তই অবোধ বলিয়া অতি দুর্ল্ভ বিষয়ে আশা করিতেছ; তুমি কি জান না যে সুনীতির উদরে তোমার জন্ম। সত্য বটে তুমি রাজার পুত্র কিন্তু আমি ত তোমায় গর্ভে ধরি নাই। আমার পুত্রের ন্যায় তোমার এরূপ বৃথা আশা কেন।" বিমাতার এই প্রকার হৃদয়-ভেদী কর্কশ বাক্য শুনিয়া তাহার কোমল হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিদ্ধ হইল। ধ্রুব তৎক্ষণাৎ অধোবদনে তথা হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে সুনীতি পুত্রের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় চঞ্চলা হইলেন। এমন সময় ধ্রুবকে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতে দেখিয়া সুনীতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস আজ তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? কেনই বা অভিমান ও রাগ ভরে আসিলে? কে তোমায় অপমান করিয়াছে? কে তোমায় অনাদর করিয়াছে?" তখন ধ্রুব অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই বর্ণনা করিল। অনন্তর ম্লানবদনা দুঃখিত-হৃদয়া সুনীতি উপদেশ বাক্যে পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন; "বাপধন! কাঁদিওনা এ পৃথিবীতে মানুষ নিজ কার্য্যের গুণে বড় হয়। যদি বিমাতার কথায় বড় ক্লেশ পাইয়া

থাক তবে পুণ্য লাভ করিবার জন্য যত্ন কর; পুণ্য লাভ করিলে সকল ফল লাভ করিবে।" ধ্রুব জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আমাদের দুঃখ কে নিবারণ করিবে;" সুরুচি বলিলেন—"বাছা! সর্ব্বদুঃখ হারী ভগবান আমাদের দুঃখ দূর করিবেন।" পুত্র জিজ্ঞাসা করিল "ভগবানকে কোথায় পাইব?" জননী বলিলেন "তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। যেখানে গিয়া ডাক পাইবে।" এই কথা বলিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে বড় ভয় হইল কি জানি অভিমানে বালক কি করিয়া বসে। এই মনে করিয়া জননী আবার বলিলেন "বাছা! তিনি অরণ্য মধ্যে থাকেন সেখানে কেহ যাইতে পারে না, সে স্থান মনুষ্যের অগম্য।" এই বলিয়া দুঃখিনী সুনীতি পুত্র কোলে করিয়া রজনীতে শয়ন করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে সুনীতি নিদ্রাভিভূতা হইলেন। ধ্রুব সেই অবসরে উঠিলেন, উঠিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন ও দুঃখিনী মাতাকে না জাগাইয়া কুটীর হইতে নিবিড় বনে গমন করিলেন। অরণ্যে গিয়া ধ্রুব কোথায় দুঃখহারী পরমেশ্বর দেখা দেও, বলিয়া চীৎকার করিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। এক একবার ঝড় উঠিতেছে আর ধ্রুব মনে করিতেছেন এই বুঝি আমার হরি। পুরাণে কথিত আছে বালক ধ্রুব সরল প্রাণে অরণ্য মধ্যে এইরূপ বলিতেছেন। হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার কাছে আসিয়া তাহার সরলতা দেখিয়া তাহাদের স্বভাব ভুলিয়া কিছু বলিতেছে না। এদিকে সুনীতি নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহার প্রাণের ধ্রুব কাছে নাই দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। ধ্রুব ধ্রুব করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে ধ্রুব কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে নারদমুনি আসিয়া তাঁহার নিকট দেখা দিলেন। তিনি আসিবামাত্র ধ্রুব তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন "ধ্রুব আমরা এতদিন ধরিয়া তপস্যা করিলাম, আমরা যাঁহাকে পাইলাম না তুমি সামান্য বালক হইয়া তাঁহাকে কিরূপে পাইবে? বৎস! যাহা সিদ্ধ হইবার নয় তুমি সে আশা ত্যাগ কর; তোমার দুঃখিনী মাতার নিকট যাও।" ধ্রুব বলিলেন "প্রভু আমি হরিকে না পাইলে ত গৃহে যাইব না।"

নারদ বলিলেন "তুমি দ্বাদশ বৎসর তপস্যা কর তবে হরিকে পাইবে।" একদিন তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণের হরি তাহাকে দেখা দিলেন। বালকের এত আনন্দ হইল যে তিনি বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন "বৎস ধ্রুব! তোমার প্রার্থনায় আমি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বরদান করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" বালক দয়াময়ের এই কথা শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া বলিলেন "প্রভু! আমি আর কিছুই চাই না আমার প্রার্থনায় তুমি যদি পরিতুষ্ট হইয়াছ তাহা হইলে আমি ইচ্ছানুসারে তোমার স্তব করিতে পারি ঈদৃশ বরদান কর। কারণ পণ্ডিতেরাও তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই আর আমি সামান্য বালক হইয়া স্তব করিতে কি করিয়া সমর্থ হইব। হে পরমেশ্বর! আমি যাহাতে তোমার ভক্ত হইতে পারি ও তোমার শ্রীচরণ পূজা করিতে পারি এইরূপ বর প্রদান কর।" দয়াময় ঈশ্বর সদয় হইয়া বলিলেন "বৎস তুমি নয়ন খুলিয়া আমায় বাহিরেও দেখ।" তিনি বলিলেন "না প্রভু আমার ভয় হইতেছে চক্ষু খুলিলে আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না। আমি অনেক

দুঃখে তোমায় পাইয়াছি আর ছাড়িতে পারিব না।" হরি যখন দেখিলেন বালক কিছুতেই চক্ষু খুলিল নাতখন তিনি আপনার রূপ লুকাইলেন। ধ্রুব চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া প্রভো কোথায় গেলে বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে নয়ন খুলিয়া দেখেন বাহিরেও হরি বিরাজমান।—

দয়াময় হরি বলিলেন "ধ্রুব তুমি কি চাও", ধ্রুব বলিলেন "প্রভো আমি আর কিছুই চাই না, আমি যখন মনে করিব তখন যেন তোমায় দেখিতে পাই।" ভক্ত বৎসল হরি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ধ্রুব আবার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার স্মরণ করিলেন। তিনি আবির্ভাব হইয়া বলিলেন বৎস, "আমায় আবার কেন ডাকিলে?" তিনি বলিলেন "আমি যে মার নিকট যাইতেছি মা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন 'কৈ বাছা কি পাইয়াছ' আমি তখন কি বলিব? আমার মাকে তোমার দেখা দিতে হইবে।" তিনি কহিলেন "বাছা! তুমি কঠোর তপস্যা করিয়া আমায় পাইয়াছ, সুনীতি আমায় কিছুই সাধনা করেন নাই। আমি কি করিয়া তাঁহাকে দেখা দিব!" ধ্রুব বলিলেন "না প্রভু তাহা কখনই হইবে না, আমার মাকে দেখা দিতে হইবে।" তিনি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ধ্রুব প্রথমেই রাজবাটীতে গমন করিলেন, তথায় গিয়া প্রথমে বিমাতার চরণে প্রণাম করিলেন; সুরুচি তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার দোষ মনে করিয়া ধ্রুবের মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপ ধ্রুব! আমি নিতান্ত পাপীয়সী ও নিষ্ঠুরা, আমি তোমার কোমল হৃদয়ে অনেক কষ্ট দিয়াছি। ধ্রুব বলিলেন মা তোমার কিছুই দোষ নাই, তোমার জন্যই আমি হরি পাইয়াছি।

ধ্রুব পিতার চরণে প্রণাম করিলেন, মহারাজ বিলাপ করিয়া কহিলেন ধ্রুব! হায় আমি কি পাপিষ্ঠ! হায় কি নরাধম! কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা শান্ত হইয়া সুনীতিকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। সুনীতি রাজসদনে আসিয়া পাগলিনী প্রায় হইয়া কহিলেন আমার হারানধন ধ্রুব কোথায়! আয় বাপ কোলে আয়! মা বলিয়া ডেকে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। সুনীতি পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন তবে বাছা তোমার দয়াময় হরিকে দেখাও। ধ্রুব ভগবানের স্তব করিবামাত্র মাতারও জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল। তিনিও সেই দয়াময় হরিকে অন্তরে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সতীশ সকলের অপ্রিয় কেন?

সতীশের বাপ মা বড়লোক, সতীশ তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। কিন্তু বড় মানুষের ঘরে একটী মাত্র ছেলে থাকিলে তাহার যেরূপ আদর হয় সতীশ সেরূপ আদুরে ছেলে ছিলেন না। পিতা মাতা যে ছেলেকে আদর করেন না, অন্যলোকে স্বভাবতঃই তাহাকে যত্ন করে না, সুতরাং সতীশ সকলেরই অপ্রিয়। বড়মানুষের ঘরে খাইবার অভাব নাই, পরিবার অভাব

নাই, দাস দাসীর অভাব নাই। সতীশ যখন যাহা চাহিতেন তখনই তাহা পাইতে পারিতেন। কিন্তু সতীশের একটী রোগ ছিল, তিনি খাওয়া পরাতে বড় একটা মন দিতে পার্‌তেন না, অন্যান্য বড়লোকের ছেলেদের ন্যায় দাস দাসীকে কর্কশ কথা কহিতে জানিতেন না, সাজ গোজ করিয়া বড় মানুষের ন্যায় চলিতে ফিরিতে ভাল বাসিতেন না। সতীশের মা সতীশকে ভাল ভাল খাবার দিতেন, সতীশ আপনি অল্প কিছু খাইয়া পাড়ার গরিব ছেলেদের জন্য অবশিষ্ট লইয়া যাইতেন।

সতীশের মা সতীশকে নানা প্রকার বহুমূল্য পোষাক কিনিয়া দিতেন, সতীশ সামান্য ধুতি চাদর জামা পরিয়া বেড়াইতেন এবং কখনো কখনো সেই সামান্য ধুতি জামাও রাস্তার গরিব বালককে দিয়া চাদর পরিয়া ঘরে আসিতেন।

সতীশের মা কাছে বসিয়া এটা খা, ওটা খা, আর একটু দিই ইত্যাদি স্নেহের কথায় সতীশকে ভাল ভাল সামগ্রী খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেন, সতীশ এর একটু তার একটু মুখে দিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতেন। সতীশের মা চটে লাল। তিনি কখনো রাগ করিয়া সতীশকে গালাগালি করিতেন, সতীশ নীরবে চলিয়া যাইতেন। সতীশের মা যদি কখনো দুঃখ করিয়া বলিতেন "হারে হতভাগা, তোর এমন দশা কেন হলো, তুই কারুর চাকুরী করিস্‌নে, কোন ভাবনা নাই চিন্তা নাই, তবে কেন দুটী খাইবার সময় অমন চঞ্চল হয়ে চলে যাস্?" সতীশ প্রায়ই মাতার কথায় কোন উত্তর করিতেন না, তবে মাতার ক্লেশ নিবারণের জন্য বলিতেন, "মা, তোমরা ঘরে থাক, কোথায় কি হইতেছে কোন সংবাদ রাখ না, আমরা দশ যায়গায় যাই, লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রাণে বড় ক্লেশ পাই। অনেক দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের পাড়ার নবীনদের কি কষ্টেই দিন যাইতেছে! নবীন, গোপাল দুইটী ছেলেকে লইয়া নবীনের মা বেচারী কত দুঃখেই দিন কাটাইতেছেন। মা, আমি প্রায়ই দেখি তাঁদের দুবেলা সমানে দুটী ভাত জোটে না। হায়! লোকের শুধু দুটী ভাত জোটে না আর আমরা কত ভাল ভাল খাবার ফেলিয়া ছড়িয়া নষ্ট করি।" এইরূপ বলিতে বলিতে সতীশের মুখ লাল হইত ও চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। সতীশের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াও কিন্তু সতীশের মা সুখী হইতেন না। বালক সতীশের আর একটী দোষ ছিল, তিনি মাছ মাংস খাইতে চাহিতেন না। সতীশের বাবা নিজে মাছ মাংস খাইতে ভাল বাসিতেন। এমন কি অন্যে না খাইলে তাহাকে নানা উপদেশ দিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ভাবিলেন, সতীশ আজ কালকার নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী বাবুদের কথা শুনিয়াই বা এইরূপ করে। তিনি সতীশকে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, অধিক কি প্রহার করিয়া দেখিলেন, কিছুতেই সতীশের মত ফিরাইতে পারিলেন না। অবশেষে যখন মিষ্টিকথায় সতীশের বাবা সতীশের মৎস্য মাংসের প্রতি ঘৃণার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশ তখন মুখ খানি মলিন করিয়া বলিলেন, "মাছ মাংস খাইতে আমার ক্লেশ হয়, প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করে, মাছ মাংস খাইয়া কখনও আমার সুখ হয় না।"

সতীশের বাবা সতীশকে বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে বলিতেন, সতীশ পাড়ার যত সব গরিবলোক, "ছোটলোকের" ছেলেদের

সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের নানা উপকার করিতেন। সতীশের এইরূপ স্বভাব দেখিয়া দিন দিনই তাঁহার বাপ মা বিরক্ত হইতে লাগিলেন, বংশের কলঙ্ক স্বরূপ মনে করিয়া সতীশের বাবা সতীশের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ ও উদাসীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সতীশকে যে ভাবে মানুষ করিবেন ভাবিয়াছিলেন সতীশ সেরূপ হইতে পারিল না, সতীশের প্রকৃতিই সেরূপ নহে। সতীশের চলন ফেরন, সাজগোজ সকলই সামান্য লোকের ন্যায়। পাড়ার মধ্যে সতীশের বাবা ধনে মানে সকলের চেয়ে বড়লোক, সুতরাং সতীশের এইরূপ ব্যবহারে পাড়ার স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই সতীশের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়রে, সতীশ ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গেল।" ক্রমে সতীশের যত বয়স বাড়িতে লাগিল তত আরো অনেক দোষ বাহির হইতে লাগিল। খুব ভোরে উঠিয়া সতীশের একটু বেড়াইবার অভ্যাস ছিল, স্কুলের ছুটীর পরে কিছু খাইয়া ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিবার নিয়ম ছিল। পাড়ার কুড়ে ছেলেদিগকে সতীশ ভোরে যাইয়া জাগাইতেন এবং সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। স্কুলের পরে তাস ইত্যাদি কুড়ে খেলায় যে সকল বালক সময় নষ্ট করিত সতীশ তাহাদিগকে লইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলিতেন। সতীশের এইরূপ আচরণে কিন্তু পাড়ার লোক চটিয়া উঠিল। "সতীশটা নিজে বয়ে গেছে, পাড়ার ছেলে গুলিরও পরকাল খাইবে" এইরূপ অপবাদ দিয়া পাড়ার অভিভাবকগণ ছেলেদিগকে সতীশের সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে কি পিতা মাতা, কি প্রতিবাসিগণ কাহারো নিকটে সতীশের আদর নাই। কেবল একজন লোক ছিলেন যাঁহার নিকটে সতীশের অনেক আবদার খাটিত, কেবল একটী স্থান ছিল যেখানে সতীশের অনেক আদর ছিল। সে লোকটী সতীশের স্কুলের মাষ্টার, সে স্থানটী সতীশের স্কুল। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে যাইয়াই সতীশ স্কুলে উপস্থিত হইতেন। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে ছেলেরা প্রায়ই স্কুল কম্পাউণ্ডের চারিদিকে খেলা করে। এই খেলায় অনেক সময়ে রক্তপাতও হইয়া থাকে। কিন্তু সতীশের কাছে কখনো অন্যায় হইবার যো ছিল না, সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিবে ইহা সতীশ কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক সময়ে সতীশকে দুর্ব্বল ছেলেদের পক্ষে মারামারি করিতে হইত। অত্যাচারী দুষ্ট ছেলেরা সর্ব্বদাই সতীশের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইত, এবং অকারণেও শিক্ষকের নিকটে সতীশকে অপদস্থ করিতে ছাড়িত না। দুষ্ট ছেলেদের স্বভাব এত নীচ যে, তাহারা ক্লাশে বসিয়া এক জন অন্যকে চিম্‌টি কাটিতেছে, আর ছাইমাটি লইয়া সর্ব্বদা ঝগড়া করিয়া শিক্ষককে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। অথচ দোষ করিয়া শিক্ষকের নিকটে স্বীকার করিবার সাহস নাই কাজেই একটী দোষ ঢাকিতে দশটী মিথ্যা কথা বলিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। কিন্তু সতীশের স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। সত্য কথা বলাই সতীশের স্বভাব ছিল, দোষ করিয়া স্বীকার করাই তাঁর অভ্যাস ছিল, এবং সমপাঠী বালকগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা তাঁহার আনন্দ ছিল। সমপাঠী বালকগণের মধ্যে অনেকেই, তিনি সত্যকথা কন বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মাষ্টারের নিকটে সকল কথা বলিয়া ফেলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিল এবং অনেক সময়ে তাঁহার নামে

মিথ্যা অপবাদ দিত, কিন্তু তিনি কিছুই করিতেন না এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া চলিতেন।

পূজার ছুটী হইল। সতীশের বাপ মা পশ্চিম বেড়াইতে যাইবেন, সতীশকেও কাজেই পিতা মাতার সঙ্গে যাইতে হইল। পূজার সময়ে হাবড়ার ষ্টেসনে বড় ভিড়। টিকেট মাষ্টারের বাক্সের সম্মুখে গায় গায় ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া লোক দাঁড়াইয়াছে, জোর যার আমল তার। সবল লোক দুর্ব্বল লোককে পেছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া আগে টিকেট লইতেছে। যাহাদের পয়সা আছে এবং ঘুশ দিতে বিবেকে বাধিতেছে না তাহারা আগে টিকেট পাইবার আশায় সম্মুখস্থ পাগ্‌ড়ীধারী চাপরাসী মহাশয়দিগকে দুই চারি পয়সা জলপানি দিয়া কাজ সারিয়া লইতেছে। সতীশদের টিকেট লইবার জন্য বাড়ীর গোমস্তা ভিড়ের মধ্যে গিয়াছে, সতীশ ষ্টেসনের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন। টিকেট মাষ্টারের ডান দিকে চাপ্‌রাসী দুই জন দাঁড়াইয়া আছে, কোন ভিড় নাই, যাহারা চাপ্‌রাসী ভায়াদের খুসী করিতেছে তাহাদিগকেই টিকেট মাষ্টারের সম্মুখে সহজে যাইতে দিতেছে, বামদিকে বড় ভিড়। একজনের পরে আর একজনকে যাইতে হইতেছে, এদিকে রেল ছাড়িবারও সময় হইল। একটী স্ত্রীলোক, বোধ হয় তাহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না, কোননগর ষ্টেসন পর্য্যন্ত টিকেট করিবে, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেচারী চাপরাসীদের নিকট দিয়া টিকেট মাষ্টারের নিকটে যাইতেছিল। চাপরাসীগণ বোধ হয় স্ত্রীলোকের নিকটে পয়সা চাহিয়া থকিবে। কিন্তু চাহিলে কি হইবে স্ত্রীলোকটী শুদ্ধ রেলভাড়ার পয়সা কয়েকগণ্ডা আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীলোক চাপ্‌রাসীর নিকটে হাত জোড় করিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল, চাপরাসীদের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, দুই তিন বার চাপরাসীগণ তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহিরে আনিল। সতীশ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, আর সহ্য হইল না, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, সতীশ চাপরাসীগণকে বলিলেন, "ইহাকে যাইতে দেও" চাপরাসীগণ হাসিতে হাসিতে বলিল "দেব না," সতীশ বিরক্ত হইয়াও গম্ভীরস্বরে বলিলেন, ভালচাও ত ছাড়িয়া দাও, অমনি চাপরাসীদের একজনে তাঁহার হাত ধরিবার উপক্রম করিল। সতীশ আত্মরক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন ও সজোরে ঐ ব্যক্তির মুখে একটী ঘুষি মারিলেন। চাপরাসী বুঝিল,বালক বলিয়া যাহাকে উপহাস করিয়াছিল সে বালক সামান্য বালক নয়। "পুলিস" "পুলিস" রব উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে পুলিস সবইন্‌স্পেক্টর ষ্টেসন মাষ্টার প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশের বাবাও ষ্টেসনের ভিতরে ছিলেন, তিনিও আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সতীশকে ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, সতীশ বীরেরন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সতীশের বাবা চাপরাসীদের অত্যাচার ও সতীশের প্রতি আক্রমণের কথা বলিয়া সতীশকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সতীশ ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ষ্টেসন মাষ্টার ইংরাজ। সতীসের সত্য কথায়ও সাহসে খুসী হইয়া সতীশকে ধন্যবাদ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

এই সকল কারণেই সতীশের বাপমা সতীশের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, সতীশের এইরূপ আচরণ দেখিয়াই সতীশের প্রতিবাসিবর্গ সতীশকে "দুরন্ত জেঠা ছেলে" ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি করি-

তেন। কিন্তু সতীশের শিক্ষক এই সকল গুণ দেখিয়াই সতীশকে ভাল বাসিতেন। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা সতীশের বিষয় কি বল?

মশা।

আমরা ছেলে বেলা মশার বাসা খুজিতে যাইতাম। ঢেকী গাছে মশা বাসা করে এই আমাদের বিশ্বাস ছিল। লাল রঙের এক প্রকার বড় পিপড়ে যেমন গাছের পাতা দিয়া বাসা প্রস্তুত করে, ঢেকী গাছে সেই রূপ অতি ক্ষুদ্র বাসা পাওয়া যায়। এ গুলি কিসের বাসা তাহা আমি আজিও জানিতে পারি নাই, কিন্তু আমার ছেলে বেলা এই সংস্কার ছিল যে এ গুলি মশার বাসা বই আর কিছুই নহে। বাস্তবিক এই সকল বাসার প্রায় প্রত্যেকটাতে এক একটা করিয়া মশা পাওয়া যায়।

যে সকল মশা আমাদের রক্ত খাইতে আইসে তাহারা সকলেই স্ত্রী মশা। পুরুষ মশা নিরীহ লোক; সে ফুলের মধু খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষের মুখের গঠনেরও কতকটা তফাৎ আছে।

ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী মশা উপযুক্ত একটা জলাশয় খুজিয়া লয়। নির্জ্জন পুকুরগুলি এই কার্য্যের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু তিন চারিদিন ধরিয়া ঝী যে জলের হাঁড়ি ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়াছে, তাহার খোজ পাইলেও মশার মা নিতান্ত দুঃখিত হইবে না। একেবারে

অনেক গুলি ডিম পাড়া হইবে। পেছনের দুই খানি পায়ের সাহায্যে ডিম গুলিকে একত্র করিয়া একটা ক্ষুদ্র নৌকার আকারে (১নং) সাজান হইবে; এই নৌকাটা জলে ছাড়িয়া দিলেই সে ভাসিতে থাকিবে। ডিমের সরু দিকটা উপরে থাকে,

সুতরাং কিরূপে নৌকার আকার হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। উপযুক্ত সময় হইলেই ডিম ফুটিয়া মশার ছানা বাহির হয়। এই সময়ে এ গুলিকে দেখিলে কেহই মনে করিতে পারে না যে, ইহারাই কালে মশা হইয়া মানুষ খাইতে আসিবে। তোমরা নিশ্চয়ই গরমির দিনে স্থির জলে মশার ছানা গুলিকে তিড়িং তিড়িং করিয়া নাচিতে দেখিয়াছ; কিন্তু তাহাদিগকে চিনিতে

পার নাই। ছবিতে যে কতকটা শুঁয়ো পোকার ন্যায় একটা চেহারা (২নং) আঁকা হইয়াছে,তাহাই মশার ছানা। ডিম হইতে বাহির হইয়া ইহারা জলে খেলা করিতে থাকে। ঝী অনেক সময় না দেখিয়া খাবার জলের সহিত গেলাসে করিয়া যে কতগুলি পোকা আনিয়া দেয় তাহা এই মশার ছানা। ইহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র ল্যাজের কাছে। নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় ল্যাজের অগ্রভাগটী জলের উপরে ভাসাইয়া দিয়া ঝুলিতে থাকে। চোয়ালে এক প্রকার লোম আছে,সেই লোমগুলি কেমন করিয়া যেন জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত প্রস্তুত করে। সেই আবর্ত্তে ঘুরিয়া নানা রকমের খাদ্যাখাদ্য আসিয়া মুখের ভিতর পড়ে। মশার ছানা এই উপায়ে জীবন ধারণ করে।

তিনবার চর্ম্ম পরিবর্ত্তনের পর ইহার আর এক প্রকারের আকার(৩নং)ধারণ করে,তাহাতে মশার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি মোটামুটি সকলই বর্ত্তমান থাকে। কিছুকাল পরে পূর্ণাবয়ব মশা(৪,৫নং)ইহার ভিতর হইতে বাহির হয়। খোলসটা জলের উপর ভাসিতে থাকে; মশা তাহারই উপর বসিয়া উড়িবার জন্য যথেষ্ট বল লাভের অপেক্ষা করে। অল্পক্ষণ রোদ বাতাস লাগিলেই তাহার হাত পা শক্ত হয়। তখন সে শূন্যে উড়িয়া অপরাপর সঙ্গীদের সহিত খেলা করে।

মশাগুলি বড় লোভী। গায় বসিবামাত্রই যদি তাহাকে তাড়াইয়া না দেও তবে সে আস্তে আস্তে শুড়টী চামড়ার ভিতর ঢুকাইয়া দিবে। রক্ত খাইতে খাইতে সে এতই আরাম পায় যে শেষে আর তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না—আমরা এত খাইলে বোধ হয় খবরের কাগজ ওয়ালারা এত দিন আমাদের নাম ছাপিয়া দিত। যখন গায় বসে, তখন দেখিবে যে, তাহার শরীরটী ছুঁচের অগ্রভাগের ন্যায় সরু। ক্ষুধায় তাহার এই দশা হইয়াছে; কিন্তু কিছু কাল তাহাকে খাইতে দাও, দেখিবে শীঘ্রই সে ফুলিয়া উঠিবে, তাহার পেটটী লাল হইয়া আসিবে। এই সময়ে তাহার দুই পাশে আঙুল দিয়া চাপিয়া সেই স্থানের চামড়া টান করিয়া ধরিলেই সে আট্‌কিয়া পড়ে। শুঁড়টী ঢুকাইবার জন্য যে ফুটো করিতে হইয়াছিল চামড়া টান করিয়া ধরিলে সেই ফুটো সরু হইয়া যায়। সুতরাং শুঁড় আর বাহির হইতে পারে না। রাত্রিকালে মশারির ভিতর দুই একটী মশা যোগাড় যন্ত্র করিয়া প্রায়ই ঢুকিয়া যায়। সকাল বেলা আর তাহারা উদর লইয়া চলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় অনেক মশাকে ধরিয়া টিপিয়া মারা গিয়াছে।

একটী গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। গল্পটী বোধ হয় সত্য নহে, কিন্তু ইহাতে মজা আছে। কতকগুলি আইরিস সাহেব একবার এদেশে আসিয়া ছিলেন। তাঁহারা কখনও মশা দেখেন নাই, সুতরাং প্রথমে মশারি কিনেন নাই। রাত্রিতে শুইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের কাণ্ড কারখানা অন্য রকম। অনেক ধমকাইলেন, অনেক বার হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভয় দেখাইলেন, দাঁত খিচাইলেন কিন্তু মশারা কোন মতেই ভয় পাইল না। অবশেষে লেপদ্বারা সর্ব্ব শরীর ঢাকিয়া কিয়ৎ কালের জন্য নিরাপদ হইলেন। কিছুকাল পরে একজন লেপের এক কোণ সরাইয়া দেখিলেন যে ঘরের ভিতর একটা জোনাকী পোকা আসিয়াছে। দেখিয়াই তিনি "চ্যাচাইয়া উঠিলেন" ওরে আর রক্ষা নাই। লেপ মুড়ি দিয়া কি করিবে? ঐ দেখ জানোয়ার গুলির একটা লণ্ঠন লইয়া আমাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে!"

অক্টোবর, ১৮৮৬।

পরলোক-গত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! পূজার সময় সমুদায় বঙ্গদেশের লোক যখন আমোদ কোলাহলে মত্ত ছিল, তখন আমাদের দেশের একটী রত্ন আমরা হারাইয়াছি! আমরা গত দুই বৎসরের মধ্যে তোমাদিগকে কত দুঃখের সংবাদই দিলাম। যাঁহারা দেশের মুখশ্রী স্বরূপ ছিলেন, এরূপ এত লোক যে এত অল্প সময়ের মধ্যে হারাইব তাহা আমরা জানিতাম না। ইঁহাদের অকাল-মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা তোমাদিগকে বলিয়া জানাইতে পারি না।

আজ যাঁহার মৃত্যু সংবাদ লইয়া তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি তাঁহার নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবে। ইঁহার নাম রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইঁহার প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস তোমরা অনেকে পড়িয়া থাকিবে; অথবা ইঁহার রচিত "মিত্র বিলাপ" নামক কবিতা পুস্তকও তোমরা পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে তোমরা তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছ, তাহা অতি সামান্য। তাঁহার যে অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও সদগুণ ছিল তাহার অল্পই ঐ সকল গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। বলিতে কি তাঁহার যে কত বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, তাহা দেশের অনেক বড় বড় লোকেও জানিতেন না। ইহার কারণ এই, তিনি আপনার গুণ সকল বিনয়ের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেন। কত লোক দেখিতে পাই, যাহারা একগুণ থাকিলে দশগুণ দেখায়; যে বিদ্যা নিজের নাই, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করে; মান সম্ভ্রম লাভ করিবার জন্য কত কৌশল কত ফন্দি করে; পদস্থ লোকদিগের সহিত মিশে ও তাঁহাদের তোষামোদ করে; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বালকের ন্যায় সরল স্বভাব ও বিনীত ছিলেন, সামান্য লোকের ন্যায় বেড়াইতেন, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত না যে তিনি এত বড় লোক।

অনুমান ১৮৪৬ সালে নদীয়া জেলার একটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ৮ বৎসর বয়সের সময় রাজকৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়, তদবধি তাঁহার ভ্রাতা, ইস্কুল সমূহের সুবিখ্যাত ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। বালককাল হইতে রাজকৃষ্ণ পাঠে অতিশয় মনোযোগী ছিলেন। ধীর শান্ত স্বভাব, ও পাঠে মনোযোগী হওয়াতে তিনি সকলের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তিনি যখন

কালেজে পড়েন তখনই তাঁহার সুখ্যাতি দেশে রাষ্ট্র হইয়াছিল। সকলেই বলিত ঐ বালকটী কালেজের ছাত্রদিগের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রে অদ্বিতীয়। আমরা তখনই তাঁহার অশেষ প্রশংসা শুনিতে পাইতাম। তিনি যখন (Philosophy) অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, উপাধি লাভ করেন, সেই উপাধি দিবার দিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধিনায়ক সার হেনরি মেইন তাহাকে প্রকাশ্য সভার মধ্যে বলিয়া দিলেন দর্শন বিষয়ে তিনি (রাজকৃষ্ণ) যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডের আক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ও সুদক্ষ ছাত্রের পক্ষেও প্রশংসনীয়।

এই যশ ও অভিনন্দন লইয়া রাজকৃষ্ণ কালেজ হইতে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে উকীলের কাজ করিবেন। কিন্তু তাহা তাঁহার পোষাইল না। পোষাইবে কেন? নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করিয়া নানা শাস্ত্র পাঠ করাতে যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ, ওকালতি কার্য্য তাঁহার জন্য নয়। রাজকৃষ্ণ ত্বরায় সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিলেন। তিনি উচ্চ প্রোফেসারের পদ পাইয়া জেনেরাল এসেম্ব্লি কালেজ, পাটনা কালেজ, কটক কালেজ, বহরমপুর কালেজ, প্রেসিডেন্সি কালেজ প্রভৃতি অনেক কালেজে কাজ করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার গভীর বিদ্যা, অসাধারণ বুদ্ধি ও নানাশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার চরিত্রের সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কালেজে পড়িবার সময় আমরা যেমন তাঁহার যশ শুনিয়াছিলাম, শিক্ষকতা করিবার সময়ও সেইরূপ যশ শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ ও বন্ধুতা হইল। আলাপ হইয়া তাঁহার চরিত্রে যে সাধুতা দেখিতে পাইলাম, তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি যেন তাহার নিকট সামান্য বোধ হইতে লাগিল। এমন প্রবল জ্ঞান-পিপাসা আমরা অতি অল্প-লোকেরই দেখিয়াছি। মানুষ যাহা জানিতে পারে, ও যাহা জানিলে মানুষের উন্নতি হয় এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহা প্রিয়-বন্ধু রাজকৃষ্ণ জানিতে উৎসুক হইতেন না। জানিবার জন্য তাঁহার এতদূর ব্যগ্রতা হইত যে যতক্ষণ বিষয়টা পড়িয়া শেষ না করিতেন ততক্ষণ যেন আহার নিদ্রা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইত। কোন একটী নূতন বিষয়ে এক খানি পুস্তক কলিকাতার কোন বন্ধুর হাতে আসিয়াছে, খবর পাইলে তিনি তাহা পাঠ করিবার জন্য হয় ত দশবার তাঁহার বাড়িতে হাঁটাহাঁটী করিতেন। বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা হইলে কেবল সেই কথা। আমরা তাঁহার সঙ্গে আধ ঘণ্টা বসিয়া এত নূতন বিষয় শিক্ষা করিতাম, যাহা দুইমাস পড়িয়াও শেখা যায় না। আজ বঙ্গদেশ একটী অমূল্য ধন হারাইয়াছেন, আমাদের সে দুঃখ ত আছেই, তাহার উপরে আজ এই দুঃখে চক্ষে জল আসিতেছে, এমন বন্ধু হারাইয়াছি যাঁহার সহিত আলাপেও জ্ঞান বৃদ্ধি হইত।

দেশের কত লোকে ত প্রোফেসার হয়, বড় চাকুরী করে, মোটা মোটা মাহিয়ানা পায়। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি সে চাকুরীতেই বদ্ধ থাকে। তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। খান, দান, পরিবারের গহনা গড়ান, ছেলে মেয়ের শিক্ষা দেন; না কোন নূতন জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করেন, না কোন প্রকারে সঞ্চিত জ্ঞানকে দেশের কাজে লাগান। আমাদের রাজকৃষ্ণ সে ধাতুর লোক ছিলেন না।

তিনি শিক্ষকতা কাজে রত থাকিবার সময় ফরাসি, উর্দ্দু, উড়িয়া, সংস্কৃত, আসামী, জর্ম্মান, পারসী, লাটিন ও পালি প্রভৃতি ভাষা শিখিয়াছিলেন। ফরাসি-দর্শনকারদিগের গ্রন্থ সকল পড়িবার জন্য এত ব্যাগ্রতা ছিল যে ফরাসি ভাষা না শিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। একদিকে যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে সেই জ্ঞানের ফল দেশবাসিদিগকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সে সময়ে "বঙ্গদর্শন" নামে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা ছিল। রাজকৃষ্ণ ঐ পত্রিকার একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তাহাতে অনেক গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলি পড়িয়া অনেকে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের যে এত সুখ্যাতি হইয়াছিল তাঁহার লিখিত প্রস্তাবগুলি তাহার এক প্রধান কারণ।

উড়িষ্যাতে তিনি যখন কর্ম্ম করিতেন, তখন কিসে উড়িষ্যাবাসিদিগের উন্নতি হয় সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতেন; এবং সে দেশীয় ছাত্রদিগকে লইয়া নানা প্রকার সভা করিয়া তাহাদিগকে সৎ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। আমরা বলিয়াছি সকল প্রকার জ্ঞান লাভে তাঁহার যত্ন ছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। যাহাতে বিজ্ঞান চর্চ্চা দেশ মধ্যে প্রবল হয় ইহা তাঁহার প্রাণগত ইচ্ছা ছিল। কেবল তাহা নহে, "এসিয়াটিক সোসাইটী" নামে এদেশে একটী সভা আছে। অনেক বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় লোক তাহার সভ্য। প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করা এই সভার উদ্দেশ্য। রাজকৃষ্ণ প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনাতে এত অনুরাগী ছিলেন যে এই সভার সভ্য হইয়াছিলেন। এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য পালী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর হইল তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটী বড় কাজ পাইয়াছিলেন। তাহাতে মাসে ৭০০৲ শত টাকা পাইতেন। দেশীয় সংবাদপত্র সকলের প্রধান অংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা, ও যত আইন প্রস্তুত হয় তাহার অনুবাদ করা, তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। ইহাতে তাঁহাকে গুরুতর মানসিক শ্রম করিতে হইত। আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে তাঁহার শরীর যেন অবসন্ন, মন যেন স্ফূর্ত্তি-হীন হইয়া আসিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, শ্রমটা কিছু অতিরিক্ত করিতে হয়। এই গুরুতর শ্রম করিয়াও তিনি জ্ঞান চর্চ্চা হইতে একটী দিনের জন্য বিরত হন নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে ধর্ম্ম-বিষয়ে চিন্তা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্ম-বিষয়ে আলাপ করিতেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম কিরূপে বর্দ্ধিত হয়, চিত্তশুদ্ধি কিরূপে লাভ করা যায়, এই সকল চিন্তা করিতেন। তিনি যখন এই সকল বিষয়ে প্রস্তাব করিতেন তখন তাঁহার শিশুর ন্যায় সরলতা ও বিনয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। পূজার কিছু দিন পূর্ব্বে সহর ত্যাগ করিবার সময় কথা হইল যে শীঘ্র আসিয়া আবার সাক্ষাৎ হইবে ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু হায়! আর সাক্ষাৎ হইল না। রাজকৃষ্ণ তাঁহার পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একাকী সংসারের ভার বহন করিবার জন্য রাখিয়া, তাঁহার বিধবা পত্নী ও পিতৃহীন বালক বালিকাদিগকে শোকসাগরে ফেলিয়া, আমাদের ন্যায় বন্ধুগণকে

বিচ্ছেদ দুঃখে নিমগ্ন করিয়া ও বঙ্গভূমিকে ক্ষতি গ্রস্ত করিয়া ৪১ বৎসর মাত্র বয়সে ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। এ ক্ষতির আর ত্বরায় পূরণ হইবে না।

ঢাকাই মস্‌লিন।

আমরা গত দুইবারে এই মস্‌লিন সম্বন্ধে সূতা কাটা হইতে তাঁতে কাপড় বুনা পর্য্যন্ত চিত্র সহিত দেখাইয়াছি। * এবারে অবশিষ্ট দুইটি চিত্র দেখান যাইতেছে :—

৭ম চিত্র।

৭ম চিত্র—পাশাপাশি দুইটি "ভাটি" দেখান হইয়াছে। বামদিকেরটি শুদ্ধ ভাটির চিত্র এবং ডাইনদিকেরটি ভাটিতে কাপড় সাজান হইলে কিরূপ দেখিতে হয় তাহার চিত্র, পাঁড়াগায়ে হয়ত অনেক ধোপার ভাটি দেখিয়া থাকিবেন সেইজন্য আমরা আর তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম না। তবে এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ঢাকাই মস্‌লিন যেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র তদনুরূপ সতর্কতার সহিত এই কাপড় ধোয়া আবশ্যক। সুতরাং ধোপারা অন্যান্য কাপড় যেমন দুইএকবার মাত্র ভাটি করিয়া পাটে আছড়াইয়া পরিষ্কার করে মস্‌লিন বস্ত্র সেরূপ না করিয়া ক্রমাগত ১০।১২ বার ভাটি করা হয় এবং পাটে খুব অল্প পরিমাণেই আছড়ান হয়। আবুল ফজেল নামক কোন এক ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে সোণারগাঁ বা সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত কাটারাসুন্দা নামক স্থানের জলই মস্‌লিন ধুইবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। ইদানীং নারায়নদিয়া হইতে তেজগাঁ পর্য্যন্ত সচরাচর কাপড় ধোয়া হইয়া থাকে। পুরাকালে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী সওদাগরদিগের আমলে তেজগাঁয়ে অনেকগুলি কাপড় ধুইবার আড্ডা ছিল কিন্তু সেই সমস্ত বিদেশীয় দিগের কুঠি নষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত তেজগাঁয়ের অধিকাংশ স্থল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

উপরে বলা গিয়াছে যে, মস্‌লিন্ বস্ত্র ১০।১২ বার ভাটিতে চড়ান আবশ্যক। প্রতি রাত্রে কাপড় ভাটি করিয়া পরদিন উহা ক্ষারজল মাথাইয়া রৌদ্রে শুথাইতে হয়। এইরূপে ১০।১২ দিন গত হইলে শেষ ভাটির পরে কাপড়গুলি পরিষ্কার জলে ধুইতে হয়। এই সময় জলের সহিত লেবুর রস মিশান বড় দরকার। তাহা হইলে কাপড়ের শ্বেত বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। থান প্রতি একটি

---

* গত বারে ভ্রম বশতঃ ৫ম চিত্রের স্থলে ৬ষ্ঠ চিত্রটি এবং ৬ষ্ঠ চিত্রের স্থলে ৫ম চিত্রটি দেখান হইয়াছে।

করিয়া বড় লেবুর রস হইলেই চলে। শাদা কাপড়ের জন্য যেমন লেবু তেমনি কার্পাস ও মুগা (রেশম) মিশ্রিত কাপড় সমূহের জন্য লেবুর রস ও চিনি ব্যবহার করা হয়; কারণ, শুনা যায় চিনিতে রেশ-মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। জুলাই হইতে নবেম্বর এই কয়মাস মস্‌লিন ধুইবার উপযুক্ত সময়। যে কাপড় যত বার ভাটি করা হইবে তাহা সেই পরিমাণে শাদা ও পরিষ্কার হইবে এবং ধোপ দিবার খরচাও সেইমত বাড়িবে। এইজন্য ১০০ থান কাপড় ধুইতে ও পাট করিতে ৩০৲ টাকা

৮ম চিত্র।

হইতে কখন কখন ১৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত পড়তা পড়ে।

৮ম চিত্র—পাটে আছড়াইবার সময় মস্‌লিনের সূক্ষ্মতর সূতাগুলি অনেক সময় স্থানে স্থানে এলোমেলো হইয়া পড়ে। কাপড় ধোয়া হইলে সেই স্থানভ্রষ্ট সূতাগুলিকে কেমন করিয়া দোরস্ত করা হয় তাহাই এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। একদিকে জমির উপরে দুটি খোঁটার সহিত সংলগ্ন একটি "নরদ" বা দণ্ডে দুইজন কাপড়ের থানটি গুটাইয়া ধরিয়া আছে অপর দিকে আরএকজন ঐ থানের খানিকটা বিস্তার করিয়াছে, মধ্যস্থলে চতুর্থ ব্যক্তি যেখানে যেখানে উহার সূতা হেলা-গুছা হইয়া গিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া দিতেছে।

পাটে আছড়াইবার সময় অনেক সূতা ছিড়ি-য়াও নষ্ট হইয়া যায়। রিফুগারেরা সেই সূতার পরিবর্ত্তে নূতন সূতা লাগাইয়া দেয়। রিফুগারিতে ঢাকার মুসলমানেরা যেমন ওস্তাদ এমন প্রায় অপর কাহাকেও দেখা যায় না। একজন সুদক্ষ রিফুগার ২০ গজ লম্বা একটি সূক্ষ্ম মস্‌লিন থান হইতে একগাছি ছেঁড়া বা মোটা সূতা বাহির করিয়া তাহার স্থানে ঠিক সেইরূপ লম্বা আর একগাছি ভাল ও সূক্ষ্ম সূতা পরাইয়া দিতে পারে!! ঢাকায় এইরূপ অনেকঘর রিফুওয়ালা আছে। ইহাদের অনেকেই আফিন খায় এবং শুনা যায় নেশার ঝোঁকেই উহারা উত্তমরূপ কাজ করিতে পারে।

(ফুলের সাজি)

চতুর্থ অধ্যায়।

মনোরমাকে রাজপুরুষগণ যখন পথ দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। নির্দ্দয় রাজকর্ম্মচারিগণ সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। ক্রমে যখন তাহার চেতনা হইল, তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল। প্রকৃত ঘটনা একে একে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল এবং সে বুঝিল "সে কারাগারে বন্দিনী"। অশ্রুজলে তাহার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরিতাপ ও ক্রন্দন করিয়া, মনোরমা কতক সুস্থির হইয়া, বিপদভঞ্জন হরিকে সকাতরে ডাকিতে ডাকিতে শীঘ্রই তৃণশয্যার উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রার কি আশ্চর্য্য শক্তি! পুত্রশোকাতুরা জননী, পতিবিয়োগ-আকুলা সতী, এবং রুগ্ন শয্যায় পীড়িত ব্যক্তিও নিদ্রাভিভূত হইয়া সকল যাতনা ভুলিয়া যান। মনোরমা যতক্ষণ নিদ্রিতা ছিল ততক্ষণ সে তাহার সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছিল।

মনোরমা জাগ্রত হইয়া দেখিল রজনী ঘোর অন্ধকারে দিক সকল আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? আমি কি সত্য সত্যই কারাগারে বন্দিনী, অথবা আপন গৃহে শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। না, আমার এ স্বপ্ন নহে, এই যে আমার হস্ত "শৃঙ্খলাবদ্ধ" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনোরমা শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল—"এখন আর আমার উপায় নাই, হরি তোমার চরণমাত্র আমার ভরসা, কৃপা করিয়া একবার এই কারাগারের মধ্যে তোমার কন্যার দশা দেখ। তুমি সকলের অন্তর দেখিতে পাও, আমার যে কোন দোষ নাই তাহা তুমি বেশ জানিতেছ। ঠাকুর আমার এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমার পিতাকে রক্ষা কর, এবং তাঁহার মনে সান্ত্বনা প্রদান কর, তিনি কুশলে থাকিলে আমার অনেক ক্লেশের হ্রাস হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে পিতার কথা মনে পড়িয়া তাহার নয়নজল প্রবলবেগে বহির্গত হইতে লাগিল। আর কথা সরিল না, নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমী তিথির অন্ধকার ক্রমে হ্রাস হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্তিকর চন্দ্রের উদয়ে দিক সকল আলোকিত হইল। গভীর রজনী,—জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, ঝিল্লিদিগের ঝিঁ ঝিঁ শব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ, বৃক্ষশাখায় জোনাকি পোকারা উড়িয়া এ ডাল ও ডাল করিতেছে, যেন শত শত মাণিক্য এক স্থানে একত্র হইয়াছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলা ঘেউ ঘেউ করিতেছে। আকাশে নক্ষত্রগণের প্রভা কমিয়া গেল, কেহ কেহ অদৃশ্য হইল। যে মনোরমা অন্য সময় গভীর রজনীতে নিদ্রাভঙ্গের পর আপনাদের গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় বসিয়া চন্দ্র দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিত; উন্মুক্ত বায়ু সুগন্ধ বহন করিয়া যে মনোরমার সেবা করিত আজ সে কারাগারে। মনোরমার কারাগৃহের গবাক্ষ দিয়া চন্দ্রালোক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মনোরমা সেই আলোর সাহায্যে দেখিল কারা-

গারের দেয়ালগুলি, ঘরের কোণে একটা মাটির ভাঁড় ও একখানা পিতলের থাল, এবং তাহার বিছানাটী কেবল কতকগুলি বিচালিমাত্র।

মনোরমা জানালার কাছে বসিয়া চাঁদ দেখিতে লাগিল, দেখিল চাঁদখানি যেন বেগে ছুটিয়া যাইতেছে, যাইতে যাইতে চাঁদ মনোরমাকে পরিহাস করিবার জন্যই যেন কখনও বা মেঘের ভিতর লুকাইতেছে, আবার মেঘের আর এক দিক দিয়া মুখ বাড়াইতেছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে মনোরমাও কখন দুঃখিত ও কখন উল্লাসিত হইতে লাগিল। সে বাল্যকাল হইতে চাঁদ দেখিতে ভালবাসিত সেই জন্য চাঁদ দেখিতে পাইয়া তাহার কারাক্লেশের অর্দ্ধেক বিস্মৃত হইয়া গেল। সে আপনাপনি কহিল "সুধাকর! আমি যেমন তোমায় ভালবাসি তুমিও কি আমায় সেইরূপ ভালবাস। তোমার ভালবাসা আমি বুঝিতেছি, না হইলে এই নির্জ্জন কারাগারে আসিয়া তুমি আমায় এত সুখী করিতে না। তোমায় আজ এত মলিন দেখিতেছি কেন, তুমিও কি আমার দুঃখ দেখিয়া, আমায় বন্দিনী দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছ? আমি যে এই দশায় পড়িয়া এইরূপ ভাবে তোমায় দেখিব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুমি কি বলিতে পার আমার পিতা এখন কোথায় আছেন; তিনি নিদ্রিত না জাগ্রত? তিনিও কি আমার ন্যায় বিলাপ করিতেছেন? ইচ্ছা হইতেছে এখন তাঁহাকে একবার দেখি। চাঁদ! আমার পিতাকে একবার বল আমি তাঁহার জন্য কত ব্যাকুলিত হইয়াছি।"

মনোরমা এইরূপ বলিতে বলিতে হঠাৎ একটী সুন্দর গন্ধ পাইল। একি কোথা হইতে এ গন্ধ আসিতেছে। অনেকক্ষণ পরে সে দেখিল সকালে বাড়ীতে সে যে যূঁইফুল গুলি তুলিয়া কাপড়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এ তাহারই গন্ধ। মনোরমার কাছে আজ জড়বস্তুগুলি যেন চেতন হইল। তাহারা যেন শুনিতে পায়, সে এইভাবে কথা কহিল, বলিল,—"তোমরা এখন আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমরাত কোন দোষ কর নি যে কারাগারে আসিবে। তবে কি তোমরা আমায় এত ভালবাস, যে আমার সহিত কারাবাস যাতনা ভোগ করিতেছ। হায় যখন আমি আজ সকালে এই ফুলগুলি তুলিয়াছিলাম তখন কে ভাবিয়াছিল যে অদ্য রাত্রে আমার এই দশা ঘটিবে! যখন রাজকুমারী হেমলতার জন্য মনের মত ফুল দিয়া সাজি সাজাইয়াছিলাম তখন কে মনে করিয়াছিল আজ আমার হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে। বাবা যে সর্ব্বদা বলিতেন পৃথিবীর সমস্তই অলীক ও ক্ষণস্থায়ী, কেবল ঈশ্বরই সত্য, তাহা ঠিক কথা, তখন কথাটী বুঝিতে পারিতাম না—এখন বেশ বুঝিতেছি।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার সে কাঁদিতে লাগিল। খানিকক্ষণ বালিকাসুলভ ক্রন্দন করিয়া কতকটা স্থির হইল। সে বাল্যকাল হইতে পিতার কাছে শিখিয়াছিল, যে বিপদে পড়িলে হরিকে ডাকিতে হয়, তাহা হইলে হরি বিপদ ভঞ্জন করিয়া দেন। তাই আজ মনোরমা ক্ষণে ক্ষণে কেবল ঈশ্বরকেই ডাকিতে লাগিল। কত কি বলিয়া ডাকিল তাহার ঠিকানাও নাই—নিয়মও নাই কেবল সরলভাবে বালক ধ্রুবের মত হরিকে ডাকিল। কখনও বা পিতার কথা ভাবিয়া নয়ন জলে আপনার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল।

এই সময়ে একখানি কাল মেঘে চাঁদটী ঢাকিয়া ফেলিল। মনোরমা আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার যে টুকু আনন্দের ভাব

উদিত হইয়াছিল তাহাও নিভিয়া গেল। সে ভাবিল চাঁদ যেমন মেঘের নীচে চিরদিন ঢাকিয়া থাকিবে না নির্দ্দোষীর প্রতি মিথ্যা অপবাদও সেইরূপ অধিক দিন থাকিবে না। দয়াময় হরি অসত্যের আঁধারে সত্যকে আবৃত রাখেন না, পিতার এই কথাটীও ঠিক। আমি যে নির্দ্দোষী নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তাহা প্রকাশ হইবে এই চিন্তায় সে মনে বল পাইল।

এইরূপ বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে মনোরমা আবার ঘুমাইয়া পড়িল, আহা তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে কত সহ্য হইবে! জগদীশ্বর আর তাহার কষ্ট দেখিতে পারিলেন না। দুঃখহারিণী নিদ্রাকে তাই বালিকার সান্ত্বনার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মনোরমা প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে একস্বপ্ন দেখিল যে, সে যেন কোন অভিনব ও রম্য উদ্যানে চাঁদের আলোকে বেড়াইতেছে। বাগানের শোভার কথা বর্ণনা করা যায় না, মনোরমাও এত উজ্জ্বল চাঁদও দেখে নাই। তাহার পিতা সেই বাগানে বেড়াইতেছেন। সে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে—পিতার চরণে পড়িল। পিতা তাহাকে আদর করিয়া তুলিলেন, আর অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখে নয়নজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত—

ধ্রুবোপাখ্যান।

অতি প্রাচীন কালে এ দেশে উত্তান পাদ নামে এক রাজা ছিলেন। সুনীতি ও সুরুচি নামে তাঁহার দুই রাণী ছিল। বহু বিবাহের জঘন্য প্রথা এখনও এদেশে প্রচলিত আছে। সুনীতি অতি ধর্ম্ম পরায়ণা, পতিব্রতা, ক্ষমাবতী, বিনয়ী,ও সকল গুণবিশিষ্টা; স্ত্রীলোকের যত গুণ থাকিতে হয় সুনীতির তাহা ছিল। সুরুচি অহঙ্কৃত, হিংসুক, উদ্ধত স্বভাব, রাগী, কর্কশ ভাষিনী এবং অভিমানিনী ছিলেন। সুরুচি সুনীতিকে ভাল বাসিতেন না ও তাঁহাকে অতিশয় হিংসা করিতেন;—ও সর্ব্বদাই সুনীতির নামে রাজার কাছে দোষ গাইতেন। কিছুদিন পরে অল্প বুদ্ধি রাজা সুরুচির বশীভূত হইয়া সুনীতিকে অরণ্যে পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে নরপতি উত্তান পাদের মহিষী সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সুনীতি সেই প্রাণ ধন ধ্রুবকে দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া অরণ্য মধ্যে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যখন সুনীতি দুঃখ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, তখন ধ্রুব আসিয়া মা, মা, বলিয়া কোলে বসিয়া আধ আধ বাক্যে খেলিবার ঘটনা গুলির পরিচয় দিতেন; সুনীতি বালকের আধ আধ বচনে সকল দুঃখ ভুলিয়া তাহাকে কোলে লইতেন। ধ্রুব পাঁচ বৎসরের হইল। একদিন ধ্রুব ঋষি-কুমারদের সহিত খেলা করিতেছেন এমন সময় একটী বালক বলিল, ভাই ধ্রুব! তুমি উলঙ্গ হইয়া খেলা করিতে আসিয়াছ, আমরা তোমায়

লইয়া খেলিব না; কাপড় পরিয়া এস তবে তুমি খেলিতে পাইবে। তখন বালক বিষণ্ণ বদনে দুঃখিনী জননীর নিকট গিয়া কহিল;—"মা! আমার কাপড় নাই বলিয়া কুমারগণ আমার সহিত খেলা করিবে না, আমার কাপড় দেও।"

সুনীতি আপনার কাপড় হইতে একটু ছিঁড়িয়া দিলেন, সেই কাপড় লইয়া ধ্রুব মাথায় বাঁধিয়া খেলিবার স্থলে গেলেন। ঋষিকুমারগণ দেখিবামাত্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বোকা ছেলে কাপড় কি মাথায় বাঁধে? তখন তাহাদের মধ্যে একজন বলিল এস ধ্রুব আমি তোমায় কাপড় পরাইয়া দি। এই বলিয়া সেই ছেড়া নেক্‌ড়া খানি পরাইতে গিয়া দেখিল সেখানি এত ছোট যে কোন মতে পরান যায় না। সে ধ্রুবকে বলিল, ধ্রুব ইহা অপেক্ষা বড় কাপড় লইয়া আইস। ধ্রুব ছুটিয়া গিয়া বলিল মা, আমায় বড় কাপড় দেও। দুঃখিনী মাতা নিজ কাপড়ের আর একটু ছিঁড়িয়া দিলেন। ধ্রুবও কাপড় লইয়া বালকদিগের নিকটে গেলেন। বালকেরা বলিল তুমি রাজার পুত্র হইয়া কাপড় পরিতে পাওনা; ধ্রুব বলিল ভাই আমার কি পিতা আছেন? আমি ত মা বই কিছুই জানি না। তাহারা বলিল মহারাজ উত্তান পাদ তোমার পিতা; চল তোমার পিতার কাছে যাই তাহা হইলে তিনি উত্তম বসন দিবেন। এই বলিয়া বালকগণ ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজ বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন মহারাজ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। ধ্রুবের সুন্দর মুখ খানি দেখিবামাত্র রাজারও মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি মনে ভাবিলেন আমি অবিচারে যে শিশু সন্তান সহিত সুনীতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম এই সেই বালক। আমার অঙ্গ সৌষ্ঠব বালকের মধ্যে অনেক আছে। ইহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে এই সেই সুনীতির পুত্র। এই মনে ভাবিয়া মহারাজ ধ্রুবকে স্নেহ ভরে কোলে করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিলেন। ধ্রুবও পিতার কোলে উঠিতে গেলেন। এমন সময়ে হিংসুক সুরুচি আসিয়া রাগভরে ধ্রুবকে বলিলেন; "অবোধ বালক তুমি অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত হইয়া এ বৃথা উচ্চ মনোরথ করিতেছ কেন? আমার উদরে তুমি জন্ম গ্রহণ না করিয়া তোমার এই বৃথা উচ্চ আশা করা তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তুমি নিতান্তই অবোধ বলিয়া অতি দুর্লভ বিষয়ে আশা করিতেছ; তুমি কি জান না যে সুনীতির উদরে তোমার জন্ম। সত্য বটে তুমি রাজার পুত্র কিন্তু আমি ত তোমায় গর্ভে ধরি নাই। আমার পুত্রের ন্যায় তোমার এরূপ বৃথা আশা কেন।" বিমাতার এই প্রকার হৃদয়-ভেদী কর্কশ বাক্য শুনিয়া তাহার কোমল হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিদ্ধ হইল। ধ্রুব তৎক্ষণাৎ অধোবদনে তথা হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে সুনীতি পুত্রের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় চঞ্চলা হইলেন। এমন সময় ধ্রুবকে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতে দেখিয়া সুনীতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস আজ তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? কেনই বা অভিমান ও রাগ ভরে আসিলে? কে তোমায় অপমান করিয়াছে? কে তোমায় অনাদর করিয়াছে? "তখন ধ্রুব অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই বর্ণনা করিল। অনন্তর ম্লানবদনা দুঃখিত-হৃদয়া সুনীতি উপদেশ বাক্যে পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন; "বাপধন! কাঁদিওনা এ পৃথিবীতে মানুষ নিজ কার্য্যের গুণে বড় হয়। যদি বিমাতার কথায় বড় ক্লেশ পাইয়া

থাক তবে পুণ্য লাভ করিবার জন্য যত্ন কর; পুণ্য লাভ করিলে সকল ফল লাভ করিবে।" ধ্রুব জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আমাদের দুঃখ কে নিবারণ করিবে;" সুরুচি বলিলেন—"বাছা! সর্ব্বদুঃখ হারী ভগবান আমাদের দুঃখ দূর করিবেন।" পুত্র জিজ্ঞাসা করিল "ভগবানকে কোথায় পাইব?" জননী বলিলেন "তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। যেখানে গিয়া ডাক পাইবে।" এই কথা বলিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে বড় ভয় হইল কি জানি অভিমানে বালক কি করিয়া বসে। এই মনে করিয়া জননী আবার বলিলেন "বাছা! তিনি অরণ্য মধ্যে থাকেন সেখানে কেহ যাইতে পারে না, সে স্থান মনুষ্যের অগম্য।" এই বলিয়া দুঃখিনী সুনীতি পুত্র কোলে করিয়া রজনীতে শয়ন করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে সুনীতি নিদ্রাভিভূতা হইলেন। ধ্রুব সেই অবসরে উঠিলেন, উঠিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন ও দুঃখিনী মাতাকে না জাগাইয়া কুটীর হইতে নিবিড় বনে গমন করিলেন। অরণ্যে গিয়া ধ্রুব কোথায় দুঃখহারী পরমেশ্বর দেখা দেও, বলিয়া চীৎকার করিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। এক একবার ঝড় উঠিতেছে আর ধ্রুব মনে করিতেছেন এই বুঝি আমার হরি। পুরাণে কথিত আছে বালক ধ্রুব সরল প্রাণে অরণ্য মধ্যে এইরূপ বলিতেছেন। হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার কাছে আসিয়া তাহার সরলতা দেখিয়া তাহাদের স্বভাব ভুলিয়া কিছু বলিতেছে না। এদিকে সুনীতি নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহার প্রাণের ধ্রুব কাছে নাই দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। ধ্রুব ধ্রুব করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে ধ্রুব কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে নারদমুনি আসিয়া তাঁহার নিকট দেখা দিলেন। তিনি আসিবামাত্র ধ্রুব তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন "ধ্রুব আমরা এতদিন ধরিয়া তপস্যা করিলাম, আমরা যাঁহাকে পাইলাম না তুমি সামান্য বালক হইয়া তাঁহাকে কিরূপে পাইবে? বৎস! যাহা সিদ্ধ হইবার নয় তুমি সে আশা ত্যাগ কর; তোমার দুঃখিনী মাতার নিকট যাও।" ধ্রুব বলিলেন "প্রভু আমি হরিকে না পাইলে ত গৃহে যাইব না।"

নারদ বলিলেন "তুমি দ্বাদশ বৎসর তপস্যা কর তবে হরিকে পাইবে।" একদিন তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণের হরি তাহাকে দেখা দিলেন। বালকের এত আনন্দ হইল যে তিনি বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন "বৎস ধ্রুব! তোমার প্রার্থনায় আমি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বরদান করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" বালক দয়াময়ের এই কথা শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া বলিলেন "প্রভু! আমি আর কিছুই চাই না আমার প্রার্থনায় তুমি যদি পরিতুষ্ট হইয়াছ তাহা হইলে আমি ইচ্ছানুসারে তোমার স্তব করিতে পারি ঈদৃশ বরদান কর। কারণ পণ্ডিতেরাও তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই আর আমি সামান্য বালক হইয়া স্তব করিতে কি করিয়া সমর্থ হইব। হে পরমেশ্বর! আমি যাহাতে তোমার ভক্ত হইতে পারি ও তোমার শ্রীচরণ পূজা করিতে পারি এইরূপ বর প্রদান কর।" দয়াময় ঈশ্বর সদয় হইয়া বলিলেন "বৎস তুমি নয়ন খুলিয়া আমায় বাহিরেও দেখ।" তিনি বলিলেন "না প্রভু আমার ভয় হইতেছে চক্ষু খুলিলে আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না। আমি অনেক

দুঃখে তোমায় পাইয়াছি আর ছাড়িতে পারিব না।" হরি যখন দেখিলেন বালক কিছুতেই চক্ষু খুলিল না তখন তিনি আপনার রূপ লুকাইলেন। ধ্রুব চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া প্রভো কোথায় গেলে বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে নয়ন খুলিয়া দেখেন বাহিরেও হরি বিরাজমান।—

দয়াময় হরি বলিলেন "ধ্রুব তুমি কি চাও", ধ্রুব বলিলেন "প্রভো আমি আর কিছুই চাই না, আমি যখন মনে করিব তখন যেন তোমায় দেখিতে পাই।" ভক্ত বৎসল হরি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ধ্রুব আবার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার স্মরণ করিলেন। তিনি আবির্ভাব হইয়া বলিলেন বৎস, "আমায় আবার কেন ডাকিলে?" তিনি বলিলেন "আমি যে মার নিকট যাইতেছি মা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন 'কৈ বাছা কি পাইয়াছ' আমি তখন কি বলিব? আমার মাকে তোমার দেখা দিতে হইবে।" তিনি কহিলেন "বাছা! তুমি কঠোর তপস্যা করিয়া আমায় পাইয়াছ, সুনীতি আমায় কিছুই সাধনা করেন নাই। আমি কি করিয়া তাঁহাকে দেখা দিব!" ধ্রুব বলিলেন "না প্রভু তাহা কখনই হইবে না, আমার মাকে দেখা দিতে হইবে।" তিনি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ধ্রুব প্রথমেই রাজবাটীতে গমন করিলেন, তথায় গিয়া প্রথমে বিমাতার চরণে প্রণাম করিলেন; সুরুচি তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার দোষ মনে করিয়া ধ্রুবের মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপ ধ্রুব! আমি নিতান্ত পাপীয়সী ও নিষ্ঠুরা, আমি তোমার কোমল হৃদয়ে অনেক কষ্ট দিয়াছি। ধ্রুব বলিলেন মা তোমার কিছুই দোষ নাই, তোমার জন্যই আমি হরি পাইয়াছি।

ধ্রুব পিতার চরণে প্রণাম করিলেন, মহারাজ বিলাপ করিয়া কহিলেন ধ্রুব! হায় আমি কি পাপিষ্ঠ! হায় কি নরাধম! কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা শান্ত হইয়া সুনীতিকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। সুনীতি রাজসদনে আসিয়া পাগলিনী প্রায় হইয়া কহিলেন আমার হারানধন ধ্রুব কোথায়! আয় বাপ কোলে আয়! মা বলিয়া ডেকে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। সুনীতি পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন তবে বাছা তোমার দয়াময় হরিকে দেখাও। ধ্রুব ভগবানের স্তব করিবামাত্র মাতারও জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল। তিনিও সেই দয়াময় হরিকে অন্তরে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সতীশ সকলের অপ্রিয় কেন?

সতীশের বাপ মা বড়লোক, সতীশ তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। কিন্তু বড় মানুষের ঘরে একটী মাত্র ছেলে থাকিলে তাহার যেরূপ আদর হয় সতীশ সেরূপ আদুরে ছেলে ছিলেন না। পিতা মাতা যে ছেলেকে আদর করেন না, অন্যলোকে স্বভাবতঃই তাহাকে যত্ন করে না, সুতরাং সতীশ সকলেরই অপ্রিয়। বড়মানুষের ঘরে খাইবার অভাব নাই, পরিবার অভাব

নাই, দাস দাসীর অভাব নাই। সতীশ যখন যাহা চাহিতেন তখনই তাহা পাইতে পারিতেন। কিন্তু সতীশের একটী রোগ ছিল, তিনি খাওয়া পরাতে বড় একটা মন দিতে পার্‌তেন না, অন্যান্য বড়লোকের ছেলেদের ন্যায় দাস দাসীকে কর্কশ কথা কহিতে জানিতেন না, সাজ গোজ করিয়া বড় মানুষের ন্যায় চলিতে ফিরিতে ভাল বাসিতেন না। সতীশের মা সতীশকে ভাল ভাল খাবার দিতেন, সতীশ আপনি অল্প কিছু খাইয়া পাড়ার গরিব ছেলেদের জন্য অবশিষ্ট লইয়া যাইতেন।

সতীশের মা সতীশকে নানা প্রকার বহুমূল্য পোষাক কিনিয়া দিতেন, সতীশ সামান্য ধুতি চাদর জামা পরিয়া বেড়াইতেন এবং কখনো কখনো সেই সামান্য ধুতি জামাও রাস্তার গরিব বালককে দিয়া চাদর পরিয়া ঘরে আসিতেন।

সতীশের মা কাছে বসিয়া এটা খা, ওটা খা, আর একটু দিই ইত্যাদি স্নেহের কথায় সতীশকে ভাল ভাল সামগ্রী খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেন, সতীশ এর একটু তার একটু মুখে দিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতেন। সতীশের মা চটে লাল। তিনি কখনো রাগ করিয়া সতীশকে গালাগালি করিতেন, সতীশ নীরবে চলিয়া যাইতেন। সতীশের মা যদি কখনো দুঃখ করিয়া বলিতেন "হারে হতভাগা, তোর এমন দশা কেন হলো, তুই কারুর চাকুরী করিস্‌নে, কোন ভাবনা নাই চিন্তা নাই, তবে কেন দুটী খাইবার সময় অমন চঞ্চল হয়ে চলে যাস্?" সতীশ প্রায়ই মাতার কথায় কোন উত্তর করিতেন না, তবে মাতার ক্লেশ নিবারণের জন্য বলিতেন, "মা, তোমরা ঘরে থাক, কোথায় কি হইতেছে কোন সংবাদ রাখ না, আমরা দশ যায়গায় যাই, লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রাণে বড় ক্লেশ পাই। অনেক দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের পাড়ার নবীনদের কি কষ্টেই দিন যাইতেছে! নবীন, গোপাল দুইটী ছেলেকে লইয়া নবীনের মা বেচারী কত দুঃখেই দিন কাটাইতেছেন। মা, আমি প্রায়ই দেখি তাঁদের দুবেলা সমানে দুটী ভাত জোটে না। হায়! লোকের শুধু দুটী ভাত জোটে না আর আমরা কত ভাল ভাল খাবার ফেলিয়া ছড়িয়া নষ্ট করি।" এইরূপ বলিতে বলিতে সতীশের মুখ লাল হইত ও চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। সতীশের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াও কিন্তু সতীশের মা সুখী হইতেন না। বালক সতীশের আর একটী দোষ ছিল, তিনি মাছ মাংস খাইতে চাহিতেন না। সতীশের বাবা নিজে মাছ মাংস খাইতে ভাল বাসিতেন। এমন কি অন্যে না খাইলে তাহাকে নানা উপদেশ দিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ভাবিলেন, সতীশ আজ কালকার নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী বাবুদের কথা শুনিয়াই বা এইরূপ করে। তিনি সতীশকে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, অধিক কি প্রহার করিয়া দেখিলেন, কিছুতেই সতীশের মত ফিরাইতে পারিলেন না। অবশেষে যখন মিষ্টিকথায় সতীশের বাবা সতীশের মৎস্য মাংসের প্রতি ঘৃণার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশ তখন মুখ খানি মলিন করিয়া বলিলেন, "মাছ মাংস খাইতে আমার ক্লেশ হয়, প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করে, মাছ মাংস খাইয়া কখনও আমার সুখ হয় না।"

সতীশের বাবা সতীশকে বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে বলিতেন, সতীশ পাড়ার যত সব গরিবলোক, "ছোটলোকের" ছেলেদের

সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের নানা উপকার করিতেন। সতীশের এইরূপ স্বভাব দেখিয়া দিন দিনই তাঁহার বাপ মা বিরক্ত হইতে লাগিলেন, বংশের কলঙ্ক স্বরূপ মনে করিয়া সতীশের বাবা সতীশের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ ও উদাসীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সতীশকে যে ভাবে মানুষ করিবেন ভাবিয়াছিলেন সতীশ সেরূপ হইতে পারিল না, সতীশের প্রকৃতিই সেরূপ নহে। সতীশের চলন ফেরন, সাজগোজ সকলই সামান্য লোকের ন্যায়। পাড়ার মধ্যে সতীশের বাবা ধনে মানে সকলের চেয়ে বড়লোক, সুতরাং সতীশের এইরূপ ব্যবহারে পাড়ার স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই সতীশের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়রে, সতীশ ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গেল।" ক্রমে সতীশের যত বয়স বাড়িতে লাগিল তত আরো অনেক দোষ বাহির হইতে লাগিল। খুব ভোরে উঠিয়া সতীশের একটু বেড়াইবার অভ্যাস ছিল, স্কুলের ছুটীর পরে কিছু খাইয়া ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিবার নিয়ম ছিল। পাড়ার কুড়ে ছেলেদিগকে সতীশ ভোরে যাইয়া জাগাইতেন এবং সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। স্কুলের পরে তাস ইত্যাদি কুড়ে খেলায় যে সকল বালক সময় নষ্ট করিত সতীশ তাহাদিগকে লইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলিতেন। সতীশের এইরূপ আচরণে কিন্তু পাড়ার লোক চটিয়া উঠিল। "সতীশটা নিজে বয়ে গেছে, পাড়ার ছেলে গুলিরও পরকাল খাইবে" এইরূপ অপবাদ দিয়া পাড়ার অভিভাবকগণ ছেলেদিগকে সতীশের সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে কি পিতা মাতা, কি প্রতিবাসিগণ কাহারো নিকটে সতীশের আদর নাই। কেবল একজন লোক ছিলেন যাঁহার নিকটে সতীশের অনেক আবদার খাটিত, কেবল একটী স্থান ছিল যেখানে সতীশের অনেক আদর ছিল। সে লোকটী সতীশের স্কুলের মাষ্টার, সে স্থানটী সতীশের স্কুল। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে যাইয়াই সতীশ স্কুলে উপস্থিত হইতেন। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে ছেলেরা প্রায়ই স্কুল কমপাউণ্ডের চারি দিকে খেলা করে। এই খেলায় অনেক সময়ে রক্তপাতও হইয়া থাকে। কিন্তু সতীশের কাছে কখনো অন্যায় হইবার যো ছিল না, সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিবে ইহা সতীশ কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক সময়ে সতীশকে দুর্ব্বল ছেলেদের পক্ষে মারামারি করিতে হইত। অত্যাচারী দুষ্ট ছেলেরা সর্ব্বদাই সতীশের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইত, এবং অকারণেও শিক্ষকের নিকটে সতীশকে অপদস্থ করিতে ছাড়িত না। দুষ্ট ছেলেদের স্বভাব এত নীচ যে, তাহারা ক্লাশে বসিয়া এক জন অন্যকে চিম্‌টি কাটিতেছে, আর ছাইমাটি লইয়া সর্ব্বদা ঝগড়া করিয়া শিক্ষককে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। অথচ দোষ করিয়া শিক্ষকের নিকটে স্বীকার করিবার সাহস নাই কাজেই একটী দোষ ঢাকিতে দশটী মিথ্যা কথা বলিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। কিন্তু সতীশের স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। সত্য কথা বলাই সতীশের স্বভাব ছিল, দোষ করিয়া স্বীকার করাই তাঁর অভ্যাস ছিল, এবং সমপাঠী বালকগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা তাঁহার আনন্দ ছিল। সমপাঠী বালকগণের মধ্যে অনেকেই, তিনি সত্যকথা কন বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মাষ্টারের নিকটে সকল কথা বলিয়া ফেলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিল এবং অনেক সময়ে তাঁহার নামে

মিথ্যা অপবাদ দিত, কিন্তু তিনি কিছুই করিতেন না এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া চলিতেন।

পূজার ছুটী হইল। সতীশের বাপ মা পশ্চিম বেড়াইতে যাইবেন, সতীশকেও কাজেই পিতা মাতার সঙ্গে যাইতে হইল। পূজার সময়ে হাবড়ার ষ্টেসনে বড় ভিড়। টিকেট মাষ্টারের বাক্সের সম্মুখে গায় গায় ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া লোক দাঁড়াইয়াছে, জোর যার আমল তার। সবল লোক দুর্ব্বল লোককে পেছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া আগে টিকেট লইতেছে। যাহাদের পয়সা আছে এবং ঘুশ দিতে বিবেকে বাধিতেছে না তাহারা আগে টিকেট পাইবার আশায় সম্মুখস্থ পাগ্‌ড়ীধারী চাপরাসী মহাশয়দিগকে দুই চারি পয়সা জলপানি দিয়া কাজ সারিয়া লইতেছে। সতীশদের টিকেট লইবার জন্য বাড়ীর গোমস্তা ভিড়ের মধ্যে গিয়াছে, সতীশ ষ্টেসনের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন। টিকেট মাষ্টারের ডান দিকে চাপ্‌রাসী দুই জন দাঁড়াইয়া আছে, কোন ভিড় নাই, যাহারা চাপ্‌রাসী ভায়াদের খুসী করিতেছে তাহাদিগকেই টিকেট মাষ্টারের সম্মুখে সহজে যাইতে দিতেছে, বামদিকে বড় ভিড়। একজনের পরে আর একজনকে যাইতে হইতেছে, এদিকে রেল ছাড়িবারও সময় হইল। একটী স্ত্রীলোক, বোধ হয় তাহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না, কোননগর ষ্টেসন পর্য্যন্ত টিকেট করিবে, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেচারী চাপরাসীদের নিকট দিয়া টিকেট মাষ্টারের নিকটে যাইতেছিল। চাপরাসীগণ বোধ হয় স্ত্রীলোকের নিকটে পয়সা চাহিয়া থকিবে। কিন্তু চাহিলে কি হইবে স্ত্রীলোকটী শুদ্ধ রেলভাড়ার পয়সা কয়েকগণ্ডা আচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীলোক চাপ্‌রাসীর নিকটে হাত জোড় করিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল, চাপরাসীদের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, দুই তিন বার চাপরাসীগণ তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহিরে আনিল। সতীশ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, আর সহ্য হইল না, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, সতীশ চাপরাসীগণকে বলিলেন, "ইহাকে যাইতে দেও" চাপরাসীগণ হাসিতে হাসিতে বলিল "দেব না," সতীশ বিরক্ত হইয়াও গম্ভীরস্বরে বলিলেন, ভালচাও ত ছাড়িয়া দাও, অমনি চাপরাসীদের একজনে তাঁহার হাত ধরিবার উপক্রম করিল। সতীশ আত্মরক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন ও সজোরে ঐ ব্যক্তির মুখে একটী ঘুষি মারিলেন। চাপরাসী বুঝিল, বালক বলিয়া যাহাকে উপহাস করিয়াছিল সে বালক সামান্য বালক নয়। "পুলিস" "পুলিস" রব উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে পুলিস সবইন্‌স্পেক্টর ষ্টেসন মাষ্টার প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশের বাবাও ষ্টেসনের ভিতরে ছিলেন, তিনিও আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সতীশকে ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, সতীশ বীরেরন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সতীশের বাবা চাপরাসীদের অত্যাচার ও সতীশের প্রতি আক্রমণের কথা বলিয়া সতীশকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সতীশ ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ষ্টেসন মাষ্টার ইংরাজ। সতীসের সত্য কথায় ও সাহসে খুসী হইয়া সতীশকে ধন্যবাদ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

এই সকল কারণেই সতীশের বাপমা সতীশের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, সতীশের এইরূপ আচরণ দেখিয়াই সতীশের প্রতিবাসিবর্গ সতীশকে "দুরন্ত জেঠা ছেলে" ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি করি-

তেন। কিন্তু সতীশের শিক্ষক এই সকল গুণ দেখিয়াই সতীশকে ভাল বাসিতেন। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা সতীশের বিষয় কি বল ?

মশা।

আমরা ছেলে বেলা মশার বাসা খুজিতে যাইতাম। ঢেকী গাছে মশা বাসা করে এই আমাদের বিশ্বাস ছিল। লাল রঙের এক প্রকার বড় পিপড়ে যেমন গাছের পাতা দিয়া বাসা প্রস্তুত করে, ঢেকী গাছে সেই রূপ অতি ক্ষুদ্র বাসা পাওয়া যায়। এ গুলি কিসের বাসা তাহা আমি আজিও জানিতে পারি নাই, কিন্তু আমার ছেলে বেলা এই সংস্কার ছিল যে এ গুলি মশার বাসা বই আর কিছুই নহে। বাস্তবিক এই সকল বাসার প্রায় প্রত্যেকটীতে এক একটী করিয়া মশা পাওয়া যায়।

যে সকল মশা আমাদের রক্ত খাইতে আইসে তাহারা সকলেই স্ত্রী মশা। পুরুষ মশা নিরীহ লোক; সে ফুলের মধু খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষের মুখের গঠনেরও কতকটা তফাৎ আছে।

ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী মশা উপযুক্ত একটী জলাশয় খুজিয়া লয়। নির্জ্জন পুকুরগুলি এই কার্য্যের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু তিন চারিদিন ধরিয়া ঝী যে জলের হাঁড়ি ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়াছে, তাহার খোজ পাইলেও মশার মা নিতান্ত দুঃখিত হইবে না। একেবারে অনেক গুলি ডিম পাড়া হইবে। পেছনের দুই খানি পায়ের সাহায্যে ডিম গুলিকে একত্র করিয়া একটী ক্ষুদ্র নৌকার আকারে (১নং) সাজান হইবে; এই নৌকাটী জলে ছাড়িয়া দিলেই সে ভাসিতে থাকিবে। ডিমের সরু দিকটা উপরে থাকে,

সুতরাং কিরূপে নৌকার আকার হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। উপযুক্ত সময় হইলেই ডিম ফুটিয়া মশার ছানা বাহির হয়। এই সময়ে এ গুলিকে দেখিলে কেহই মনে করিতে পারে না যে, ইহারাই কালে মশা হইয়া মানুষ খাইতে আসিবে। তোমরা নিশ্চয়ই গরমির দিনে স্থির জলে মশার ছানা গুলিকে তিড়িং তিড়িং করিয়া নাচিতে দেখিয়াছ; কিন্তু তাহাদিগকে চিনিতে

পার নাই। ছবিতে যে কতকটা শুঁয়ো পোকার ন্যায় একটা চেহারা (২নং) আঁকা হইয়াছে,তাহাই মশার ছানা। ডিম হইতে বাহির হইয়া ইহারা জলে খেলা করিতে থাকে। ঝী অনেক সময় না দেখিয়া খাবার জলের সহিত গেলাসে করিয়া যে কতগুলি পোকা আনিয়া দেয় তাহা এই মশার ছানা। ইহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র ল্যাজের কাছে। নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় ল্যাজের অগ্রভাগটী জলের উপরে ভাসাইয়া দিয়া ঝুলিতে থাকে। চোয়ালে এক প্রকার লোম আছে,সেই লোমগুলি কেমন করিয়া যেন জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত প্রস্তুত করে। সেই আবর্ত্তে ঘুরিয়া নানা রকমের খাদ্যাখাদ্য আসিয়া মুখের ভিতর পড়ে। মশার ছানা এই উপায়ে জীবন ধারণ করে।

তিনবার চর্ম্ম পরিবর্ত্তনের পর ইহার আর এক প্রকারের আকার(৩নং)ধারণ করে,তাহাতে মশার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি মোটামুটি সকলই বর্ত্তমান থাকে। কিছুকাল পরে পূর্ণাবয়ব মশা(৪,৫নং)ইহার ভিতর হইতে বাহির হয়। খোলসটা জলের উপর ভাসিতে থাকে; মশা তাহারই উপর বসিয়া উড়িবার জন্য যথেষ্ট বল লাভের অপেক্ষা করে। অল্পক্ষণ রোদ বাতাস লাগিলেই তাহার হাত পা শক্ত হয়। তখন সে শূন্যে উড়িয়া অপরাপর সঙ্গীদের সহিত খেলা করে।

মশাগুলি বড় লোভী। গায় বসিবামাত্রই যদি তাহাকে তাড়াইয়া না দেও তবে সে আস্তে আস্তে শুড়টী চামড়ার ভিতর ঢুকাইয়া দিবে। রক্ত খাইতে খাইতে সে এতই আরাম পায় যে শেষে আর তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না—আমরা এত খাইলে বোধ হয় খবরের কাগজ ওয়ালারা এত দিন আমাদের নাম ছাপিয়া দিত। যখন গায় বসে, তখন দেখিবে যে, তাহার শরীরটী ছুঁচের অগ্রভাগের ন্যায় সরু। ক্ষুধায় তাহার এই দশা হইয়াছে; কিন্তু কিছু কাল তাহাকে খাইতে দাও, দেখিবে শীঘ্রই সে ফুলিয়া উঠিবে, তাহার পেটটী লাল হইয়া আসিবে। এই সময়ে তাহার দুই পাশে আঙুল দিয়া চাপিয়া সেই স্থানের চামড়া টান করিয়া ধরিলেই সে আট্‌কিয়া পড়ে। শুঁড়টী ঢুকাইবার জন্য যে ফুটো করিতে হইয়াছিল চামড়া টান করিয়া ধরিলে সেই ফুটো সরু হইয়া যায়। সুতরাং শুঁড় আর বাহির হইতে পারে না। রাত্রিকালে মশারির ভিতর দুই একটী মশা যোগাড় যন্ত্র করিয়া প্রায়ই ঢুকিয়া যায়। সকাল বেলা আর তাহারা উদর লইয়া চলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় অনেক মশাকে ধরিয়া টিপিয়া মারা গিয়াছে।

একটী গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। গল্পটী বোধ হয় সত্য নহে, কিন্তু ইহাতে মজা আছে। কতকগুলি আইরিস সাহেব একবার এদেশে আসিয়া ছিলেন। তাঁহারা কখনও মশা দেখেন নাই, সুতরাং প্রথমে মশারি কিনেন নাই। রাত্রিতে শুইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের কাণ্ড কারখানা অন্য রকম। অনেক ধমকাইলেন, অনেক বার হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভয় দেখাইলেন, দাঁত খিচাইলেন কিন্তু মশারা কোন মতেই ভয় পাইল না। অবশেষে লেপদ্বারা সর্ব্ব শরীর ঢাকিয়া কিয়ৎ কালের জন্য নিরাপদ হইলেন। কিছুকাল পরে একজন লেপের এক কোণ সরাইয়া দেখিলেন যে ঘরের ভিতর একটা জোনাকী পোকা আসিয়াছে। দেখিয়াই তিনি "চ্যাচাইয়া উঠিলেন" ওরে আর রক্ষা নাই। লেপ মুড়ি দিয়া কি করিবে? ঐ দেখ জানোয়ার গুলির একটা লণ্ঠন লইয়া আমাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে!"

নবেম্বর, ১৮৮৬।

কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র।

নেক নিষ্ঠুর বালক বালিকা পিতামাতার মনে কষ্ট দিতে ছাড়ে না। পিতামাতার মত স্নেহ জগতে আর কে করে? যাঁহাদের স্নেহ ভিন্ন অসহায় শিশুকালে আমাদের বাঁচিবার কোন উপায়ই ছিল না কত অকৃতজ্ঞ সন্তান অবাধ্য আচরণে ও কটু কথায় সেই পিতামাতার স্নেহময় প্রাণ ভাঙ্গিয়া দেয়! নিজের একটু স্বার্থ ও সুখের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিলে তাঁহাদের ক্লেশের ভার যদি একটু লঘু হয় ও তাহা দ্বারা তাঁহাদের প্রাণে যদি একটুকু সুখ আনিয়া দিতে পারি তাহা অপেক্ষা সন্তানের আর সৌভাগ্য কি? কিন্তু পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতে এই কথা স্মরণ রাখিয়া সুসন্তানের কাজ কয় জনে করে? "আমার যতদূর সাধ্য পিতামাতার সেবা করিয়াছি, কোন অপ্রিয় আচরণ দ্বারা কোন দিন তাঁহাদের প্রাণে শেল বিদ্ধ করি নাই" যে পিতৃমাতৃ বৎসল সন্তান মৃত জনক জননীর কথা স্মরণ করিয়া এই কথা বলিতে পারেন, তিনি কি সৌভাগ্যবান! আমরা নিম্নে এক জন বৃদ্ধ ডাক্তারের জীবনের একটী ঘটনার কথা প্রকাশ করিতেছি। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া পিতৃমাতৃবৎসল সন্তান যে কি আনন্দ অনুভব করেন, ইহা পাঠ করিয়া সখার পাঠক পাঠিকা তাহার পরিচয় পাইবেন।

"বার বৎসর বয়সে একদিন বিকাল বেলা বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি এমন সময় পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম তিনি একটা পুঁটুলি লইয়া সহরের দিকে যাইতেছেন। আমাকে সেটা দেখাইয়া বাবা বলিলেন 'এইটা অমুক স্থানে লইয়া যাও।' আমি স্বভাবতই অলস-প্রকৃতি ছিলাম, সহজে কোন কাজে যাইতে চাহিতাম না; বিশেষতঃ সেদিন সকাল বেলা হইতে সারাদিন ক্ষেতে কাজ করিয়া বড়ই ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছিয়া হাত পা ধুইয়া একটুকু ঠাণ্ডা হইব ও আহারের পর পাড়ার আর পাঁচজন ছেলের সঙ্গে আমোদ করিব, উৎসুক হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়াছিলাম। বাবা যে স্থানে যাইতে বলিয়াছিলেন তাহা দুই মাইল দূরে। সুতরাং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আগুন হইয়া বাড়ী যাইবার সময় বাবা এ নিষ্ঠুর আদেশ করিলেন দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলাম। 'আমি এখন কোন মতেই পারিব না' অত্যন্ত বিরক্তির সহিত এই কথা বলিতে যাইতেছিলাম,

কিন্তু জানি না কেন হঠাৎ আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। আমি না গেলে বাবা আপনিই যাইবেন ইহা নিশ্চয় জানিতাম। বাবার দিকে একবার চাহিলাম, তাঁহার প্রশান্ত স্নেহময় মুখ দেখিয়া আমার কঠোর উত্তর মুখেই রহিয়া গেল, 'আচ্ছা বাবা, এখনিই যাইতেছি' বলিয়া প্রফুল্লমুখে পিতার হস্ত হইতে পুঁটুলি লইলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অবসন্ন শরীরে তাঁহার আদেশ পালন করিতে আমার এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া স্নেহময় পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তিনি স্নেহপূর্ণ চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তুমি যে আমার কথামত কাজ করিতে যাইবে আমি তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম, তুমি কোন দিনই আমার কথার অবাধ্য নও; আমি নিজেই যাইতেছিলাম কিন্তু শরীরটা যেন কেমন করিতেছে, তাই আর পারিয়া উঠিলাম না।'

"বাবা আমার সঙ্গে সঙ্গে সহর পর্য্যন্ত গেলেন ফিরিয়া যাইবার সময় আমার হাতে হাত রাখিয়া আবার বলিলেন 'তুমি চিরদিনই সুপুত্রের কাজ করিয়াছ, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

"বাবার কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলাম। বাড়ীতে আসিয়া বাহির বাড়ীতে অনেক লোক একত্র হইয়াছে দেখিয়া, কি হইয়াছে জানিতে অগ্রসর হইলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। বাড়ী পৌছিয়াই হঠাৎ পড়িয়া গিয়া বাবার মৃত্যু হইয়াছে! যাঁহারা নিকটে ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিলাম মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার কথা বলিতেছিলেন।

"আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু সেই দিনের ঘটনা এখনও মনে উজ্জলরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। 'তুমি চিরদিনই সুপুত্রের কাজ করিয়াছ' পিতার এই শেষ কথা এখনও কাণে বাজিতেছে। সেই সময়ে হঠাৎ যদি আমার সুবুদ্ধির উদয় না হইত তাহা হইলে আজ কি ভয়ানক অনুতাপে হৃদয় পূর্ণ হইত। ঈশ্বর-প্রসাদে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতার আদেশ পালন করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণে সুখের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি, ইহা যখন স্মরণ করি, তখন হইতে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় হয় এবং আনন্দে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ দি।"

ভালবাসার সহিত যে কার্য্য করা যায় তাহার ফল বৃথায় যায় না।

আমার অবাধ্যতায় মৃত জনক-জননী না জানি কত ক্লেশ পাইয়াছেন একথা ভাবিয়া যাহাকে অনুতাপ করিতে হয় তাহার মত দুর্ভাগ্য কে?

তাই বলি পাঠক পাঠিকা! পিতামাতা যে আদেশ করেন নিজের একটুকু সুখ ও আমোদের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রাণে আনন্দ ও অনুরাগ লইয়া তাহা পালন করিতে প্রফুল্লমুখে ছুটিয়া যাইও। স্মরণ রাখিও, যে বালকবালিকা পিতামাতাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে ও সেই অনুরাগ বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ করিতে উৎসুক, ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন।
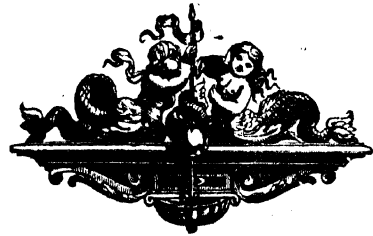
মহাত্মা নেল্‌সনের গল্প।

পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ আছে আমরা ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা নেল্‌সনের বাল্যকালের কয়েকটী গল্প বলিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ মহাপুরুষ বাল্যাবস্থাতেই স্বীয় ভাবী মাহাত্ম্যের চিহ্ন অনেক দেখাইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে আরও দুই চারিটী কথা লিখিয়া তোমাদিগকে দেখাইব যে, একটীমাত্র গুণেই তিনি এত খ্যাতি লাভ করিয়া জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। তোমাদেরও মধ্যে এই বাল্যকাল হইতে যিনি সেই গুণটীমাত্র লাভ ও বর্দ্ধন করিয়া সেই নিয়মের অনুসারে নিশ্চয়ই সব সময়ে কাজ করিতে পারিবেন, তিনিও সেই বীরচূড়ামণি নেল্‌সনের মত আপনার জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া জীবন সার্থক করিবেন সন্দেহ নাই।

আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের যে মহাসমর হয়, তাহাতে কত লোক বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিয়া বড়মানুষ হইয়াছিলেন। কিন্তু নেল্‌সন যে গরিব সেই গরিবই ছিলেন। সেই বিষয়ে কিন্তু তাঁহার নিজের মত বড় চমৎকার ছিল। তিনি বলিতেন—"আমি দরিদ্র আছি সত্য, এত বড় যুদ্ধের পরেও ধনী হইতে পারিলাম না বটে, কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষে আমার চরিত্রে এক বিন্দুও কলঙ্ক পড়ে নাই। আমার চিরকাল বিশ্বাস যে প্রকৃত পবিত্র জীবনে উপার্জ্জিত যে যশ, তাহা ধনরাশি অপেক্ষা অনেক মূল্যবান।" বীর-যুবক বাল্যকালে যে দৃঢ়তার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন চিরদিনই সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা (যাহা ঠিক উচিত বলিয়া বুঝিব তাহাই করিব, যা ঘটে ঘটুক) দেখাইয়া গিয়াছেন।

নেল্‌সন যখন বোরিয়াস্ নামক জাহাজের কাপ্তেন (অর্থাৎ সর্ব্বোপরি কর্ত্তা) হইয়া আমেরিকা যান, তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। আণ্টিগোয়া নামক এক বন্দরে গিয়া দেখিলেন যে, একখানা জাহাজের মাস্তুলে একটা চওড়া নিশান উড়িতেছে। চওড়া নিশান কিসের চিহ্ন জান?—সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার চিহ্ন। সেই বন্দরে যতগুলি জাহাজ ছিল, তাহাদের কোনটীর কাপ্তেনই নেল্‌সনের অপেক্ষা ক্ষমতায় উচ্চ নহেন, বরং সকলেই তাঁহার নিম্নে। তাঁহার উপরে কেবল প্রধান নৌ-সেনাপতি সার রিচার্ড হীউস্, তিনিও সেখানে থাকিতেন না। সুতরাং হিসাব মত সে বন্দরে নেল্‌সনেরই ক্ষমতা সর্ব্বোপরি। অথচ আর একখানি জাহাজে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার চিহ্ন চওড়া নিশান দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য "কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ্" বা প্রধান নৌ-সেনাপতি সার রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে, ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা মাউট্রে সাহেবের অধীন হইয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে। এবং ঐ বন্দরে মাউট্রে সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতা অধিক থাকার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে যে কোন জাহাজে ইচ্ছা, চওড়া নিশান উড়াইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

নেল্‌সন তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, মাউট্রে সাহেবের ঐ নিশান উড়াইবার কোন ক্ষমতা নাই, এবং তাঁহার উপর হুকুম চালাইবার কোন অধিকার নাই। এমন কি তোমরাও স্পষ্ট বুঝিতেছ যে, যখন ঐ বন্দরে নেল্‌সন সকল কাপ্তেনেরই

উপরে, তখন ঐ স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কোন অধিকার নাই যে, তাঁহার উপরে ক্ষমতা চালান; অথচ নেল্‌সনের উপরওয়ালা প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে আদেশ করিলেন—মাউট্রের হুকুম শুনিতে হইবে। তিনি কি করেন? যে সে লোক হইলে হয়ত সে আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু নেল্‌সন বেশ জানিতেন যে, তিনি নিজ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ভিন্ন আর কাহারও অধীন হইবেন না। সুতরাং অসম সাহসের সহিত বন্দরে প্রবেশ করিবামাত্র ঐ জাহাজের কাপ্তেনকে তৎক্ষণাৎ চওড়া নিশানটা নামাইয়া ডক্ইয়ার্ডে (জাহাজ মেরামতের ও সব সামগ্রী রাখিবার স্থান) পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। সার রিচার্ড আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিলেন। কিন্তু পরে নেল্‌সনেরই জিৎ হইল। ঐ অন্যায় আদেশ পালন না করার জন্য তিনিই প্রশংসা পাইলেন।

আরও একটা গল্প বলি শুন। তখন ইংলণ্ডের বাণিজ্য আইনে লেখা ছিল যে, কোন বিদেশীয় জাহাজ বা মাহাজন আমেরিকার ইংরাজ ঔপনিবেশিক দ্বীপসমূহে ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না। আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ দেশ আগে ইংরাজদেরই ছিল, কিন্তু ঐ মহাসমরে তাহারা স্বাধীন আমেরিকান্ হয়। সুতরাং তাহারা হিসাবমত এখন "বিদেশীয়" হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাদের জাহাজ সকল পূর্ব্বের মত ইংরাজদিগের দ্বীপগুলিতে গিয়া বাণিজ্য করিত। নেল্‌সন দেখিলেন যে, তাহা আইন-বিরুদ্ধ কাজ হইতেছে। তিনি প্রধান নৌ-সেনাপতির নিকটে গিয়া সে কথা বলিলেন। প্রথমে তিনি উড়াইয়াই দিয়াছিলেন। কিন্তু নেল্‌সন ত আর ছেলে ভুলানতে ভুলিবার নন, তাঁহার নিকটেই আইন ছিল, খুলিয়া তখনি দেখাইয়া দিলেন যে, আমেরিকানদিগকে দূর করিয়া না দিলে কর্ত্তব্য করা হয় না, দোষ হয়।—সার রিচার্ড কি করেন?—অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন।

তখন নেল্‌সন আসিয়া ঐ সকল দ্বীপের শাসনকর্ত্তাকে ঐ কথা বলিলেন। কিন্তু বালকবৎ কাপ্তেনকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাঁহাকে উপহাস করায়, সিংহশাবক অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"দেখুন, আমি বালক হইতে পারি, কিন্তু ইংলণ্ড মহাসাম্রাজ্যের কর্ণধার প্রধান মন্ত্রী পীট (যাঁহার বয়স এখন ২৫ বৎসর) তাঁহার অপেক্ষা আমার বয়স কম নহে। আর তিনি যেমন এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন আমিও তেমনি দক্ষতার সহিত একখানি রণতরীর অধ্যক্ষতা করিতে সমর্থ।" এই বলিয়া ২৬ বৎসরের যুবা ঐ বৃদ্ধের মুখ চুণ করিয়া দিলেন।

তারপর একটী দিন ধার্য্য হইল ও আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, ঐ দিনের পর যে আমেরিকান জাহাজ ইংলণ্ডীয় বন্দরে দেখা যাইবে তাহাই গ্রেপ্তার করা হইবে। দ্বীপবাসী সমস্ত লোক একবাক্যে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি করিয়া উঠিল, শাসনকর্ত্তারাও সকলেই (একজন ছাড়া) তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইল। মহা হুলস্থুল ব্যাপার। গতিক মন্দ দেখিয়া দুর্ব্বলচেতা ভীরু সার রিচার্ড চুপে চুপে নেল্‌সনকে পত্র লিখিলেন যে, সকলের মত লইয়া ও খুসী করিয়া যেন কার্য্য করা হয়। কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীর নেল্‌সন অচল, অটল, হিমালয় পর্ব্বতের মত দৃঢ় হইয়া আপনার মতানুসারে স্বতেজে চলিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রধান সেনাপতি সার রিচার্ড আপনার পত্র অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া কড়া হুকুম বাহির

করিলেন যে, নেল্‌সন যেন আমেরিকান্ জাহাজ সকলের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করেন। তাহারা পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিতে পাইবে। তিনিই সকলের উপর ক্ষমতাশালী। তাঁহার এই প্রকাশ্য আদেশ অমান্য করিলে নেল্‌সনের যার পর নাই বিপদের সম্ভাবনা। এই আদেশ প্রচারিত হইলে শাসনকর্ত্তারাও খুব জোর পাইয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রূপাদি করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীর-হৃদয় টলিবার নহে। তিনি এবারেও আপনার উপরওয়ালার স্পষ্ট আজ্ঞার বিপরীত কাজ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বলিলেন, "হয় আমার অধিনায়ক সার রিচার্ডকে অমান্য করিতে হইবে, না হয়ত আমার দেশের আইন অমান্য করিতে হইবে। আমি কখনই কর্ত্তব্য ত্যাগ করিতে পারিব না। যা হয়, হউক।" তাহার পর সার রিচার্ডকে বিনম্রভাবে লিখিলেন "আপনার আদেশ অমান্য করাই এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। পরে সাক্ষাৎ হইলে বুঝাইয়া দিব যে আমি অতি ঠিক কাজ করিতেছি।" স্থূলদর্শী সার রিচার্ড কর্ত্তব্য-প্রিয় বীরের এই কথার মহত্ব কি বুঝিবে? প্রথমে রাগে অন্ধ হইয়া তাঁহাকে বিচারাধীনে আনিয়া শাস্তি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পরে বুঝিতে পারিয়া আবার নেল্‌সনকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

তারপর কি হইল শুনিবে? গায় কাঁটা দিতেছে। উক্ত নির্দ্ধারিত দিনের পরেও অনেক আমেরিকান জাহাজ ঐ বন্দরে ছিল তাহারা ধৃত ও বাজেয়াপ্ত হইল। অবশেষে নেল্‌সন স্বয়ং চারিখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আমেরিকান জাহাজ মাল বোঝাই শুদ্ধ দেখিতে পাইয়া ভদ্রতাপূর্ব্বক তখনি না ধরিয়া ৪৮ আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বন্দর ত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু দুষ্ট কাপ্তেনেরা তাহা না শুনিয়া আবার বলিল যে, তাহারা আমেরিকান জাহাজ নয় তখন অগত্যা নেল্‌সন তাহাদের কয়েকজন নাবিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আমেরিকান ধার্য্য হওয়ায় চারিখানি জাহাজই আটক করিলেন। এই বার মহা প্রলয় উপস্থিত হইল। সমস্ত অধিবাসী, শাসন কর্ত্তারা, ব্যবসাদারেরা এবং বাণিজ্যাগারও (Custom House) সব এক বাক্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত করিল। নেল্‌সনের নামে ৪,০০,০০০ চারি লক্ষ টাকা লোকসানের দাবী দিয়া মাহাজনেরা নালিশ করিল। সর্ব্বনাশ! কি উপায়? ভীরু সার রিচার্ড এবারেও তাঁহাকে সমর্থন করিলেন না, দূরে থাকিয়া কি হয় দেখিতে লাগিলেন। ভীম সাহসে নেল্‌সন আপনার পক্ষ সমর্থন করিলেন। এবং এমন স্বাধীন ও নির্ভীক হৃদয়ে শান্ত ও গম্ভীর ভাবে এবং এমন দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত মকদ্দমা চালাইলেন যে তাঁহারই জয় লাভ হইল।

পৃথিবীতে চিরকালই কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ লোকেরা এইরূপে জয়ী হইয়া আসিয়াছেন। কর্ত্তব্য ঈশ্বরের আদেশ। এই আদেশের উপরেই যিনি জীবনকে দাঁড় করাইতে পারেন তিনিই বীর, নির্ভয়, নিরাপদ ও জয়ী।

মুদ্রাযন্ত্র।

চীনেদের বড় বুদ্ধি। গ্রাম্য লোকদিগের অনেকে এখনও বিশ্বাস করে যে ষ্টীম্ এঞ্জিন্, টেলিগ্রাফ্ ইত্যাদি বড় বড় কল কারখানা সব চীনেদের তৈরী। বাস্তবিক চীনেদের সম্বন্ধে লোকের এরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ আছে। পূর্ব্বকালে যখন অন্যান্য দেশের লোকেরা এসব বিষয়ের কিছু জানিত না, তখন চীনেরা অনেক রকম কল ও সঙ্কেত জানিত। তখন যাহা কিছু আশ্চর্য্য হইত, প্রায় সবই চীনেরা প্রস্তুত করিত। এইরূপেই চীনেদের এরূপ নাম হইল।

যে ছাপাখানা দ্বারা পৃথিবীর এত উপকার হইয়াছে, তাহারও প্রথম মতলবটা চীনেদেরই মাথায় খেলিয়াছিল। গল্প আছে খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীতে চীন রাজমন্ত্রী কুং তেও প্রথম ছাপিবার সংকেত আবিষ্কার করেন। অনেক হুকুম, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি এত অধিকবার লিখিতে হইত এবং তাহাতে এত অধিক সময় লাগিত যে, তাহাতে রাজকার্য্য সুন্দররূপ চলিবার বড়ই ব্যাঘাত হইত। সুতরাং তিনি মনে করিলেন যে, ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় একটা বাহির করা আবশ্যক। তিনি দেখিলেন যে সেই সকল হুকুম কাঠে খোদাই করিয়া, তাহাতে কালী দিয়া তাহা হইতে ছাপ তুলিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে তিনি মুদ্রাঙ্কণের মূলমন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। সেই সময়ে পী চিং নামক একজন কর্ম্মকার বাস করিত। সে দেখিল যে মস্ত একটা হুকুম কাঠে খোদাই করার চাইতে আলাদা আলাদা অক্ষর খোদা থাকিলে সেইগুলি আবশ্যক মত একত্র করিয়া অতি সহজেই কাজ চালান যাইতে পারে। সে মাটির অক্ষর তৈরী করিয়া তাহাদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে পৃথক অক্ষর রাখিলে বেশ কাজের সুবিধা হয়। কিছুদিন পরে পী চিং, মরিয়া গেল। তাহার ছেলেদের বুদ্ধি আর ত ততটা পাকা হয় নাই, সুতরাং তাহারা মনে করিল যে বাবা কি ছেলে খেলা নিয়াই জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছেন! এই ভাবিয়া তাহারা পী চিঙের অক্ষরগুলি ফেলিয়া দিল। শীল মোহরের গোছ করিয়া কাঠ খোদাই করা ভিন্ন ছাপার কার্য্যের আর অধিক উন্নতি চীনেদের দ্বারা হইল না।

জর্ম্মনি দেশে গুটেন্‌বর্গ নামক একজন লোক ছিলেন; তিনিই প্রকৃত পক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তিনিও প্রথমে খোদাই করা কাঠ হইতেই ছাপ তুলিতেন। ফষ্ট্ নামক এক ব্যক্তি গুটেন্‌বর্গের আবিষ্কারে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার সহিত যোগ দিয়া এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরেই গুটেন্‌বর্গ বুঝিতে পারিলেন যে হাতে ছাপ না তুলিয়া ছাপ তোলার জন্য কোনরূপ যন্ত্র থাকিলে বড়ই ভাল হয়। তিনি একটী যন্ত্রের কথা ভাবিয়া কনরেড্ সাম্প্যাক্ নামক একজন ছুতোরকে বলিলেন। সে তাঁহাকে এক কাঠের ছাপাখানা প্রস্তুত করিয়া দিল। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে (১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) কষ্টার নামক একজন লোক প্রথমে পৃথক অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ ছাপিতে আরম্ভ করেন। এই প্রথম মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ এখন অতি দুষ্প্রাপ্য হই-

য়াছে। অল্পদিন হইল নিউইয়র্ক নগরে (আমেরিকায়) ইহার একখণ্ড নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল; তাহার মূল্য ১৮০০০৲ আঠার হাজার টাকা হইয়াছিল।

ইংরাজেরা জর্ম্মণদের নিকট হইতেই এই বিদ্যা লাভ করেন। উইলিয়ম ক্যাক্‌ষ্টন্ নামক একব্যক্তি কলোন্ নগরে আসিয়া ছাপার কাজ শিক্ষা করেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে ইংলণ্ডের রাজা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে একটী ছাপাখানা স্থাপন করিতে অনুমতি দেন। ওয়েষ্টমিনষ্টার এবি নামক গীর্জাতে সেই ছাপাখানা স্থাপিত হয়।

ইংলণ্ডে ক্যাক্‌ষ্টনের যে গৌরব, আমাদের দেশে মহাত্মা কেরীরও সেই গৌরব হওয়া উচিত। কেরী সাহেবই প্রথমে এদেশে ছাপাখানা আনয়ন করেন। তাঁহারই যত্নে প্রথম বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইল। শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। তখনকার ছাপা এখন দেখিলে হয়ত তোমরা হাসিবে। আমি বহুকালের পুরাতন একখানি অভিধান দেখিয়াছি। তাহাতে বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি অর্থ লেখা আছে। অভিধানখানি ঠিক ওয়েবষ্টারের বড় ডিক্সনারির ন্যায় বড় হইবে। ইহার বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেখিতে হাতের লেখা অক্ষরের মত, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। এখন অক্ষরের অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু এক কথা মনে রাখিও, কেরী সাহেবের নিকট আমরা এই সকলের জন্য ঋণী।

আজ কাল ছাপাখানার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের দুই একটী প্রেস দেখিয়া বুঝিতে পারিবে না। নিম্নে প্রধান পাঁচটী ছাপার কলের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। ম্যারিননির কৃত। এই কল প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০০ হইতে ২০,০০০ করিয়া ছাপে।

২। জুলিস্ ডেরীকৃত। এই কল প্রতি ঘণ্টায় ১৬০০০ হইতে ৩২০০০ করিয়া ছাপে।

৩। হো সাহেব কৃত। আমেরিকার তিনটী প্রধান খবরের কাগজ ছাপিতে এইরূপ তিনটী কল ব্যবহৃত হয়। এই কল খবরের কাগজ ছাপিয়া কাটিয়া আঠা দিয়া জুড়িয়া এবং ভাঁজ করিয়া দেয়। এবং এত কাজ করিয়াও ঘণ্টায় ২৫০০০ হিসাবে ছাপে।

৪। এলুজে কোম্পানির প্রেস। এই প্রেসে ঘণ্টায় ৩৫০০০ হইতে ৭০,০০০ করিয়া ছাপা হইতে পারে।

৫। স্কট্ রোটারি প্রেস। ইহাতে ঘণ্টায় ৩০,০০০ হিসাবে ৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট কাগজ ছাপা কাটা ও ভাঁজ করা হয়।

স্নেহলতার দয়া।

বৈশাখ মাস। দারুণ গ্রীষ্ম, রৌদ্রের তেজে চারিদিক যেন অগ্নিময় হইয়াছে; কাহারও ঘরের বাহির হইবার সাধ্য নাই। এমন সময় ঐ দেখ রাস্তায় একটী স্ত্রীলোক দুটি ছেলে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে। এত রৌদ্রে, এই দুই প্রহরের সময় ইহারা কোথায় যাইতেছে? আর সকলের মত ঘরে না থাকিয়া ইহারা এমন সময় কেন বাহির হইয়াছে? আবার চাহিয়া দেখ স্ত্রীলোকটীর মুখখানি নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়িতেছে। কেন, ইহাদের কি কোন বিপদ ঘটিয়াছে? হ্যাঁ, ইহাদিগের নিতান্তই বিপদ। কিছুদিন হইল ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদিগের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। স্বামী যাহা উপার্জ্জন করিত তাহাতে কোন মতে দিন চলিয়া যাইত, তাহার মৃত্যু হওয়াতে ইহারা নিতান্ত বিপদে পড়িয়াছে। ইহাদিগের আর কেহ এমন নাই যে খাইতে পরিতে দেয়, বা অন্য প্রকারে সাহায্য করে।

এখন ঐ অনাথা স্ত্রী ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে। কিন্তু ভিক্ষা সকল সময় মিলে না! কাল যাহা ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছিল, তাহাতে অতি কষ্টে কাল এক বেলা চলিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতে তাহাদিগকে উপবাস করিতে হইয়াছে। নানা কষ্টে স্ত্রীলোকটীরও কঠিন ব্যারাম হইয়াছে, রোগ যাতনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, ছট্ ফট্ করিয়া কাটাইয়াছে, প্রাতঃকালে তাহার একটু ঘুম আসিয়াছে, এমন সময় তাহার ছেলে দুটি জাগিয়া উঠিল। আগের দিন রাত্রিতে কিছু খায় নাই বলিয়া তাহারা যার পর নাই ক্ষুধিত হইয়াছিল। এখন উঠিয়া মাকে জাগাইয়া তুলিয়া খাবার চাহিতে লাগিল। অবোধ ছেলেরা জানিত না যে,ঘরে কিছুই খাবার নাই! তাহারা কেবল মাকেই জানে,তাহারা জানে মা থাকিলে আর খাবার ভাবনা নাই, তাই মাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিল "মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে।" অনাথা স্ত্রীলোকের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যখন এই কথা কাণে গেল—"মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে" তখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেদের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলেরা তাহা বুঝিল না, আরও আব্দার করিতে লাগিল,—"মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে।" তখন সেই অনাথা বিধবা আর অন্য উপায় না দেখিয়া ছেলেদুটীকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার জন্য বাহির হইল। রোগ যন্ত্রণায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, খানিক চলিয়া এক একবার বসিয়া পড়িতেছে, আবার খানিক চলিতেছে। এই ভাবে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, কিন্তু এই দুই প্রহর বেলা হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত কেহ দয়া করিয়া তাহাকে একমুষ্টি ভিক্ষা দেয় নাই, যাহা দ্বারা ছেলেদুটীকে একটু শান্ত করিতে পারে। রোগে, অনাহারে, পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আর চলিতে না পারিয়া সেই অনাথা একটা বাড়ীর সম্মুখে বসিয়া পড়িল; এবং আর কোন উপায় না দেখিয়া হাতের উপর মাথাটী রাখিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল। ছেলেরাও ক্ষুধার জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতেছে! তাহারা কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "মা খেতে দে" "মা খেতে দে।" যে বাড়ীর সম্মুখে সেই অনাথা স্ত্রীলোক বসিয়া পড়িয়াছিল, সে বাড়ীটী বেশ বড়। খানিক বসিয়া অনাথা স্ত্রীলোকটী ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বাড়ীর কর্ত্তা আহারের পর গিয়া শুইয়াছেন, ভৃত্যেরা তাঁহাকে বাতাস করিতেছে; সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বাবু এখন ঘুমাইবেন। বাবুর ছেলেও আহারের পর নীচের বসিবার ঘরে একটা সোফার উপর শুইয়া বিশ্রাম করিবার উদ্যোগ করিতেছেন,এমন সময় সেই অনাথা স্ত্রীলোক কাতর স্বরে বলিল "মাগো দুটী ভিক্ষা পাই।" সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা চিৎকার করিয়া উঠিল "মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে"। বাবুরা আহার করিয়াছেন, এখন একটু নিদ্রা যাইবেন, এমন সময় বাহিরে কে চিৎকার করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত করিতেছে? বাবুর ছেলে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একজন স্ত্রীলোক ভিক্ষা চাহিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম করিলেন, বাহির হইয়া যাও। ছেলে দুটি বড়ই কাঁদিতেছে, মায়ের প্রাণ সহ্য করিতে না পারিয়া অনাথা বিধবা আবার ভিক্ষা চাহিল; বাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, বাহির হইয়া যাও। এই শব্দ বাড়ীর মধ্যে পৌঁছিল। বাবুর একটি মেয়ে ছিল, তাহার বয়স অধিক নহে, মেয়েটির নাম

স্নেহলতা। স্নেহলতা এই চিৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল, তাহার দাদা রাগে কাঁপিতেছেন, আর দেখিল এক অনাথা বিধবা মলিন বিষণ্ণ মুখে বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। সঙ্গে দুটী ছোট ছেলে, তখনও বলিতেছে "মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

"মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে" এই কথা যেন স্নেহলতার বুকে বিঁধিল। আর সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে তাহার নিজের ছোট ছোট দুখানি হাত দিয়া তাহার দাদার হাত দুখানি ধরিল, ধরিয়া সজল নয়নে বলিল "দাদা ইহারা বড় দুঃখী, ওদের উপর কেন রাগ কর, তোমার পায়ে পড়ি উহাদিগকে তাড়াইয়া দিও না। ভগিনীর এই কথা শুনিয়া ছেলে বাবুর রাগটা যেন একটু কমিল, তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন স্নেহলতা ঐ অনাথা স্ত্রীলোকটীকে ডাকিয়া ফিরাইল, এবং তাহাদিগকে একটা জায়গায় বসাইয়া দৌড়িয়া উপরে গেল। স্নেহলতা প্রকৃতই স্নেহলতা! স্নেহলতার অন্তর স্নেহ, ভালবাসা, দয়াতে পূর্ণ। পরের দুঃখ দেখিলে তাহার বুক ফাটিয়া যাইত; চক্ষের জল রাখিতে পারিত না। বাড়ীতে সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্নেহলতা তখন পর্য্যন্তও খায় নাই। স্নেহলতাদের বাড়ীর পাশে একজনদের, তারই বয়সের, একটি মেয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, তাই সে সেই বাড়ীতে গিয়া সেই মেয়ের মার কাছে বসিয়াছিল। তাই তার আজ এখনও খাওয়া হয় নাই। স্নেহলতা উপরে গিয়া তাহার খাবার সমস্ত জিনিস আনিয়া সেই অনাথার হাতে দিল। অনাথার চক্ষের জল উছলিয়া উঠিল; স্নেহলতার এত দয়া দেখিয়া তাহার চক্ষের জল আরও অধিক পড়িতে লাগিল। স্নেহলতা আবার উপরে গেল। উপরে তাহার বাবার ঘরে যাইয়া তাঁহার নিকট বলিল, "বাবা বাহিরে একজন বড় দুঃখী স্ত্রীলোক দুটি ছোট ছেলে লইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে।" স্নেহলতা এমন ভাবে এই কথাগুলি বলিল যে তাহার পিতা তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছে। তাহার মুখখানি সেই অনাথা বিধবার দুঃখ দেখিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে যেন তাহার সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। ইহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য! তাঁহার ছেলে যখন সেই অনাথাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য চিৎকার করিতেছিল তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন, আর এখন স্নেহলতার দয়াও দেখিলেন; ছেলের নিষ্ঠুরতা ও মেয়ের দয়া দেখিয়া অনেক শিখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্নেহলতার হাতে কয়েকটী টাকা দিয়া বলিলেন "মা এই লও, সেই অনাথাকে দিয়ে এস।" স্নেহলতা আহ্লাদে সেই টাকা লইয়া নীচে দৌড়িয়া গেল, এবং সেই অনাথার হাতে টাকা কয়েকটী দিল।

স্নেহলতা গৃহলক্ষ্মী। এই গৃহলক্ষ্মী যে গৃহে নাই, সে গৃহ ধন রত্নে পূর্ণ থাকিলেও শ্মশান। স্নেহলতার কাছে আজ তাহার পিতা ভ্রাতা যাহা শিখিলেন তাহা আর জন্মে ভুলিলেন না।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি কত অসহায়া অনাথা এই ভাবে দিনপাত করে! কেহবা সারাদিন পরে একমুঠা খাইতে পায়,—কেহবা তাহাও পায় না, অনাহারেই হয়ত দিনপাত করে। কতলোক দরিদ্রতার জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করে। আমরা হয়ত নানাপ্রকার ভাল ভাল খাবার

জিনিস দিয়া প্রত্যহ আহার করিতেছি, আর একজন হয়ত কেবল একমুঠা ভাতও পাইতেছে না। দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে দুই প্রহরের সময় বা দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, মুষ্টি ভিক্ষার জন্য কতজন দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, আমরা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছি না। আমরা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ লইয়াই ব্যস্ত, আমার প্রতিবাসী যে অনাহারে মরিতেছে, কত দুঃখী-লোক যে একমুঠা ভাতের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আমরা দেখিতেছি না।

সখার পাঠক পাঠিকা! দুঃখীকে কেমন করিয়া দয়া করিতে হয় তোমরা কি স্নেহলতার কাছে আজ তাহা শিখিবে? পাঠিকাগণ! তোমরা কি স্নেহলতার ন্যায় স্নেহময়ী হইবে?

নানা প্রসঙ্গ।

তোমাকে যদি কেহ লাঠি লইয়া মারিতে আইসে, তবে তুমি কি কর?—দৌড়াইয়া পলাও। আততায়ীর হাত এড়াইবার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু অনেক জানোয়ার ইহা অপেক্ষা অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করে।

অনেক জানোয়ার এইরূপ অবস্থায় পড়িলে মড়ার মত হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপে অনেক সময় বিপদ হইতে রক্ষা পায়।

পীউইট্ পাখীর বাসার কাছে মানুষ গেলে পীউইট্ ভান করে যেন সে ভাল করিয়া উড়িতে পারে না। এরূপ পাখীকে ধরা সহজ মনে করিয়া অনেকেই তাহার পেছনে পেছনে যায়। এইরূপে পাখী তাহাকে ভুলাইয়া বাসা হইতে দূরে লইয়া যায়।

কেন্নাইকে বিরক্ত করিলে সে শরীর গুটাইয়া গোলাকার হইয়া থাকে। ইহা হইতেই কেন্নাই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হেঁয়ালিটী উৎপন্ন হইয়াছে:—

"ছ'কুড়ি ছ'খানা পা,
রক্ত বরণ গা,
টোকা দিলে টাকাটী হয়
তাকে তুই খা।"

উট পক্ষীকে কুকুরেরা তাড়া করিলে যখন সে মনে করে যে আর ইহাদের হাত এড়ান গেল না তখন মাথাটী বালির নীচে গুঁজিয়া রাখে। অবশ্য ইহাতে বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উটপক্ষী প্রথমে মনে করে যে বড়ই নিরাপদ হইয়াছে।

এক প্রকারের পোকা আছে তাহারা নিজের বাড়ী ঘর সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। কোনরূপ ভয় পাইলেই ঘরের ভিতর লুকাইয়া থাকে।

এক প্রকারের ফড়িং আছে, তাহার পাখা দুটী একত্র করিলে দেখিতে ঠিক গাছের পাতার মতন হয়। তখন আর তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায় না। এইরূপে তাহারা ফড়িং-খাদক পাখীদের হাত হইতে রক্ষা পায়।

গুগ্‌লিরা যখন নিতান্তই বেকায়দা দেখে তখন তাহারা মুখের কাছের দরজাটী বন্ধ করিয়া দেয়।

শম্বুকজাতীয় অনেক প্রকার জলজীব আছে, তাহারা যখন দেখে যে শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই, তখন এক প্রকার কাল জিনিস পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে জলটা অনেক দূর পর্য্যন্ত এত কাল হইয়া যায় যে, আর তাহার ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অবসরে সে পলাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে যায়।

কচ্ছপগুলির কাণ্ড কারখানা সকলেই দেখিয়াছ, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার আবশ্যক দেখি না। এক প্রকারের কচ্ছপ আবার শুধু গলাটী আর হাতপাগুলি ভিতরে লইয়া গিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তাহার শরীরের আবরণটা কবাটের মত হইয়া সেই হাত পাগুলিকে ঢাকিয়া রাখে।

শেয়ালগুলি যে কতবার মরিয়া থাকে তাহা আর কি বলিব। এ বিষয়ে শেয়ালের সঙ্গে আর কেহ পারিবে না।

বুনোরোহিতের আঁইস বলিয়া এক প্রকার আঁইস অনেক জায়গায় বিক্রয় হয়; অনেকে তাহাতে আংটী প্রস্তুত করিয়া হাতে দেয়। বাস্তবিকই যে জঙ্গলে কোনরূপ রোহিত মাছ থাকে বা ঐগুলি যে মাছেরই আঁইস, তোমরা এরূপ মনে করিও না। ঐ সকল আঁইস এক প্রকার চতুস্পদ জানোয়ারের। আমাদের দেশে এইরূপ জানোয়ার অতি অল্পই আছে; সুতরাং আমরা উহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাই না, দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় অনেক জন্তু বাস করে। এই সকল জন্তুকে আর্মেডিলো বলা হয়। আর্মেডিলো অনেক প্রকারের হইয়া থাকে; অপর পার্শ্বে একটীর ছবি দেওয়া গেল।

দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক বাঁদর থাকে; তাহাদের জ্বালায় আর্মেডিলো বড় ব্যতিব্যস্ত হয়। বাঁদরগুলি তাহাদিগকে প্রথমে খোঁচায়। যদি তাহারা গর্ত্তে প্রবেশ করে তবে লেজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া যারপর নাই বিড়ম্বনা করে। যে আর্মেডিলোটীর ছবি দেওয়া হইল, কেবলমাত্র তাহারই নিকট বানরেরা কিঞ্চিৎ জব্দ থাকে। এই আর্মেডিলোর নাম বল্ আর্মেডিলো (Ball Armadillo)। বল আর্মেডিলো উপায়ান্তর না দেখিলে হাত পা গুটাইয়া লেজ মাথা গুঁজিয়া পাছা সামনে টানিয়া লইয়া বেশ একটী নীরেট গোলাকার জিনিস হইয়া থাকে। অপর পৃষ্ঠার (ছবি দেখ।)

বাঁদরেরা আর তখন ধরিয়া টানিবার মত কোন জিনিস পান না; সুতরাং অপ্রতিভ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়।

ফুলের সাজি।

পঞ্চম অধ্যায়।

মনোরমার বিচার।

মনোরমা জাগিয়া দেখিল নিকটে দুই জন রাজপুরুষ দণ্ডায়মান। তাহারা মনোরমাকে তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য সঙ্কেত করিল, সেও কিছু না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। সে সময়ে তাহার প্রাণের ভিতর যে কি হইতেছিল তাহা কে বলিতে পারে? যদি কেহ কখন এমন অবস্থায় পড়িয়া থাকেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন, বলিতে পারিবেন না। তাহার কণ্ঠ তালু শুকাইয়া গেল, চরণ যেন চলে না, বুক ধড় ধড় করিতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারীরা তাহাকে বিচার-মন্দিরে লইয়া গেল। হায়! মনোরমার কপালে এত দুঃখও ছিল।

বিচারপতি তাহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর প্রদান করিল। মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আর কত সহ্য করিবে?

বিচারক বলিলেন "বাছা, কাঁদ আর যাহা কর, আমার বেশ বোধ হইতেছে, একাজ তুমি ভিন্ন আর কেহ করে নাই, আমাকে তুমি প্রতারণা করিতে পারিবে না, বরং নিজ দোষ সহজে স্বীকার কর।"

মনোরমা, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না ধর্ম্ম অবতার! আমি ইহার কিছুই জানি না। আমি যাহা করি নাই কিরূপে তাহা করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিব!" বিচারপতি বলিলেন, "রাজ কুমারীর একটী দাসী তোমার হাতে সেই আংটী দেখিয়াছে, আর মিথ্যা কথা বলিও না।" তখন তাঁহার আজ্ঞায় নিকটস্থ ভৃত্যেরা মায়াকে তথায় উপস্থিত করিল।

আমরা বিচারের কথা পরিত্যাগ করিয়া রাজবাটীতে মায়া কি অবস্থায় ছিল তাহা পাঠক পাঠিকাকে জ্ঞাপন করিব।

রাজকুমারী হেমলতা মনোরমাকে মহামূল্য বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে দেন নাই এই

হিংসায় ও রাগে মায়া জ্বলিয়া উঠিল এবং যাহাতে মনোরমা কুমারীর চক্ষুঃশূল হয় তাহা করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। সে রাজ বাটীর চারি দিকে সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইল—"আংটী আর কে নেবে, সেই হতভাগা চাষার মেয়েটারই এই কাজ, যখন সে রাজ কন্যার গৃহ হইতে নামিয়া আসিতেছিল আমি তার হাতে সেই হীরার আংটী দেখিয়াছি, সে যেই আমায় দেখিল অমনি চম্‌কিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি আংটী-টাকে কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া ফেলিল। আমি তখন জোর করিয়া তাহার কাপড় দেখিলাম না, ভাবিলাম রাণীমা আংটীটা উহাকে দিয়া থাকিবেন; তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসেন এবং ইহার আগেও অনেক জিনিস দিয়াছেন। আরও ভাবিলাম যদি সে ঐ আংটী চুরী করিয়া থাকে তাহা হইলে এখনি আংটীর খোঁজ পড়িবে, তখন আমি যাহা দেখিয়াছি বলিয়া দিব। ভাগ্যবলে আমি সে সময়ে ঘরে ছিলাম না, তাহা হইলে মেয়েটা হয়ত আমাকেই চোর বলিয়া ধরাইয়া দিত।" রাজপরিবারগণ মনে করিল মায়া যাহা বলিতেছে ইহাই ঠিক।

মায়া বিচারপতির পার্শ্বে সাক্ষীরূপে দণ্ডায়-মান হইল, বিচারক বলিলেন,—"মায়া! ঈশ্বর সকল স্থানে আছেন তাঁহার সমক্ষে সত্য করিয়া বল তুমি আংটীর বিষয় কি জান?"

মায়ার বুক কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু রাক্ষসী বিচারপতির কথায় বা নিজের বিবেকের কথায় কর্ণপাত করিল না—ভাবিল "যদি আমি সত্য বলি তবে আমার কাজটিত যাবেই, লাভের মধ্যে আমাকে কারাগারে বন্দিনী হইতে হইবে, তাহা হইবে না।" সে বলিল, "মনোরমা তোর মনে এত ছিল, আংটী আমি যে তোর হাতে দেখিয়াছি এখন অস্বীকার কর্‌ছিস কি করে?"

মনোরমা তাহার মিথ্যা কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল, সে মায়ার মত নহে যে তাহাকে ফিরা-ইয়া কটু বলিবে; অবিরল ধারে তাহার নয়ন হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি কখন আমার হাতে আংটী দেখ নাই, কেন তুমি অকারণে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছ, আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই।"

কিন্তু মায়ার মন কিছুতেই বিচলিত হইবার নয়, সে নিজের ইষ্ট অনিষ্ট খুব বুঝে। মায়া ক্রমাগত এক কথাই বলিল। বিচারপতি নানারূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না—মায়া বড় চতুর।

তখন বিচারপতি বলিলেন "মনোরমা তুমি নিশ্চয়ই দোষী, মায়া তোমার হাতে আংটী দেখি-য়াছে, এবং এই সমস্ত ঘটনাগুলি দেখিলে বোধ হয় তুমি ভিন্ন আর কেহ একাজ করে নাই, আংটী কোথায় রাখিয়াছ বল।"

মনোরমা তখনও সেই এক কথা বলিল,—বিচারক আজ্ঞা দিলেন, "যতক্ষণ না দোষ স্বীকার করিবে ততক্ষণ ইহাকে বেত্র প্রহার কর" কিন্তু কিছুতেই সত্য মিথ্যা হয় না। প্রহার খাইয়াও মনোরমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল, "আমি কিছু জানি না, কিছু জানি না" হায়! কেহই তাহার কথা শুনিল না।

অবশেষে তাহাকে আবার কারাগারে পাঠান হইল। মনোরমার দশা দেখিলে আজ পাষা-ণও গলিয়া যায়, তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের শ্রী কিছুই নাই, শরীর ক্ষত বিক্ষত

হইয়াছে এবং ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। প্রহারের বেদনায় সে অস্থির হইল, সেদিন অনাহারেই কাটিয়া গেল এবং রাত্রে অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে হরিকে প্রাণের সকল জ্বালা নিবেদন করিল। পরে সে কতক শান্তি বোধ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইল।

পরদিন আবার তাহাকে বিচার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। বিচারপতি দেখিলেন বল প্রয়োগে কোন ফল হইল না, তিনি এখন মিষ্ট কথায় ও প্রতারণা বাক্যে মনোরমার মনের কথা জানিতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, "তুমি জান চুরি করার শাস্তি প্রাণ দণ্ড, তোমায় এই দণ্ড পাইতে হইবে। কিন্তু এখনও যদি বল কোথায় আংটী রাখিয়াছ তাহা হইলে আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব। কাল তোমায় যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট হইবে, আর কিছুই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে না, তোমার পিতাকেও ছাড়িয়া দিব, আবার সুখে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে এখনও বল আংটী লইয়া কি করিয়াছ? মৃত্যু ও জীবন তোমার কথার উপর নির্ভর করিতেছে, দেখ আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি।"

মনোরমা একই কথা বলিল। বিচারপতি তাহার আশ্চর্য্য পিতৃভক্তি বুঝিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "দেখ মনোরমা তুমি যদি তোমার আপনার প্রাণের উপর যত্ন না কর, বৃদ্ধ পিতার কথা যেন তোমার মনে থাকে। তোমার পিতার শুভ্র-কেশযুক্ত মস্তক জল্লাদের অস্ত্রের দ্বারা দুই খণ্ড হইবে, তাহা কি দেখিতে ইচ্ছা কর? তোমার পিতার পরামর্শে তুমি তোমার দোষ স্বীকার করিতেছ না, তাহা কি আমি বুঝি নাই?"

মনোরমা এই কথা শুনিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইল, সে জড়ের ন্যায় বিহ্বলের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কথা সরিল না।

কঠিন হৃদয় বিচারপতি তবুও বলিলেন, "স্বীকার কর, "হাঁ" এই সামান্য কথায় তোমার পিতার জীবন রক্ষা হইবে।"

তখন সে একবার ভাবিল "যদি একটা মিথ্যা কথা বলিলে পিতার প্রাণ রক্ষা হয় ক্ষতি কি, বলি, আমি আংটী লইয়াছিলাম বটে কিন্তু পথে আসিবার সময় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার মনের ভিতর হইতে তখনি কে বলিল 'না মনোরমা মিথ্যা বলিও না সত্য বল যাহা হয় হইবে, মিথ্যার সমান পাপ নাই'; মনোরমা অন্তরে ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিল, দয়াময় হরি তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর আমাদিগকে হয় রাখ, নয় মার।"

মনোরমা কাতরস্বরে তখন বলিল "যদি আমি বলি আমি আংটী লইয়াছি তাহা হইলে আমার মিথ্যা বলা হইবে আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা বলিব না, কিন্তু যদি প্রাণ দণ্ড গ্রহণ করা হয় তবে যেন শুধু আমারই প্রাণ দণ্ড হয়, আমার বৃদ্ধ পিতাকে যেন কোন শাস্তি না দেওয়া হয়! বৃদ্ধ বলিয়া তাঁহার প্রতি দয়া করুন। আমি তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।"

উপস্থিত ব্যক্তিগণ বালিকার কথা শুনিয়া গলিয়া গেল, কঠিন প্রাণ বিচারকেরও হৃদয় গলিল, তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। ধন্য মনোরমা তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস! ধন্য তোমার সত্যবাদিত্ব! ধন্য তোমার পিতৃভক্তি!

জানোয়ারের বুদ্ধি।

আবার পাঠক পাঠিকা! তোমাদিগকে গুটিকত জানোয়ারের বুদ্ধির গল্প শুনাইব। তোমরা জান হাতি বড় বুদ্ধিমান জন্তু। হাতির বুদ্ধির অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তোমরাও অনেক গল্প শুনিয়া থাকিবে। আজ আর একটা শুন। দুই জন ইংরাজ একদেশে বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পরের বন্ধু। এই দুই জন ইংরাজের মধ্যে একজনরে একটী হাতি ছিল। তিনি হাতিটীকে বড় ভাল বাসিতেন। একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। তখন তিনি তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে হাতিটীকে রাখিয়া যান। তাঁহার বন্ধুর স্ত্রীর হাতিটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল, পাছে তত্ত্বাবধানের ক্রটিতে হাতিটী রোগা হইয়া যায়, মনে এই ভয় ছিল, এই জন্য তিনি সর্ব্বদা হাতিটী তদারক করিতেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখা গেল যে, হাতিটী রোগা হইয়া যাইতেছে। দেখিয়া বিবি বড় ভাবিত হইতে লাগিলেন। ভিতরের কথা এই, যে ঐ হাতির মাহুত বড় দুষ্ট লোক। সে প্রত্যহ হাতির খোরাকের দানা হইতে এক এক পুটুলি দানা লুকাইয়া রাখিত, এবং তাহা চুরি করিয়া বিক্রয় করিত। বিবি তাহা ধরিতে পারিতেন না বলিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার মনে মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইত। একদিন হাতির আহারের সময় তিনি স্বয়ং আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঐ দুষ্ট মাহুত বিবি আসিবার পূর্ব্বেই এক পুটুলি দানা চুরি করিয়া নিজের বগলে রাখিয়াছিল; এবং একখানি কম্বলে আপনার সমুদায় শরীর ঢাকিয়া, সাধু সাজিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিতেছিল। মেম যখন তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুই নিশ্চয় হাতির দানা চুরি করিস্ নতুবা হাতি রোগা হইতেছে কেন? সে ভদ্রলোক বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে হাতিটী রাখিয়া গিয়াছে, আমি হাতিটী রোগা করিয়া ফিরাইয়া দিব কি?" সেই দুষ্ট মাহুত মিষ্ট বচনে বলিল "মেম! আমি কি উহার আহারের দানা চুরি করিতে পারি; ও আমার বেটা, আমার মানিক।" এই বলিয়া হাতিকে অনেক আদর করিতে লাগিল। দানার পুটুলিটী তখনও তাহার বগলে আছে। সে যখন দানা চুরি করে হাতি তখন দেখিয়াছিল, এবং সে যে পুটুলিটী বগলে লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহাও হাতি জানিত। সুতরাং যখন সে কপট ভালবাসা দেখাইয়া অনেক আদরের কথা বলিতেছে, তখন হাতি থস্ করিয়া তাহার গলার কম্বলখানি কাড়িয়া লইল এবং বগল হইতে পুটুলিটী টানিয়া বিবির সমক্ষে ফেলিয়া দিল। কি বুদ্ধি!

ক্রমশঃ

ধাঁধা।

গত সেপ্টেম্বর মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। ৩৬ পয়সা লোকসান হইয়াছিল।

ডিসেম্বর, ১৮৮৬।

জানোয়ারের বুদ্ধি।

আর একটী হাতির বুদ্ধির কথা শোন। একটা হাতির একজন মাহুত ছিল। সে মাহুত সস্ত্রীক হাতির কাছেই থাকিত। মাহুতের স্ত্রী হাতিকে ভাল বাসিত, হাতিও তাহাকে ভাল বাসিত। একবার মাহুত আপনার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া একদিন রাত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিল, এবং তাহার মৃত দেহ নিকটেই একস্থানে পুতিয়া রাখিল। দুই এক দিনের মধ্যেই আর একটা স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে বলিয়াই বোধ হয় পূর্ব্ব স্ত্রীকে মারিয়াছিল। যাহা হউক সে নূতন স্ত্রীকে আনিয়া হাতির সহিত প্রথমে পরিচয় করিয়া দিল। বলিল এই তোর স্বামিনী, তুই ইহার কথা মান্য করিস্। হাতি সেই হত্যা কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়াছিল; সুতরাং সে যখন নবাগত স্ত্রীকে পরিচয় করিয়া দিতেছিল, তখন হাতি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখন কিছু বলিল না। পরে মাহুত যখন বাহিরে গেল, তখন হাতি সেই স্ত্রীলোককে একেলা পাইয়া তাহাকে শুঁড় দিয়া ধরিল ও টানিয়া লইয়া তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীকে যেখানে গোর দেওয়া হইয়াছিল সেখানে লইয়া গেল, এবং দন্তের দ্বারায় গোর খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মৃত শরীরটী বাহির করিয়া সেই স্ত্রীলোকের সমক্ষে ফেলিয়া দিল। হাতির বাক্‌শক্তি থাকিলে হয়ত বলিত "দেখ্ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক, কিরূপ পুরুষকে বিবাহ করিয়াছিস্।"

তোমরা জান ইংরজেরা কুকুরকে বড় ভাল বাসে। সাধে কি এত ভালবাসে, কুকুরের মত প্রভুর উপকারী বন্ধু মানবের অতি অল্পই আছে। তবে একটী কুকুরের গল্প শুন। স্কট্‌লণ্ড দেশের নাম কি শুনিয়াছ, নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, স্কট্‌লণ্ড দেশ ইংলণ্ডের উত্তরে। তোমরা ম্যাপ খুলিয়া দেখিবে। স্কট্‌লণ্ড দেশ পর্ব্বতময়। সেখানকার মেষপালকদিগকে পাহাড়ের উপরে মেষ চরাইতে হয়। একবার স্কট্‌লণ্ডের একজন মেষপালক এক পাহাড়ের উপরে মেষ চরাইতে গিয়াছিল তাহার সঙ্গে একটী কুকুর ও তাহার একটী ৪ চারি বৎসরের ছেলে ছিল। সে ব্যক্তি মেষ চরাইতেছে, ছেলেটি কুকুরের সহিত খেলা করিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ কুয়াসাতে দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধানদেশে সময়ে সময়ে এইরূপ হঠাৎ কুয়াসা হইয়া থাকে। তখন আর পথ ঘাট দেখিতে পাওয়া যায় না। কুয়াসা কয়েক ঘণ্টা থাকে,

পরে কাটিয়া যায়। সেদিন্ কুয়াসা হইয়া একেবারে পাহাড় ছাইয়া ফেলিল। সে ব্যক্তি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কুকুরটীকে সঙ্গে করিয়া মেষ খুঁজিতে গেল। ছেলেটীকে একটী স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেল। মেষ খুঁজিয়া সংগ্রহ করিতে তাহার কিছুক্ষণ বিলম্ব হইল। আসিবার সময় কুয়াসা এত গাঢ় হইয়াছে যে, আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ছেলেরও সাড়া শব্দ নাই। নাম ধরিয়া সেই ঘন কুয়াসার মধ্যে বার বার ডাকিতে লাগিল। উত্তর নাই, অবশেষে ভাবিল, বাড়ী ত নিকটে,যদি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বাড়ী গিয়া থাকে। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গিয়া দেখে সেখানেও নাই। তখন সর্ব্বনাশ! রাত্রি সমাগত, কোথায় অন্বেষণ করে। তাহার স্ত্রী আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে জানিতে পারিল কুকুরটীও পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসে নাই। দুশ্চিন্তার ও মনের ক্লেশে রাত্রি পোহাইয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শোকার্ত্ত পিতা আবার শিশুর অন্বেষণে বাহির হইল। পাহাড়ে পাহাড়ে, ঝোপে জঙ্গলে, গুহাতে খুঁজিয়া বেড়াইল; কোন স্থানে পুত্রের সন্ধান পাইল না। নিরাশ মনে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল; আসিয়া শুনিতে পাইল যে, কুকুর তাহার আহারের সময়ে যথাকালে কোথা হইতে আসিয়াছিল, নিজের খাবার খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন কুকুরটীর দেখা সাক্ষাৎ নাই, মেষপালক শিশু অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। আর এক রাত্রি দুঃসহ যাতনায় কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে আবার সেই অনুসন্ধানে বাহির হইল। তাড়ি বিতাড়ি করিয়া খুঁজিতে লাগিল। কোন স্থানেই উদ্দেশ পাওয়া গেল না। আর একদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন প্রাতে মেষপালক মনে করিল যে, সে দিন আর বাহিরে যাইবে না, কুকুর খাইয়া কোথায় যায় দেখিতে হইবে। সে দিন প্রাতে কুকুর যথা সময়ে খাইতে আসিল, কিন্তু তাহার প্রভু দেখিল যে, সে সমুদয় খাবার না খাইয়া বড় একখান রুটি খণ্ড মুখে করিয়া লইয়া চলিয়াছে? তখন সে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গিয়া দেখে শিশুটী পাহাড়ের অনেক শত হাত নীচে গড়াইয়া পড়িয়া এক গুহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া আছে। সেখানে নিরাপদে এক পাথরের উপরে বসিয়া কুকুরের দত্ত রুটী খণ্ড খাইতেছে। তখন তাহার কি আনন্দ হইল! কুকুর! তোমার এই গুণ সকল মানুষের নাই!

পরেশ ও তাহার পিতা।

রেশদের বাটীর সম্মুখস্থ বাগানটী নানাবিধ ফুলের গাছে সুসজ্জিত। মধ্যস্থলে খানিকটা গোলাকার খালি জমি; তাহাতে নূতন দুর্ব্বাঘাস সবুজ মখমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; দেখিলেই তাহার উপর শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। বাগানের পরেই দোতালা বাড়ী। তাহার আলিসা ও জানালার সম্মুখের কার্নিস সমস্ত ফুলের টব

দিয়া সাজান। বাহির দরজার উপরে যে জানালা, তাহার সম্মুখের টবটী চীনামাটি দ্বারা নির্ম্মিত ও অতি সুন্দররূপে চিত্রিত। ইহাতে একটী গোলাপ ফুলের গাছ। উহা যে সে গোলাপ নহে; উহার ফুল খুব বড় বড় এবং তাহার গন্ধ অতি চমৎকার। পরেশের বাপ অনেক মূল্য দিয়া এই গোলাপ গাছশুদ্ধ টবটী কিনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশের জন্মদিন উপলক্ষে তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সুরেশ এই গাছটীকে অত্যন্ত যত্ন করিত; যখন ইহার কুঁড়ি ধরিত তখন সুরেশের কতই আহ্লাদ! কতদিনে ফুল ফুটিবে সুরেশের মন তাহার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। কয়েক দিন হইল গাছটীতে ছোট বড় প্রায় সাত আটটী কুঁড়ি ধরিয়াছে।

বৈশাখ মাস; বেলা প্রায় ছয়টা বাজে বাজে; বাগানের খালি জমির উপর বাটীর ছায়া পড়িয়াছে; পরেশের পিতা সেইখানে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পুস্তক পড়িতেছেন; সুরেশ গাছে দিবার জন্য নীচে জল আনিতে গিয়াছে;—এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ হইল, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা ভাঙ্গা টবের কুচি পরেশের পিতার পায়ের নিকট ছিট্‌কাইয়া পড়িল। পরেশের পিতা একটু চমকাইয়া উঠিয়া যে দিকে শব্দ হইল সেইদিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন,—সুরেশের সাধের টবটী জানালা হইতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুরেশের মা পার্শ্বের ঘরে জিনিস পত্র গুছাইতেছিলেন, তিনি সিঁড়ি হইতে, "হায়! হায়! কে সুরেশের টব ভাঙ্গিল? দেখত ঝি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঝিকে ডাকিতে লাগিলেন। সুরেশ ছল ছল চক্ষে ভাঙ্গা টবের দিকে চাহিয়া পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝি তাড়াতাড়ি উপরে গেল। পরেশের মা বলিলেন, "আমাদের বাগানের সমস্ত গাছ নষ্ট হইলেও আমার এত দুঃখ হইত না। আহা এমন সুন্দর টব! এমন সুন্দর ফুল ধরিতেছিল! সুরু আমার গাছটীকে কত যত্ন করিত! আহা! বাছা আমার গত শ্রাবণ মাসে জন্মদিন উপলক্ষে গাছটী পাইয়াছিল। এ নিশ্চয় দুরন্ত পরেশের কর্ম্ম।"

এই সময়ে পরেশের পিতা ও সুরেশও উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঝি বলিল, "যদি মা পরেশ টব ফেলিয়া থাকে, তবে দৈবাৎ ফেলিয়াছে। ওর দাঁড়াইবার দোষে টব পড়িয়া গিয়াছে; পরেশ ইচ্ছা করিয়া টব ফেলে নাই। কি বল, পরেশ?" এই বলিয়া সে পরেশের কাণে কাণে বলিল, "বল না, তা না হ'লে তোমার বাবা বড় রাগ করিবেন।"

পরেশের মা বলিলেন, "আমার বোধ হয় তাহাই হইবে। দেখো বাবা, আর কখনও এমন কাজ করিও না। আমি বুঝিয়াছি তোমার দাদার ও আমাদের মনে কষ্ট দিয়া তুমি দুঃখিত হইয়াছ। এস আমার কোলে এস।"

পরেশ বলিল, "না মা, তুমি আমাকে কোলে করিও না। আমি বড় দুষ্ট; আমি ইচ্ছা করিয়া টব ফেলিয়া দিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া পরেশের পিতা পরেশের কাছে গিয়া বলিলেন,—"বটে! তা কেন এমন কাজ করিলে?"

পরেশ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কেমন চমকিয়া উঠ, তাই দেখিবার জন্য টব ফেলিয়াছিলাম। আমি বড় অন্যায় করিয়াছি। তুমি আমাকে মার; খুব মার।"

পরেশের পিতা পরেশকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "বাপু! তুমি অন্যায় কাজ করি-

য়াছ। কিন্তু তুমি শাস্তি পাইবার ভয় সত্বেও সত্য কথা কহিয়াছ বলিয়া আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম,—ইহা যদি চিরজীবন তোমার স্মরণ থাকে তাহা হইলে এ সমস্ত দোষ কাটিয়া যাইবে। দেখ ঝি! তুমি যদি পুনরায় কখনও ইহাকে এই রকমে মিথ্যা কথা কহিতে শিখাও, তাহা হইলে তোমাকে অন্যত্র চাকরির চেষ্টা দেখিতে হইবে।" এইরূপে সেদিনকার ব্যাপার চুকিয়া গেল।

পরেশের পিতার স্বভাব ছিল যে, তিনি সোজা সুজি 'এই কর,' কি 'অমুক কাজ করিও না' বলিয়া উপদেশ দিতেন না। কোন্ অবস্থায় কিরূপ কাজ করিতে হইবে তিনি কেবল তাহার আভাস দিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। তাহার পর তুমি নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লও। উপরের বর্ণিত ঘটনার কিছুদিন পরে পরেশের পিতার একবন্ধু পরেশকে হাতীর দাঁতের গুটিকতক সুন্দর খেলানাশুদ্ধ একটী বাক্স দিয়াছিলেন। তাহা পাইয়া পরেশের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। সে রাত্রি দিন ঐ সকল খেলানা লইয়া খেলা করিয়াও তৃপ্ত হইত না; এবং শয়নকালে খেলানা বাক্সটী মাথার বালিসের কাছে রাখিয়া ঘুমাইত।

একদিন পরেশের পিতা বলিলেন, "তুমি অন্য সকল খেলানার চেয়ে এইগুলিকে অধিক ভাল বাস, না?"

পরেশ বলিল, "হাঁ, বাবা।"

"আচ্ছা, সুরেশ যদি তোমার এই খেলানা বাক্সটী জানালা হইতে ফেলিয়া দিয়া সব ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার মনে কষ্ট হয় না কি?"

পরেশ অত্যন্ত কাতরভাবে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না।

পরেশের পিতা বলিতে লাগিলেন, "ভাল, তুমি গল্পে যে সকল বাজিকরের কথা শুনিয়াছ তাহাদের একজন যদি মন্ত্রের জোরে তোমার এই খেলানার বাক্সটীকে একটী গোলাপ গাছ শুদ্ধ সুন্দর চীনামাটির টব করিয়া দেয় এবং তোমাকে ঐ টবটী লইয়া তোমার দাদার ঘরের জানালায় রাখিতে দেয়, তাহা হইলে বোধ হয় তোমার খুব আনন্দ হয়?"

পরেশ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "হাঁ বাবা, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়।"

পরেশের পিতা বলিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে তুমি এ কথা মনের সহিত বলিতেছ। কিন্তু কেবল সাধু ইচ্ছায় অসৎ কার্য্যের দোষ খণ্ডন হয় না। সৎকার্য্য করা চাই।"

এই বলিয়া তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অভিপ্রায় কি, পরেশ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু সেদিন কেহ পরেশকে ঐ বাক্স লইয়া আর খেলা করিতে দেখে নাই। পরদিন প্রাতঃকালে পরেশের পিতা দেখিলেন পরেশ একটী বাগানে একটী গাছতলায় বসিয়া আছে। তিনি সেই দিক্ দিয়া যাইতে যাইতে পরেশকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বাবা পরেশ, আমি বাহিরে বেড়াইতে যাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে আসিবে? ভাল কথা, তোমার খেলানার বাক্সটী অমনি হাতে করিয়া আনিও। আমি সেটী একজনকে দেখাইতে ইচ্ছা করি।" দৌড়াইয়া ঘরে গিয়া বাক্সটী লইয়া আসিল এবং পিতার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইল।

পথে যাইতে যাইতে পরেশ বলিল, "বাবা, এখনও আর সে রকম বাজিকর নাই?"

"কেন, তাহাতে কি?"

"তবে কেমন করিয়া আমার খেলার বাক্সটী গোলাপ গাছের টব হইবে?"

পরেশের পিতা বলিলেন, "বাবা যাহাদের ভাল কাজ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দুইজন বাজিকর থাকে। একজন এইখানে" এই বলিয়া পরেশের পিতা পরেশের বক্ষস্থলে হাত দিলেন এবং তাহার পর তাহার কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "আর একজন এইখানে থাকে।"

"বাবা, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"বুঝিতে চেষ্টা কর। বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই।"

এইরূপে কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা এক ফুলগাছ বিক্রেতার গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং নানা প্রকারের গাছ দেখিতে দেখিতে একটী সুন্দর গোলাপ ফুলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরেশের পিতা গাছটী দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আহা! সুরেশ যে গাছটী ভাল বাসিত, এটী যে দেখিতেছি তাহার চেয়ে ভাল। এ গাছটীর দাম কত গা?" মালী বলিল, "আজ্ঞা, চারিটাকা।" পরেশের পিতা পকেট হইতে হাত তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তবে আজি আর হইল না। আজি সঙ্গে অধিক টাকা নাই।"

তাহার পর পিতাপুত্রে সহরের মধ্যে একজন চীনাবাসনওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া পরেশের পিতা দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি গত শ্রাবণ মাসে যেমন একটী ফুলের টব লইয়াছিলাম, সেরকম টব আর আছে?" এবং সম্মুখে সেইরূপ একটী টব দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ইহার দাম কত?" দোকানদার বলিল, "দুই টাকা।" তাহার পর পরেশের পিতা দোকান হইতে বাহিরে আসিয়া পরেশকে বলিলেন, "তোমার দাদার আগামী জন্মদিনে তাহাকে আর একটী গোলাপফুলের টব কিনিয়া দেওয়া যাইবে। যদি তাহার এখনও কয়েকমাস বিলম্ব আছে, তাহাতে ক্ষতি নাই। গোলাপ ফুল ত দুই দিনে শুকাইয়া যায়, কিন্তু সত্যের সৌন্দর্য্য কখনও মলিন হয় না; আর যে প্রতিজ্ঞার কখনও ভঙ্গ হয় না, চীনাবাসনের অপেক্ষা তাহা অধিক মূল্যবান্।"

পরেশ এতক্ষণ মাথাহেঁট করিয়াছিল। পিতার শেষ কথা শুনিয়া সে মাথা তুলিয়া কথা কহিবার উপক্রম করিল; কিন্তু আনন্দে তাহার কথা সরিল না।

তাহার পর পরেশের পিতা একজন খেলানা বিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানদারকে বলিলেন, "আমার কাছে তোমার যে টাকা পাওনা আছে অদ্য তাহা দিতে আসিয়াছি। আর এক কথা মনে পড়িল, গত বৎসর তোমার দোকান হইতে আমি যে একটী হাতীর দাঁতের বাক্স কিনিয়া ছিলাম তাহার অপেক্ষা আমার ছেলের এই খেলানার বাক্সটীর কাজ কত পরিস্কার দেখ দেখি। পরেশ! বাক্সটী দেখাও ত, সকল জিনিসের দাম জানিয়া রাখা ভাল? কেননা এক সময় হয় ত তাহা বিক্রয় করিবার ইচ্ছা হইতে পারে। যদি আমার ছেলে মনে করে যে এই খেলানার বাক্সে তাহার আর দরকার নাই, তাহা হইলে কতদাম দিয়া তোমরা এটী কিনিতে পার?"

দোকানদার বলিল, "নয় টাকার অধিক দিতে পারি না আর যদি আপনার ছেলে দোকা-

নের এই সব সুন্দর খেলানার মধ্য হইতে কোন জিনিস পছন্দ করিয়া লন তবে সে ভিন্ন কথা।"

পরেশের পিতা বলিলেন, "তবে তোমরা নয় টাকায় এটী কিনিতে পার? আচ্ছা দেখ পরেশ, যদি কখনও তোমার এই খেলানার বাক্সে প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে হয়, তবে তুমি ইহা তখনই বিক্রয় করিতে পার। আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।"

পরেশের পিতা দোকানদারকে তাহার প্রাপ্য টাকা দিয়া চলিয়া আসিলে পরেশ কিন্তু একটু বিলম্বে দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল। এবং দৌড়িয়া পিতার নিকট আসিয়া আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বলিল, "বাবা, এই দেখ এখন আমরা সেই গোলাপ গাছ ও সেই চীনামাটির টব কিনিতে পারিব।" এই বলিয়া পরেশ পকেট হইতে কতকগুলি টাকা বাহির করিল।

পরেশের পিতা রুমাল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "আমি কি ঠিক্ কথা বলি নাই? তুমি সেই দুইজন বাজিকরের দেখা পাইয়াছ!"

* * * *

সেদিন বাড়ী ফিরিবার পর গোলাপ গাছশুদ্ধ টবটি সুরেশের ঘরের জানালায় রাখিয়া পরেশ যখন মাকে ও সুরেশকে উহা দেখাইবার জন্য ডাকিতে গেল, তখন তাহার আনন্দের সীমা দেখে কে?

পরেশের পিতা বলিলেন, "পরেশের কর্ম্ম; উহার টাকাতেই ফুলের টব আসিয়াছে। পরেশ সৎকর্ম্ম দ্বারা অসৎকর্ম্মের দোষ খণ্ডন করিয়াছে।"

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া পরেশের মা বলিলেন, "সে কি কথা? আহা! বাছা আমার যে সেই খেলানার বাক্সটী বড় ভালবাসিত। তুমি আজি বৈকালেই যত দাম লাগে দিয়া বাক্সটী কিনিয়া আনিও। আমি টাকা দিব।"

সুরেশ কহিল, "বাবা, মার কাছে আমার বার টাকা আছে। আমার সে টাকাতে কোন দরকার নাই। তুমি সেই টাকা দিয়া পরেশের বাক্স আনিয়া দিও।"

পিতা বলিলেন, "কি বল পরেশ? বাক্সটী কি ফিরাইয়া আনিব?"

"না বাবা, না। তা হ'লে আমার আহ্লাদ করিবার আর কি রহিল?" এই বলিয়া পরেশ পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন পরেশের পিতা তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"দেখ আমি সন্তানদিগকে যে সকল শিক্ষা দিতে চাই তাহার মধ্যে স্বার্থত্যাগের সুখ ও পবিত্রতা সর্ব্বপ্রধান। চিরজীবন উহাদিগের এই শিক্ষা পাওয়া উচিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। অতএব যাহাতে এই সুশিক্ষা নিস্ফল হইয়া যায় তাহা করিবার প্রয়োজন নাই।"

দীপশিখা।

ত বারে আমরা দীপশিখা সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা যাইতেছে।

আমাদের কথাগুলি পরিষ্কার বুঝিতে হইলে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া সামনে রাখ। প্রদীপের তেল পলিতার ভিতরদিয়া আস্তে আস্তে উর্দ্ধগামী হইতেছে। পলিতার মুখে তুমি আগুন লাগাইয়া দিয়াছ সুতরাং এই উর্দ্ধগামী তৈল ঐ আগুনের কাছে আসিয়াই গরমে বাষ্প হইয়া যাইতেছে। এই বাষ্প আগুন পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। সেই জ্বলন্ত বাষ্পকেই আমরা প্রদীপের শিখা বলি।

এখন দেখা যাউক এই বাষ্প জ্বলিবার সময় ব্যাপারটা কিরূপ হয়। বাতাসে অম্লজান বায়ু আছে; আর তেলের বাষ্প অম্লজানের সহিত মিশিয়া জলীয় বাষ্প ও কার্ব্বণিক য়্যাসিড্ বায়ুর সৃষ্টি করে। তেলের বাষ্পে যে জলজান বায়ু আছে তাহা অম্লজানের সহিত মিশিয়া জল হয়, আর উহাতে যে অঙ্গারের ভাগ আছে তাহা অম্লজানের সহিত মিশিয়া কার্ব্বণিক য়্যাসিডের উৎপত্তি হয়।

প্রদীপের শিখার প্রতি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে যে, তাহার গোড়ার দিকের কতকটা অংশ অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। এই স্থানের ভিতরে একটী দেশলায়ের কাঠি ঢুকাইয়া দাও। কাঠিটী যাই একটু পুড়িতে আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকে লইয়া আইস। এখন দেখিবে যে কাঠির যে স্থান দীপের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল, সে স্থান জ্বলে নাই। তাহাতে এই বুঝা যায় যে দীপের ভিতরটা ফাপা, অর্থাৎ সেখানে আগুন নাই। বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে যে, দীপের অত্যুজ্জ্বল অংশের চারিধারে অতি ক্ষীণ আলোক বিশিষ্ট একটী আবরণ আছে। তবে দেখিতেছি দীপের তিনটা অঙ্গ হইল। এইরূপ তিন অঙ্গ কেন হইল বলি, শুন।

পলিতার অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ তৈল বাষ্প হইয়া উঠিতেছে। প্রথমে বাষ্পের জলজানের ভাগটুকু বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশে। তখন জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া উড়িয়া যায়, আর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গারের কণাগুলি পৃথক হইয়া পড়ে। এইরূপ মিশিবার সময় সেই স্থানটা এত গরম হয় যে, ঐ অঙ্গারের কণাগুলি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। এইরূপে দীপের শিখার সৃষ্টি হয়। দীপের শিখার ভিতরে যে ফাঁপা জায়গাটুকু দেখিয়াছ, তাহা কি জান? পলিতার মুখ দিয়া ক্রমাগত তেলের বাষ্প উঠিয়া ঐ স্থানে একত্র হইয়াছে। বাতাসের অম্লজান ক্রমে ক্রমে ঐ বাষ্পের সহিত মিশিবে, কিন্তু এদিকে আবার নূতন বাষ্প আসিয়া জমিবে; সুতরাং ঐ স্থানটুকু ঐ রূপ ফাপাই থাকিবে। ঐ উজ্জ্বল অংশের চারিধারেও যে আবার একটী আবরণ আছে দেখিলে, সেখানে কি হইতেছে জান? যে অঙ্গারের কণা তাতিয়া ঐ উজ্জ্বল অংশের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই অঙ্গার এইস্থানে আসিয়া বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া কার্ব্বনিক য়্যাসিড্ হইতেছে। আমরা যে প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বল দেখি তাহার কারণ ঐ অঙ্গার-কণাগুলি। সে গুলি কঠিন জিনিস। কেবল মাত্র কঠিন জিনিসই তাতিয়া উজ্জ্বল হইতে পারে। অঙ্গার-কণা গুলি যখন অম্লজানের সহিত মিশিয়া কার্ব্বনিক য়্যাসিড হইল, তখন আর তাহারা কঠিন রহিল না; কার্ব্বনিক য়্যাসিড একটা বায়ু, তাহা কঠিন জিনিস নহে। এই জন্যই বাহিরের ঐ স্থানটুকু উজ্জ্বল নহে।

আমরা দেখিলাম যে তেলের বাষ্প অম্লজানের সহিত মিশিতে যাইয়াই দীপশিখার সৃষ্টি করে। কিন্তু এইরূপ মিশিতে হইলে যথেষ্ট উত্তাপের

প্রয়োজন। ফু দিলে প্রদীপ নিভিয়া যায় কেন জান? ফু দিয়া প্রদীপ জ্বালিবার পক্ষে আমরা ব্যাঘাত জন্মাই; কারণ তৈলের বাষ্প অম্লজানের সহিত মিশিবার সময় যে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছিল, ফু দিয়া সেই উত্তাপটাকে আমরা তাড়াইয়া দিই। তখন আর পলিতার মুখ হইতে বাষ্প উঠিয়াও উত্তাপের অভাবে অম্লজানের সহিত মিশিতে পারে না; সুতরাং তখন দীপশিখারও সৃষ্টি হয় না। শিখার যে উত্তাপটুকু ছিল, তাহারই তেজে তৈল এতক্ষণ বাষ্প হইয়া আসিতে ছিল। এখন শিখা নাই, কাজেই এখন আর তেলও বাষ্প হইতে পারিতেছে না। তবে আর দীপ জ্বলিবে কি করিয়া?

ক্রমশঃ

প্রকাশের পরিবর্ত্তন।

প্রকাশের একটী রোগ ছিল, তিনি বুঝুন আর না বুঝুন সকল কথাতেই উত্তর করিতেন, ছেলে মানুষ হইয়া বুড়োদের মুখে মুখে তর্ক করিতেন। প্রকাশ যখন ক্লাশে পড়িতে বসিতেন তখন শিক্ষক মহাশয়ের সকল প্রশ্নের উত্তরেই তিনি মাথা নাড়িয়া মাতুব্বরী করিতে যাইতেন, অন্যকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত তাহাতেও তিনি উপযাচক হইয়া হাত দিতেন। বাড়ীতে যখন কোন ভদ্রলোক তাঁহার পিতার সহিত কথপোকথন করিতেছেন তিনি সেইস্থানে উপস্থিত হইতেন এবং বৃদ্ধদের কথার ভিতর কথা কহিয়া পিতার বিরাগভাজন হইতেন। প্রকাশের শুধু এই একটী রোগ থাকিলে আর ভাবনার বিষয় ছিল না, অনেক রোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

লোকে ভাল বলুক, লোকে ভাল বাসুক এই ইচ্ছা প্রকাশের মনে বড় প্রবল ছিল। ভাল কাজ না করিলে যে লোকে সুখ্যাতি করে না, মধুর স্বভাব না হইলে যে লোকে ভালবাসিতে পারে না, এ বিবেচনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ যখনই তাঁহার দোষ দেখাইয়া তাঁহার পিতা মাতা কি আত্মীয় স্বজনেরা তিরস্কার করিতেন তখনই তিনি অভিমানে মুখ ফুলাইয়া কাঁদিতেন, কখন বা মাতাকে দুঃখ করিয়া বলিতেন, "লোকে কেবল আমার দোষই দেখে!"

প্রকাশ বোকার মত অনেক কথা কহিতেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি বুদ্ধিমান ছেলের ন্যায় কথা কহিতে পারেন। এই ভুল বিশ্বাসে তাঁহার বড় অনিষ্ট হইয়াছিল, তিনি বৃথা অভিমানী হইয়া লোকের কথা গ্রাহ্য করিতেন না, কেহ কিছু ভাল বলিলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেন না এবং কাহারও নিকটে কিছু শিখিতে যাইতে নিজকে অপমানিত মনে করিতেন।

প্রকাশের এই সকল দোষ দূর করিবার জন্য তাঁহার পিতা, মাতা, শিক্ষক মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই নানা উপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকাশের মনে বড়ই ঘৃণার উদয় হইল। তিনি মনে মনে তাঁহার দোষের আলোচনা

করিতে লাগিলেন। অন্য লোকে তাঁহার দোষ দেখিয়া যত না তিরস্কার করেন, তিনি নিজে তাঁহার দোষগুলি পরিষ্কার বুঝিয়া নিজকে তার চেয়ে অধিক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দোষ দূর করিবার জন্য এতদিন লোকেরা তাঁহাকে কত উপদেশ দিয়াছে, পিতা মাতা কত তিরস্কার করিয়াছেন, অধিক কি প্রহার করিতে পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইল না। যখন তিনি নিজের দোষের বিষয়ে নিজে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাল হইবার ইচ্ছা আগুনের ন্যায় যখন তাঁহার প্রাণকে পোড়াইতে লাগিল, তখন একে একে এই কয়েকটী সত্য তিনি নিজের জীবনে লাভ করিলেন।

(১) নিতান্ত দরকার না হইলে বৃথা কথা কহিব না, এবং খুব ভাল করিয়া না বুঝিয়া কাহারও কোন কথার উত্তর দিব না।

(২) উপযুক্ত না হইয়া কখনও কিছু পাইবার আশা করিব না এবং কেহ দিলেও গ্রহণ করিব না।

(৩) লোকে নিন্দা করিলে রাগ না করিয়া এই বুঝিব যে, আমার ভিতরে এমন কোন দোষ আছে, যাহা দূর করা উচিত।

এই তিনটী চিন্তা সর্ব্বদাই প্রকাশের মনে থাকিত এবং সকল সময়েই তিনি এই অমূল্য সত্যগুলি জীবনে পালন করিতে চেষ্টা করিতেন।

একদিন প্রকাশ পিতার সহিত রেলের গাড়ীতে যাইতেছিলেন, গাড়ীর ভিতরে তাঁহার পিতার সহিত আর কয়েকটী ভদ্রলোকের নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা, তর্ক বিতর্ক হইতেছিল, প্রকাশ কোন কথা না বলিয়া তাঁহাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের কথা শেষ হইলে তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওহে বাবু তুমি যে কিছু বল না!" প্রকাশ একটু হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। প্রকাশের বাবা প্রকাশের এই নূতন ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন। সেই ভদ্রলোকটী কিন্তু প্রকাশকে একটী নিরেট বোকা ঠাও-রাইলেন।

আগুন যেমন কাপড়ে বাঁধিয়া রাখা যায় না, মানুষের সৎগুনগুলিও তেমনি প্রাণের মধ্যে ঢাকা থাকে না; উপযুক্ত সময়ে বাহির হইয়া পড়ে। প্রকাশের হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার মা একদিন বলিলেন, "এতদিন পরে কার কথায় তোর এমন হইল?" প্রকাশ বিনীতভাবে বলি-লেন, "মা, এখনও আমার কিছু হয় নাই, আশী-র্ব্বাদ করুন যেন আমার সকল দোষ দূর করিয়া আপনাদিগকে সুখী করিতে পারি। আর আমার মনে বিশ্বাস হইতেছে, মা! পরমেশ্বর আমার প্রাণের ভিতরে আছেন, তিনি যদি আমার প্রাণের ভিতরে না থাকিতেন তবে আমার প্রাণে ভাল হইবার জন্য এইরূপ ইচ্ছা কে জন্মাইয়া দিল?"

উভয় সঙ্কট।

ঘোষেদের কুলের বাগানে
কুলগুলি পেকে যে রয়েছে !
কি মধুর নারিকেলি কুল !
মনে হলে মুখে জল আসে

"চারি দিকে রয়েছে প্রাচীর
কেমনেতে ঢুকিব সেখানে।
দুরন্ত কুকুর নাকি আছে,
তাই বড় ভয় হয় মনে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে
বিপিন যেতেছে গৃহপানে।
পাঠশালে যাহা শিখিয়াছে
কিছু কিন্তু নাই তার মনে।

অবশেষে বাগানের কাছে
এসে দেখে, কেহ নাই সেথা।
পড়েছিল "চুরি করা পাপ,"
লোভে আজ ভুলিল সে কথা।

তাড়াতাড়ি ঘরে ছুটে গিয়ে
বইগুলি কোথা ফেলে দিল ;
আনন্দেতে হইয়া অধীর
থ'লে নিয়ে বাহিরে চলিল।

পিছু পিছু ডাকিছেন মাতা ;
সে ডাক কি যায় তার কাণে ?
কুলের কি সুমিষ্ট আস্বাদ
তাই সুধু জাগিতেছে মনে।

এসে দেখে পূর্ব্বের মতন
গাছতলা, কেহ কোথা নাই।
মনে মনে ভাবিল বিপিন,
"এবে আমি কাহারে ডরাই।"

আস্তে আস্তে উঠিল প্রাচীরে,
নিঃশব্দেতে নাবিল বাগানে ;
দুর্ দুর্ বুক কাঁপে তার,
চারিদিকে চাহিছে সঘনে।

ধীরে ধীরে গাছেতে উঠিল ;
ডালে বসি চারিদিকে চায় ;
মুখে কুল ; কিন্তু মনে ভাবে
"কেহ যেন দেখিতে না পায় ?"

এইরূপে ভয়ে ভয়ে তার
শান্ত যবে হইল উদর।
থ'লে পূরে নাবে গাছ হ'তে
আনন্দেতে প্রফুল্ল অন্তর।

মনে ভাবে "দেখিল না কেহ,
আজি মোর 'সৌভাগ্যের দিন' ;
(হায় মূর্খ ! জান না কি আছে
একজন জেগে নিশিদিন।)

এত ভাবি অবোধ বালক
গাছ হ'তে নাবিতে নাবিতে—
সর্ব্বনাশ !—বাগানের পাশে
কুকুর যে পাইল দেখিতে।

কুকুর দেখিয়ে তারে গাছে,
প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল।
আস্তে আস্তে কোনরূপ করি
গাছ হতে বিপিন নাবিল।

প্রাচীরেতে উঠিয়া সত্বর
পিছুদিকে নাবিতে সে যায়;—
কুকুরের ডাক শুনি মালি
হেন কালে আইল তথায়।

পাছে তার ডাকিছে কুকুর,
থ'লে হতে কুল পরে যায়,
মালি এসে হাত ধরে তার;
বিপিন ঠেকিল মহাদায়।

জিহ্বার শুনিয়ে কুমন্ত্রণা,
পরদ্রব্য লইতে এমন,
তোমরা কি চাওগো পড়িতে
এইরূপ বিপদে কখন?
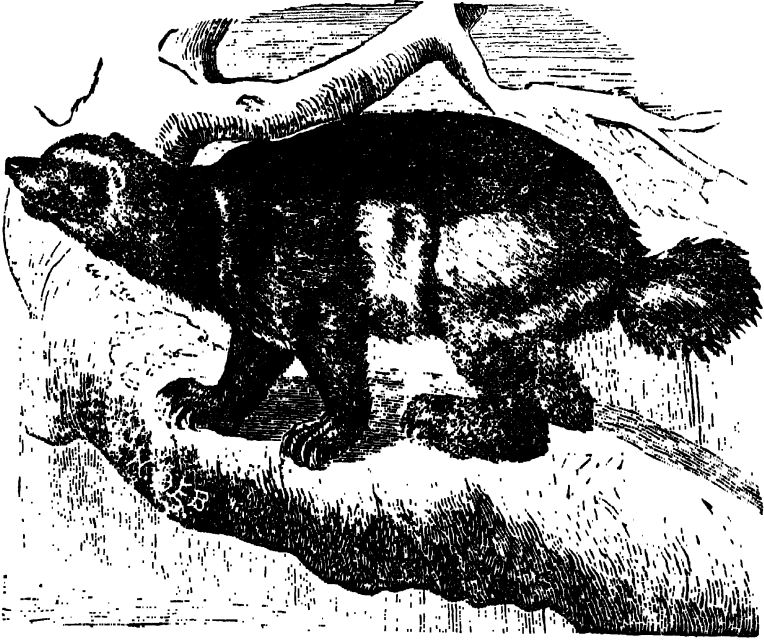
গ্লটন্।

উপরে যে জানোয়ারের ছবি দেখিতেছ তাহার বাড়ী আমাদের দেশে নয়; উত্তরের শীত-প্রধান দেশ সকলে ইহারা বাস করে; কাম্স্কট্কা উপদ্বীপে ইহারা খুব বেশী পরিমাণে থাকে। ঐ সকল শীতপ্রধান দেশে ভোদড় জাতীয় অনেক প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু বাস করে; তাহারা নিশাচর বৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদের জ্বালায় সেখানকার লোকেরা সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে। গৃহপালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আহারীয় পশুপক্ষীর প্রতি ইহাদের বড়ই অনুরাগ। এই কারণে ঐ সকল দেশের অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের শত্রুতা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এর উপর আবার এই সকল পশুর চর্ম্ম অতিশয় মূল্যবান্। সুতরাং ইহাদিগকে বধ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়। এরূপ অনেক লোক আছে যে, নানা প্রকার কৌশল করিয়া ঐ সকল জন্তু ধরাই তাহাদের ব্যবসায়। আমরা যে জন্তুর কথা কহিতেছি, সেও এই জাতীয়; কিন্তু তাহার স্বাভাবিক ধূর্ত্ততা এত বেশী যে, তাহাকে কেহই ধরিতে পারে না।

গ্লটনের সম্বন্ধে পূর্ব্বকালে লোকের অনেক আশ্চর্য্য সংস্কার ছিল। তখনকার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে, ঐ গ্লটন যদি কোন বড় জন্তুর মৃত শরীর দেখিতে পায় তবে অমনি উহাকে খাইতে

আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে যখন পেটটা ঢাকের মতন ফুলিয়া উঠে—আর তাহাতে জিনিস ধরে না—তখন গ্লটন খুব নিকট নিকট অবস্থিত দুইটী গাছের মধ্য দিয়া শরীরটাকে নিয়া যাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ করাতে ভয়ানক চাপ পড়িয়া তাহার পেটের ভিতরের সব জিনিস বাহির হইয়া যায়। এইরূপে পেট খালি হইলে গ্লটন্ আবার আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আহার্য্য পদার্থ একেবারে ফুরাইয়া না যায়, ততক্ষণ এই উপায়ে ক্রমাগত ভক্ষণ এবং উদ্গীরণ চলিতে থাকে।

অনেকে বলিয়াছেন যে, গ্লটন্ কোন গাছে উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; নীচে কোন বড় জন্তু আসিলে অমনি তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। এইরূপে হঠাৎ পড়াতে তেমন প্রকাণ্ড জানোয়ারটাও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায় আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না। গ্লটন্ এই অবস্থায় তাহাকে সহজেই মারিয়া ফেলিতে পারে। যাহা হউক আধুনিক অনেক পণ্ডিতের এই মত যে, গ্লটন্ গাছে উঠিতে তত পটু নহে; সুতরাং এই সকল গল্পকে গল্পের ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্লটন্ জানোয়ারটী আড়াই ফুটও লম্বা হইবে না, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বড় বেশী। শিকারিরা অন্যান্য জন্তু ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতে, গ্লটন্ অনায়াসে তাহার ভিতরের আধারটুকু খাইয়া যায়। ফাঁদে কোন ছোট জানোয়ার পড়িলে তাহাও উদরস্থ করে। গ্লটন্‌কে এপর্য্যন্ত খুব কম লোকেই ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে পারিয়াছে। নিম্নে একজন শিকারীর লিখিত একটী গল্প অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"একবার একটা বৃদ্ধ গ্লটন্ আমার মার্টেন্ (ভোঁদড় জাতীয় আর এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু) ধরিবার ফাঁদ গুলির খোঁজ পাইল। আমি পোনের দিন পর একদিন ফাঁদগুলি দেখিতে যাইতাম, সে তার চাইতে ঘন ঘন আসিতে লাগিল। ইহাতে আমি বড়ই চটিয়া গিয়া মনে করিলাম যে, যেরূপেই হউক ইঁহার চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া আমি ভিন্ন ভিন্ন ছয় স্থানে ছয়টা মজবুত ফাঁদ প্রস্তুত করিলাম এবং তিনটা লোহার ফাঁদও সংগ্রহ করিলাম। তিন সপ্তাহ কাল চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সে এই সকল ফাঁদের কাছেও গেল না, কিন্তু আমার মার্টেন ধরিবার ফাঁদগুলিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। যে সকল মার্টেন ফাঁদে পড়িত; সে গুলিকে এবং ফাঁদে যে সকল আধার দেওয়া হইত তাহাও খাইয়া ফেলিতে লাগিল। তখনকার দিনে বিষ খাওয়াইয়া মারার নিয়ম ছিল না, সুতরাং এর পর আমি বন্দুক পাতিয়া তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলাম। বন্দুকটীকে একটা ছোট পুকুরের ধারে একটা ঝোপের ভিতর রাখিয়া দিলাম, আধারটা এরূপভাবে রাখা হইল যে গ্লটন সেই পথে যাইবার সময় তাহা দেখিবেই। এর পর প্রথম যে দিন সেই স্থান দেখিতে গেলাম সে দিন দেখিলাম যে গ্লটন সেখানে আসিয়াছিল; কিন্তু আধারটাকে ছোঁয় নাই, কেবল শুঁকিয়াই চলিয়া গিয়াছে। ইহার পরের বারে আসিয়া প্রথমেই যে দড়ি দ্বারা বন্দুকের কলের সহিত আধারের সংযোগ ছিল সেই দড়িটীকে কাটিয়াছে, (কাটিয়াছে আবার বন্দুকের মুখের একটু পেছনে, যেন কাটিবার সময়ে হঠাৎ বন্দুক ছুটিয়া গেলেও গুলি গায় না লাগে) তার পর নিশ্চিন্ত মনে আধারটী লইয়া গিয়া পুকুরের ধারে বসিয়া খাইয়াছে। সেই

খানে গিয়া আমি দড়িগাছ পাইলাম। ইচ্ছাপূর্ব্বক এত বুদ্ধি খরচ করিয়াছে ইহা আমি কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; কারণ ঐরূপ করিতে হইলে ঠিক মানুষের বুদ্ধির সমান বুদ্ধির আবশ্যক করে। সুতরাং আমি আবার কল পাতিয়া রাখিলাম। দড়িটী যেখানে ছিঁড়িয়াছিল সেইখানে বাঁধিয়া দিলাম। কিন্তু ক্রমাগত তিনবার অবিকল একই রকম ফল পাইলাম। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দড়িটী যে জায়গায় বাঁধিয়া দেওয়া গিয়াছে প্রত্যেকবার তাহার একটু পেছনে কাটিয়াছে,—কিজানি যদি ইহার মধ্যেও আমি তাহার বিনাশের জন্য কোনরূপ সন্ধান করিয়া রাখিয়া থাকি। এই সকল দেখিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, এইরূপ বুদ্ধিমান্ জন্তুর বাঁচিয়া থাকাই উচিত।"

হঠাৎ মানুষের সহিত দেখা হইলে গ্লটন্ দুই পায়ের উপর বসিয়া এক হাতে চক্ষের উপর ছায়া দিয়া (আমরা অনেক দূরের জিনিস রৌদ্রের সময় দেখিতে হইলে যেমন করি) তাহাকে দেখে। এইরূপ করিয়া দুই তিন বার চাহিয়া দেখিয়া তার পর পলাইতে চেষ্টা করে।

বনলতা।

কালীকান্ত বাবুর পরিবারে সুখ নাই। প্রায় সাত আট বৎসর হইল তাঁহার একটী মাত্র ছেলে বিনয় কোথায় যে গিয়াছে কেহ জানে না; সেই অবধি কালীকান্ত বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী নিতান্ত মনোদুঃখে দিনপাত করিতেছেন। পরিবারের মধ্যে কালীকান্ত বাবু, তাঁহার স্ত্রী এবং একটি বার বৎসরের মেয়ে। বনলতা যখন ছোট ছিল তখন প্রায়ই মামার বাড়ীতে থাকিত, কারণ মার চেয়ে সে দিদিমাকে অধিক ভাল বাসিত। বনলতার যখন দুই বৎসর বয়স তখন সে একবার মামার বাড়ী যায়, এবং ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর সেখানেই থাকে; এই ৩।৪ বৎসরের মধ্যে সে বিনয়কে একবারও দেখে নাই। তারপর যখন বাড়ী আসিল তখন বনলতা ৫।৬ বৎসরের হইয়াছে, বাড়ী আসিয়া আর সে বিনয়কে দেখিতে পায় নাই। বনলতা বাড়ী আসিলে কালীকান্ত বাবু ও তাঁহার স্ত্রী বনলতাকে কিছুই জানিতে দেন নাই। পাছে তাহার জীবন দুঃখময় হইয়া যায় এই আশঙ্কায় তাঁহারা আপনাদিগের মনোকষ্ট গোপন করিয়া রাখিতেন। তাহাকে কিছুই বুঝিতে দিতেন না।

পশ্চিমাঞ্চলে কোন স্থানে কালীকান্ত বাবু থাকিতেন। একটি ছোট পাহাড়ের উপর বাড়ীটী স্থাপিত, চারিদিকে সুন্দর বাগান, স্থানটি বড়ই সুন্দর। বনলতা বনে বনে বেড়াইতে বড়ই ভালবাসিত; কখনও ঝরণার কাছে, কখনও গাছের তলায়, কখনও লতাকুঞ্জে বসিয়া থাকিত। একদিন সকাল সকাল বনলতা বেড়াইতে বাহির হইল। অন্য অন্য দিন কেহ তাহার সঙ্গে যাইত, কিন্তু আজ সে একাকীই বাহির হইল। পাহাড়ের উপর একটি পথ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে,বনলতা মনের আনন্দে ও উৎসাহে সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে বেলা অধিক হইল, সূর্য্যের প্রখর তাপে বনলতা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও তাহার বেড়াইবার সাধ কমে নাই; পথের ধারে একটি সুন্দর ঝোপের কাছে বসিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিল। কতদূর গিয়া একটি ছোট পথ দেখিতে পাইল, পথের দুপাশে বড় বড় গাছ রহিয়াছে, গাছে ফুল ফুটিয়াছে, ফল ধরিয়াছে, পাখী ডাকিতেছে; সেখানে কিছুমাত্র রৌদ্রের তেজ নাই। বনলতা তখন ভাবিল এই পথে যাই,—এ পথে রৌদ্রের তেজ নাই,চলিতেও বেশ সুবিধা হইবে,অধিক ক্লান্ত হইব না। এই ভাবিয়া সেই পথে চলিতে লাগিল। কতক দূর যাইয়া দেখিল পথটি ক্রমে ছোট হইতেছে এবং ক্রমে নিবীড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; তখন তাহার মনে একটু ভয় হইল, ভাবিল "এ পথ জানি না, ক্রমে গভীর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, যদি পথ হারাইয়া যাই, যদি আর ফিরিয়া যাইতে না পারি' তাহা হইলে

কি দশা হইবে ?—যে পথে যাইতেছিলাম সেই পথে যাওয়াই ভাল ছিল। কিন্তু আবার ভাবিল যে এখন রৌদ্রের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সে পথটি সহজ হইলেও সে পথে চলা বড় কষ্টকর, সে পথ অপেক্ষা এ পথ শতগুণে ভাল। কোথাও সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও পাখী গান করিতেছে, কোথাও ঝরণার ঝর ঝর শব্দ হইতেছে, শীতল বাতাসে শরীর জুড়াইতেছে,—এই পথে যাই, না হয় আর খানিক যাইয়া ফিরিয়া আসিব।" বনলতা কখনও দাঁড়াইয়া পাখীর গান শোনে, কখনও অন্যমনস্ক হইয়া ঝরণার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে, কোথাও পাহাড়ের উপরে একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে,—তাহাই আনিতে পাহাড়ের উপর উঠে, কখনও নদীর স্রোতে কোথা হইতে ফুল ভাসিয়া আসিতেছে তাহাই দেখিবার জন্য নদীর তীর ধরিয়া চলিতে থাকে ;—এইরূপে ক্রমে সে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

ক্রমে বেলা অবসান হইল, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া সে একটু চিন্তিত হইল। তখন বাড়ী ফিরিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইল, কিন্তু গভীর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, ক্রমে অন্ধকার হইতেছে, এখন কোন পথে বাহির হইবে আর তাহা স্থির করিতে পারিল না, তখন সে অত্যন্ত ভীত হইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হইতে লাগি
আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিল, ক্রমে
ঝড় উঠিল। অন্ধকারে বনের সিং
বাহির হইল, তাহাদের গর্জ্জনে
কাঁপিতে লাগিল। তখন বি
না বুঝিয়া নির্ব্বোধের মত
তার জন্য আপনাকে কত
বুঝিল নির্ব্বোধের মত
অন্বেষণ করিলে কেমন
তখন সেই অসহায়া
জোড় হস্তে ঈশ্বরকে
ক্রমে যেন মনে এক
সাহস হইল। তখ
চলিতে লাগিল। ক
আলো দেখিতে পাই

কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল, আশা ও আনন্দের উদয় হইল। আলোক লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবং দেখিল এক ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। বনলতা কুটীরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, ভয়ে ভয়ে দ্বারে আঘাৎ করিতে লাগিল। তখন দ্বার খুলিয়া এক সন্ন্যাসী বাহির হইলেন। বাহিরে একাকী অসহায়া বালিকাকে দেখিয়া, তাহাকে কুটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী বালিকাকে দেখিয়া যেন একটু চমকিত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সময়ে এই হিংস্র জন্তু পূর্ণ নিবিড় বনের মধ্যে তুমি কেন আসিয়াছ? বালিকা তখন সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিল। সন্ন্যাসী ধীর ভাবে সমস্ত শুনিলেন, তারপর বলিতে লাগিলেন "আজিকার ঘটনা তুমি কখনও ভুলিও না, ইহা হইতে তুমি যথেষ্ট উপদেশ পাইবে। আজিকার ঘটনার সহিত মানুষের জীবনের সুন্দর তুলনা করা যাইতে পারে। দেখ মানুষ যখন প্রথম সংসারে প্রবেশ করে, তখন তাহার হৃদয় আশা ও উৎসাহে পূর্ণ থাকে। সেই আশা ও উৎসাহ লক্ষ্য
সে সৎপথে চলিতে থাকে, তখ
থাকিয়া যে সুখ পায়.
কিন্তু যখন
ন

যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা তখন বুঝিতে পারে, তখন মনে চিন্তা উপস্থিত, তখন শত চেষ্টায়াও ফিরিবার পথ সহজ খুঁজিয়া পায় না। পথ হারাইয়া দিন দিন আরও কুকার্য্যে রত হয়, এবং তাহাদ্বারা আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমে যখন জীবন ফুরাইয়া আসে,—যখন উৎসাহ উদ্যম আর থাকে না, যখন চক্ষু নিস্তেজ হইয়া যায়,—চারিদিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, যখন আর চলিবার শক্তি থাকে না,—তখন আর এ সামান্য সুখে মানুষকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু যাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তাহারা এরূপ বিপদে পতিত হইয়াও নিরাশ হয় না। লক্ষ লক্ষ বিপদের মধ্যেও যে পরমেশ্বরকে স্মরণ করে,—যে তাঁহার উপর নির্ভর করে—সে নিশ্চয়ই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়; বিপথ হইতে পুনরায় সৎপথে আসিতে পারে। একথা কখনও ভুলিও না।" বুদ্ধিমতী বালিকা একাগ্র হইয়া সমস্ত শুনিল, উপদেশ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিল। তখন সন্ন্যাসী বলি-[illegible] "আজ এই খানেই থাক, কাল তোমাকে [illegible]াসিব।"

[illegible] দেখিল কালীকান্ত

[illegible]দের মুখে

[illegible]

বর্ষশেষ।

দিন আসে দিন চলে যায়,
বর্ষ পিছে বরষ মিলায়।

তিলে তিলে পলে পলে দণ্ড চলি গেল,
দণ্ডে দণ্ডে প্রহর চলে যায়,
প্রহরে প্রহরে ওই দিন চলে গেল,
দিনে দিনে মাস গেল হায়!
মাসে মাসে ওই কত বর্ষ চলে গেল,
বরষে বরষে যুগ যায়,
একে একে ধীরে ধীরে সকলই মিশাল,
কালের সে আঁধার বেলায়।
কত গ্রীষ্ম কত বর্ষা কত চলি গেল
এল শীত বসন্ত ধরায়,
কত রবি, কত শশী, আকাশে উদিল;
কত এল যে গেল কোথায়!
—একজনও ফিরিল না হায়!—
ফিরিয়া চাহিয়া দেখি অতীতের পানে,
পুনঃ এক বর্ষ চলে গেল,
[illegible]হিয়া কত কিবা যে করি মনে,
[illegible]য় কিছুই না হল।
[illegible]ফরাব করি মনে,
[illegible]রিল না হায়,
[illegible]য় খেলায়
পুনরায়!

[illegible] গেল
[illegible]।

সখা

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

পঞ্চম ভাগ।

১৮৮৭।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN."

কলিকাতা

২ নং বেণেটোলা লেন, "সখা"-যন্ত্রে, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

ভারতবর্ষের অসভ্য জাতির
মানচিত্র
আ র ব
সা গ র
ব ঙ্গ
উ প সা গ র
বোম্বাই
হায়দ্রাবাদ
মহীশূর
মাদ্রাজ
কলিকাতা
৬৫
৭০
৭৫
৮০
৮৫
৯০
৯৫
১০০
২০
১৫
১০
৫
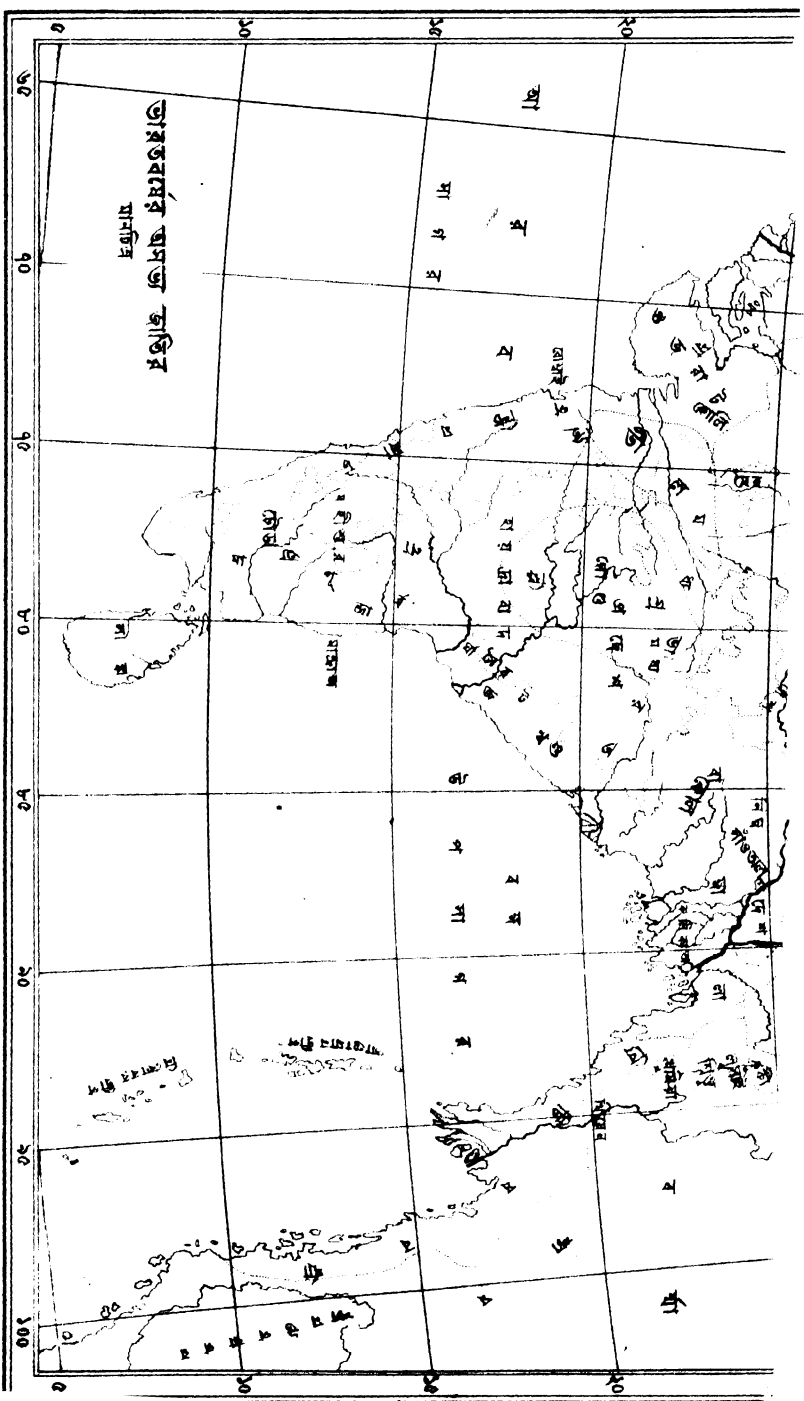
সূচীপত্র।
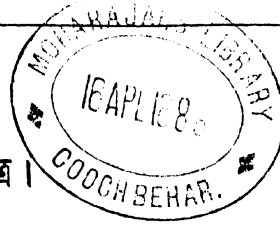
বিষয়।			পত্রাঙ্ক।
অতি লোভের শাস্তি	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	...	৬৩, ৭১
অনাথা বালিকা (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১২২
অসন্তুষ্ট কাঠবিড়াল	শ্রীরামব্রহ্ম সান্ন্যাল	...	১৮০
আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১৭
আলেয়া	ঐ	...	১৫৯
আশ্চর্য্য বিনয় (প্রাপ্ত)	শ্রীমতী সরলাসুন্দরী লাহিড়া	...	৪৪
আসিবে না (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৪২
এলিফাণ্টা গিরি-মন্দির	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	...	৭৫
কলিকাতায় মহোৎসব	শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	...	২
কাশ্মীরে দেখিবার জিনিষ	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	৯৩
কুমারী তরুদত্ত (সচিত্র)	ঐ	...	৪৯
কুসঙ্গের দোষ (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)	শ্রীললিতকুমার বসু	...	৫৬
কৃপণ কুকুর	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	...	৭
কেগো ঐ বৃদ্ধা নারী (সচিত্র পদ্য)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	...	২৯
কোহিনুর	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১২৭
গণ্ডার (সচিত্র)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১১৯
গরিব দুঃখীদিগের প্রতি ব্যবহার (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)	শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস	...	৩২
গ্রানভিল সার্প (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১৬১
চীনের কথা (সচিত্র)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	৫৯
জন পাউণ্ডস্ (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১৩৭
জোনাকীর বক্তৃতা (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৫৮
টাকা কড়ি ...	ঐ	...	৮৯
ঠগী (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১৬৮, ১৭৭
দীপ-শিখা ...	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ	...	৮
দুঃখিনীর দুঃখের কথা	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৭০
ধাঁধা			৪৮, ৯৬, ১২৮, ১৪৪, ১৬০, ১৭০, ১৮৬

নব বর্ষের সঙ্গীত (পদ্য)	শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা	...	৬৪
নানা প্রসঙ্গ	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ	...	৯৫
পঞ্চম বর্ষ	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	...	১
পণ্ডিতেরা ভ্রান্তি	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	...	৭৭
পম্পীয়াই	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১১০
পরদেশ-পাখী (সচিত্র)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৫৫
পরোপকার (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)	শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী	...	৩০
পলাতক পাখী (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৭৪
পেটুক পুষি (সচিত্র পদ্য)	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	...	৬
প্রজাপতি (সচিত্র পদ্য)	শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৯২
প্রতিশোধ	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৩২
প্রভুর কাজ	কুমারী কামিনী সেন বি, এ	...	৩৯
পাখীদের দেশ ভ্রমণ	শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল	...	৬৫, ৮১
পার্লিয়ামেণ্ট সভা (সচিত্র)	শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	...	২২
পিপীলিকার উপদেশ (সচিত্র)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু		৩৫, ৫২, ৬৮, ৮৬
ফরাসী বালিকার স্বদেশানুরাগ	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	৪১
ফুলের সাজি	শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়		১৪, ১২৯, ১৪৫
বর্ষ-শেষ (পদ্য)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১৮৬
বাঘ-মানুষ (সচিত্র)	ঐ	...	৭৮
বায়ু মণ্ডল	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	...	৮৩
বালক কলবার্ট	শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ	...	১০২
বালক বালিকার হাসি মুখ (প্রাপ্ত)	ঢাকার জনৈক ছাত্র	...	১৬৭
বালকের সৎ শিক্ষা	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন	...	৯৬
বাল্য জীবনের অস্থির গতি (পদ্য)	শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা	...	১
বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন	...	১৫৪
ভরত-বিলাপ (পদ্য)	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম,এ	...	৭৩
ভারতের অসভ্য জাতি (সচিত্র)	শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল	...	৯৭, ১২৩, ১৪৭
ভিখারিনীর প্রার্থনা (পদ্য!)	শ্রীবিহারীলাল গুহ	...	১০৫
মজার পড়া (পদ্য)	শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	...	৩৭
মদ্য পানের অপকারিতা (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)	শ্রীঅমৃতলাল নাথ	...	৩৭
মহাভারতের গল্প (পরোপকার)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	৩৩
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সচিত্র)	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম,এ	...	৯, ২৫

মেডাময়সল্ লি বুাঙ্ক্ (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	৪৫
মেরী কার্পেণ্টার (সচিত্র)	ঐ	...	১০৬,১১৩
মুক্তি-লাভ (সচিত্র)	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন	...	১৫০
যেমন রোগ তেমনি ব্যবস্থা (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১২৫
রমণীর দয়া	ঐ	...	৫৪
রাখি-বন্ধন	ঐ	...	১৫২
শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত (প্রাপ্ত)	শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	১৮৩
সংগ্রহ	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১৭২
সাজি	ঐ	...	১৭৫
সাধুতার পুরস্কার (বালকের রচনা)	শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস	...	৭২
সুরা রাক্ষস কোম্পানি অন্ লিমিটেড	শ্রীভুবনমোহন রায়	...	১৪২

জানুয়ারি, ১৮৮৭।

পঞ্চম বর্ষ।

সখার পাঠক পাঠিকা! তোমাদের "সখা" ঈশ্বর কৃপায় পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। এক একটী ছেলে এমনি থাকে যে, তাহাকে যে দেখে সেই ভালবাসে; লোকে এইরূপ ছেলেকে "আরিভিস্তু" বলে। আমাদের "সখা"ও বুঝি সেইরূপ "আরিভিস্তু" ছেলে। অনেক ছেলের এরূপ দেখা যায় যে, ছেলেবেলা সকলে তাহাদিগকে ভালবাসে, কিন্তু বড় হইলে তাহাদের সে কোমলতা থাকে না। ছেলেগুলি কদাকার হইয়া পড়ে, লোকে বলিতে থাকে এ বড় না হইলেই ছিল ভাল, কেন তেমনিটী থাকিল না। আমাদের প্রিয় "সখা"র বেলা সেরূপ দেখিতেছি না। বয়স বড় হইয়াও "সখা" দিন দিন কত আদর পাইতেছে। "সখা" এই সকল হিতৈষী বন্ধুর ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে করিয়া পঞ্চম-বর্ষে পা বাড়াইতেছে।

জন্মতিথির দিন পিতা মাতা পরমান্ন করিয়া শিশুকে খাওয়াইয়া থাকেন। আজ "সখা"কে কে পরমান্ন খাওয়াইবে? প্রমদাচরণ যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে ভাল করিয়া পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া বুঝি বা "সখা"কে উপহার দিতেন। আমাদের দ্বারা সে কাজ হইল না। আমাদের যাহা কিছু আছে তাহা দিয়া "সখা"কে সাজাইয়া পাঠাইলাম। পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা একবার "সখা"কে জন্মদিনে আদর কর।

সংসারে তোমরা অনেক মানুষ দেখিতে পাও, যাহারা কেবল নিজের জন্য প্রাণ ধারণ করে। অর্থাৎ কোন রকমে অর্থোপার্জ্জন করা ও নিজের উন্নতি করাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, সেই জন্যই তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন। আমাদের প্রিয় "সখা" সেরূপ নয়। বঙ্গদেশের শিশুদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের উপকার করাই ইহার জীবনের লক্ষ্য; তোমরা সকলে "সখা"র জন্মদিনে একবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, "সখা" যেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়।

বাল্যজীবনের অস্থির গতি।

কুসুম কলিকা বালক বালিকা
পরিবার উপবনে;
হাসিয়া খেলিয়া উঠিছে ফুটিয়া
স্বভাবের সুনিয়মে।

দেহের গঠন নূতন নূতন
ভাবে হয় পরিণত;
মনের আকার তেমনি তাহার
তরল জলের মত।
কার কি নিয়তি, কোন্ দিকে গতি
দেখিব দুদিন পরে;
যখন যৌবন লয়ে সেনাগণ
প্রবেশিবে দেহ ঘরে।
কুশিক্ষার ফলে আমোদের ছলে
মাদক-গরল-পানে;
কত সুকুমার করি পাপাচার
অকালে মরিবে প্রাণে।
কুসঙ্গে মিশিয়া কুকথা শিখিয়া
হবে কুঅভ্যাসে রত;
আপনি মরিবে অপরে মারিবে
থাকিবে পশুর মত।
যৌবন গরবে অন্ধ হয়ে রবে
না জানিবে গুরুজনে;
কবে মিথ্যা কথা, যাবে যথা তথা
নীচ অধমের সনে।
কিন্তু পরিশেষে পাবে বহু ক্লেশ
পড়িয়া কণ্টক বনে;
মরিবে কাঁদিয়া কুকর্ম্ম স্মরিয়া
নাহি পাবে সুখ মনে।
বালক সুজন হইবে যেজন
রহিবে সে সাবধানে;
তার পরিমল ছুটিবে কেবল
চিরদিন স্বর্গপানে।
মানব-সমাজে দেবলোক-মাঝে
বসিবে সে উচ্চাসনে:
থাকিবে অঙ্কিত তাহার চরিত
ইতিহাস-দরপণে।

কলিকাতায় মহোৎসব।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! বড় বেশী দিনের কথা নয়, হয়ত তোমাদের মনে পড়িবে, গত ১৮৮৩ সনের মে মাসে যখন সুবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুমাসের জেল হয় তখন তোমাদিগকে আমাদের দেশের অনেক কথা বলা হইয়াছে। আমাদের দেশ যে পরাধীন, আমাদের দেশের লোক যে ইংরেজের অধীন এ বিষয় তোমরা শুনিয়া থাকিবে। এ দেশ স্বাধীন ও দেশ পরাধীন এ সকল কথার মানে বুঝিতে পারিলেও ভাব ভাল করিয়া বুঝা তোমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। তাই তোমাদিগকে এ সম্বন্ধে দুইএকটা কথা বলিতেছি। তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে ইংলণ্ডের মহারাণীই আমাদের দেশের রাণী এবং আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা প্রজা সকলেই সেই ইংরেজ রাণীর প্রজা। বাস্তবিক এ কথা সত্য। সেই মহারাণী শুধু ভারতবর্ষের কর্ত্রী নন, ইংলণ্ডের ছোটবড় সকল লোকই তাঁহার প্রজা। তবে ইংলণ্ডের লোক আমাদের ন্যায় পরাধীন নয়। আমাদের দেশের জমিদার তালুকদারগণ যেরূপ তাঁহাদের অধীনের প্রজাগণের দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পারেন, যে দিক ইচ্ছা সেইদিকেই তাহাদিগকে পাঠাইতে পারেন, ইংলণ্ডের লোক মহারাণীর প্রজা হইলেও তিনি তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। বিলাতে একজন রাণী আছেন বটে, কিন্তু ইংরাজেরা জানে যে একজন লোকের ইচ্ছায় কোন কাজ হয় না, দেশশাসনে ইহাদের সকলেরই কিছু কিছু

অংশ আছে। দেশটা যে দেশের লোকদেরই, তাহা চাষারা পর্য্যন্ত জানে। রাজা বা রাণীর নামে অনেক কাজ হয় বটে, কিন্তু ইংরেজেরা নিজেরাই সব কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেশের লোকেরা সৈন্য হইতে পারে, যুদ্ধ বিদ্যা শিখিতে পারে, যাহাতে দেশের ও নিজেদের কল্যাণ হয় এমন কাজ নির্ভয়ে করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের লোক সেই এক রাণীর অধিকারের প্রজা হইয়াও স্বাধীন-ভাবে কিছু করিতে পারে না। যে সকল ইংরেজ আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন, তাহাদের অনেকেই আমাদিগকে অসভ্য মনে করেন, পশুর মত ব্যবহার করেন, আমাদের প্রতি কত সময়ে কত অত্যাচার করেন, কত অবিচার করেন তাহা তোমরা হয়ত অনেকেই জান না। বিলাতের প্রজাগণের ন্যায় আমাদের কোন অধিকার নাই। আমরা মহারাণীর প্রজা হইলেও আমাদের ভারতবর্ষের নানা স্থানে যেমন মহারাণীর পরিবর্ত্তে এক এক জন শাসন কর্ত্তা রহিয়াছেন, যেমন বোম্বাইতে একজন গবণর, মান্দ্রাজে একজন গবর্ণর, পাঞ্জাবে একজন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এবং আমাদের বাঙ্গালা দেশে একজন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অর্থাৎ যাঁহাকে লোকে ছোটলাট বলে, তিনি, এবং সকলের উপরে গবর্ণর জেনারেল অর্থাৎ বড় লাট বাহাদুর রহিয়াছেন, ইংলণ্ডের প্রজাদের শাসনের জন্য এরূপ লোক নাই। আমাদের দেশে যেমন এই সকল বড়লাট ছোটলাটগণ আমাদের প্রতি যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, যখন ইচ্ছা তখনই আমাদের নিকট হইতে ট্যাক্স (কর) আদায় করিতে পারেন, আমাদিগকে শাসন করিবার জন্য ও আমাদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আইন প্রস্তুত করিতে পারেন, ইংলণ্ডের লোকের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবার নিয়ম নাই। অতি পূর্ব্বকালে আমাদের হিন্দু রাজারা যেমন দেশের পণ্ডিতগণকে লইয়া একটী রাজসভা করিতেন এবং সেই জ্ঞানীলোকেরা সভায় বসিয়া যেরূপ রাজাকে ভাল মন্দ উপদেশ দিতেন, ইংলণ্ডেও অতি পূর্ব্বকাল হইতে তেমনি একটী রাজসভা চলিয়া আসিয়া আধুনিক পার্লিয়ামেণ্ট নামক সভায় পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের হিন্দু রাজারা যেরূপ দেশীয় পণ্ডিতগণের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন বলিয়াই যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন না, ইংলণ্ডের রাণী সেইরূপ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণের বিনা সম্মতিতে কোন কাজ করিতে পারেন না বলিয়াই দেশের লোক সুখে আছে, স্বাধীন আছে। ইংলণ্ডের রাজা বা কোন রাজপ্রতিনিধি অপেক্ষা সাধারণ লোকেরই ক্ষমতা বেশী। রাণীর ক্ষমতা কেবল নামমাত্র, পার্লিয়ামেণ্টই দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা। এই পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহাসভার সভ্যগণই দেশের প্রকৃত শাসন কর্ত্তা এবং এই সকল সভ্যই আবার দেশের লোকের দ্বারা মনোনীত হইয়া থাকেন। এই মহাসভা দুইটী ভাগে বিভক্ত। একটিকে "হাউস অফ লর্ডস্" অর্থাৎ সম্ভ্রান্তদের সমাজ এবং অপরটিকে "হাউস অফ্ কমন্স" অর্থাৎ সাধারণদের সমাজ কহে। খুব উঁচু বংশের লোকেরা ও বড় বড় পাদ্রিরা মিলিত হইয়া লর্ডস্ সভার কাজ করেন। দুইজন প্রধান যাজক এবং চব্বিশজন যাজক, ও ডিউক, মার্ক্ইস্, আরল, ভাইকাউণ্ট, ব্যারণ ইত্যাদি উপাধিধারী লর্ড পরিবারের কয়েকজন লোক লইয়া লর্ডসভা গঠন হইয়া থাকে। রাজার ন্যায় এই সম্ভ্রান্তলোকদের শাসন ক্ষমতা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে; দেশের কোন রাজকার্য্য লইয়া কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে এই সভাতেই সর্ব্বশেষে

নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আবার নগর, গ্রাম, পল্লিগ্রাম, জেলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা বাছিয়া বাছিয়া বিচক্ষণ লোকদিগকে কমন্স সভার সভ্য করিয়া পাঠান। এই সভ্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাধারণ লোকদের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাধারণদের সমাজের বিশেষ ক্ষমতা এই যে, সমস্ত রাজ্যের আয়ব্যয়ের ভার ইহাঁদের হাতে এবং এই জন্যই ইহাঁরা রাজাকে দমনে রাখিতে পারেন। পার্লিয়ামেণ্টের দুই ভাগের সভ্যদের মধ্য হইতে রাজমন্ত্রীরা মনোনীত হইয়া থাকেন এবং বস্তুতঃ এই মন্ত্রীরাই রাজা বা রাণীর নামে রাজ্য শাসন করেন। দেশের কোন নূতন আইনকানুন করিতে হইলে মন্ত্রীরাই অনেক সময়ে সকল আইনের কথা সাধারণদের সভায় উপস্থিত করেন এবং সাধারণদের সভার অধিকাংশ সভ্যের মত হইলে লর্ড সভায় যায় এবং তথা হইতে রাণীর নিকটে সেই আইন সই করাইতে পাঠান হয়, রাণীর সই হইলেই আইন হইয়া যায়। যদি সাধারণদের সভার অনেকে কোন আইনের বিরুদ্ধে থাকেন এবং মন্ত্রীরা সেই আইনের প্রস্তাব করিয়া থাকেন, তবে অনেক সময় মন্ত্রীবর্গ তাঁহাদের পদ পরিত্যাগ করেন; পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভাঙ্গিয়া যায়; আবার দেশের লোকে নূতন সভ্য মনোনীত করিয়া নূতন পার্লিয়ামেণ্ট সভা গঠন করিয়া লয়। পাঠক পাঠিকাগণ! এখন শুনিলেত ইংলণ্ডের প্রজাগণের সহিত ভারতবর্ষের প্রজাগণের কত তফাত। আমাদের দেশের লোক সেই একই রাণীর অধীনে থাকিয়া, একই রাজ্যের প্রজা হইয়া এত পরাধীন কেন বলিতে পার কি? তোমরা মনে করিও না যে, মহারাণী বা তাঁহার প্রতিনিধি বড় লাট সাহেব আমাদের দেশীয় লোক নন বা এক জাতীয় লোক নন বলিয়াই আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করেন না। তোমরা বিশ্বাস করিও না যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়া এদেশের লোকের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবেন বলিয়াই এ দেশের রাজ্যভার তাঁহাদের হাতে লইয়াছেন।

যদি আমাদিগকে পেষণ করাই ইংরেজদের উদ্দেশ্য হইত, যদি আমাদের টাকাকড়ি কাড়িয়া লওয়াই ইংরেজদের ইচ্ছা হইত, তবে তাঁহারা আমাদের সুখ সুবিধার জন্য এত কখনই করিতেন না। তাঁহারা আমাদের অবস্থা ভাল হইবে বলিয়া রেলের গাড়ি করিয়াছেন। আগে এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে সংবাদ দিতে হইলে এক জন লোক পাঠাইতে হইত, এবং তাহাতে কত খরচ হইত ও কত সময়ে লোকও মিলিত না, এখন দুই পয়সার টিকিট দিয়া একখানা চিঠি লিখিলেই ডাকে চিঠি যাইতে পারে। অতএব তোমাদের মনে রাখা উচিত যে ইংলণ্ডের বড় বড় লোকের মত এই যে, আমাদের ভারতবর্ষের লোকেরা যতদিন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত না হইবেন ততদিন ইংরেজেরা আমাদের কল্যাণের জন্যই আমাদিগের রাজকার্য্য করিবেন। ইংলণ্ডের লোকদের মত আমাদের যখন শরীরের বল, মনের তেজ, কার্য্যক্ষমতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান হইবে, আমরা যখন খুব সাহসী হইয়া দেশের হিতের জন্য প্রাণ দিতেও ডরাইব না, আমরা যখন সত্যকাজ করিতে কাহারো ভয় করিব না, আমরা যখন ইংলণ্ডের লোকের ন্যায় ভারতের সমস্ত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলকে এক দেশের এক জাতির ও এক ঘরের লোক বলিয়া দেখিতে শিখিব, একজনের ভাগ দেখিয়া আর একজনে

হিংসা করিব না তখন আমাদের দেশ আমাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া ইংরেজেরা ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবেন। পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষায় খুব উঁচু হয়, পরমেশ্বর সেই জাতির লোক দ্বারায় নীচু জাতির লোকের ভাল করান।

তোমাদিগকে যে সকল কথা বলা হইল আমাদের ভারতবর্ষের সকল স্থানের বড় বড় লোকেরাই এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তাই তাঁহারা সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে ইংলণ্ডের প্রজাদের ন্যায় আমরা হইতে পারি। গত ২৮শে ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় এবার মহা উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকার "টাউন হল" ঘরে তিন দিন সভা হইয়াছিল। এই সভায় মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যভারত, পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা হইতে দুই এক জন করিয়া দেশের মধ্যে যাঁহারা গণ্য, মান্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এমন সব লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দেশের লোকেরা তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যাহাতে ভারতবর্ষের লোক ইংলণ্ডের লোকের ন্যায় যুদ্ধ বিদ্যা শিখিতে পারে, বড় বড় চাকুরী পাইতে পারে, দেশের আইন কানুন করিবার সময়ে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতে পারে, এই সকল কথা লইয়া ভারতবর্ষের সকল স্থানের বড় বড় লোকেরা কলিকাতায় বসিয়া অনেক পরামর্শ করিয়াছেন। এবার কলিকাতায় যাহা দেখিয়াছি এমন আর কখনও দেখি নাই। ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, এমন একদিন ছিল যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অর্থাৎ আদিম হিন্দুজাতি একত্রে বাস করিতেন, তার পর তাঁহারা ভারতবর্ষেরও অনেক দূরদেশের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, রুচি ও ব্যবসায় অনুসারে নানা জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। আগে আমরা ভাবিতাম কেবল বাঙ্গালাদেশের লোকেরাই বুঝি আমাদের দেশীয় লোক। এবার স্বচক্ষে দেখিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। এবার দেখিলাম, ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, নানা দিক হইতে ভারতসন্তানগণ উপস্থিত হইয়া একের দুঃখের কথা অন্যকে বলিতেছেন, বাঙ্গালী পঞ্জাবীর গলা ধরিয়া ভাই ভাই যেমন প্রাণ খুলিয়া কথা কয় তেমনি কত মনের কথা কহিতেছেন; হিন্দু মুসলমানকে "ভাই" বলিয়া কত কথা কহিতেছেন, খ্রীষ্টান হিন্দুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কেমন সুন্দর ছবি দেখাইতেছেন। বোম্বাই মান্দ্রাজ হইতে যাঁহারা সুশীল, সুবোধ, ধার্ম্মিক লোক আসিয়াছেন আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের কত আদর ও সম্মান করিয়াছেন। বোম্বাই মান্দ্রাজের সেই সকল ভাল লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক বাঙ্গালী পুরুষ ও স্ত্রীলোক বাড়ীতে খাওয়াইয়াছেন ও ভালবাসা দিয়াছেন। এমন দৃশ্য যে দেখিল না সে বড়ই দুর্ভাগ্য।

পেটুক পুষি।

থাবার পেয়ে খোকা বাবুর মুখটী যেন আলো।
থামী হাতে, নির্জ্জনেতে বস্‌লেন গিয়া ভালো।
ভাব্‌ছেন মনে, ভাই বোনে টের না পেলেই হয়,
এক্‌লা বসে, থাবেন কসে, খাবার সমুদয়।
নিষ্কণ্টকে, দিচ্ছেন্ মুখে যেই হাসি হাসি,
হেন কালে, দেখতে পেলে, পুষি সর্ব্বনাশি।
শত্রুর জ্বালায়, খাওয়া যে দায়, এত শত্রুও আছে,
পেটুক পুষী বড়ই খুসী ঘনিয়ে আসে কাছে।
খোকা ভাবে নেমে যাবে একটু পেলেই পরে
নতুবা ডেকে আন্‌বে কাকে নাজানি এ ঘরে;
ডাক শুনে ভাই বোনে যদি ছুটে আসে,
কেড়ে থাবে সব ফুরাবে কাঁদ্‌ব একা বসে?
ভাবি মনে, তার বদনে প্রথম খানি তুলে,
দিয়ে তারে তুষ্ট করে, নিয়ে যাক চলে।
একটী পেয়ে খুসী হয়ে যায় না হতভাগা,
লেজটী তুলে কাঁধে ঠেলে আর একখানির লাগি।
এমনি করি, হয় যে দেরী, ভাই বোনেরা আসে;
একলা থাবার, চেষ্টা খোকার, দেখে সবাই হাসে।

কৃপণ কুকুর।

স্কটলণ্ড দেশের একজন ভদ্রলোকের একটী কুকুর ছিল, তাহাকে তিনি ডাণ্ডি ডাণ্ডি বলিয়া ডাকিতেন। ঐ কুকুরের বুদ্ধির কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। প্রভু যখন যে জিনিস আনিতে বলিতেন ডাণ্ডি তাহা দশটা জিনিসের মধ্য হইতে খুঁজিয়া আনিতে পারিত। প্রভু বলিলেন কাপড়ের ভিতর হইতে চামড়ার ব্যাগটা আন, ডাণ্ডি গিয়া কাপড় তাড়ি বিতাড়ি করিয়া ব্যাগটা বাহির করিয়া মুখে করিয়া আনিয়া দিল। এইরূপে প্রভু যখন যাহা আদেশ করিতেন ডাণ্ডি তখনই তাহা পালন করিত।

একদিন সেই বাড়িতে কতকগুলি লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের পকেট হইতে একটা আধুলি পড়িয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে আধুলিটির খোঁজ হইল। সকলেই এদিকে ওদিকে খুঁজিতে লাগিলেন। ডাণ্ডি তখন ভাল মানুষটির মত ঘরের এক কোণে বসিয়া আছে। তাহার প্রভু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ডাণ্ডি আধুলিটা খুজে দে, তোকে একখানা বিস্‌কুট দিব। ডাণ্ডি আধুলটী আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। ভিতরের কথা, ডাণ্ডি নিজে ঐ আধুলিটী কুড়াইয়া রাখিয়াছিল।

তাহার প্রভুর বান্ধবগণ প্রায় তাহাকে দুই একটা পয়সা দিতেন। ডাণ্ডি জানিত যে পয়সা দিলে রুটী-ওয়ালার দোকান হইতে রুটী পাওয়া যায়। এই জন্য সে পয়সা পাইলেই ছুটিয়া রুটির দোকানে যাইত এবং রুটি কিনিয়া খাইত। এইরূপে ডাণ্ডি একটা আসল পথ-ভিকারী হইয়া উঠিল। পরিচিত লোক পথে দেখিলেই আকার ইঙ্গিতে পয়সা চাহিত এবং পয়সা পাইলেই রুটীর দোকানে যাইত। একদিন ডাণ্ডি একজন ভদ্রলোকের নিকট পয়সা চাহিল। ভদ্রলোক বলিলেন "হায়! হায়! ডাণ্ডি আমার সঙ্গে পয়সা নাই, বাড়ীতে আছে," এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন; স্বপ্নেও মনে করিতে পারিলেন না যে, ডাণ্ডি তাঁহার কথা বুঝিয়াছে। কিন্তু তিনি বেড়াইয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ কে আসিয়া দ্বার ঠেলিতেছে। চাকরাণী খুলিয়া দেখে যে ডাণ্ডি। গৃহস্বামী বুঝিলেন ডাণ্ডি পয়সা আদায় করিতে আসিয়াছে। তাহাকে একটা পয়সা দিলেন। কিন্তু সেটা মেকি পয়সা। ডাণ্ডির অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল বটে কিন্তু মেকি পয়সা ধরিতে পারে এতদুর বুদ্ধি ছিল না। সে মেকি পয়সাটি লইয়া একছুটে রুটীর দোকানে গেল এবং পয়সাটী রুটীওয়ালার হাতে দিল। রুটিওয়ালা মেকি পয়সা দেখিয়া রুটী দিল না বরং বলিল "চোর কুকুর! তুই আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস্।" ডাণ্ডি বড় অপমানিত হইয়া সেই মেকি পয়সাটী লইয়া বরাবর সেই পয়সাদাতা ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে গেল। দ্বার ঠেলিতে লাগিল; দাসী দ্বার খুলিলে তাহার পায়ের নিকট পয়সাটী রাখিয়া তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তিসূচক দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেল।

ডাণ্ডির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কীর্ত্তি এখনও বলা হয় নাই। সে লোকের নিকট নিত্য যে পয়সা পাইত, তাহাতে তাহার পেট ভরিয়া রুটী খাইয়াও পয়সা বাড়িত। ডাণ্ডি ভাবিল এসব পয়সা সময়ে কাজে লাগিবে। এই ভাবিয়া সেই সকল

পয়সা আপনার শয্যার নিম্নে সঞ্চয় করিতে লাগিল। তাহার শয্যা ত আর কেহ তুলিয়া দেখিত না, সুতরাং সে তাহার উপর পরম সুখে শুইয়া থাকিত। কৃপণ যেমন নড়ে চড়ে আর নিজের ধন দেখে, ডাণ্ডি সেইরূপ নড়িত চড়িত আর নিজের শয্যাটীর উপরে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিত। একদিন রবিবার অতি প্রাতঃ-কালে ডাণ্ডি রুটী কিনিয়া আনিতেছে, তাহার প্রভু দেখিয়া ভাবিলেন "এত সকালে ডাণ্ডি পয়সা কোথায় পাইল? তবে বোধ হয় পয়সা জমাইয়া রাখে" এই ভাবিয়া চাকরাণীকে তাহার ঘর অন্বেষণ করিতে বলিলেন। স্ত্রীলোকটী যতক্ষণ এ দিক ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, ততক্ষণ ডাণ্ডি কিছু বলে নাই; সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তির ন্যায় আধখানি চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল। যেই চাকরাণী আসিয়া তাহার শয্যাতে হাত দিল অমনি উঠিয়া সেই চাকরাণীর কাপড় ধরিয়া টানিয়া অন্য দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বারণ না শুনিয়া চাকরাণীটী যখন শয্যা তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন ভয়ানক ক্রোধ করিয়া তাহাকে কামড়াইতে গেল। অবশেষে তাহার প্রভু আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন। চাকরাণী শয্যা নাড়িয়া দেখে যে, ডাণ্ডি প্রায় চারি আনা পয়সা শয্যার তলে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ডাণ্ডি দেখিল বড় মুস্কিল, শয্যার তলে পয়সা রাখিলে নিস্তার নাই। সেই অবধি পয়সা সে পাইলে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিত। এমন কুকুরের কথা কি কেহ কখনও শুনিয়াছ?

দীপশিখা।

তেলের বাষ্প বাতাসের অম্লজনের সহিত মিশিবার সময় যে একটা কাণ্ড কারখানা হয় তাহাকেই আমরা সাধারণ ভাষায় "প্রদীপ" বলিয়া থাকি। একটা জিনিস অম্লজনের সহিত মিশিয়া এই ব্যাপারের সৃষ্টি করিল। মিসিবার সময় একটা জিনিস তাতিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আর আমরা বলিলাম "ঐ আগুনের শিখা।" গতবারে আমরা মোটামুটি এই কথাগুলি শিখিয়াছি।

কিছুকাল হইল, আমাদের একজন পাঠক আমাদিগকে একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমরা তাহার উত্তর দিতে গিয়া এতদিন দেরি করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। বিষয়টা খুব কঠিন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তা ছাড়া উত্তর না দিতে পারার আর একটা কারণ আছে। দুঃখের বিষয়, আমরা যতবার কেরোসিন্ ল্যাম্পের পলিতা বাড়াইয়া দিয়াছি, একবারও তাঁহার পত্রোল্লিখিত আশ্চর্য্য ঘটনাটী দেখিতে পাই নাই। পলিতা কমাইয়া দিলে কতকটা ঐরূপ হয় বটে। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে কেহ যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে করিয়া দেখিতে পারেন। বিষয়টা এই:—

"আমি একদিন কেরোসিন্ ল্যাম্পের নিকট বসিয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ একবার ঘর অন্ধকার হইল, ল্যাম্পের দিকে তাকাইয়া
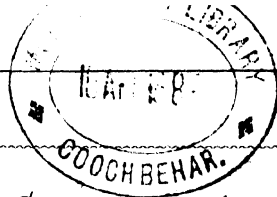
দেখি যে, "পলিতার মুখে একটী ফুল (কালীতে যে একরূপ ফুলের ন্যায় ল্যাম্পের মুখে হয়) হইয়া আছে ও নীলরঙ্গের শিখা উঠিতেছে, প্রকৃত আলো নাই। এইরূপে ৫।৬ সেকেণ্ড পর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পুনরায় ঐরূপ হয় কিনা দেখিবার জন্য তাকাইয়া রহিলাম। অধিকক্ষণ গত হইতে না হইতেই ঐরূপ হইল। কিন্তু সে বার অন্যরূপ—প্রকৃত আলোই ল্যাম্পের মুখ হইতে ৩।৪ অঙ্গুলি উপরে জ্বলিতে লাগিল, ব্যবধান স্থানের মধ্যে কিছুই দেখা গেল না। এরূপ ৩।৪ বার হওয়ার পর আলো একেবারে অদৃশ্য হইল, ½ মিনিট পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যাই দেশালাই জ্বালিলাম তৎক্ষণাৎ ল্যাম্প ও আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিল। কিছুকাল পর যথার্থই প্রদীপ নিভিল। সেবার আমাকে পুনরায় উচিত মত ধরাইতে হইল।"

আমরা যতবার পলিতা বাড়াইয়া দিয়াছি, ততবারই আলোটা লম্বা জিব্ বাহির করিয়া কেবল ধূম উদ্গীরণ করিয়াছে। শেষে চিম্‌নী ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কায় আবার পলিতা কমাইয়া দিতে হইয়াছে।
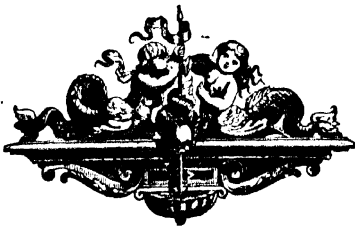
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমাদিগকে অনেক মহাজনের জীবনচরিত বলিয়াছি আজ এমন একজন মহাত্মার জীবনচরিত বলিব, যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের বাঙ্গালির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় ঈশ্বর-পরায়ণ, ধার্ম্মিক লোক এখন বাঙ্গালাতে জীবিত নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি এখনও জীবিত আছেন কিন্তু আর অধিকদিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না। বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতাবশতঃ ইহাঁর শরীরের অবস্থা দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে; এবং দেখিয়া ভয় হইতেছে যে, এশরীর অধিকদিন রহিবে না। যেদিন ইনি এ সংসার পরিত্যাগ করিবেন সেদিন ভারতবর্ষের একটী উজ্জ্বল তারা খসিয়া পড়িবে।

তবে ইহাঁর বিষয় কিছু শুন। ইহাঁর নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহাঁর যে প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছ ইহা তাঁহার অত্যন্ত প্রাচীন অবস্থার প্রতিমূর্ত্তি; বিশেষতঃ আমাদের দেশে এখনও চিত্রবিদ্যার ততদূর উন্নতি না হওয়াতে আমরা মনের মত করিয়া কোন লোকের ছবি করিতে পারি না। সুতরাং এ ছবিতে সেই মহাপুরুষের আসল চেহারা কিছুই প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতাতে একজন বিখ্যাত বড় মানুষ ছিলেন। ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রভুত্বশক্তিতে তাঁহার সমকক্ষ লোক সে সময়ে কলিকাতায় ছিল না। গবর্ণর জেনেরাল হইতে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সমুদায় ইংরাজ তাঁহার হাতধরা ছিল। দেশের লোকের ত কথাই নাই। তিনি ধনে,

মানে, পদে, সর্ব্বাগ্র গণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁর নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর। ইহাঁর নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এই দুইজনের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ভার পড়ে। ১৮৩৩ সালে রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর রাধাপ্রসাদ রায় দিল্লীতে গমন করেন; তখন ব্রাহ্মসমাজের ভার দ্বারকানাথ ঠাকুরের উপর পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়ক্রম তখন ১৭ কি ১৮ বৎসর। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার বাল্যকালে রামমোহন রায় একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন; তাঁহার পিতা,

রামমোহন রায়ের সহিত বন্ধুতা থাকাতে, প্রথমে তাঁহাকে সেই স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পর তিনি হিন্দু কালেজে পড়িয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর যে কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী ছিলেন, তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেরূপ ধনীর ছেলে হইলে মানুষ কত বাবুগিরিতে থাকে তাহা তোমরা বুঝিতেই পার। সেরূপ বিলাস ও বাবুগিরির মধ্যে বাস করিয়া লোকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি মলিন হইয়া যায়। নানা কুসঙ্গী জুটিয়া সর্ব্বদা কুপথে যাইবার জন্য পরামর্শ দিতে থাকে; স্বার্থপর লোকে আপনাদের কাজ সারিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা তোষামোদ করে; তাহাতে মস্তক ঘুরিয়া যায়; এই কারণে এদেশের বড় মানুষের ছেলেরা প্রায় নষ্ট হইয়া যায়। বড় মানুষের ছেলেদিগকে মানুষ করিবার জন্য যত টাকা ব্যয় হয়, যত পরিশ্রম হয়, যত চেষ্টা হয়, কোন গরিবের ছেলের জন্য তেমন হয় না। অথচ অতি অল্প বড় মানুষের ছেলেকেই মানুষ হইতে দেখা যায়। ছেলেবেলা হইতেই তাহাদের নানা পাপে মতি হয়, ও ধনের অহঙ্কারে মন পূর্ণ হয়। এখন বিবেচনা কর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে তাঁহার বয়স যখন ১৭ কি ১৮ বৎসর তখন হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে মতি হইল। যে দুই কারণে তাঁহার মনে ধর্ম্ম চিন্তার উদয় হইল, তাহা শুনিলেও তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিবে; কারণ তেমন ঘটনা প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের জীবনে ঘটিতেছে—কিন্তু সেরূপ চিন্তা অন্য কাহারও মনে উদয় হয় না। প্রথম, তিনি একদিন রাত্রিকালে ছাদের উপরে শয়ন করিয়া আকাশের শোভা দেখিতেছিলেন। নির্ম্মল আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে, দেখিয়া তাঁহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল! মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাদের উপরে কি কেহ কর্ত্তা নাই? অন্য লোকের মনে এরূপ চিন্তা যদিও কখনও উঠে, দুই দণ্ডের মধ্যেই আবার মিলাইয়া যায়। কিন্তু এই মহাত্মা স্বতন্ত্র ধাতুতে নির্ম্মিত, সুতরাং তাঁহার প্রাণে এই প্রশ্ন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তত বিষয় সুখের মধ্যে থাকিয়াও এই চিন্তা তাঁহার প্রাণে জাগিতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার একজন আত্মীয়া বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। সেই শব দাহের সময়ে তিনি শ্মশানে গিয়াছিলেন। শ্মশান হইতে সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিল এবং আপন আপন কাজে নিযুক্ত হইল, কিন্তু তাঁহার প্রাণে এক যুগান্তর ঘটিয়া গেল। তিনি দিব্যচক্ষে বিষয় সুখকে অনিত্য ও অসার বলিয়া দেখিতে পাইলেন। যেন কি এক অপূর্ব্ব আলোক তাঁহার প্রাণে আসিয়া পড়িল! তিনি যেন কি এক অমূল্য বস্তু লাভ করিলেন! এখন হইতে তাঁহার মনে ধর্ম্ম-চিন্তা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মের চর্চ্চা ভিন্ন আর কোন চর্চ্চা তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া নিরন্তর ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বাড়ীর নিকটে ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী, তাঁহার পিতা তাহার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন, এবং তাহার রক্ষার জন্য মাসে মাসে প্রায় ৮০।৮৫ টাকা অর্থ সাহায্য করিতেন, তথাপি তিনি ইহার পূর্ব্বে সেখানে বড় একটা যাইতেন না। সেদিন হইতে প্রাণে ধর্ম্ম-চিন্তা প্রবল হইল, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করিলেন। গিয়া দেখেন, সমাজের অতি হীন অবস্থা। রামমোহন রায় যে আচার্য্যকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই কোন প্রকারে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন;

পুরাতন সভ্যদের প্রায় কেহই আর আসেন না। কেবল সমাজের দিন দুইচারিজন পথিক লোক আসিয়া বসে। ওদিকে সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচার হইতেছে। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজকে সংস্কার করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। তখন তাঁহার বয়স অনুমান ২০ বিশ বৎসর হইবে।

তিনি উৎসাহের সহিত ধর্ম্মালোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩৯ সালে "তত্ত্ববোধিনী সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করা, ধর্ম্ম-বিষয়ে বিচার করা, ঐ সভার প্রধান কার্য্য হইল। এই সময়ে একটী ঘটনা হয় তাহাতেও ঐ মহাত্মার আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে। একদিন তিনি গভীর ধর্ম্ম-চিন্তাতে মগ্ন হইয়া বেড়াইতেছেন এমন সময়ে একটী পুথীর পাতা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে লাগিল; তিনি কুড়াইয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন, ভাল বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাহার অর্থ করিয়া দিলেন। সেটী "ঈশোপনিষদ" নামক বেদের এক গ্রন্থের প্রথম পাতা। দেবেন্দ্র নাথ দেখিলেন যে সেই একটী পাতাতে অতি আশ্চর্য্য গভীর সত্য সকল নিহিত রহিয়াছে! দেখিয়া তাঁহার বেদ ও উপনিষদের প্রতি ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি উপনিষদ্ সকল পাঠ করিতে পারিবেন বলিয়া মনোযোগ সহকারে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পাঠ ও আত্মচিন্তা দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মভাব দিন দিন গাঢ় হইতে লাগিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইল। এই পত্রিকা এখনও আছে এবং তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে অতি গভীর সত্য সকল প্রকাশ হইয়া থাকে। তোমরা সকলেই অক্ষয় কুমার দত্তের নাম জান; তাঁহার প্রণীত চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ তোমরা সকলেই পড়িয়াছ। সেই অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির গুণে তত্ত্ব-বোধিনী অল্প দিনের মধ্যে দেশের বাঙ্গলা সংবাদ পত্র সকলের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা দেশমধ্যে ধর্ম্মচিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল; আমাদের দেশের যে সকল প্রাচীন শাস্ত্র এতদিন লোকে জানিতনা তাহা উদ্ধার হইতে লাগিল; সেই সকলের অনুবাদ দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া যাইতে লাগিল; আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররূপ খনিতে যে এত রত্ন আছে তাহা জানিয়া সকলের মনে স্বদেশানুরাগ প্রবল হইতে লাগিল; যে ব্রাহ্ম-সমাজ মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আবার তেজের সহিত বাড়িয়া উঠিল।

এদিকে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ধর্ম্ম-চিন্তার অতি গভীর স্থানে প্রবেশ করিতেছেন। তখন তাঁহার মনে একটী প্রশ্ন বিশেষভাবে প্রবল হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাতে লোকের মতি না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম চর্চ্চাতে ফল কি? যদি লোকে ঈশ্বরের পূজা না করে, তবে তাহা-দিগকে সাকার দেব দেবীর পূজা ছাড়াইয়া ফল কি? এই ভাবিয়া ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবং আরও কয়েক জন বন্ধু একত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি-লেন যে তাঁহারা রোগাদিরদ্বারা অশক্ত না হইলে

প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিবেন। তাঁহার সহিত যত লোকে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কে কোথায় গিয়াছে, হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেকেই সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘণ করিয়াছে কিন্তু তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একটী দিনের জন্য তাহা ভঙ্গ করেন নাই। এখন তাঁহার শরীর জরাজীর্ণ এখনও তিনি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন। বুঝিয়া লও ইনি কি ধাতুর লোক। সমাজমধ্যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা যখন আরম্ভ হইল তখন লোকের ধর্ম্মজীবন ফিরিতে লাগিল। তাঁহার সহবাসে থাকিয়া অনেক দুরাচার লোকের চরিত্র শুধরাইয়া যাইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে সময়ে যে কেহ ইংরাজী শিক্ষা করিত, সেই ইংরাজী সভ্যতা ভাল বাসিত, সুরাপানে রত হইত; ধর্ম্মের প্রতি একবারে উদাসীন হইয়া পড়িত। এই মহাত্মার জীবনে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিল। তাঁহার স্বদেশানুরাগ শতগুণ বাড়িয়া গেল; এদেশীয় শাস্ত্র, এদেশীয় ভাব, এদেশীয় রীতি নীতি, তাঁহার ভাল লাগিত; তিনি ঋষিদের প্রকৃত শিষ্য হইয়া তাঁহাদের পদতলে বসিলেন; মনোযোগ পূর্ব্বক পাপাশক্তি ও দুর্গতি হইতে যুবকদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং ধর্ম্মচিন্তাতে গম্ভীররূপে নিমগ্ন হইলেন। এই জন্যই বলিয়াছি ইহাঁর প্রকৃতি সাধারণ প্রকৃতি নয়।

„সত্যস্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা করিব না” এই প্রতিজ্ঞা করার পর তাঁহাকে অনেক ক্লেশ পাইতে হইত। তখনও তাঁহার অতুল প্রভাব-শালী পিতা বর্ত্তমান। তখনও বাড়ীতে মহা ধুমধাম করিয়া দুর্গোৎসব হইত। সে সময়ে বাড়ীর ছেলেদিগকে অঞ্জলি দিতে হইত, তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তাহা দিতেন না। সেই কয়েক দিন বাড়ী ছাড়িয়া পথে পথে বাগানে বাগানে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া কাটাইতেন।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর দুইটী ঘটনা হয় তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম-বীরত্বের আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম, তাঁহার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধের দিন যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রাণে এই চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল, আমি যখন সত্যস্বরূপের উপাসক তখন আমি কিরূপে সাকার দেবদেবীর পূজা করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করিব? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সাকার দেবদেবীর পূজা করিবেন না। তাঁহার বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তিনি বাড়ীর বড়ছেলে তিনি শ্রাদ্ধে যোগ দিবেন না, পরিবার পরিজন সকলে কাঁদিতে লাগিল। তিনি কোনক্রমেই নিজের ব্রত লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রাদ্ধের অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তিনি কেবল দান উৎসর্গ করিয়া, সমস্ত দিন বেদপাঠ ও উপাসনাদিতে কাটালেন। এই সময় হইতে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে আর একটী ঘটনা ঘটিল। তাঁহার পিতা মরিবার সময় অনেক লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই ঋণের দায়ে তাঁহার কারঠাকুর কোম্পানী নামে যে সওদাগরী ছিল তাহার পতন হইল। সওদাগরী ছাড়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের যে বৃহৎ জমিদারী ছিল তাহার অধিকাংশ তাঁহার নিজের উপার্জ্জিত এবং অল্পাংশ তাঁহার পৈতৃক ছিল। এই পৈতৃক জমিদারী তিনি পুত্রদের জন্য নিজ

সম্পত্তি হইতে পৃথক করিয়া কয়েক জন বিশ্বস্ত ব্যক্তির জিম্বায় তাহা রাখিয়া দেন। এই সম্পত্তির উপরে তাঁহার পাওনাদারদের হাত দিবার অধিকার ছিল না কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন দেখিলেন যে তাঁহার পিতার উপার্জ্জিত সমুদায় বিষয় বিক্রয় করিয়াও সমস্ত ঋণ শোধ হয় না, তখন তিনি নিজেদের খাওয়া পরার একমাত্র উপায় যে জমিদারী বিশ্বস্তদের জিম্বায় আছে তাহাও বিক্রয় করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি যখন সত্য-স্বরূপের উপাসক হইয়াছি তখন নিজের বিষয় থাকিতে পিতার পাওনাদারদিগকে তাহা না দিয়া অধর্ম্মে পতিত হইতে পারিব না?" কোন ক্রমেই মনকে তাহার জন্য প্রস্তুত করিতে পারিলেন না। ওদিকে তাঁহার পিতার এত ঋণ রহিয়াছে যে সমুদায় বিষয় বিক্রয় হইয়া তাঁহাদের ফকির হইয়া যাইবার কথা। তিনি সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না; বাড়ীর লোকদিগকে বলিলেন যে, "ফকির হই আর মরিয়াই যাই, আমি প্রবঞ্চনা করিতে পারিব না" বাড়ীতে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল। তিনি পাওনাদারদিগকে ডাকাইয়া সমুদায় বিষয়ের একটী তালিকা করিয়া তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার এই সাহস ও সাধুতা দেখিয়া পাওনাদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিলেন। ইহার ফল এই হইল তাঁহারা বিষয় বিক্রয় করিয়া লইলেন না। দেবেন্দ্র বাবুর পরিবারের জন্য মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া আপনাদের হাতে বিষয় রাখিয়া চালাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আবার তাঁহারা নিজেই সেই বিষয় দেবেন্দ্র বাবুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে দেবেন্দ্র বাবু বহুকাল ধরিয়া সেই সমুদায় ঋণ শোধ করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার পিতা কলিকাতার চ্যারিটেবল সোসাইটীতে একলক্ষ টাকা দিবার যে লেখা পড়া করিয়াছিলেন কিছু দিন হইল তিনি সেই একলক্ষ টাকাও দিয়াছেন। এমন সুযোগ্য পুত্র কয়জন দেখা যায়। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন, ইহার প্রমাণ যদি কোথাও দেখিতে চাও, তবে এই মহাত্মার জীবনে দেখ। আজ এই পর্য্যন্ত। এখনও অনেক বলিতে অবশিষ্ট রহিল পরে বলিব।

ক্রমশঃ।—

ফুলের সাজি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পিতা ও কন্যার সাক্ষাৎ।

মনোরমার দুঃখের কাহিনী শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। পরমেশ্বর কোমল হৃদয়া বালিকাকে কি পরীক্ষাতেই ফেলিয়াছেন! দেখিতে দেখিতে আর একটী দিন চলিয়া গেল। কারাগারই এখন মনোরমার আবাসস্থান, দ্বারে ভীষণাকার প্রহরী, হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র নাই, আকার দেখিলে সাক্ষাৎ যম বলিয়া বোধ হয়। হায়! বালিকা তুমি অকারণে

কত ক্লেশই পাইতেছ; ঈশ্বরই দেখিতেছেন তুমি কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ।

মনোরমার কারাগৃহ ত্যাগ করিয়া আমরা একবার বিচারকের গৃহে গিয়া দেখি তিনি কি করিতেছেন। ঐ দেখ তাঁহার মুখে চিন্তার কালিমা পড়িয়াছে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। বিষম সমস্যা—কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। ভাবিলেন—তাই ত এই বালিকার বিচার করিতে তিন দিন অতীত হইল, তথাপি সত্য নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বালিকার নির্ভীক চিত্ত, সতেজ কথা শুনিলে তাহাকে নির্দ্দোষী ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু যদি সে প্রকৃত অপরাধী হয় তাহা হইলে এরূপ কপট ও দুষ্ট প্রকৃতি বালিকা আমি এই প্রথম দেখিলাম।

তিনি এখনও কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না বলিয়া আপনি রাজভবনে উপস্থিত হইলেন—এবং কোন বিশ্বস্ত রাজ-ভৃত্যকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া তাহাদ্বারা রাজমহিষী কথিত সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিলেন।

বিচারক মায়াকে আবার ডাকিয়া বিবিধ প্রকারে তাহাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিষম বিভ্রাট, অথচ একদিকে রাজ অন্তঃপুরে চুরী, অন্যদিকে বিশেষ প্রমাণাভাবে একটী বালিকার প্রাণদণ্ড! কারণ তখন চুরী অপরাধে প্রাণদণ্ডের নিয়ম ছিল। সমস্তদিন অনেক ভাবিয়া তিনি পরিশেষে মনোরমার পিতাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "দীননাথ! তুমি একবার তোমার কন্যাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি তোমায় সে কি বলে। দেখ, সকলে আমায় বলে আমি বড় কড়ালোক কিন্তু আমি কখনও কোন অবিচার করি নাই। তুমি কি এমন ইচ্ছা কর যে তোমার মেয়েটীর প্রাণদণ্ড হয়—যেরূপ ঘটনা তাহাতে সে নিশ্চয় দোষী—এবং আমাদের দেশের আইন অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু যদি সে এখনও তাহার দোষ স্বীকার করে ও আংটীটি ফিরাইয়া দেয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে বালিকা বলিয়া অল্প শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি। নচেৎ তাহার প্রাণের আশা নাই, যাও যাহাতে সে আংটী ফিরাইয়া দেয় তাহা কর। তুমি পিতা, তুমি স্বীকার করাইয়া আংটি আদায় করিতে পারিবে। যদি তুমি না পার তোমাকেও আমরা দোষী জ্ঞান করিব এবং তোমাকে ও দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে।"

দীননাথ উত্তর করিল "আপনি যেমন বলিলেন সেইরূপই হইবে কিন্তু তাহাকে অনেক বার ভালরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি; সে নির্দ্দোষী সুতরাং তাহার দোষ স্বীকারের কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাহউক আমি যে তাহাকে দেখিতে পাইবার অনুমতি পাইলাম ইহাই যথেষ্ট।"

এক জন প্রহরী বৃদ্ধ দীননাথকে কারাগারে মনোরমার নিকট লইয়া গেল; দীন নাথ তথায় প্রবেশ করিলে পর, প্রহরী দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে গেল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, বৃদ্ধ ক্ষীণ দীপালোকে দেখিল, মনোরমা তৃণ শয্যায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। আহা! তাহার সে লাবণ্য নাই! মুখের সে হাসি হাসি ভাব নাই, শুষ্ক কমলের ন্যায় তাহার মুখখানি শ্রীহীন হইয়াছে! বৃদ্ধ দেখিল পার্শ্বে একখানি থালায় কতকগুলি অন্ন ও ব্যঞ্জন এবং একটি ঘটিতে এক ঘটি

জল। অনুমানে তাহার বোধ হইল, মনোরমা তাহা স্পর্শও করে নাই। এই সকল দেখিয়া বৃদ্ধ চক্ষের জল রাখিতে পারিল না। হায় রে? ইহার এত কষ্টও ছিল, না জানি আরও বা কি ঘটে! সে এই চিন্তা করিতেছে এমন সময় মনোরমা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বৃদ্ধ কন্যার গাত্রে হস্ত দিয়া বলিল "ভয় কি মা!" মনোরমা চক্ষু খুলিয়া দেখে, কাছে পিতা বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন "ভয় কি মা"। আশাতিরিক্ত এই মিলনে তাহাদের হৃদয় যে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য, প্রথমে কাহারও মুখে কথা বাহির হইল না, দুজনেই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিল। তৎপরে বালিকা পিতার পা দুটী ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, নয়নজলে বৃদ্ধেরও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে দীননাথ কন্যাকে তাহার আগমনের কারণ সমস্ত খুলিয়া বলিল। মনোরমা বলিল, বাবা তুমি ত ঠিক জান আমি নিরপরাধিনী, হায়! শেষে কি তুমিও আমায় চোর বলিয়া স্থির করিলে? পিতা বলিল, মনোরমে! স্থির হও আমি তোমায় নির্দ্দোষী বলিয়া জানি কেবল বিচারপতির আজ্ঞায় তোমায় আবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তোমার এই দশা দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, না জানি তোমার আরও কি হয়।

মনোরমা বলিল বাবা, আমি নিজের জীবনের জন্য একতিলও চিন্তিত নহি, তোমার যদি কোন অনিষ্ট না হয় তাহা হইলে আমার প্রাণদণ্ড আজ্ঞা হইলেও আমি আনন্দে প্রাণত্যাগ করিতে পারিব।

পিতা বলিল "আমার জন্য ভয় নাই, আমাকে উহারা কোন দণ্ড দিবে না, কিন্তু তোমার কথা ভাবিয়া আমি বড় কাতর হইতেছি।" মনোরমা প্রফুল্লমনে কহিল যদি তোমার কোন ভয় না থাকে—তাহা হইলে আমার মৃত্যুও সুখের হইবে। কারণ আমি এ সংসার ত্যাগ করিয়া আমার পরম পিতা হরির কাছে যাইব—স্বর্গে আমার মার সঙ্গে আবার আমার মিলন হইবে। কথাগুলি শুনিয়া বিষাদের মধ্যেও দীননাথের প্রফুল্লতা আসিল—তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তিনি যে তোমায় এরূপ নির্ভয়ের ভাব আসিয়াছে; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র কন্যারত্ন হারাণ আমার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও যন্ত্রণা-দায়ক। ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমি মনোরমাকে তোমার হাতে দিলাম—তুমি তাহাকে রাখিতে হয় রাখ না রাখিতে হয় মার।" কিয়ৎক্ষণ পরে বাষ্পবেগ সংবরণ করিয়া আবার কহিলেন—"মনোরমে—তুমি জান মায়ার সাক্ষ্যদানেই তোমার এই বিপদ—কিন্তু তুমি কি মনে মনে তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিয়াছ! তাহার উপর তোমার কোন মন্দ ভাব নাই ত? মনোরমে! তাহাকে দয়া করিয়া ক্ষমা কর।" মনোরমা বলিল "আমি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি; যাহা আমার ক্লেশ, সমুদায়ই হরির ইচ্ছায় হইয়াছে। অন্য কাহার দোষ দিব?" মনোরমার কথা শেষ না হইতেই প্রহরী দোর খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। প্রহরী দীননাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "চল"। মনোরমা পিতার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রহরীর উত্তেজনায় অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে পা সরাইয়া লইলেন, মনোরমা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া তৃণের উপর পড়িয়া রহিল।
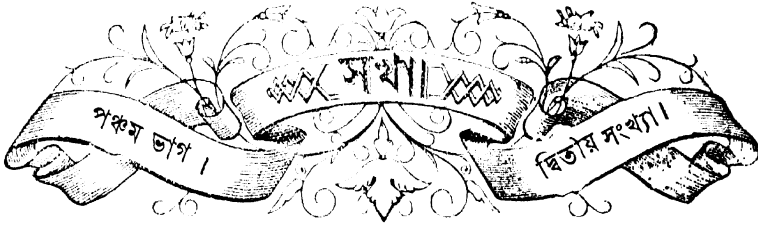
ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭।

আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া।

আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে সকলেই হয়ত জান না, যে আমাদিগের মহারাণীর সম্পূর্ণ নাম কি; কুইন ভিক্টোরিয়াই আমরা সকলে জানি; কিন্তু ইহাঁর প্রকৃত নাম আলেকজান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া। সাধারণতঃ রাজারাণীদিগের ভাগ্যে যাহা প্রায় ঘটে না, ইহাঁর ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে; পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করা প্রায় কোন রাজার ভাগ্যেই ঘটে না, কিন্তু আগামী ২০শে জুন আমাদিগের মহারাণীর রাজত্ব পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে পৃথিবীর যে যে স্থানে মহারাণীর রাজত্ব আছে সকল স্থানেই মহা উৎসব হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সকল স্থানে গত ১৬ এবং ১৭ই এই উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। এই জুবিলি উপলক্ষে কলিকাতায় এবং অন্য অন্য স্থানে মহা ধুমধাম হইয়া গিয়াছে; অনেক ভাল কাজও হইয়াছে এবং অনেক ভাল কাজের অনুষ্ঠানও হইয়াছে। এই জুবিলি উপলক্ষে এ দেশের জেল হইতে ২৩৩০৭ জন কয়েদীকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে যাঁহার জন্য মহা উৎসব হইল তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল জানিবার জন্য অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে, তাই আজ আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী উপহার দিতেছি।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে বিলাতে কেন্‌সিংটন রাজপ্রাসাদে মহারাণীর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা এডওয়ার্ড ডিউক বা কেণ্ট, ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। মহারাণীর মাতার নামও ভিক্টোরিয়া, ইনি জর্ম্মাণ দেশের কোন রাজবংশের কন্যা ছিলেন। তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ জর্জ্জ রাজা হইলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল, পুত্র সন্তান হয় নাই; কিছু দিন পরে সে কন্যারও মৃত্যু হয়; জর্জ্জের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা উইলিয়ম রাজা হইলেন। ইহাঁর দুই কন্যা জন্মে, কিন্তু জন্মের অল্প দিন পরেই দুই কন্যারই মৃত্যু হয়। তৃতীয় জর্জ্জের তিন পুত্র নিঃসন্তান হইয়া মরিলেন; চতুর্থ পুত্র এডওয়ার্ডের, ভিক্টোরিয়ার বয়স এক বৎসর হইতে না হইতেই, মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং পিতৃহীনা বালিকা ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে

C. Roberts

২০শে জুন বৃটিশ রাজ্যের রাণী হইলেন; এই সময়ে তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র।

মহারাণী এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন, তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর। ইনি খুব সুন্দরী ছিলেন; বাল্য-কালে ইহাঁকে বড়ই সুন্দর দেখাইত, তাই ইহাঁর পিতা মাতা ইহাঁকে আদর করিয়া "বাসন্তী কুসুম" বলিয়া ডাকিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভিক্টোরিয়ার বয়স এক বৎসর হইতে না হইতেই, তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা কন্যাকে সুশিক্ষিত করাই জীবনের ব্রত করিলেন, যাহাতে কন্যাকে সর্ব্বগুণভূষিতা করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ভিক্টোরিয়া মার কাছে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহারই গুণে তিনি আজ এত বড়। তাঁহার মার শিক্ষা যত্ন ও চেষ্টার গুণেই তিনি আজ পৃথিবীর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেছেন। ছেলে বেলায় বাড়ীতে বিশেষতঃ পিতা মাতার কাছে যে শিক্ষা হয় সেই শিক্ষাই মানুষকে গড়িয়া তোলে; ভিক্টো-রিয়া বাল্যকালে মার কাছে সুশিক্ষা পাইয়া-ছিলেন, জীবনে তাহার সুফলও ফলিয়াছে।

আমাদের দেশে বড় লোকের ছেলেদেরই লেখাপড়া হয় না, মেয়েদের ত দূরের কথা। ছেলে বেলা হইতে এত অধিক আদর দেওয়া হয় যে অল্প বয়সেই ছেলেরা নিতান্ত খারাপ হইয়া যায়। ভিক্টোরিয়া রাজবংশে জন্মিলেও তাঁহার মাতা বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহার শিক্ষা দিতে লাগিলেন। খাওয়া দাওয়া, লেখা পড়া, খেলা, বেড়ান এ সকল কাজেরই একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল। প্রথম প্রথম লেখা পড়ায় বিশেষ মনোযোগ দিতেন না; বলিতেন "এটা শিখে কি হবে?" "ওটা শিখ্‌লে কোন লাভ নাই।" কিন্তু ক্রমে লেখা পড়ায় তাঁহার মনোযোগ হইতে লাগিল, এবং যখন তাঁহার এগার বৎসর বয়স, তখনই লাটিন্, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় সহজে কথা বলিতে পারিতেন, অঙ্কশাস্ত্রে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন, এবং উৎকৃষ্টরূপ শিল্পবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। আমা-দিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কয়জনের এ প্রকার বিদ্যা উপার্জ্জনের প্রতি অনুরাগ আছে? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এগার বৎসরের মেয়ের পক্ষে তিন চারিটা ভাষা শেখা কত আশ্চর্য্য! একখানা বাঙ্গালা বইএর দুই পাতা উল্টাইতে পারিলেই আমাদের দেশের মেয়েরা মনে করেন ঢের হইল; অধিক লেখা পড়া শিখি-বার একটা যে ইচ্ছা তা যেন এদেশে নাই। তার পর একটু লেখা পড়া শিখিলেও শিল্প শিক্ষার দিকে আমাদের মেয়েদের মনোযোগ বড় কম। মহারাণী চিত্রবিদ্যা অত্যন্ত সুন্দর জানিতেন, আমাদের দেশে অতি অল্প মেয়েই চিত্রবিদ্যা বা অন্য কোন শিল্প জানেন।

ছেলেবেলা হইতেই মার কাছে ভিক্টোরিয়া মিতব্যয়ী হইতে শিখিয়াছেন। বিলাসিতা বা বাবুগিরির দিকে তাঁহার মন ছিল না; রাজবংশে জন্মিয়াও তিনি সামান্য ভাবে থাকিতেন। এক দিন ভিক্টোরিয়া শিক্ষয়িত্রীর সহিত কিছু জিনিষ কিনিবার জন্য বাজারে গিয়াছিলেন; কতকগুলি জিনিষ কিনিতেই, তাঁহার হাতে যে টাকা ছিল তাহা ফুরাইয়া গেল। একটী সুন্দর বাক্স দেখিয়া সেইটী লইবার জন্য তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল, কিন্তু টাকা নাই কি করেন; দোকানদার অন্য অন্য জিনিষের সঙ্গে বাক্সটীও বাঁধিয়া দিল। শিক্ষয়িত্রী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারীর হাতে টাকা নাই, তিনি এ বাক্স

আজ কিনিতে পারিবেন না।" দোকানদার অগত্যা বাক্সটা রাখিয়া দিল, মহারাণীও আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন, এবং পরে যখন হাতে টাকা হইল তখন কিনিয়া আনিলেন। আমাদের পাঠক পাঠিকারা কয়-জন এরূপ করিয়া থাকেন? কোন জিনিস কিনিতে ইচ্ছা হইলে হাতে টাকা থাক্ আর নাই থাক্, তাহা কিনিতে হইবেই হইবে; পিতা মাতার উপর সে জন্য কত আবদার কত অত্যা-চার করেন।

ভিক্টোরিয়ার যখন বার বৎসর বয়স তখন তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হইল যে, তিনিই রাণী হইবেন; এক জন বার বছরের মেয়ে এত বড় একটা রাজ্যের রাণী হইবেন একথা শুনিলে হয়ত অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখেন, কিন্তু ভিক্টোরিয়া একটুও গর্ব্বিত হন নাই; তিনি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি তবে ভাল হব।" কয়জনের মনে এ কথাটি আসে? যাহার ছেলেবেলা হইতে এই সৎ ইচ্ছাটি থাকে, সেই কালে বড় হইতে পারে। ১৮৩৭ সালের ২০ এ জুন রাজা উইলিয়মের মৃত্যু হয়, তখন ভিক্টো-রিয়ার বয়স ১৮ বৎসর। প্রধান পুরোহিত তৎ-ক্ষণাৎ এই সংবাদ লইয়া ভিক্টোরিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন; ভিক্টোরিয়া এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত শোক পাইলেন, এবং পুরোহিতকে বলিলেন, "আপনি আমার জন্য প্রার্থনা করুন।" তখন তাঁহারা হাঁটু গাড়িয়া এই দুঃখের সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। সেই দিনই ১৮৩৭ সালের ২০ এ জুন ভিক্টোরিয়া ১৮ বৎসর বয়সে প্রকাণ্ড বৃটিশ রাজ্যের রাণী হইলেন। ইহার আট দিন পরে অভিষেক হইল এবং এই উপলক্ষে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের মণি মুক্তায় জড়িত এক মুকুট তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইল।

বাল্যকাল হইতেই ভিক্টোরিয়া অতিশয় বুদ্ধি-মতি ছিলেন। এই বালিকা বয়সে এতবড় একটা রাজ্যের রাণী হইয়া যে প্রকার ধীর ও গম্ভীর ভাবে এবং বিবেচনার সহিত কার্য্য করি-তেন, তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। ১৮৪০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ২১ বৎসর বয়সে জর্ম্মন রাজকুমার ফ্রান্সিস্ এলবার্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং মহা সুখে স্বামীর সহিত জীবন যাপন করেন। কিন্তু ১৮৬১ সনে মহারাণী বিধবা হন, স্বামীর মৃত্যুর পর বহুকাল কোন আমোদ আহ্লাদে যোগ দেন নাই। মহারাণীর চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা; তার মধ্যে এক পুত্র এবং এক কন্যার মৃত্যু হইয়াছে।

মহারাণীর যে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব উপলক্ষে এত উৎসব হইল, এই পঞ্চাশ বৎসর অনেক বড় বড় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আমা-দের দেশে এই পঞ্চাশ বৎসরে রাজনীতি সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে যে কত পরি-বর্ত্তন, কত উন্নতি হইয়াছে তাহা তোমরা বড় হইলে বুঝিতে পারিবে।

আমাদিগের মহারাণী রাজবংশে জন্মিয়া, এত বড় বৃটিশ রাজ্যের অধিশ্বরী হইয়াও বাল্যকাল হইতেই দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে বিভুষিতা ছিলেন। গর্ব্ব বা অহঙ্কার তাঁহার একেবারেই নাই, তিনি বড় বিনয়ী। তিনি তাঁহার অসংখ্য প্রজাদিগকে বড়ই স্নেহ করেন; তাঁহার এই সকল সদ্‌গুণে মোহিত হইয়াই ইংরেজ ও তাঁহার আর আর প্রজারা তাঁহাকে এত ভক্তি করে এবং ভালবাসে; প্রজার এত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা অতি কম রাজার ভাগ্যেই ঘটিয়া

থাকে। মহারাণী বড় ধার্ম্মিকা; তাঁহার অভিষেকের পর বাড়ী ফিরিয়া যাইয়া মার কাছে বলিলেন, "মা আমি যে ইংলণ্ডের রাণী তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু যাহা হউক, মা রাণী হইয়া তোমার কাছে আমার প্রথম অনুরোধ এই যে, আমাকে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল একলা থাকিতে দাও।" মাতা তাহাতে সম্মতি দিলেন, তখন ভিক্টোরিয়া একাকী সেই দুই ঘণ্টা কাল, এই বালিকা বয়সে তাঁহার উপর যে গুরুতর কাজের ভার পড়িল, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মহারাণীর দয়া অত্যন্ত অধিক; তিনি রাণী হইবার অল্পদিন পরেই ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁহার কাছে একখানি মৃত্যুর আজ্ঞা সহি করাইতে আসিলেন। একজন সৈনিক দল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কোর্টমার্সেলে তাহার মৃত্যু দণ্ড হইয়াছে, মহারাণীর তাহাতে সহি দিতে হইবে। মহারাণীর প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল, কেমন করিয়া একজনের প্রাণ বধের আজ্ঞা দিবেন। তাঁহার এত কষ্ট হইল যে চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তখন ডিউককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এব্যক্তির স্বপক্ষে কি কিছুই বলিবার নাই?" ডিউক বলিলেন, "এ লোকটা অতি অকর্ম্মণ্য, কোন কাজই করে না, তবে জানিনা, শুনিয়াছি ইহার চরিত্র ভাল।" মহারাণী আহ্লাদে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ডিউক আপনাকে শত শত ধন্যবাদ; এ ব্যক্তি সৎলোক, এইজন্য ইহাকে আমি ক্ষমা করিলাম।" কি উপায়ে এ হতভাগ্যের জীবন রক্ষা করিবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন, যখন শুনিলেন সে ব্যক্তির চরিত্র ভাল, তখন সেই জন্যই তাহার প্রাণ দণ্ড রহিত করিলেন।

ভিক্টোরিয়া অত্যন্ত সাধু চরিত্রা এবং ন্যায়-পরায়ণা। এক সময়ে প্রধান মন্ত্রি তাঁহাকে কোন একটা দলিল সহি করিবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং বলেন যে কাজের সুবিধার জন্য সেটা করা বড় দরকার; কাজটা বোধ হয় ন্যায়সঙ্গত ছিল না। সাধুশীলা ভিক্টোরিয়া উত্তর করিলেন,"ন্যায় যাহা তাহা কর্ত্তব্য, অন্যায় যাহা তাহা কখনই করা উচিত নহে, ইহা আমি বাল্যকালই শিখিয়াছি,কাজের সুবিধা আমি বুঝি না, যাহা ন্যায় তাহা করিব, যাহা অন্যায় তাহা করিব না।" এই সকল সদ্‌গুণ না থাকিলে মহারাণী আজ এত বড় হইতে পারিতেন না।

মহারাণী অন্যায় দেখিতে পারেন না। এক দিন বাড়ীতে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রেলিং এ বার্ণিশ লাগাইতেছিল; তাঁর দুটি মেয়ে, তাহারা তখন খুব ছোট ছিল, গিয়া সেই বৃদ্ধার কাছে আবদার করিতে লাগিল যে, তাহারা বার্ণিশ করিবে। বৃদ্ধা ত কিছুতেই দিতে সম্মত হয় না, কিন্তু শেষে অগত্যা বার্ণিশ করিবার তুলি তাহাদিগের হাতে দিল। তুলি পাইয়া রেলিং বার্ণিস করা দূরে থাক্, তাহারা সেই বৃদ্ধার মুখ রং করিয়া দিয়া দৌড়িয়া পলাইল। মহারাণী এই কথা শুনিবামাত্র দুইজনকে ধরিয়া সেই বৃদ্ধার কাছে লইয়া গেলেন, এবং তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে বলিলেন, তারপর বাজার হইতে সেই বৃদ্ধার জন্য তাহাদিগের দ্বারা কাপড় ক্রয় করাইয়া আনাইলেন; কারণ তাহারা বৃদ্ধার কাপড়ও নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই কাপড়ের দাম মেয়েদের নিজের টাকা হইতে দিতে হইল। দুঃখী দরিদ্র সকলের প্রতিই মহারাণীর সমান ব্যবহার। যখনই কোন অগ্নিদাহ প্রভৃতি কোন প্রকার দুর্ঘটনা হয়, মহারাণী তৎক্ষণাৎ যথা

সাধ্য গরিব দুঃখীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে নিজে সান্ত্বনা দিয়া পত্র লেখেন।

একবার লণ্ডন হাঁস্‌পাতালের একটী ছোট বালিকা তাঁহাকে দেখিতে চায়; সে বলে যে, “যদি আমি একবার মহারাণীকে দেখিতে পাই তাহা হইলে আমার সকল ব্যারামের কষ্ট দূর হইবে।” হাঁস্‌পাতালের অধ্যক্ষ এই কথা মহারাণীকে জানাইবামাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ হাঁস্‌পাতালে উপস্থিত হন, এবং সেই বালিকাটীর কাছে যাইয়া তাহাকে কত স্নেহের কথায় সান্ত্বনা দেন। এই সকল ঘটনায় বেশ বুঝা যায় যে, মহারাণীর প্রকৃতি কত সদ্‌গুণে ভূষিত। তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রকার আরও অনেক গল্প আছে; সময় হইলে পরে বলা যাইতে পারে। আমরা আশা করি মাহারাণী রাজবংশে জন্মিয়া, এত বড় রাজ্যের রাণী হইয়া দয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়, সততা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণে তাঁহার প্রজাগণের এত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেছেন, আমাদিগের পাঠিকারাও সেই সকল গুণে ভূষিতা হইতে যত্নবতী হইবেন।

পার্লিয়ামেণ্ট সভা।

পাঠক পাঠিকাগণ! গতবারে তোমাদিগকে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত পার্লিয়ামেণ্ট সভার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। এই যে প্রকাণ্ড ছবিটী দেখিতেছ, এইটী পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের ছবি। দেখ দেখি ইহার ছাদের উপরে কেমন বড় বড় চূড়া! মহারাণীর রাজবাড়ী হইতে এই পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ অতি অল্প দূর টেমস্‌ নদীর তীরে অবস্থিত। এই পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ এত বড় যে প্রায় চব্বিশ বিঘা জমি ব্যাপিয়া ইহা দাঁড়াইয়া আছে। এই বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিতে সাড়ে তিন কোটী টাকা খরচ হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টের ঘরের বিষয়ে যাহা হউক দুই এক কথা তোমরা শুনিলে, এখন এই ঘরে বসিয়া কি কাণ্ড কারখানাটা হয়, তাহাই তোমাদিগকে বলিবার ইচ্ছা আছে।

বৎসরের মধ্যে প্রায় ৭ মাস কাল পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিবেশন হয়। অধুনা ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি শেষ হইয়া থাকে। কোন কার্য্যের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনের প্রয়োজন হইলে রাজা বা রাণীকে ১৪ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। তোমাদের হয়ত স্মরণ আছে যে, এই সভা দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাহার এক ভাগের নাম সম্ভ্রান্তদের সভা, অপর ভাগের নাম সাধারণদের সভা। সম্ভ্রান্তদের সভার সভ্যগণ খুব উঁচু বংশের লোক। প্রাচীন কালে প্রায় রাজার ইচ্ছায়ই সম্পূর্ণরূপে সভার
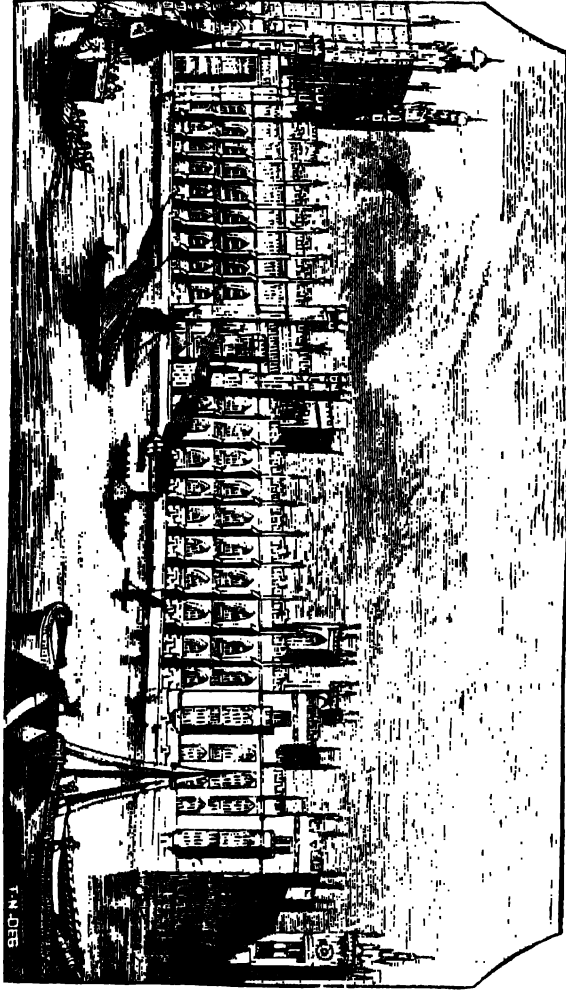
সভ্যগণ নিযুক্ত হইত। রাজা সম্ভ্রান্ত পরিবারের যাহাকে ইচ্ছা লর্ড সভায় গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু এখন আর সেরূপ হইবার নিয়ম নাই। যাঁহার পিতা লর্ড সভার সভ্য থাকেন তিনি পিতার মৃত্যুর পরে উপযুক্ত হইলে লর্ড সভার সভ্য হইবার অধিকার পাইতে পারেন। রাজার আজ্ঞানুসারে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদিগের মধ্য হইতেও দুই এক জনকে কখন কখন লর্ডসভার সভ্যের পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। লর্ডসভার সভ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই, রাজার

ইচ্ছানুসারে নূতন পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড দেশ হইতে ইংলণ্ডের এই মহাসভায় প্রতিনিধি আসিয়া থাকে, এই সকল প্রতিনিধিগণ ও লর্ডসভার সভ্যগণের সমস্ত অধিকার পাইয়া থাকেন।

সাধারণের সভা এক কথায় বলিতে গেলে ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণ লোকের সভা। কিন্তু কি প্রণালীতে এই সভার সভ্যগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং কি উদ্দেশ্যে এবং কাহারাই বা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন তাহাই এখন তোমাদিগকে বলিতেছি। ইংলণ্ডে যে কোন ব্যক্তি অন্ততঃ বার্ষিক দশ পাউণ্ড আয় হয় এমন এক খণ্ড জমি ভোগ দখল করিয়া থাকেন, তিনি সাধারণ সভার সভ্য মনোনীত করিবার পক্ষে সম্মতি দিতে পারেন। আবার যিনি কোন ব্যক্তির চাকুরী বা কোন [illegible] কোন একটী বাস স্থানের সম্পূর্ণ কর্ত্তা হইয়া বাস করিতে থাকেন, তিনিও সভ্য নির্ব্বাচন উপলক্ষে আপনার মত দিতে পারেন। এই সকল লোকেরাই গ্রাম, নগর, ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি দেশীয় নানা স্থান হইতে দুই এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান এবং এই প্রতিনিধিগণই সাধারণদের সভা গঠন করিয়া লন। প্রাচীন কালে এই সকল প্রতিনিধিগণ যে গ্রাম বা নগর হইতে প্রেরিত হইতেন সেই গ্রাম বা নগরের লোকদিগের নিকট হইতে বেতন স্বরূপ টাকা লইতেন এবং সেই জন্য অনেক ভাল ভাল গ্রাম ও নগরের লোকেরা দারিদ্র্য বশতঃ প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত না। এখন আর প্রতিনিধিগণ টাকা লইতে পারেন না, সুতরাং সকল গ্রাম ও নগরের লোকেরাই লোক সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাইবার সুবিধা পাইয়াছেন।

মহারাণীই পার্লিয়ামেণ্ট সভার প্রধান অধ্যক্ষ; রাজ কার্য্যও তাঁহার নামে চলে, এবং তাঁহার উপরেই রাজ্যের সমস্ত ভার ন্যস্ত। কিন্তু কাজে তাহা নয়। সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একটী মন্ত্রী-সভা আছে, তাহাকে ক্যাবিনেট বলে। এই ক্যাবিনেটের সভ্যগণ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণের দ্বারা বিশেষতঃ কমন্স্ অর্থাৎ সাধারণদের সভার লোকদিগের দ্বারাই নিয়োজিত হইয়া থাকেন। "ধনাগারের প্রথম লর্ড" এই সর্ব্বোচ্চ পদ মন্ত্রী-সভার প্রধান মন্ত্রীকেই দেওয়া হইয়া থাকে। তোমরা হয়ত সুবিখ্যাত গ্লাডষ্টোন সাহেবের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি এক সময়ে এই প্রধান পদে নিযুক্ত থাকিয়া মহারাণীকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর নীচে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ টী পদ আছে। এই ১৪ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একজন অধ্যক্ষ আছেন; তাঁহাকে ভারতের ষ্টেট-সেক্রেটরী বলে, তিনি বড় লাট বাহাদুরেরও উপরের কর্ম্মচারী।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশনের সময়ে সভ্য ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্ট গৃহে প্রবেশ করা বড় সহজ নহে, কোন সভ্যের অনুমতি না লইয়া ত যাওয়াই যায় না, তার পর আবার অনুমতি পাইলেও বসিবার স্থান পাওয়া যায় না। লর্ড-সভার সভ্যগণের জন্য পৃথক স্থান, কমন্স্-সভার সভ্যগণের জন্য পৃথক স্থান, মন্ত্রীসভার সভ্যগণের জন্য স্বতন্ত্র স্থান, দর্শকগণের জন্যও একটী বসিবার স্থান আছে বটে কিন্তু সে স্থানটী এত অপ্রশস্ত যে অনেকের ভাগ্যেই সেস্থানে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। পার্লিয়ামেণ্টে অনেক কাণ্ড কারখানা হয়; সে সকল কথা

তোমরা এখন বুঝিবে না এই পর্য্যন্ত শুনিয়া রাখ যে,আমাদের দেশে যখন পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় দেশীয় লোকের একটী রাজ-সভা হইবে তখন আমাদের দেশের অনেক কল্যাণ সাধন হইবে; পাঠক পাঠিকাগণ তোমরা যদি এই বাল্য কাল হইতেই ভাল হইবার চেষ্টা কর তবে দেশের অবস্থা ফিরিবে এরূপ আশা করিতে পারা যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যাঁহার পাঠক পাঠিকা! এই মহাত্মার জীবনের অনেক কথা তোমরা গত-বারে শুনিয়াছ, কিন্তু অনেক কথা এখনও বলিতে বাকি আছে, সে সমুদায় আজ বলিয়া উঠিতে পারা যাইবে না। তাহার অনেক বিষয় আবার একবার অনুসন্ধান দ্বারা জানা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কিছুদিন হইতে ভক্তিভাজন মহর্ষি মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত রহিয়াছেন। তাঁহার শরীর দিন দিন রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমরা যে গিয়া তাঁহার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিব তাহারও যো নাই। তোমরা সকলে প্রার্থনা কর যে, তিনি ত্বরায় আরোগ্য লাভ করুন। তিনি যতদিন এ দেহে থাকেন, ততদিনই দেশের লাভ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধের সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেরূপ ধর্ম্ম-বীরের কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সমধিক উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তোমরা সকলেই বোধ হয় বেদের নাম শুনিয়াছ। হিন্দুমাত্রেই বেদ-গ্রন্থের আদর করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে এই বিশ্বাস ছিল, এবং এখনও অনেকে সেরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, বেদ—মনুষ্যের রচিত নয়, তাহা সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। এই বেদের বিষয় তোমাদিগকে কিছু বলা আবশ্যক। অতি প্রাচীন কালে যখন বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই, এবং লিখিবার রীতি প্রচলিত হয় নাই, তখন বড় বড় ঋষিরা মুখে মুখে অনেক স্তুতি ও বন্দনা রচনা করিতেন। এই সকল স্তুতি ও বন্দনা অপর লোকে মুখে মুখে শিক্ষা করিত, ও মুখে মুখে শিখাইত। এই-রূপ অনেক শত বৎসর মুখে মুখে চলিয়া আসার পর যখন বর্ণমালার সৃষ্টি হইল, তখন মধ্যে মধ্যে এক একজন পণ্ডিত সেই সমুদায় মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের আকারে বদ্ধ করেন। এইরূপে বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়;—ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব। এই সকল বেদের মধ্যে অনেক ধর্ম্মোপদেশ আছে। প্রাচীন কালের হিন্দুরা বলিতেন যে, বেদ অভ্রান্ত, অর্থাৎ তাহা ঈশ্বর-প্রণীত এবং তাহাতে ভ্রম নাই। ব্রাহ্ম-সমাজ যখন প্রথমে স্থাপিত হয়, তখন প্রথম প্রথম বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ সমাজের বেদী হইতে বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের ভারগ্রহণ করার কয়েক বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল যে, বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থ বলা যায় কি না? শুনিতে পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক সুবিখ্যাত অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদা তর্ক বিতর্ক হইত। অন্য লোক হইলে তাঁহার মনের তর্ক দুই দিন পরে মনে মিলাইয়া যাইত; আবার তিনি সংসারের অপর কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। কিন্তু এই মহাত্মা স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত; সুতরাং তিনি এ বিষয়ের সবিশেষ অনু-সন্ধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি চারিজন বুদ্ধিমান যুবক বাছিয়া চারি বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীতে পাঠাইলেন। তাঁহারা মনোযোগ সহকারে সেখানে থাকিয়া বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন, কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং কাশীতে গমন করিলেন। তখন কাশীতে যাওয়া সহজ ছিল না; এখনকার মত রেলওয়ে ছিল না; যাইতে হইলে হয় নৌকা-যোগে, না হয় পদব্রজে, না হয় পাল্কী করিয়া বহুদিনে পৌঁছিতে হইত। আবার পথে চোর ডাকাতের ভয় ছিল। লোক সুখে যাইতে পারিত না। দেবেন্দ্রনাথ ইহার কিছুতেই ভয় পাইলেন না। তিনি অনেক পথশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া কাশীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া পরমা-নন্দে তাঁহাদিগের সহিত শাস্ত্রালাপে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহু অন্বেষণ ও পাঠের পর তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, বেদ মনুষ্যের রচিত, সুতরাং অভ্রান্ত নহে; তাহাকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেই মাত্র তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া মানা যাইতে পারে না, অমনি তিনি সে মত পরিত্যাগ করিলেন। ইহা কত বড় সত্য-প্রিয়তার ও বীরত্বের কথা তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। যে বেদ এতদিন ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্বরূপ ছিল, এবং যাহার প্রতি দেশ শুদ্ধ লোকের এত আদর, তাহাকে পরিত্যাগ করা কত বড় সাহসের কর্ম্ম। সত্যের প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ না থাকিলে তিনি কখনই সে সাহস পাইতেন না। আরও আশ্চর্য্য দেখ, বেদ অভ্রান্ত এই মত তিনি পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু বেদের সদুপদেশ সকলের প্রতি ও আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র সকলের প্রতি তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহার বিন্দুমাত্র ও হ্রাস হইল না। তিনি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল হইতে ভাল ভাল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করি-লেন। এই গ্রন্থখানি তোমরা অনেকে দেখ নাই। এমন অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে আর নাই বলিলে হয়। এখানি ঐ মহাত্মার এক প্রধান কীর্ত্তি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মলিন হইয়া রহিয়াছে, এই জন্য এই গ্রন্থের মূল্য এখনও লোকে বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু কালে ইহার মূল্য লোকে জানিতে পারিবে।

মহর্ষি মহাশয় এক দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের লোকের ধর্ম্মোন্নতির প্রধান একটী উপায় করিলেন, অন্যদিকে উৎসাহের সহিত দেশমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগি-লেন। নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল, তিনি স্বয়ং নানা স্থানে গিয়া তাহা-দিগকে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। কেবল

মুখের উৎসাহ নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। এখন তিনি বার্দ্ধক্য ও শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আর নিজে কোন স্থানে যাইতে পারেন না, কিন্তু এখনও তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির যখন নির্ম্মাণ হয় তখন তিনি ঐ কার্য্যের সাহায্যের জন্য ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা দিয়াছিলেন, এইরূপ কত সমাজে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য একটী সামান্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইহার নাম এখন আদি ব্রাহ্মসমাজ। মহর্ষি মহাশয় নিজ ব্যয়ে ঐ বাড়ীর উপর ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চালাইবার জন্য মাসে মাসে ৪।৫ শত টাকার ও অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের যোগ দেওয়া অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে ব্যয় করিয়াছেন তাহা একত্র করিলে অনেক লক্ষ টাকা হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ যে, ইহার জন্য তিনি কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া গণ্য করেন নাই। তাঁহার পিতা কলিকাতায় বড়লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, রাজাদিগের নিকট সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি যদি মনে করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পিতার ন্যায় রাজ-সম্ভ্রম লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু সে দিকে তাহার মন ছিল না। যে পথে গেলে রাজাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তিনি সে পথে চলিতেন না। বড় বড় পদস্থ ইংরাজেরা সাধ্য সাধনা করিয়া ও তাঁহাকে পাইত না, কিন্তু একটী সামান্য লোকও ঈশ্বরোপাসনা করিবার জন্য ধরিলে তাহার ভবনে গিয়া উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন।

এইরূপে কায় মন প্রাণে বহু বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করার পর, ১৮৫৬ কি ১৮৫৭ সালে তিনি কিছুকাল তপস্যায় যাপন করিবার জন্য হিমালয় শৃঙ্গে গমন করিলেন। এই সময়ে তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করেন। সেখানে দুই একটী ভৃত্য মাত্র সঙ্গে করিয়া একাকী কেবল ভজন সাধন ও আত্ম-চিন্তাতে যাপন করিতেন। এই সময়ের মধ্যে একদিকে যেমন জ্ঞানের উন্নতি অন্য দিকে তেমনি ধর্ম্মভাবের গভীরতা বৃদ্ধি হইল। তিনি যে ধ্যানপরায়ণতার জন্য চির-দিন প্রসিদ্ধ সেই ধ্যানপরায়ণতা এই সময়ে বিশেষরূপে বিকসিত হয়। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, এক একদিন ধ্যানে বসিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়াছেন; আহার নিদ্রা মনেই থাকিত না, ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকি-তেন। তাহার পরেও তাঁহার ধ্যানপরায়ণতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। অনেকবার এরূপ দেখা গিয়াছে যে, ঈশ্বর-চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে তিনি বাহ্য জ্ঞানশূন্য। নয়ন মুদ্রিত করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি এমন উজ্জ্বল বিশ্বাস ও প্রেম আমরা আর কখনও দেখি নাই। উপনিষদের যে সকল বচনে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশিত আছে তাহার কোন বচন কেহ উচ্চারণ করিলে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

দুই বৎসর হিমালয়ে বাস করিবার পর তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পথেই বা কত কষ্ট। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বেই

সিপাইগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। ইংরাজগণ অনেক কষ্টে সেই বিদ্রোহ শান্ত করিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় কোন কোন স্থানে তাহার বন্দি দশায় পড়িবার আশঙ্কা হইয়াছিল। যাহা হউক অনেক কষ্টে ও অনেক ব্যয়ে তিনি দেশে আসিয়া পৌছিলেন। আসিয়া আবার উৎসাহের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। দুই বৎসর কঠিন ভজন সাধন দ্বারা যে সকল অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার যে কিরূপ জলন্ত জীবন্ত ভাব ছিল তাহার বর্ণনা হয় না। তাহা এক দিন শুনিলে দশদিন মন এক নূতন ভাবে থাকিত। তিনি যেমন বলিয়া যাইতেন অমনি সেই সকল উপদেশ লিখিয়া লওয়া হইত। সেই সকল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখান নামে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে। এই গ্রন্থ যে কি গভীর জ্ঞানে পূর্ণ তাহার বর্ণনা হয় না। তোমরা বড় হইলে তাহা পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। ইহাও তাঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি। এই সময় হইতে সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। কেশব বাবুকে দক্ষিণ হস্তের ন্যায় পাইয়া তাঁহার উৎসাহ দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। কেশব বাবুর সাহায্যে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় নামে যুবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য একটী সাপ্তাহিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে কেশব বাবু ইংরাজীতে এবং তিনি বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিতেন। দেখিতে দেখিতে দলে দলে শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল, অনেকে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইল। কেশব বাবু কলিকাতা কলেজ নামে একটী স্কুল স্থাপন করিলেন, তাহাতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন এবং ব্রাহ্মদিগের নিমিত্ত একখানি অনুষ্ঠান পদ্ধতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। তাহা তাহার আর একটী কীর্ত্তি। চারিদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

ইহার কিছুদিন পরে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যদল সমভিব্যাহারে আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। ইহার সবিশেষ বিবরণ বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বিবাদের অল্পকাল পরেই মহর্ষি মহাশয় স্বীয় উপযুক্ত পুত্রদিগের উপরে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার অর্পণ করিয়া চিরদিনের মত অবসর গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি নির্জ্জনে বাস করিয়া আসিতেছেন। ধ্যান্ ধারণা পাঠ ও আত্মচিন্তা ভিন্ন অন্য কার্য্য নাই। ইহাতেই তাঁহার আনন্দ। এবিষয়েও তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের শিষ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে এই আদেশ আছে যে, পঞ্চাশ বৎসরের পরে বনে যাইবে, তিনি তাহাই করিয়াছেন।

কেগো ওই বৃদ্ধা নারী!

কেগো ওই বৃদ্ধা নারী পথ দিয়া যায়!
ছিন্নবস্ত্র, পক্ককেশ, করে যষ্টি ধরি,
লোল চর্ম্ম, দৃষ্টি ক্ষীণ, কাঁপে দেহ, হায়!
প্রতি পদ যেতে তাঁর, থর থর করি।

পেছল হয়েছে পথ ঘন বৃষ্টিপাতে
এ ঘোর সময়ে বৃদ্ধা কেন পথ মাঝে?
জলেতে ভিজিছে দেহ ছাতা নাই হাতে,—
প্রাচীন বয়সে, হায়! এ কষ্ট কি সাজে?

দেখিয়া নারীর দশা সুমতি বালক
ছাতা লয়ে দ্রুতগতি ছুটি কাছে গেল,
ছাতা দিয়ে, হয়ে তার পথ-প্রদর্শক,
বৃদ্ধারে গৃহের দিকে লইয়া চলিল।

নিজের লাগিছে বৃষ্টি, তাতে দৃষ্টি নাই-—
"এ হেন বৃদ্ধার যেন ক্লেশ নাহি হয়!"
এই মনে সে বালক ভাবিছে সদাই;
জলে ভিজে তাই ওই প্রফুল্লতাময়।

সহায় করিল নারী বালকের কাঁধ,
বালকে সহায় করি স্বগৃহেতে গেল;
বৃদ্ধার আত্মীয়গণ হাতে পে'ল চাঁদ
অপার সুখেতে সবে ভাসিতে লাগিল।

কাজ শেষ করি সেই বালক সুজন
আপনার বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আইল;
আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তখন,
অতঃপর সমপাঠী সকলে কহিল;—

"না জানি কাহার মাতা—এ ঘোর সময়
"প্রাণের তনয় আহা ! কাছে নাই তাঁর,—
"এমন সময়ে এই বিপত্তি উদয়—
"থাকিত সন্তান যদি হ'ত উপকার।

"মা আমার যদি হেন বিপদ মাঝারে
"পড়েন, সন্তান তাঁর রবে দূর দেশে,
"সে সময় যদি কেহ না দেখে তাঁহারে
"বল, বন্ধুগণ ! মন দহে কিনা ক্লেশে ?

"আমার প্রাচীনা মার দুঃখ যদি হেন
"দূর দেশে থেকে মোর প্রাণাকুল করে,
"অভাগিনী মাতা ওই—বল তবে কেন
"সন্তানের মত নহি সেবিব উহারে।"

বলিতে বলিতে চক্ষু জলেতে পূরিল—
দূরদেশে মাতা তাঁর তাই খেদ মনে ;
সন্তানের কার্য্য শিশু অপরে করিল,
'কাহারো জননী বৃদ্ধা' এই মনে জেনে।

বৃদ্ধা নারী গৃহে গেল, বাঁচিল পরাণে—
নতজানু, দয়াময়ে ডাকে প্রাণ খুলে—
"এমন সন্তান যাঁর তাঁকে, এই জনে,
"দয়াময় দীনবন্ধু রেখো পদতলে।"

স্বর্গীয় প্রমদা চরণ সেন।

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

পরোপকার।

অন্য ব্যক্তিকে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া যে সাহায্য বা উপকার করা হয় তাহাকেই পরোপকার বলিয়া থাকি। বাস্তবিক মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরোপকারের ন্যায় ধর্ম্ম জগতে অতি বিরল। জীবমাত্রেরই সুখ দুঃখ সমান। সকলেই সুখাবস্থায় সুখী এবং দুঃখাবস্থায় কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। এই দুঃখাবস্থায় তাহাদের দুঃখমোচন করিলে তাহারা নিশ্চয়ই বেশ সুখী হয় এবং উদ্ধার বা মোচনকারীকে অন্তরের সহিত ভালবাসে।

যেমন আমি কোন কষ্টে পড়িলে দশ দিক অন্ধকার দেখি। মনে করুন আমি মাতৃ পিতৃ হীন, আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই। আমি দুটী খেতে পাই না। অন্নের চিন্তায় শরীর শুষ্ক হইতেছে, দুই চারি দিন আদপেই খেতে পাই নাই, এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ আমাকে দুটী ভাত আনিয়া দেয়, তখন কি আমি সাতিশয় আনন্দিত হইয়াও সবিশেষ উপকৃত হইয়া আমার উপকারককে ধন্যবাদ দিব না ? তখন কি আমার মনে তাহার আশীর্ব্বাদসূচক বাক্য আসিবে না ?

এইরূপ সকলেরই আছে। আমি যেমন এইরূপ আনন্দিত হই, অন্যের কষ্টের অবস্থাতে সাহায্য করিলেও সেও নিশ্চয়ই এইরূপ আনন্দিত হইবে, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে ভালবাসিবে।

এটী নিঃসন্দেহেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, আমার মত সকলেরই সুখ দুঃখ বোধ আছে। সুতরাং আমি যেমন দুঃখে পড়িলে কষ্ট অনুভব

করি, এবং অপরের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য উৎসুক হই অন্যান্য সকলেরও ঐরূপ অবস্থায় ঠিক ঐরূপ হইয়া থাকে। এবং আমি যেমন ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত হইলে বড়ই সুখী ও আনন্দিত হইয়া থাকি এবং মুক্তকারীকে খুব ভালবাসি, অপরেও ঠিক সেইরূপই মনে করিবে। বিশেষতঃ পরের উপকার করিলে নিজের মনেও একটী আত্ম-প্রসাদ উপস্থিত হয়। এবং মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। সকলেরই পরের উপকার করিতে সাধ্য মত চেষ্টা পাওয়া উচিত। কাহাকেও কোনও বিষয়ে মনোকষ্ট না দিয়া সকলকেই সুখী করার চেষ্টা পাওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কোনও একটী বালক বন্ধুবান্ধব হীন এবং অতি দরিদ্র। তাহার মনে করুন পুস্তকাদি বিহনে পাঠ চলিতেছে না, এরূপ অবস্থায় আমার সাধ্যমত তাহাকে সাহায্য করা উচিত। যাহাতে তাহার পাঠ চলিতে পারে তাহা করা উচিত। তাহা হইলে সে অবশ্যই মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। এবং যদি আমি কোন বিপদে পড়ি তাহা হইলে সেও কৃতজ্ঞ অন্তরে আমাকে সাহায্য করিতে পারে।

এইরূপ বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, অন্নহীনকে অন্ন দান প্রভৃতি রূপে যাহার যে অভাব তাহা যে কেহ মনোযোগ সহকারে মোচন করে সকলেই তাহাকে ভাল বাসে; এবং ঈশ্বর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

এটী সর্ব্বক্ষণই মনে রাখা উচিত যে, পরম পিতা পরমেশ্বর সৎকর্ম্ম জন্য অর্থ দিয়াছেন। সুতরাং তাহার সদ্ব্যয় করিতে পারিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করা হয়। এবং তাহা হইলে ঈশ্বর তাহাকে ভাল বাসেন।

যে সকল লোক দরিদ্র দুঃখী, খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, তাহাদিগকে দেওয়ার চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই। আমরা যে অর্থ মিঠাই খাইয়া বা অন্যান্য অসৎ উপায়ে ব্যয় করি, যদি তাহা না করিয়া দীন দুঃখীদিগের উপকারের জন্য রাখিয়া দিই তাহা হইলে কত দুঃখী ব্যক্তি সাহায্য পায়!

যাহা হউক যিনি যেরূপেই পারেন সাধ্যমত পরের উপকার করা উচিত। দীন দুঃখী দেখিলেই সাহায্য করা উচিত। আহা! তাহা হইলে কত দুঃখীজনই যেন উপকার পায়। কতজনই যেন সুখী হয়!

পৃথিবীতে এইরূপ কত দুঃখীজন যে সাহায্য অভাবে দুঃখে জীবনযাপন করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? আহা! যদি সকলে এইরূপে যথাসাধ্য সাহায্য করে, তাহা হইলে না জানি কতজনই যেন দুঃখযন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পায়! সকলেরই এবিষয়ে মনোযোগ দিয়া সাহায্য করা উচিত।

দেখুন, যত লোকে পরের উপকারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, উপকার করিয়াছেন তাঁহাদের যশ দেশ বিদেশে ঘোষিত হইতেছে। মহাত্মা সক্রেটীস কত কাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তবুও তাঁহার নাম ঘোষিত হইতেছে। আর মহাত্মা গোল্ডস্মীথবর কসিয়স্কো এমন পরোপকারক ছিলেন যে, এমন কি ভ্রমণে বহির্গত হইবার সময়ও তিনি এক থলি টাকা লইয়া বহির্গত হইতেন এবং দরিদ্র দেখিবামাত্রই দান করিতেন। এমন দাতা কে?

আর ভগিনি ডোরা পরোপকারীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ইহার মত পরোপকারী প্রায়ই দেখা যায় না। যে রোগী রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, ভগিনী ডোরা তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছেন; ঔষধ দিতেছেন। যে ব্যক্তি

মদ, গাজা খাইয়া উচ্ছন্ন যাইতেছে ভগিনী ডোরা তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া সৎপথে আনিতেছেন। এইরূপ শত শত কার্য্য তাঁহার জীবনে বিদ্যমান। ইহাঁর সমস্ত জীবন এইকার্য্যে ব্যয় হইয়াছে। সকলেরই ইহাঁর পরোপকারীতা শিক্ষা করা উচিত।

আর অধিক কি, আমাদের মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ইনি দয়ার সাগর। ইহার মত পরোপকারক আর দেখা যায় না। দুঃখীকে বস্ত্র, অন্ন, টাকাকড়ি প্রভৃতি ইনি অকাতরে দান করিয়া থাকেন। ইহাঁর অনুগ্রহে আজ কত লোক দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক ইনিই ঈশ্বর দত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ইঁহার অমায়িকতা প্রভৃতির গল্প শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যদি ইনি শুনিলেন একজন দুঃখী অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তখন তিনি যে অবস্থায়েই থাকুন না কেন,তাহাকে সাহায্য করিবেনই করিবেন। ইনি দুঃখীকে উপকার করিতে অণুমাত্রও কাতর নহেন। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা তিনি ইঁহাকে দীর্ঘ জীবি করুন এবং সকল ব্যক্তির অন্তরে ইঁহার মত পরোপকারের বীজ নিহিত করেন।

যাহা হউক পরোপকার করা যে সর্ব্বতোভাবে উচিত, তাহাতে আর সংশয় নাই। এবং সকলেরই পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুকরণ পূর্ব্বক সাধ্যমত পরের উপকার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ।
বয়স ১৩ বৎসর।

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

গরিব দুঃখীদিগের প্রতি ব্যবহার।

যাহাদের বিদ্যা ও ধন কিছুই নাই তাহাদিগকে গরিব বলে। কোনও গরিব বাড়ীতে আসিলে তাহাকে তাহার যে বস্তুর অভাব থাকে তাহা তাহাকে প্রথমে দিবে এবং যাহাতে সে চিরজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

* * * *
* * *

তাহাকে যদি সকল ধন না দিয়াও বিদ্যাধন দেওয়া যায়, তাহা হইলেই উচিত কাজ করা হয়। কারণ তাহার যদি সকল ধন না থাকিয়াও বিদ্যা ধন থাকে তাহা হইলেই সে চিরকাল চলিতে পারে। যদি তুমি তাহাকে টাকা পয়সা দাও, কি ১ খানা কাপড় দাও তাহা হইলেও সে সন্তুষ্ট হইবে কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় হইবে না; কারণ তাহার ধন কয়েক মাসেই ফুরাইয়া যাইবে এবং কাপড়ও ২।৩ মাসের মধ্যেই ছিঁড়িয়া যাইবে। এই জন্য সে পূর্ব্বের ন্যায় ধন হারা হইয়া পড়িবে; তখন আবার পূর্ব্বের ন্যায় গরিব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। এই কারণেই তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ভাল। কোন এক জন গরিব আমার বাটীতে আসিল, আমি যদি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করি তবে সে সন্তুষ্ট হইবে; আর আমি যদি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার না করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিই, তাহা হইলে সে দুঃখিত অন্তরে চলিয়া যাইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, সোনসিংহ।
বয়স ৭ বৎসর।

মার্চ্চ, ১৮৮৭।
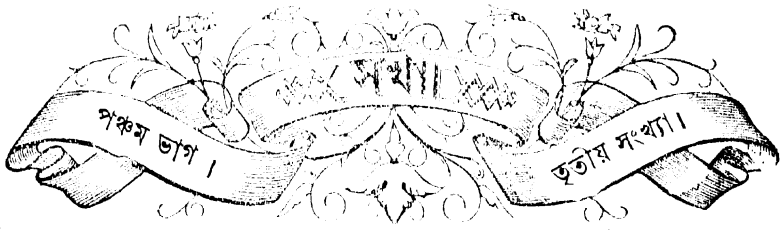
মহাভারতের গল্প।

(পরোপকার।)

দেবলোকে মহা বিপদ উপস্থিত। বৃত্রাসুরের উৎপাতে দেবগণ মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মহা তেজস্বী দুর্জ্জয় বৃত্রাসুর অগণ্য দৈত্য সেনা লইয়া দেবলোকে নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। দেবতাগণের ধর্ম্ম কর্ম্মে নানাপ্রকার বিঘ্ন জন্মাইতেছে; দেবলোকের শান্তি নষ্ট করিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। দেবতাগণও দেবলোক ছাড়িয়া তাঁহার সহিত পলায়ন করিয়াছেন। কি উপায়ে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন সেই চিন্তা করিতে করিতে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন "মানুষের হাতে বৃত্রাসুরের মৃত্যু নাই; অতএব তোমরা নারায়ণের নিকট যাও, তিনি ইহার উপায় করিবেন।" দেবগণ নারায়ণের নিকট যাইয়া বৃত্রাসুরের উৎপাতের কথা বলিলেন। নারায়ণ বলিলেন "বৃত্রাসুর আমার পরম ভক্ত, আমি তাহাকে বধ করিতে পারিব না। তোমরা দধীচি মুনির নিকট যাও। তিনি পরম দয়ালু এবং পরোপকারই তাঁহার জীবনের ব্রত। তাঁহার নিকট এই মহা বিপদের কথা বলিয়া, তাঁহার অস্থি ভিক্ষা চাও। তিনি কৃপা করিয়া অস্থি দিলে, সেই অস্থি বিশ্বকর্ম্মার নিকট লইয়া যাও। বিশ্বকর্ম্মা তাহাদ্বারা বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন; সেই বজ্রে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হইবে।" তখন দেবগণ ইন্দ্রের সহিত দধীচি মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বৃত্রাসুরের অত্যাচারের কথা বলিলেন। এবং সেই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরোপকারব্রত দধীচি সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন;—"দেবরাজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ আমার জীবন সার্থক হইল। আমার এই জীর্ণ অস্থি—দুই দিন পরে ধূলায় মিশাইত, আজ তাহা দেবতাগণের উপকারে লাগিবে, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য আছে! পরোপকারের জন্য যাহার জীবন যায় তাহারই সার্থক জীবন; আমার একটি জীবন দিলে যদি এতগুলি জীবন রক্ষা হয়, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি তাহার জন্য প্রস্তুত আছি।" শিষ্যগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন তিনি শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা কেন অশ্রুপাত করিতেছ! এ আমার পরম সৌভাগ্য; পরের হিতের জন্য এ সংসারে কয় জনে প্রাণ দিতে

পারে? আজ আমি পরোপকারের জন্য প্রাণ দিতে পারিতেছি, ইহাতে তোমরা আনন্দ কর। পরহিত করিতে প্রাণে কেন কষ্ট হইবে! ধূলার শরীর দুদিন পরে ধূলাতে মিশাইবে, পরহিতে যদি ইহা না লাগিল, তবে এই শরীর লইয়া কি করিব? মানুষ হইয়া যদি মানুষের উপকারে না আসিলাম, তবে এ জীবন লইয়া কি করিব? মানুষ মানুষের উপকার করিবে, মানুষের দুঃখ কষ্ট মানুষ দূর করিবে, এই জন্যই মানুষের জন্ম। যে তাহা পারিল না;—যে দুঃখীর দুঃখ দূর করিল না, বিপন্নকে আশ্রয় দিল না;—দরিদ্রকে সহায়তা করিল না,—ক্ষুধিতের মুখে একগ্রাস অন্ন তুলিয়া দিল না—বস্ত্রহীনকে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্রও দিল না, তাহার মনুষ্য জন্মই বৃথা। অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য, অন্যের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য, সমস্তই দিতে হইবে; পরের হিতের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইবে। ইহা যিনি পারেন, তাঁহারই মনুষ্য জন্ম সার্থক।"

এই বলিয়া মুনি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং উত্তরীয় ধারণ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। শিষ্যগণ বেদগান করিতে লাগিল এবং মধুর হরিসংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। দধীচির নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল, নাসিকা নিশ্বাস শূন্য হইল, শরীর নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইল; অকস্মাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল। দধীচি মুনি পরোপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন,—স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তখন ইন্দ্র দধীচির অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাহাদ্বারা এক অপূর্ব্ব বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন। সেই মহা বলশালী বজ্রে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হইল, ইন্দ্র পুনরায় রাজত্ব পাইলেন। দেবলোক নিরাপদ হইল। আবার দেবলোকে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

মহাভারতের এই গল্পটীর উপদেশ আমাদিগের হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখা উচিত। পরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করা অপেক্ষা মানুষের জীবনের আর অধিক সুখ—অধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? মৃত্যুর পর যে শরীর আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে, যদি তাহা পরের উপকারে লাগে, যদি একটি জীবন দিলে দশটী জীবন রক্ষা হয়, তবে কেন তাহা দিবে না? পরের দুঃখ দূর করা, পরের চক্ষের জল মুছাইয়া দেওয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া, ক্ষুধিতকে অন্ন দেওয়া—ইহারই জন্য মানুষের জন্ম। অন্যের উপকার করা, অন্যকে সুখী করাই মানুষের এক প্রধান কর্ত্তব্য। যদি তুমি তাহা না পারিলে, যদি অন্যের দুঃখ দূর করিতে না পারিলে, অন্যকে সুখী করিতে না পারিলে তবে তোমার জন্মই বৃথা। মহাভারতের এই গল্পটীতে আমরা শিখিতেছি যে, অন্য সকল দূরে থাক্, পরোপকারের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে হইবে; আর শিখিতেছি যে, যাহার কোন শক্তি নাই, কোন সামর্থ্য নাই, সেও যদি পরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তবে সে বজ্রের বল পায়। যাহার কোন শক্তি ছিল না, কোন সহায় ছিল না, পরোপকার করিতে গিয়া সে দেখিতে পায় যে, সে বজ্রের বল পাইয়াছে, পরের হিত সাধনের জন্য তাহার হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় বল, বজ্রের ন্যায় শক্তি উপস্থিত হইয়াছে। একটি কথা আছে—সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়। কথাটি বড় খাটি। তুমি সৎকার্য্য করিতে যাও, ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। তোমার যদি কোন সম্বল না থাকে, তথাপি দেখিতে পাইবে যে, তুমি যে সাধু কার্য্যে হাত দিয়াছ, শত সহস্র

বিঘ্ন বাধা সত্বেও, তাহা হইয়া যাইতেছে। সাধু ইচ্ছা থাকা চাই। পরোপকার করিবার জন্য সংকল্প থাকা চাই। যদি আর কিছুও না পার, পরের দুঃখে একফোঁটা চক্ষের জল ফেলিও, সেই একফোঁটা চক্ষের জলের মূল্য লক্ষ টাকা।

পিপীলিকার উপদেশ।

আমি কাল ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখিলাম যে, একটা ফড়িং হইয়া গিয়াছি এবং এদিক ওদিক করিয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে এক পুকুরের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে খানে অল্প অল্প ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, আর অমনি আমার সুমধুর ফড়িং কণ্ঠের গান ধরিয়া দিলাম। সে গানে মুগ্ধ হইয়া এক পিঁপড়ে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে অনেক ক্ষণ আলাপ করিয়া আমাদের দুজনার মধ্যে বেশ বন্ধুতা জন্মিয়া গেল। পিঁপড়ে তাহাদের বাড়ী যাইতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিল। তাহাদের বাড়ী পুকুরের ওপারে। পুকুর পার হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। দুজনার বুদ্ধি খাটাইয়া আমরা দুটা খড়ের ডাঁটার উপর একটা পাতা জড়াইয়া ভেলা তৈয়ার করিলাম। তার উপর দুজনা চড়িয়া একটা লম্বা খড় দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে চলিলাম। পুকুরে অনেক শেওলা, পানা, ঘাস জমিয়াছিল, তাহাতে আমাদের ভেলা বাধিয়া যাইতে লাগিল; অনেক কষ্টে সে গুলি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। পুকুরের মাঝখানে গিয়া দেখি জল হইতে বিড় বিড় করিয়া বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে। পিঁপড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ও কি ভাই" সে বলিল "তাও জান না, ওখানে জলের ভিতর মাকড়সা ভুড় ভুড়ি তুল্‌ছে।" আমি আগে শুনিয়া ছিলাম যে "মাকড়সারা কেবল স্থলেই থাকে।" পিঁপড়ে বলিতে লাগিল "এরকমের মাকড়সারা জলের ভিতর থাকে আর জলের পোকা ধরিয়া খায়। সকলের রুচি ত আর সমান নয়, কেহ পাঁঠা খাইতে ভাল বাসে, কেহ আবার নিরামিষই খায়। ইহারা জলের পোকাই খাইতে ভাল বাসে তাই জলের ভিতর থাকে। জলের ভিতর থাকিয়াই নিশ্বাস টানে। জলের ভিতর গাছড়া থাকে, তাহাতে নিজের সূতা জড়ায় আর উল্টা ছোট ঘণ্টীর মত একটা বাসা সেই সূতা দিয়া তৈয়ার করে। বাসাটা প্রথমে জলে পূর্ণ থাকে, মাকড়সা জলের উপর উঠিয়া একগাল বাতাস টানিয়া লইয়া সেই বাসার তলে যাইয়া মুখের বাতাস ছাড়িয়া দেয়। বাতাস টুকু বাসার ভিতরে উপর দিকে থাকিয়া যায়। এইরূপ অনেকবার করিতে করিতে বাসাটা বায়ুতে পূর্ণ হইয়া যায় তখন মাকড়সা ইহার মধ্যে বাস করে ও স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস টানে। অনেক দিন পরে যখন ঘরের বাতাসটা খারাপ হইয়া যায় তখন মাকড়সা সেই বাসাটাকে কাত করিয়া ধরে আর ঘরের সব বাতাস বাহির হইয়া যায়। পুনরায় নূতন বায়ু আনিয়া বাসা পূর্ণ করে। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ রেসমের মত কোমল লোমে আবৃত, তাই জলে ইহাদের গাত্র ভিজিয়া যায় না।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর আমাদের ভেলা পুকুরের ওধারে আসিয়া লাগিল। পিঁপড়ের হাত ধরিয়া তাহাকে ভেলা হইতে নামাইলাম। দুজনায় হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে লাগিলাম।

পথে কত নূতন নূতন জিনিস দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অনেক দূর গিয়া এক গর্ত্তের সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গর্ত্তের ভিতরটী বেশ শীতল। পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাই অল্পক্ষণের জন্য দুজনায় ঘুমাইতে লাগিলাম। প্রথমে আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে এক বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় নাই তথাপি তিনি এমনি অশিষ্ট যে আমাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। একটী গাছে সূতা জড়ান জালের মত তাঁহার বাসা। দূর হইতে দেখিলাম কতকগুলি মাছির কঙ্কাল সেই বাসায় ঝুলিতেছে। আমি যাইতেছিলাম কিন্তু আমার পিপীলিকা বন্ধু আমার কাণেকাণে বলিলেন "উহাকে বিশ্বাস করিওনা ও দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে, পক্ষীকে নিজের বাড়ীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহার প্রাণ বধ করে, উহার নাম মাকড়সা।" মাকড়সা আমায় জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাইতেছ?" আমি বলিলাম "পিঁপড়েদের বাড়ি" "তুমি কি পাগল হইয়াছ,প্রাণটা হারাবে না কি, যদি প্রাণের প্রতি কিছু মায়া থাকে তবে খবরদার পিঁপড়েদের বাড়ী যেও না। পিঁপড়েরা বড় দুষ্ট লোক, বড় রাগী, ওদের রাজ্যে সবাই সমান, রাজা টাজা নাই, মার্কিন দেশের মত সবাই রাজা।" আমি বলিলাম "আমার বন্ধু পিঁপড়া যে ওরকমের লোক তা আমার বিশ্বাস হয় না, তিনি বলিয়াছেন কোন ভয় নাই।" আমরা তথা হইতে চলিয়া গেলাম। পিঁপড়া মাকড়সার মুখে স্বজাতির নিন্দা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল "আপনি ওব্যাটাদের জানেন কি, আমি ওদের সব কুলের খবর জানি, আপনাকে সব বলিব।" আমরা পশ্চাতে তাকাইয়া দেখি মাকড়সা মুখটী চুন করিয়া নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া নিজের জালে গিয়া বসিয়া রহিল। মনে করিয়াছিল আমাদের ভুলাইয়া তাহার জালে লইয়া গিয়া আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত চুষিয়া উদর পূর্ণ করিবে। কিন্তু আমার বন্ধুর পরামর্শে আমি না গিয়া রক্ষা পাইয়াছি। মাকড়সার কুলের খবর আমার বন্ধুর নিকট যাহা শুনিলাম তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক, আমি আগামী বারে তাহা বলিব।

মজার পড়া।

ঘোড়ার মত দৌড়ে এত চল্‌বো না ক নেচে।
পা পিছ্‌লে প'ড়ে যাই ত নাক্‌টি যাবে ছেঁচে॥
আমার বড় মন্দ স্বভাব—কাঁটা খোঁচা দলি'।
যখন তখন, যেথা সেথা, বড়ই ছুটে চলি॥
সবাই করেন মানা, তবু শুনিনে ত কথা।
বুকে মুখে মাথায় ঠুকে তাই পাই সে ব্যথা॥
কষ্ট এত পেয়েও কি তাই মনে থাকে ছাই।
আড়াই পা না যেতে যেতে সকল ভুলে যাই॥
সিঁড়ির উপর ছড়্‌-ছড়্‌-ছড়্‌ সেই দণ্ডেই ছুটি।
পা পিছ্‌লে আবার পড়ি—আবার কেঁদে উঠি॥
মা ব'লেছেন তাই সে আমায়, কষ্ট পেয়ে বড়।
"মিছামিছি ছুট্‌তে গিয়ে এবার যদি পড়॥
'আহা' ব'লে তুল্‌ব না ত, নেবো না ত কোলে।
মুখ মুছিয়ে দেবো না ত মিষ্ট কথা ব'লে॥
খেলার সময় দৌড়ে খেল, বারণ তাতে নাই।
চল্‌তে গিয়ে পড়্‌বে ট'লে দেখ্‌তে নাহি চাই॥
বরং তুমি পড়্‌তে যদি ভাল বাস বড়।
বই নে এস, কাছে ব'স, 'দশ' 'রস' পড়॥
নূতন পড়া প'ড়্‌বে যদি,—মাসি মাকে ডেকে।
গড়্‌গড়িয়ে দেখাও প'ড়ে 'বড় গাছ'টা থেকে॥"

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

(মদ্য পানের অপকারিতা।)

সুরাপান যে সর্ব্বপ্রকারে দূষণীয়, তাহা সকল দেশে ও সকল উপদেশ-গ্রন্থে চিরকাল বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন কোন স্থান নাই যেখানে সম্মুখে বা পরোক্ষে, উক্ত সুরাসুর আধিপত্য না করিতেছে! সুরাপান করিলে মনুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পায়, তন্নিমিত্ত নানা প্রকার অসৎ কার্য্য করিতেও সুরাপায়ীরা কুণ্ঠিত হয় না। যে পর্য্যন্ত মদের নেশা বিদূরিত হইয়া না যায় ঐ পর্য্যন্ত, সুরাপায়ীগণ মনুষ্য লোক পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার পশুলোকে বিচরণ করে; এবং তজ্জন্যই তাহাদিগকে পাশব আচরণে লিপ্ত থাকিতে অধিকাংশ সময় দেখা যায়। আমরা স্মরণ শক্তির সাহায্যে এই সংসার মধ্যে নিয়ত নির্বিঘ্ন ও অভ্রান্ত ভাবে কার্য্য করিয়া সংসার যাত্রা ও অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। মদ্যপান করিলে আমাদের সেই উপকারিণী স্মৃতি শক্তির অভাব ঘটে। সেই শক্তির হ্রাস প্রযুক্ত আমাদের অনেক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। মোহ, তন্দ্রা, প্রলাপ এই সকল সুরাপানের নিত্য সহচর, আমাদের কাম, ক্রোধ, রিপু সকলও সুরাপান করিলে বিশেষ প্রবল হইয়া, কুপথে মতি জন্মায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-গণও সেই নেশার আবির্ভাবে স্ব স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া নানা প্রকার মারাত্মক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। আমাদের এমন কোন ইন্দ্রিয় ও

এমন কোন শক্তি নাই, সুরাপান করিলে যাহার বৈক্লব্য না ঘটে। ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ স্বচ্ছন্দে পৃথিবী মধ্যে অবস্থান করিবার নিমিত্ত যে সকল উপকরণ প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের বল, ও কার্য্য পটুতা জন্মে, তৎপ্রতি মনোযোগী থাকিয়া তাহা সম্পাদন করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কোন ক্রমে তাহার বিপরীতাচরণ করা উচিত নহে। করিলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার একান্ত সম্ভাবনা। কাজেই সুরাপান যে নিতান্ত দূষণীয় কাজ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। যেহেতু সুরাপান করিলে সর্ব্বদা ঈশ্বরাজ্ঞা উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে।

সুরাপানের আর একটী মহৎ দোষ এই যে, যে সকল দেশে ইহার আধিপত্য আছে শীঘ্রই ঐ সকল দেশ দরিদ্রতার চরম সীমায় উপনীত হয়। ঐ অসুর যাহাকে একবার স্বকীয় মোহ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, সে আর তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু উপার্জ্জন করে সকলই সুরা দেবীর পূজার্থ ব্যয় হইয়া থাকে; তথাপি আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি না হওয়ায় প্রথমে ঋণ, ও তৎপরে চৌর্য্যাদি দুষ্ক্রিয়া দ্বারা, নরকের পথে অগ্রসর হয়।

সুরাপান করিয়া মোগল বংশের আদি সম্রাট বাবর যে প্রকার বিপদে পতিত হন, তাহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। হিন্দুকুল-গৌরব পৃথ্বিরাজের হস্ত হইতে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার সুরাপানই কি এক প্রধান কারন নয়? যাহা হউক সে দূরের কথা, যে ক্রন্দনের রোল এখনও বঙ্গ হইতে বিদূরিত হয় নাই, সেই তিন কড়ির ফাঁসীর কারণ কি সুরাপান নয়? এই প্রকার কত কত বিপজ্জনক ও লোমহর্ষণ কাণ্ড যে সুরাপানের প্রসাদাৎ সম্পাদিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। অতএব দেখা যায় যে, সুরাপান নিসংশয়ে দূষণীয়। সুরাপান করিলে মনুষ্যের পরিপাক শক্তির হ্রাস ঘটে। তজ্জন্য শরীর অসুস্থ হইলে কাজেই অন্যান্য কার্য্যের অসুবিধা ঘটে। সুরাপান করিতে করিতে অনেককে ভবধাম পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব সুরাপানের অপকার যে হাতে হাতে ফলে তাহার সন্দেহ নাই।

যে সকল কারণে বিদ্যার্জ্জনের ব্যাঘাত জন্মে, সুরাপান তাহার অন্যতম। সুরাপানের এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, সে উদ্যোগী পুরুষের উদ্যোগ, পরিশ্রমীর পরিশ্রম, সত্যভাষীর সত্য, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, ইত্যাদিগকে অনায়াসে বিনাশ করিয়া ফেলে। যে প্রকার রত্নাদি সংযোজিত বহুমূল্য বস্ত্রাদি অগ্নি সংযোগে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার সুরাপান দ্বারা উৎপাদিত নেশায়, মনের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, ইত্যাদি সমূলে বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নেশাতে ইন্দ্রিয়াদির বৈক্লব্য ঘটিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন বাগান্দ্রিয় দ্বারা অভিমত বাক্য উচ্চারিত না হইয়া অস্পষ্ট পাশব ভাষার সৃষ্টি হয়। তাহার কোন প্রকার ভাবার্থ থাকে না। সেই প্রকারে হস্তাদি ও স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিচ্যুত হয়। নেশাকালে আত্ম বিস্মৃতি ঘটিয়া নেশাখোরের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তদ্বিষয় লেখা বাহুল্য।

শ্রীঅমৃতলাল নাথ, মুলপাড়া।
বয়স ১৯ বৎসর।

প্রভুর কাজ।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে কুকুর সেয়ানরামদাস বাগানে বেড়াইতেছে, এমন সময়ে বৃদ্ধ শৃগাল ধূর্ত্তকৃষ্ণ চতুর-চূড়ামণি একটা আড়াল জায়গা হইতে বাহির হইয়া, অতি সাবধানে এ দিক ও দিক তাকাইতে লাগিল। তখন সেয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি হে ভায়া, অনেক দিন পরে দেখা হইল, ভাল আছ ত?"

সেয়ান উত্তর করিল না; কারণ বৃদ্ধের সহিত তাহার কোন কালেও আলাপ বা সম্প্রীতি ছিল না। কোন কারণ বশতঃ সেয়ান অনেক-বার ইহার খোঁজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা লৌকিকতা বা ভদ্রতার খাতিরে নহে। যেখানে হৃদয়ের সদ্ভাব নাই, সে খানে অসভ্য জানোয়ার কখনই মৌখিক বন্ধুত্ব প্রকাশ করে না।

শৃগাল উত্তর না পাইয়া বলিতে লাগিল; "তা তোমার বেশ চেহারা খুলিয়াছে, তা নাইবা হইবে কেন, কপাল গুণে অতি দয়ালু মনিব পাইয়াছ, সুখে স্বচ্ছন্দে আছ, ঈশ্বর করুন চির-কাল এমনই থাক। তা, বাটীর সর্ব্বত্র সর্ব্বথা কুশল ত?"

সেয়ান বিস্তৃত দন্তপাটী প্রকাশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "বড় কুশল নহে; কি হইয়াছে তাহা বোধ হয় মহাশয়ের অবিদিত নাই।" এই বলিয়া কুকুর এক দৃষ্টে শৃগালের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার চক্ষু ধূর্ত্তের অন্তর পর্য্যন্ত দেখিয়া লইতেছিল। বৃদ্ধ নির্লজ্জ এবং মনো-ভাব গোপনে বিশেষ পটু হইলেও তাহার মুখ ও কাণ দুটি লাল হইয়া উঠিল; তথাপি নিতান্ত ভদ্র লোকের ন্যায় বলিল, "আমিত কিছু জানি না। আমি বনচারী, গৃহস্থের ঘরের খবর আমার জানা কিরূপে সম্ভবে?"

সেয়ান দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি বলিতেছি। তিন দিন হইল ছোট দিদি মনির দুটা খরগোস হারাইয়াছে, আবার খোকা বাবুর সাদা হাঁস পাওয়া যাইতেছে না।"

"আ-হা-হা! আ-হা-হা! কি বলিলে? দুটা খর-গোস—খোকা বাবুর সা-দা হাঁ-স—হায়! হায়! হায়! আহা হা হা হা!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, দুই হাত তুলিয়া শুষ্ক চক্ষু মুছিতে মুছিতে চক্ষু দুটি একটু সজল ও আরক্ত হইয়া উঠিল। তখন বাম হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া, ডাইন হাত বুকের উপর রাখিয়া বলিতে লাগিল—"তুমি কিছু টের পাও নাই, কি করিয়াই বা পাইবে, তুমি কর্ত্তার ঘরে ঘুমা-ইয়া থাক। আর কি বলিব, বাছা, খরগোস ও হাঁস বড় নিমক হারাম জন্তু, পুষিতে নাই। জীব-বিজ্ঞান পড় নাই বুঝি? তাহাতে লেখা আছে খরগোস জাতির স্বভাবই এই যে রাত্রিকালে সুবিধা পাইলে উহারা বাহির হইয়া যায়, বড় একটা ঘরে ফেরে না। আর হাঁসের কথা কি বলিব? দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান উহাদের এক রোগ।"

সেয়ান বলিল, আমি জীব-বিজ্ঞান পড়ি নাই, কিন্তু এতটা বুঝিতে পারি যে, দেশ বিদেশে যাইতে হইলে, কেহ বাড়ীর কোনে ঠ্যাং ফেলিয়া যায় না। ঐত দুখানা হাঁসের ঠ্যাং পড়িয়া রহি-য়াছে। মহাশয়ের অনেক বিদ্যা বুদ্ধি, ঠ্যাং

ফেলিয়া বেড়াইতে যাইবার কারণ অবশ্যই জানা আছে।”

সেয়ানের কণ্ঠস্বর, অধরের হাস্য এবং দন্তের আভা দেখিয়া, শৃগালের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, অতএব “আজ আসি, হাতে অনেক কাজ” এই বলিয়া তিনি মানে মানে বিদায় লইলেন। সেয়ান মনে মনে বলিল—“এই বুড়ারই যত ডাকাতী। যাই, মা হারা হাঁসের ছানা গুলির কখন কি ঘটে জানি না। কুঁড়ে ঘর খানার বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাত্রে আর কর্ত্তার ঘরে শুইব না, ছানা গুলির কাছে বসিয়া থাকিব। কিন্তু কুঁড়ে ঘর খানা নিতান্তই স্যাঁত স্যেঁতে, চালে খড় নাই, ভিতরে ঠাণ্ডা বাতাস যায়, রাত্রে বড় শীত ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু কি করি, প্রভু আমাকে বাড়ীর প্রহরী করিয়াছেন, প্রভুর কাজ করিতেই হইবে, নহিলে অবিশ্বাসীর কাজ হয়। বিশ্বাসী ভৃত্য প্রভুর কাজ অবহেলা করে না। শারীরিক অসুবিধা ভোগ করিয়া যদি তাহার নিকট নিরপরাধী থাকিতে পারি তাহাই আমার লাভ, তাহাই আমার সুখ।”

এইরূপ ভাবিয়া সেয়ানরামদাস নিজের সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া যেখানে হাঁসের ছানাগুলি ছিল, সেই ক্ষুদ্র কুঁড়েতে আসিল। ছানাগুলি মার ডানার তলে নির্ভয়ে কেমন আরামে ঘুমাইয়া থাকিত, এখন তাহাদের দুঃখ ও ভাবনার সীমা নাই। সেয়ানকে দেখিয়া তাহারা আহ্লাদে চাঁ চোঁ করিতে করিতে তাহার নিকটে আসিয়া তাহার গায়ে গা দিয়া ঘিরিয়া বসিল, কারণ জন্মিয়া অবধি তাহারা সেয়ানকে বন্ধু বলিয়া চিনিয়াছে। চতুষ্পদ রক্ষক সস্নেহে দ্বিপদ আশ্রিত দিগকে অভয় দিয়া, তাহাদের পার্শ্বে শুইয়া রহিল।

ক্রমে রাত্রি হইল, সেয়ানের চক্ষু ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অসহায় ছানাগুলির কথা ভাবিয়া তাহার ঘুমাইতে সাহস হইল না, কষ্টে চক্ষু খুলিয়া রহিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন, কে পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত কুঁড়ের দিকে আসিতেছে। সেয়ান ধীরে আসিয়া বেড়ার ভাঙ্গা দিকে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন পায়ের শব্দ থামিয়া গেল। আবার একটু খট্ করিয়া শব্দ হইল। সেয়ানের চক্ষু নড়িতেছে না, নিশ্বাসটিও পড়িতেছে না। দুটা পা একটা লম্বা মাথা, ক্রমে সমস্তটা শরীর ঘরে প্রবেশ করিল। শৃগাল ভায়া পা বাড়াইয়া একটি হাঁসের ছানার দিকে যেই মাথা বাড়াইতেছেন অমনি খপ্ করিয়া কুকুর তাহার গলা কামড়াইয়া ধরিল। ধূর্ত্তকুঞ্জের শরীর কুকুরের শরীরের প্রায় দেড়া, কিন্তু হইলে কি হইবে, শৃগালচন্দ্র যুদ্ধ সজ্জায় ছিলেন না, কুকুর তাহাকে বড় কায়দা করিয়া ধরিয়া ছিল; আর একটি কথা, ন্যায়ের পক্ষে যে যুদ্ধ করে সে দুর্ব্বল হইলে ও বলবান হয়, তাহার বল কিছুতেই টুটে না।

অনেক ক্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল। শব্দ শুনিয়া মালীর ঘুম ভাঙ্গিল, সে ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে অবাক্ হইয়া রহিল, পরে শৃগালের গলায় এক গাছা বড় দড়ি বাঁধিয়া কুকুরকে ছাড়াইয়া লইল। শৃগাল চন্দ্র সারারাত কয়েদ্ রহিলেন; সকাল বেলা বাড়ীর কর্ত্তার হুকুম মত তাহার যাহা হয় হইবে। সেয়ান তখন নিশ্চিন্ত মনে ছানা গুলির কাছে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার আর কোন ভাবনা নাই, সুতরাং ঘুমাইবার বাধা নাই। প্রভুর কাজ ভালরূপে সম্পন্ন করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রাণ ভরা আহ্লাদ। সমস্ত রাত কেবল সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছিল।

ফরাসী বালিকার স্বদেশানুরাগ।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী সম্রাট চতুর্থ চার্লসের মৃত্যু হয়। তখন তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড্ ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। এড্‌ওয়ার্ড্ পরলোকগত ফরাসীসম্রাটের ভগিনীপুত্র ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ফরাসী সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে যেমন পুত্র সন্তান না থাকিলে ভাগিনেয় বিষয়ের অধিকারী হয় ফরাসী দেশে সে নিয়ম ছিল না। সুতরাং এই বিষয় লইয়া ইংরাজরাজ এডওয়ার্ড এবং ফরাসীসম্রাট ফিলিপের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধ এক শত বৎসরেরও অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল। যাহারা প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করেন তাঁহাদের পৌত্র প্রপৌত্রেরা এই যুদ্ধের শেষ করিয়াছিলেন। এতদীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধের বিবরণ পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় নাই।

এই যুদ্ধে প্রথম প্রথম ইংরেজেরাই জয়লাভ করেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ফরাসী দেশের অনেক স্থান অধিকার করিয়া ফেলিলেন। ফরাসীরা দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিল; ইংরাজ সৈনিকেরা ফরাসীদিগকে বিড়াল কুকুরের ন্যায় মনে করিতেন; আজ কাল আমরা যেমন পদে পদে ইংরাজ কর্ত্তৃক অপমানিত হই সেই সময়ে ফরাসীদেরও এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। ফরাসীরমণী এবং বালক বালিকারা ইংরেজদিগকে সর্প কিংবা ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করিত। বাস্তবিক তখন ফরাসীদিগের আশা যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল; আর যে ফরাসীরা স্বাধীন হইবে—আর যে তাঁহারা ইংরেজদিগের অত্যাচার ও অপমান হইতে মুক্তি লাভ করিবে এ আশা ছিল না। কিন্তু চিরদিনকি সমান যায়? পাপ ও অত্যাচারের কতদিন শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে? যাহারা অন্যায় পূর্ব্বক পরের রাজ্য অধিকার করিতে চাহে ন্যায়বান পরমেশ্বর কি তাহাদের ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়া থাকেন? তাহা নয়। যাহারা ক্ষণকালের জন্য প্রভুত্ব পাইয়া নির্দ্দোষীর প্রতি অত্যাচার করে—আপনাদিগের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ন্যায়ের পথ লঙ্ঘন করে—তাহাদের শীঘ্রই সে গর্ব্ব ও মূর্খতার জন্য অনুতাপ করিতে হয়। আর যাহারা ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া ন্যায় ও সত্যের পথে যাইবার জন্য চেষ্টা করেন—শত দুর্ব্বল হইলেও ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হন। একদিন না একদিন তাহাদের ঘোর দুঃখ-রজনীর অবসান হয়—অপমান ও নির্য্যাতনের শেষ হইয়া যায়।

একশত বৎসরের দুঃখ ও দাসত্ব সহ্য করিয়া ফরাসীদের ভাগ্যেও তাহাই হইল। এই একশত বৎসর তাহারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না এবং অশিক্ষিত ও কাপুরুষ লোকের মত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না। আপনাদের ক্ষুদ্র বল ও সাহস লইয়া জয়ী ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন—কতবার পরাজিত হইয়াছেন তবুও সে চেষ্টার বিরাম নাই। ফরাসীরা এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া—স্বাধীনতার জন্য এইরূপ প্রাণপণে খাটিয়াছিল বলিয়া—ঈশ্বর তাঁহাদের দুঃখের দিন অবসান করিলেন। আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় উপায়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজেরা "অর-লিন্‌স্' নামক স্থান অবরোধ করিয়াছে। কত-

দিন কতমাস চলিয়া গেল ফরাসীরা কিছুতেই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইল না। দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে ফরাসীরা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজদিগের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। সকলেই বুঝিতে পারিল এইবার ফরাসীরা চিরকালের জন্য ইংরেজদিগের অধীন হইবে—দাসত্ব ভিন্ন তাহাদের অন্য গতি নাই। কিন্তু সহসা তাহাদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইল। ফরাসীরা ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পন করিবে এমন সময় অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক বালিকা তাহাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইল।

এই বালিকা ডমরেমী গ্রামের কোন এক কৃষক-কন্যা এবং ইহার নাম জোয়ান। জোয়ান শিশুকাল হইতে অতিশয় ধীর ও শান্ত ছিলেন এবং মাতার সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নিকটস্থ অরণ্যে যাইয়া পক্ষীদিগকে আহ্বান করিতেন আর তাহারা নির্ভয়ে জোয়ানের হস্ত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিত। জোয়ানের শান্ত ধীর স্বভাব এবং তাঁহার পবিত্র জীবন যেন দেশের এই মহৎ কার্য্য সাধন করিবার জন্যই গঠিত হইয়াছিল। যখন আহত ও ক্লান্ত সৈনিকগণ ডমরেমীর নিকট দিয়া গমন করিত তখন তিনি স্বহস্তে তাহাদের সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন; আহার ও পানীয় দ্বারা তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতেন। কে জানিত যে এই ধীর ও শান্ত স্বভাবের মধ্যে বীরত্ব ও দেশানুরাগের খনি নিহিত রহিয়াছে? ক্রমে দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া বালিকার হৃদয় বিগলিত হইল এবং নির্জ্জনে ও নীরবে দেশের কথাই তাঁহার মনে হইত। তখন ফরাসী দেশে এক জনরব ছিল যে "লোরেনের নিকটস্থ কোন কৃষক কন্যা ইংরেজদিগের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবে।" জোয়ানের মনে সে কথা উদয় হইলে কয়দিন তিনি ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন যে সাধু মাইকেলের আত্মা তাঁহাকে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য আদেশ করিতেছেন। পরদিন তিনি নিকটস্থ রাজ কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া, এই কথা বলিলেন। কিন্তু তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করিল না—ধর্ম্ম যাজকেরা একার্য্যকে অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রতিজ্ঞা নড়িল না, তিনি বলিলেন "আমি যদি মাতার নিকট থাকিয়া গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম তাহা হইলেই আমি অধিক সুখী হইতাম কিন্তু কি করিব! এ প্রভুর আজ্ঞা; আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না।" অবশেষে জোয়ান রাজ সমীপে নীত হইলেন; কিন্তু সেখানেও পুরোহিতেরা একার্য্য অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। তখন জোয়ান ধীরতার সহিত বলিলেন "আপনাদের পুস্তক অপেক্ষা ঈশ্বরের পুস্তক অধিক মাননীয়।" এবং যখন রাজ সভার মধ্যে রাজা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন তখন আপনার পরিচয় প্রদান করিবার কালে বলিলেন "আমার নাম কুমারী জোয়ান, ঈশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে আপনাকে রিমজ্ নগরে অভিষেক করিতে হইবে। ঈশ্বরই এ রাজ্যের রাজা; আপনি তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।"

যখন এই পবিত্র স্বভাবা অষ্টাদশবর্ষীয়া কুমারী আপাদ মস্তক শ্বেত বস্ত্রে আবৃত হইয়া এবং শ্বেত পতাকা হস্তে গ্রহণ করিয়া অশ্বারোহণে "অরলিন্‌স্" অভিমুখে গমন করিলেন তখন সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কুচরিত্র ইংরাজ সৈনিকেরা তাঁহাকে নানারূপ কুৎসিৎ ভাষায় উপহাস করিতে লাগিল কিন্তু তিনি সেদিকে কর্ণ

পাত ও করিলেন না। ঈশ্বরের যে আদেশ পালন করিতে আসিয়া ছিলেন তাহা সম্পন্ন করিতেই অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অধ্যবসায়, ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত নির্ভরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ফরাসী সৈনিকদিগের উৎসাহ প্রদীপ্ত হইল এবং একে একে সমস্ত দুর্গ ফরাসীদিগের হস্তগত হইল। শেষ দুর্গ জয় করিবার সময় জোয়ান আহত হইয়া পড়িলেন কিন্তু তথাপি যুদ্ধের বিরাম হইল না। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যাহা ঈশ্বরের আদেশ তাহা সম্পন্ন হইবেই। তাহাই হইল। যখন ইংরেজেরা পশ্চাদপদ হইল তখন জোয়ান ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সমস্ত সৈন্য তাঁহার সঙ্গে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কি চমৎকার দৃশ্য! যুদ্ধের নরহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক ব্যাপারের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য স্বর্গীয় ভাব!! যদি সংসারে সমস্ত যুদ্ধ কার্য্য এমন দেবভাবে চালিত হইত তবে আর পৃথিবীতে এত নির্দ্দোষ রক্ত পাত ও নরহত্যা সংঘটিত হইত না। ইহার পর তিনি রাজার পদতলে পড়িয়া আপনার জন্মস্থানে ভ্রাতা ভগিনীর নিকট যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না।

অতঃপর ইংরাজেরা সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া আবার যুদ্ধ করিতে আসিল' এবারও জোয়ান উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল যে একার্য্য তাঁহার জন্য নহে এবং ঈশ্বরের আদেশ তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। বোধ হয় এই বিশ্বাসের জন্যই তিনি এবার শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। একবৎসর কারাগারে অতিবাহিত হইলে ইংরেজেরা তাহার নামে এই অভিযোগ আনিলেন যে "তিনি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন এবং মন্ত্র ও ইন্দ্রজাল দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।" বিচারকেরা তাঁহার প্রতি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল কিন্তু তাঁহার একই উত্তর "ঈশ্বর আমাকে এ কার্য্যে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার আদেশেই ইহা করিয়াছি।" যখন তাহাকে বলা হইল যে যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই হইত তবে তুমি কেন বন্দী হইবে অতএব ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে। তখনও জোয়ান বলিলেন "যদি আমার পতনই ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে তাহাই হউক, কারণ ঈশ্বরের আদেশে যাহা করিয়াছি তাহার জন্য অনুতপ্ত হইব না।" নির্দ্দয় বিচারকেরা তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিল। জোয়ান নির্ভয়ে এক উচ্চস্থানে আরোহন করিলেন, নিম্নে ভয়ানক অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। ক্রুশ কাষ্ঠ বক্ষে ধারণ করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা তাঁহার পবিত্র দেহ বেষ্টন করিল। শেষ মুহূর্ত্তে একবার খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ করিয়া নরপিশাচদিগের অত্যাচারে তিনি আত্ম সমর্পণ করিলেন। যখন সকলে চলিয়া যাইতে লাগিল তখন এক জন ইংরেজ সৈনিক বলিয়া উঠিল 'আমরা আজ এক সাধ্বীকে দগ্ধ করিলাম আমাদের জয়ের আশাও এইসঙ্গে বিলুপ্ত হইল।' বাস্তবিক ও সেই দিন হইতে ইংরেজদিগের আশা একেবারে নির্মূল হইল। জোয়ান যে আত্মত্যাগ ও দেশানুরাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন তাহাতে ফরাসী হৃদয়ে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইল। এক নূতন সাহস ও বীর্য্যে ফরাসীরা পরাক্রান্ত হইল। শত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে আজিও ফরাসীরা সেই দেবীর স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা ভরে অবসন্ন হইয়া থাকে—সহস্র সহস্র বৎসর

চলিয়া যাইবে তবুও জোয়ানের স্বদেশানুরাগ স্বর্ণাক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদিগের কুকীর্ত্তির কালিমা চিহ্নও মানবজাতির চক্ষের সমক্ষে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে।

(প্রাপ্ত।)

আশ্চর্য্য বিনয়।

রুষিয়ার সম্রাট আলেকজ্যাণ্ডারের লাহার্প নামক একজন শিক্ষক ছিলেন। লাহার্প অতিশয় দরিদ্র লোক হইলেও তাঁহার উপর আলেকজ্যাণ্ডারের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি শিক্ষকের কুটীরে গিয়া তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে ভাল বাসিতেন। একদা এই প্রকার সমাজবেশে লাহার্পের গৃহে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে প্রার্থনা করেন। দ্বারবান নূতন লোক, রাজাকে চিনিতে না পারিয়া কহিল, "মহাশয় আমার প্রভু এখন পাঠে ব্যস্ত, এক ঘণ্টার জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আমার নিষেধ আছে" এবং তাঁহাকে চাকরদিগের গৃহে বসিতে অনুরোধ করিল। ভৃত্যদিগের আহারের সময় উপস্থিত হওয়াতে অভ্যাগতকে তাহারা আহারে নিমন্ত্রণ করিল। সমগ্র রুষিয়ার অধিপতি, যাঁহার আহারের জন্য পৃথিবীর উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু একত্রিত হয়, এই প্রকার অনুরুদ্ধ হওয়াতে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অতিশয় আহ্লাদ সহকারে ভৃত্যদিগের সামান্য আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আহারান্তে দ্বারবান প্রভুকে জানাইল যে "আলেকজ্যাণ্ডার নামক একজন যুবক তাঁহার সন্দর্শন প্রার্থী।" লাহার্প তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। সম্রাট হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিলে পর, শিক্ষকের লজ্জার পরিসীমা রহিল না। ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আলেকজ্যাণ্ডার আপনার হস্ত দ্বারা শিক্ষকের মুখ বন্ধ করিয়া কহিলেন "ছিঃ মহাশয় আমার নিকট আপনার প্রার্থনা অন্যায়। আপনার এক ঘণ্টা আমার এক দিনের সমান—বিশেষতঃ এত ক্ষণ বাহিরে বসিতে না হইলে আপনার ভৃত্যদিগের সহিত অতি সুন্দর আহারে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইত।"

দ্বারবান অবাক— রুষিয়ার সম্রাটকে সে নিমন্ত্রণ করিতে সাহসী হইয়াছিল!! মহামতি আলেকজ্যাণ্ডার সহাস্য বদনে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন ও তাঁহার সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ দ্বারবানকে এক শত রুবল (এক রুবল প্রায় দেড় টাকা) উপহার প্রদান করিলেন।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী লাহিড়ী।

মেডামুয়সল্ লি ব্লাঙ্ক।

বুনো কাকী বনের মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া একটী বালিকার যে কি দশা হইয়াছিল নিম্নলিখিত ঘটনাটী পড়িলে তাহা জানিতে পারিবে।

১৭৩১ সনে ফ্রান্সের উত্তরপূর্ব প্রান্তে সগনী নামক গ্রামে গ্রামবাসীরা এক দিন সন্ধ্যাকালে একটা উৎসব করিতেছিল; এমন সময়ে তাহারা এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাইল। দেখিল যে, একটী জানোয়ার তাহাদিগের নিকটে আসিতেছে, জানোয়ারটার আকৃতি মানুষের মত, তাহার লম্বা চুল পিঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, সমস্ত শরীর প্রায় অনাবৃত, হাতে একগাছি ছোট লাঠি। এই অদ্ভুত জানোয়ার দেখিয়া গ্রামবাসীদিগের উৎসব আনন্দ ত দূরে গেল; ভয়ে কেহ তাহার সম্মুখেও যাইতে সাহস করিল না। একটা খুব বড় তেজাল কুকুর ছিল। সে সকল দেশের লোকেরা চোর ডাকাতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই সকল বড় বড় তেজাল কুকুর রাখিত, কুকুরের গলায় বড় বড় লোহার কাঁটা দেওয়া কলার পরান থাকিত। সেই কুকুরটাকে তাহারা ছাড়িয়া দিল; কিন্তু তাহাতে সেই অদ্ভুত প্রাণী একটুও ভীত হইল না, বরং আত্মরক্ষার জন্য লাঠি হাতে করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কুকুরটাকে খুব উত্তেজিত করিয়া দেওয়াতে, সে এক ভয়ঙ্কর লম্ফ দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যেমন গিয়াছে, অমনি এক লাঠির আঘাতে তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া, এই অদ্ভুত প্রাণী তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল; এবং একটা বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, কাঠবিড়ালীগুলি যেমন নিপুণতার সহিত গাছে উঠে, সেই রূপ নিপুণতার সহিত একটা গাছে গিয়া উঠিয়া বসিল। সে গ্রামের লোকেরা সাহস করিয়া আর তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না; এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত আর এই অদ্ভুত প্রাণীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

কয়েক দিন পরে সেখানকার জমিদার এই প্রাণীর কথা শুনিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন না। সপ্তাহ খানেক পরে একদিন তাহার একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটা আতা গাছের উপর একটা অদ্ভুত আকৃতির জানোয়ার বসিয়া আছে; তাহারা কাছে যাইবা মাত্র, সে একটা গাছ হইতে আর একটা গাছে, সে গাছ হইতে আর একটা গাছে, এই রকম করিয়া অবশেষে বাগানটা পরিত্যাগ করিয়া, একটা খুব উঁচু গাছের উপর গিয়া বসিল। জমিদার তখন লোকজন জড় করিয়া সেই গাছের তলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কি উপায়ে ইহাকে ধরিবেন তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গ্রামের লোকেরা দেখিয়াই চিনিল যে এইই সেদিন তাহাদিগের কুকুরটাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু সেই ভদ্রলোক তাহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কোন ভয় করিও না। ইহাকে একটি ছোট বালিকার মত দেখা যাইতেছে, বোধ হয় এ পাগল, ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, কোন মতে পলাইয়া বোধ হয় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা সমস্ত রাত্রি এবং তার পর দিন ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গাছ তলা

দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিল। তখন সেই ভদ্রলোক বলিলেন যে, একটা পাত্রে খানিকটা জল গাছতলায় রাখিয়া সকলে সেখান হইতে চলিয়া যাও। সকলে তাহাই করিল। তখন দেখা গেল যে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ধীরে ধীরে নামিল, এবং জলের কাছে আসিয়া ঘোড়া প্রভৃতি যেমন করিয়া জল খায়, তেমনি করিয়া সমস্ত জলটা খাইয়া ফেলিল। তখন সেখানে যত লোক ছিল সকলে তাহাকে ধরিবার জন্য একেবারে আসিয়া পড়িল, এবং অনেক কষ্টে অবশেষে তাহাকে ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেল।

প্রথমে তাহাকে রান্না ঘরে লইয়া গেল; সেখানে কতগুলি পাখী ছিল; সে কাঁচাই তাহা খাইয়া ফেলিল। খাওয়ার পর সে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, তাহার চাহনি দেখিয়া বোধ হইল যে, সে কখনও এসকল জিনিস দেখে নাই। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহার বয়স বার তের বৎসর হইয়াছে। তখনও কোন কথা বলিতে পারিত না, কেবল এক এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ করিতে পারিত।

এই অদ্ভুত জীব লইয়া কি করিবেন, তখন সেই ভদ্র লোক তাহা ভাবিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন সে নিতান্ত অস্থির হইয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং ক্রমাগত পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাত্রিতে তাহাকে খাবার দেওয়া হইল, কিন্তু সে তাহা স্পর্শও করিল না, বোধ হয় রান্না করা জিনিস দেওয়া হইয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ। শুইবার জন্য তাহাকে বিছানা করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কোন মতেই সে বিছানায় শুইল না; কাপড়ও পরাইবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। তখন সেই ভদ্রলোক ভাবিতে লাগিলেন, ইহাকে লইয়া কি করিবেন। কথাও বলিতে পারিত না, সুতরাং এ হতভাগ্য বালিকার কোন কথাই জানা গেল না। কিন্তু যাহাই হউক, সেই ভদ্রলোকটি অতিযত্নের সহিত তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার স্বভাবও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং ক্রমে সে কাপড় পরিতেও আরম্ভ করিল। এবং মাস খানেক পরে দেখা গেল সে আর পলাইবে এ প্রকারও সম্ভাবনা নাই। কিছু কাল পরে তাহাকে এক দিন বাড়ীর বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল; কিন্তু তাহাতে এক বিপদ ঘটিল। বাড়ী ছাড়িয়া মাঠে যাইবা মাত্র সে হঠাৎ দৌড়িতে আরম্ভ করিল, এবং এত দ্রুতবেগে দৌ-

ড়িতে লাগিল যে, কেহ তাহাকে দৌড়িয়া ধরিতে পারিল না। কিন্তু সেই ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সে পলাইতে পারিল না। পলাইবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না। কারণ দেখা গেল যে, সে একটা বড় পুকুরের ধারে উপস্থিত হইয়া, কাপড় খুলিয়া রাখিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং চারিদিক সাঁতরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার সে ডুব দিয়া এতক্ষণ জলের মধ্যে ছিল যে, সে ভদ্রলোকটী ভাবিয়াছিলেন যে, হয়ত সে ডুবিয়া মরিয়াছে। তিনি তাহাকে তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখা গেল যে সে একটা মাছ মুখে করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। তারপর তীরে উঠিয়া আবার কাপড় পরিয়া সকলের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সে কথা বলিতে পারিত না বটে কিন্তু বনের সকল প্রকার পাখীর ডাক সুন্দর রূপে অনুকরণ করিতে পারিত; এবং অনেক সময় তাহাকে পাখী বলিয়া ভ্রম হইত! এই সকল দেখিয়া বোধ হইল যে, সে পাগল নহে, কিন্তু কোন ঘটনা বশতঃ ছেলে বেলায় বনে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং বনে কোন প্রকার জীবন ধারণ করিয়া সে এত বড় হইয়াছে। তাহাকে কথা বলিতে শিখাইবার জন্য অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, এবং অবশেষে সে চেষ্টার সুফলও ফলিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা বলিবার শক্তি যত বাড়িতে লাগিল, ছেলেবেলার কথা ততই ভুলিতে লাগিল। কতক কতক কথা সে মনে করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল। তাহাতেই তাহার ছেলেবেলার বিবরণ কতক জানিতে পারা গিয়াছে।

সে বলে যে, প্রায় তাহার সমবয়সী আর একটী বালিকার সহিত সে বনে বাস করিত। পিতা মাতার সম্বন্ধে কোন কথাই তাহার মনে নাই। শীতকালে বন্য পশুর চামড়া দ্বারা তাহারা দুই ভগ্নীতে শীত নিবারণ করিত, এবং গ্রীষ্ম কালে একটা ঘাঘরার মত কিছু পরিত, এবং তাহাতে ছোট লাঠি গাছটি ঝুলাইয়া রাখিত। এই লাঠি দ্বারা বন্য পশু মারিয়া আহার করিত। রক্ত পান করিতে বড় ভাল বাসিত, বিশেষতঃ খরগোসের রক্ত তাহাদের বড় প্রিয় ছিল। সে বলে যে, তাহার সঙ্গিনীর মৃত্যু হইয়াছে। একদিন তাহারা দুই জনে একটা নদীতে সাঁতরাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হওয়াতে দুই জনেই ডুব দিয়া অনেক দূরে গিয়া ভাসিয়া উঠে। সেখানে তাহারা মালার মত কি একটা জিনিষ পায়, এবং তাহাকে কে লইবে এই লইয়া দুই জনের মধ্যে বিবাদ হয়। তাহার ভগ্নী তাহাকে এক আঘাৎ করে এবং সেও সেই লাঠি দিয়া তাহার মাথায় এক আঘাৎ করে। এই আঘাতে সে পড়িয়া যায় এবং মাথা হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া তাহার অত্যন্ত দুঃখ হয় এবং তাহাকে বাঁচাইবার জন্য সে কি ঔষধ আনিতে যায়। কোন লতা পাতায় রক্ত বন্ধ হইবে, তাহা বোধ হয় তাহারা জানিত। কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া আর তাহার ভগ্নীকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে তাহার দুঃখ আরও অধিক হইল, এবং সে বনে বনে তাহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। এই সময়ে সে ধরা পড়ে। তাহার ভগ্নীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই হতভাগ্য বালিকার স্বভাব যদিও ক্রমে পরিবর্তন হইতে লাগিল, তথাপি অনেক সময় তাহাকে শাসনে রাখা যাইত না, এবং সে

সহজেই অত্যন্ত রাগিয়া উঠিত। বিশেষতঃ পুরুষ জাতির উপর তাহার কেমন এক প্রকার স্বাভাবিক রাগ ছিল; পুরুষ দেখিলেই সে অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিত। একজন ধর্ম্মযাজক এই জন্য তাহাকে একটী কন্‌ভেণ্টে (convent) রাখিতে পরামর্শ দেন, কারণ সেখানে পুরুষের যাতায়াত একেবারেই নাই। কন্‌ভেণ্টে আনিয়া তাহাকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল, এবং মেডামযসল্ লি ব্লাঙ্ক এই নাম তাহাকে দেওয়া হইল। জীবিত প্রাণীর উপর তাহার লোভ তখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ যায় নাই। এক দিন একটী খুব সুন্দরী স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিতে যান; তিনি আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় তাহাকে তাঁহার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়। একটা রান্না করা মুরগী টেবিলের উপর ছিল, লিব্লাঙ্কের চেহারা দেখিয়া বোধ হইল, তাহার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই সে স্ত্রীলোকটী তাহাকে খানিকটা দিতে গেলেন, তখন সে একটু উত্তেজিত এবং সম্পূর্ণ সরলতার সহিত বলিল, "না আমি উহা চাই না, আমি তোমাকে চাই।" এই বলিয়া সে তাঁহাকে ধরিতে যাইতেছিল, এমন সময় বলপূর্ব্বক সেখান হইতে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল।

এই কন্‌ভেণ্টে যখন সেই বালিকা থাকিত তখন পোলাণ্ডের রাণী তাহাকে দেখিতে যান। তাঁহার একজন কর্ম্মচারী তাহাকে কি একটু বিদ্রূপ করাতে সে তাঁহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করে; কিন্তু অনেক কষ্টে শেষে রক্ষা পান।

কন্‌ভেণ্টে আসিয়া তাহার শরীর ক্রমে খারাপ হইতেছিল এই জন্য তাহাকে একটী আশ্রমে রাখা হয় এবং তাহার পরিচর্য্যার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বালিকার যখন অধিক বয়স হইয়াছিল, তখন তাহার পূর্ব্বের স্বভাব কিছুই ছিল না, বেশ ধীর শান্ত ভাবে মানুষের মত জীবন যাপন করিত। পারিস নগরে ১৭৮০ সনে ৬২ বৎসর বয়সে এই হতভাগ্য বালিকার মৃত্যু হয়। উপরে লিখিত ঘটনা ভিন্ন, তাহার জীবনের আর কোন ঘটনা জানা যায় নাই।
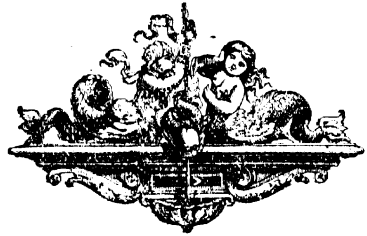
ধাঁধা।

১। ৪৫কে এমন ৪ ভাগে বিভক্ত কর যে, প্রথম ভাগকে ২ দিয়া যোগ করিলে, দ্বিতীয় ভাগ হইতে ২ বিয়োগ করিলে, তৃতীয় ভাগকে ২ দিয়া গুণ করিলে এবং চতুর্থ ভাগকে ২ দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক ফলই ১০ হইবে।
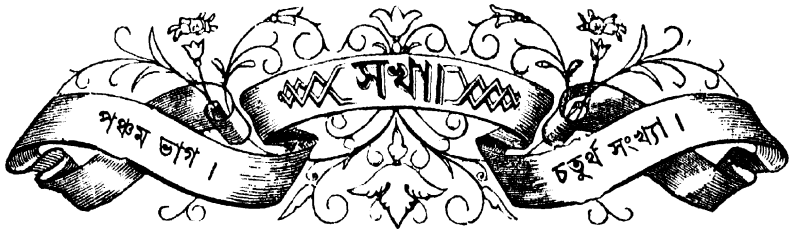
এপ্রিল, ১৮৮৭।

কুমারী তরু দত্ত।

যদি ফুলের গন্ধ থাকে, তবে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সকল ফুলে গন্ধ থাকে না; একটী বাগানের মধ্যে শত শত ফুল ফোটে, কিন্তু তার মধ্যে অনেকই দেখিতেই সুন্দর। অশোক গাছে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা থোপা থোপা ফুল ফোটে, কিন্তু তাহাতে গন্ধ নাই; এমনিতর অনেক ফুলই ফোটে যাহার গন্ধ থাকে না, দেখিতেই কেবল সুন্দর। কিন্তু বাগানের মধ্যে আবার এমন এক একটী ফুল ফোটে, যার গন্ধ চারিদিক আমোদিত করিয়া তোলে। এই ফুলগুলি ফুটিয়া, চারিদিক সৌরভ বিস্তার করিয়া, অবশেষে শুকাইয়া ঝরিয়া যায়; যত্ন করিয়া রাখিলে, শুকাইয়া ঝরিয়া গেলেও, ইহাদিগের সুগন্ধ একেবারে যায় না।

ত্রিশ বৎসর হইল এমনিতর একটী ফুল কলিকাতায় এক বাঙ্গালীর ঘরে ফুটিয়াছিল। তাহার সৌরভ কেবল বাঙ্গালাদেশে নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অকালে ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতে ফুলটী শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। ঝরিয়া গেলেও তাহার সৌরভ এখনও যায় নাই।

কলিকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবার লেখা পড়া প্রভৃতির জন্য বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৫৬ সালের ৪ঠা মার্চ্চ এই প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে তরুর জন্ম হয়। তরুর পিতা বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত বিদ্বান এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কার্য্য করিতেন এবং শেষ অবস্থায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্মালোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইহাঁর একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। পুত্রের নাম অব্জ এবং কন্যা দুটীর নাম অরু এবং তরু।

অব্জর বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন তাহার মৃত্যু হয়; পুত্রের কাছে গোবিন্দ বাবু অনেক আশা করিতেন, কিন্তু অকালে মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। পুত্রের মৃত্যু হইল, তখন গোবিন্দ বাবু কন্যা দুটীকে অতি যত্নে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অরু এবং তরু উভয়েই অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন, কিন্তু সকলের অপেক্ষা তরুর প্রতিভা অধিক ছিল। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৃতীয় সন্তান অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান হয়। যাহা হউক অরু বড় হইলেও তরুর অনুগত হইয়া—তরুর ইচ্ছামত

চলিত। যেমন একটা উজ্জ্বল আলোকের কাছে একটা ছোট আলোকের প্রভা দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি তরুর কাছে অরুর প্রভা প্রকাশ পাইত না; কিন্তু তাই বলিয়া তরুর কাজে কথায় বা ব্যবহারে কখনও অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ পাইত না।

তরুর শিক্ষা এবং তাঁহার মনের বিকাশের প্রধান সহায় যে তাঁহার পিতা ছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। গোবিন্দ বাবু প্রথম হইতেই যাহাতে সন্তানদের সুশিক্ষা হয় তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন; এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া নানা উপায়ে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন। অরু ও তরু ফ্রান্স দেশে কয়েক মাস ভিন্ন আর কখনও কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। যাঁহারা মনে করেন স্কুলে না পড়িলে লেখা পড়া শিক্ষা হয় না, তাঁহারা দেখিবেন স্কুলে না পড়িয়াও তরু যে প্রকার লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, অনেকে বি এ, এম এ, পাশ করিয়াও তাহা পারেন নাই। যদি ইচ্ছা ও যত্ন থাকে, তাহা হইলে ঘরে বসিয়াও অনেক লেখা পড়া, অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। তরু আট মাস মাত্র ফ্রান্সের একটী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নাম মাত্র; গৃহে আপনার যত্নেই অধিক শিক্ষা করিতেন।

গোবিন্দ বাবু ১৮৬৯ সালে ইউরোপ যান, এবং সেই সময় অরু ও তরুকে সঙ্গে লইয়া যান। শিক্ষা দেওয়াই তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাঁরা ফ্রান্সে কিছুকাল থাকেন, এবং ইংলণ্ডে তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক কাল থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের উপর তরুর প্রাণের একটা টান ছিল। ফ্রান্সে যখন ছিলেন তখন তরুর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। ফরাসী কাব্য পড়িবার জন্য তাঁহার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। কেবল যে পড়িয়াই ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, ছোট বড় সকল কবিদিগের লেখাই তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি ছিল, তিনি যে রাশি রাশি কবিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে সকলই তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি অনেক পড়িয়াছিলেন, এবং যাহা পড়িতেন তাহা খুব ভাল করিয়া পড়িতেন, একটীও শক্ত কথা তাঁহার নিকট এড়াইবার যো ছিল না; ছোট বড় সকল অভিধান হইতে সেই কথার ঠিক অর্থ না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। তাঁহার পিতার

সহিত তাঁহার যদি কখনও কোন কথার প্রকৃত অর্থ লইয়া তর্ক হইত, তাহা হইলে দশটীর মধ্যে সাত আটটীতে তিনিই জিতিতেন। তিনি প্রথমে অনেক ইংরেজী বই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষে প্রায় আর তিনি ইংরেজী বই পড়িতেন না, অধিকাংশ সময় ফরাসী ও জর্ম্মাণ বই লইয়াই দিবারাত্র থাকিতেন। ৩।৪ আল্‌মারী পরিপূর্ণ ফরাসী ও জর্ম্মাণ বই পড়া একটী বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নয়। ফরাসী জাতি তাঁহার প্রাণের ভাল বাসার বস্তু ছিল। যখন ফ্রান্সের সহিত প্রুসিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ হইল, তখন তরু ইংলণ্ডে ছিলেন, এবং তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। তখন তিনি তাঁহার দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন—"একদিন বাবা মাকে সম্রাটের কথা কি বলিতেছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি গিয়া শুনিলাম ফরাসীরা হার মানিয়াছে। আমি তখন কি ভাবে আবার সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম তাহা স্মরণ আছে, কে যেন আমার গলা চাপিয়া ধরিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁদ কাঁদ স্বরে অরুকে সকল কথা বলিলাম। ফ্রান্সের কেন পতন হইল? ইহার অনেক লোক পাপ ও নাস্তিকতায় ডুবিয়াছে—এইজন্য কি? হে ফ্রান্স তোমার কি ভয়ানক পতন হইল! এই অবমাননার পর ঈশ্বরকে ভাল করিয়া পূজা ও সেবা করিতে শিখিও। দুর্ভাগ্য ফ্রান্স তোমার জন্য আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।" এই সময়ে তিনি একটী কবিতা লেখেন; তাহার মর্ম্ম এই যে—ফ্রান্স মরে নাই, কিছুকালের জন্য মূর্চ্ছাগত হইয়াছে; সকলে মিলিয়া ইহার শুশ্রূষা কর, আবার ফ্রান্স সকল জাতির উপরে দাঁড়াইবে। পনর বছরের বালিকার কি সহৃদয়তা, —কি ধর্ম্মভাব!

সংসারের কাজ কর্ম্মে তিনি অতিশয় নিপুণা ছিলেন; কোন কাজকেই নীচ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি অতিশয় সুন্দর গান করিতে পারিতেন এবং পিয়েনো বাজাইতে পারিতেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা লিখিয়াছেন যে, "আজিও যেন সেই মধুর শব্দ আমার কর্ণে বাজিতেছে।" অরু ও তরু উভয়ের ইচ্ছা ছিল একখানি উপন্যাস লিখিয়া প্রকাশ করিবেন, তরু লিখিবেন এবং অরু তাহাতে ছবি আঁকিয়া দিবেন। তরু সেই উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৭৪ সালে অরুর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছা আর সফল হয় নাই। ১৮৭৯ সালে একজন ফরাসী মহিলা তাঁহার জীবনী সহিত তাঁহার লিখিত উপন্যাস খানি মুদ্রিত করেন। একটী বাঙ্গালী মেয়ের রচিত ফরাসী উপন্যাস দেখিয়া ইউরোপের লোক যার পর নাই আশ্চর্য্য হন; ইহাতে তাঁহার প্রতিভার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা পদ্য লেখায় তাঁহার প্রতিভা বিশেষ প্রকাশ পায়; এবং কবিত্বের জন্যই ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তাঁহার এত আদর। জীবিতাবস্থায় তাঁহার কয়েকটী মাত্র কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ সালে তাঁহার পিতা তাঁহার একখানি পদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের এত সুখ্যাতি হইয়াছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হইয়াছিল এবং ৬৷৭ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে ভারত গীতিমালা নামে আর একখানি পদ্য প্রকাশিত হয়—এবং ইহাই তাঁহার শেষ কীর্ত্তি। ইহা দ্বারা তাঁহার কবিত্বশক্তি বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়—এবং তাঁহার যশ চারিদিকে বিশেষরূপে বিস্তৃত হয়। ১৯৷২০ বৎসরের একটী বাঙ্গালী রম-

নীর পক্ষে ইহা কি সামান্য প্রশংসার কথা! আজ কাল অনেক মহিলারা পদ্য লিখিতেছেন এবং কেহ কেহ ভাল ভাল কবিতাও লিখিতেছেন; কিন্তু বিদেশীয় ভাষায়—ইংরাজিতে পদ্য লিখিয়া ইংরেজের নিকট প্রশংসা লাভ করা সামান্য ক্ষমতার কথা নহে। ১৮৭৩ সালে দেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতার সহিত সংস্কৃত অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। বোধ হয় দেশীয় ভাষার পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু অকাল মৃত্যুতে সে আশা আর সফল হইতে পারে নাই। বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন এমন সময় তাহার শরীর অসুস্থ ছিল। সুতরাং আর পড়া শুনা হইল না। বিষ্ণুপুরাণের দুইটী গল্প ইহার মধ্যে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। প্রাচীন ভারত রমণী নামক একখানি ফরাসী পুস্তক পড়িয়া তিনি তাহা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই পুস্তক লিখিতে লিখিতে ব্যারাম ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল এবং ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট একুশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। অল্প বয়সে তরুর মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে সহজে লোকে তাঁহার নাম ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার যশ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে তাঁহার কত আদর! তরু গিয়াছেন—ফুলটী শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত রহিয়াছে। এমন ফুল বেশী ফোটে না। যে কুসুম ভাল করিয়া না ফুটিতেই এত শোভা এত সৌরভ; ফুটিলে তাহার কি শোভা কি সৌরভই না হইত!

পিপীলিকার উপদেশ।

(৩৬ পৃষ্ঠার পর।)

পিঁপড়ে বলিতে লাগিল—মাকড়সা আশ্চর্য্য কীট। ইহারা বড় হিংস্র; মায়া দয়া কিছুমাত্রই নাই। জীবন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া খায়। আহা, সেই পোকগুলি তখন কত ছট্ ফট্ করিতে থাকে, তাহা দেখিয়াও তাহাদের দয়া হয় না। অনেক দুষ্ট ছেলে আছে যারা পোকা মাকড় ব্যাং দেখিলেই কত যন্ত্রণা দেয় ও মারিয়া ফেলে, কিছুই দয়া হয় না, মাকড়সাও সেইরূপ। নিরামিশ ত খাইবেই না, তার পর মরা পোকা মাকড় ও খাইবে না। আমরা পিঁপড়ে, বুঝিলে ভাই, জেয়ন্ত পোকা টোকা খাই না, উদ্ভিদ খাই, চিনি খাই, মধু খাই, সন্দেসের ত কথাই নাই, আর মড়া জিনিসের মাংস খাই। জীব হিংসা করিতে আমাদের কেমন প্রাণে লাগে। ভাই! মাকড়সার অবস্থা দেখিলে আমাদের বড় দুঃখ হয়। তুমি ওদের গিয়ে এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পার! ওদের শিক্ষা দিলে অনেক লাভ হইতে পারে।

ভাই! মাকড়সার আট্টা পা। আট্টা চোক। তলপেটে একটা থলিয়া আছে, সে থলিয়া হাঁসের ডিমের সাদা পদার্থের মত এক রকম রসে পূর্ণ। সে থলিয়ার গায়ে কতকগুলি সূক্ষ্ম ফাঁপা লোম আছে, তাহার ভিতর দিয়া সেই রস বাহির হয়। বাহির হইবামাত্রই জমিয়া সুতার মত হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম সুতাগুলি একত্রিত হইয়া এক এক গাছি মাকড়সার সুতা হয়। এই সুতা দড়ির মত খোলা যায়। এই সুতা মাকড়সার

অনেক কাজে আইসে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে, উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে, বাস স্থান নির্ম্মাণ করিতে, শিকার ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতে, নিজের ডিমগুলি সাবধানে ঢাকিয়া রাখিতে, শীত হইতে পরিত্রাণের জন্য বস্ত্র বয়ন করিতে—এই সকলেই মাকড়সা সূতা ব্যবহার করিয়া থাকে। সকল মাকড়সাই একই প্রকারের জাল বুনে না। ইহাদের মধ্যেও মহারাষ্ট্রী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, পার্শী আছে। ইহারা জাতীয় রীতি বজায় রাখিতে বড়ই ইচ্ছুক। বাঙ্গালীর মত আবার জাতীয় রীতি অনুকরণ করিতে ভাল বাসে না; কোন কোন মাকড়সা গাড়ির চাকার মত জাল বুনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে, কেহ আবার মাঝখানটা গর্ত্ত—ভিক্ষার ঝুলির মত—জাল বুনিয়া ঝুলাইয়া রাখে, আবার কেহ কেহ গর্ত্ত বা কোটরের মুখে বোম্বাই চাদরের মত পুরু জাল দিয়া দুয়ার নিম্মাণ করিয়া নিরাপদে তাহার ভিতর বাস করে। সে দুয়ার মাকড়সা নিজের ইচ্ছায় খুলিতে বা বন্দ করিতে পারে, অপরের পক্ষে সে দুয়ার খোলা বড় কঠিন ব্যাপার। কেহ দিবসে নিদ্রা যায়, রাত্রে আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। কেহ রাত্রে ঘুমায়, সমস্ত দিবস শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ একস্থানে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে, কখন ফাঁদে শিকার পড়িবে তাই ভাবিতে থাকে; সে স্থান হইতে আর নড়ে না। কাহার বা নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, দিন রাত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ শিকারের পশ্চাতে নিঃশব্দে আস্তে আস্তে যায়, তৎপরে হঠাৎ তাহার গায়ে লাফাইয়া পড়িয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করে। কেহ কেহ বাতাসে নিজের সূতা উড়াইয়া দেয়, যখন সূতাটা বেশ বড় হয় তখন আর মাকড়সার ভার সূতাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; মাকড়সা শুদ্ধ সূতা বাতাসে উড়িয়া যাইতে থাকে, ইহাকেই "চাঁদের বুড়ীর সূতা" বলে।

মাকড়সার বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়। একবার একটী মাকড়সা দুটী বৃক্ষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জাল তৈয়ার করে। জালটী বড় বলিয়া টান হয় নাই, বাতাসে বড় দুলিত, তাহাতে মাকড়সার বড় অসুবিধা হইত। টান করিবার জন্য জালের নীচের দিকে তিন চারিটী সূতা বাঁধিয়া সেগুলিকে গাছতলায় পাথর আর ঘাসের সহিত আট্‌কাইয়া দেয়। কিন্তু গাছতলা দিয়া লোক এবং গরু ও ছাগলের যাতায়াতে সে বাঁধ গুলি ছিঁড়িয়া যায়। তখন মাকড়সা সূতার সাহায্যে নীচে নামিল এবং ভূমি হইতে একটী ছোট কাঁকর লইয়া পুনরায় সেই সূতার সাহায্যে উপরে উঠিয়া জালের নীচে সেইটীকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিল। কাঁকরের ভারে জালটী বেশ টান হইয়া রহিল। জালের তলা দিয়া অনায়াসে লোকজন যাতায়াত করিতে লাগিল, আর পূর্ব্বের ন্যায় ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিল না।

মাকড়সা রাগ এবং অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি মাছি ধরিয়া একটী মাকড়সার জালে ফেলিয়া দিতেন, আর যেই মাকড়সা সেই মাছি ধরিত, অমনি তিনি মাছিটীকে কাড়িয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপ পাঁচ ছয় বার করাতে মাকড়সার বড় রাগ হইল। পুনরায় মাছি ফেলিয়া দিলে সে আর ধরিতে আসিল না, জাল কাটিয়া দিয়া মাছিকে নীচে ফেলিয়া দিল। সেই লোকটী তারপর দিন মাকড়সার কত খোসামুদি করিলেন তথাপি তাঁহার মাছির দিকে দৃক্‌পাত করিল না। অনেকক্ষণ পরে সেটীকে দূরে ফেলিয়া দিল।

মাকড়সা বড় সঙ্গীতপ্রিয়। মৃদুস্বরে বেহালা, হারমোনিয়াম বা পিয়ানো বাজাইলে মাকড়সাদিগকে অনেক সময়ে জাল ছাড়িয়া বাজনার নিকটে আসিতে দেখা গিয়াছে। সঙ্গীতে এতই মুগ্ধ হয় যে, সে সময়ে তাহারা কোন বিপদের আশঙ্কা করে না। শব্দ কর্কশ হইলেই তাহারা পলাইয়া স্বস্থানে যায়।

অন্যান্য জীবের ন্যায় মাকড়সাও মৃত্যুর ভাণ করে। ভেককে আঘাত করিলে যেমন মড়ার মত পড়িয়া থাকে, কেন্নো পোকা নাড়িলে গুঁড়ি গুঁড়ি হইয়া যেমন পয়সার মত নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে, মাকড়সাকে আঘাত করিলে সেইরূপ মড়ার মত পড়িয়া থাকে, পা ছিঁড়িয়া লইলেও নড়ে না। তারপর পিঁপড়ে বলিতে লাগিল—এরা কেমন যে এক রকমের জীব তা বলা যায় না। এদের সমাজ নাই, শাসন-প্রণালী নাই। পারিবারিক স্নেহবন্ধন কিছুই নাই। ইহারা বড় স্বার্থপর, নিজের ষোল আনাই বুঝে। অপরের খোঁজ খবরও রাখে না। একলা একলা থাকে, দু তিন জন এক সঙ্গে থাকিবে না, পরস্পরকে সাহায্য করিবে না, কাজেই ইহারা হিংস্র স্বভাব। যাহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকে না, যাহাদের সমাজ নাই, তাহাদের দয়া, মায়া, স্নেহ, অনুরাগ, ভালবাসা—এই সকল বৃত্তি কিরূপে জন্মিবে? আমরা পিঁপড়েরা ক্ষুদ্র জীব, আমরা পরের জন্য সারাদিন রাত খাটি, ভাই ভাই এক সঙ্গে থাকি, আমাদের সমাজ-বন্ধন আছে, শাসন-প্রণালী আছে, অপরের অসময়ে সাহায্য করি, পীড়ার সময়ে সেবা সুশ্রূষা করি। আমাদের মধ্যে কেমন স্নেহ, বন্ধুতা আছে। আমরা বেশ সুখী—এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে আমরা পিঁপড়ের বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম।

রমণীর দয়া।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দয়াশীলা। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীজাতীর হৃদয়ে স্নেহ, দয়া প্রভৃতি অনেক অধিক। অন্যের কষ্ট দেখিলে মেয়েদের যেমন কষ্ট হয়, পুরুষের তেমন হয় না। কাহারও দুঃখ বিপদ দেখিলে মেয়েদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, কাহাকেও কাঁদিতে দেখিলে মেয়েরা চখের জল রাখিতে পারেন না। দয়া মনুষ্যের একটী উৎকৃষ্ট ভূষণ। পাঠিকাগণ! তোমরা যেন এই ভূষণ হারাইও না। পরমেশ্বর স্নেহ দয়াতে তোমাদিগের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তোমরা যেন তাহা অবহেলা করিও না। অন্যের দুঃখ ক্লেশ দূর করিবার জন্য যেন তোমাদের প্রাণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, অন্যের চক্ষের জল মুছাইয়া দিবার জন্য, স্নেহের অঞ্চল যেন সর্ব্বদা তোমাদের হাতে থাকে।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক দয়ার কাজ করিয়াছেন, এমন কি অন্যকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। তৃতীয় বর্ষের সখাতে তোমরা তাহার একটী ঘটনা পড়িয়াছ। আজ তোমাদিগকে আর দুইটী ঘটনা শুনাইব।

ফয়জাবাদের সিপাহীরা যখন বিদ্রোহী হয়, তখন সেখানকার ডেপুটী কমিসনার একজন লোক দিয়া তাঁহার স্ত্রীকে, সকল পরিত্যাগ করিয়া, সেই লোকের সঙ্গে শীঘ্র নদীকূলে যাইতে বলিয়া পাঠান। বিবি সেই লোকের সঙ্গে পাল্কীতে নদীকূলে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তখন বিবি পাল্কী হইতে নামিয়া একখানি

গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। একটী এ দেশীয় স্ত্রীলোক তাঁহাকে অসহায় দেখিয়া নিজের ঘরে আশ্রয় দিল এবং একটি তুন্দুরের ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। সিপাহীরা রাত্রিতে ঐ গ্রামে প্রবেশ করিয়া পলায়িত ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষদিগের খোঁজ করিতে লাগিল। এবং সকলকে এই বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল যে, যাহারা পলাইতদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহারা যদি তাহাদিগকে না বাহির করিয়া দেয়, তবে তাহাদিগকেও হত্যা করিবে। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটী নিজের প্রাণ যাইবে জানিয়াও সেই বিবিকে বাহির করিয়া দিল না। সেই বিবি যে সে বাড়ীতে ছিলেন তাহা অনেকেই জানিত কিন্তু কেহই তাহা প্রকাশ করিল না। বিবি সমস্ত রাত্রি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; কিন্তু সিপাহীরা কোন খোজ না পাইয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গেল। পর দিন প্রাতঃকালে বিবির সঙ্গের সেই লোকটী সেখানকার একজন জমিদারের নিকট গিয়া এক খানি নৌকা চাহিয়া আনিল। তখন সেই নৌকায় ডেপুটী কমিসনারের স্ত্রী এবং আরও কয়েকজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক তাঁহাদের সন্তানাদি লইয়া নৌকায় উঠিলেন। জন কতক বিশ্বাসী সিপাহী তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল। সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগাইয়া কয়েকজন গ্রামের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ করিতে গেল। এখানেও স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে অনেক সহায়তা করিয়াছিল। ইহাদিগের দুরাবস্থা দেখিয়া তাহারা কতই ক্লেশ পাইয়াছিল। একটী ছোট ছেলে ক্ষুধায় ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া একজন আসিয়া তাহাকে স্তন্যদান করিতে লাগিল। যাহারা এই নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগকে এই প্রকার সাহায্য করিতেছিল, সিপাহীরা জানিতে পারিলে হয়ত তাহাদিগকে বধ করিত; কিন্তু তাহা জানিয়াও তাহারা আশ্রয় দিতে ক্ষান্ত হয় নাই।

বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে একজন ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার স্ত্রী ও ছেলেদের ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, কেবল একটীমাত্র দেড় বৎসরের ছেলে তাঁহার নিকট ছিল। একজন মুসলমান ধাত্রী ঐ ছেলেটীকে পালন করিত। সে একদিন ছেলেটীকে কোলে লইয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল যে,সেখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। সিপাহীরা ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলকেই বধ করিতেছে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া গেল এবং আপনার কাপড় লইয়া তাহার দ্বারা বেশ করিয়া ছেলেটীকে জড়াইয়া ঘরের এক কোণে লুকাইয়া রাখিল, এবং তাহাকে পিছনের দিকে রাখিয়া সে আপনি সম্মুখে বসিয়া রহিল। সিপাহীরা ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বলিল,"আমরা ইউরোপীয়দিগকে বধ করিব, ছেলেটীকে কোথায় রাখিয়াছ বল।" সে সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে রক্ষা কর—প্রভৃতি অন্য সকল কথা বলিতে লাগিল। সিপাহীরা তাহাদিগের কথার উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইল এবং একজন তাহার হাতের অস্ত্র দিয়া তাহাকে আঘাত করিল। তাহার শরীর হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু তবুও সে তাহাদিগের কথার কোন উত্তর দিল না। সিপাহীরা তাহাকে আরও আঘাত করিল, এবং আঘাতের পর আঘাত পাইয়া সে একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল। সিপাহীরা তখন চলিয়া গেল। খানিক পরে চেতনা লাভ করিয়া শিশুটীকে লইয়া সে নিজের বাড়ীতে গেল এবং ইংরেজ বলিয়া কেহ জানিতে না পারে এই জন্য তাহা

গায়ে এক প্রকার রং মাখাইয়া দিল। কিছুদিন পরে সে শুনিতে পাইল যে, তাহার প্রভু লক্ষ্ণৌ নগরে আছেন; এই সংবাদ পাইয়া শিশুটীকে লইয়া সেখানে গেল এবং তাঁহাদিগের ছেলে তাঁহাদিগকে দিয়া আসিল। তাহার শরীর তখনও সুস্থ হয় নাই এই জন্য সে নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে চাহিল; বিদ্রোহ শান্তি হইলে তাহাকে পুরস্কার করিবেন এই বলিয়া তাহার প্রভু তাহাকে তখন বিদায় দিলেন। কিন্তু সেই বিদ্রোহের সময়ই তাহার প্রভু ও তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্ণৌ নগরে হত হন, এবং ঐ শিশুটী অন্যান্য অনাথ সন্তানের সঙ্গে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

(কুসঙ্গের দোষ।)

সংসর্গ মানবের একটী প্রধানতম অঙ্গ। সংসর্গ ব্যতীত মানব, মানব সমাজের যোগ্য হইতে পারে না। হস্ত পদাদি প্রত্যেক অঙ্গ যেরূপ আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় এবং যাহাদের একটীর অভাবে আমাদের অত্যন্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হয়, সেইরূপ সংসর্গের অভাব হইলেও আমরা একাকী পড়িয়া অত্যন্ত কষ্টে পতিত হই; এসংসারে কেহই একাকী থাকিতে ভাল বাসে না, সঙ্গ লাভের ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেরই আছে। মনুষ্যের স্বভাব দেখিলেই প্রতীতি হয় যে, সে একা থাকিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। আমরা অহরহ বহু পরিজন মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকি এবং যখন যাহার নিকট গেলে সুখী হইব বলিয়া মনে করি তখনই তৎসমীপে গমন করিতে সক্ষম হই। এজন্য একাকী থাকা কতদূর কষ্টকর তাহা সহজে অনুভূত হয় না। কিছুকাল নির্জ্জনে বাস করিলেই আবার পুনরায় আমাদের স্বজন বাসের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে। বহুকাল একাকী অবস্থান করিলে মনে যে গুরুতর কষ্ট হয় তাহার সহিত অন্য কোন কষ্টের তুলনা হইতে পারে না। সঙ্গ লাভের ইচ্ছা মনুষ্যের এত প্রবল যে, যখন অপর মনুষ্যের সহিত মিলিত হওয়া একান্ত অসম্ভব হয় তখন কোন ইতর প্রাণীর সহিত সম্মিলিত হইতে পারিলেও বহু পরিমাণে সচ্ছন্দ অনুভূত হয়। ইহার একটী গল্প আমরা ইংরাজী পুস্তকে অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

পেরিস নগরীতে বেছটাইল নামক একটী বৃহৎ দুর্গ ছিল তথায় বন্দীসমূহ রক্ষিত হইত। তথায় কোন সময় লেটিউত নামক জনৈক বন্দী রক্ষিত হইয়া ছিল। তিনি তথায় সঙ্গী শূন্য হইয়া কোন এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়া ছিলেন কিন্তু তথায় তিনি জেল রক্ষক ব্যতীত কাহাকেও দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ঐ কুটীরে একটী রন্ধ্র প্রবিষ্ট কিঞ্চিৎ আলোক ব্যতীত আর কোন আলো আসিত না। তিনি একদা ঐ সুরঙ্গ মধ্যে একটী ইঁদুর দেখিতে পাইলেন এবং

উহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে কেমন এক প্রকার তৃপ্তি উপস্থিত হইল যে, তিনি উহাকে তাঁহার নিকটে আসিবার জন্য আহারীয় সামগ্রী দ্বারা উহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন, ক্রমে ঐ ইঁদুরটার ভয় হ্রাস হওয়ায় সে ঐ বন্দীর নিকট আসিয়া তাহার আহারীয় পাত্র হইতে আহারীয় দ্রব্য লইয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। এবং এইরূপ ক্রমে ক্রমে তিনি চতুর্দ্দিকে ১০।১২টী ইঁদুর কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে তিনি তাহার বন্ধন যন্ত্রনা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি তাহার মুক্তির বিষয় মনেও ভাবিতেন না। ইহার পর যখন তিনি জেল রক্ষকের আজ্ঞা ক্রমে অন্য কোন কুঠরীতে নীত হইয়া তাঁহার সঙ্গী সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে বন্ধন যাতনার কষ্ট অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! ইঁদুর মানুষের ভাব কিছুই অনুভব করিতে পারে না এবং মনুষ্যের সহিত তাহার কোন ও প্রকার সহানুভূতি হওয়াই সম্ভাবনা নাই; তথাপি আসঙ্গ লিপ্সার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বন্দী স্নেহশীল বন্ধুর ন্যায় তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সংসর্গ দ্বিবিধ; সৎসংসর্গ ও কুসংসর্গ। কুসংসর্গের অপকারীতাই প্রবন্ধের মূল বিষয়। বিশুদ্ধ এবং পবিত্র স্বভাব বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকদিগের সঙ্গকেই সৎসংসর্গ বলা যাইতে পারে। সৎসংসর্গই লোকের শিক্ষালাভের মূল কারণ; এবং সেই শিক্ষাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শিক্ষাই জীবনের হিত সাধক ও মহোপকারী। শিক্ষাই মানুষের যাবতীয় উন্নতির মূল। অশিক্ষিতের হৃদয় আকর নিহিত অপরিষ্কৃত প্রস্তরবৎ। ঐরূপ শ্রীহীন প্রস্তর সুচারুরূপে গঠিত, পরিষ্কৃত ও পরে মার্জ্জিত হইলে যেমন উজ্জ্বল ও রমণীয় হয় তদ্রূপ শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যের লুকায়িত মানসিক শক্তি পূর্ণ বিকসিত এবং প্রকৃতি সুগঠিত ও মধুর হয়। ইংরাজিতে একটী কথা আছে "used key is always bright" ব্যবহার্য্য চাবী সর্ব্বদাই উজ্জ্বল হইয়া থাকে অর্থাৎ সৎসংসর্গরূপ উপযুক্ত শিক্ষা এবং চালনা ব্যতীত মানবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয় কখন বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞান শিক্ষা সংসর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কেবল জ্ঞান শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। শিক্ষায় মনুষ্যের মন যেমন জ্ঞানে উন্নত হইবে, সেইরূপ গুণে বিভূষিত হইবে; স্বভাব যেমন উন্নত ও দৃঢ় হইবে সেইরূপ গুণে বিভূষিত হইবে। জ্ঞানে যিনি উন্নত হইয়াছেন অথচ চরিত্রে সাধু হন নাই তিনি মূর্খেরও অধম। বাস্তবিক যাবতীয় মানসিক শক্তির পূর্ণ ও স্বাভাবিক বিকাশ এবং চরিত্রের সাধুতা ও সৌন্দর্য্য সম্পাদনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত হইতে পারে; উন্নত সমাজে উন্নত পরিবারে বাস করিলে গ্রন্থাদি পাঠ ব্যতীতও মানসিক উন্নতির সুশিক্ষার বহুপরিমাণে অধিকারী হওয়া যায়; যাহারা সাধু ও সৎসঙ্গে বাস করেন তাহাদিগকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা না দিলেও তাহারা বহুপরিমাণে সুনীতি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। অবস্থার বিপাকে পড়িয়া কত কত ধার্ম্মিক ও মহাজন, কত বীর ও বিজ্ঞানবিদ, কত জ্ঞানী ও গুণী, ইতর আলয়ে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাদের ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। নিয়মিত শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে চিরকালের জন্য গভীর তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। সংসর্গ লোকের পরীক্ষা স্থল। যাহার যেরূপ রুচি সে সেরূপ দলে ভুক্ত হয়; যাহারা সৎ তাহারা

সজ্জনের সংসর্গ ত্যাগ করে না। এবং যাহারা দুশ্চরিত্র তাহারাও কখন অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে না। সাধারণতঃ সদ্বিষয় অপেক্ষা অসদ্বিষয়ে মনুষ্যের মন অধিক আকৃষ্ট করে, কাজেই কুনীতি সহজে শিক্ষা হয়। এজন্য অসৎ লোক সজ্জনের সহিত সমাগম করিলেও তাহাদের চরিত্র সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কিন্তু সৎলোক অধিক দিন কুসঙ্গে বাস করিলে কুজনের দোষরাশী সহজেই তাহাদের অভ্যস্থ হইয়া উঠে। * * * * * * * * * * * কুসঙ্গে থাকিলে যেরূপ দুর্দ্দশায় পড়িতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য একটী ঐতিহাসিক ঘটনা এস্থলে লিখিত হইতেছে। হিন্দু দিগের রাজত্বের পর দিল্লীতে পাঠান বংশীয় রাজার রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই পাঠান-বংশীয় মুসলমানদের মধ্যে কৈকোবাদ নামে এক ব্যক্তি এক সময় দিল্লীর অধিপতি ছিলেন। যখন কৈকোবাদ দিল্লীর বাদসাহ হইয়াছিলেন তখন তাহার বয়ক্রম অষ্টাদশ বৎসর ছিল। নিজাম নামে কৈকোবাদের এক প্রধাম মন্ত্রী ছিল। ইহার চরিত্র সাতিশয় মন্দ ছিল। এই মন্দ লোকের সংসর্গ দ্বারা কৈকোবাদের চরিত্র দূষিত হইয়া যায়। কৈকোবাদ কুচরিত্র নিজামের পরামর্শে অল্প বয়সে মদ্য পানাদি নানাপ্রকার পাপকার্য্যে এত আসক্ত হন যে,শীঘ্রই তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে। কৈকোবাদের পিতা বখর খাঁ এই সময় বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তেজস্বিতা ও সৎ-স্বভাবের জন্য তাহার সুখ্যাতি ছিল। পুত্র কুসংসর্গে পড়িয়া খারাপ হইয়া যাইতেছে শুনিয়া তাঁহাকে সদুপদেশ দিবার জন্য দিল্লীতে আসি-লেন। এদিকে কুমন্ত্রী নিজাম কৈকোবাদকে পরামর্শ দিল যে, বাঙ্গলার নবাব দিল্লীর বাদসাহের অনুমতি ব্যতীত সৈন্য লইয়া দিল্লীতে আসি-য়াছে, সুতরাং সে রাজবিদ্রোহী; তাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কৈকোবাদ কুমন্ত্রীর কুহকে মুগ্ধ হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন, বখর খাঁ পুত্রের এই ভাব দেখিয়া তাঁহাকে লিখিলেন, "বৎস! যুদ্ধ করিতে হয়, পরে করিও, আমি অগ্রে তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" কৈকোবাদ পিতার এই পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কুমন্ত্রী নিজাম তাঁহাকে এই পরামর্শ দিল যে, কৈকোবাদ রাজ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া,সিংহাসনে বসিয়া থাকি-বেন, বখর খাঁ সামান্য ভৃত্যের ন্যায় সেলাম করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। বখর খাঁ কি করেন, রাজসভায় আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পুত্রকে তিন বার সেলাম করিলেন। এরূপ অবস্থাতেও কৈকোবাদ সিংহাসনে রহি-য়াছেন দেখিয়া, বখর খাঁ নিতান্ত দুঃখ বোধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদ পিতাকে কাঁদিতে দেখিয়া, সিংহাসন হইতে নামিয়া তাঁহার পা ধরিতে গেলেন, বখর খাঁ পুত্রকে এই কার্য্য করিতে নিরস্ত করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার গল দেশ ধারণ করিলেন। তখন পিতা পুত্র উভয়েই শোকে অধীর হইয়া, অনবরত অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। সভাস্থ লোক ইহা দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। কৈকো-বাদ সমুচিত সম্মানও আদর করিয়া পিতাকে নিজের সিংহাসনে বসাইলেন। পিতা পুত্রে অনেকক্ষণ আলাপ হইল। অনন্তর বখর খাঁ কয়েক দিন নির্জ্জনে বসিয়া পুত্রকে সৎপথে আসিতে অনেক উপদেশ দিলেন। কৈকোবাদ

প্রকৃত পক্ষে বড় সরল ও কথার বাধ্য ছিলেন। কেবল দুষ্ট স্বভাব নিজামের সংসর্গে থাকাতে তিনি নানাপ্রকার গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে পিতার সৎপরামর্শে তাঁহার স্বভাব শুধরাইতে লাগিল। তিনি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখনও নিজামের কথা শুনিবেন না; এবং তাহার কথায় কুকর্ম্মে রত হইবেন না। বখর খাঁ পুত্রের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার রাজ্যে গমন করিলেন। বখর খাঁ বাঙ্গলায় চলিয়া গেলে, নিজাম সুযোগ পাইয়া, আবার কৈকোবাদকে নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। কৈকোবাদ কুমন্ত্রীর সংসর্গে পড়িয়া আবার দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বদা পাপকার্য্য করাতে শীঘ্রই কৈকোবাদের পক্ষাঘাত রোগ হইল। এদিকে রাজ্যে নানা প্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। এই গোলযোগের সময় একদল লোক প্রবল হইয়া, কৈকোবাদের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইল।

দেখুন! কৈকোবাদ দিল্লীর বাদসাহ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও কেবল কুসংসর্গে পড়িয়াই, তরুণ বয়সে তাহার কি পরিণাম হইল? সর্ব্বদা সৎসংসর্গে থাকা উচিত। কুসংসর্গে থাকিয়া আপনার অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে।

অপরিণত বয়সে লোকের অনুকরণ-প্রিয়তা প্রবল ও কার্য্যক্ষম থাকে কিন্তু পরিণত বয়সে সেরূপ থাকে না। শিশু স্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে মাতার প্রকৃতি অধিকার করে ও তাহার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে, বালক সমবয়স্ক সহচর দিগের রীতি পদ্ধতি গুণ দোষ চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিয়া তদনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। যুবক বন্ধুমণ্ডলীর চরিত্র ও ব্যবহার দেখিয়া স্বীয় চরিত্র সংগঠন করে; জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাত সারেই হউক তাহাদের প্রকৃতি ও আয়ত্ত করে। কিন্তু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে তেমন নহে। বস্তুত অপরিণত বয়সেই অনুকরণ ইচ্ছা ও অনুকরণ ক্ষমতা অধিকতর প্রবল থাকে। মোম দ্বারা যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ প্রতিমূর্ত্তি অনায়াসে গঠন করিতে পারা যায়, অল্প বয়সে যখন মন কোমল থাকে তখন তাহাকে যে পথে ইচ্ছা সেই পথে অনায়াসে চালিত করা যায়। এবং ভাল মন্দ যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ চরিত্র অনায়াসে সংগঠিত হইতে পারে, অতএব বাল্যকাল হইতে যাহাতে কোন কুব্যবহার অভ্যস্ত হইতে না পারে বরং অন্তঃকরণ নানা মনোহর গুণগ্রামে সুশোভিত হইতে পারে তৎপক্ষে প্রত্যেককেই একান্ত যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব ছেলে বেলা হইতেই লোকের কুসঙ্গ পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং সৎসঙ্গে থাকা বিধেয়।

শ্রীললিতকুমার বসু, বরিশাল।
বয়স ১৫ বৎসর।

চীনের কথা।

তোমরা গত বৎসরের "সখা"র চীন দেশের গল্প পড়িয়াছ। চীনের লোকেরা ছেলে মেয়ের প্রতি কিরূপ যত্ন করে, ছেলেবেলা হইতে তাহাদের কাঁধে কিরূপ কাজের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়-

তাহা তোমরা শুনিয়াছ। ছেলেরা কিরূপে সারাদিন স্কুলে থাকে, মাষ্টার মহাশয় কেমন আফিম খাইবার নল এবং থলে হাতে করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন তাহাও দেখিয়াছ। চীন দেশের লোকগুলি দেখিতে কেমন, তাহাদের বাড়ী ঘর কেমন, তাহাদের কিরূপ আবার ব্যবস্থা ইহা কি তোমাদের শুনিতে ইচ্ছা হয় না? কোন দেশের কিম্বা লোকের বিষয় একটু কিছু জানিলে আরো বেশী জানিতে ইচ্ছা হয়। তাই তোমাদিগকে আজ চীন দেশীয় লোকেরা দেখিতে কেমন সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

আমাদের দেশে যেমন এক এক জনের এক এক রকম বর্ণ তাহাদের তাহা নয়। আমাদের দেশে হয়ত তিন চারিজন ভাইবোন তিন চার রকম রঙের। কেহবা মিচ্‌মিচে কাল, কেহবা আধময়লা, কেহবা একটু কাল এইরূপ পাঁচ রকমের পাঁচ জন দেখা যায়। কিন্তু চীন দেশে সে রকম নয়। সেখানে সকলেরই এক রকম রঙ; কেবল তাহাই নহে দেখিতেও প্রায় সকলেই এক রকম; হঠাৎ দেখিলে কোনরূপ প্রভেদ বুঝা যায় না। সকলেরই চ্যাপ্টা মুখ, থাদা নাক এবং মিট্‌মিটে ছোট ছোট চোখ। আমাদের চাইতে তাহাদের রঙ্ অনেক ফরসা এইজন্য কলিকাতায় তাহাদিগকে সামান্য লোকেরা "চীনে সাহেব" বলিয়া থাকে। রঙ্ ফরসা বলিয়া চীনেরা সুন্দর নহে। ছেলেবেলা তাহাদিগকে বেশ সুন্দর দেখায়, কিন্তু যতই বয়স বাড়ে ততই মুখ ক্রমে চ্যাপ্টা হইতে থাকে এবং আকৃতি কদাকার হইয়া উঠে। বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা নিতান্ত কুৎসিৎ হয়।

চীনেদের দুই একটী অতিশয় হাস্যকর প্রথা প্রচলিত আছে। তাহারা মনে করে এইরূপে তাহাদিগকে অতি সুন্দর দেখায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা আরও কদাকার হয়। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বাম হাতের নখ রাখিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে ইহা পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। এই নখ রাখা অতিশয় সম্মানজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়; কারণ যাহারা শারীরিক পরিশ্রম ও কঠিন কার্য্য করে তাহারা নখ রাখিলে তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এই জন্য দরিদ্র লোক এবং শ্রমজীবিরা তাহা রাখিতে পারে না। বড় বড় নখ থাকিলেই বুঝা যায় যে তাহারা ভদ্র লোক এবং কোন হীন কাজ করে না। আমাদের দেশে ও মাঝে মাঝে লোকে তারকেশ্বরের কিম্বা অন্য কোন দেবতার নামে নখ ও চুল মানস করে। বড় বড় নখ রাখিলে হয়ত হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং তাহা হইলে বড় কষ্ট পাওয়া যায়; চীনেরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নখের দুই পার্শ্বে দুই খণ্ড বাঁসের বাখারি দিয়া বাঁধিয়া রাখে।

ইহা অপেক্ষা আর একটী প্রথা অতিশয় কষ্টদায়ক। তোমরা হয়ত শুনিয়াছ চীনেদের মেয়েদের পা অতিশয় ছোট। তাহাদের ছোট পা সৌন্দর্য্যের প্রধান চিহ্ন বলিয়া মনে করা হয়। সকল দেশেই এ রকম কোন না কোন কুসংস্কার আছে। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা কোমর সরু করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে। আমাদের দেশেও যে মেয়েদের মধ্যে দুই একটি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার নিয়ম নাই তাহা নহে। তবে চীন দেশীয়দের এইরূপে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অনেক আড়ম্বর করিতে হয়। কিরূপে তাহারা পা ছোট করে তাহা শুনিতে অতি অদ্ভুত। যখন মেয়েদের তিন চারি কিম্বা পাঁচ বৎসর বয়স হয় তখন এই মহৎ ব্যাপারের

অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই ব্যাপার শেষ হইতে প্রায় দুই তিন বৎসর সময় লাগে এবং সেই সমস্ত সময় সুন্দরীরা অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। পা বাঁধিবার জন্য চীন দেশে এক-রকম সাদা রাঙা ব্যাণ্ডেজ (পুলটিস) কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ দুই ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ৮ হাত লম্বা। ইহা দ্বারা পা বাঁধিবার পূর্ব্বে ফিটকিরির গুড়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়, কারণ তাহা হইলে পরে কোন রূপ ফোঁড়া কিংবা ঘা হইতে পারে না। পা এত শক্ত করিয়া বাঁধা হয় যে প্রায় একখানা পাকে মাঝখানে ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ করা হয়। ইহাতে রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং পা আর বড় হইতে পারে না। ইহাতে কি কষ্ট হয় তাহা একবার অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়; কিন্তু তবু সুন্দরী হইবার এত প্রবল ইচ্ছা যে চীনের বালিকারা ইহা অম্লান বদনে সহ্য করে।

এইরূপ প্রায় একমাস কাল পা বাঁধা থাকে। একমাস পরে এইরূপ বাঁধা পা দুইখানাকে খুব গরম জলে অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখা হয়। তখন পুলটিসটি আস্তে আস্তে খুলিয়া ফেলিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পায়ের এক পরদা মরাচাম উঠিয়া যায়। এই সময়ে কাহারো কাহারো পায়ের তলায় কতকগুলি মাংস অথবা দুই তিনটি আঙ্গুল ও খসিয়া পড়ে।

যখন পা জলে ভিজিয়া যায় তখন বেশ করিয়া পুছিয়া ফেলা হয়। তাহার পর আবার কিছু ফিটকিরির গুড়া ছড়াইয়া ৫ ফুট লম্বা নূতন এক পুলটিস দ্বারা পা বাঁধা হয়। এবারকার বাঁধা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক শক্ত হয়। ইহার পর স্ত্রীলোকেরা মাসে একবারের অধিক পা খুলে না। পা খুলিলে আর তাহারা হাটিতে পারে না এবং ভয়ানক যন্ত্রণা হয়।

যখন প্রথম এইরূপে পা ছোট করিবার জন্য ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা হয় তখন প্রথম প্রথম তিন চারি মাস ভয়ানক যন্ত্রণা থাকে। কেহ কেহ বা এক বৎসর কালও এই যন্ত্রণা ভোগ করে। সারাদিন রাত্রিতে একটুও শান্তি নাই, যেন কেহ ছুঁচ বিঁধাইয়া দিতেছে। এইরূপে ক্রমে যখন পা অবশ হইয়া যায়, তখন আর কিছু বোধ হয় না। কিন্তু উহা চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য ও কদাকার হইয়া থাকে। তোমরা হয়ত মনে করিতে পার যে চীনের বালিকারা এই ভয়ানক কার্য্য করিতে ভীত হয় কিন্তু তাহা নহে; আমাদের দেশে যেমন অলঙ্কার পরিবার সাধে মেয়েরা অক্লেশে নাক ও কাণ বিঁধাইতে পারে সেখানেও মেয়েরা সুন্দরী হইবার অভিলাষে নিজেরাই পায়ের ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া থাকে।

এইরূপ ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা পা যেমন অকর্ম্মণ্য হয় তেমনই কদাকার হয়। যে বালিকার চিত্র দেওয়া হইতেছে তাহার পায়ের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। চীনের খ্রীষ্টান পাদরীরা এই কুপ্রথা উঠাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু বড় কৃতকার্য্য হন নাই, কারণ চীনদিগকে একথা বলিলে তাহারাও বলে "কেন বাপু, তোমাদের মেয়েরাও ত কোমর সরু করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করে; তবে আর আমাদের দোষ কি?" পাদরী সাহেবেরা তখন মুখ ফিরাইয়া ঘরে আসেন। নিজের দোষ থাকিলে পরের দোষ সংশোধন করা বড়ই কঠিন। একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। অতএব যাহারা জীবনে কোন সৎ

তাহা তোমরা শুনিয়াছ। ছেলেরা কিরূপে সারাদিন স্কুলে থাকে, মাষ্টার মহাশয় কেমন আফিম খাইবার নল এবং থলে হাতে করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন তাহাও দেখিয়াছ। চীন দেশের লোকগুলি দেখিতে কেমন, তাহাদের বাড়ী ঘর কেমন, তাহাদের কিরূপ আবার ব্যবস্থা ইহা কি তোমাদের শুনিতে ইচ্ছা হয় না? কোন দেশের কিম্বা লোকের বিষয় একটু কিছু জানিলে আরো বেশী জানিতে ইচ্ছা হয়। তাই তোমাদিগকে আজ চীন দেশীয় লোকেরা দেখিতে কেমন সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

আমাদের দেশে যেমন এক এক জনের এক এক রকম বর্ণ তাহাদের তাহা নয়। আমাদের দেশে হয়ত তিন চারিজন ভাইবোন তিন চার রকম রঙের। কেহবা মিচ্‌মিচে কাল, কেহবা আধময়লা, কেহবা একটু কাল এইরূপ পাঁচ রকমের পাচ জন দেখা যায়। কিন্তু চীন দেশে সে রকম নয়। সেখানে সকলেরই এক রকম রঙ; কেবল তাহাই নহে দেখিতেও প্রায় সকলেই এক রকম; হঠাৎ দেখিলে কোনরূপ প্রভেদ বুঝা যায় না। সকলেরই চ্যাপ্টা মুখ, খাঁদা নাক এবং মিট্‌মিটে ছোট ছোট চোখ। আমাদের চাইতে তাহাদের রঙ্‌ অনেক ফরসা এইজন্য কলিকাতায় তাহাদিগকে সামান্য লোকেরা "চীনে সাহেব" বলিয়া থাকে। রঙ্‌ ফরসা বলিয়া চীনেরা সুন্দর নহে। ছেলেবেলা তাহাদিগকে বেশ সুন্দর দেখায়, কিন্তু যতই বয়স বাড়ে ততই মুখ ক্রমে চ্যাপ্টা হইতে থাকে এবং আকৃতি কদাকার হইয়া উঠে। বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা নিতান্ত কুৎসিৎ হয়।

চীনেদের দুই একটী অতিশয় হাস্যকর প্রথা প্রচলিত আছে। তাহারা মনে করে এইরূপে তাহাদিগকে অতি সুন্দর দেখায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা আরও কদাকার হয়। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বাম হাতের নখ রাখিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে ইহা পাঁচ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। এই নখ রাখা অতিশয় সম্মানজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়; কারণ যাহারা শারীরিক পরিশ্রম ও কঠিন কার্য্য করে তাহারা নখ রাখিলে তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এই জন্য দরিদ্র লোক এবং শ্রমজীবিরা তাহা রাখিতে পারে না। বড় বড় নখ থাকিলেই বুঝা যায় যে, তাহারা ভদ্র লোক এবং কোন হীন কাজ করে না। আমাদের দেশে ও মাঝে মাঝে লোকে তারকেশ্বরের কিম্বা অন্য কোন দেবতার নামে নখ ও চুল মানস করে। বড় বড় নখ রাখিলে হয়ত হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এবং তাহা হইলে বড় কষ্ট পাওয়া যায়; চীনেরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নখের দুই পার্শ্বে দুই খণ্ড বাঁসের বাখারি দিয়া বাঁধিয়া রাখে।

ইহা অপেক্ষা আর একটী প্রথা অতিশয় কষ্টদায়ক। তোমরা হয়ত শুনিয়াছ চীনেদের মেয়েদের পা অতিশয় ছোট। তাহাদের ছোট পা সৌন্দর্য্যের প্রধান চিহ্ন বলিয়া মনে করা হয়। সকল দেশেই এ রকম কোন না কোন কুসংস্কার আছে। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা কোমর সরু করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে। আমাদের দেশেও যে মেয়েদের মধ্যে দুই একটি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার নিয়ম নাই তাহা নহে। তবে চীন দেশীয়দের এইরূপে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অনেক আড়ম্বর করিতে হয়। কিরূপে তাহারা পা ছোট করে তাহা শুনিতে অতি অদ্ভুত। যখন মেয়েদের তিন চারি কিম্বা পাঁচ বৎসর বয়স হয় তখন এই মহৎ ব্যাপারের

অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই ব্যাপার শেষ হইতে প্রায় দুই তিন বৎসর সময় লাগে এবং সেই সমস্ত সময় সুন্দরীরা অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। পা বাঁধিবার জন্য চীন দেশে এক-রকম সাদা রাঙা ব্যাণ্ডেজ (পুলটিস) কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ দুই ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ৮ হাত লম্বা। ইহা দ্বারা পা বাঁধিবার পূর্ব্বে ফিটকিরির গুড়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়, কারণ তাহা হইলে পরে কোন রূপ ফোঁড়া কিংবা ঘা হইতে পারে না। পা এত শক্ত করিয়া বাঁধা হয় যে প্রায় একখানা পাকে মাঝখানে ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ করা হয়। ইহাতে রক্তের চলাচল বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং পা আর বড় হইতে পারে না। ইহাতে কি কষ্ট হয় তাহা একবার অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়; কিন্তু তবু সুন্দরী হইবার এত প্রবল ইচ্ছা যে চীনের বালিকারা ইহা অম্লান বদনে সহ্য করে।

এইরূপ প্রায় একমাস কাল পা বাঁধা থাকে। একমাস পরে এইরূপ বাঁধা পা দুইখানাকে খুব গরম জলে অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখা হয়। তখন পুলটিসটি আস্তে আস্তে খুলিয়া ফেলিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পায়ের এক পরদা মরাচাম উঠিয়া যায়। এই সময়ে কাহারো কাহারো পায়ের তলায় কতকগুলি মাংস অথবা দুই তিনটি আঙ্গুল ও খসিয়া পড়ে।

যখন পা জলে ভিজিয়া যায় তখন বেশ করিয়া পুছিয়া ফেলা হয়। তাহার পর আবার কিছু ফিটকিরির গুড়া ছড়াইয়া ৫ ফুট লম্বা নূতন এক পুলটিস দ্বারা পা বাঁধা হয়। এবারকার বাঁধা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক শক্ত হয়। ইহার পর স্ত্রীলোকেরা মাসে একবারের অধিক পা খুলে না। পা খুলিলে আর তাহারা হাটিতে পারে না এবং ভয়ানক যন্ত্রণা হয়।

যখন প্রথম এইরূপে পা ছোট করিবার জন্য ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা হয় তখন প্রথম প্রথম তিন চারি মাস ভয়ানক যন্ত্রণা থাকে। কেহ কেহ বা এক বৎসর কালও এই যন্ত্রণা ভোগ করে। সারাদিন রাত্রিতে একটুও শান্তি নাই, যেন কেহ ছুঁচ বিঁধাইয়া দিতেছে। এইরূপে ক্রমে যখন পা অবশ হইয়া যায়, তখন আর কিছু বোধ হয় না। কিন্তু উহা চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য ও কদাকার হইয়া থাকে। তোমরা হয়ত মনে করিতে পার যে চীনের বালিকারা এই ভয়ানক কার্য্য করিতে ভীত হয় কিন্তু তাহা নহে; আমাদের দেশে যেমন অলঙ্কার পরিবার সাধে মেয়েরা অক্লেশে নাক ও কাণ বিঁধাইতে পারে সেখানেও মেয়েরা সুন্দরী হইবার অভিলাষে নিজেরাই পায়ের ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া থাকে।

এইরূপ ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা পা যেমন অকর্ম্মণ্য হয় তেমনই কদাকার হয়। যে বালিকার চিত্র দেওয়া হইতেছে তাহার পায়ের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। চীনের খ্রীষ্টান পাদরীরা এই কুপ্রথা উঠাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু বড় কৃতকার্য্য হন নাই, কারণ চীনদিগকে একথা বলিলে তাহারাও বলে "কেন বাপু, তোমাদের মেয়েরাও ত কোমর সরু করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করে; তবে আর আমাদের দোষ কি?" পাদরী সাহেবেরা তখন মুখ ফিরাইয়া ঘরে আসেন। নিজের দোষ থাকিলে পরের দোষ সংশোধন করা বড়ই কঠিন। একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। অতএব যাহারা জীবনে কোন সৎ-

কার্য্য করিতে চাহে তাহাদের বাল্যকাল হইতেই আপনাদিগের সৎপথে চালাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

চীন দেশের বালক এবং পুরুষেরা সকলেই পশ্চাতে একটী বেণী মাত্র রাখিয়া মাথার আর সমুদয় চুল ফেলিয়া দেয়। তাহারা দাড়ি গোঁফ ও প্রায় রাখে না। তবে কোন কোন স্থানের লোকেরা চল্লিশ বৎসর পরে গোঁফ ও ষাটি বৎসরের পর দাড়ি রাখিয়া থাকে। সকলেই এক একটী বেণী রাখিয়া থাকে। যখন চীনেরা মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য শোক প্রকাশ করে তখন মস্তকের সকল স্থানেই চুল রাখিয়া থাকে।

বেণী কাটিয়া দেওয়া চীনদের মতে ভয়ানক অপমানের কথা। এই উপায়ে চোরদিগকে মধ্যে মধ্যে সাজা দেওয়া হয়। চীনদেশীয় কৃষক ও শ্রমজীবীরা যখন কাজ করিতে যায় তখন পাগড়ীর মত মাথার চারিদিগে বেণী বাঁধিয়া থাকে।

চীন দেশীয় স্ত্রীলোকেরা অতি আশ্চর্য্যরূপে চুল বাঁধিয়া থাকে। এক এক জনের চুল বাঁধিতে দুই চারি ঘণ্টার কমে হয় না। ইংরেজেরা চুল ঠিক রাখিবার জন্য পোমেটাম ব্যবহার করে, আমাদের মেয়েরা পোমেটামের কথা শুনিবার আগে মোম ব্যবহার করিতেন এখনও হয় ত পাড়াগাঁয়ে কেহ কেহ সেই পূর্ব্ব প্রকারের অনুসরণ করিয়া থাকেন। চীন দেশীয় স্ত্রীলোকেরা এক রকম গাছের আটা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা তাঁহারা নানা সময়ে চুলের নানা রকম আকৃতি করিয়া থাকে। কখনও ফুলদান কখনও বা পাখীর মত এবং কখনও বা অন্য কোন রকমের আকৃতি করিয়া চুল বাঁধা হয়।

ইহারা সুন্দর দেখাইবার জন্য মুখ সাদা ও লাল রঙে চিত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে বরং আরও বিশ্রী দেখায়। সুন্দর দেখাইবার ইচ্ছা সকলেরই আছে, কিন্তু সে ইচ্ছা যখন অস্বাভাবিক হয় তখন লোককে সুন্দর না করিয়া

বরং কুৎসিত করে। ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, প্রকৃতির যাহা নিয়ম তাহা অতিক্রম করিলেই লোক অস্বাভাবিক ও কুৎসিত হইয়া পড়ে। চীনেরা যদি অস্বাভাবিক উপায়ে পা ছোট না করিত এবং মুখ চিত্রিত না করিত তবে তাহাদিগকে সুন্দর দেখা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের অতি সুন্দর হইবার ইচ্ছাই তাহাদিগকে অতিশয় কুৎসিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে কি আমাদের কিছু শিক্ষা করিবার নাই?

অতি লোভের শাস্তি।

(সত্য ঘটনা।)

কলিকাতার পনর ষোল ক্রোশ দূরে কোন পল্লীগ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের বিদ্যাসাধ্য কিছুই ছিল না কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াতে ছেলেপিলে অনেক গুলি হইয়াছিল। সন্তানগুলি সকলেই বুদ্ধিমান কিন্তু ব্রাহ্মণের এমন ক্ষমতা ছিল না যে কোনটিকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা দেন; ভাত যুটে ত কাপড় যুটেনা এই প্রকার অবস্থা। বড় ছেলেটি ১৩। ১৪ বৎসরের ছেলে হইয়া উঠিল তথাপি পড়াশুনার কোন বন্দোবস্ত হইল না। অমূল্য সময় বৃথা বহিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেটী এক এক বার একখানি সংস্কৃত পুথী হাতে করিয়া এক একবার ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাটিতে গিয়া বসিত আর অধিকাংশ সময় ঘুড়ি উড়াইয়া, মাছ ধরিয়া, পাখীর ছানা চুরি করিয়াও গৃহস্থের গাছের ফল পাকড় পাড়িয়া বেড়াইত। যতই বয়স বাড়িতে লাগিল ছেলেটীর লেখাপড়া শিখিবার বাসনা ততই প্রবল হইতে লাগিল। সে চাহিয়া চিন্তিয়া কয়েকখানি পুস্তক সংগ্রহ করিল, তাহা লইয়া স্কুলের বালকদিগের নিকট গিয়া পড়া বলিয়া আনিত ও যথাসাধ্য শিখিবার চেষ্টা করিত।

ঐ দরিদ্র বালকটীর একজন আত্মীয় ব্রাহ্মণের কলিকাতার দক্ষিণ বর্ত্তী ভবানীপুর নামক স্থানে একখানি টোল চতুষ্পাটী ছিল। তিনি বালকটীর শিক্ষার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া তাহাকে নিজ টোলে যায়গা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বালকটী ভবানীপুরে আসিল। তখন কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানদিগকে ১৲টাকার অধিক বেতন দিতে হইত না। একজন দয়ালু লোক মাহিনার টাকাটী দিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন বালক আনন্দের সহিত কলেজে ভর্ত্তি হইল। কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ ভবানীপুর হইতে ২॥ ক্রোশ তিন ক্রোশের কম হইবে না। বালকটী প্রত্যহ এই পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইত ও অপরাহ্নে আবার হাটিয়া আসিত। ইহা ভিন্ন তাহাকে আশ্রয়দাতার সাহায্যের জন্য তাহার জজমান বাড়ীতে নিত্য পূজা করিতে হইত ও রাত্রে ঠাকুরদের আরতি করিতে হইত। ইহাতে সেই বালকের এত সময় যাইত যে, সে আর দুবেলা আহার করিবার সময় পাইত না; রাত্রে একবার রাঁধিত প্রাতে সেই পান্তভাত খাইয়া স্কুলে যাইত। এইরূপ নিত্যই যাইত।

এইরূপ কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে একজন আত্মীয় লোক দয়া করিয়া কলিকাতার বাসায় তাহাকে স্থান দিতে সম্মত হইলেন। বালকের দুঃখ ঘুচিল। সে কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা

করিতে লাগিল। কিন্তু ওদিকে তাহার আরও অনেকগুলি ভাই ভগিনী জন্মিয়াছে এবং ভাই গুলি বড় হইতেছে। বেচারাকে জনক জননীর সাহায্যের জন্য প্রাইভেট পড়াইয়া কিছু কিছু টাকা বাড়ীতে পাঠাইতে হইত; সমুদায় সময় পড়াতে মন দিতে পারিত না। এইরূপ করিয়া অতি কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। তখন সংস্কৃত কালেজের যে শ্রেণীতে উঠিলে বৃত্তির পরীক্ষা হইত সে অনেক কষ্টে সেই শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিল। ভাবিয়াছিল যে সেই শ্রেণীতে একটি বৃত্তি পাইবে তাহা হইলে আর তাহার পড়ার বিঘ্ন ঘটিবে না। পড়া শুনাও চলিবে এবং পিতা মাতাকেও কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পরীক্ষাতে সে কৃত কার্য্য হইতে পারিল না। ওদিকে পিতা মাতা তাহারও বিবাহ দিয়াছেন এবং একটি সন্তানও জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া এই বয়সেই লেখা পড়া সাঙ্গ করিতে হইল।

ক্রমশঃ

নববর্ষের সঙ্গীত।

(১)

বরষে বরষে দিবসে দিবসে
নিমেষে নিমেষে সময় যায়;
তাহার তরঙ্গে নানা রঙ্গ ভঙ্গে
জীবন প্রবাহ ছুটিয়া ধায়।

(২)

কোথায় কে ছিল কোথায় আসিল
কিছুই বুঝিতে পারি না ভাই;
সময়ের গতি, সুগভীর অতি
ধরিতে ছুঁইতে নাহিক পাই।

(৩)

অজ্ঞান আঁধার রাখি সবাকার
জগতের পতি করুণাময়;
করেন পালন মায়ের মতন
জীবনে মরণে তাঁহারি জয়।

(৪)

প্রকৃতির মাঝে নব নব সাজে
দেন দেখা তিনি মানব গণে;
যেন বাজীকর বহু গুণাকর
করেন বিহার আনন্দ মনে।

(৫)

নূতন বরষে নূতন হরষে
নবীন বালক বালিকা সবে;
সেই জননীরে, চারি দিকে ঘিরে
কর জয় গান মধুর রবে।

(৬)

ঐ দেখ কত ফল ভরে নত
নবপল্লবিত পাদপরাজী;
নমিছে ঈশ্বরে সমীরণ-ভরে
নবীন কুসুম ভূষণে সাজি।

(৭)

মলয় বাতাসে সুনীল আকাশে
ভাসিছে নবীন নীরদ রাশি;
তরু কুঞ্জবনে মা বাপের সনে
নবজাত পাখী বসিল আসি।

(৮)

যাঁহার কৃপায় মৃত প্রাণ পায়,
সাজে সবে নিত্য নবীন বেশে;
তিনি চির নব প্রেমরসার্ণব,
তাঁহার বিভব দেখ হে এসে।
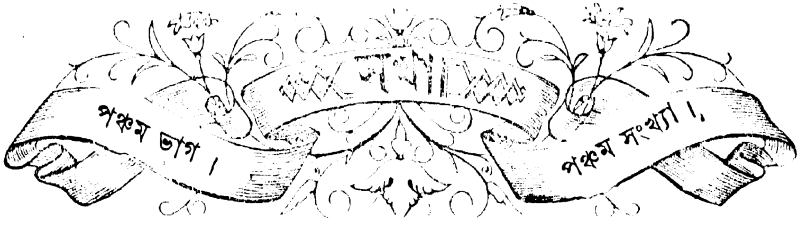
মে, ১৮৮৭।

পাখীদের দেশ ভ্রমণ।

আমার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি কখন লক্ষ্য করিয়াছ যে, শীত ও বসন্ত কালে এমন কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি গ্রীষ্মকালে আর দেখা যায় না? বৈশাখ মাস শেষ হইয়াছে, এখন আর বাড়ির উঠানে, প্রশস্ত রাস্তার মাঝখানে খঞ্জন পাখী নেচে নেচে বেড়ায় না। আঁব, কাঁটালের বাগানে, ঝোঁপে, জঙ্গলে আর হুদ্‌হুদ, কচ্ কচে প্রভৃতি পাখীর ডাক শুনিতে পাওয়া যায় না। মাঠে, ঘাটে, কিম্বা ধান্যক্ষেত্রে নানা বর্ণের নানা প্রকার হাঁস, টিল্, মুনিয়া প্রভৃতি পাখী সকল মনের সুখে আর চরিয়া বেড়ায় না। বসন্ত কাল অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও কোকিল ও পাপিয়ার মিষ্ট রব এক আধ বার শুনিতে পাওয়া যায়, কিছু দিন পরে আর তাহাদের গান শুনিতে পাইব না। কলিকাতা এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে এখন ঝাঁকে ঝাঁকে চিল দেখা যায় কিন্তু বর্ষা আসিলে উহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, তখন দুই একটা এখানে ওখানে দেখা যাইবে মাত্র। কলিকাতায় আজ কা'ল হাড়গিলা পাখী একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আর কিছুদিন পরে অনেক আসিয়া উপস্থিত হইবে। খঞ্জন, হাঁস, প্রভৃতি পক্ষীরা এখন কোথায় গিয়াছে? চিলেরা কোথায় যাইবে? ইহারা কেনই বা যায় আর কেনই বা আসে, এই সকল বিষয় তোমরা কি কখন অনুসন্ধান করিয়া থাক?

তোমরা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছ যে, আমাদের দেশের বড় লাট, ছোট লাট প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ শীতের কয়েক মাস মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলেই শিমলা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া থাকেন এবং গ্রীষ্মের কয়েক মাস সেই স্থানেই বাস করেন। শীত আসিতে না আসিতে আবার এদেশে ফিরিয়া আসেন। কি জন্য তাঁহারা পাহাড়ে যান তা তোমাদের মত বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী পাঠক পাঠিকাকে বলিয়া দিতে হইবে না। তাঁহারা শীত প্রধান দেশের লোক, একেত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাকাই তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর, তাহাতে আবার গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে তাঁহাদের পক্ষে এদেশে বাস করা আরও কষ্টকর, এমন কি অসাধ্য হইয়া উঠে। কাযে কাযেই তাঁহারা গ্রীষ্মকালটা এমন কোন স্থানে বাস করেন যেখানকার জল বায়ু অনেক অংশে তাঁহাদের স্বদেশের জল বায়ুর মত। এই সকল বড়

বড় কর্ম্মচারীদিগের যথেষ্ট সুবিধা আছে বলিয়াই তাঁহারা কখন পর্ব্বতে কখন এদেশে বাস করিতে পারেন। যখন আমরা গ্রীষ্মের জ্বালায় ছট্ ফট্ করি তখন কি আমাদের কোন শীতল স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা হয় না? পৌষ, মাঘ মাসের শীতে শরীর যখন কাঁপিতে থাকে তখন কি আমরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না? আমাদিগের ইচ্ছা হইলেও সুবিধা নাই, কাযেই শীত ও গ্রীষ্মে কষ্ট পাইলেও তাহা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু পক্ষীরা ত আমাদের মত নয়, তাহারা স্বাধীন, তাহাদিগের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সুবিধাও যথেষ্ট, এক দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে যাওয়াও তাহাদিগের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। আমরা শীতকালে যে সকল পক্ষী দেখিতে পাইতাম আর এখন তাহাদিগকে দেখিতে পাই না—তাহারা সকলেই বেশী গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারে না বলিয়া শীত প্রধান দেশে চলিয়া গিয়াছে।

এখন তাহারা যেখানে বাস করিতেছে সেখানে শীত বেশী হইলেই আবার এদেশে ফিরিয়া আসিবে। কেবল যে শীত ও গ্রীষ্মের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই পক্ষীরা এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়ায় তা নয়, আহার অন্বেষণের নিমিত্তও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে এক দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যাইতে হয়। আহার খুঁজিয়া বেড়ান প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব। অতি প্রাচীন কালে যখন সমস্ত মানবজাতি অসভ্য ছিল, কাহারো ঘর দুয়ার ছিল না, তখন মানুষেও আহারের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইত। এখনও মধ্যআসিয়া নিবাসী অসভ্য জাতিরা তাহাই করিয়া থাকে। যখন দেখে যে, বাসস্থানের নিকট আর বড় একটা আহারোপযোগী বন্য পশু পাওয়া যায় না তখন অন্য এমন কোন স্থানে চলিয়া যায় যেখানে অন্ততঃ কিছু দিন আহারের ব্যাপারটা ভাল চলে। কিন্তু মানুষ বল, আর পশু বল, ইহাদের চলা ফেরার সুবিধা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। যাইবার রাস্তায় যদি একটি বৃহৎ নদী পড়িল তাহা হইলে মানুষের নৌকা চাই, না হইলে মানুষ আর এক পা চলিতে পারেন না, একটি উচ্চ পাহাড় সম্মুখে থাকিলে সেটি আর অতিক্রম করিবার যো নাই। অন্যান্য চতুষ্পদ পশুদিগের পক্ষেও তাই। হয় তো এক স্থানে শীত ও বাতাসে কষ্ট পাইতেছে, বরফ পড়িয়া সমস্ত প্রদেশ ঢাকিয়া গিয়াছে, একটি তৃণ নাই যে আহার করে, একশত ক্রোশ রাস্তা চলিয়া গেলেই সমস্ত কষ্ট দূর হয়, শীত ও বাতাস হইতে বাঁচে, যথেষ্ট আহার পায়, কিন্তু যাইবার যো নাই, সম্মুখে হয় তো একটি সমুদ্রের খাড়ি, কিম্বা একটি পাহাড়, পশু ভায়ার সাধ্য নাই যে, এ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যান। পক্ষীরা কিন্তু এ সকল বাধা বিপত্তি কিছুই মানে না, তাহাদের আবশ্যক হইলেই তাহারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিয়া যাইতে পারে। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, হিমালয়ের মত উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিয়াও অনেক পক্ষী বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই বার আসা যাওয়া করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হাঁস, টিল প্রভৃতি জলচর পক্ষী আর মাঠে, ঘাটে, ধান্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। একবারেই যে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা বলিতে পারি না; দুই একটি স্থান বিশেষে থাকিতেও পারে, কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে আর দেখা যায় না। সখার পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকে হয় ত শীতের

ছুটিতে বাড়ী যাইবার সময় নদীর বালুকাময় চড়ায় নানা বর্ণের হাজার হাজার হাঁস বসিয়া থাকিতে দেখিয়া থাকিবেন। কতকগুলি হাঁস এক পা গুটাইয়া এক পায়ের উপর ভর দিয়া মাথাটি ডানাতে লুকাইয়া সুখে ঘুমাইতেছে; আবার কতগুলি ঐ বালুকাময় তটের নিকট নদীর নির্ম্মল জলে কেমন সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে কি সুন্দর! কি আমোদজনক! কিন্তু এবার গ্রীষ্মের ছুটির সময় কি হাঁসের ঝাঁক দেখিতে পাইয়াছিলে? নিশ্চয় দেখিতে পাওনি। আর কেমন করেই বা দেখিতে পাইবে, তারা কি আর এ দেশে আছে! এখন তাহারা মধ্য আসিয়ার নানা প্রদেশের নদী, হ্রদ, তড়াগে মনের সুখে বিচরণ করিতেছে। কোন কোন জাতীয় হাঁস আবার সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত গিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করিতেছে, বাসা নির্ম্মাণ হইলেই ডিম পাড়িবে। আবার শীত পড়িলেই ছানা গুলিকে সঙ্গে লইয়া এদেশে চলিয়া আসিবে।

অক্টোবর মাস আরম্ভ হইতে হইতেই মধ্য আসিয়ার মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত শীত পড়িতে থাকে, হাঁস প্রভৃতি জলচর পক্ষী সকল তখন ঐ প্রদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করে। ঐ সকল প্রদেশে এখন যত হাঁস বাস করিতেছে সবগুলিই যে এক দিনে চলিয়া আসে তাহা নয়। ক্রমে শীত ও যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে হাঁসেরাও তেমনি দলে দলে চলিয়া আসে। নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে যখন নদ, নদী, হ্রদ প্রভৃতি বরফে ঢাকিয়া যায় তখন আর একটি হাঁসও সেখানে থাকে না। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে আবার গিয়া জমা হয়। কর্ণেল প্রেজ ভ্লাস্কি নামক রুস দেশীয় একজন বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ মধ্য আসিয়ার অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আপনার চোখে হাঁস জাতির গতি বিধি ও স্বভাব বেশ করিয়া দেখিয়াছেন।

হাঁসেরা যখন হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহারা প্রথমতঃ হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীত প্রধান প্রদেশে সকলে বাস করে; ক্রমে যত শীত বেশী হয় তত বাঙ্গলা প্রভৃতি নিম্ন দেশে চলিয়া আসে। ইহারা আপন আপন বাসস্থান বেশ মনে করিয়া রাখিতে পারে, এবং প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা দল ছাড়া থাকে না। একটি হাঁসকে কিন্তু আশ্চর্য্য রকম দল ছাড়া হইতে দেখা গিয়াছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নানা জাতীয় অনেকগুলি হাঁস আলিপুর পশুশালার ঝিলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কয়েক দিন পরে তিন চারিটি হাঁস বড় ঝিল ত্যাগ করিয়া গণ্ডারের পুষ্করিণীতে গিয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন এইখানে থাকিয়া হাঁস কয়েকটি কোথায় চলিয়া গেল কেহ খোজ খবর করিল না। ১৮৭৮সালে ডিসেম্বর মাসের প্রথম গণ্ডারের পুষ্করিণীতে একটি হাঁস খেলিয়া বেড়াইতে দেখা গেল, দেখিয়া বোধ হইল যে, যে কয়েকটি হাঁস চলিয়া গিয়াছিল এটি তাহাদের মধ্যের একটি, তৎকালে কিন্তু উহা বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করিল না, কারণ, আবার মার্চ্চ মাস আসিতে না আসিতেই হাঁসটি কোথায় অদৃশ্য হইল। পরবৎসর ২৭সে নবেম্বর পুনরায় ঐ হাঁসটি আসিয়া উপস্থিত। এইরূপ পাঁচ বৎসর কাল হাঁসটি শীতের সময় আসিত এবং গ্রীষ্ম কালে চলিয়া যাইত। বিগত তিন বৎসর হইল হাঁসটিকে আর দেখা যায় না। হয় তো কোন নিষ্ঠুর শিকারীর হাতে প্রাণ হারাইয়াছে কিম্বা কোন দলে মিশিয়া গিয়াছে

হাঁসটির কেমন স্মরণ শক্তি এবং স্থান বিশেষের প্রতি ভালবাসা! হাঁসেরা যখন হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম কোণস্থিত গিরিশঙ্কট পার হইয়া যাওয়া আসা করে তখন কত শত হাঁস শীতে মরিয়া যায়।

পক্ষীদিগের স্থান পরিবর্ত্তনের বিষয় আরও অনেক বলিবার রহিল, আগামী বারে বলা যাইবে।
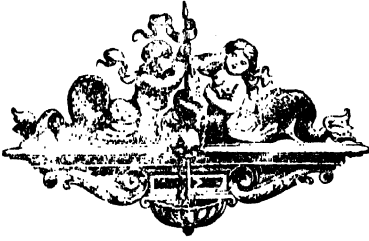
পিপীলিকার উপদেশ।

যখন পিঁপড়ার বাড়ী আসিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। সেখানে যাইবামাত্রই বড় এক মজার যুদ্ধ দেখিলাম। একটা ক্ষুদ্র গুবরে পোকার সহিত বার তেরটা পিঁপড়ার যুদ্ধ বাধিয়াছে। বেচারা গুবরে পোকা একলা, তথাপি সে নির্ভয়ে অতি বীরত্বের সহিত বার তেরটা পিঁপড়ার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। আমি নিতান্ত উৎসুক-চিত্তে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল; অবশেষে গুবরে পোকারই জয় হইল, তাহার বীরত্বে চমৎকৃত হইয়া আমি করতালী দিয়া 'সাবাস সাবাস' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তাহার পর বাড়ীর ভিতর গিয়া আহারাদির পর কিছু ক্ষণ আমার বন্ধুর সহিত গল্প করিতে করিতে শরীরের ক্লান্তি প্রযুক্ত শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

রাতটা বেশ নির্বিঘ্নে কাটিয়াছিল, সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই; ভোর হইবামাত্র আমার বন্ধু আসিয়া আমাকে জাগাইল। এবং আমার খাবার জন্য এক টুকরা মিছরি লইয়া আসিল। আমার আহার সমাপ্ত হইলে পর পিঁপড়ে কিছু গম্ভীর ভাবে আমাকে বলিল, "ভাই আমি তোমাকে একটা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমাদের দলের লোকের সহিত গুবরে পোকার যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহাতে আমাদের দলের লোক হারিয়া যায় সেই জন্য তুমি গুবরে

পোকাকে 'সাবাস' বলিয়াছিলে, তাহাতে আমাদের উদ্ধত স্বভাব কতিপয় যুবক বড় চটিয়াছিল, দেখ আমাদের ছোঁড়ারা বড় গোঁয়ার, তাদের অগ্রপশ্চাৎ কোন বিবেচনা নাই, আর বড় অভিমানী, তাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, অনর্থক ঝগড়া বাধাইয়া কায কি?" আমার তখন মাকড়সার কথাগুলি সব মনে পড়িতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিলাম পরের ধানে মই দিতে যাওয়া বড়ই অন্যায়। আমার বন্ধুকে বলিলাম "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অতি সাবধানে তোমার ভাতৃবর্গের সহিত ব্যবহার করিব।" তাহার পর আমরা দুজনে পিঁপড়ের দেশ দেখিতে লাগিলাম, তাহাদের বাড়ী ঘর দুয়ার রাস্তা নগর সমস্তই দেখিতে লাগিলাম। ইহাদের নগরটী প্রকাণ্ড এক গাছের গুঁড়ির পাশে; অর্দ্ধেক মাটীর উপরে অর্দ্ধেক মাটির ভিতরে। ইহাদের রাস্তাগুলি মাটিতে সুড়ঙ্গ করা, ঘরগুলিও মাটি খুদিয়া তৈয়ার করা। মাটির উপরের অংশটী পিঁপড়েদের খুব পরিশ্রমের পরিচয় দেয়। মাটি দিয়া কেমন ছাত তৈয়ার করিয়াছে, ছোট ছোট খড় কুটা ও মাটি দিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ছোট ছোট ঘর করিয়াছে, সেগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনই পরিষ্কার!

পিঁপড়ে বলিতে লাগিল "আমাদের এ নগর অতি প্রাচীন। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য যে কবে আরম্ভ হয় তাহা ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহই বলিতে পারে না ইহা কত দিনকার। তবে আমাদের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপারের নির্দ্দেশ আছে। আমাদের দেশে কত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কত হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। আমরা যুদ্ধে কত বন্দী আনিয়াছি। সন্ধি বিগ্রহ যে কত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। আমার মনে আছে এবং এই কথা আমরা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি যে, একদিন আবাল বৃদ্ধ সকলেই মহাভীত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্যাপারটা এই যে, আমাদের দেশে ভয়ানক ভূমি কম্প উপস্থিত হইল, সমস্ত ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ছারখার হইয়া গেল, কত লোক চাপা পড়িয়া মরিল, আমাদের শিশু সন্তান কত হারাইল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সাহসী ছিলেন তাঁহারা বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড অসুর, লম্বায় দশ বার হাজার হাত, চওড়ায় দু তিন হাজার হাত, দুটা হাত ও দুটা পা, আসিয়া আমাদের নগরের অর্দ্ধেক উপড়াইয়া লইয়া গেল, তাহারই জন্য এত কাণ্ড হইয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর ঠিক হইল যে সেই শত্রুটা মানুষ বলিয়া যে একদল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসুর আছে তাহারই একটা। ইহারা আমাদের শাবক চুরি করিতে আইসে, ইহারা শালিক ময়না বুলবুলী পোষে: তাহাদিগকে সেইগুলি খাইতে দেয়। আর মাছ ধরিবার সময়ে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা ধরিয়া তাহা দিয়া টোপ তৈয়ার করে। এই নিষ্ঠুর পাষণ্ডদের কিছুমাত্র মায়া দয়া নাই, আবার এই অসুরেরা সকলের প্রভু হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া যাঁক করিয়া বেড়ায়। কেউত আর বলবার নাই, গায়ে জোর বেশী, যা খুসী তাই করে। কিন্তু ভাই, আমরা দলে বেশী, আমরাও সময়ে সময়ে তাদের বড় জব্দ করিয়া থাকি।" আমি বলিলাম "ওদের জবরদস্তির কথা আর বলিও না। আমরা ফড়িং আমাদেরও ঐ রকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, আর তাদের পোষা পাখিদের খাইতে দেয়। আমার ভাই, একদল মাসতুত ভাই আছে, তাদের কাছে ভায়ারা বড়

থাকেন, তখন ইহাদের সব বীরত্ব ও চালাকি বাহির হইয়া যায়। আমার মাসতুত ভাইরা পঙ্গপাল, তাহারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া ওদের দেশে শস্য ক্ষেত্রে পড়ে, সেই বার ভায়ারা না খাইয়া মরেন, তাহাদের গায় পড়িলে ছটপট করিয়া মরেন, তখন আর ঘরের বাহিরে আসিতে সাহস হয় না, তাদের গরু বাছুর ঘোড়া সবই পঙ্গপালের জ্বালায় ছট ফটিয়া মরে।"

এই রকম কথা বার্ত্তার পর আমি কতকগুলি নূতন নূতন পোকার বাড়ী দেখিতে পাইলাম। এক রকম শুঁয়োপোকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম একি ভাই। পিঁপড়ে বলিল "ওরা অনেক এখানে আছে। আমরা ওদের কিছু বলি না, আমাদের বাপ দাদারাও কিছু বলিতেন না, তাঁহারা আরও যত্ন করিতেন। আমাদের ছোট ছোট শিশুরা খোসা বদলায়, ইহারা সেইগুলি খায়। আমাদের অন্যান্য যত ময়লা আবর্জ্জনা থাকে ইহারা তাহা খাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। ইহারা আমাদের বড় উপকারে আসে। ইহারা না থাকিলে আমাদের বড় কষ্ট হইত। সেই জন্য আমরা ইহাদের ঘর বাড়ী দিয়াছি ও যত্ন করিয়া থাকি।"

তারপর একটা ছোট হল্‌দে রঙ্গের গুবরে পোকার মত একটা পোকা দেখিয়া বলিলাম "একি ভাই!" পিঁপড়া বলিল "ওদের আমরা পুষিয়াছি। ওরা আমাদের গরু। ওরা দুধ দেয়। ওরা কেমন মধুর মত একরকম রস বের করে তা খাইতে বড়ই উপাদেয়। আমরা ইহাদের বড় যত্ন করি ও ভাল ভাল খাবার দি। আমাদের গোয়াল ঘরে আর এক রকমের গরু আছে, চল দেখবে চল।" গিয়া দেখি ছিম্ গাছে বেগুন গাছে ও অন্যান্য গাছে যে ছোট ছোট উকুনের মত পোকা থাকে তাই অনেক আছে।

পিঁপড়ে বলিল, "আমরা যখনই ইহাদের গাছের উপর দেখিতে পাই তখনই শুঁড় দিয়া ইহাদের ল্যাজের উপর সুড় সুড়ি দি আর অমনি ওরা কোন উচ্চ বাচ্য না করিয়া এক রকম রস বাহির করে, আমরা তাহা পান করিতে বড়ই ভালবাসি। তাই আমাদের ছেলেরা, ইহারা পোষ মানে কি না তাই পরীক্ষা করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছিল, এখন ইহারা বেশ পোষ মানিয়াছে এবং আমাদের ইচ্ছামত সুড় সুড়ি দিলেই সেই রস নির্গত করিয়া দেয়। ইহাদের ধরিয়া আনিয়াছি, এখানে আসিয়া ইহারা কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট নহে, কারণ আমরা ইহাদের সহিত কোন অসদব্যবহার করি না। তবে ইহাদের পোষা কিছু কষ্টকর, ইহারা গাছের রস ভিন্ন আর কিছুই খায় না, আমাদের এদেশে গাছ নাই তবে আমরা গাছ রোপনের চেষ্টায় আছি।"

পিঁপড়ের গোয়াল ঘরে এই রকমের সব গরু দেখিলাম।

ক্রমশঃ।

অতি লোভের শাস্তি।

৬৪ পৃষ্ঠার পর।

বিদ্যালয় ছাড়িয়া সে কলিকাতাতেই ১৫৲ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম পাইল। সে আয়ে তাহার যদিও এক প্রকার কুলাইতে পারিত কিন্তু অসময়ে লেখা পড়া ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহার মনে বড় ক্ষোভ হইল; সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে তাহার ত লেখা পড়া হইলই, না, ভাইগুলিকে একবার মনের সাধে লেখা পড়া শিখাইবে। এই ভাবিয়া সে স্কুলের কর্ম্মের উপরে তিন চারিটী প্রাইভেট পড়ান যুটাইল। বাপ্‌রে সে কি ভয়ানক পরিশ্রম! অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ হাতে জল দিয়া পড়াইতে বাহির হয়। দুই জায়গায় পড়াইয়া ৯ টার সময় ফিরিয়া আসে, আসিয়া আহার করিয়া ১০টার সময় বিদ্যালয়ে যায়, আবার সেখান হইতে ৪টার পর বাহির হইয়া, দুই জায়গায় পড়াইয়া ৮৷৯টার সময় বাসাতে আসে। এইরূপে সে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিত। দুই তিনটী ভাইকে আনিয়া নিজের নিকট রাখিয়া অতি উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখাইতে লাগিল। ক্রমে বাড়ীর চেহারা ফিরিয়া গেল, জনক জননীর হাহাকার দৈন্য দশা ঘুচিয়া গেল। বধূর অঙ্গে দুই দশখান গহনা হইল। লোকে দেখিতে লাগিল যে, সে দিন দিন বেশ উন্নতি করিতেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রে সে ব্যক্তি পড়াইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া আহার করিতে যাইবে এমন সময়ে মাথা বেদনা করিতেছে বলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ভাইগুলি অনন্য গতি হইয়া তৎক্ষণাৎ পাল্‌কী করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন কলিকাতাতে যে দুই একজন ছিলেন সকলেই সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বড় বড় ডাক্তারেরা তাহার চৈতন্য করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই চৈতন্য হইল না। কয়েকদিন সেই অবস্থায় থাকিয়া তাহার মৃত্যু হইল। ডাক্তারেরা সকলেই বলিলেন যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য সে মারা পড়িল।

আমরা সকলে হায় হায় করিতে লাগিলাম। এত পরিশ্রম না করিলেও তার চলিত। বধূর অঙ্গে এত গহনা না হোক, পরিবারের সকলে সুখে খাইয়া পরিয়া থাকিতে পারিত। কিন্তু মানুষের যখন আশা বাড়ে তখন বাড়িতেই থাকে, অবশেষে অর্থ-লোভে মানুষ শরীরকে শরীর বলিয়া গণনা করে না, শ্রমকে শ্রম বলিয়া ভাবে না। তাহার শাস্তিও পায়। এ ব্যক্তি যদি এত অতিরিক্ত শ্রম না করিত, তাহা হইলে আরও কত দিন বাঁচিয়া পিতা মাতার সেবা করিতে পারিত, ও ভাইদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিত। তাহার কিছুই হইল না। তাহাদের যে দৈন্য দশা সেই দৈন্য দশাই রহিয়া গেল। ভাইগুলিকে পড়া ছাড়িয়া কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইল, এবং সমুদায় উন্নতির ব্যাঘাত হইয়া গেল। কোন প্রকারের লোভে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়।

প্রাপ্ত।

(বালকের রচনা।)

সাধুতার পুরস্কার।

বিনয়, নম্রতা, সত্য, বিশ্বাস, ন্যায়, ক্ষমা, পরোপকার প্রভৃতি গুণে যিনি অলঙ্কৃত, তাঁহাকে সাধু কহে। সাধুর ভাবকে সাধুতা ও তাহার পুরস্কারকে সাধুতার পুরস্কার কহে।

কি বালক, কি বালিকা, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সকলেরই ভাল বা সাধু হইবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু বহুবিধ কারণ প্রযুক্ত এইভাব কাহাতেও অধিক, কাহাতেও কম, তজ্জন্য অনেকেই ভাল বা সাধু হইতে পারেন না। আমরা যদি বাল্যকাল হইতেই সাধু সঙ্গে থাকি, সৎকথা শুনি, সচ্চিন্তা করি ও সাধুদিগের জীবন-চরিত পাঠ করি, এবং পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি সদাচরণ করি, ও তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে আমরাও সাধু হইতে পারিব। এবং সাধু হইলেই তাহার পুরস্কার আছে। আর যদি তাহা না করিয়া সর্ব্বদা খেলাইয়া বেড়াই, ও উন্নতির কথা ভুলিয়া গিয়া, বৃথা আমোদ, বৃথা গল্প করিয়া অমূল্য সময়কে নষ্ট করি, কুসঙ্গে বেড়াই, কুচিন্তা করি, তাহা হইলে ক্রমে সাধু না হইয়া সাধুর বিপরীত অসাধু হইব। আর আমাদের সাধু হইবার ইচ্ছাও কখন উন্নত হইবে না। সুতরাং আমাদিগকে দেখিলে সকলেই ঘৃণা করিবে; এমন কি আমাদের সহিত বাক্যালাপও করিবে না।

বিশ্বাস, সত্য, ন্যায় প্রভৃতি যাহা সাধুদিগের ভূষণ তাহাদেরই দুই একটীর পুরস্কারের বিষয় উল্লেখ করিব।

বিশ্বাস—আমাদের দেশের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যিনি প্রথমে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" আবিষ্কার করেন, যাঁহার জীবন-চরিত শুনিতে বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ভালবাসে, তিনি যখন উক্ত (ব্রাহ্ম) ধর্ম্ম আবিষ্কার করেন, ও শিক্ষিত লোকেরা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন মহা হুল স্থূল ঘটিল, একবারে চারিদিকে দ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইল, পুরাতন দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা ও প্রাচীনসংস্কারাপন্ন লোকেরা তাঁহার উপর কত অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল; এবং ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত কত বাধা দিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু পর্ব্বত যেমন সহস্র সহস্র তরঙ্গাঘাতেও বিচলিত হয় না, সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়ও আপনার বিশ্বাস হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি এইরূপ অনেক পরিশ্রম করিয়া কলিকাতায় প্রকাশ্যে একটী ঈশ্বরের উপাসনালয় স্থাপন করিয়া যান। অধুনা সেই "ব্রাহ্মসমাজ" নানা শাখা বিশাখায় বিস্তৃত হইয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের যশঃকীর্ত্তন করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা রামমোহন রায়ের সুমহৎ জীবনের পরিচয় দিতেছে। দেখ দেখি ভাই ভগিনী সকল, কেমন সাধুতার পুরস্কার হইল।

ন্যায় পরায়ণতা—সুবিখ্যাত মৃত রামদুলাল দে যিনি বাল্যকালে অন্নাভাবে কলিকাতায় মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া তাঁহারই আফিসে ১০৲ দশ টাকা বেতনে মুহুরি রূপে নিযুক্ত হন, তিনিই ন্যায় পরায়ণতার জন্য সময়ে কলিকাতায় একজন প্রভূত ধনশালী বলিয়া বিখ্যাত হয়েন।

কোনও সময় রাম দুলালের প্রভু তাঁহাকে কিছু টাকা দিয়া টালা কোম্পানির বাটীতে একটা

নির্দ্দিষ্ট নীলাম ক্রয় করিতে পাঠান। তাঁহার (রামদুলালের) আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই উক্ত নীলাম বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অবিলম্বেই শুনিলেন যে, একখানি জাহাজ নীলামে ধরা হইয়াছে। তিনি এই জাহাজ খানি কয়েক দিবস পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। এবং তাহাতে কত মূল্যের দ্রব্য আছে, কি রূপেই বা উদ্ধৃত হইতে পারে, তাহা একপ্রকার নিরূপণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে শুনিবা মাত্র তাঁহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট জাহাজ বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, যাহা তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অনেক অল্প মূল্যে ডাক হইতেছে; সুতরাং জাহাজ খানি ক্রয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার ডাক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায়, প্রভু মদনমোহনের নামে ১৪০০০৲ চৌদ্দ হাজার টাকায় ক্রয় করিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া তিনি নিকটস্থ অন্য কোনও গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এক সাহেব উক্ত বস্তু ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিলেন; এবং তাহা লইবার জন্য বাবু রামদুলালকে কত ভয় দেখাইলেন, ও কত গালি দিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভীত হইলেন না। অবশেষে তাঁহাকে বিক্রয় করিতে অনুরোধ করাতে বাবু রামদুলাল চৌদ্দ হাজারের উপর প্রায় একলক্ষ টাকা লাভ রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই লক্ষ টাকা মদনমোহনের প্রাপ্য, কিন্তু তিনি মনে করিলেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু লাভের টাকা লওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ প্রভুর বিনানুমতিতে এই কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে প্রভুর সমীপে গমন করিলেন। এবং সভয়ান্তঃকরণে বিনীত ভাবে যথাযথ সমুদয় বলিলেন; এবং স্বীয় দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া টাকাগুলি সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। মদনমোহন দত্ত মহাশয় বাবু রামদুলালের ন্যায়পরায়ণতা ও সরলতা দেখিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত লাভের সমস্ত টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিলেন। এই স্থান হইতেই বাবু রামদুলাল দের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইল। শুনা যায় যে, শেষে তিনি কোটী টাকা করিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের ত ইহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, মিথ্যা কথা, চুরি প্রভৃতি কদাচার কার্য্য না করিলে বাণিজ্য হয় না, তাঁহাদের বাবু রামদুলাল দে মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা উচিত। আইস ভাই ভগিনী সকল! আমরাও এখন হইতে সাধু হইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে বড় হইয়া সাধু হইতে পারিব।

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস, চন্দননগর।

ভরত-বিলাপ।

কৈকেয়ী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইয়া, ভরতকে মাতামহের ভবন হইতে আনাইল। ভরত রামের বনগমনের কথা কিছুই জানিতেন না। তিনি গৃহে আসিয়া রামের বন গমন সংবাদ ও পিতার মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। নিজ মাতা কৈকেয়ীকে অনেক তিরস্কার করিয়া তৎপরে মহারাণী কৌশল্যার নিকট গমন করিলেন। কৌশল্যার সহিত তাঁহার কিরূপ কথা বার্ত্তা হইয়াছিল তাহারই বিব

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ হইতে সহজ বাঙ্গলাতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। এবারে স্থানাভাবে কৌশল্যার সহিত সাক্ষাৎ করা পর্য্যন্ত দেওয়া গেল, ভরতের বিলাপ আগামী-বারে দেওয়া যাইবে।

ভরত চেতনা পেয়ে বহুক্ষণ পরে,
কাতরে বিলাপ করে, ভাসে নেত্র-ধারে।
কৈকেয়ী সমীপে বসি হেঁট-মুখ লাজে,
ভরত ভর্ৎসনা করে সভাজন মাঝে;—
"চাহি না এ রাজ্য-পদ, তোর কুমন্ত্রণা
করিনু প্রতিজ্ঞা আর কাণে লইব না।
রাম অভিষেকে পিতা করিলা বাসনা;
দূরে থেকে বার্ত্তা তার কিছুই জানিনা;
শত্রুঘ্ন ভেয়ের সনে থাকি দূরদেশে,
না জানি কেমনে রাম গেলা বনবাসে।
প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই, ঠাকুরাণী সীতা,
গেলা শূন্য করি ঘর, না জানি বারতা।"
ভরত কাঁদিয়া কহে কত আর্ত্তস্বরে!
শুনিয়া কৌশল্যা ডাকি কন সুমিত্রারে;—
"ওলো শোন্ ঘরে বুঝি আসিল ভরত,
শোন লো বিলাপ করি কাঁদিতেছে কত।
ভরত ধার্ম্মিক ধীর সাধু সদাশয়,
বারেক দেখিতে তারে ব্যাকুল হৃদয়।"
এত বলি রাম-মাতা, শোকেতে মলিনা,
শীর্ণ-দেহ, ম্লান-কান্তি, যেন দীন হীনা,
চলিতে শকতি নাই কাঁপে থর থর,
ভরত উদ্দেশে মাতা যান তার ঘর।
ওদিকে ভরত মায়ে নিন্দিয়া বিশেষ,
কৌশল্যা দর্শন আশে যান অবশেষ,
সঙ্গেতে শত্রুঘ্ন বীর; যায় দুই জনে;
পথেতে হইল দেখা কৌশল্যার সনে।
অমনি হারায়ে জ্ঞান পড়িলা জননী;
আলিঙ্গিয়া ধরি তোলে দুই নরমণি!
পাইয়া চেতন মাতা দেখে নেত্র-জলে
ভাসিছে দোঁহার মুখ; সম্বোধিয়া বলে;—
"রাজ্য যদি চাও বাপ ভুঞ্জ নিষ্কণ্টকে,
মা তোর কৌশলে রাজ্য ঘটাইল তোকে,
প্রাণের কুমারে মোর পাঠাইল বনে;
না জানি কি গুণ তাতে বুঝিল বা মনে।
বল্ বাপ মায়ে তোর, করুণা করিয়া
অভাগীকে সেই বনে দিক্ পাঠাইয়া।
তোরা থাক্ রাজ্যে বাপ, আমি অভাগিনী
বনে যাই, গেল যথা আমার বাছনি।
ধার্ম্মিক যশস্বী বীর আমার শ্রীরাম,
যাই তার পাশে, রাজ্যে নাহি মোর কাম।
দেও অনুমতি বাপ সুমিত্রারে লয়ে,
ছাড়িয়া এ রাজ্য-পদ যাই দূর হয়ে।
রাজার আদেশ আছে তর্পণ তাঁহার
করিতে পাবে না তুমি, নাহি অধিকার।
সেই অগ্নিহোত্র লয়ে পলাই দুজনে,
নিজে রেখে এস বাপ, সে ঘোর কাননে।
যেখানে প্রাণের রাম তপস্যাতে রত,
দিয়ে এস সেই স্থানে বাপরে ভরত।
সুবিস্তীর্ণ এই রাজ্য, হস্তি অশ্ব রথ,
ভুঞ্জ তুমি, কৈকেয়ীর পূর মনোরথ।"
ব্রণেতে ফুটালে সূচি যেমন যাতনা,
ভরত পাইলা প্রাণে তেমনি বেদনা।
হারায়ে চেতনা বীর কৌশল্যা চরণে
পড়ে গেল, দর দর ধারা দুনয়নে।
বহুক্ষণে পেয়ে জ্ঞান, উঠিয়া বসিল,
অঞ্জলি বাঁধিয়া মায়ে বলিতে লাগিল।
"মাগো আমি জ্ঞানে ধর্ম্মে কিছুই না জানি;
পোড়াও না বাক্যানলে আমারে জননি!

ক্রমশঃ।

এলিফাণ্টা গিরি-মন্দির।

সখার পাঠক পাঠিকা; তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, আমাদের এই দেশে দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ম্যাপ খুলিয়া তোমরা বেহার ও অযোধ্যার মধ্যে গোরকপুর নামে একটী নগর দেখিবে, তাহার কিয়দ্দূরে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কপিলাবস্তু নামে একটী বড় নগর ছিল। ঐ নগরে সেই সময়ে শুদ্ধোদন নামে শাক্য বংশীয় একজন রাজা রাজ্য করিতেন। মহাত্মা বুদ্ধ তাঁহার ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল গৌতম; পরে অলৌকিক জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়াতেই বুদ্ধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গৌতম বাল্যাবধিই ধর্ম্মানুরাগী ও চিন্তাশীল ছিলেন। রাজ সংসারের ধূম ধাম তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁহার পিতা তাঁহার মন ফিরা-ইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। অব-শেষে গৌতম রাজ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন। ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর তিনি এক নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দিন দিন তাঁহার দলে শত শত লোক যুটিতে লাগিল। ক্রমে বড় বড় রাজারা তাঁহার মতাবলম্বী হইল। বর্ত্ত-মান পাটনা নগর যেখানে দেখিতেছ, তখন ঐ স্থানে একটী রাজ-নগর ছিল। সেই নগরে অশোক নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি দেশ বিদেশে ধর্ম্ম-প্রচারক পাঠা-ইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ প্রচা-রকগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন কি ভারত-বর্ষ পার হইয়া সিংহল দ্বীপ ও পূর্ব্বে জাবা, জাপান, চীন প্রভৃতি স্থানেও গিয়া পড়িয়া-ছিলেন। অশোক রাজা আর একটী কার্য্য করিয়া-ছিলেন; তিনি অনেক পর্ব্বতের গুহার মধ্যে মনো-হর গিরি-মন্দির সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ তাপসগণ তাহার মধ্যে বসিয়া ধ্যান ধারণা করিতেন। সেখানে প্রস্তরফলকে বুদ্ধের উপদেশ সকল খোদিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে এরূপ বৌদ্ধ-কীর্ত্তি সকল এখনও বিদ্যমান আছে। অশোকের খোদিত অনেক প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহার কতক-গুলি কলিকাতার মিউজিয়মে আনিয়া রাখা হই-য়াছে। এরূপ বোধ হয়, গিরি-গুহা খনন করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করার পথ বৌদ্ধেরা প্রথমে প্রদ-র্শন করিয়া থাকিবে। তৎপরে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণ তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে এরূপ দেখা যায় যে, কোন গিরিগুহাতে অগ্রে বৌদ্ধগণ মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তৎপরে আবার হিন্দুর প্রতাপ বাড়িলে তাহাতে হিন্দুদের দেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এরূপ ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ও পঞ্জাবে অনেক মুসলমানের মসজিদ দেখা যায় যাহা এক সময়ে হিন্দুর দেবালয় ছিল, মুসলমান রাজাগণ হিন্দুর দেবালয় ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার শিকদিগের অমৃত-সরস্থিত স্বর্ণ-মন্দির দেখিলে বো[illegible] শিক রাজগণ মুসলমান মসজিদ ও [illegible] হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তর সকল হরণ করি[illegible]

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে গুজরাটের আমেদাবাদ নগরের একটী প্রস্তরে বাঁধান রাস্তার কতকগুলি পাথর উঠিয়া যাওয়ায় উল্টাইয়া দেখা গেল যে,তাহার অপরদিকে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। পরে যে পাথর খানি তোলা যায় সেই খানেই একটী দেবমূর্ত্তি। ইহাতে অনুমান হয় যে, ঐ নগরের কোন মুসলমান রাজা কোন হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া সেই সকল দেবমূর্ত্তি দ্বারা ঐ রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, লোকে তাহাদিগকে পদ দ্বারা দলন করিয়া যাউক।

যাহা হউক যে গিরি-মন্দিরটীর বিষয় আমরা বর্ণনা করিব, তাহার বিষয় কিছু বলি। এই গিরি-মন্দিরটী বোম্বাই সহরের কিছুদূরে সমুদ্র মধ্যস্থিত একটী পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত। বোম্বাই হইতে লোকে বোটে করিয়া এই গিরি-মন্দির দেখিতে গিয়া থাকে। বোম্বাইএর নিকটে সমুদ্র সর্ব্বদা আন্দোলিত, সাহসী লোক না হইলে বোটে যাইতে বড় ভয় পায়। বোট ডোবে না কিন্তু তরঙ্গের উপরে নাচিতে থাকে, ও কখন কখনও তরঙ্গের জল বোটের উপরে আসিয়া আরোহি-দিগকে স্নান করাইয়া দেয়। এই জন্য এলিফাণ্টা গিরিগুহা দেখিতে যাইবার সময় লোকে অনেক সময় দুই স্থুট কাপড় লইয়া যায়। বোট নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে, সেই পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলে দেখি, বরাবর পাষাণ-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী উপরে উঠিয়া গিয়াছে। উঠিয়া দেখি, সোপানগুলি কি সুন্দর! তাহাতেই বা কত পরিশ্রম হইয়াছে! ক্রমে গিরিমন্দিরের দ্বারে গিয়া পলাম। সেখানে দুই একখানি ঘর বাঁধিয়া অরূপ দুই চারিজন লোক আছে। তাহারা দর্শন করিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। দেখিলে বোধ হয় সেখানে একটী সামান্য গুহা ছিল, তারপরে মানুষের পরিশ্রমের গুণে সেই গুহা এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার ভিতরে বড় বড় থাম, নানা প্রকার খোদিত মূর্ত্তিবিশিষ্ট ঘর। এক পার্শ্বে একটী জলপূর্ণ ক্ষুদ্র উদপান (চৌবাচ্চা); সেখানে দিনরাত্রি জল ঝরিয়া পূর্ণ রাখিতেছে। ঘরগুলি প্রকোষ্ঠে (মংলে মংলে) বিভক্ত। বিশ্রাম কর, রাঁধিয়া খাও,—ধ্যান ধারণা কর, সকল কার্য্যের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। সচরাচর বৌদ্ধ-নির্ম্মিত গিরিমন্দিরে যে সকল ধ্যানস্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহা বড় দেখিতে পাইলাম না। কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার অবয়ব সকল কালক্রমে কোন কোন স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারা গেল না। অনুমানে বোধ হইল কোন হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি হইবে। এমনও হইতে পারে যে, এই গিরিমন্দির এক সময়ে বৌদ্ধদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয় তৎপরে হিন্দুরাজাদিগের রাজত্ব কালে হিন্দুদিগের হস্তে পতিত হয়। তাঁহারা ইহাকে আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

পর্ব্বতে যাঁহারা কখনও যান নাই, তাঁহারা গিরি-গুহা কি তাহা বুঝিতে পারেন না। পর্ব্বতের গায়ে বা দুইটী পাহাড়ের মাঝে কখনও কখনও এক একটী গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গর্ত্তের মুখ এমন ছোট যে, একজন মানুষকে অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে হয়। বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয় যে, গর্ত্তটী অতি সামান্য ও অধিক দূর বিস্তৃত নয় কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, তাহা বহুদূর-বিস্তৃত, কোন কোনটীর মধ্যে যাইবার বেশ পথ আছে; কোন

কোনটী যে কতদূর বিস্তৃত তাহার ঠিকানা করা যায় না। ভিতরে এমনি অন্ধকার ও বায়ু এমন বন্ধ যে যাইতে ভয় হয় ও নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। এই সকল গিরিগুহাকে কাটিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পীগণ মনোহর দেব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এলিফাণ্টা গিরি-মন্দির তাহার একটী। সখার পাঠক পাঠিকা! গিরি-মন্দিরের কথা যদি তোমাদের শুনিতে ভাল লাগে আরও কতকগুলির বর্ণনা সংগ্রহ করিয়া শুনাইতে পারি।

পণ্ডিতের ভ্রান্তি।

আমরা সময়ে সময়ে বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় ভ্রান্তির কথা শুনিয়া কত কৌতুক করিয়া থাকি। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রের বড় চর্চ্চা ছিল। সর্ব্বদা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচার করিয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা অনেক সময় স্থূল স্থূল বিষয় ভুলিয়া যাইতেন। এরূপ গল্প আছে যে, একবার একজন মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ন্যায়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্ক ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীতে আসিতেছিলেন। তিনি তখন চিন্তাতে এমনি নিমগ্ন যে, বাহিরের বিষয় একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া কৌতুক করিয়া খুব গম্ভীরভাবে তাঁহাকে বলিল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার বাড়ীর বড় অমঙ্গল সংবাদ। আপনার গৃহিণী বিধবা হইয়াছেন।" ব্রাহ্মণের এ বুদ্ধিটুকুও তখন যোগাইল না যে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার পত্নী কিরূপে বিধবা হইবেন। তিনি খুব চিন্তান্বিত অন্তরে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। যখন তাঁহার পত্নী তাঁহার পা ধুইবার জল দিতে আসিলেন তখনও তাহার ভ্রান্তি ঘুচে নাই; তাঁহার শরীরে অলঙ্কার দেখিয়া ব্রাহ্মণ একেবারে কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজের বিধবা কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "আমি শুনিয়া আসিলাম তোমার গর্ভধারিণী বিধবা হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার দেহে অলঙ্কার; এ কিরূপ বিধি?" কন্যা হাসিয়া বলিল, "সে কি বাবা! ন্যায় পড়িয়া তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে গিয়াছে? তুমি থাকিতে মা কিরূপে বিধবা হইবেন।" তখন ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—তাই তো!"

ইংলণ্ডেও এরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে; তাহার কয়েকটী নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা ও বৈজ্ঞানিক আইসাক্ নিউটন সাহেব বাচ্চা শুদ্ধ একটা বিড়াল পুষিয়াছিলেন। বিড়ালের থাকিবার জন্য একটা ছোট কাঠের ঘর তৈয়ার করেন। বিড়ালটার সেই ঘরে ঢুকিবার জন্য একটা খুব বড় ছিদ্র করিয়া রাখেন। তার পর মনে মনে ভাবিলেন যে, বড় বিড়ালটার যাইবার পথ ত করিলাম, ছোট বিড়ালটা ঘরে ঢুকিবে কি করিয়া? এই বলিয়া তিনি সেই বড় ছিদ্রের পাশে ছোট বিড়ালটা ঢুকিতে পারে এই রকম একটা ছোট ছিদ্র করিলেন। বড় ছিদ্র দিয়া বড় বিড়াল যাইবে, ছোট ছিদ্র দিয়া ছোট বিড়ালটা যাইবে। যিনি অঙ্কশাস্ত্রের অতি কঠিন এবং দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিতে আর এটা যোগাইল না যে, যে ছিদ্র দিয়া বড় বিড়াল প্রবেশ করিতে পারে সেই ছিদ্র দিয়া ছোট বিড়ালও প্রবেশ করিতে পারিবে।

বিখ্যাত নাটককার এবং অদ্বিতীয় শেরিডান সাহেব একটা বাগান বাড়ী

করেন। সে বাড়ীর চারিদিক বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। একদিন বাড়ীর বাহির হইয়া বেড়ার ঝাঁপ বা দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আর সে দড়ির বাঁধন খুলিতে পারিলেন না। অগত্যা বেড়া লাফাইয়া আসিতে হইল। এইরূপ দুই দিন ধরিয়া যতবার আবশ্যক হইত ততবারেই বেড়া লাফাইয়া আসা যাওয়া করিতেন। দুইদিন পরে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। শেরিডান বলিলেন,অনুগ্রহ করিয়া বেড়াটা লাফাইয়া আসুন। তাঁহার বন্ধু বলিলেন,দরজাটা খুলিয়াই দিন্ না কেন? তিনি উত্তর করিলেন ও দড়ির বন্ধন আমি খুলিতে পারি না। বন্ধু বলিলেন, দড়িটা তবে কাটিয়া ফেলেন না কেন? তখন শেরিডান থ হইয়া তাঁহার বন্ধুর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন, তৎপরে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া দড়ি কাটিয়া দিলেন ও সজোরে এক লাথি মারিয়া বেড়ার দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন "আপনি যদি আমার বন্ধু হন এবং আমাকে কিছুমাত্র ভাল বাসেন তবে আমার পৃষ্ঠে ঐরূপে পদাঘাত করুন।" যাঁহার হাসি ঠাট্টার সময়ে, রসিকতার সময়ে মজার মজার কথা বলিতে এবং নাটকে মানব মনের গূঢ় ও বিচিত্র ভাব সকলের বর্ণনা করিতে যে বুদ্ধি যোগাইত, বেড়ার দড়ি কাটিলে যে বেড়া খোলা যায় সে বুদ্ধি আর যোগাইল না!

মার্কিন দেশীয় একজন পণ্ডিতের বাড়িতে সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার যে ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেই এত কম আলো ছিল যে,বলিতে গেলে আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না; অতি কষ্টে এক ধার হইতে অন্য ধারে গেলাম। দেখিলাম তিনি চিঠি লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন; তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার চোখ খারাপ হইয়া আসিতেছে, তিনি কি লিখিতেছেন তাহা স্পষ্ট দেখিতে পান না। আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মিট মিট করিয়া সে ঘরে যে গ্যাস জ্বলিতেছিল তাহা বাড়াইয়া দিলাম। তখন আমার বন্ধু চমৎকৃত হইয়া যে কিরূপ ভাবে একবার গ্যাসের দিকে একবার আমার দিকে একবার চিঠির দিকে তাকাইতে লাগিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না।

বাঘ-মানুষ।

ঘে মানুষে কেমন ভাব তাহা সকলেই জানে। ফাঁক পেলে কেহও কাহাকে ছেড়ে কথা বলে না। ব্যাঘ্র মহাশয় যদি সুবিধা পান তবে ঘাড় ভাঙ্গিয়া মানুষ ভায়ার রক্ত পান করিতে ক্রটী করেন না; আর মানুষে সন্ধান পাইলেও গোলা বারুদের তোপ-ধ্বনি করিয়া দাদা মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন।* আমাদের দেশে বাঘ ও মানুষের এরূপ আদর অভ্যর্থনা প্রায়ই হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে আবার ইহাও শুনা যায় যে, বাঘের ঘরে মানুষের সন্তান পালিত হইয়া থাকে। আমার মনে আছে ছেলে বেলা এই রকম কত গল্প শুনিয়াছি। যখন বড় হইয়া ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলাম তখন

* আমরা ডারউইন সাহেবের সূত্র অনুসারে ব্যাঘ্রকে জ্যেষ্ঠ বলিলাম, বোধ হয় ইহাতে কাহারও আপত্তি হইবে না।

আর এসমুদায় গল্পে বড় বিশ্বাস হইত না। কিন্তু ইংরাজী পড়িয়াও নিস্তার নাই। রোমের ইতিহাসে পড়িলাম রোমের স্থাপন কর্ত্তা এক বাঘিনীর দুধ খাইয়া বাঁচিয়াছিলেন। সে সত্য যুগের কথাও বরং অবিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু আজ কাল যাহা শুনিতে পাই তাহা আর গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ফতেপুরে বাঘের ঘর হইতে একটী মানুষের বাচ্ছা আনা হইয়াছিল। সেখানকার সিভিল সার্জ্জনের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, বালকটীর বয়স ৬ অথবা ৭ বৎসর ছিল। ছেলেটী কথা বলিতে পারিত না, কাপড় পরিতে চাইত না এবং রান্না করা কিছুই খাইত না। সে যে অনাথ নিবাসে থাকিত সেখানকার পাদ্রি সাহেব ভয়ে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতেন। ডাক্তার সাহেব গিয়া তাহাকে ছেড়ে দিতে ব্যবস্থা করিলেন এবং মাংস ও হাড় রান্না করে খেতে দিতে বলিলেন। বাঘের মানুষ-বাচ্ছাকে ছেড়ে দেওয়া হইলে তাহার দৌরাত্ম্যে সকল অস্থির হইয়া উঠিল। একদিন ডাক্তার সাহেব গিয়া দেখিলেন যে, বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার পায়ের উপর হাত দিয়া মুখের দিকে কাতর ভাবে তাকাইতে লাগিল; এবং যেন কথা বলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অতি কষ্টেও কিছু বলিতে পারিল না, কেবল "শাক" এই কথাটী বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাক ও ভাত খাওয়াইতে বলিলেন। ক্রমে তাহার ছেলে বেলার কথা মনে আসিতে লাগিল এবং "মা" ও "বাবা" এই কথা বলিতে শিখিল। কিন্তু এরূপ ভাবে তাহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। শাক খাইতে খাইতে তাহার ভয়ানক পেটের অসুখ হইল। এইরূপে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় পড়িয়া তাহার উদ্ধত ব্যাঘ্রের স্বভাব যাইতে লাগিল এবং ক্রমেই পোষ মানিতে লাগিল; ডাক্তার সাহেব কাছে গেলে আর তাহাকে সহজে ছাড়াইয়া আসিতে পারিতেন না। যদিও তাহার গায়ে বাঘের ন্যায় দুর্গন্ধ ছিল এবং দেখিতে অতিশয় কদাকার ছিল তথাপি দয়ালু স্বভাব ডাক্তার তাহার কাছে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন এবং তাহাকে আদর করিতেন। শত চেষ্টায়ও তাহার সে ব্যারামের উপশম হইল না। মৃত্যু দিন যখন ডাক্তার সাহেব তাহাকে দেখিতে গেলেন তখনও সে তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিল এবং যখন সাহেব আদর করিয়া তাহার মাথার উপর হাত দিলেন তখন সে সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিল। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে "শাক" এই কথাটী বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব চাহিয়া দেখিলেন হতভাগ্য ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে।

কিছুদিন হইল কাণপুরে একটী বাঘ-মানুষের কথা শুনা গিয়াছে। একজন ইংরেজ মহিলা যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, ইহার বয়স ২৫ কি ৩০ বৎসর হইবে। দেখিতে খুব বলবান এবং দৃঢ়কায়; চুলগুলি এবং পরিধান কাপড় বেশ মোটামুটি পরিষ্কার, দেখিলে খুব ছোট লোক কিম্বা ভিক্ষুকের মত বোধ হয় না। ইহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, বাঘ-মানুষকে কেমন ভদ্র লোকের দেখা যায়। চক্ষু দুটি ভয়ানক রক্তবর্ণ, দে ভয় করে, এবং জিহ্বা হিংস্র জন্তুর মত লক্ কাহাকেও কোন উপদ্রব করে না; কিন্তু স

লোক বলিয়া থাকে যে, সে ছোট ছোট ছেলে পেলে দেখিলেই যেন খাইবার জন্য জিহ্বা বাহির করে। যাহা হউক সকলেই তাহাকে ভয় করে এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য অথবা পয়সা দিয়া থাকে।

বাঘ-মানুষকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একটী ১০ বৎসরের মেয়েকে দেখাইয়া বলিল যে, যখন সে দেখিতে তত বড় তখন এক জঙ্গল হইতে রোজ সাহেব তাহাকে ধরিয়াছিল। তখন সে চা'র হাত পার উপর ভর দিয়া চলিত। কিছুকাল হাঁসপাতালে থাকার পর রোজ সাহেব নিজেই তাহাকে রাখিয়া ছিলেন এবং মা বাপের মত যত্ন করিতেন। রোজ সাহেব বিলাত চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে।

উক্ত ইংরাজ মহিলা যখন ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন সে জোড় হাত করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় ঈশ্বর এবং স্বর্গ সম্বন্ধে কত কথা বলিল। এই মনুষ্যাকৃতি ব্যাঘ্র-স্বভাব বিশিষ্ট জীব মদ খাইতে বিশেষ পটু। একটী ইংরেজ মহিলা ইহাকে অনেক দিন খাওয়া পরা দিতেন, কিন্তু হতভাগা ভয়ানক মদ খাইত ও খারাপ ব্যবহার করিত। [illegible]শেষে সেখান হইতে পালাইয়া আর পুনরায় [illegible] নাই। এখনও যে পয়সা কড়ি পায় তাহা [illegible] মদ খাইয়া থাকে।

[illegible]অদ্ভুত জন্তুর আচার ব্যবহার প্রায়ই মানুষের ন্যায় হইয়াছে। এখন কাহারও কোন ক্ষতি করে না। শুনা গিয়াছে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন কোন স্ত্রীলোক তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে ভয়ানক রাগান্বিত হইয়াছিল এবং তাহাকে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিল। ইহা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে আর কিছু শুনা যায় নাই।

এই গল্প পড়িয়া কি তোমরা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণার প্রমাণ পাইবে না? তাঁহার সৃষ্ট জীব জন্তুকে তিনি কত ভাবে লালন পালন করিতেছেন ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়! যে বাঘ মানুষের ভক্ষক, ঈশ্বরের আদেশে সেই আবার রক্ষক হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের কৌশল!! ধন্য তাঁহার মহিমা!!!
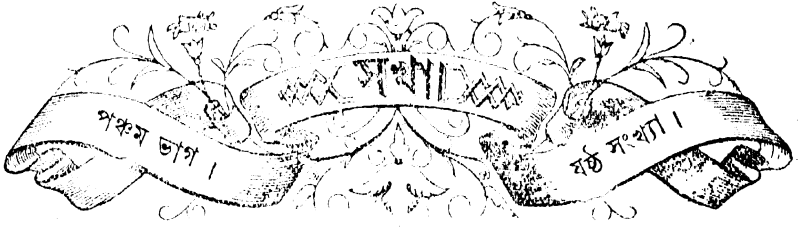
জুন, ১৮৮৭।

পাখীদের দেশ ভ্রমণ।

(৬৮ পৃষ্ঠার পর)।

হাঁস ভিন্ন আরও অনেক প্রকার পক্ষী শীত-কালে এদেশে আইসে এবং গ্রীষ্ম কালে আবার চলিয়া যায়। সে পক্ষীগুলি যে কি কি তাহা বলিয়া দেওয়া সহজ নয়, কারণ তাহা-দিগের অধিকাংশেরই বাঙ্গালা নাম নাই। তবে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর পক্ষীকে "কাদাখোঁচা" বলিয়া থাকে, কারণ ইহারা নদী, তড়াগ ও বিলের ধারে ধারে চরিয়া বেড়ায়, এবং ঠোঁট ও পা দ্বারা নরম মৃত্তিকা হইতে ছোট ছোট ভেক ও শম্বুক তুলিয়া আহার করে। হাঁসের মত ইহারা সাঁতার দিতে পটু নয়। ইহারা যে হাঁসের মত সাঁতার দিতে পারে না কেন, তাহা এই দুই শ্রেণীর পক্ষীর পা দেখিলেই সহজে বুঝা যায়। হাঁস জাতীয় পক্ষীর পায়ের আঙ্গুলগুলি একখানি পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আবৃত, কাদাখোঁচার আঙ্গুল-গুলি মুক্ত, হাঁসের মত যোড়া নয়। হাঁসের পায়ের গঠন এইরূপ হওয়াতে তাহাদিগের পক্ষে সাঁতার দেওয়া বড় সুবিধা,—কারণ দুখানি পা দুখানি দাঁড়ের কাজ করিয়া থাকে। তোমরা হয় ত অনেকেই ডাক পাখী (ডাহুক) দেখিয়াছ,—আর যদি না দেখিয়া থাক তবে এবার সুবিধা পাইলেই দেখিবে, কাদাখোঁচা পাখীর আকার অবয়ব অনেকটা এই ডাক পাখীর মত।

হাঁস, কাদাখোঁচা প্রভৃতি পক্ষীগণ যখন এদেশে আইসে তখন তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাজ, বহিরি, লঘুবর প্রভৃতি কতকগুলি শিকারী পক্ষীও এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নিরীহ জলচর এবং অন্যান্য পক্ষীগণকে মারিয়া আহার করে। গরিব হাঁস ও কাদাখোঁচা বেচারিদের আর নিস্তার নাই, শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবে এবং যথেষ্ট আহার পাইবে বলিয়া তাহারা যদি এদেশে আসিল, এখানেও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার শত্রু আসিয়া উপস্থিত! ঐ সকল শিকারী পক্ষীরা হাঁস এবং অন্যান্য পক্ষীর প্রাণ বধ করিয়া আহার করে শুনিয়াই হয়ত তোমরা চটিয়া উঠিবে। বলিবে, ঐ নিষ্ঠুর পক্ষীরা অন্য কিছু আহার করে না কেন? কিন্তু ঐ শিকারী পাখীদিগেরই বা দোষ কি? তাহারা ত আর আমোদ করিয়া কিম্বা মিছা মিছি জব্দ করিব বলিয়া অন্য পা[illegible] মারিয়া খায় না। তাহাদের আহারই মাংস। ধান, ছোলা, গম কিম্বা ফল মূল তাহারা জীবন ধারণ করিতে পারে না, কাজেই তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকা[illegible]

এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু মারিয়া আহার করিতে হয়। একেই বলে জীবন-সংগ্রাম। সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যেই এই নিয়ম বিদ্যমান। তোমরা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই পড়িয়াছ যে, কাদাখোঁচা প্রভৃতি পাখীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক ও শম্বুক তুলিয়া খায়, ভেকগণ আবার কীট, পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে। এইরূপ যে দিকে তাকাইবে সেই দিকেই প্রাণীদিগের মধ্যে খাদ্য ও খাদক সম্বন্ধ দেখিবে। আপাততঃ এ সকল বড় অন্যায় বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু তোমরা প্রকৃতির তত্ত্ব যতই অনুসন্ধান করিবে ততই দেখিতে পাইবে যে, এই অন্যায় ও অত্যাচারের মধ্যেও একটি সুনিয়ম আছে।

গতবারের 'সখা'তে তোমরা পড়িয়াছ যে, এখন আর খঞ্জন পাখী এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারা যে এখন কোথায় বাস করিতেছে তাহা ঠিক করিয়া বলা সহজ নয়, তবে প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তাহারাও এখন মধ্য এবং উত্তর আসিয়ার স্থানে স্থানে বাস করিতেছে, শীতের আরম্ভেই আবার এদেশে ফিরিয়া আসিবে। খঞ্জন ভিন্ন আরও অনেক পাখী এখন এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। তোমরা যদি যত্ন করিয়া এক খানি স্মরণ পুস্তকে (Note Book) প্রতিদিন যাহা দেখিতে ও শুনিতে পাও তাহা লিখিয়া রাখ তাহা হইলে ছয় মাস কিম্বা এক বৎসর পরে দেখিতে পাইবে যে, নূতন নূতন অনেক বিষয় শিখিয়াছ, তখন আপনা আপনিই [illegible]তে পারিবে কোন সময়ে কি পাখী আসে [illegible]কি পাখী চলিয়া যায়।

[illegible]স, কাদাখোঁচা, খঞ্জন প্রভৃতি যাহাদিগের [illegible]তক্ষণ বলা হইল তাহারা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অন্য দেশে চলিয়া যায়, কিন্তু এ সকল ভিন্ন আরো অনেকগুলি পাখী আছে যাহারা ভারতবর্ষের মধ্যেই কখনও এদেশ কখনও ওদেশ করিয়া বেড়ায়। আমাদের দেশে এখন আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফল পাকিয়াছে, এখন এই সকল ফলের বাগানে কত প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কিছু দিন পরে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না; কারণ ফল ফুরাইয়া গেলে পক্ষীরা আহার অন্বেষণের নিমিত্ত অন্য স্থানে চলিয়া যাইবে। শীত কালে যখন এদেশের নদ নদীর জল কমিয়া যায় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙ্গশালিক আসিয়া নদীর উচ্চ পাড়ে গর্ত্ত করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে এবং আবার যখন নদীর জল বৃদ্ধি হয় তখন অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

'সখা'র পাঠক পাঠিকা! এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ কত প্রকার কারণে পক্ষীগণকে কখনও এদেশ কখনও ওদেশ করিয়া বেড়াইতে হয়। কেবল যে ভারতবর্ষেই পাখীদের এইরূপ দেশ ভ্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নয়, ইউরোপ, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তাহারা সুবিধা ও অসুবিধা অনুসারে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। তোমরা সকলেই জান—ইউরোপ শীত প্রধান দেশ, যে সকল পক্ষী বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে বাস করে তাহারা শীতের প্রারম্ভে উত্তর আফ্রিকা কিম্বা অন্য কোন স্থানে চলিয়া যায়, কারণ এই সময়ে ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রদেশে এত প্রবল শীত হয় যে, এই সকল পাখী তাহা সহ্য করিতে পারে না, বিশেষ এই সময়ে সমস্ত দেশ বরফে ঢাকিয়া যায় বলিয়া আহার প্রাপ্তিরও বিশেষ অসুবিধা হয়। আবার যে সকল পাখী

শীত কালে ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, উত্তর ফ্রান্স, হলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাস করে তাহারা গ্রীষ্মকাল আসিলে ইউরোপের আরও উত্তর দিকে এমন কি লাপলাণ্ড দেশ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

বায়ু-মণ্ডল।

আমার পাঠক পাঠিকা! তোমরা শুনিয়া থাকিবে এবার একটা ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছে। রথযাত্রার সময়ে লক্ষ লক্ষ যাত্রী জগন্নাথ ক্ষেত্রে যায়। অনেক লোকে প্রায় স্থল পথে হাঁটিয়া জগন্নাথে যাইত। কিছুকাল হইতে যাত্রীদিগকে কলের জাহাজে করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অনেক যাত্রী এইরূপে গিয়া থাকে। এবার প্রায় ৭৫০ জন যাত্রী "সার জন লরেন্স" নামক একখানি কলের জাহাজে আরোহণ করিয়া উড়িষ্যাতে যাইতেছিল। গঙ্গাসাগরে ভয়ানক "সাইক্লোন" (ঘূর্ণী-ঝড়) উপস্থিত হয়। এই সাইক্লোনে সেই সাতশতের অধিক যাত্রী সমেত জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে। আমরা কলিকাতায় বসিয়া এই "সাইক্লোনের" আভাস পাইয়াছিলাম। যে দিন গঙ্গা সাগরে ঝড় হয় তার পূর্ব্বদিন হইতেই কলিকাতাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমরা আর কয়েকবার এইরূপ ঝড় দেখিয়াছি; আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, কলিকাতাতেই বা ঐরূপ ঝড় হয়। ২৬শে মে বৃহস্পতিবার তার যোগে কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে গঙ্গাসাগরে ভয়ানক ঝড় হইতেছে, বায়ুর গতি এত দ্রুত যে ঘণ্টায় ৬৭ মাইল ছুটিতেছে। পূর্ব্বদিন অর্থাৎ বুধবার হইতেই গঙ্গাসাগরে এই ঝড় আরম্ভ হয়। তখন আমরা জানিতে পারি নাই যে, ঐ দারুণ ঝড়ে বাঙ্গালা দেশের অনেক গৃহে হাহাকার ধ্বনি উঠিবে। বুধবার "সারজন লরেন্স" নামক একখানি কলের জাহাজ প্রায় ৭৫০ জন যাত্রী লইয়া কলিকাতা হইতে গঙ্গাসাগরে প্রবেশ করে। জাহাজখানি যখন সমুদ্রে প্রবেশ করিতে যায় তখনই ঝড়ের সঞ্চার হইয়াছিল। এরূপ শুনা যায় যে, জাহাজখানি যখন সমুদ্রে প্রবেশ করিতে যায় তখন তীরের বন্দর হইতে বিপদ-সূচক নিশান দেখান হইয়াছিল। তাহার অর্থ এই—"আকাশের অবস্থা বড় ভয়-জনক, সমুদ্রে প্রবেশ করিও না।" কিন্তু ঐ জাহাজের কাপ্তেন আরভিং সাহেব সে নিশান গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি নাকি আরও কয়েকবার ঝড়ে পড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। তিনি সাহস করিয়া জাহাজ লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন, এই মাত্র লোকে দেখিল, তার পর সে জাহাজের কি হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। জাহাজের সংবাদ না পাওয়াতে গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তিন চারিখানি জাহাজ সারজন লরেন্সের অন্বেষণে পাঠাইলেন। তাহারা চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে ভয়ানক দৃশ্য সকল চ… পড়িতে লাগিল। কোথাও ৫/৭টী স্ত্রী… জড়াজড়ি করিয়া মরিয়া ভাসিয়া আসি… শরীরগুলি পচিয়া ঢোল হইয়াছে; … বা জননী ক্ষুদ্র শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া

ভাসিয়া আসিতেছে; কি অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ! ভয়ানক বিপদের সময়েও অঞ্চলের ধনটীকে ছাড়ে নাই! কোথাও কোন ইংরেজের দেহের কতকটা ভাসিয়া আসিতেছে, অবশিষ্ট অংশ হাঙ্গরে খাইয়া ফেলিয়াছে। কোথাও বা কোন ইংরাজের নামাঙ্কিত কাঠের বাক্স তীরের নিকট ভাসিতেছে। কাপ্তেন সাহেবের বাক্স এইরূপে পাওয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক দৃশ্য! এদিকে বঙ্গদেশে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কি জানি এই বর্ণনাগুলি পড়িতে হয়ত সখার কোন পাঠক বা পাঠিকার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে! হয়ত তাঁহাদের কোন আত্মীয় স্বজন ঐ ভয়ানক দিনে দুরন্ত সাগরের গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছেন! যদি সখার পাঠক পাঠিকার মধ্যে এমন কেহ থাকেন, তাঁহার সান্ত্বনার জন্য আমরা কি বলিব? এই ভয়ানক বিপদের বার্ত্তা শুনিয়া আমরা যে প্রাণে কত বেদনা পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যদিও আমাদের নিজ বাড়ীর লোক কেহ ঐ জাহাজে ছিলেন না, কিন্তু আমাদের প্রিয় জন্মভূমির শতশত সন্তান একদিনে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ-ত্যাগ করিল ইহাতে কাহার প্রাণে না আঘাত লাগে! অতএব তাঁহাদের দুঃখে সমুদায় দেশের লোক দুঃখিত। এইমাত্র সান্ত্বনা।

এই বিপদের সমাচার শুনিয়া পাঠক পাঠিকার মনে কি প্রশ্নের উদয় হইতেছে! তোমরা অনেকে বোধ হয় জাহাজ দেখ নাই। একটা বড় জাহাজ একটা সহর। তাহা জলে ডোবা [illegible] সহজ নয়। অধিক কি ৭৫০ জন যাত্রী ও [illegible] উপরে আবার জাহাজের চাকর বাকর এই [illegible] লোক লইয়া যে জাহাজ যাইতেছিল, তাহা [illegible] হইবার সম্ভাবনা তাহা তোমরা সহজেই [illegible] করিতে পার। এতবড় একখানি জাহাজ জলে ডুবাইয়া দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। ইহাতেই তোমরা অনুমান করিতে পার সেই "সাইক্লোনের" জোর কত। ১২৭১ সালে কলিকাতার নিকটে এইরূপ এক সাইক্লোন হইয়াছিল, তাহার জোর দেখিয়া একজন কবি একটী গান রচনা করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"বাপ্‌রে পবনের পায়ে নমস্কার"

বাস্তবিক পবনের এই বিক্রম দেখিলে ঐ কথাই বলিতে হয়। তোমাদের কি "সাইক্লোনের" বিষয় কিছু জানিতে ইচ্ছা হইতেছে না? সাইক্লোন কেন হয়? ইহার এত জোর কেন? এসকল কি জানিতে ইচ্ছা কর না? যদি কর, তবে গোড়া হইতে আরম্ভ করা যাউক, মন দিয়া শুন।

তোমরা যদি খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ উপরে কিছুই দেখিতে পাও না; কেবল শূন্য। বাস্তবিকই কি সব শূন্য? প্রাতঃকালে যখন ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস বহিতে থাকে, ও শরীর স্নিগ্ধ করে তখন কি বলিতে পার সমুদয় শূন্য? বোধ হয় পার না। বোধ হয় তখন জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে সব শূন্য নয়, ইহার মধ্যে বাতাস আছে। বাস্তবিক কথাটা এই, পুষ্করিণীর জলে একটি খেলিবার মার্ব্বল ফেলিয়া দিলে সেটী যেমন জল রাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকে তেমনি এই পৃথিবী বায়ু সাগরের মধ্যে ডুবিয়া আছে। মৎস্যেরা যেমন জলরাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকে, জলরাশির মধ্যেই ক্রীড়া করে, ও বিচরণ করে, আমরা তেমনি বায়ু-রাশির মধ্যে ডুবিয়া আছি, বায়ু-রাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতেছি, বায়ু-রাশির মধ্যেই বিচরণ করিতেছি। যেন একটী বায়ুময় কোষের মধ্যে পৃথিবী আবৃত হইয়া রহি-

য়াছে। এই বায়ুময় কোষকে বায়ু-মণ্ডল বলা গেল।

পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে কতদূর উপর পর্য্যন্ত এই বায়ু-ময় কোষ পাওয়া যায় তাহা বলা যায় না। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন পৃথিবীর উপরে ৯০ মাইল অর্থাৎ ৪৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত এই বায়ু-মণ্ডল পাওয়া যায়, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আরও অনেক উপরে অর্থাৎ ২১২ মাইল উপরে ও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ বলিতেন বায়ুর ভার নাই, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, বায়ুর ভার আছে: এমন কি এক স্কোয়ার ইঞ্চ অর্থাৎ এক বুরুল লম্বা ও এক বুরুল প্রস্থ এই পরিমাণ ভূমির উপরে প্রায় সাত সের বায়ু থাকে। তোমরা বলিতে পার তবে ত আমাদের মাথার উপরে অনেক মণ বায়ু আছে, তবে আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে না কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। জলের ভার আছে তাহা ত জান। এক কলসী জল তুলিতে তোমাদের কত কষ্ট হয়! ভাল এক কলসী জলের যদি এত ভার হইল, তাহা হইলে একটা মানুষের শরীরের উপরে কত জলের ভার হওয়া সম্ভব, ভাবিয়া দেখিবে। কিন্তু তোমরা যখন ডুব সাঁতার দেও তখন কি ভারে শরীর পিষিয়া যায়? অধিক কি, তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, জল পূর্ণ কলসীটা উপরে তুলিতে কোমর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; সেই জল পূর্ণ কলসীটা জলে ডুবাইয়া দেখিবে, অনায়াসে নাড়িতে পারিবে। ইহার কারণ কি? কারণ এই, জলের উপরে বাতাসের যে চাপ পড়ে তাহা জলের সকল দিকে ও সকল ভাগে সমানরূপে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ কোন দেয়ালে যদি তুমি একটী গজাল মার, ও সেই গজালের উপরে ঘন ঘন হাতুড়ির আঘাত করিতে থাক, যে ভূমিটুকুর উপরে গজালটী বসিতেছে, হাতুড়ির যত জোর সেই ভূমি টুকুর উপরেই লাগে; তাহার পাঁচ হাত দূরের ইটকে সে জোর পৌছে না। জল কিম্বা বাতাসের প্রকৃতি এরূপ নয়। পুষ্করিণীর এক দিকে যে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, সকল দিকের জলেই সেই শক্তি অনুভব করিবে। তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার; কাণায় কাণায় জল পরিপূর্ণ একটী বড় গামলা বা টবের একপার্শ্বে যদি একটী বড় জিনিস জোরে ডুবাইয়া দেও দেখিবে অপর পার্শ্ব দিয়া জল উছলিয়া পড়িতেছে। কে অপরদিকের জল ঠেলিয়া তুলিল? তুমি জিনিসটীকে ডুবাইবার জন্য একদিকে যে বল প্রয়োগ করিতেছ তাহা যদি অপরদিকে না যাইবে তবে কে সে জলকে ঠেলিয়া তুলিল?

এখন একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, তুমি জলপূর্ণ যে কলসীটি পুনরায় জলে ডুবাইতেছ, তাহার ভিতরে যেমন জলের ভার আছে, তেমনি তাহার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, অধো, উর্দ্ধ চতুর্দ্দিক হইতে জলের ভারের শক্তি, ও উপরের বায়ুর ভারের শক্তি তাহাকে ঠেলিয়া রাখিতেছে, এইজন্যই তোমার হাতে জোর লাগিতেছে না। আমরা বায়ুসাগরে যখন বেড়াই, তখনও এই কারণে মস্তকের উপরের বায়ুর ভার অনুভব করিতে পারি না।

বাতাসের ভার আছে, একথাটা যদি একব
বুঝিতে পার তাহা হইলে একথাটীও স
বুঝিতে পারিবে যে, উপরের বায়ুর অপেক্ষা
বীর নিকটের বায়ুর উপরে অধিক ভার ?
তাহার ঘনত্ব অধিক। অর্থাৎ যদি /

করিয়া ক্রমাগত উপরে উঠিয়া যাও, যতই উপর উঠিবে ততই পাতালা বায়ু দেখিবে। এমন কি ৫।৬ মাইল উপরে বাতাস এত পাতলা যে, সেখানে বায়ুর অভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলাই দুষ্কর।

বায়ু-মণ্ডল কি কি দ্রব্যে গঠিত? —বায়ু-মণ্ডলে অনেক প্রকার দ্রব্য আছে। প্রায় ৮০ ভাগ নাইট্রোজান নামক একপ্রকার গ্যাস, ২১ ভাগ অক্‌সিজেন নামক গ্যাস, অল্পাংশ কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, ও এমোনিয়া প্রভৃতি অন্যান্য অংশও আছে। তদ্ভিন্ন বায়ু-মণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম জলীয় পরমাণুসকল বাষ্পাকারে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহার সকলগুলিই অতিশয় প্রয়োজনীয় পদার্থ। এই সকলের দ্বারা কি কি কাজ হয় একথা ভাবিলে, বিশ্বকর্ত্তার অপূর্ব্ব পালনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নাইট্রোজান 'গ্যাস' জীবদেহের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহাতে আমাদের দেহপুষ্টি হয়। অক্‌সিজেন গ্যাস অগ্নিকে রক্ষা করে, ঐ গ্যাসই অগ্নির খাদ্য বস্তু। অক্‌সিজেন না থাকিলে অগ্নি জ্বলে না। আমাদের রক্তাধারের পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাসে নিরন্তর অক্‌সিজেন গ্যাস ভিতরে লইতেছি ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস উদ্গীরণ করিতেছি। কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস আমাদের পক্ষে বিষাক্ত দ্রব্য কিন্তু উদ্ভিদদিগের তাহা খাদ্য। আবার অক্‌সিজেন গ্যাস তরুলতার পক্ষে বিষাক্ত, আমাদের দেহের [illegible] নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এইরূপে আমরা [illegible] উদ্গীরণ করিতেছি, তাহা লইয়া বৃক্ষেরা [illegible]রণ করিতেছে। আবার তাহারা যাহা [illegible] করিতেছে তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা [illegible]ছি। বৃক্ষেরা আমাদের কেমন বন্ধু!! বিধাতা কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে পরস্পরের বিনিময় দ্বারা আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

পিপীলিকার উপদেশ।

(৭০ পৃষ্ঠার পর।)

পিঁপড়েদের গোয়াল ঘর দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর আহারাদি করিয়া দুজনায় বাহির হইয়া গ্রাম দেখিতে গেলাম। বন, জঙ্গল, মাঠ, ঘাট সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম, গাছে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কত পাখীরা সুমিষ্ট গান করিতেছিল। এরূপ নানা বস্তু দেখিতে শুনিতে বেলা অবসান হইয়া আসিল। পাঁচ হাত গাছের পঁচিশ হাত ছায়া হইতে লাগিল। সূর্য্য ডুবু ডুবু হয়। তখন আমরা বাড়ী ফিরিতে লাগিলাম। আসিবার সময়ে পথিমধ্যে একস্থানে ফোয়ারার মত ধূলি জোরে উপরদিকে উঠিতেছে দেখিলাম। কেন ওরূপ হইতেছে কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না; বড় আশ্চর্য্য হইলাম। আমি আমার বন্ধু পিঁপড়ের দিকে চাহিয়া দেখি যে, তাঁহার মুখটী শুকাইয়া গিয়াছে, ভয়ে জড় সড় হইতেছেন। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি ভাই'। সে বলিল "ভাই এখানে আমাদের অনেক শত্রু আছে। আমার প্রাণে বাঁচা বড় দুষ্কর। ঐ যে ধূলা উঠিতেছে ও কি জান ও বাঘে ধূলা উঠাইতেছে। বাঘ কি বুঝিতে পারিলে না। ওরা এক রকম পোকা, পিঁপিড়ে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা খাইতে ভাল বাসে। ওরা মাটীতে আমাদের জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে, আমরা ফাঁদে পড়িলেই আমাদের ধরিয়া খায়। ওরা বড় মজার ফাঁদ পাতে। প্রথমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটীতে বড় একটি গোল দাগ দেয়। ওরা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না, কেবল পিছন দিকে হাঁটে। সেই দাগের ভিতরে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে থাকে। মাটি গর্ত্তের বাহিরে ফেলিবার সময়ে ধূলার ভিতর মাথাটী গুজিয়া দেয়, তার পরে জোরে মাথাটী সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া দেয়, অমনি মাথার উপরের ধূলিগুলি দূরে গিয়া পড়ে। ঐরকম করিতেছিল বলিয়া ঐ ধূলি উঠিতেছিল। যে গর্ত্তটি খোঁড়ে সেটা দেখিতে ঠিক তেল ঢালিবার ফনেলের মত। মুখটা খুব চৌড়া, তার পর শেষভাগটা ক্রমে সরু হইয়া আসিয়াছে। গর্ত্তের চারিপাশে এমনি ভাবে আলগা করিয়া ধূলি রাখিয়া দেয় যে, তার কাছে গেলেই গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে হয়। গর্ত্তের ভিতর ধূলা ঢাকা দিয়া কর্ত্তা বসিয়া থাকেন কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, ছোট কোন পোকা গর্ত্তের নিকট গেলেই, এমনি জোরে ভিতর হইতে ধূলা ছুড়িয়া মারে যে, সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া যায়। তখনি তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত চুষিয়া খায়। খাওয়া হইয়া গেলে খোসাটা ঐ রকম করিয়া ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয় ও নূতন শীকারের আশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। গর্ত্তটা বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পোকাগুলি বড় ছোট, তোমার মাথার মত বড় হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ এত বড় গর্ত্ত এক ঘণ্টার মধ্যে তৈয়ার করিয়া শীকার ধরিবার আশায় বসিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং মেটে, মাথা আর গলা সমস্ত শরীরের পরিমাণে খুব ছোট। মুখের সম্মুখে খুব শক্ত ছোট দুখানি কাস্তের মত শুঁড় বা দাঁত আছে তাহা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া খায়। ইহাদের চলন বড় মজার, মাটিতে কেমন গুঁড়ি গুঁড়ি হইয়া থাকে; এক এক হেঁচকা মারে আর অনেক পিছনে গিয়া পড়ে। এইরূপে পিছাইয়া যাইতে থাকে, সম্মুখে যাইতে পারে না, আর আমাদের মত ক্রমাগত পা দিয়া হাঁটিতে পারে না। এই জন্য শীকারের পিছনে পিছনে ছুটিয়া ধরিতে পারে না। কাজেই ফাঁদ পাতিয়া শীকার ধরিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ইহাদের অনেক দিন থাকিতে হয় না; কিছুদিন পরে একটা গুটি করিয়া কিছুকাল তাহার ভিতর থাকিবে তার পর ফড়িংএর মত হইয়া উঠিয়া যাইবে। এখনকার অবস্থা বড় কষ্টজনক। তবে যদি ভবিষ্যতে সুখের জীবনের আশা না থাকিত, তবে ইহাদের বাঁচিয়া থাকা কি দায়ের হইত।"

"এখানে ইহাদের অনেক গর্ত্ত আছে তাই আমার ভয় হইতেছে।" আমি বলিলাম "ভয় কি আমার হাত ধরিয়া চল, আমি থাকিতে কোন ভয় নাই।" আমরা সাবধানে চলিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। পিঁপড়েদের বা[ড়ী] প্রবেশ করিবার সময়ে তাদের প্রহরীরা অ[...] দিকে কট মট করিয়া তাকাইতে লাগিল। অন্ধকার হইয়াছে। কলিকাতায় বাবুদের বা[...]

যেমন গ্যাসের আলোকে ঘর আলোকিত হয়, অন্যান্য লোকের ঘর যেমন কেরোসিন ল্যাম্পে বা প্রদীপে আলোকিত হয়, ইহাদের সে সব কিছু নাই অথচ ইহাদের ঘরগুলি সব আলোকময়। পিঁপড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ আলো [illegible]থা হইতে আসিল, সে হাঁসিয়া বলিল, [illegible]লার মত ছোট ছোট একরকম ব্যাংএর [illegible]র গাছ আছে রাত্রে খুব চকচক্ করে, এ [illegible] আলো। আমরা ঘর আলোর জন্য [illegible]কে এখানে রোপণ করিয়াছি। কেন, তুমি এরকম গাছ দেখ নাই? তোমরা কখন মাঠে ঘাটে বেড়াও না, তা জানিবে কি করিয়া। না দেখিলে শুনিলে কি কিছু জানা যায়। আমরা কত দেশ বেড়াইয়াছি, কত দেখিয়াছি, তাই কত শিখিয়াছি।" তার পর সে আমাকে কিছু খাবার দিয়া একটী ঘর দেখাইয়া দিল আর বলিল "এইখানে রাত্রে ঘুমাইও।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। খানিক পরে আমি ঘরের দোর বন্ধ করিয়া শুইয়া আছি এমন সময়ে কে আমার দোরে আসিয়া "এ ঘরে কে" বলিয়া

ধাক্কা দিতে লাগিল। আমি বলিলাম "তুমি কে? কি চাও।" সে রাগিয়া বলিল "তুমি কে? ভাল চাও ত শীঘ্র দোর খোল।" আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি দোর খুলিয়া দিলাম আর বলিলাম "আমি তোমাদের বন্ধু, তোমাদেরই একজন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এখানে আনিয়াছেন," তখন সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। আমি গিয়া শুইলাম, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম আসিল না। কত দুর্ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে ঘুম আসিল। ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যেন পুকুরের উপর এক ভেলা রহিয়াছে। হঠাৎ ভেলার পাশে এক প্রকাণ্ড মাথা ভুস্ করিয়া উঠিল। তার চোখ দুটী কট্‌মট্ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, যেন দুটা আগুন জ্বলিতেছে। বড় ভয় হইল, পলাইবার জন্য মুখ ফিরাইলাম। সে দিকেও ঐরূপ একটা প্রকাণ্ড মাথা, ঐ রকম দুটা চোখ জ্বলছে। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে বিকটাকার মূর্ত্তি জল হইতে উঠিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, সকলেরই চক্ষু আমার দিকে। সে সময়ে দেখি আমার পিঁপড়ে বন্ধু বলিতেছে "ঐ দেখ ভেলায় একটা ছিদ্র আছে, আইস ইহার ভিতর দিয়া জলে ডুব দি, আর উহারা ধরিতে পারিবে না।" ইতিমধ্যে শত শত বিকট মূর্ত্তি আমাকে টানিয়া জলের ভিতর লইয়া গেল—নীচে নীচে আরও নীচে লইয়া যাইতে লাগিল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে, এমন সময়ে পূর্ব্বের সেই মাকড়সা আসিয়া বলিতে লাগিল "কেমন বেশ হয়েছে। আমি আগেই ত সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, বারণ করিয়াছিলাম পিঁপড়েদের ওখানে যাইও না।" তার পর দেখি যে এক ক্ষুদ্র কারাগারে বদ্ধ আছি। অনেকগুলি পিঁপড়ে ক্রোধান্ধ হইয়া দোর ঠেলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল, "উহাকে মারিয়া ফেল, খাইয়া ফেল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি এক কোণে জড় সড় হইয়া করজোড়ে কাতরে মাপ চাহিতে লাগিলাম, বলিলাম "দোহাই তোমাদের! আমাকে রক্ষা কর, তোমাদের নিজের লোক আমাকে আনিয়াছে। কোথায় আমার বন্ধু আমাকে রক্ষা কর।" এ সময়ে আমার বন্ধু আসিয়া আমাকে ঠেলিতে লাগিল আর বলিল "ওঠ, বেলা হইয়াছে।" আমি উঠিয়া বসিলাম। সে বলিল "ওকি কাঁপছ যে, তোমার গা দিয়া ঘাম বাহির হচ্চে যে, কি হয়েছে কি?" আমি লজ্জায় কিছু বলিলাম না। তার পর উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া একটু আহারাদি করিলাম।

ক্রমশঃ

টাকা কড়ি।

তোমরা যে সাদা সাদা গোল গোল চকচকে জিনিষগুলি দেখিতে পা[ও] যাহার বলে ভাত খাও কাপড় [পর] যাহার মধুর ঝন্‌ঝন্ টুন্‌টুন্ শব্দে মনটা [...] আনন্দে নাচিতে থাকে সেই টাকা যদি সং

না থাকিত তবে কি হইত বলিতে পার? একটা গানে আছে,

"যার পয়সা নাইরে ভাই
সংসারে তার মরণ ভাল।"

এমন জিনিষ না হইলে কি পৃথিবী চলিত? এরূপ অবস্থা হয়তো তোমাদের কল্পনায়ও আসে না; অথচ পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল যখন টাকা কড়ি কিছুই ছিল না। অবশ্য সে দুই এক শত বৎসরের কথা নয়; পৃথিবীর অতি আদিম কালে এইরূপ অবস্থা প্রচলিত ছিল।

এখন যেমন কোন জিনিষের আবশ্যক হইলে টাকা দিয়া আমরা কিনিয়া থাকি তখন লোকে [illegible] করিতে পারিত না। এখন টাকা দিয়া [illegible] ইচ্ছা তাহা কিনিতে পার। লোকে কথায় [illegible] "পয়সায় বাঘের দুধও মেলে।" অর্থাৎ [illegible] পয়সা হইলে সংসারে কিছুই দুষ্প্রাপ্য [illegible]। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ পৃথিবীতে [illegible]র টাকা পয়সা কিছুই নাই। তোমার হয়ত কোন জিনিষ প্রচুর পরিমাণে আছে, আবার কোন জিনিষ হয়ত কিছুই নাই। যে লাঙ্গল চাষ করিয়া ধান জন্মায় তাহার কেবল ধানই আছে, যে কাপড় তৈয়ার করে তাহার কেবল কাপড়ই আছে, যে বই লেখে তাহার কেবল বইই আছে অর্থাৎ যাহার যে ব্যবসা তাহার তাহাই আছে। যে ব্যবসার জন্য যে সমুদায় জিনিষ পত্রের প্রয়োজন তাহাই বা কোথা পাওয়া যায়? তবে কি পৃথিবীতে তখন ব্যবসাদি চলিত [illegible] যাহার ধান আছে সেইই কেবল ভাত [illegible] আর সকলে কি উপবাস করে দিন কাটাত? [illegible] কাপড় আছে সেইই কেবল কাপড় [illegible] আর সকলে কি ন্যাংটা হইয়া থাকিত? না, তাহা নয়। তখনও সকলে আবশ্যকীয় সমুদায় দ্রব্যই পাইত কিন্তু অত্যন্ত কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। মনে কর, তোমার অধিক কাপড় আছে কিন্তু খাইবার কিছু নাই; তখন তোমার এমন লোক খুঁজিতে হইত যাহার কাপড়ের প্রয়োজন আছে। যদি তাহার নিকট খাদ্যদ্রব্য অধিক থাকিত তবে তোমার বেশী কষ্ট পাইতে হইত না কিন্তু যদি তাহা না হইয়া তাহার নিকট কতকগুলি টেবিল চেয়ার থাকিতো তবে তোমার কি কষ্টই হইত!! সেই গুলি লইয়া আবার তোমাকে খুঁজিতে হইত "কাহার নিকট খাদ্য দ্রব্য অধিক আছে অথচ তাহার টেবিল চেয়ারের আবশ্যক?" হয়তো তোমার কপালক্রমে সেখানেও বিফল হইতে হইত আবার তোমাকে "কে নেবে গো" "কে নেবে গো" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে হয়তো তোমার পরিবারের লোকদিগকে ১০ দিন না খাইয়া থাকিতে হইত। এই প্রথাকে "বিনিময়" প্রথা বলা যায়।

লোকে যখন এইরূপ অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিল এবং সমাজের অবস্থা যখন ক্রমে উন্নত হইতে লাগিল তখন সকলেই একটা সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে উদ্যোগী হইল। সকলে একমত হইয়া একটা কোন পদার্থকে সকল প্রকার জিনিষের সাধারণ বিনিময়ার্থ নিযুক্ত করিল। ইহাতে কেমন সুবিধা!! যে কাপড় বিক্রী করিবে সেও সেই সাধারণ পদার্থের' পরিবর্তে বিক্রয় করিত, যে কাপড় কিনিবে সেও সেই সাধারণ পদার্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে পারিত। তখন নানা দেশে নানা প্রকার পদার্থ দ্বারা এই সাধারণ বিনিময়ের কার্য্য চলিতে লাগিল। ইহার নাম "মুদ্রা" এবং সাধারণ ভাষায় ইহাকে

"টাকা কড়ি" বলে। কত দেশে কত প্রকার দ্রব্য এই সাধারণ বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত তাহা শুনিলে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। চীন দেশীয় লোকেরা কিছুদিন পূর্ব্বে চা পাতা দ্বারা টাকা কড়ির কাজ চালাইত। আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতি এখনও এক প্রকার কড়ি ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রাচীন আরব দেশীয়েরা ঘোড়া গরু দ্বারা বিনিময় করিত। যখন কেহ কোন জিনিষ কিনিতে যাইত তখন এক পাল গরু, ঘোড়া, ছাগল তাড়াইয়া লইয়া যাইত, আবার যে বিক্রয় করিত তাহারও এইরূপ জিনিষ বেচিয়া একপাল পশু তাড়াইয়া লইয়া যাইতে হইত। ইহা হইতেও হাসির কথা আছে। আবিসিনিয়া দেশে লবণ মুদ্রারূপে বিরাজ করিতেন। কোন কোন দেশে চামড়া দিয়াও টাকার কাজ চালান হইত।

এ সকল অসভ্য দেশের কথা। সভ্য দেশে সর্ব্বত্রই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। সকল সভ্য দেশেই এই এক রূপ নিয়ম হইবার কারণ কি? যে সমুদায় জিনিষ সহজে পাওয়া যায় তাহাদ্বারা যদি মুদ্রা প্রস্তুত হইত তবে কি অসুবিধা হইত একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। মনে কর মাটী কিংবা কাঠ যদি টাকারূপে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে একটা সামান্য জিনিষ কিনিতে হইলেও গাড়ী গাড়ী টাকা বোঝাই করিয়া লইতে হইত। এইজন্যই যাহার মূল্য অধিক এবং যাহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজে লইয়া যাওয়া যায় তাহাই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুদ্রার জন্য এরূপ জিনিষ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য যাহা দুষ্প্রাপ্য নয় অথচ অধিক মূল্যবান এবং সহজে বহনীয়। কেবল যদি অধিক মূল্যবান জিনিষই মুদ্রারূপে প্রচলিত হইত তাহা হইলে হীরক মণিমুক্তা প্রভৃতিই অধিক উপযোগী ছিল। কিন্তু এত অধিক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য জিনিষ ব্যবহৃত হইলেও অতিশয় অসুবিধা হইত। সামান্য লোকে টাকা কড়ি পাইত না এবং কিছুদিন পর হীরক ও মণিমুক্তা হয়তো আর পাওয়াই যাইত না। এইরূপ নানা কারণেই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রারূপে প্রচলিত হইয়াছে এবং হইতেছে; আশা করা যায় এ প্রথা শীঘ্র উঠিয়া যাইবার নহে।

যে টাকা কড়ি দ্বারা আমরা এত অসুবিধা হইতে নিস্তার পাইয়াছি এবং যাহার প্রসাদে এত সুখ ও সুবিধা ভোগ করিতেছি তাহা কত আদরের জিনিষ! এইরূপ জিনিষ যাহারা অন্যায় আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যয় করে তাহারা কি মূর্খ!! যাহাদের টাকা কড়ি নাই, একবার ভাবিয়া দেখ তাহারা কত কষ্ট ও কত অসুবিধা ভোগ করে। ভাই, যদি তোমার বেশী টাকা থাকে যদি তুমি নিজের ব্যয় কুলাইয়া টাকা বাঁচাইতে পার; তবে তাহা অসৎকাজে ব্যয় না করিয়া কুপথে বিসর্জ্জন না করিয়া দরিদ্রের সুখ ও সুবিধার জন্য ব্যয় কর। তুমি টাকার প্রসাদে যে সুখভোগ করিতেছ তাহাদিগকে সেই সুখের কিঞ্চিৎ ভাগী কর। ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন—দরিদ্র স্বর্গের দিকে দুই হস্ত তুলিয়া তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।
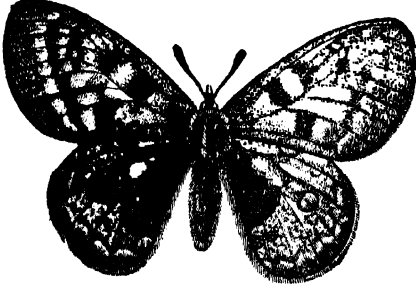
প্রজাপতি।

১

ছুঁওনা ছুঁওনা প্রজাপতি ওটি,
যেওনা যেওনা উহার কাছে;
বাতাসে বিছায়ে ছোটপাখা ছুটী
ঘুরিয়া ফিরিয়া কেমন নাচে!

২

নবীন নধর, নিখুঁত সুন্দর
বিমল কোমল শরীর খানি!
কিবা অপরূপ রূপ মনোহর
নিরখিলে আহা জুড়ায় প্রাণি!

৩

তরুণ-তপন কোমল-কিরণ
পড়েছে উহার শরীর'পরে,
যাহা মরি মরি কর দরশন
কি সুন্দর শোভা বিকাশ করে!

৪

স্বভাবের শিশু, ফেরে বনে বনে
নাহি কোন ভয় ভাবনা-ঘোর,
নাচে, হাসে, গায় আপনার মনে
আপনার ভাবে আপনি ভোর!

৫

সদাই প্রফুল্ল—সরল হৃদয়,
করে না করে না কাহার ক্ষতি!
কপট আচার, হিংসা কারে কয়,
জানে না কখন সুশীল মতি!

৬

ফুলে ফুলে ফুলে করি মধুপান,
কুসুমের রেণু মাখিয়া গায়,
বিহরে আনন্দে সারা-দিনমান,
আর কোন সুখ নাহিত চায়!

৭

জননীর কোলে শিশুটি যেমতি
স্তনপান করে ঘুমায় সুখে!
কুসুমের মধু খেয়ে প্রজাপতি
তেমতি ঘুমায় কুসুম-বুকে!

৮

সাদা-সিধা মন, সরল সুজন,
উহার মতন কে আছে আর?
তবু দুষ্ট-লোকে বল কি কারণ,
"পাগল" বলিয়া নিন্দেরে তার?

৯

যে বলে বলুক, তাহে ক্ষতি নাই,
নিন্দুক লোকের স্বভাব এই
শত শত গুণ না দেখিয়া ভাই,
তিল-পারা দোষ ধরিবে সেই!

১০

আমরাও ভাই করিয়া যতন,
প্রজাপতি মত সকলে হব,
সরল সুজন, হব খোলা মন,
যে যা বলে তাহা সকলি সব!

কাশ্মীরে দেখিবার জিনিষ।

মানুষের দিন দিন জ্ঞান বাড়িতেছে, বিদ্যা বুদ্ধি বাড়িতেছে। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সকল কার্য্যেরই একটা না একটা কারণ ঠিক করিয়া লইতেছে; কিন্তু তবুও প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেকগুলি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার নিকট মানুষের জ্ঞান, মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে অনেক স্থানে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। আজ আমরা কাশ্মীর রাজ্যের কয়েকটী আশ্চর্য্য পদার্থের বিষয় বলিব।

শ্রীনগরের নিকট একস্থানে একটী ছোট দ্বীপ আছে, এই দ্বীপে একটী কুণ্ড আছে, এবং কুণ্ডের মাঝখানে ইঁটের একটী ছোট বেদীর উপর একটা ধ্বজা ও পতাকা স্থাপিত আছে। হিন্দুদিগের ইহা একটী তীর্থস্থান। যাত্রীগণ ক্ষীর এবং পায়স এই কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া, দেবীর পূজা করিয়া থাকে সেইজন্য ইহার নাম,—ক্ষীর ভবাণী। এই কুণ্ডের জলের বর্ণ অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; জলের রং কখনও গোলাপী, কখনও রক্ত বর্ণ, কখনও সবুজ, কখনও বা অন্যপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকদিন যদি জলের রং রক্ত বর্ণ থাকে, তাহা হইলে সে দেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, দেবী কুপিতা হইয়াছেন; এবং রাজ্য মধ্যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে, এই আশঙ্কা করিয়া থাকে। জলের বর্ণ কেন এপ্রকার পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা এপর্য্যন্তও কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। যাত্রীরা কুণ্ডের জলে যে সমস্ত পদার্থ নিক্ষেপ করে, সময় সময় তাহা তুলিয়া কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করা হয়, কিন্তু তাহাতেও কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। জলের রং কখনও নীল হইতেছে, কখনও বা সাদা হইতেছে, কখনও বা রক্ত বর্ণ হইতেছে; আবার কখনও বা অনেকদিন পর্য্যন্ত এক রংই রহিয়াছে। কি কারণে এপ্রকার হয়, তাহা এখনও কেহ স্থির করিতে পারেন নাই।

শ্রীনগরের দক্ষিণভাগে, একস্থলে একটী অতি উচ্চভূমি আছে; এই উচ্চভূমির নিম্নভাগে প্রায় ২০ হস্ত প্রশস্ত একটী নালা দেখা যায়। এই নালাটী সকল সময়ই শুষ্ক থাকে; কিন্তু প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে, শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ঐ উচ্চভূমির নানাস্থান হইতে জল নিসৃত হইয়া নালায় পড়ে, এবং নালাটী পূর্ণ হইয়া যায়। নালাটীর নাম জটাগঙ্গা; বছরের সমস্ত ইহা শুষ্ক থাকে, কেবলমাত্র ঐ এক নির্দ্দিষ্ট দিনে ইহা জলপূর্ণ হয়।

এই জটাগঙ্গার কিছুদুরে, একটা খুব বড় হ্রদ আছে; ইহার নাম হাকের সর। এই হ্রদের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলিতে বড় বড় বৃক্ষ প্রভৃতি জন্মিয়াছে এবং গরু প্রভৃতি দ্বীপের উপর চরিয়া বেড়াইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খুব প্রবলবেগে যখন বাতাস বহিতে থাকে, তখন এই দ্বীপগুলি নৌকার মত ইতস্ততঃ ভাসিতে থাকে; বড় বড় গাছ, গরু বাছুর প্রভৃতি জীবজন্তু লইয়া বাতাসে এদিক ওদিক চালিত হইতে থাকে। কাশ্মীরে এ প্রকার ভাসমান ক্ষেত্র আরও আছে, কিন্তু সেগুলি মানুষের তৈয়ারী। জলের উপর লতা পাতা জন্মাইয়া, ক্রমে তাহার উপর মাটী ফেলিয়া কাশ্মীরের লোকেরা তাহার উপর শস্যক্ষেত্র তৈয়ার করে; এবং ইচ্ছামত এক স্থান হইতে আর একস্থানে লইয়া যায়। সময় সময় এই সকল ক্ষেত্র চুরি যায়, এবং তাহা লইয়া মোকদ্দমাও হইয়া থাকে। কিন্তু উপরে যে দ্বীপের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি মানুষের তৈয়ারী নহে, এবং তাহার আয়তনও খুব বড়।

আর একস্থানে একটা কুণ্ড আছে, তাহাতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার কুণ্ডের মধ্যস্থ সাতটী স্থান হইতে জল বাহির হইয়া কুণ্ডপূর্ণ করে, এবং প্রত্যেকবার অতি অল্পকাল পর্য্যন্ত জল থাকে, তার পর আবার শুকাইয়া যায়। ইহার নাম ত্রিসন্ধ্যা।

আর একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়; সেটী ...শ সময়ই শুষ্ক থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের ... এই যে, মধ্যে মধ্যে হঠাৎ কোথা হইতে ...আসিয়া কুণ্ড পূর্ণ হইয়া যায়; কুণ্ড এই কতকক্ষণ পূর্ণ থাকে; আবার জল কোথায় চলিয়া যায়। তখন একবিন্দু জলও কুণ্ডের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর এক স্থানে একটা খুব বড় পর্ব্বতের গুহা আছে। ইহার নাম মণ্ডা। শুনা যায় এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার ভিতরের জিনিষ খাইলে ঠিক বরফের মত বোধ হয়; কিন্তু তাহা খাইতে খাইতে গুহার বাহিরে আসিলে, আর সে শীতল বরফ থাকে না; কঠিন পাথরের মত হইয়া যায়। এখন এই গুহার মুখে একখানা বড় পাথর পড়িয়া যাওয়াতে আর ইহার মধ্যে যাওয়া যায় না।

আর একটী বলিয়াই আজ শেষ করিব। এক স্থানে একখণ্ড খুব বড় পাথর আছে, ইহার নাম হলদর। উহার নিকটে গিয়া "হলদর জল দেও" বলিয়া কয়েকবার চিৎকার করিয়া বলিলেই, সেই পাথরের গাত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকে।

কাশ্মীরে দেখিবার জিনিষ যে ইহাতেই শেষ হইল তাহা নহে। কাশ্মীরে দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। এমন সুন্দর এবং সুখের স্থান অতি অল্পই আছে। আমরা কেবল কয়েকটী প্রাকৃতিক আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

পৃথিবীর কত স্থানে যে এই প্রকার কত আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, তাহা কে বলিতে পারে? আজ যে গুলির কথা বলিলাম, তাহা আমাদিগের এই দেশেই রহিয়াছে। আমরা আশা করি আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অন্ততঃ দু চার জন এ সকল চোকে দেখিয়া চক্ষু স্বার্থক করিবেন।

নানাপ্রসঙ্গ।

একদিন বড় ঝড় হইতেছিল। দশ বার জন লোক একটা ঘরে আশ্রয় লইল। মেঘে আকাশ অন্ধকার হইয়াছে। এমন সময় এক খানা কাল মেঘ ঘরের উপরে আসিয়া থামিল। মেঘ খানা ভয়ানক কাল; দেখিলেই ভয় হয়। ইহা দেখিয়া একজন বলিল "মেঘটা অবশ্যই কিছু চায়, হয়ত আমাদের মধ্যে একজন মহাপাপী আছে, তাহার মাথায় বাজ ফেলিয়া মেঘটা তাহাকে মারিতে আসিয়াছে।" আর একজন বলিল "একজন দোষীকে মারিতে গিয়া তাহার সঙ্গে এতগুলি নির্দ্দোষীকে বধ করিবে, বোধ হয় এই জন্যই বাজ পড়িতে দেরী হইতেছে। কিন্তু দেরী আর কতক্ষণ হইবে, দোষী ব্যক্তি যদি শীঘ্র পৃথক হইয়া না যায় তবে আর আর সকলেও তাহার সঙ্গে মারা যাইবে।" আর একজন বলিল "ইহা কখনই হইতে পারে না; চল আমরা প্রত্যেকেই এক এক বার করিয়া বাহিরে যাই। যে দোষী সে বাহিরে গেলেই তার ঘাড়ে বাজ পড়িবে।" এই পরামর্শ বেশ সঙ্গত বোধ হইল; তার পর এক এক জন করিয়া বাহিরে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে এক জন ছাড়া আর সকলেই বাহিরে গিয়া আসিল, কিন্তু তাহাদের কাহারও মাথায় বাজ পড়িল না। শেষ ব্যক্তির পালা যখন আসিল, তখন সে আর কোনমতেই বাহিরে যাইতে চাহে না। অন্যান্যেরা মনে করিল "এই ব্যক্তিই দোষী, ইহাকে ঘর ছাড়িয়া যাইতে হইবে, নতুবা ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মারা পড়িব।" এই ভাবিয়া সকলে ঠেলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল, আর অমনি ঘরের উপর বাজ পড়িয়া তাহারা মরিয়া গেল। যাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল সে বাঁচিল।

একটী ছোট ছেলের বাপ মা মরিয়া যাওয়াতে সে বড়ই দুঃখে পড়িল। সে মনে করিল যে এরূপ দুঃখ সহ্য করার চাইতে মরিয়া যাওয়াই ভাল। এই ভাবিয়া সে একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে এক পুত্রহীন সওদাগর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে সেই ছেলেটীকে ঐরূপ গর্ত্ত খুঁড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বালক উত্তর করিল "আমার মা নাই, বাপ নাই; আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? আমি এই গর্ত্তে পড়িয়া মরিব।" সওদাগরের বড় দয়া হইল; সে বলিল "তোমার মরিয়া কাজ নাই; তুমি আমার সঙ্গে এসো, আমরাই তোমার বাপ মা হইব।" বালক সওদাগরের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গেল, সেখানে সে খুব যত্ন পাইতে লাগিল। কিছু দিন পরে সওদাগরের এক ছেলে হইল। সওদাগর ও তাহার স্ত্রী এখন সেই দুঃখী ছেলেটীকে অত্যন্ত হিংসা করিতে লাগিল। তাহাদের হিংসা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে তাহারা সেই ছেলেটীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একটা গভীর কূপ খুঁড়িয়া রাখিল—মনে করিল "একবার তো কূপে পড়িয়াই মরিতে গিয়াছিল, এবারে কূপ প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিলে অবশ্যই তাহাতে ঝাপিয়া পড়িয়া মরিবে।" কিন্তু সেই দুঃ[illegible] সন্তান ইহার কোন খবর পাইবার পূর্ব্বেই সও[illegible]গরের নিজের ছেলে সেই কূপ দেখিতে গেল [illegible] হঠাৎ তাহাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

গল্প গুলি সত্য না হউক, ইহাদের ভিতরে বেশ উপদেশ আছে? পরের মন্দ ভাবিও না। দেখ এই সকল লোক পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া কি শাস্তিই পাইল!

বালকের সৎশিক্ষা।

কয়েক দিন হইল একখানি রেলের গাড়ীতে অনেক লোকের ভিড় হওয়াতে উপযুক্ত স্থানাভাব বশতঃ যাত্রীরা বড়ই কষ্ট পাইতেছিল, ইহার পর আবার গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বেই একটী বৃদ্ধ লোক দৌড়িয়া আসিয়া উক্ত রেলের গাড়ীতে উঠিলেন। স্থানাভাবে উক্ত বৃদ্ধ লোকটীর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। সে গাড়ীতে অনেক লোক ছিল কেহই কিছু বলিল না; সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একটী ১০।১২ বৎসরের বালক বৃদ্ধের কষ্ট দেখিয়া নিজের স্থান ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার বসিবার জায়গা করিয়া দিল এবং নিজে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া [illegible]র যায়গায় বসিল। বালকের এইরূপ সৎ[illegible] দেখিয়া অন্যান্য সকলেই তাহাকে প্রশংসা [illegible]ত লাগিল। এটী যে উচিত কর্ম্ম তাহা সকলেই জানেন তত্রাচ অন্য কেহই বৃদ্ধের বসিয়া বিশ্রাম করার স্থান দিলেন না।

এই ঘটনাটীতে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই তত্রাচ যেরূপ সময় হইয়াছে তাহাতে না উল্লেখ করিলে এইরূপ সৎকার্য্যের জন্য অন্যান্য বালককে উৎসাহিত করা হয় না। আজ কাল সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হুজুক দিন দিন বাড়িতেছে এবং আমাদের প্রাচীনকালের হিন্দুদের যে সমুদয় সদ্‌গুণ ছিল তাহার ক্রমশঃ লোপ হইতেছে।

বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাহাদিগকে ভক্তি করা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং যাহারা এরূপ কাজ করেন তাহারাই একটী সৎশিক্ষা পাইয়াছেন ইহা বলিতে হইবে।

ধাঁধা

গত মার্চ্চ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। ৮, ১২, ৫, ২০।

নূতন ধাঁধা।

১। এমন একটী তিন অক্ষরের কথা বল যাহার আদ্য অক্ষর ছাড়িলে সকল লোকেরই খাদ্য হয়; মাঝের অক্ষর ছাড়িলে তাহা দ্বারা সকলকেই সন্তুষ্ট করা যায় এবং শেষ অক্ষর ছাড়িলে তাহা হইতে সকলেই ভয় পায়।

জুলাই, ১৮৮৭।

ভারতের অসভ্যজাতি।

সখার পাঠক পাঠিকা! এই যে ভাল ভাল কাগজে পরিষ্কার অক্ষরে ছাপান নানা প্রকার বই পড়িতেছ, সুন্দর সুন্দর জামা, কাপড়, জুতা, ছাতা ব্যবহার করিতেছ, কত প্রকার সুমিষ্ট খাদ্য আহার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছ; আবার দীর্ঘকালের জন্য বিদ্যালয় সকল বন্ধ হইলে বাড়ী যাইবার সময় রেলের গাড়ি কিম্বা কলের জাহাজে চড়িয়া 'পনর দিনের পথ এক দিনেই যাইতেছ, তোমরা কি মনে কর পৃথিবীতে চিরকালই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে? না, তা নয়, আমরা যে সকল সুবিধা এখন ভোগ করিতেছি তাহা চিরকালও ছিল না কিম্বা হঠাৎ এক দিন কিম্বা এক সময়েও হয় নাই; এ সকল মানুষের শিক্ষা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে হইয়াছে। তোমরা যত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিবে তত জানিতে পারিবে যে, পৃথিবীর অবস্থা ক্রমে পরিবর্তন হইয়াছে। বেশি দিনের কথা নয়, আমরা যখন তোমাদিগের মত বালক ছিলাম তখন সখার মত এমন এক খানি ভাল কাগজ ছিল না যাহা পাঠ করিয়া আমরা সৎশিক্ষা পাইতাম। এখন কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরে গ্যাসের আলো এবং কলের জল হইয়া মানুষের কত সুবিধা হইয়াছে, কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এ সকল কিছুই ছিল না; পরিষ্কার জলের অভাবে কলিকাতার মত বড় বড় সহরে লোকের যে কি কষ্ট হয় তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। কলিকাতা হইতে ঢাকা কিম্বা মুরশিদাবাদ এখন এক দিনেই যাওয়া যায়, কিন্তু আগে যখন রেলের গাড়ি এবং কলের জাহাজ হয় নাই তখন অনেক দিন লাগিত। কেবল যে যাইতে বিলম্ব হইত তাহা নয়, যাওয়া আসা অতি বিপদজনক ছিল; স্থলপথে চোর ডাকাইতের ভয়, জল পথের ত কথাই নাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় বড় বড় নদী বাহিয়া প্রাণটি হাতে করিয়া যাইতে হইত। কেবল যে আমাদিগের দেশেই এইরূপ নানা প্রকার সুবিধা জনক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নয়, অন্যান্য দেশেও হইয়াছে। তোমরা শুনিয়া থাকিবে আগে বিলাত হইতে এ দেশে আসিতে ছয় মাস আবার এদেশ হইতে বিলাতে যাইতে ছয় মাস লাগিত, এখন সেই মাসের পথ একুশ বাইশ দিনের হইয়াছে চব্বিশ সপ্তাহের পথকে তিন সপ্তাহের ক[illegible] কত সময় কত বিদ্যাবুদ্ধি, পরিশ্রম ও [illegible] এবং কত লোকের সাহায্য লাগিয়াছে

তোমাদিগকে কি বলিব। দেখিলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! একশত দেড় শত বৎসরের মধ্যে যদি এত উন্নতি হইতে পারে তাহা হইলে একবার মনে করিয়া দেখ দুই তিন হাজার বৎসরে মানুষের অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব! আর বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে। যে ইংলণ্ড আজ এত পরাক্রমশালী, এত উন্নত দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই ইংলণ্ডের অবস্থা কি ছিল তোমরা জান কি? সেই সময়ে যে সকল লোক ঐ দেশে বাস করিত তাহাদিগের ঘর বাড়ী ছিল না; তাহারা চাষ করিয়া শস্যাদি উৎপন্ন করিতে জানিত না; পর্ব্বতগুহায় কিম্বা বড় বড় গাছের কোটরে বনে জঙ্গলে বাস করিত; বনের পশু মারিয়া আহার করিত, পশুর ছাল গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করিত। তখন তাহারা অসভ্য ছিল। সেই দেশ এখন কি হইয়াছে! এখন বোধ হয় তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে না যে, এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ মাত্রেই অসভ্য ছিল, অর্থাৎ তখন কাহারও ঘর বাড়ী ছিল না, পরিচ্ছদ ছিল না, অস্ত্র শস্ত্র ছিল না, পশু পক্ষীরা যেমন ইচ্ছামত ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, ক্ষুধা হইলে আহার অন্বেষণ করে, ভবিষ্যতের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিতে জানে না, তখনকার মানুষও ঠিক তাই ছিল। মানুষের এই অবস্থাকেই প্রকৃত অসভ্য অবস্থা বলে, কত কাল পূর্ব্বে যে, মানুষ মাত্রেরই অবস্থা এরূপ ছিল তাহা বলিয়া দেওয়া কঠিন, তোমরা যত শিক্ষা করিবে, পুরাতত্ব ভূতত্ব প্রভৃতি পাঠ করিবে জানিতে পারিবে যে, এ সকল কত প্রাচীন কথা।

বর্ত্তমান কালেও পৃথিবীর অনেক স্থানে অসভ্য-জাতীয় মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়; আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আসিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ সকলের স্থানে স্থানে নানা জাতীয় অসভ্য মনুষ্য বাস করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে সকল অসভ্য জাতি বাস করে যাহাতে তাহাদিগের বিষয় তোমরা কিছু জানিতে পার সেই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লেখা হইতেছে।

ইতিহাসে পড়িয়া থাকিবে যে, প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে হিন্দুরাই প্রধান ছিলেন, পরে মুসলমানেরা আসিয়া হিন্দুদিগকে পরাজয় করিয়া আপনাদিগের অধিকার স্থাপন করেন। মুসলমানেরা অনেক দিন রাজত্ব করার পর এখন ইংরেজরা এদেশের রাজা হইয়াছেন। এই সকল ঘটনার বহুকাল পূর্ব্বে,—এত পূর্ব্বে যে এখন ঠিক করিয়া সময় নিরূপণ করা কঠিন, ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসী অসভ্য ছিল; কালক্রমে মধ্য আসিয়ার পশ্চিম প্রদেশ হইতে এক দল মনুষ্য আসিয়া ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগের আধিপত্য স্থাপন করেন এবং আপনাদিগকে "আর্য্য" অর্থাৎ পূজ্য বা মানব কুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন। আদিম অধিবাসীরা আর্য্যগণকে যে সহজে ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করিতে দিয়াছিলেন তাহা নয়; তাহারা অনেক বিবাদ অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সংখ্যাতে অল্প হইলেও আর্য্যদিগের বল, বুদ্ধি, কৌশল, সাহস ও একতা আদিম অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বেশি ছিল বলিয়া অবশেষে আদিম অধিবাসীরা পরাজিত হয়। পরাজিত হইয়া কেহ কেহ আর্য্যদিগের দাসত্ব স্বীকার করে এবং কালক্রমে তাঁহাদিগের সহিত মিশিয়া যায়; কিন্তু যাহারা

অপেক্ষাকৃত বীর্য্যবান এবং স্বাধীনতাপ্রিয় তাহারা দাসত্ব স্বীকার না করিয়া এমন সকল দুর্গম জঙ্গলময় পাহাড়ে গিয়া বাস করে যেখানে মানুষে সহজে যাইতে পারে না। ভীল, কোল, চুয়াড়, ধাঙ্গড়, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি এখন আমরা দেখিতে পাই তাহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগের বংশধর। ইহারা যে প্রকৃত অসভ্য তা বলা যায় না, কারণ যাহারা কেবল পশু পক্ষী মৎস্য শীকার করিয়াই আহার করে, চাষ বাস করে না তাহারাই প্রকৃত অসভ্য, কিন্তু যে সকল জাতির বৃত্তান্ত বলা হইতেছে ইহারা যদিও আহারের নিমিত্ত পশু পক্ষী শিকার করে তথাপি ইহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ধান গম প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকে এবং সকলেই অন্ততঃ এক খানি কৌপিন পরে, একবারে উলঙ্গ কেহই থাকে না। প্রকৃত অসভ্য না হউক ইহারা অসভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কত দেশের কত অসভ্যজাতি সভ্য হইয়া গিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগের অবস্থা এখনও কেন এত হীন? ইহার কারণ আছে, অন্যান্য অসভ্য জাতির মত ইহারাও অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত, সহজে কাহারও সহিত মিশিতে চায় না, মিশিবার আবশ্যকও হয় না, কারণ ইহাদিগের জীবনে অভাব অতি কম, আর ইহারা যে সকল স্থানে বাস করে সে সকল স্থান প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর এবং দুর্গম বলিয়া অপর লোক কেহ সেখানে যায় না এবং যাইবার বড় একটা আবশ্যকও হয় না। ইহারা মান্ধাতার আমল হইতে এক রকম কাজ করিয়া আসিতেছে, এক রকম গৃহে বাস করিতেছে, এক রকম খাদ্য আহার করিতেছে, কিছুরই পরিবর্ত্তন নাই, কিছুরই উন্নতি নাই। পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি হইবেই বা কোথা হইতে? যে সকল কারণে জাতীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় ইহাদিগের মধ্যে তাহার কিছুই নাই; শিক্ষা কাহাকে বলে জানে না, নীতি কাহাকে বলে জানে না, প্রতিদ্বন্দীতা একবারে নাই, উন্নত অবস্থার লোকের সঙ্গে মিশে না, কি করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে? ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠজাতিরা হাজার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম এবং উদারতার গৌরব করুন, তাঁহারা এই সকল আদিম অধিবাসীদিগকে বরাবর ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছেন, কখন তাহাদিগের উন্নতির চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তোমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে যে, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা করেন নাই কিম্বা আমরাও যাহা কখন কল্পনা করি নাই, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকেরা সাত সমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়া তাহা করিতেছেন এবং ঈশ্বর ইচ্ছায় অনেকটা পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। পাদ্রি সাহেবেরা এখন এই সকল অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং তাহাদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যে উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহারা কাজ করিতেছেন তাহাতে বোধ হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সকল অসভ্য জাতিরা শিক্ষিত ও সভ্য হইয়া উঠিবে।

যাহাতে তোমরা সহজে বুঝিতে পার কোন্ অসভ্য জাতি ভারতবর্ষের কোন্ অংশে বাস করে এই উদ্দেশে একখানি ক্ষুদ্র মান-চিত্র (Map) দেওয়া হইল; ইহাতে জাতির নামগুলি স্পষ্ট করিয়া লেখা এবারে ধাঙ্গড়দিগের বিষয় সংক্ষেপে লি- যাইতেছে।

ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, রাঁচি, সম্বলপুর প্রভৃতি প্রদেশ সকলের পাহাড় ও জঙ্গলে ধাঙ্গড় দিগের বাস। আমরা যদিও ইহাদিগকে ধাঙ্গড় বলিয়া থাকি কিন্তু এই জাতির প্রকৃত নাম "ওরাঁও"। কতকাল হইতে যে ইহারা এই সকল স্থানে বাস করিয়া আসিতেছে তাহা বলা যায় না, বোধ হয় তিন চারি হাজার বৎসরের কম নয়, ইহাদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে, ইহারা প্রথমে কুনকাল দেশ হইতে আসিয়া রোথায় বসতি করে, পরে একদল ছোটনাগপুরের দিকে আর একদল রাজমহলের দিকে যায়, যে দল রাজমহল পাহাড়ে গিয়া বাস করে তাহারা "পাহাড়ী" নামে পরিচিত (ইহাদের বৃত্তান্তও পরে জানিতে পারিবে)।

তোমরা বোধ হয় অনেকেই ধাঙ্গড় দেখিয়াছ, বিশেষতঃ যাহারা কলিকাতায় থাক, কারণ এখানে গৃহস্থের বাড়ীর নর্দ্দমা প্রভৃতি অপরিষ্কার হইলে ইহারাই প্রায় পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায়। অধিকাংশ অসভ্যজাতির মত ধাঙ্গড় দেখিতে কদাকার, রং সকলেরই কাল, পেট মোটা, কপাল ছোট, চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং ভাব শূন্য, কিন্তু দুই এক জনের আকার অবয়ব সুন্দর না হউক বেশ সুগঠন। ইহারা মাথায় লম্বা লম্বা চুল রাখে এবং সে গুলিকে জড়াইয়া মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক দিগের মত খোঁপা বাঁধে, অর্থাৎ আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মত খোঁপাটি উচু করিয়া না রাখিয়া চুলের নিচে গুঁজিয়া রাখে। ইহাদিগের পরিচ্ছদ অতি সামান্য একখানি কৌপিন পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ ভাল, কারণ স্ত্রীলোকেরা সাড়ীর মত কিছু জড়ায় আবার কখন কখন চাদরও করিয়া থাকে। আকারে আর পরিচ্ছদে যাহাই হউক ইহারা বেশ প্রফুল্লচিত্ত এবং কর্ম্মিষ্ঠ। কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতির স্ত্রীলোকেই অলঙ্কার ভাল বাসে, সভ্য এবং ধনী লোকেরা না হয় সোণা রূপা, হীরা, মুক্তা নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া আপন আপন শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন, গরিব অসভ্য বেচারিরা এ সকল বহুমূল্য দ্রব্য কোথায় পাইবে, তাহারা শঙ্খ, প্রবাল, পাখীর পালক, পুঁতির মালা দিয়া শরীর সজ্জিত করে। এই সকল ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা আবার প্রায় সর্ব্বাঙ্গেই উল্কি পরিয়া থাকে। উল্কি পরা কাহাকে বলে বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। অনেক জাতীয় অসভ্যের মধ্যে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই উল্কি পরে, কিন্তু ধাঙ্গড় দিগের পুরুষের গায়ে বড় একটা উল্কির দাগ দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে যুবা পুরুষেরা অনেক সময়ে সাধ করিয়া বাহুতে উল্কি পরে। স্ত্রীলোকদিগের মাথায় যদি চুল কম হয় তাহা হইলে ইহারা পরচুলা ব্যবহার করিয়া থাকে, এ বিষয়ে আর ইহাদিগকে অসভ্য বলিবার যো নাই, কারণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সুসভ্য দেশের মহিলারা প্রায়ই পরচুলা পরিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে বালিকা কিম্বা যুবতীদিগের মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা জন্মিলে যেমন "সই" পাতানের প্রথা আছে ধাঙ্গড় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও সেই রূপ আছে, তবে ইহারা "সই" না বলিয়া "গুই" বলিয়া থাকে।

ধাঙ্গড়দিগের ঘর বাড়ী অতি সামান্য, অপরিষ্কার এবং বিশৃঙ্খল; মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, সুকর, মুরগি সকলের এক যায়গায় বাস। ঘর বাড়ীর এইরূপ অভাব এবং দুর্দ্দশা বলিয়া প্রত্যেক গ্রামে এক একখানি নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে, যেখানে গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত যুবা পুরুষেরা রাত্রিতে

শয়ন করিয়া থাকে, এবং এই ঘরের সম্মুখের উঠানে দিনের বেলায় গ্রামের যুবক যুবতীরা একত্রিত হইয়া নাচে, গায় এবং আমোদ করে। ধাঙ্গড়দিগের মধ্যে যদিও বাল্যবিবাহ নাই, কিন্তু হিন্দুদিগের দৃষ্টান্তে অনেক পরিবারের মধ্যে এখন এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যেমন পিতা মাতা কিম্বা অন্য আত্মীয়েরা বর কন্যা মনোনীত করিয়া থাকেন, ধাঙ্গড়দিগের মধ্যে তাহা নাই, ইহাদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিবে তাহারাই আপন আপন স্ত্রী পুরুষ মনোনীত করিয়া লয়। বিবাহের দিন স্থির হইলে বর আপন আত্মীয় বন্ধুগণকে সঙ্গে করিয়া বিবাহ করিতে যায়। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত বরের একবার ভান যুদ্ধ হয়, তাহার মানে এই, যে কন্যার পক্ষের লোকেরা যেন কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে চায় না আর বর যেন কন্যাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে চায়। এই ভান যুদ্ধ অতি প্রাচীনকালের প্রকৃত অসভ্য দিগের আচার ব্যবহারের চিহ্ন স্বরূপ। কৃত্রিম যুদ্ধ শীঘ্রই মিটিয়া যায় এবং তখন নৃত্য গীত আরম্ভ হয়, এই নৃত্য গীতে বর কন্যাও যোগ দেয়। ধাঙ্গড়দিগের বিবাহে কোন মন্ত্রাদি নাই, কেবল হরিদ্রা মাখা এবং সিন্দুর পরা হইলেই বিবাহ হইয়া গেল। হলুদ মাখার সময় বর কন্যাকে একখানি হলুদ বাটা শীলের উপর দাঁড়াইতে হয়; তাহাদিগের আত্মীয় বন্ধু চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায় এবং একখানি চাদর দিয়া কন্যা পাত্রের সমস্ত শরীর ঢাকিয়া দেয়, এই ঢাকার মধ্যে থাকিয়া বর কন্যাকে এবং কন্যা বরকে হলুদ মাখাইয়া দেয়; ইহার পর বর কন্যা স্নান করিয়া আসে, তখন বর কন্যাকে সিন্দূর পরাইয়া দেয়। এই সিন্দূর পরানকে ধাঙ্গড়েরা "সিন্দূর" দান বলে। বুদ্ধিমান ধাঙ্গড় দিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রত্যেক বিবাহ যে ঠিক এই প্রণালী অনুসারে হয় এরূপ বোধ হয় না। ধাঙ্গড়দিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই।

ধাঙ্গড়েরা বেশ পরিশ্রমপটু; ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে,পরিশ্রম করিবার নিমিত্তই তাহারা জন্মিয়াছে। ধাঙ্গড়াদগের খাদ্যের মধ্যে ভাত আর দাল প্রধান; সাক, তরকারি কচিৎ আহার করে, তবে পশু পক্ষী মারিয়া প্রায়ই খাইয়া থাকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সূর্য্যতেই সপ্রকাশ, ইহারা উপাসনার প্রয়োজন বোধ করে না, কারণ ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর কখন অনিষ্ট করেন না। অন্যান্য অসভ্য জাতির মত ইহারাও ভূত, প্রেত, বিশ্বাস করে, এবং এই সকল উপদেবতাগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত পূজাদিও করিয়া থাকে। পরকাল সম্বন্ধে ধাঙ্গড়দিগের কিছুই জ্ঞান নাই, মানুষ মরিয়া গেলে তাহার কি হয় তাহা কিছুই জানে না, তবে অপমৃত্যু হইলে ভূত হয় বলিয়া বিশ্বাস করে; বিশেষতঃ বাঘে যে মানুষকে মারিয়া ফেলে সে মানুষ যে বাঘ হয় এটি ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। ইহাদিগের মধ্যে শব দাহ প্রথা প্রচলিত আছে, মৃত ব্যক্তির শরীর পুড়িয়া গেলে, ছাই এবং পোড়া অস্থিগুলি একত্র করিয়া কলসিতে করিয়া মৃত ব্যক্তির ঘরের নিকটে ঝুলাইয়া রাখে, এবং আগামী শীতকালে ফেলিয়া দেয়। যেখানে সেখানেই যে ফেলিয়া দেয় তাহা নয়, এই মৃত ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষদি অস্থি সকল যেখানে ফেলা হইয়াছে সেই ফেলিয়া দেয়।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দুর্গাপুর প্রভৃতি

অনেকগুলি ধাঙ্গড় ঘর বাড়ী বাঁধিয়া বাস করিতেছে, আপন দেশ অপেক্ষা কলিকাতায় বেশি উপার্জ্জন করিতে পারে বলিয়াই ইহারা এখানে আছে। কলিকাতার ময়দানে মিউনিসিপালিটির অধীনে এবং বড় বড় বাগানে এই সকল ধাঙ্গড়কে খাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহারা বেশ পরিশ্রম পটু, তবে এদেশে কিছু দিন থাকিলে, এদেশের লোকের সঙ্গে মিসিলে ইহারাও কপটতা শিক্ষা করে। আপন আপন দেশে যখন যথেষ্ট শস্য জন্মে তখন অনেকে আবার এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, আবার শস্যাদি ফুরাইলে এদেশে চলিয়া আসে। পাদ্রি সাহেবেরা এখন ধাঙ্গড়দিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ধাঙ্গড়দিগের দেশে অনেক স্থানে তাঁহারা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন, অনেক ধাঙ্গড় খ্রীষ্ট ধর্ম্মও অবলম্বন করিয়াছে।

ক্রমশঃ

বালক কলবার্ট।

ন কাজের ফল ভাল হইলেই যে তাহা সাধুকার্য্য হইল, তাহা নহে। অভিপ্রায় দেখিয়া সাধুতার বিচার করা হয়। মনে কর কোন দরিদ্রবালক অনাহারে ক্রন্দন করিতেছে; তাহার কষ্ট দেখিয়া তোমার প্রাণে দয়া হইল; তোমার সঙ্গে কিছু নাই, কেবল তোমার জলখাবার দুইটা কি তিনটা পয়সামাত্র আছে। তুমি তোমার নিজের কষ্টের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাকে ঐ পয়সাগুলি দিলে। সে তোমাকে চিনে না, অন্য কোন লোকও সেখানে নাই; সুতরাং তোমার এ কার্য্যের জন্য প্রশংসালাভের সম্ভাবনা নাই, তুমি সে প্রত্যাশাও রাখ না। এরূপ অবস্থায় তোমার ঐ কার্য্য অতি যৎসামান্য হইলেও তাহাকে সাধুকার্য্য বলিব।

আবার মনে কর কোন ধনশালী জমিদার সংবাদ পত্রে নিজের সুখ্যাতি প্রচারের ইচ্ছায় অথবা রাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকট রায় বাহাদুর বা রাজাবাহাদুর উপাধিলাভের প্রত্যাশায় সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যে দশ হাজার টাকা দান করিলেন। তাঁহার হয়ত প্রকৃত পরহিতৈষণা নাই, তাঁহার দরিদ্র প্রজাবর্গ হয় ত তাঁহার উৎপীড়নে অস্থির। এরূপ স্থলে তাঁহার এই দানকে সাধুকার্য্য বলিতে পারি না। শুদ্ধ সত্যনিষ্ঠা, দয়া, কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া যে কার্য্য করা যায় তাহাই প্রকৃত সাধুকার্য্য নামের যোগ্য। তাহাতেই মানুষের হৃদয় উন্নত হয়। আর কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে যে কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা সাধুকার্য্য নহে, তাহাতে মানুষের অন্তঃকরণ উন্নত হয় না।

সৎকার্য্যের প্রতি অনুরাগ ও অসৎকার্য্যের প্রতি ঘৃণা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে বহু দিন অসৎ পথে থাকিয়া যাহাদের প্রাণ অসার হইয়া গিয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। অসৎপথে থাকিয়া সুখভোগ করা অপেক্ষা সৎপথে

থাকিয়া কষ্ট পাওয়াও ভাল, ইহাই মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থার ভাব। এই জন্যেই যখন আমরা দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তি প্রবল প্রলোভন সত্বেও কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা তাঁহার সৎসাহস দেখিয়া আনন্দিত হই এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, সে অবস্থায় নীচ স্বার্থের অধীন না হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুসরণ করাই যথার্থ মহত্ত্ব। নিম্নলিখিত ঘটনা ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল।

ব্যাপ্টিষ্টি কল্‌বার্টের বয়স যখন পনর বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে একজন বস্ত্রব্যবসায়ীর অধীনে কর্ম্মশিক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দেন। এক দিন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের চারি প্রকারের বস্ত্রসহ এক ধনী বণিকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাঁর একটী গৃহের পরদা প্রস্তুত করিবার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তিনি নিজের মনোমত বস্ত্র পছন্দ করিয়া লইবেন এই অভিপ্রায়ে বস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁহার নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বস্ত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বণিক্ বস্ত্র মনোনীত করিয়া তাহার ত্রিশ গজ ক্রয় করিলেন। মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে কল্‌বার্ট ভ্রমক্রমে বলিলেন, ইহার প্রতি গজের মূল্য 'পনর ক্রাউন।' কিন্তু ইহার প্রকৃত মূল্য গজ প্রতি আট ক্রাউন। বণিক তাহা জানিতেন না। তিনি কলবার্টের কথানুসারে সমস্ত মূল্য চুকাইয়া দিলেন।

দোকানে ফিরিয়া আসিলে পর বৃদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ীর কথায় কল্‌বার্ট নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

কিন্তু লোভী বৃদ্ধের ইচ্ছা ঐ সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে। বৃদ্ধ বলিতে লাগিল,—"বেশ, বেশ! তুমি বড় সুছেলে। এক দিন তোমা হইতে তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। পনর ক্রাউন! আমার ইচ্ছা করিতেছে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠি। যাহার দাম ছয় ক্রাউনও নয়, তাহা বেচিয়া পনর ক্রাউন! আট ক্রাউনের বদলে পনর ক্রাউন দরে ত্রিশ গজ কাপড়! প্রতি গজে সাত ক্রাউন অধিক লাভ! আজ আমার কি শুভক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।"

ব্যাপ্টিষ্টি বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি একটু পশ্চাতে সরিয়া গিয়া বলিলেন,"মহাশয়! বলেন কি? আমার একটা ভুল হইয়া গিয়াছে বলিয়া কি আপনি তাহা হইতে অন্যায় রূপে লাভ করিতে চান না কি?"

অর্থ লোলুপ বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ! বুঝিয়াছি, তুমি ইহার কিছু অংশ চাও, না? অবশ্য তোমাকেও ইহা হইতে কিছু দিব।"

বালক কল্‌বার্ট ধীর ভাবে নিজের টুপিটী হস্তে লইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি এরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারিব না। আমি এখনি ঐ ভদ্রলোকটীর কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিব এবং তিনি অতিরিক্ত যে টাকা দিয়াছেন তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিব।"

মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে কল্‌বার্ট এক লম্ফে দোকানের বাহিরে উপস্থিত হইয়া ঐ বণিকের নিকট চলিলেন। অসাধু বস্ত্রব্যবসায়ী হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল।

বণিকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ক[illegible] বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। দ্বারবান্ প্রথমে তাঁ[illegible] প্রবেশ করিতে দিল না, বলিল, তাহা[illegible] এখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবে[illegible]

কিন্তু কল্‌বার্টের আগ্রহ ও অনুনয় দেখিয়া সে অবশেষে তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কল্‌বার্ট তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দ্বারবান্ বণিকের গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিলে, বণিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?"

দ্বারবান্ বলিল, "আজ্ঞা, সেই কাপড়ের দোকানের ছেলেটী আসিয়াছে; সে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।"

বণিক বলিলেন, "তাহাকে বল, এখন দেখা হইবে না।"

কল্‌বার্ট বাহির হইতে মিনতি করিয়া বলিলেন, "আমি একটী কথামাত্র নিবেদন করিব।"

বণিক্ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আবার তুমি কেন আসিয়াছ? তুমি কি চাও? আমি ত তোমার কাপড়ের দাম চুকাইয়া দিয়াছি? তবে আবার কি? আমার কাজ আছে। তুমি যাও"

বণিকের কথায় ব্যাপ্টিষ্টির একটুও ভয় হইল না। তিনি মনে মনে জানিতেন তিনি কোন অন্যায় কার্য্য করিতে আসেন নাই। তবে ভয় পাইবেন কেন? চলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, তিনি একেবারে বণিকের গৃহের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বণিক মনে করিতেছিলেন দ্বারবান্‌কে হুকুম দিবেন যে, কল্‌বার্টকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহার সাহস দেখিয়া তিনি মুহূর্ত্তেকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

কলবার্ট বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার সহিত অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি; [illegible]ও আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ করি নাই, তথাপি [illegible]ত আপনার ক্ষতি হইয়াছে।"

[illegible]ই কথা শুনিয়া বণিক্ আরও বিস্মিত [illegible]। কল্‌বার্টও সুবিধা বুঝিয়া গৃহের মধ্যে একটু অগ্রসর হইলেন, এবং জামার পকেট হইতে কতকগুলি মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমাকে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যে চারিশত পঞ্চাশ ক্রাউন দিয়াছিলেন তাহা এই। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই টাকা লইয়া আমার প্রদত্ত রসীদ খানি ফিরাইয়া দিন। আমি আপনার নিকট যে কাপড় বিক্রয় করিয়াছি তাহার মূল্য পোনর ক্রাউন হিসাবে না হইয়া আট ক্রাউন হিসাবে হইবে। তাহা হইলে আমি আপনার দুইশত চল্লিশ ক্রাউন পাইব, বাকী দুইশত দশ ক্রাউন আপনি ফিরাইয়া পাইবেন। আমি ঐ টেবিলের উপর সমস্ত রাখিয়াছি।"

এই সকল কথা শুনিয়া বণিকের ক্রোধ চলিয়া গেল। তিনি মিষ্টবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক ত? তুমি কি ঠিক জান ইহাতে কোন ভুল হয় নাই।"

কল্‌বার্ট উত্তর করিলেন, "না মহাশয়! আমি যাহা বলিলাম ইহাতে কোন ভুল নাই। আপনার কাজের সময় আপনাকে বিরক্ত করিলাম বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমি স্বয়ং আমার ভুল বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বে যদি আপনি তাহা জানিতে পারিতেন তাহা হইলে আমার আক্ষেপ রাখিবার স্থান থাকিত না। আমি এখন বিদায় হই।"

বণিক বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর, তুমি কি জান যে, আমি কাপড়ের দর দামের বিষয় কিছু জানি না, সুতরাং তুমি ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত টাকা নিজে লইতে পারিতে?"

"সে কথা আমার মনেই আসে নাই।"

"কিন্তু যদি ইহা তোমার মনে হইত, তাহা হইলে কি করিতে?"

"এরূপ ইচ্ছা আমার মনে আসা অসম্ভব।"

তুমি সাধুতার অনুরোধ এই যে টাকা আমাকে

ফিরাইয়া দিলে, ইহা যদি আমি তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করি?”

ব্যাপ্টিষ্টি কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া বলিলেন, “আমার ঐ টাকাতে কি অধিকার আছে? এবং আপনিই বা উহা আমাকে দিবেন কেন? আমি কখনই উহা লইব না।”

বণিক্ ব্যাপ্টিষ্টির হস্ত নিজের হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, “আমি তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।” বণিকের এক একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল কল্‌বার্টকে ঐ টাকা গ্রহণ করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। কিন্তু পাছে তাঁহার মনে ক্লেশ হয় এই আশঙ্কায় তাহা হইতে নিরস্ত হইয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

ব্যাপ্টিষ্টি সত্বর বণিকের বাটী হইতে বাহির হইয়া যেমন রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন, অমনি কে সজোরে তাঁহার জামার কলার ধরিল। ব্যাপ্টিষ্টি দেখিলেন তাঁহার প্রভু বৃদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী। কলবার্ট টাকা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট গালি বর্ষণ পূর্ব্বক বলিল, “যা, আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা। আর তোকে আমার কাজ করিতে হইবে না। আমাকে যেন আর কখনও তোর মুখ দেখিতে না হয়।”

* * *

সেই দিন সন্ধ্যাকালে ব্যাপ্টিষ্টির পিতামাতা আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় বালক কলবার্ট অপ্রতিভ ও দুঃখিত ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমার মনিব আমাকে কর্ম্ম হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।”

বৃদ্ধ কলবার্ট একটু রুষ্ট ভাবে বলিলেন, “তবে বোধ হয় তুমি কোন অন্যায় কাজ করিয়াছিলে?”

তখন ব্যাপ্টিষ্টি সমস্ত ঘটনা সরলভাবে যথাযথ বর্ণন করিলেন। তিনি কোনও কথা বাড়াইয়া বলিলেন না, তাঁহার প্রভুর চরিত্রের কোন প্রকার নিন্দাও করিলেন না। তাঁহার কথা শেষ হইলে তাঁহার পিতা সগর্ব্বে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র বটে, তুমি বেশ কাজ করিয়াছ।”

তাঁহার মাতাও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “হাঁ বাবা, ব্যাপ্টিষ্টি, তুমি ঠিক কাজ করিয়াছ।”

ভিখারিণীর প্রার্থনা।

(১)

“দ্যাখো বাবা একবার চেয়ে,
দুয়ারে যে আছিগো দাঁড়ায়ে,
পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়
ম’রে যাই ক্ষুধার জ্বালায়
চরণও ত চলে নাকো আর
চাও বাবা চাও এক বার।

(২)

“এক মুঠো অন্ন সুধু চাই
তাও কি এ পোড়া ভাগ্যে নাই?
কচি কচি শিশু দুটী আছে
অন্ন বিনে শুকিয়ে যে গেছে
কি নিয়ে তাদের মুখে দেবো
কোন্ প্রাণে ঘরে ফিরে যাব?

(৩)

“তোমাদের এ ধন থাকিতে
আমরা কি পাব না খাইতে?

ঈশ্বরের রাজ্যের ভিতরে
মোরা কি মরিব অনাহারে?
সুখ ইচ্ছা অন্য কিছু নাই
এক মুঠো অন্ন সুধু চাই।

(৪)

"চাও তবে একবার চাও
এক মুঠো অন্ন সুধু দাও
তোমাদের "জয় জয়" হবে
এক গুণে দশ গুণ পাবে।
কাঙালেরে এক মুঠো দিলে
শত মুষ্টি মেলে পরকালে।"

মেরী কার্পেণ্টার।

স্নেহ, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি গুণে স্ত্রীজাতীর হৃদয় পরিপূর্ণ। স্ত্রীজাতীর হৃদয়ে যদি এই সকল প্রবৃত্তিগুলি না থাকিত, যদি তাঁহাদিগের হৃদয় পুরুষের মত কঠিন হইত, অন্যের দুঃখ কষ্টে যদি তাঁহাদিগের হৃদয় ব্যথিত না হইত, অন্যের চক্ষে জল দেখিলে যদি ইহাঁদিগের চক্ষের জল না পড়িত, তাহা হইলে আর মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকিত না। মাতার স্নেহ, ভগ্নীর ভালবাসা,—এই সকল আছে বলিয়া আমরা কত দুঃখ কষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি, কত শোক যন্ত্রণা ভুলিতেছি, কত সুখে সুখী হই-[illegible]। যদি ইহাঁদিগের হৃদয়ে এই স্বর্গীয় [illegible]গুলি না থাকিত, যদি স্ত্রীজাতীর হৃদয় [illegible] না হইয়া কঠিন হইত, স্নেহ মমতা প্রভৃতি [illegible]ত, তাহা হইলে পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট অনেক বাড়িয়া যাইত। স্ত্রীজাতীর হৃদয়ে স্নেহ, মমতা, দয়া ও পরোপকারের প্রবৃত্তি আছে বলিয়া পৃথিবীর অনেক দুঃখ কষ্ট কমিয়া গিয়াছে। রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখ কষ্টে ও ক্লেশ যন্ত্রণায় সহানুভূতি, এমন আর কে করিতে পারে? সংসারের সহস্র কার্য্যের মধ্যেও তাঁহাদিগের এই প্রবৃত্তি কার্য্য করিতেছে। আবার এমন কতগুলি রমণী আছেন, যাঁহারা সংসারের আর সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরোপকার ব্রতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি কখন দৃক্‌পাতও করেন নাই। অন্যের দুঃখ, অন্যের দুর্দশা মোচনের জন্য, অন্যের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য, তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। মানুষের মধ্যে ইহাঁরা দেবী। আমরা ক্রমে ইহাঁদিগের এক একটি চিত্র সখার পাঠিকাদিগের সম্মুখে ধরিব। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশে এ প্রকার দৃষ্টান্ত থাকিলেও তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন; সুতরাং হয়ত অনেক সময় আমাদিগকে বিদেশীয় দৃষ্টান্ত পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।

পরোপকার ব্রতে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন,মেরী কার্পেণ্টারের নাম, তাঁহাদিগের মধ্যে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। ইহাঁর দয়া, ইহাঁর পরোপকারের প্রবৃত্তি, কেবল আত্মীয় বা স্বদেশীয়দিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, কিন্তু এই দূরদেশ, ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইনি বাল্যে এই পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং আজীবন ইহাতেই নিযুক্ত ছিলেন।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এক্‌ষিটার নামক স্থানে ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার নামে একজন অতি সদাশয় এবং পরহিতৈষী ধর্ম্ম-যাজক বাস করি-

তেন। ১৮০৭ সালে ৩রা এপ্রিল তাঁহার একটী কন্যা জন্মে; এই কন্যাই মেরী কার্পেণ্টার। ডাক্তার কার্পেণ্টারের আরও দুটী কন্যা এবং দুটী পুত্র জন্মে। বাল্য কালেই মেরীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং অত্যন্ত কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যে জ্ঞান ও ধর্ম্মে তাঁহার জীবন উজ্জ্বল হইয়াছিল, মেরী বাল্য বয়সেই ধার্ম্মিক পিতার নিকট তাহার উপদেশ পাইয়াছিলেন; এবং যে পরোপকার ব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সদাশয় পরহিতৈষী পি[illegible] দৃষ্টান্তে, এই বাল্য বয়সেই তাহার বীজ [illegible] হইয়াছিল। ১৮১৭ সালে ডাক্তার কা[illegible] ব্রিষ্টলে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ [illegible] ব্রিষ্টলে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া ব্য[illegible]

দিগকে বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এবং নীতি ও ধর্ম্ম বিষয় উপদেশ দিবার জন্য, একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মেরীর জ্ঞানতৃষ্ণা অতিশয় প্রবল ছিল; তিনি পিতার নিকট বালকদিগের সহিত শিক্ষা লাভে প্রবৃত্ত হইলেন, পিতাও কন্যার শিক্ষা লাভের ইচ্ছা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া যত্নের সহিত ক্রমে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মেরীও পিতার যত্নে ও উপদেশে, এবং আপনার পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে গ্রীক, লাটিন, গণিত, সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠিন কঠিন বিষয়ে অল্প বয়সেই বিশেষ সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে বালিকারা যে পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিত মেরী তদপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা লাভ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কার্য্য করিবার ইচ্ছা মেরীর বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত অধিক ছিল। ক্রমে মেরী তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্ম প্রচার, শিক্ষাদান, পুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি নানা কার্য্যে ডাক্তার কার্পেণ্টার ব্যাপৃত ছিলেন। মেরী পিতাকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বয়স এই সময় সতের বৎসর মাত্র; কুমারী কার্পেণ্টার মাতা ও ভগ্নীর সাহায্যে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিলেন; এবং অত্যন্ত দক্ষতার সহিত বালকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কুমারী কার্পেণ্টার অনেক দিন হইতে [illegible]দিগের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন [illegible]র ইচ্ছা করিতেছিলেন, ক্রমে সে ইচ্ছা পরিণত হইল। একটী বালিকা বিদ্যালয় [illegible]করিয়া রীতিমত বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৩১ সালে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ভারও তিনি গ্রহণ করিলেন; এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা দান ব্যতীত ছাত্রদিগের বাড়ীতে যাইয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সময় তাঁহার আর এক দিকে দৃষ্টি পড়িল। বিলাতের নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, ইহারা যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করে তাহা প্রায় সমস্তই সুরাপানে ব্যয় করে, স্ত্রী পুত্র কিম্বা পরিবারের অন্য সকলকে নিতান্ত কষ্টে, এমন কি অনেক সময় অনাহারে দিনপাত করিতে হয়। অনেক সময় এমনও ঘটে যে, স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া পিতা মাতা সন্তানদিগকে পথে পরিত্যাগ করিয়া যায়। কুমারী কার্পেণ্টার যখন ছাত্রদিগের বাড়ীতে যাইতেন, তখন এই সকল শোক দুঃখের ছবি তাহার চক্ষে পড়িত; এই সকল দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইত; ইহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং কি উপায়ে এই নিরাশ্রয় নিরন্ন লোকদিগের দুঃখ ক্লেশ দূর করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে পরোপকার ব্রতে কুমারী কার্পেণ্টার নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই ব্রিষ্টল নগরে তাহার সূত্রপাত হইল। কিছুকাল চিন্তার পর তিনি জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ব্রত সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন, কিছুতেই তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তিনি ক্রমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং ঈশ্বরের নিকট বল ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটী ঘটনাতে তিনি অভিষ্ট বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইলেন। ১৮৩৩ সালে দুই মহাত্মা তাঁহাদিগের গৃহে অতিথি

হন ; এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মপরায়ণতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সকল প্রকার হিতজনক কার্য্যে একাগ্রতা দেখিয়া কুমারী কার্পেণ্টার অনেক শিক্ষা লাভ করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে একজন,মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়,আর একজন আমেরিকার বোষ্টন নগর নিবাসী ডাক্তার জোসেফ টুকারম্যান্। রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার যশ সেখানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাঁহার উদার শিক্ষায় কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডে ও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান পাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ডাক্তার কার্পেণ্টারের পরম বন্ধু ছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার ষ্টেপল্টন্ গ্রোভ নামক স্থানে প্রতিদিন এই উদার প্রশস্ত-হৃদয় অতিথির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই রাজা রামমোহন রায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন, ক্রমে রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিল, রোগের হাত হইতে তিনি আর রক্ষা পাইলেন না; ২৭ এ সেপ্টেম্বর অপরিচিত স্থানে ভারতের গৌরব রবি অস্তমিত হইলেন। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুতে কুমারী কার্পেণ্টার, তাঁহার একজন পরম বন্ধু হারাইলেন। রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তিনি একান্ত মনে রাজার সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে যে করুণার ধারা নিসৃত হইয়া, শত সহস্র দুঃখী সন্তানদিগকে শান্তি প্রদান করিয়াছিল, রাজা রামমোহন রায়ের রোগ শয্যায় তাহার প্রথম বিকাশ হয়। এই মহাত্মার মৃত্যুতে কুমারী কার্পেণ্টার অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হন। রামমোহন রায়ের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি বুঝিলেন, যে পৃথিবীর সকলই দুদিনের জন্য; সামান্য সুখের জন্য অনন্ত কালের সুখ পরিত্যাগ করা উচিত নহে ; পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই মহত্ব, আত্মসুখে যাহারা ব্যস্ত, তাহাদের বৃথা জীবন। এই রূপে মৃত রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তিনি তাঁহার জীবনের মহত্ত্বের কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে মহৎ ও সাধু ইচ্ছা সকল জাগিয়া উঠিতে লাগিল, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হইল।

ডাক্তার টুকারম্যানের নিকটেও কুমারী কার্পেণ্টার অনেক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অতিশয় দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; বোষ্টন নগর নিবাসী দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচনের জন্য ইনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। এতদিন পরে কুমারী কার্পেণ্টারের আশা পূর্ণ হইল। ১৮৩৫ সালে দরিদ্রদিগের অবস্থা ও কার্য্য পরিদর্শনের জন্য একটি সভা স্থাপিত হয়। বিশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি এই সভার সম্পাদক ছিলেন, এবং তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে এই সভা দ্বারা অনেক কার্য্য হইয়াছিল। অনেক দুর্দ্দশা-গ্রস্ত পরিবারে সুখ শান্তি বিস্তারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহকারীদিগের উৎসাহ ও কার্য্য তৎপরতার অভাবে, তাঁহার উদ্দেশ্য এই সভা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল না। তিনি ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম কিছুই কমিল না; কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমেরিকা হইতে ডাক্তার গ্যানেট্ নামক আর একজন দরিদ্র-হিতৈষী পুরুষ ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

পম্পীয়াই।

আমরা অনেক সময় মানুষের খেয়াল্ই বুঝিতে পারি না, প্রকৃতির খেয়াল্ কেমন করিয়া বুঝিব! প্রকৃতির অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইয়া থাকিতে হয়; মানুষের সামান্য বুদ্ধিতে তখন আর কুলায় না; মানুষ অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, আর ভাবে এ কি হইল! ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণবায়ু, সমুদ্র জলের উচ্ছ্বাস প্রভৃতিতে কত কত ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে সুন্দর অট্টালিকায় সুখে বাস করিতেছ, আমোদ প্রমোদে মাতিয়া সময় কাটাইতেছ; যে নানাবিধ ফুল ফলে সুশোভিত উদ্যানে বিচরণ করিয়া কত সুখী হইতেছ, যে পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছ; তোমার সে সুন্দর গৃহ সে সুন্দর উদ্যান, সে সুদৃঢ় পর্ব্বত,—কিছুই নিরাপদ নয়। প্রকৃতির খেয়াল্ হইলে তোমার সুন্দর গৃহ মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, ধূলা হইয়া যাইতে পারে, তোমার সুন্দর উদ্যান মরুভূমিতে পরিণত হইতে পারে, যেখানে ঐ পর্ব্বত মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেখানে সমুদ্র তরঙ্গ খেলিতে পারে। ভাবিয়া দেখিতে হইলে, আমরা মৃত্যুরই হাতের মধ্যে রহিয়াছি; কখন প্রকৃতির খেয়াল্ হইবে, আর নিমেষে প্রকৃতির এ ক্ষেত্র হইতে আমাদিগকে কি জানি কোথায় যাইবে!

যে সে কথা থাক্, প্রকৃতির একটী খেয়ালে একদশের পম্পীয়াই নগরের যে দশা হইয়াছিল, তাহাই আজ বলিব। ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাৎ, এদুটীই বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ, এবং এ দুয়েরই মধ্যে খুব সম্বন্ধও আছে। এই দুয়ের দ্বারা যে কত সর্ব্বনাশ, কত কি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ১৭৫৫ সালের ১লা নভেম্বর এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া লিসবন্ নগর একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। বিপদ প্রায় একা আসে না। একদিকে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে নগরের সমস্ত অট্টালিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল, এ দিকে চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, ভূতল হইতে ভয়ঙ্কর গন্ধকের বাষ্প উত্থিত হইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। যাহারা কোনমতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা সমুদ্র তীরে গিয়া আশ্রয় লইল; কিন্তু সেখানেও আর এক বিপদ উপস্থিত হইল, সমুদ্র জল পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া তীরের দিকে আসিতে লাগিল; জল-স্রোত আসিয়াই তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, এবং কত জীবন সেই সঙ্গে ভাসিয়া গেল। কতক-গুলি লোক নিরাপদ ভাবিয়া এক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রের গ্রাস হইতে তাহারাও রক্ষা পায় নাই; সেই স্থানটী একেবারে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ভূমিকম্প এত প্রবল হইয়াছিল যে, জাহাজের যে সকল নঙ্গর নদীগর্ভে ফেলা ছিল, সে গুলি একেবারে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। এবং নদীর জল একেবারে ১৪।১৫ হাত স্ফীত হইয়া আবার মুহূর্ত্তে পূর্ব্বের মত হইয়া গেল। কথিত আছে সহস্রেরও অধিক লোক এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে প্রাণ ত্যাগ করে।

১৮১৫ সালে সম্বদ্বীপে যে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাৎ হইয়াছিল, তাহাতে বার হাজার লোকের মধ্যে কেবল মাত্র ছাব্বিস জন জীবিত ছিল। এই

সময় আর একটী ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হয়, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবায়ু উত্থিত হইয়া, মানুষ গরু ঘোড়া প্রভৃতি সমস্ত আকাশের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল; বৃক্ষ সকল উন্মূলিত করিয়া সমুদ্র ছাইয়া ফেলিল।

• ১৬৬৯ সালে এট্না হইতে যে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাতে চৌদ্দখানি নগর ও গ্রাম ধ্বংস হইয়া যায়। এবং যে ৫৪ দিন পর্য্যন্ত অগ্ন্যুৎপাত হইতে ছিল, তাহাতে সূর্য্য বা চন্দ্র কেহ দেখিতে পায় নাই; ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতির কোনটাই সামান্য নহে। ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এক ভয়ানক ঘটনা হয়, দৌলতগাঁর ঝড় অনেকের মনে থাকিতে পারে। এই ভয়ঙ্কর ঝড়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালার যে কত লোকের প্রাণ নাশ হয়, তাহার সংখ্যা নাই। ঝড় বলিয়া সেটী বিখ্যাত, কিন্তু বাস্তবিক ঝড় না বলিয়া সেটীকে জলপ্লাবন বলাই উচিত। আমরা শুনিয়াছি, যে দিন এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হইয়াছিল, সেদিন কিছু পূর্ব্বেও কেহ কিছু বুঝিতে পারে নাই; অকস্মাৎ এই ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হয়। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অনেক গুলি নদীর জল প্রায় শুকাইয়া যায়, সেই সমস্ত জল একত্রিত হইয়া দৌলতগাঁ প্লাবিত করিয়া দেয়।

এখন মূল প্রস্তাবের বিষয় বলা যাউক। বেলা অপরাহ্ন, আকাশ বেশ নির্ম্মল, বেশ শীতল বাতাস বহিতেছে। পম্পীয়াই নগরবাসীগণ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এমন সময় অকস্মাৎ বিসুভিয়স পর্ব্বত হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সেই ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, অমাবস্যার ন্যায় অন্ধকারে সমস্ত নগর পূর্ণ হইল। ক্রমে সেই ধূম রাশির সহিত ভস্ম, উত্তপ্ত প্রস্তর খণ্ড, এবং গন্ধকের বাষ্প উত্থিত হইতে লাগিল। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ভস্ম ও প্রস্তর দুই তিন হাত উচ্চ হইয়া জমিয়া গেল। ক্রমে নদীতে বাণ আসিবার সময় যে প্রকার শব্দ হয়, সেই প্রকার শব্দ হইতে লাগিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, কৃষ্ণ বর্ণের কাদার এক প্রকাণ্ড স্রোত দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই কর্দ্দম স্রোতে নগরের সমস্ত রাজপথ এবং গৃহ প্রভৃতি পূর্ণ হইয়া গেল। যে, যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় এই স্রোতে প্রোথিত হইল; যাহারা গৃহের মধ্যে ছিল, তাহারা সেখানেই এই কর্দ্দমে আবৃত রহিল, যাহারা পলায়ন করিতেছিল, তাহারাও কতক প্রস্তর বৃষ্টিতে আহত হইয়া পতিত হইল, কেহ বা গন্ধকের গন্ধে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল, কেহ বা কর্দ্দম স্রোতে প্রোথিত হইয়া রহিল। তিন দিন তিন রাত্র ক্রমাগত এই ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল; এবং এ তিন দিনে সমস্ত নগরটী একেবারে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে আর কোন উপদ্রব ছিল না; তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে; ভস্ম ও প্রস্তর বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে, কর্দ্দম স্রোত নিবারিত হইয়াছে, গন্ধকের বাষ্প আর উঠিতেছে না। নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে, চারিদিক স্থির—ধীর; কিন্তু মহাসমৃদ্ধশালী সে পম্পীয়াই নগর আর নাই—নগরের চিহ্ন মাত্রও নাই। যেখানে পম্পীয়াই নগরের রাজপ্রাসাদ, মন্দির ও অন্যান্য সহস্র সহস্র অট্টালিকা ছিল, সেখানে কেবলমাত্র ভস্ম ও কর্দ্দমের স্তূপ দেখা গেল। পম্পীয়াইর সঙ্গে হর্কুলেনিয়া প্রোথিত হয়। প্রায় সতের শত বৎসর এ নগর ভস্ম ও কর্দ্দমের নীচে প্রোথিত এই সময়ের মধ্যে ইহার উপর মাটি জমি এবং কৃষকগণ কৃষিকার্য্যও আরম্ভ ক

পরে একদিন কৃষকগণ খনন করিতে করিতে মাটির নীচে অট্টালিকার চিহ্ন দেখিতে পাইল। তখন ইহার বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হইল; নেপল্‌সের রাজা উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিলেন; এবং খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। ক্রমে পম্পীয়াইয়ের রাজপথ এবং অট্টালিকা সকল বাহির হইতে লাগিল। কোন স্থানে ঝাড়, লণ্ঠন, ছবি প্রভৃতি নানাপ্রকার আসবাব সজ্জিত অট্টালিকা বাহির হইল; কোন স্থানে নানাবিধ দ্রব্য পূর্ণ দোকান দেখা গেল, কোথায়ও মিষ্টান্ন পূর্ণ ময়রার দোকান বাহির হইল; একটী দোকান খনন করিয়া দেখা গেল, যে দোকানী রুটী, পেয়াজ ও মাছের চচ্চড়ী বিক্রয় করিতেছিল, সেই অবস্থায়ই প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। একটা খুব বড় বাড়ী দেখা গেল, নানাপ্রকার গৃহ সজ্জায় বাড়িটী সজ্জিত রহিয়াছে, কিন্তু একটীও লোক নাই; পরে দেখা গেল নীচের একটা ঘরে সতেরটী মানুষের কঙ্কাল রহিয়াছে; দেখিয়া বোধ হইল যে, যখন কর্দ্দম স্রোত গৃহে প্রবেশ করে, তখন গৃহস্বামী তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মাটিতে তাঁহাদের শরীরের এবং বস্ত্রাদি ও অলঙ্কারের অবিকল ছাঁচ রহিয়াছে। সেই ছাঁচ দেখিয়া সমস্তই বেশ বোঝা যায়; ঐ সতের জনের মধ্যে একজন সেই বাড়ীর কর্ত্রী; তাঁহার সূক্ষ্ম রেশমের বস্ত্র পরিধানে ছিল, এবং হাতে একখানি রুমালে কতকগুলি চাবি বাঁধা ছিল, আর এক হাতে একটী ছেলেকে ধরিয়া [illegible]লেন। তাঁহার পাশে একটী যুবতী কন্যা, এবং [illegible]টি ছেলে ভয়ে বসিয়া পড়িয়াছে। আর [illegible]নে দেখা গেল একজন স্ত্রীলোক অলঙ্কারের [illegible]য়া পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় কর্দ্দম [illegible]তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের উপর বড় মমতা, মরিবার সময়ও ঐ স্ত্রীলোক তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, দেখা গেল বুকে করিয়া মাটির মধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। দুই জন চোর একটা ধাতুনির্ম্মিত পুতুল লইয়া পলাইতেছিল, তাহারা সেই অবস্থায়ই প্রোথিত রহিয়াছে। এই প্রকার নানাবিধ অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়াছিল; সমস্ত লিখিতে হইলে অনেক হইয়া পড়িবে।

আমরা পম্পীয়াইয়ের কথা লিখিতে গিয়া প্রকৃতির অনেক খেয়ালের কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি। বাস্তবিক কেন এ সকল ঘটনা ঘটে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কি কারণে ঘটে তাহাও অনেক সময় মানুষের বুদ্ধিতে কিনারা হয় না। অথচ এই সকল অদ্ভুত ঘটনা যে কেবল প্রকৃতির খেয়াল্, তাহাও নহে। ইহার যে কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা নহে; তবে সকল আমরা বুঝিতে পারি না। যেখানে সমতল ভূমি ছিল সেখানে হয়ত পর্ব্বত মালা শোভা পাইতেছে, যেখানে সুন্দর উদ্যান ছিল, সেখানে হয়ত আজ মরুভূমি, যেখানে মহাসমৃদ্ধশালী নগর ছিল, সেখানে হয়ত আজ সমুদ্র তরঙ্গ খেলিতেছে! কেন?—তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহার যে কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা নহে। এক একটী ঘটনায় হয়ত লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন যাইতেছে; কত শত গ্রাম, কত শত সমৃদ্ধ নগর ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; তবু ও ইহার যে কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা নহে। সকলেরই উদ্দেশ্য আছে—প্রকৃতির খেয়ালেরও উদ্দেশ্য আছে; আমাদিগকে লইয়াও প্রকৃতি খেলা করিতেছে; প্রকৃতির কখন কি খেয়াল্ হইবে, তাহাতে কে কোথায় ভাসিয়া যাইব—কে জানে?

———

আগষ্ট, ১৮৮৭।

মেরী কার্পেণ্টার।

(১০৯ পৃষ্ঠার পর।)

ডাক্তার গ্যানেটের আগমন উপলক্ষে কার্পেণ্টারের যত্নে, ব্রিষ্টলে একটী সভা হয়। ডাক্তার গ্যানেটের মুখে আমেরিকার দরিদ্রদিগের উন্নতির বিবরণ শুনিয়া, আপনাদিগের মধ্যেও সেই প্রকার প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ জন্মে। মেরী কার্পেণ্টারও ইহার উপর তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়া, আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত ব্রত পালন করিতে উদ্যোগী হন। তিনি দরিদ্র ও নিরাশ্রয়দিগের বাড়ী যাইয়া, তাহাদিগকে রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে সাহায্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে দুঃখ বিষাদ ও দুর্দ্দশার ছবি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে বিচলিত হইত। কিন্তু তাহাতে তিনি এক দিনের জন্যও কাতর বা নিরুৎসাহ হন নাই। তাঁহার মুখ সকল সময়ই প্রসন্ন থাকিত, হৃদয় সকল সময়ই প্রফুল্ল থাকিত; তাই তিনি দুঃখের মধ্যে সুখ, বিষাদের মধ্যে প্রসন্নতা আনিতে পারিয়াছিলেন। দীন, দুঃখী, দুর্দ্দশাগ্রস্থ লোকেরা তাঁহার অসীম স্নেহে, তাহাদিগের সকল দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়াছিল।

এই সময় একটী গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইল; কুমারী কার্পেণ্টার পিতৃহারা হইলেন। কার্পেণ্টারের স্বভাবতঃ কোমল হৃদয়, এই শোকে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কিন্তু ধীরতার সহিত নিজ শোক চাপিয়া রাখিয়া, শোক সন্তপ্ত মাতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি এই সময়ে কয়েকটী কবিতা রচনা করেন, তাঁহার হৃদয়ের গভীর শোক এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছিল। শাস্ত্র আলোচনায় এবং শাস্ত্র চিন্তায় তিনি অত্যন্ত সুখী হইতেন; এবং এই শোক সন্তাপের সময়, তাহা দ্বারা তিনি আপনাকে অনেক সময় প্রসন্ন রাখিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কত বালক বালিকা, পিতা মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া,—আশ্রয়শূন্য হইয়া, রাজপথে কান্দিয়া কান্দিয়া বেড়ায় তাহার সংখ্যা নাই। এই হতভাগাদিগকে আশ্রয় দান, বা ইহাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য পূর্ব্বে কেহ কোন চেষ্টা করেন নাই। ইহারা একটু [illegible]য়ের জন্য, এক মুঠা অন্নের জন্য, লালা[illegible] বেড়াইত, কিন্তু ইহাদিগের দুঃখ দূ[illegible] কেহ তাহা মোচন করিবার জন্য [illegible] নাই। ক্রমে কুসঙ্গে এবং প্রলো[illegible]

ইহাদিগের চরিত্র দূষিত হইয়া উঠিত; ইহারা চুরী করিতে শিখিত, দস্যুবৃত্তি শিখিত, এবং নানাপ্রকার অসৎকার্য্যে জীবন কাটাইত। আবার এমন কতকগুলি লোক ছিল, যাহারা এই সকল বালক বালিকাদিগকে রীতিমত এই সকল দুষ্কার্য্য শিক্ষা দিত। মেরী কার্পেণ্টারের হৃদয়, এই সকল বালক বালিকাদিগের অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল; এই অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। কি উপায়ে ইহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে অতি সামান্য লোকের দ্বারাও কত সময় কত মহৎ কার্য্যের সূচনা হয়। যে র‍্যাগেড স্কুলের (Ragged School) দ্বারা এখন ইংলণ্ডের এত উপকার হইতেছে, একজন সামান্য চর্ম্মকারের দ্বারা তাহার সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডে পোর্টসমাউথ নামক স্থানে জন্ পাউণ্ডস্ নামে একজন চর্ম্মকার ছিলেন। সদাশয় সাধু প্রকৃতি জন পাউণ্ডস্ দুঃখী অনাথ বালক বালিকাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য অগ্রসর হন। ইনি নিজের জুতার দোকানে অনাথ বালক বালিকাদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা ও সদুপদেশ দিতেন। তাঁহার যত্নে ও উপদেশে অনেক বালক বালিকা, দুঃখ দুর্দ্দশা, পাপ ও অসৎ কার্য্যের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। জন্ পাউণ্ডসের দৃষ্টান্তে অনেক হিতৈষী ব্যক্তি এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন; র‍্যাগেড্ স্কুল স্থাপিত হয়।

কার্পেণ্টার অনেক দিন ধরিয়া, অনাথ বালক [illegible]নের দুর্দ্দশা দূর করিবার উপায় চিন্তা [illegible]লেন, র‍্যাগেড্ স্কুলের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া, [illegible]শার সঞ্চার হইল। ১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট লিউইন্‌স্ মিড্ নামক স্থানে তিনি একটী র‍্যাগেড্ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত, ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তাঁহার চেষ্টা ও আশা ফলবতী হইল। অন্যান্য বিষয়ের সহিত বালক বালিকারা, যাহাতে নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া, উন্নতমনা ও উন্নতচরিত্র হয়, সে দিকে কার্পেণ্টারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পূর্ব্বে যাহারা আশ্রয়-শূন্য সহায়-শূন্য হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত; সৎ উপদেশ এবং সৎসঙ্গের অভাবে যাহারা প্রলোভন ও কুসঙ্গে পড়িয়া, নানাবিধ দুষ্কার্য্যে দিন কাটাইত, মেরী কার্পেণ্টারের আন্তরিক যত্ন ও অক্লান্ত চেষ্টায়, তাহারা ক্রমে সুচরিত্র হইতে লাগিল; অসৎ প্রকৃতি সংশোধিত হইয়া, সাধু প্রবৃত্তি সকল ক্রমে তাহাদিগের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মেরী কার্পেণ্টার জীবনের এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন; কিন্তু তখন আর এক দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণও চুরী প্রভৃতি অপরাধে রাজবিধি অনুসারে দণ্ড পাইয়া থাকে। এই সকল অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ কারাগারে প্রবেশ করিলে, ইহাদিগের স্বভাব সংশোধিত হওয়া দূরে থাক্, কারাগারের অসৎ-প্রকৃতি লোকদিগের সংসর্গে, ইহাদিগের চরিত্র আরও দূষিত হইয়া উঠে, দুষ্কার্য্যে আরও অনুরক্ত হইয়া পড়ে, এবং মুক্তিলাভ করিয়া আবার দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হয়, ও দণ্ড পাইয়া আবার কারাগারে প্রেরিত হয়। একবার কারাগারে প্রবেশ করিলে, আর কেহ, —এমন কি আত্মীয় স্বজনেরাও, আর ইহাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহে না; সুতরাং চুরী প্রভৃতি অসৎ কার্য্যের দ্বারাই ইহারা দিনপাত করিতে বাধ্য হয়। এপর্য্যন্ত আর কেহ এই হতভাগ্যদিগের উদ্ধারের

জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিন্তু মেরী কার্পেণ্টারের পরদুঃখ-কাতর হৃদয়, ইহাদিগের দশা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। তিনি বালঅপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য, সংস্কার-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। এবং এই সংকল্প সাধন উদ্দেশে ১৮৫১ সালে সংস্কার-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া, একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তক প্রকাশ করা ভিন্ন, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইল; ১৮৫৪ সালে তাঁহার চেষ্টায়, এ সম্বন্ধে এক আইন বিধিবদ্ধ হইল, এবং এই সময় হইতে অনেকে এ বিষয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। সাধারণের এই আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখিয়া, কুমারী কার্পেণ্টারও উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন; এবং ১৮৫২ সালে কিংসউড্ নামক স্থানে সংস্কার-বিদ্যালয় খোলা হইল;—মেরী কার্পেণ্টারের জীবনের আর একটী মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তিনি আন্তরিক যত্ন, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার সহিত, এই বিদ্যালয়ের জন্য খাটিতে লাগিলেন; অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চেষ্টার সুফল ফলিতে লাগিল। কুমারী কার্পেণ্টারের আর একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, বালক ও বালিকা দিগকে এক বিদ্যালয়ে রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে; ইহাতে বালিকাদিগের পাঠের বিশেষ বিঘ্ন হয়। এজন্য তিনি বালকদিগের জন্য, একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। কবি বায়রণের পত্নী, মেরী কার্পেণ্টারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন; তিনি নিজ ব্যয়ে ব্রিষ্টল নগরে "রেড্‌-লজ্" নামক একটী বড় বাড়ী কিনিয়া দিলেন। ১৮৫৪ সালে ১০ই অক্টোবর, এই বাড়ীতে বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খোলা হইল। কুমারী কার্পেণ্টার এই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার লইলেন। তাঁহার আন্তরিক যত্নে, তাঁহার শিক্ষায়, তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে, বালিকাদিগের চরিত্র সংশোধিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে তাহাদিগের হৃদয়ের সাধু বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। যাহারা এক সময়ে, সমাজ এবং আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, চুরী প্রভৃতি নানা প্রকার অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া জীবন কাটাইত; বার বার কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, সমাজকে যাহারা আপনাদিগের শত্রু মনে করিত, এবং যথাসাধ্য শত্রুতা সাধনের চেষ্টা করিত; মেরী কার্পেণ্টারের যত্নে ও শিক্ষায়, উপদেশে ও দৃষ্টান্তে, তাহারাই আজ সংসারে সৎপথ অবলম্বন করিয়া সুখে জীবন কাটাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, ইহাদিগের মধ্যে অনেকে আবার অন্যকে সংশোধন করিবার জন্য যত্নবতী হইয়াছেন। বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিক্ষার সঙ্গে, সৎপথে থাকিয়া যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এ প্রকার নানা কার্য্য ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। "রেড্‌লজ্" বিদ্যালয়ের সুফল দেখিয়া, অন্যান্য স্থানেও এই প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পৃথিবীর প্রধান ব্যক্তিরা যাহা করিতে পারেন নাই, একটী অবলা সেই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। এই জন্যই একটী কথ প্রচলিত আছে;—"সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর ত[illegible] সহায়।"

যাঁহাদিগের হৃদয়ে দয়া অধিক[illegible] দিকে যাঁহাদিগের ইচ্ছা প্রবল, তাঁ[illegible] থাকিতে পারেন না। কারাগারে কয়ে[illegible]

ক্লেশ যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্যই কারাগারে পাঠান হয়; কিন্তু দেখা যায় যে, চরিত্র সংশোধন হওয়া দূরে থাক্, কারাগারের অত্যাচারে এবং যন্ত্রণায়, ইহাদিগের চরিত্র আরও দূষিত হইয়া উঠে। সংস্কার-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, মেরী কার্পেণ্টার আশানুরূপ ফল পাইয়াছিলেন। এখন কারাবাসিদিগের দুর্দ্দশা যাহাতে দূর হয়, তাহারা যাহাতে শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি যত্নবতী হইলেন। ১৮৬৪ সালে "আমাদের কারাবাসী" (our convicts) নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে কারাগারের দূষিত কার্য্য প্রণালীতে, কয়েদীগণের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন; এবং যাহাতে কারাগারের অবস্থার উন্নতি এবং কয়েদীগণের শিক্ষা ও সংশোধনের উপায় হয়, তাহার জন্য কতগুলি সৎপরামর্শ দেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় নাই; এই পুস্তক প্রকাশের পর এ সম্বন্ধে খুব আন্দোলন উপস্থিত হয়; এবং ইংলণ্ডের কারাগারগুলির সংশোধন ও উন্নতির সূত্রপাত হয়।

মেরী কার্পেণ্টারের বয়স এখন ষাইট বৎসর হইয়াছে। তিনি এক প্রকার বৃদ্ধ দশায় উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সেই যৌবনের উৎসাহ উদ্যম বর্ত্তমান। স্বদেশে তাঁহার কার্য্য এইখানেই এক প্রকার শেষ হইল। কিন্তু এখন আবার এই দূরদেশ,—ভারতবর্ষের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহার পরমবন্ধু মহাত্মা [illegible] রামমোহন রায় ভারতবর্ষবাসী ছিলেন, [illegible] ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনু-[illegible]। এদেশীয় রমণীদিগের সুশিক্ষার কোন [illegible]াল বন্দোবস্ত নাই বলিয়া, তিনি অত্যন্ত [illegible] এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি এদেশে আসিবার জন্য ব্যগ্র হন। এই বয়সে স্বদেশ ছাড়িয়া দূরদেশে যাইতে লোকের কত আশঙ্কা হয়, কিন্তু মেরী কার্পেণ্টারের পরহিতৈষী হৃদয়ে কোন আশঙ্কা উপস্থিত হইল না। ১৮৬৬ সালে তিনি প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন। স্বদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি বালিকা-দিগের জন্য একটী শ্রমিক-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আজ পর্য্যন্ত সে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে, এদেশে বালিকাদিগের ভাল শিক্ষা হই-তেছে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; এবং উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য, "ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল" স্থাপন করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মেরী কার্পেণ্টার প্রথমে বম্বে পদার্পণ করেন। বম্বে স্ত্রীশিক্ষা এবং কারা-গারের সংস্করণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তার পর বম্বে হইতে কলিকাতা আসিবার পথে, মান্দ্রাজে কয়েকদিন সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী পরিদর্শন করেন। ২০শে নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। মেরী কার্পেণ্টার এদেশীয় মহিলাদিগের মঙ্গল উদ্দেশ্য করিয়া এই দূরদেশে আসিয়াছেন, এ কথা বঙ্গ মহিলারা বিস্মৃত হন নাই। বঙ্গ মহি-লারা এই সময়ে তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি, দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। মেরী কার্পেণ্টারও ইহাঁদিগের বিনয় ও নম্রতাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া, কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া শিক্ষা প্রণালী পরি-দর্শন করিতে লাগিলেন; এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্ন-তির জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। তাঁহার যত্নে বম্বে ও কলিকাতায় দুইটী সামাজিক বিজ্ঞান সভাও স্থাপিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির চেষ্টা এবং বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন ভিন্ন, মেরী কার্পেণ্টার কারাগার এবং কারখানা প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। কারখানা গুলিতে অনেক দরিদ্র ও নিরন্ন লোক প্রতিপালিত হইতেছে দেখিয়া, পর-দুঃখ-কাতর কার্পেণ্টার একান্ত সুখী হন। তিনটী প্রধানউদ্দেশ্য লইয়া পরহিতৈষী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। প্রথম—স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি; দ্বিতীয়—ইংলণ্ডে যে প্রণালীতে সংস্কার-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই প্রণালীতে সংস্কার-বিদ্যালয় স্থাপন, তৃতীয়—কারাগার সংস্কার। গভর্ণর জেনারেলের নিকট এই তিনটী বিষয়ে, মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; এবং যাহাতে এই উদ্দেশ্য ফলবতী হয়, যথাসাধ্য তাহার চেষ্টাও করেন। সময়ে তাঁহার উদ্দেশ্য ফলবতী হইয়াছিল। ২০শে মার্চ্চ মেরী কার্পেণ্টার ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ভারতবর্ষে আসিয়া যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে ছয়মাস অবস্থান" নামক এক পুস্তকে সে সমস্ত প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে বালকদিগের শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা, শ্রমিক-বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, কারা-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে, তাঁহার অভিপ্রায় এবং অনেক সৎ-পরামর্শ লিপিবদ্ধ করেন। এই পরহিতৈষী অবলার হৃদয় কতখানি মহৎ ভাবে পরিপূর্ণ ছিল, ইহাতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি অন্য কোন-ভাবে পরিচালিত হইয়া নিজের মত প্রকাশ করি নাই, ভারতবর্ষের জন্য কার্য্য করা, এবং ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করাই, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।" প্রসংশা বা সম্মান লাভের আকাঙ্খায়, সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি এদেশে আসেন নাই। নিস্বার্থ পরোপকার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাই তাঁহার আশা—তাঁহার উদ্যম ফলবতী হইয়াছিল।

কার্পেণ্টার দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে অসিয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে মহিলাদিগের জন্য নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করেন; এবার শারীরিক অসুস্থতার জন্য কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই; বম্বে হইতেই তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। এইবার দেশে ফিরিয়া গিয়া, এদেশীয়দিগের সহিত ইংলণ্ডের লোকের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্টতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, এবং ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতির জন্য, "জাতীয় ভারত সভা" স্থাপন করেন। ১৮৬৯ সালে মেরী কার্পেণ্টার তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার চেষ্টার সুফল ফলিতেছে, তাঁহার আশা ফলবতী হইতেছে, দেখিয়া তিনি একান্ত সুখী হন; এবং ক্রমে তাঁহার সংকল্প সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া, স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১৮৭৩ সালে এই পরহিতৈষী মহিলা বৃদ্ধ বয়সে কারাগারের অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য, আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৮৭৫ সালে, মেরী কার্পেণ্টার শেষবার এদেশে আসেন; বম্বে, পুনা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয়, কারাগার প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া মান্দ্রাজে গমন করেন। সেখানে চিকিৎসালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করেন; এবং মহিলাদিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে দেখিয়া বিশেষ সুখী হন। মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় ও পরে ঢাকায় গমন করেন। ইহার পর বরদা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধা[illegible] প্রধান স্থান পরিদর্শন করিয়া, দেশে ফি[illegible] যান। মেরী কার্পেণ্টার সকল শ্রেণীর লো[illegible] সঙ্গেই মিশিতেন। তিনি শেষবার যখন [illegible]কাতায় আসেন, তখন বরাহনগরে

জীবিদিগের প্রত্যেকের বাড়ীতে যাইয়া, তাহাদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের উপরই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, ইহারাই তাঁহার সন্তান তুল্য ছিল; ইহাদিগের জন্যই এই পরহিতৈষী মহিলা, আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

কার্পেণ্টারের ভারতবর্ষে আগমনের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার অক্লান্ত যত্নে, চেষ্টায় ও অধ্যবসায় গুণে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অনেক উন্নতি হইয়াছিল, কারাগারের অবস্থার সংস্কার হইয়াছিল, বিশেষতঃ স্ত্রী-কয়েদীদিগের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন, ও সংস্কার-বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে রাজ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। দেশের লোক যাহা করিতে পারেন নাই, দেশের লোকের যে দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, একটী বিদেশীয় অবলা, বৃদ্ধ বয়সে এই দূরদেশে আসিয়া, সেই সকল মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

মেরী কার্পেণ্টারের বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি কমিয়াছে বটে, হৃদয়ের উৎসাহ, উদ্যম কমে নাই। এই বৃদ্ধ বয়সেও অনেক প্রকার হিতকর কার্য্য করিবার কল্পনা করিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল! যে পরহিতৈষী অবলার হৃদয় হইতে করুণাধারা নিস্সৃত হইয়া, শত সহস্র দুঃখী সন্তপ্ত দিগকে শান্তি বিতরণ করিতেছিল, ধীরে ধীরে মৃত্যু তাঁহাকে এ জগৎ হইতে লইয়া গেল। রোগ [illegible]ণে মৃত্যুযন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় [illegible] মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ [illegible]ল। ১৪ই জুন নিয়মিত কাজ করিলেন; এক [illegible]ময় একজন বন্ধুর সহিত অনেক হিতকর বিষয় কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রিতে একটী প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া নিদ্রা গেলেন; এই নিদ্রাই তাঁহার চিরনিদ্রা হইল; কুমারী কার্পেণ্টার চিরশান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার পালিতা কন্যা শয়নালয়ে গিয়া দেখিল, কুমারী কার্পেণ্টারের প্রাণশূন্য দেহ শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। ১৯এ জুন করুণার প্রতিমূর্ত্তি,—এই পরহিতৈষী অবলার দেহ "আর্নোস্‌ভেল' নামক স্থানে সমাহিত হয়। যে সকল বালক বালিকাদিগকে তিনি সুশিক্ষিত ও সংসারের উপযুক্ত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহারা আজ মাতৃহারা হইয়া, শোক পরিচ্ছদ পরিয়া, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সমাধিভূমিতে উপস্থিত হইল। ধনী দরিদ্র সকলেই আজ এই মহিলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন। মেরী কার্পেণ্টারের জীবন পরোপকার ব্রতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া, নিজের জীবন কেবল পরোপকারের জন্যই উৎসর্গ করিয়াছিলেন, নিজের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। গরিব দিগকে দয়া বিতরণ করিয়া, দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়া, রোগীর সেবা করিয়া, সন্তপ্তকে সান্ত্বনা দিয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করিয়া, তিনি যে সুখ পাইতেন; অন্য সুখ তাঁহার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ। এদেশের লোক তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী, বিশেষতঃ এদেশের রমণীগণ কখনও তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না। নিস্বার্থভাবে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি জীবনের ব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার দ্বারা এত মঙ্গলকর কার্য্য হইতে পারিয়াছে। বড় বড় লোকে যাহা করিতে পারেন নাই, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া একটী অবলা তাহা সম্পন্ন

করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই লোকে বলে,—"সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"
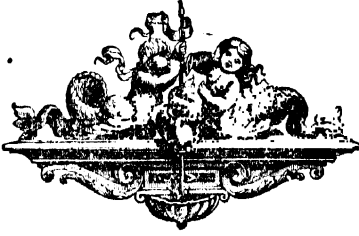
গণ্ডার।

মানুষের মধ্যে যেমন সভ্য ও অসভ্য আছে, জন্তুদিগের মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ থাকিবার সম্ভাবনা। শ্বেতাঙ্গেরা যেমন কৃষ্ণকায়দিগকে "কালা আদমি" বলিয়া উপহাস করে—অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করে, জন্তুদের মধ্যেও সেরূপ প্রথা আছে কিনা জানি না। কিন্তু কতকগুলি জন্তু দেখিতে একটু পরিষ্কার, একটু ভদ্র, একটু সভ্য বলিয়া বোধ হয়। আর কতকগুলি দেখিতে কদাকার ও অসভ্য এবং চলা ফেরাতে অভদ্র বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ আপনাদের বন্য-স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের দাসত্ব স্বীকার করে ও অল্প দিনেই অর্দ্ধসভ্য বলিয়া পরিচিত হয় কিন্তু কতকগুলি এমন গোঁয়ার যে কিছুতেই পোষ মানে না সুতরাং তাহারা চিরকালই জানোয়ার হইয়া থাকে।

গণ্ডার এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। ইহারা দেখিতে অতিশয় কদাকার এবং অত্যন্ত অসভ্যের ন্যায় বাস করে। আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে যেমন ধাঙ্গড় জন্তুদের মধ্যে সেইরূপ গণ্ডার। আমি যেখানে যেখানে গণ্ডার দেখিয়াছি সেইখানেই দেখিয়াছি যে, তাহারা পচাজল, নানারূপ আবর্জ্জনা ও কর্দ্দমের মধ্যে রহিয়াছে। সকল গায়ে কাদা লেপা, তাতেই তাদের মহা আনন্দ!! বোধ হয় আমাদের গায়ে চন্দন দিলেও আমরা এত খুসী হই না।

এইত গেল ইহাদের আচার ব্যবহার; আকৃতিও সেইরূপ। ছবিতে দেখিতে পাইবে শরীরখানা কেমন সুবৃহৎ! জন্তুদের মধ্যে যাহাদের সিং আছে তাহাদের সকলেরই মাথার উপর; যেমন গরু, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদের সিং নাকের উপর। দেখিতে কেমন সুশ্রী!! নাকের উপর যেন একটা দাঁত উঠিয়াছে। আমি ভাবি, গণ্ডার যদি কোন দিন আয়নায় মুখ দেখিতে পাইত তবে হয়ত লজ্জায় এতদিন গলায় দড়ী বেঁধে মরিত।

গণ্ডার যে অসভ্য তাহার একটী প্রমাণ এই যে, ইহাদের বাসস্থান অসভ্য এসিয়া ও আফ্রিকা-দেশে। সভ্য ইউরোপে গণ্ডার নাই। অতি প্রাচীনকালে রোম নগরে দুইবার গণ্ডার প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আধুনিক ইউরোপে গণ্ডার দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে পর্টুগালের রাজার জন্য এক গণ্ডার প্রেরিত হয়; ইহা লইয়া ইউরোপে মহা ধূম পড়িয়াছিল; নানাস্থানে ইহার প্রেরিত হইয়াছিল এবং অনেকে নানারূপ জনক বিবরণ লিখিয়াছিলেন। ১৬৮৫
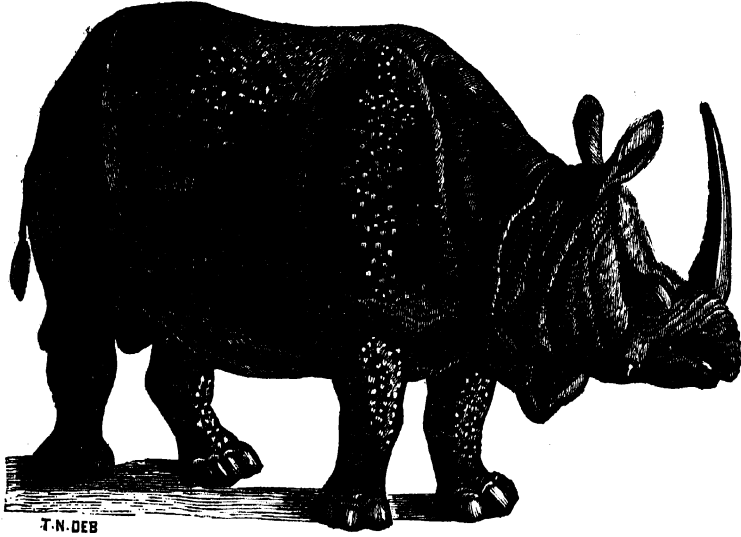
ইংলণ্ডে একটী গণ্ডার আনীত হয়; ইহার পর ১৭৩৯ ও ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে দুইটী গণ্ডার ইউরোপের অনেক স্থানে প্রদর্শিত হয়। ক্রমে দুই একটী করিয়া ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭টী গণ্ডার ইউরোপে প্রেরিত হয়। এই সপ্তমটী জর্ম্মনির রাজার পশুশালার জন্য ক্রীত হইয়াছিল; কিন্তু লণ্ডন পর্য্যন্ত যাইয়াই ইনি লীলা সম্বরণ করেন। ইহার কিছুদিন পর আর একটী জর্ম্মনরাজের পশুশালার জন্য আনীত হয়। আজকাল ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক পশুশালায়ই গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিলাতে "রেজেণ্ট পার্ক" নামক স্থানে পাঁচ রকমের গণ্ডার আছে।

[illegible] পৃথিবীতে মোট কত প্রকারের গণ্ডার আছে [illegible] নিশ্চয় বিবরণ পাওয়া যায় না। এসি-[illegible] চারি প্রকার এবং আফ্রিকায় চারি [illegible] দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন আফ্রি-[illegible] রকমের গণ্ডার আছে। আফ্রিকার গণ্ডারের নাকের উপর দুইদুইটী সিং আছে। আগেরটী বড় এবং পাছেরটী ছোট; কিন্তু এক রকম গণ্ডারের দুইটী সিংই সমান উঁচু হয়। আফ্রিকাবাসী গণ্ডারের নাকের উপরিস্থিত সম্মুখের সিং ২০ ইঞ্চি হইতে ৪ফুট অর্থাৎ আড়াই হাতেরও উপর উচু হইয়া থাকে কিন্তু পাছেরটী ১০ হইতে ২০ ইঞ্চির অধিক কখন ও বড় হয় না।

আমরা ছেলেবেলা "শিশুশিক্ষা"র পড়িয়াছি যে গণ্ডারের চামড়া এতদূর শক্ত যে বন্দুকের গোলা গুলিতে বিদ্ধ হয় না। কিন্তু জানিতে পারা গিয়াছে যে, সে কথা সত্য নহে। আফ্রিকা দেশে ইউরোপের ভ্রমণকারীরা অনেক গণ্ডার শীকার করিয়াছেন। হাড়গিলার ন্যায় একরকম পাখী আছে তাহাদিগকে, যেখানে গণ্ডার থাকে সেই থানেই দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই গণ্ডারের পৃষ্ঠের উপর চড়িয়া থাকে। এই জন্য এই পাখী দিগের নাম "গণ্ডার পাখী" হইয়াছে।

শীকারীরা এই পাখী দেখিয়াই অনেক সময়ে গণ্ডার শীকার করিবার সুবিধা পায়। বেকার সাহেব নামক একজন ভ্রমণকারী গণ্ডার শীকার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। একদিন তিনি এবং কয়েকজন আফ্রিকাবাসী শীকার করিতে গিয়াছিলেন। এক নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দেখিলেন দুইটী গণ্ডার মহাসুখে নিদ্রা যাইতেছে। সাহেব একাকী দুইটী বন্দুক হাতে করিয়া অগ্রসর হইলেন; সাহেব ৬০ হাত দূরে থাকিতেই হঠাৎ তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং একটা গণ্ডার তীব্রবেগে সাহেবকে আক্রমণ করিল। সাহেবও ক্ষিপ্রহস্তে গণ্ডারের গলদেশে বন্দুকের গুলি করিলেন। তখন গণ্ডারেরা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল; সাহেবও তাহার দলবল লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পাছে পাছে ছুটিলেন। একজন তরবারি দ্বারা একটা গণ্ডারের পশ্চাদ্দেশে আঘাত করিয়াছিল বটে কিন্তু অবশেষে গণ্ডার দুটা এমন নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল যে, সেখানে যাওয়া তাদের সাধ্য হইল না। আর একদিন এই সাহেব শীকার করিতে যাইয়া গণ্ডারের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন।

এসিয়াতে চারি প্রকারের গণ্ডার আছে। ইহার মধ্যে দুই রকমের গণ্ডারের দুই দুইটী সিং আছে; এবং অন্য দুই রকমের কেবল মাত্র একটী সিং আছে। (ছবি দেখ) ইহার মধ্যে "ভারতীয় গণ্ডার" নামে এক রকমই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা আকৃতিতে ৪।৫ ফুটের অধিক কখনও উচু হয় না।

আর এক রকমের গণ্ডার আছে তাহাদের কাণের উপর বড় বড় লোম হয়। বিলাতে রেজেন্ট পার্কে এইরূপ একটী গণ্ডার ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম হইতে নীত হইয়াছিল। এই গণ্ডারটী এক নদীতীরে কাদার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, এবং উঠিতে চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারে নাই। সেখানকার প্রায় ২০০ দুইশত লোক ইহার গলায় দুইগাছি দড়ী বাঁধিয়া টানিতে থাকে এবং অবশেষে অতি কষ্টে উঠাইয়া এক গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। পরদিন যখন লোকেরা দেখিল যে, গণ্ডার দেখিতে খুব সবল হইয়াছে এবং দড়ী ছিঁড়িয়া যাইতে পারে তখন তাহারা ভয়ে চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কাপ্তেন হুড্ আটটি হাতী সঙ্গে করিয়া সেখানে গমন করেন। এবং বহুকষ্টে গণ্ডারের পাছের পায়ে দড়ী বাঁধিয়া এবং চারিদিকে হাতীর পাহাড়া রাখিয়া চট্টগ্রামে আনয়ন করেন। এই গণ্ডারটীর নাম "বেগম"। ইহা বিলাতে ১২৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৬০০০ টাকায় বিক্রীত হয়। এখন ইহা অনেকটা শান্ত হইয়াছে এবং রেজেণ্ট পার্কে অবস্থিতি করিতেছে।

গণ্ডার সমস্তদিন আলস্যে কাটায়। প্রায়ই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে শুইয়া থাকে এবং নিদ্রা যায়। রাত্রিতে অনেক পথ চলিয়া থাকে। এবং পথের সম্মুখে যাহা পড়ে তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। গণ্ডার মাংস আহার করে না। ইহারা নিরামিষ ভোজন করে। ইহারা কোন "নিরামিষ ভোজন বিধায়িনী" সভার সভ্য আছে কিনা আমি জানিনা; তবে জন্তুদিগের ম[...] এইরূপ কোন সভা হইলে ইহারা সভ[...] কিংবা সম্পাদক হইবার যোগ্য ইহা ত[...] সংশয়ে বলিতে পারি। হাতীরা এত বড়[...] য়ার হইলেও গণ্ডারকে ভয় করে। গণ্ড[...] পেট চিরিতে বড় ভালবাসে, হা[...]

ইহাদিকে বড় ভয় করে। গণ্ডারের সিংএর নিকট হাতীর দাঁত পরাস্ত।

গণ্ডার হাতীর ন্যায় পোষ না মানিলেও বাঘের ন্যায় হিংস্র নহে; কিন্তু জন্তুর মধ্যে এমন গোঁয়ার আর একটী আছে বলিয়া বোধ হয় না।

অনাথা বালিকা।

১

শ্রাবণের আঁধার রজনী;
অবিরল বরষার ধারা;
ঘন ঘন চমকে বিজলী
জন প্রাণী নাহি দেয় সাড়া।

২

ক্ষুদ্র এক কুটীরের মাঝে
মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিছে;
দেখ ওই বিছানার পাশে
বালিকাটী বসিয়ে রয়েছে।

৩

পরাণের সোদর তাহার
শুয়ে আজি মরণ শয্যায়!
ঔষধের কারণে জননী
অভাগিনী গিয়েছে কোথায়।

৪

"মা মা" বলে থেকে থেকে ভাই,
ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিছে
সযতনে ভগিনী কেমনে
আগুলিয়ে ভাইকে রেখেছে।

৫

ওই শুন! আকাশ বিদারি
এক 'কড়' 'কড়' ভয়ঙ্কর রবে,
বজ্রপাত হইল ধরায়
যেন আজি বিনাশিতে সবে।

৬

"মা! মা! ধর ধর" বলি ভাই
সশঙ্কিতে করিল চীৎকার
বুকে চেপে ধরিল ভগিনী
কিন্তু তারে রাখে সাধ্য কার?

৭

চলে গেছে চিরদিন তরে
আত্মা সেই ক্ষুদ্রদেহ ছাড়ি
জ্ঞান-হারা অবোধ বালিকা
মরা ভাই আছে বুকে ধরি।

৮

অভাগিনী জননী কোথায়?
ঔষধ লইয়ে তাড়াতাড়ি
সেই ঘোর নিশীথ সময়ে
পাগলিনী ফিরিছেন বাড়ী।

৯

ঘরে ফিরে কি দেখিবে সেথা
এই ভাবি আকুল নয়ান,
"এত দুঃখে হায় অন্তর্য্যামী!
কেন মোর রয়েছে পরাণ?"

১০

এই কথা বলিতে বলিতে
গৃহদ্বারে উঠিবে যেমনি
দুঃখিনীর দুঃখ বিনাশিতে
বজ্রপাত হইল তখনি।

১১

পরদিন প্রভাত বেলায়,
প্রতিবেশী সকলে আসিল;
গৃহদ্বারে দাঁড়ায়ে জননী
দেখি সবে বিস্ময় মানিল।

১২

বহুযত্নে—বহুক্ষণ পরে
বালিকার চেতন হইল।
কিন্তু তার জননী সোদর
এজনমে আর না জাগিল!

ভারতের অসভ্যজাতি।

(১০২ পৃষ্ঠার পর।)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধাঙ্গড় জাতি রোথা হইতে এক দল ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করে আর এক দল রাজমহল পাহাড়ের দিকে যায়। যে দল রাজমহল পাহাড়ে গিয়া বাস করে তাহাদিগকেই "পাহাড়ী" বলে, এই পাহাড়ীদিগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

"পাহাড়ী" জাতি যদিও আজ কালি অনেকটা শান্ত ও সভ্য হইয়াছে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে ইহারা অতিশয় কলহপ্রিয় এবং নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিল; এমন কি মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেও ইহাদিগের দৌরাত্মে নিকটবর্ত্তী প্রজাগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। পরে জানিতে পারিবে যে, রাজমহল পাহাড়ের উপত্যকায় অনেক সাঁওতাল বাস করে, এই সকল সাঁওতাল এবং রাজমহল প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার এবং প্রজাগণ এই পাহাড়ীদিগকে আপদ বালাই মনে করিত—কখন আসিয়া মারিয়া ধরিয়া লুট পাট করিয়া লয় এই ভয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত। আজ কালি ইংরাজদিগের সুশাসনে বড় বড় জমিদারদিগের মধ্যে বড় একটা মারামারি, লাঠালাঠি দেখিতে পাওয়া যায় না—অবশ্য একেবারে যে নাই তা বলিতেছি না, তবে পূর্ব্বকালের মত আর নাই। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময় জমিদারদিগের মধ্যে প্রায়ই মারামারি কাটাকাটি হইত, ঐ সময় রাজমহল প্রদেশবাসী জমিদারগণ এই সকল পাহাড়ীদিগের দস্যুবৃত্তির সুবিধা লইয়া তাহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত। পাহাড়ীরা ক্রমে এতই নির্ভীক এবং লুণ্ঠনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে,ঐ সকল প্রদেশের পথে ঘাটে লোকজনের চলাফেরা প্রায় বন্ধ হইয়াছিল, কখন কখন তাহারা গভর্ণমেণ্টের ডাক হরকরাকেও মেরে ধরে ডাকের থলেটি লইয়া পলায়ন করিত। তাহাদিগকে সাজা দিবার নিমিত্ত কখন কখন দলে দলে পুলিস সৈন্য পাঠান হইত, কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না, কারণ গোলমাল হইতে দেখিলেই তাহারা পাহাড়ের উপর উঠিয়া এমন সকল দুর্গম জঙ্গলে লুকাইত যেখানে আর অপর লোকের প্রবেশের সাধ্য থাকিত না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন,—বলে যাহা হয় নাই কলে কৌশলে তাহা হইয়াছে। কিছুতেই আর যখন তাহারা জব্দ হয় না তখন গভর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগের দুজন সুচতুর কর্ম্মচারী এক দিন পাহাড়ীদিগের প্রধান প্রধান মণ্ডল এবং তাহাদের অধীনস্থ লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং বিদায় ক[illegible] তাহাদিগকে নানা প্রকার বস্ত্রাদি দিয়া [illegible] করেন। পাহাড়ীরা দেখিল এত ব[illegible] তাহারা ক্রমেই ঐ সৈনিক পুরুষদিগে[illegible] ঘনিষ্টতা করিতে আরম্ভ করিল এবং [illegible] সৎব্যবহারগুণে এবং উপঢৌকণের

বশ হইয়া পড়িল। এখন পাহাড়ীরা আর সেরূপ দস্যু প্রকৃতি লুণ্ঠনপ্রিয় নাই, অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে, চাস বাস করিতেছে। পাহাড়ীদিগের আকৃতি খাট, মোটা শরীর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহারা অত্যন্ত সাহসী। অন্য অন্য অসভ্য জাতির মত ইহাদিগের রং নিতান্ত কাল নয়, কিন্তু নাক, চোক, কপাল অনেকটা ধাঙ্গড় দিগের মত। পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী না হউক দেখিতে বেশ সুশ্রী। পুরুষেরা বাবুগিরী করিতে বড় ভাল বাসে, চুল গুলিকে সর্ব্বদাই আঁচড়ে খোঁপার মত ক'রে বেঁধে রাখে এবং প্রায় সদা সর্ব্বদাই এক খানি লাল কাপড়ের পাগড়ি বাঁধিয়া রাখে, অন্য পরিচ্ছদের মধ্যে এক খানি খাটধুতি কোমরে জড়ান থাকে। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অনেক ভাল। ইহারা সাদা থান কাপড়ের কোর্ত্তা পরে এবং তাহার উপর একখান রং চং তসরের কাপড় আসামী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় জড়াইয়া রাখে, দেখিতে মন্দ দেখায় না। অলঙ্কারের মধ্যে পলার কাঠমালা এবং ধাতু নির্ম্মিত আংটি পরে।

পাহাড়ীরা তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা; মল্লর, মাল এবং কুমার। প্রথমোক্ত শ্রেণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাদিগের মধ্যেই পাহাড়ীদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বভাব চরিত্রের চিহ্ন অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইহারা শেষোক্ত শ্রেণী-[illegible] অপেক্ষা গম্ভীর প্রকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত [illegible]আমোদপ্রিয়, আহারাদি সম্বন্ধেও ইহারা [illegible] হিন্দু দিগের মত বাছিয়া গুছিয়া খায়; [illegible] একেবারেই খায় না এবং আপন [illegible] অন্যের রাঁধা দ্রব্যও খায় না। ভুট্টা, [illegible] প্রভৃতিই পাহাড়ীদিগের প্রধান খাদ্য। পাহাড়ের ঢালু জমিতে এই সকল শস্য উৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন আর আর আবশ্যকীয় বস্তুই ইহাদিগকে স্থানান্তর হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাদিগের কিন্তু পয়সা কড়ি নাই, বাঁস, কাট, ঘাস পাহাড়ে যথেষ্ট জন্মে, পাহাড়ীরা এই সকল বাঁস, কাট কাটিয়া লইয়া পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের বাজারে যায়, এবং সেখান হইতে ঐ সকল বাঁস এবং কাঠের বিনিময়ে লবণ, তেল, কাপড় প্রভৃতি লইয়া আসে। চাস বাসের ভার স্ত্রীলোকদিগের উপরই। চাসের প্রণালীও অতি সামান্য, একখানি খুন্তি দ্বারা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহাতেই বীজ বপন করা হয়। পুরুষেরা যে স্ত্রীলোকদিগের উপরে চাস বাসের ভার দিয়া মজা করিয়া বসিয়া থাকে তা নয়। তাহারাও জাতীয় রীতি এবং আপন আপন সংস্কার অনুসারে যথেষ্ট পরিশ্রম করে। একটী হরিণ কিম্বা ময়ূর শীকার করিবার নিমিত্ত এমন পরিশ্রম বা কষ্ট নাই যা তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়; একটি মৌমাছির চাকের অনুসন্ধানে চারি পাঁচ ক্রোশ অনায়াসে হাঁটিয়া বেড়ায়; তাহাদিগের গৃহের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য নিজহাতে প্রস্তুত করে; কাঠ, কয়লা, বাঁস, তুলা প্রভৃতি দ্রব্য সকল মাথায় করিয়া বাজারে যায়, এবং আরও কত পরিশ্রম করে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাস করিতে হইলেই পুরুষ পাহাড়ীদিগের মহা মুস্কিল হয়, একাজটি আর তাদের দ্বারা হ'বার যো নাই; কাযে কাযেই স্ত্রীলোকদিগকে করিতে হয়।

পাহাড়ীদের গ্রামগুলি ধাঙ্গড়দের মত অপবিষ্কার নয়, প্রায় প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকেই চাস বাসের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও

পাহাড়ীরা নিজে অপরিষ্কার, কিন্তু ইহাদিগের বাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ধাঙ্গড়দের মত দুর্গন্ধময় নয়। ঘরগুলি বাঁসের বেড়ার, কাদার দেয়াল প্রায়ই নাই; ধাঙ্গড়দের মত ইহাদিগের গরু, ভেড়া, মুরগি, মানুষ সব এক ঘরে থাকে না; গৃহপালিত পশু পক্ষী এবং আহারীয় শস্যাদির ঘর স্বতন্ত্র। ধাঙ্গড়দিগের মত পাহাড়ীদেরও অবিবাহিত যুবকেরা গ্রামের এক খানি নির্দ্দিষ্ট ঘরে রাত্রি বাস করে; কিন্তু যুবক যুবতীরা অন্য সময় বেশ মুক্তভাবে মিশিয়া থাকে এবং যদিও পরস্পর সদা সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে সময় কাটায় তথাপি ইহাদিগের মধ্যে কোন অন্যায় ব্যবহার দেখা যায় না। পাহাড়ীদিগের বিবাহ প্রণালী অতি সহজ; যুবক যুবতীর পরস্পর বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইলে, যদি অন্য কোন আপত্তি উপস্থিত না হয়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের পর বর ও কন্যা উভয় পক্ষের লোকই বরকে একটী আশ্চর্য্য রকম অনুরোধ করে; তাহার মর্ম্ম এই যে, বর যেন কন্যাকে হত্যা না করেন। বহুবিবাহ এবং বিধবা বিবাহ পাহাড়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এক ভাইয়ের মৃত্যু হইলে অপর ভাই মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীগণকে বিবাহ করিতে পারে।

ধাঙ্গড়দিগের মত পাহাড়ীরা শব দাহ করে না—পুতিয়া ফেলে। ধাঙ্গড়দিগের মত পাহাড়ীরাও এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, ইহাদিগের প্রত্যেক পল্লিতে এক একটি করিয়া গ্রাম্য দেবতা আছে, সেই সকল গ্রাম্য দেবতাগণকে তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ইহারা সময় সময় পূজাদি করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস যে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর এই পৃথিবী শাসন করিবার নিমিত্ত প্রথমে সাতজন মানুষ সৃষ্টি করেন এবং ইহারা তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের বংশধর। যদি তোমরা কখন পাহাড়ীদিগের গ্রামে যাও তাহাহইলে দেখিবে যে, প্রত্যেক ঘরের বাহিরে এক একখানি লম্বা বাঁস পোতা; ইহার অর্থ এই যে, এই বাঁস পোতা থাকিলে ভূত প্রেতের কুদৃষ্টি তাহাদিগের উপর পড়িবে না। হাজার অসভ্য হউক, নিষ্ঠুর হউক, আর দুর্দ্দান্ত হউক, পাহাড়ীদিগের একটী মহৎ গুণ আছে; ইহারা প্রায়ই মিথ্যাকথা বলে না। কোন বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইতে হইলে ইহারা তীর ছুঁইয়া সপথ করে যে সকলেই সত্য কথা কহিবে।

পাদ্রি সাহেবেরা অসভ্য জাতিদিগকে যেমন শিক্ষা দিতেছেন পাহাড়ীদিগকেও সেইরূপ দিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই জাতির মধ্যেও অত্যন্ত মাতলামি ঢুকিয়াছে, আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যখন এই জাতিকে উন্নত করিয়াছেন, আর যেন ইহাদিগের অবনতির পথ পরিষ্কার করিয়া না দেন।

ক্রমশঃ

যেমন রোগ তেমনি ব্যবস্থা।

নন্দদুলাল মা· রুমাল বাঁধিয়া, ত· ঠেসান দিয়া, হাত দিয়া, ব· যাছেন। ধরিয়াছে। সম্মুখে বই পড়িয়া রহিয়াছে

দশটাও বাজিয়া গেল ;—ইস্কুলে যাবারও সময় যায়। কিন্তু এমনি মাথা ধরিয়াছে যে মাথা আর তুলিতে পারিতেছেন না। নন্দদুলালের মা আসিয়া দেখেন, নন্দদুলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বুঝি তাঁর নন্দদুলাল ইস্কুলে গিয়াছে। নন্দদুলালকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, “বাবা নন্দদুলাল, আজও কি তোমার মাথা ধরিয়াছে?” এইখানে বলিয়া রাখি, আমাদের নন্দদুলালের এ রোগ নূতন নহে। কি যে হইয়াছে বলিতে পা[illegible]রি না, তবে অনেক দিন হইতেই এ রোগ [illegible]াকে ধরিয়াছে; প্রায়ই নটা দশটার সময় [illegible]মাথা ধরে, দু তিন ঘণ্টা এমনি মাথা ধরা [illegible]যে নন্দদুলাল আর মাথা তুলিতে পারেন [illegible]দুলাল মা বাপের বড় আদরের ছেলে; [illegible]ন, “থাক্ বাবা, তবে আর তোমার এ[illegible] গিয়া কাজ নাই, কি যে হ’ল, কেন আমার নন্দদুলালকে এমন রোগে ধরিল; আজই আমি ডাক্তার আনাইয়া, যাহা হয় এর একটা ব্যবস্থা করিব।” নন্দদুলাল বই লইয়া, মার সঙ্গে গিয়া ঘরে শুইলেন। ডাক্তারের বাড়ী খবর গেল, এদিকে নন্দদুলালের মাথা ক্রমে ছাড়িয়া গেল,—দু তিন ঘণ্টার বেশী মাথা ধরা থাকিত না। এমন সময় ডাক্তার আসিলেন। ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, নন্দদুলাল আর শুইয়া নাই; উঠিয়া এদিক ওদিক করিতেছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া নন্দদুলালের মুখ—কেন জানি না একটু বিমর্ষ হইল। যাহাই হ’ক ডাক্তার আসিবামাত্র নন্দদুলালের মা, বাপ, ভারি ব্যস্ততার সহিত, নন্দদুলালের এই উৎকট ব্যারামের কথা বলিলেন। তাঁহাদিগকে ভারি চিন্তিত দেখিয়া, ডাক্তারও একটু চিন্তিত হইলেন। এবং ব্যারামের আদ্যোপান্ত বিবরণ মনোযোগের সহিত শুনিয়া, ডাক্তার নন্দদুলালকে কাছে

ডাকিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষা করিয়া সুচতুর ডাক্তার সমুদায় বুঝিতে পারিলেন। সে দিন কিছু না বলিয়া, নন্দদুলাল যে ইস্কুলে পড়িতেন, ডাক্তার সেই ইস্কুলে একটু অনুসন্ধান লইলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, যে নন্দদুলাল, ক্লাসে কিছুই করে না, পড়া শুনাতে একেবারেই মন নাই, প্রতিদিনই পড়া শুনার জন্য শাস্তি পায়। ডাক্তার বুঝিলেন রোগ কি? তখন যেমন রোগ তেমনি ব্যবস্থা হইল। ইস্কুলের ভয়ে যে তার মাথা ধরে, তাহা নন্দদুলালের মা বাপ এতদিন বুঝিতে পারেন নাই। ডাক্তার পর দিন যাইয়া ব্যবস্থা করিলেন,—যখন মাথা ধরিবে, তখন আদ ঘণ্টা অন্তর পাঁচ বেত। নন্দদুলালের মুখ শুকাইয়া গেল; এতদিন মা বাপকে ফাঁকি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ডাক্তারকে আর ফাকি দিতে পারিলেন না। যাই হ'ক, শুনিয়াছি, তার পরদিন থেকে আর একদিনের জন্যও নন্দদুলালের মাথা ধরে নাই। ব্যবস্থা শুনিয়াই রোগ পলাইয়াছে। আমরা জানি না নন্দদুলালের মত রোগ আমাদের কোন পাঠক পাঠিকার আছে কি না; যদি থাকে তবে যেন এ কথা মনে থাকে;—যে যেমন রোগ তার তেমন ব্যবস্থাও আছে।

কোহিনুর।

লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। মানুষের কত আয়াস, চিরদিন লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া রাখিবে! কিন্তু লক্ষ্মী কাহারও ঘরে চিরদিন বাঁধা থাকেন না। আজ যাহার লক্ষ্মী-শ্রী আছে, কাল হয়ত দেখিবে সে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গিয়াছে। এমনিতর চিরদিন প্রায় কাহারও সমান যায় না। কিন্তু সে কথা থাক্; আমরা কোহিনুরের কথা বলিতেছি। কোহিনুরও লক্ষ্মীর ন্যায় বড় চঞ্চল; পৃথিবীর কত বড় বড় রাজারা, শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও, এই কোহিনুরকে কেহ চিরদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। আমরা দেখিয়াছি, পৃথিবীতে যে রাজার ক্ষমতা যখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে, কোহিনুর তখনই তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে। চিরদিন কাহারও হাতে ইহা থাকে নাই, এবং বোধ হয় থাকিবেও না। ভারতবর্ষ রত্নগর্ভা নামে খ্যাত; কিন্তু ভারতভূমির সমুদায় রত্নের মধ্যে, এই কোহিনুর নামক হীরক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। খৃষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে, এই অপূর্ব্ব হীরক মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্পত্তি ছিল, বিক্রমাদিত্যের তখন অতুল প্রভাব। তারপর যখন দিল্লীর সম্রাটগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন, তখন—খৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কোহিনুর তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। এই হীরকের ওজন এই সময় ১৬ তোলা ছিল। সম্রাট সাজাহান একজন ভিনিসীয় রত্নকারকে কোহিনুর পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল করিবার ভার দেন; রত্নকার চাঁচিতে চাঁচিতে রত্নটিকে এত হাল্কা করিয়া ফেলে যে, কোহিনুরের ওজন একেবারে ৪॥ তোলা হইয়া যায়। সাজাহান রত্নকারের যথেষ্ট দণ্ড করেন, কিন্তু সে যে ক্ষতি করিয়াছিল তাহার আর পূরণ হইল না। সাজাহানের মৃত্যুর পর দিল্লী সম্রাটগণের হস্তেই কোহিনুর থাকে; নাদির সাহের নিকট, যখন মহম্মদ সাহ পর হইলেন, এবং মোগল সম্রাটগণের ক্ষমতা হইল, তখন কোহিনুর আবার নাদী আশ্রয় হইল। নাদীর সাহ এই রত্নটি নুর নাম দেন; কোহিনুর অর্থে

পর্ব্বত। নাদীরের মৃত্যুর পর কোহিনুর কাবুল অধিপতি আমেদ খার হস্তগত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত কাবুলের আমিরগণের ক্ষমতা প্রবল ছিল, কোহিনুর ততদিন তাঁহাদিগেরই হস্তে থাকে। পরে যখন সা সুজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, কাবুল পরিত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তাঁহার সহিত কোহিনুর আর একবার ভারতে ফিরিয়া আসিল। সা সুজা এক প্রকার বন্দীভাবে পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের গৃহে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। রণজিতের তখন প্রবল প্রতাপ। কোহিনুর নিঃস্ব সা সুজার হস্তে আর কেমন করিয়া থাকিবে?—যিনি তখন মহা প্রতাপশালী, তাঁহারই আশ্রয় লইল—কোহিনুর রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইল। রণজিৎ কোহিনুর পাইয়া, কাবুলপতি সা সুজাকে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং এই মহারত্ন লাভ উপলক্ষে রাজ্য মধ্যে এক মহোৎসব করিলেন। রণজিতের মৃত্যুর পর, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তে কোহিনুর থাকে। কিন্তু কোহিনুর চিরদিন কাহারও হস্তে থাকিবার নয়। ভারতে ইংরাজের প্রতাপ বিস্তারিত হইতে লাগিল; ভারত ইংরাজের পদানত হইল। ইংরাজের নিকট রণজিতের বংশধর পরাস্ত হইলেন; পাঞ্জাব হতবল হইল—অপ্রাপ্ত বয়স্ক দলীপ সিংহের অন্যান্য ধন সম্পত্তির সহিত কোহিনুর ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণে [illegible]র্পিত হইল। কিন্তু যিনি যখন মহাপ্রতাপ-[illegible], কোহিনুর তখন তাঁহারই। ইংরাজ এখন [illegible]তাপশালী, সুতরাং কোহিনুর আর কতদিন [illegible]র হতভাগ্য বংশধর দলীপের হস্তে [illegible] লর্ড ডালহৌসী কোহিনুর মহারাণীকে [illegible] দিতে মনস্থ করিলেন। দুইজন এক [illegible]চারী এই মহারত্নের ভার লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন,—কোহিনুর ভারত পরিত্যাগ করিয়া গেল। ১৮৫০ সালের ৩রা জুন মহারাণীকে এই অত্যুজ্জ্বল মহারত্ন উপঢৌকন দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কোহিনুর দেখিতে একটি অর্দ্ধ ডিম্ববৎ ছিল; এখন একটী আদ্‌ফোটা গোলাপের ন্যায় হইয়াছে; এখনও ইহার ওজন চারি তোলার কম হইবে না। ভারত হতবল হইয়াছে; আজ ৩৭ বৎসর কোহিনুর ভারত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—ভারত হতশ্রী হইয়াছে; আর কি কোহিনুর কখনও ভারতে ফিরিয়া আসিবে?

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। বিছানা।

নূতন।

তিনবর্ণে নাম, চিরদুঃখী আমি
বিদিত ভুবন মাঝে;
শির না কাটিলে পারিনা কখনো
রত হ'তে কোন কাজে।
পদশূন্য হয়ে আছি আমি সদা
পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে,
কটী মম আছে সলিল মাঝারে
জান কি এহেন জনে?
আছে মোর কত দুর্ব্বল সন্তান
অকৃতজ্ঞ নরাধম,
মাঝখান রেখে করে চিরকাল
শরীর ভক্ষণ মম।
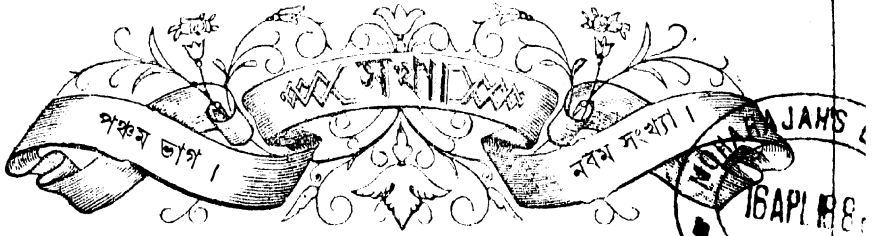
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭।

ফুলের সাজি।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজদণ্ড।

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

—:—

নগরবাসীগণ মনোরমার অদৃষ্টে কখন কি হয় তাহারই জন্য যেন উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে ছিল। যাহারা তাহার মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু তাহাদের হৃদয়ে এক বিষম শঙ্কা উপস্থিত হইল, পাছে মনোরমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। কারণ সে সময়ে সামান্য চুরী অপরাধেও লোকের প্রাণ দণ্ড হইবার নিয়ম ছিল। মনোরমা নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণ হয় রাজার নিজেরও এই মনোগত অভিলাষ। সেই জন্য তিনি বিচারের সমস্ত কাগজপত্র বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বিচারকের সহিত নানাপ্রকার পরামর্শ করিলেন, কিন্তু কোন মতে মনোরমার নির্দ্দোষের প্রমাণের সুযোগ পাইলেন না। আর যে কেহ এ কার্য্য করিয়াছে তাহা বোধ হইল না।

রাজমহিষী, রাজকুমারী হেমলতা, মনোরমার প্রাণ রক্ষার জন্য অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাজ সমীপে আবেদন করিলেন। ওদিকে বৃদ্ধ দীননাথ কারাগারে বসিয়া ভগবানের নিকট ঐকান্তিক অন্তরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন মনোরমার সাধুতার প্রমাণ হয়, "হা হরি! কি করিলে, কি কারণে বালিকাকে এ বিষম পরীক্ষা করিতেছ? হরি! তুমিত জান মনোরমার কোন দোষ নাই—দেখ যেন তাহার অকারণে প্রাণদণ্ড না হয়।" এক এক বার যখন দীননাথ মনোরমার প্রাণ দণ্ডের কথা চিন্তা করে তখন তাহার ধমনী দিয়া রক্ত প্রবাহ বেগে ছুটিতে থাকে। আবার কতকক্ষণ পরে যখন মন স্থির হয় তখন ভাবে, না, না, পরম ন্যায়বান হরি কি এরূপ অকারণে বালিকার প্রাণ দণ্ড করাইবেন। অবশ্য আমাদের বিশেষ কোন অপরাধ ছিল তাহার জন্য এই মনোকষ্ট ও যাতনা ভোগ করিতেছি। কিন্তু কাহারও দ্রব্য গ্রহণ দূরে থাকুক আমরা কখন পরদ্রব্যে লোভ পর্য্যন্ত করি নাই। ভগবান তোমার মনে যাহা আছে তাহাই হউক।

মনোরমা সেই কারাগৃহে; সে কখন [illegible] করিতেছে, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে একটু শব্দ শুনিয়াই চমকিয়া উঠিতে[illegible] সময়েই মনে আশঙ্কা, এখনি প্রহ[illegible] আমায় বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবে।

শোচনীয় দশায় পড়িয়া মনোরমা পিতার চিন্তায় সর্ব্বদা আকুল। আমার প্রাণদণ্ড হইলে বৃদ্ধ পিতার কি দশা হইবে এই চিন্তায় সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

এক দিন মায়া কোথায় যাইতে যাইতে সম্মুখে জল্লাদকে বধ্যভূমি পরিষ্কার করিতে দেখিতে পাইল। জল্লাদকে বধ্যভূমিতে দেখিয়া মায়ার মনে মনোরমা সংক্রান্ত আমূল বৃত্তান্ত উদয় হইল। তৎক্ষণাৎ যেন তাহার মনে শত বৃশ্চিক এক কালে দংশন করিল—সে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া মনোরমার মৃত্যু আনয়ন করিতেছে তাহা সে বেশ বুঝিল। এই চিন্তায় মায়ার মুখ ম্লান ও হাস্য-বিহীন হইল—সে দিন সে আহার করিতে বসিল মাত্র, আহার করিতে পারিল না। রাজ অন্তঃপুরস্থ অন্য দাসদাসী মায়ার মনের এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল, কিন্তু ইহার কারণ জানিতে সমর্থ হইল না—অন্তর্য্যামী ভগবান ভিন্ন জীবের হৃদয়ের ভাব আর কে বুঝিবে? সে রাত্রিতে মায়ার নিদ্রা হইল না, শয্যা যেন বিষ—একবার মাত্র একটু তন্দ্রা আসিল, তন্দ্রার সময়ে মায়া স্বপ্ন দেখিল মনোরমার রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তক তাহার কাছে পড়িয়া রহিয়াছে, মনোরমার রক্তে আপনার হস্ত ভিজিয়া গিয়াছে। আতঙ্কে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, জাগিয়া দেখে ঘোর অন্ধকার। আর নিদ্রা হইল না। মায়ার এই ঘোর যাতনা হইল বটে, কিন্তু [illegible]ার এত সাহস হইল না যে বিচারকের কাছে [illegible]দোষ বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে অনেক [illegible]নকে একরূপ বুঝাইয়া রাখিল।

[illegible]শেষে বিচারপতি তাঁহার বিচারের মন্তব্য [illegible]লেন। তাঁহার মন্তব্যের মর্ম্ম এই—যে [illegible]ভিন্ন অন্য কেহ আংটী লইতে পারে [illegible]ত কথা। মনোরমা একে চৌর্য্য দোষে দোষী, তাহাতে অপরাধ স্বীকার না করাতে সে যথার্থ প্রাণদণ্ডের যোগ্য। কিন্তু তাহার বয়স অতি কম এবং এতাবৎ কাল সকলেই তাহার চরিত্রের সুখ্যাতি করিত বলিয়া প্রাণ দণ্ড না হইয়া তাহাকে কারাগারে জন্মের মত আবদ্ধ করা হইবে। তাহার পিতা বৃদ্ধ দীননাথ এই চৌর্য্যকার্য্যে লিপ্ত বলিয়া বোধ হওয়াতে তাহাকেও জন্মভূমি হইতে চিরদিনের মত বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার সমুদয় সম্পত্তি রাজভাণ্ডারসাৎ হইবে। রাজা বিচারপতিকে বলিয়া দণ্ডাজ্ঞার এই পরিবর্ত্তন করিলেন যে, মনোরমাও দীননাথের সহিত জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইবে। কিন্তু বিচার পতির অন্যান্য দণ্ডাজ্ঞা সমান রহিল।

আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, দুই দিনের শেষে যদি কেহ মনোরমা ও তাহার পিতাকে প্রসাদপুরের মধ্যে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের প্রাণ দণ্ড হইবে।

নগরময় দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। পরদিন যখন প্রভাতে মনোরমা ও তাহার পশ্চাতে তাহার হস্ত ধরিয়া বৃদ্ধ দীননাথ নগর হইতে বাহির হইল তখন তাহাদের পূর্ব্ব পরিচিত অনেক লোক তাহাদিগকে দেখিতে আসিল, অনেকে তাহাদের দুঃখের দশা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল, অনেকে মনোরমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল। দীননাথ ও মনোরমা সকলের সহিত যথাযোগ্য কথাবার্ত্তা প্রণামাদি করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তাহারা অল্পদূর না যাইতে যাইতে মায়া তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমার নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া মায়ার পূর্ব্বের অনুতাপ সম্পূর্ণ দূর হইয়া আবার তাহার মনোরমার প্রতি পূর্ব্বের মত ভাব

হইয়াছিল। সুতরাং মনোরমার নির্ব্বাসন তাহার আহ্লাদেরই বিষয় হইল। রাজকন্যার ভালবাসা ও অনুগ্রহ পাত্রী আপনি হইব এই তাহার ইচ্ছা। মনোরমা সে স্থান লইতেছিল বলিয়া তাহার প্রতি তাহার ঈর্ষা জন্মিয়াছিল। আর মনোরমা তাহার কণ্টক হইতে পারিবে না এই তাহার মহা আনন্দ। বাস্তবিক সে মনোরমাকে যে নষ্ট করিতেই চাহে তাহা নহে।

রাজকুমারী হেমলতা যখন মনোরমার বিচার হইতেছিল তখন এক দিন মায়াকে মনোরমাদত্ত সাজিটী তাঁহার ঘর হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে কহিয়াছিলেন। ঐ সাজি দেখিলেই হেমলতার মনোরমার কথা মনে হইয়া অন্তরে বড় ক্লেশ হইত বলিয়া ঐরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন। মায়া মনে করিল রাজকুমারী মনোরমা দত্ত সাজি গ্রহণ করিবেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যখন মনোরমা ও তাহার পিতা নগর হইতে বাহির হইতেছিল তখন মায়া তাহাদের কাছে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে সেই সাজি, মায়া বলিল, "মনোরমা এই সেই তোর সাজি, রাজকুমারী চোরের উপহার লন না" এই বলিয়া মায়া সাজি মনোমার চরণ তলে ফেলিয়া ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে সাজি লইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। মনে করিল সাজি, তোমারই জন্য আমাদের এই দশা! সত্যইত রাজকুমারী গরিবের দত্ত সাজি লইবেন কেন?

দীননাথের হাতের লাঠিগাছটী ও রাজ পুরুষেরা লইয়াছেন এই সাজিটী মাত্র তাহাদের পার্থিব সম্বল।

যতক্ষণ দেখা যায় মনোরমা চলিতে চলিতে প্রসাদপুরের দিকে চাহিতে লাগিল—হায় এত সাধের বাড়ী, এত যত্নের বাগান আজ কোথায় রহিল। ক্রমে ক্রমে প্রসাদপুর তাহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। এবং একটী অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ দীননাথ আর চলিতে পারিল না, শোকে ও পরিশ্রমে তাহার চলিবার শক্তি রোধ হইল। মনোরমা পিতাকে ধরিয়া একটী প্রাচীন বট বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসাইল।

দীননাথ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া কতক শান্ত হইয়া কন্যাকে কহিল, মনোরমে এস সর্ব্বাগ্রে আমরা ভগবানের চরণ বন্দনা করি। তিনি কৃপা করিয়া আজ আমাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন, ধন্য তাঁহার কৃপা! বৃদ্ধ হাত যোড় করিয়া আনন্দ অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে কহিল, "হরি! তুমি বৃদ্ধের একমাত্র সম্বল, তোমার কৃপায় আবার আমরা স্বাধীন ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, তোমার কৃপাবলে আজ আবার মনোরমাকে লাভ করিয়াছি।"

"হরি! তুমি দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, ভগবান! যাহারা দুঃখে পড়িয়া তোমায় ডাকে, তুমি তাহাদের দুঃখ মোচন কর, তুমি অভয়দাতা পিতা, তুমিই স্নেহময়ী মাতা, তুমিই বিপদের কাণ্ডারী, যখন বিপদে পড়িয়া আমরা তোমায় মা, মা, বলিয়া ডাকি, তখন তুমি হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান কর। মা, আমরা নিরাশ্রয় সম্বলহীন, তুমি মাত্র আমাদের ভরসা। আজ তুমি আমাদের জন্য কোন উপায় বিধান কর। তুমি সহায় হইয়া আমাদিগকে দেশান্তরে লইয়া যাও" বলিতে বলিতে দীননাথের শ্বেতশ্মশ্রু বহিয়া অবিরল ধারে চক্ষের জল পড়িতেই হইতে লাগিল। গণ্ডস্থল দিয়া আনন্দ ধারূবে প্রেম ধারা বহিয়া মনোরমার বক্ষস্থল ভাসিয়ে আজ পিতা ও কন্যার হৃদয়ে একই ভাবের ভক্তির, একই প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিয়া তলে ইহাই স্বর্গ শোভা।

প্রতিশোধ।

(গল্প।)

একদিন ছিল যখন এদেশে কেহ মদ খাইত না। প্রাচীনকালে সুরাপান মহা পাপ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। ইংরেজ বাহাদুরের কৃপায় মদ খাওয়াটা আজকাল জল খাওয়ার মত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্গোৎসব আসিতেছে এখন কত অর্থ এই মহা অনর্থের জন্য নষ্ট হইবে কে জানে? পূজার মধ্যে মদ একটা অতি আবশ্যকীয় জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সব না হইলে চলে কিন্তু মদ না হইলে চলে না। হয়ত ছেলে মেয়েরা পরিবার কাপড় পায় না, ডাক্তার ও ঔষধ বিনা রোগের যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে কিন্তু কর্ত্তার মদ না খাইলেই নয়। আমরা এমন কথাও শুনিয়াছি যে, ঘরের গহনা বিক্রী করিয়াও মাতালের উদর পূর্ণ হইয়া থাকে।

বাড়ীর কর্ত্তারাই যে কেবল এই বিষ পান করেন তাহা নহে। তাহাদের দৃষ্টান্তে অল্পবয়স্ক বালকদিগের মধ্যেও এপ্রথা চলিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে মদের এমনই প্রাদুর্ভাব বাড়িয়াছে যে, ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে পা[illegible]স্যাস্পদ হইতে হয়। মদ খাওয়াটা "ফ্যাসন" [illegible] উঠিয়াছে। মদ না খাইলে ভদ্রলোকের [illegible]াওয়াই মুস্কিল। দেখাদেখি ছেলে বাবুরাও [illegible]টে খাট রকমের "মদের বৈঠক" করেন। [illegible] দুটি ছোকরা বাবু নাকি পুলিসের [illegible]ড়িয়াছিলেন। আমরা জানি মফ[illegible]য় এবং গ্রামেও এরূপ অনেক স্কুলের ছেলে আছেন। আমরা আশা করি আমাদের "সখা"র পাঠকপাঠিকারা কখনও এরূপ দোষে লিপ্ত হইবেন না; কিন্তু পাছে হতভাগ্য লোকদিগের সংসর্গে মিশিয়া কেহ কোন দিন এই নীতি-বাক্যটী ভুলিয়া যান এই ভয়ে আমরা একটী গল্প বলিতেছি।

আরম্ভ।

প্রায় পোনর বছরের কথা; তখন কলিকাতায় স্কুল কালেজের বাজার এত সস্তা ছিল না। গভর্ণমেণ্ট এবং মিশনরি সাহেবেরা দুএকটী স্কুল কালেজ করিয়াছিলেন। লোকেও তখন বড় ইংরেজী শিখিতে চাহিত না। যাহারা একটু বেশী সাংসারিক, টাকাকড়ির প্রতি একটু বেশী মনোযোগী তাহারা টাকার লোভে, কেহ কেহ বা বিদ্যার লোভেও ছেলেদিগকে ইংরেজী পড়াইতেন। কিন্তু একটা কথা, তাহার মধ্যে অনেকেই ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মদ এবং মুরগী খাওয়াটা বিশেষ রূপে শিক্ষা করিতেন। এই সময়ে কলিকাতার কোন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে দুইটী বন্ধু পড়িতেন। একটীর নাম শ্যামলাল এবং অন্যটীর নাম কানাই। ইহাদের দুজনারই অবস্থা বেশ ভাল। শ্যামলালের বাবা এবং কানাইর দাদা দুজনেই সাহেব সওদাগরদের হাউসের বড় চাকুরে ছিলেন। কর্ত্তাদের মধ্যেও যেমন সদ্ভাব ছিল ছেলেদের মধ্যেও তেমনি ভাব ছিল। কর্ত্তারা এক বৈঠকের লোক ছিলেন; একসঙ্গে মদ মাংসটা চলিত। অনেক টাকা পাইতেন বটে, কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ের জন্য কিছুই বাঁচাইতে পারিতেন না। প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পরই মজ্‌লিস হইত; কিন্তু শনিবার রাত্রিতেই আড্ডাটা ভালরূপ জম্‌কাইত। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া শ্যামলাল ও কানাই যে শিক্ষা পাইয়া-

ছেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহারাও কর্ত্তা-দের মত আপনাদের বন্ধু বান্ধব লইয়া শনিবার দিন সন্ধ্যার পর ছোটখাট মজ্‌লিস করিতেন। তাহাতে মদ খাওয়া এবং অশ্লীল সংগীত প্রভৃতির আলোচনা হইত।

কয়েকদিন হইল শ্যামলালের বিবাহ হইয়াছে। তাহার বন্ধুরা তাহাকে এক দিন একটা ভোজ দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্যামলালেরও অসম্মতি নাই; ক্লাসের ছেলেদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। আজ কানাই বাবুই এ সভায় সভাপতি। তাহার বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণ; তিনিই সকল যোগাড় করিতেছেন। অবশ্য এ মহাব্যাপারে মদের ও ক্রটী হয় নাই। সে যাহা হউক কানাইর আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের ক্লাসে একটা হতভাগা ছেলে ছিল সে মদ খাইত না; তাহাকে আজ দলে ভর্ত্তি করিতে হইবে। সে গরিবের ছেলে; পড়াশুনা ভাল করিত এজন্য একটী সদাশয় লোক তাহাকে স্কুলের মাইনা, বইর দাম এবং সময়ে সময়ে অন্যান্য সাহায্যও করিতেন। ছেলেটীর নাম সুরেশ; বয়স ১৪ বৎসর। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে কানাই এবং শ্যামলালই ক্লাসের মধ্যে বড়লোকের ছেলে ছিল এবং গায়েও খুব বল ছিল সুতরাং সকলেই তাহাদিগকে ভয় করিত। তাহারাই ক্লাসের সরদার ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা সুরেশকে মদ খাওয়াইতে পারে নাই। তাহারা সুরেশকে, পড়ার খরচ দিবে, স্কুলের মাইনা দিবে, রোজ গাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যাবে এবং আরও কত প্রলোভন দেখাইয়াছে তবুও সুরেশ তাহাদের কথায় স্বীকৃত হয় নাই। অনেকে হয়ত মনে করিবে "এটা সুরেশের ভারী অন্যায়; যাহারা তাহার জন্য এত করিতে প্রস্তুত সে তাহাদের কথা শুনিল না।" কিন্তু সুরেশ, তাহা বুঝিত না। সে অন্যরূপ বুঝিত। সে ভাবিত "যিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পড়াইতেছেন তাহার মনে কত কষ্ট হইবে, দুঃখিনী মার দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং মার নিকট শুনিয়াছি মদ খাওয়া যে মহা পাপ তাহা হইতে কেমনে উদ্ধার পাইব?"

আজ সর্ব্ব প্রথমেই কানাই বাবু ছোট একটী গ্লাস এবং সুন্দর একটী বোতল বাহির করিলেন; এক গ্লাস লাল টক্‌টকে মদ ঢালিয়া সুরেশকে বলিলেন "ভাই সুরেশ, অনেক দিন তোমাকে অনুরোধ করিয়াছি তুমি শুন নাই, কিন্তু আজ এ অনন্দের দিনে আর তেমনটী করো না।"

সুরেশ। "তোমরা ত জান, আমি মদ খাই না, আমি মার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি কখনও মদ স্পর্শ করিব না। আমার বাবা এই মদের জন্য অকালে মরিয়াছেন, এই মদের জন্যই আমরা এত দুঃখী; আমি কখনও মদ খাইব না।"

এইরূপ কথা হইতে হইতে কানাই বাবু এবং তাঁহার বন্ধুরা কিছু কিছু উদরস্থ করিলেন। সকলেই সুরেশকে অনুরোধ করিতে লাগিল। কেহ বলিল "তোমার মা ত ইহা জানিবেন না।" কেহ বলিল, "এক গ্লাস খাইলে আর মাতাল হইবে না, মরিয়াও যাইবে না।" আর কেহ বা বলিল "গ্লাসটা নিয়া একটু মুখ দিয়ে দাওনা, তা হইলেই ত সকল গোল চুকে যায়।" কিন্তু সুরে[illegible] তাহা বুঝিল না, সে বুঝিল "এক পাপের[illegible] কেন আর এক পাপ করিব? মদ খাই[illegible] কেন প্রতারণা করিব?"

অবশেষে কানাই গ্লাসটী হাতে[illegible] শের নিকট গিয়া বসিলেন, প্রথ[illegible]

সাধিল, সুরেশ শুনিল না, গলা ধরে আদর করে কত বলিল কিছুতেই রাজি হইল না। তখন কানাইর রাগ হইল; দাঁড়াইয়া চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন।

"সুরেশ, এখনও বলিতেছি, কথা শুন; না হইলে ভাল হইবে না।"

সুরেশ তেমনি স্থিরভাবে বলিল "আমি কখনও মদ স্পর্শ করিব না।"

"তবে দেখ" বলিয়া কানাই বাঁ হাতে সুরেশকে চেপে ধরিয়া ড'ান হাতে মদের গ্লাস লইয়া ঔষধের মত সুরেশের মুখে ঢালিতে গেল; কিন্তু সুরেশ মুখ খুলিল না। অনেক চেষ্টায়ও কানাইর উদ্দেশ্য সফল হইল না। তখন মাতাল কানাই রাগে অন্ধ; পশুর ন্যায় জ্ঞান শূন্য; কিছু দূরে গিয়া সুরেশের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল এবং হঠাৎ মদপূর্ণ গ্লাস তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিল। গ্লাস সুরেশের কপালে লাগিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; সুরেশ অচেতন হইয়া পড়িল; কপাল হইতে শতধারে রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন সকলেই অবাক্। অনেকে ভয়ে প্রস্থান করিল। কানাই বাবু বড় গ্রাহ্য করিলেন না। আর ২।৩ জন জল ঢালিতে লাগিল এবং বাতাস করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই হইল না। অবশেষে নিকটস্থ কোন ডাক্তার ডাকিতে হইল; ডাক্তার বাবুর নিকট কিছুই গোপন রহিল না, তিনি [illegible]রেশকে সুস্থ করিয়া নিজের গাড়ীদ্বারা তাহার [illegible] পৌঁছাইয়া দিলেন। সেদিন সুরেশের মা [illegible] পাইয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝা [illegible] ঈশ্বরের কৃপায় সুরেশ শীঘ্রই আরোগ্য [illegible] এই অপরাধে স্কুল হইতে কানাই [illegible]লের নাম কাটা গেল; তাহারা চিরদিনের জন্য স্কুলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

শেষ।

উপরোক্ত ঘটনার বার বৎসর পরে রাত্রি ৮টার সময় দুইটা যুবক লালবাজারের রাস্তার ফুটপথে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। সে দিন মাসের ৩রা তারিখ। তাহারা সেই দিন গত মাসের মাইনা পাইয়াছে এবং সেই টাকার সৎব্যবহারের বিষয়ই চিন্তা হইতেছে। অনেক ক্ষণ পর পরামর্শ স্থির হইল, দুইজন নিকটস্থ শুঁড়ির দোকানে প্রবেশ করিল।

মদের সঙ্গে আরও দোষ আছে। তখন বড় জুয়াখেলা এবং নক্স খেলার চলন ছিল; যাহাদের এই ব্যবসা, তাহারা মদের দোকানেই কিছু সুবিধা পাইত। বাবুদের আজ ট্যাকে টাকা; খেলার দিকে মনটা সহজেই ঝুঁকিল। টাকার উপর টাকা যাইতেছে, দৃষ্টি নাই, "এইবারে বুঝি জিতিব" ভাবিয়া ক্রমেই বেশী টাকার বাজী ধরিলেন, কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হইল না। একজন সর্ব্বস্বান্ত হইল;—হাতের আংটী পর্য্যন্ত গেল। আর এক জন প্রায় অর্দ্ধেক টাকা খোয়াইল। তখন অনেক রাত্রি; দোকানদার পাহারাওয়ালার ভয়ে আস্তে আস্তে দোকান হইতে বাবু দুটীকে বাহিরে ছাড়িয়া দিল। দুজনে ঢুলিতে ঢুলিতে আসিয়া রাস্তায় একটা গ্যাসের নিকট দাঁড়াইল; একজন বলিল,

"ভাই আজ তোমার বড়ই দুর্ভাগ্য; সকল বারেই তোমার হার হইল। তা কি করিবে? চিরদিন ত আর সমান যায় না; আমাদেরও একদিন আসিবে; তখন ইহার শোধ উঠাইব। কাল অবশ্য তুমি আফিসে যাইবে? রাত্রি প্রায় ১টা বাজে এখন আসি—"

এই বলিয়া শ্যামলাল বাড়ীর দিকে ফিরিল। কানাই সেইখানেই কিছু ক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল তার পরে গঙ্গার পোলের দিকে চলিল। পাঠক পাঠিকা! এখন বুঝিয়াছ যে ইহারা আমাদেব পূর্ব্ব পরিচিত শ্যামলাল ও কানাই। শ্যামলালেরর পিতার মৃত্যু হইয়াছে; তাহাদের অবস্থা এখন বড় খারাপ। কানাইরও সেইরূপ; তাহার দাদা কোন অপরাধ করার জন্য মেয়াদে গিয়াছেন। পূর্ব্বে কর্ত্তারা কেহই টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া যান নাই সুতরাং কানাই ও শ্যামলাল অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে। স্কুল ছাড়িয়া হাউসে কেরাণী গিরি চাকরী লইয়াছে। কিন্তু যেরূপ স্বভাব তাহাতে তাহাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যাহাদের জন্যে উন্নতি হইবে তাহারা এখন নাই। কাজে কাজেই তাহারা অতি সামান্য বেতনে চাকরী করিত। শ্যামলালের বিধবা মাতা, স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে এবং অন্য দুই একটা অনাথাও তাহার স্কন্ধে পড়িয়াছে। কানাইর পরিবার আরও বৃহৎ; নিজেদের বাড়ী ভাড়া দিয়া হাবড়ায় একটী সামান্য বাড়ী ভাড়া করিয়াছে; বৃদ্ধা মাতা, দাদার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদিগের ভরণ পোষণের ভার তাহার উপর; নিজেও বিবাহ করিয়াছে এবং দুইটী ছেলে হইয়াছে। এই বৃহৎ পরিবার তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আজ মাইনা পাইবার দিন, এতরাত্রে এখনও কানাই বাড়ী ফিরিল না; মা পথের দিকে চাহিয়া আছেন; ছেলেরা "বাবা" "বাবা" করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; স্ত্রী বুঝিতে পারিয়াছেন 'কি কাণ্ড হইয়াছে'; এবং তখনও বসিয়া কাঁদিতেছেন।

এদিকে কানাই কি ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গার ধারে আসিল, তখন লোক জন নাই, আলো গুলি গঙ্গার জলে পড়িয়াছে। কানাই পোলের উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছে গঙ্গার জল কেমনে যাইতেছে। শীতল বাতাসে মদের নেশা কমিতেছে—ক্রমে কানাইর বাড়ীর কথা মনে পড়িল। মা, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে সকলের কথা মনে পড়িল—মনে হইল; 'আজ মাইনা পেয়েছি' টাকা না হইলে কাল খাওয়া ঘটিবে না; পকেটে হাত দিল টাকা নাই। হাতের দিকে দৃষ্টি পড়িল আংটী নাই তখন সকল কথা মনে হইল—মদ খাওয়া এবং জুয়াখেলার ফল কি হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিল। এই একমাস কেমনে চলিবে?—কিছুই উপায় নাই—চারিদিক অন্ধকার—কানাইর মাথা ঘুরিয়া গেল। নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল গঙ্গার জল—বোধ হইল বড়ই শীতল। কানাইর মনে হইল "এই জলে ডুবিয়া সকল ভাবনা ভুলি না কেন?" তখন বাড়ীর দিকে একবার চাহিল—চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, জীবনের সকল পাপ ও দুষ্কর্ম্মের কথা মনে হইল। কানাই ভাবিল "আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। যাহারা রহিল ঈশ্বর তাহাদের উপায় করিবেন।" অনেক দিন পরে কানাইর মনে হইল ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন। বিপদে না পড়িলে অনেকেই সে কথা ভুলিয়া যায়।

কানাই তখন উঠিয়া পোলের শেষ প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল; একবার আকাশের দিকে চাহিল—দেখিল, গম্ভীর নিস্তব্ধ নীলবর্ণের আকাশে নক্ষ[illegible] ভিন্ন কিছুই নাই। গঙ্গার জলের দিকে [illegible] তাহার মধ্যে দেখিল আলো। বাড়ী[illegible] আর একবার চাহিল; গঙ্গার জলে [illegible] দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইবে ঠিক ক[illegible] সাঁতরাইয়া তীরে উঠিতে ইচ্ছা [illegible]

গায়ের চাদর দিয়া পা বাঁধিল। কানাই প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান, আর এক মূহুর্ত্তের মধ্যে গঙ্গার গর্ভে ডুবিবে।

কিন্তু তাহার সে পাপ ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। বিপদে পড়িয়া কানাইর মুখে যে ঈশ্বরের নাম বাহির হইয়াছে সেই ঈশ্বরই তাহাকে রক্ষা করিলেন। পেছন দিক হইতে কে যেন আসিয়া কানাইকে ধরিলেন এবং অনায়াসে তুলিয়া "রেইলিং" এর এদিকে আনিলেন। কানাই ভীত ও স্তম্ভিত; প্রথমে পাহারাওয়ালকে ডাকিল। কিন্তু যখন অপরিচিত লোকটী তাহার পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিলেন—যখন দেখিল তাঁহার পরিচ্ছদ ভদ্র লোকের ন্যায়, তখন কানাইর রাগ গেল ও নিজের প্রতি ঘৃণা হইল। কম্পিত স্বরে বলিল—

'তুমি কে? আমাকে ধরিবার তোমার কি ক্ষমতা আছে? আমাকে ছাড়িয়া দাও—'

ভদ্রলোকটী কোন কথা বলিলেন না। হাত ধরিয়া সযত্নে বলিলেন "আপনি স্থির হউন; চলুন আমরা একটু বসি, আমি কে পরে জানিতে পারিবেন।' কানাই জড়বৎ রহিল। ভদ্রলোকটী হাত ধরিয়া তাহাকে পোলের ওপারে লইয়া চলিলেন। কোনই আপত্তি নাই—সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

অপরিচিত ভদ্রলোকটীর কি পরিচয় দিতে হইবে? ইনি হাবড়ার একজন বড় লোক; মাসে ৫০০৲ টাকা মাইনা পান। পূর্ব্বে অতিশয় গরিব [illegible]লেন কেবল আপনার চরিত্র ও বিদ্যাবলে এত- [illegible]ঠিয়াছেন। নাম শুনিলে বোধ হয় সকলেই [illegible]—ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সুরেশ [illegible]জ কলিকাতায় তাঁহার কোন বন্ধুর [illegible]ণ ছিল, আসিতে রাত্রি হইয়াছে; [illegible]তেও নিষেধ করিয়াছেন কারণ তিনি একাকী রাত্রিতে হাঁটিতে বড় ভাল বাসিতেন।

সুরেশবাবু ও কানাই দুজনে বসিলেন। কানাই নিজের পাপ ও দুষ্কর্ম্মের কথা বলিতে বলিতে কত কাঁদিল; বলিল "এরূপ হতভাগ্যের পক্ষেও কি আত্মহত্যা পাপ?"

সুরেশ। "শতবার, সহস্রবার।"

কানাই। "আমার কি আর ভাল হইবার উপায় আছে? পরিবারের এ ভার কেমনে বহন করিব?"

সুরেশ। "ঈশ্বর তাহার উপায় করিবেন। আজ আপনি আমার বাড়ী চলুন।"

সুরেশবাবু কানাইকে বাড়ীতে নিয়া গেলেন এবং একটা চাকর দ্বারা কানাইর বাড়ীতে খবর পাঠাইলেন—সকলে নিশ্চিন্ত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে সুরেশ বাবু কানাইকে এক মাসের মাহিনার টাকা দিয়া বাড়ী পাঠাইলেন কিন্তু নিজের নাম বলিলেন না। এই হইতে কানাইর সৎপথে মতি হইল। অল্প দিনের মধ্যেই কানাই বাবু সকলের নিকট মান্য ও গন্য হইয়া উঠিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কানাই, সুরেশ বাবুকে তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিল। কানাইর পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু শ্যামলাল ও আসিয়াছিল। কানাই আজ সুরেশ বাবুর পরিচয় না লইয়া ছাড়িবে না। অনেক পীড়াপীড়িতে সুরেশ পরিচয় দিলেন। কানাই কিছুক্ষণ পুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে বলিল—

"সুরেশ, ভাই তোমাকে কি বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিব জানি না। তুমিই আমাকে উদ্ধার করিয়াছ! যদি সেই দিন তুমি মদ খাইতে

তবে আমার উপায় কি হইত? আমি আজ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতাম।”

শ্যামলালের ও সেই দিন হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। একজনের জন্য দুইজন পাপের পথ হইতে ফিরিল। এত দিনে সুরেশ তাঁহার অন্যায়ের প্রতিশোধ প্রদান করিলেন।

জন পাউণ্ড্স্।

আমরা মেরী কার্পেণ্টারের জীবনীতে, র্যাগেড্ স্কুলের সৃষ্টিকর্ত্তা জনপাউণ্ড্সের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। একজন অতি সামান্য লোকের দ্বারা জগতের কত উপকার হইতে পারে,—একজন অতি সামান্য লোকের দৃষ্টান্তে কত বড় বড় কাজের সূত্রপাত হইতে পারে,—জন পাউণ্ড্সের জীবন তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। যাহার অর্থ নাই,—পদ নাই; সমাজে যে অতি নীচ বলিয়া গণ্য;—অন্যের উপকার করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে, সৎকাজ করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে, এমন লোকের দ্বারাও যে কত মহৎ কাজ হইতে পারে, এই দরিদ্র চর্ম্মকারের জীবনে আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

এই সদাশয় পরোপকার-পরায়ণ চর্ম্মকার ১৭৬৬ সালে, পোর্টস্‌মাউথ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা অতি সামান্য কার্য্য করিয়া দিনপাত করিতেন। জনের যখন বার বৎসর বয়স, তখন তাঁহাকে জাহাজ নির্ম্মাণ শিখাইবার জন্য এক কারখানায় পাঠান হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ একদিন কাজ করিতে করিতে একটা উচ্চস্থান হইতে তিনি পড়িয়া যান। ইহাতে তাঁহার দক্ষিণ পা খানি ভগ্ন হয় এবং জন জন্মের মত খোঁড়া হইয়া যান। এই দুর্ঘটনার জন্য, জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল: তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া জন চর্ম্মকারের ব্যবসা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এব্যবসাও তিনি উপযুক্তরূপ শিখিতে পারেন নাই; তিনি জুতা তৈয়ার করিতে পারিতেন না,—কেবল মেরামত করিতে পারিতেন। জুতা মেরামত করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার দিন চলিয়া যাইত, সুতরাং জন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন।

এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহের একটা উপায় হইলে, জন অন্য দিকে মন দিলেন। যে পরোপকার প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল—যে কার্য্যের জন্য তাঁহার হৃদয় এতদিন ব্যাকুল হইতেছিল,—জন পাউণ্ড্স্ এখন সেই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। জন পাউণ্ড্সের আশ্চর্য্য শিক্ষা দিবার ক্ষমতা ছিল। তিনি নিজে অতি সামান্য লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু তিনি যাহা জানিতেন, তাহা শিখাইবার তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। জন পাউণ্ড্সের এক ভ্রাতা না... কের কার্য্য করিতেন; তাঁহার অনেক সন্তান ছিল। এই সন্তানদিগের মধ্যে সন্তান বিকলাঙ্গ ছিল,—এই সন্ত... হইয়া হাঁটিতে পারিত না। জন বালকটীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ...

ইহাকে বড় কেহ আদর করিত না, জন নিজেই ইচ্ছা করিয়া ইহার শিক্ষার ভার লইলেন। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া, অনেক কৌশল করিয়া, এই বালকটীকে এক জোড়া জুতা তৈয়ার করিয়া দিলেন; বিকলাঙ্গ বালক সেই জুতা ব্যবহার করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। জন পাউণ্ড্স্ তখন তাহার বিদ্যা শিক্ষার দিকে মন দিলেন। তিনি দেখিলেন যে, আরও দুই একটী সঙ্গী হইলে, বালকের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়। একদিন জন দেখিলেন একটী অনাথ বালক, কোনও স্থানে আশ্রয় না পাইয়া একটা বাড়ীর ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। এই নিরাশ্রয় বালককে দেখিয়া, পরদুঃখ-কাতর সদাশয় জন পাউণ্ড্সের হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি এই বালককে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। ... নিজ ভ্রাতষ্পুত্রের সঙ্গে ইহাকেও শিক্ষা দিতে ...লেন। র‍্যাগেড্ স্কুলের এই প্রথম সূচনা ... ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে লাগিল; যে ... বালক বালিকা, আশ্রয়শূন্য সহায়- ...জপথে ঘুরিয়া বেড়াইত, সদাশয় ... তাহাদিগকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়া অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জন এই অনাথ বালক বালিকাদিগকে যে কেবল শিক্ষা দিতেন, তাহা নহে; নিজের সামান্য গৃহে আশ্রয় দিয়া, ইহাদিগকে অন্নবিস্ত্র এ সমস্তই তিনি দিতেন। যাঁহাদিগের ধন আছে, সম্পত্তি আছে, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার যাঁহাদিগের শক্তি আছে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবার যাঁহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা হয়ত এই হতভাগ্যদিগের কথা ভাবিয়াও দেখেন না। কত শত অনাথ— কত শত নিঃসহায়, দুঃখী বালক বালিকা, একটু আশ্রয়ের জন্য, এক মুঠা অন্নের জন্য রাজপথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়, আমরা হয়ত তাহাদিগের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহি না। কিন্তু নিঃসহায় দরিদ্র চর্ম্মকার জন পাউণ্ড্স্, জুতা মেরামত করিয়া যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সেই সামান্য অর্থ দ্বারা, কত ক্ষুধিতকে অন্ন—কত দুঃখী অনাথকে আশ্রয় দিয়াছেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তিনি কাহারও নিকট কখনও কোন সাহায্য পান নাই; নিজের সামান্য আয়ই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। তিনি চির জীবন অবিবাহিত ছিলেন; এই দীন দুঃখী অনাথ

বালক বালিকারাই তাঁহার পুত্র কন্যা ছিল, ইহাদিগকে লইয়াই তাঁহার সংসার। নিজের সুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এই দুঃখী অনাথ দিগকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়া, তিনি যে সুখ অনুভব করিতেন, অন্য সুখ তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

জন পাউণ্ড্‌সের জুতা মেরামতের যে সামান্য দোকান খানি ছিল, সেইখানেই এই বালক বালিকাদিগকে তিনি শিক্ষা দিতেন, আর স্বতন্ত্র গৃহ ছিল না। এই গৃহটীও বড় ছিল না; বারো হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত প্রস্থে একটী মাত্র ঘর। জুতা মেরামত করিতে যে সমস্ত যন্ত্র প্রয়োজন, সেই সমস্ত যন্ত্র লইয়া, সদাশয় জন এই গৃহের মধ্যস্থলে একখানি টুলের উপর বসিতেন--বালক বালিকারা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিত। জন জুতা মেরামত করিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। কেহবা তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া পড়া বলিতেছে, কেহবা শ্রুত-লিখন লিখিতেছে, কেহবা তাঁহাকে অঙ্ক দেখাইতেছে; আবার অনেকে সেই গৃহের মধ্যে যে সামান্য দুই একখানি টুল বা ভগ্ন বাক্স ছিল, তাহার উপর বসিয়া রহিয়াছে,—তাহারাও পড়িবে। জন যখন ইহাদিগকে একত্র করিয়া শিক্ষা দিতে বসিতেন, তখন বাহির হইতে দেখিলে বোধ হইত, যেন বড়ই একটা বিশৃঙ্খলা। কিন্তু জনের এমনি বন্দোবস্ত ছিল, যে কখনও কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত না; সকলেই তাঁহার কাছে সমান শিক্ষা পাইত। ছোট ছোট ছেলে দিগকে শিক্ষা দিবার রীতি বড় অদ্ভুত ছিল। একটী ছেলেকে নিকটে ডাকিয়া জন তাহার হাতখানি ধরিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখানা কি?" তারপর তাহাকে বানান করিতে বলিতেন, তারপর হাতে একটী তালি দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "বলত কি করিলাম?" কাহারও বা কানটী ধরিয়া বলিতেন, "বলত এটা কি?" তারপর কানটী মলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "বলত কি করিলাম?" এইরূপে বালকদিগকে কথা এবং সেই সকল কথার অর্থ শিখাইতেন। যেমন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তেমনি সেই সকল অঙ্গের কি কি কার্য্য, তাহাও শিখাইয়া দিতেন। জন কেবল লেখা পড়া শিখাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যাহাতে বালক বালিকাগণ নিজে জীবিকা সংস্থান করিতে পারে, এমন শিক্ষাও দিতেন। যাহাতে এই দুঃখী অনাথ বালক বালিকারা ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারে, যাহাতে জীবনে সৎপথে থাকিয়া, নিজ নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, জনের সেই চিন্তাই প্রধান ছিল; এবং একান্ত যত্নে, সেই প্রকার শিক্ষাই দিতেন। ছুটীর দিনে, জন ইহাদিগকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন, ইহাদিগকে ব্যাট্ বল, ঘুড়ী, প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া দিতেন, এবং নিজে ইহাদিগের সহিত খেলা করিতেন।

রবিবার দিন জন ইহাদিগকে লইয়া উপাসনা করিতে যাইতেন। ছেলে ও মেয়েদের কতকগুলি কাপড় জন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; রবিবার দিন সেইগুলি ছেলে মেয়েদিগকে পরিতে দিতেন; তাহারা তাহাদিগে ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেই গুলি পরিয়া, স আনন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত;— কি সুন্দর!

যে র‍্যাগেড্ স্কুলের দ্বারা এখন অন্যান্য দেশের এত উপকার হই দরিদ্র চর্ম্মকার জন পাউণ্ড্‌স্‌ই

সদাশয় পরোপকার-পরায়ণ জন পাউণ্ড্সের দৃষ্টান্তে ডাক্তার টমাস গথ্রী প্রথম র‍্যাগেড্ স্কুল স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন। এক একটী অতি সামান্য কারণে কত সময়, এক একটী মহৎ কার্য্যের সূচনা হয়! ডাক্তার টমাস গথ্রী ঘটনাক্রমে একদিন একটী সরাইএ উপস্থিত হন। সেখানে অনেকগুলি ছবি ছিল; তার মধ্যে একটী ছবির দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন, একটী জুতা মেরামতের দোকানের ছবি; দোকানের মধ্যস্থলে একজন বসিয়া জুতা মেরামত করিতেছে, আর চারিদিকে কতকগুলি দরিদ্র, বালক বালিকা তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহারা তাঁহার কাছে পাঠ শিক্ষা করিতেছে। ডাক্তার গথ্রী অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, সেটী জন পাউণ্ড্স্ এবং তাঁহার স্কুলের ছবি। তিনি জন পাউণ্ড্সের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, একজন সামান্য দরিদ্র চর্ম্মকারের চেষ্টায়, কত শত নিরাশ্রয় অনাথ বালক বালিকা, দুঃখ দারিদ্র্য—পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আমরা মেরী কার্পেণ্টারের জীবনীতে বলিয়াছি যে, ইংলণ্ডের নীচশ্রেণীর লোকের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। কত শত অনাথ বালক বালিকা, আশ্রয়শূন্য—সহায়শূন্য হইয়া, রাজপথে ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং অবশেষে উদরান্নের জন্য অসৎ-[illegible] অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ডাক্তার গথ্রী [illegible]লেন, এই পর-হিতৈষী, দরিদ্র, সামান্য চর্ম্ম-[illegible] চেষ্টায়, এই শ্রেণীর কত শত বালক [illegible] জীবনোপায় হইয়াছে। যাহাদিগের [illegible]শ্রয় ছিল না, সমাজে যাহাদিগের [illegible] আপনার বলিবার যাহাদিগের কেহ ছিল না, এই সদাশয় মহাত্মার সামান্য গৃহে, তাহারা আশ্রয় পাইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে; যাহাতে তাহারা জীবনে সৎপথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সমাজের মধ্যে দশজনের একজন হইতে পারে, সদাশয় জন পাউণ্ড্স্ তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কখন কখন দেখা যাইত, জন পাউণ্ড্স্ গরম গরম আলুসিদ্ধ হস্তে লইয়া, এক একটী বালকের পশ্চাতে দৌড়িতেছেন। দুষ্ট বালকদিগকে তিনি আলু দিয়া ভুলাইয়া আনিতেন। পরের জন্য প্রাণ এত ব্যাকুল কয় জনের হয়; অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য কয় জনে এত করিয়া থাকে? এই দরিদ্র চর্ম্মকারের পরদুঃখকাতরতা, নিরাশ্রয় অসহায়দিগের প্রতি তাঁহার অতুলনীয় স্নেহ, দীন দুঃখী অনাথদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা—এই সমস্ত দেখিয়া ডাক্তার গথ্রী বিস্মিত হইলেন; এবং লজ্জিতও হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি র‍্যাগেড্ স্কুল স্থাপন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন,—সেইদিন হইতে সেই দরিদ্র চর্ম্মকার জন পাউণ্ড্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, র‍্যাগেড্ স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ইংলণ্ডের দরিদ্র অনাথ বালক বালিকাদিগের জীবনোপায় হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জন পাউণ্ড্স্ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। নিজের সুখের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না; সেদিকে দৃষ্টি থাকিলে, যে মহৎ কাজের সূত্রপাত তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার দ্বারা কখনই হইত না। সামান্য আহার এবং ছিন্ন বসনেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কাহারও নিকট হইতে তিনি কখনও কোন সাহায্য পান নাই; নিজের সামান্য আয়ের উপর

নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে এ সমস্ত করিতে হইয়াছিল, জীবিত থাকিতে তাঁহার নাম প্রায় কেহ জানিত না;—এবং সেই সামান্য গৃহে যে তিনি কি মহৎ কার্য্যের ভিত্তি গাঁথিতেছিলেন, তাহা তিনি নিজে একবারও ভাবিতেন না। অনাথ নিরাশ্রয়দিগের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত, তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে যে দেশময় র‍্যাগেড্ স্কুল স্থাপিত হইবে, এবং তদ্দারা দেশের অশেষ কল্যাণ হইবে, তাহা তিনি নিজেও জানিতেন না। তিনি যদি শতশত লোকের মস্তক ছেদন করিয়া, একটী দেশ জয় করিতেন, তাহা হইলে হয়ত দেশ বিদেশে তাঁহার নাম ঘোষিত হইত। কিন্তু তিনি যে শত শত অসহায় অনাথ বালক বালিকাকে, দুঃখ দারিদ্র্য এবং পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে "মানুষ" করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য তখন কেহই বুঝে নাই।

জীবনের শেষ অবস্থায়, প্রায়ই দুই একজন সৈনিক, নাবিক অথবা অন্য কোন ব্যবসাবলম্বী লোক, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহারা,—আশ্রয় শূন্য সহায় শূন্য হইয়া যখন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষা ও সদুপদেশেই তাহারা আজ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে,—এই কথা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যখন স্মরণ করাইয়া দিত, তখন তাঁহার কি আনন্দ হইত—কি অতুল সুখেই সুখী হইতেন! যাহাদিগকে "মানুষ" করিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ তাহারা দশজনের একজন হইয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দ ধরিত না।

জন পাউণ্ড্সের বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছে, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই। একজন চিত্রকর তাঁহার স্কুলের একখানি ছবি চিত্র করিয়া দিয়াছিলেন। জন পাউণ্ড্স্ গৃহে বসিয়া একদিন প্রাতঃকালে, একদৃষ্টে সেই ছবিখানি দেখিতে ছিলেন। ছবিখানি দেখিতে দেখিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। যে সকল অনাথ বালক বালিকাদিগকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন, আজ তাহারা অনাথ হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মৃত্যুর পরও এই সকল অনাথ বালক বালিকারা কত দিন জন পাউণ্ড্সের গৃহদ্বারে আসিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইত!

জন পাউণ্ড্সের জীবনী শেষ হইল; আমরা ডাক্তার গথ্রীর শেষ কথা কয়েকটী পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব;—আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি সেই দিন আসিতেছে, যেদিন যিনি প্রকৃত সম্মানের উপযুক্ত, তিনিই সম্মান প্রাপ্ত হইবেন;—কবিগণ যাঁহাদিগের যশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার জন্য কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিবেন, আর এই অপরিচিত দরিদ্র চর্ম্মকার, ঈশ্বরের চরণতলে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবেন।

"আসিবে না ?"

১

আবার শরৎকাল
দেখ মা, এসেছে ফিরে
বরষার জল বৃষ্টি
চলিয়ে গিয়েছে দূরে।

২

আকাশেতে মেঘ নাই
কেবলি গর্জ্জন সার।
প্রফুল্ল পৃথিবি-মুখ
চারি দিক পরিষ্কার

৩

মাঠেতে হরিত বর্ণ
শস্য গুলি মনোহর—
বাতাসে ঢেউর মত
নাবে উঠে থরে থর।

৪

নদী মাঝে কত নৌকা
আসে যায় তুলি পাল
কবে মা আসিবে দিদি ?
এইতো পূজার কাল।

৫

ফুটিয়াছে স্থল পদ্ম
দেখ মা, বাগানে কত
ঝুড়্ শেফালিকা
পড়িতেছে অবিরত

৬

কবে মা আসিবে দিদি ?
দুজনে ভোরের বেলা
বাগানে কুড়াব ফুল
আনন্দে গাঁথিব মালা।

৭

কেন মা বলনা কথা
রয়েছ এমন ভাবে ?
আসিবে না দিদি কিগো!
এবার বাড়ীতে তবে ?

৮

না না বাছা: দিদি তোর
যেদেশে গিয়াছে হায়!
ফেরে না সেখান হ'তে
কেহ কভু পুনরায়।

সুরা-রাক্ষস কোম্পাণী

আন্‌লিমিটেড।

আমাদিগের ব্যবসায় অতি পুরাতন। বহুদিন হইতে আমরা এই ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছি। পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই, যেথানে আমাদিগের কারবার নাই। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আমাদিগের ব্যবসার আজ কাল বড় উন্নতি:

আমাদিগের সুযশ ও সু-নাম কাহারও নিকট অবিদিত নাই। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই নিকট আমরা বিশেষ পরিচিত। সুতরাং আজ আবার নূতন করিয়া আমাদিগের পরিচয় দিবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু আমরা শুনিতেছি, কতকগুলি লোক হিংসা পরবশ হইয়া আমাদিগের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুরাপান নিবারিণী সভা, টেম্পারেন্স এসোসিএসন্‌, ব্যাণ্ড অব হোপ, প্রভৃতি নাম দিয়া, স্থানে স্থানে ইহারা দুই চারি জন মূর্খ লোককে ভুলাইয়া সভা করিতেছে। ইহাদিগের নিশ্চয়ই কোন একটা মতলব আছে; নিশ্চয়ই কোন স্বার্থ আছে; নতুবা অন্যের ক্ষতি করিবার জন্য ইহারা কেন এত ব্যস্ত হইবে? যাহাই হউক, এই ধূর্ত্ত হিংসা-পরায়ণ লোকদিগের চেষ্টায় আমরা বিন্দুমাত্রও ভীত নই। আমাদিগের ক্রেতাগণের, বিশেষতঃ দেশের আশা ভরসা—যুবকগণের, আজ কাল আমাদিগের প্রতি যে প্রকার অনুগ্রহ, তাহাতে এই বিদ্বেষ-পরায়ণ লোকেরা আমাদিগের কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। শত সহস্র "ব্যাণ্ড অব হোপ" স্থাপন করিলেও, আমরা দেশময় যে প্রকাণ্ড "ব্যাণ্ড অব ডিস্‌পেয়ার" খাড়া করিয়াছি, তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না।

তবে এস বঙ্গদেশের বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ—তোমাদিগের জন্য অনন্ত নরকের দ্বার আমরা খুলিয়া রাখিয়াছি! এই পূজা উপলক্ষে আমরা তোমাদিগের সর্ব্বনাশের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতে ক্রটী করি নাই। মহারাজা, রাজা, জমিদার, ধনী—তোমাদিগের জন্য আমরা বিলাত হইতে খাঁটী হলাহল আমদানী করিয়াছি। দেশের সাধারণ লোক এবং দুঃখী দরিদ্রদিগেরও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা তাহাদিগের জন্য এই বঙ্গদেশের প্রায় প্রতি পল্লিতে, এই হলাহল প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। এই বাঙ্গলাদেশে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এবং অনুগ্রহে আমরা ছয় শত সদরভাটি ও তিন হাজার খোলাভাটি খুলিয়াছি। এই খোলাভাঁটিগুলিতে অবিশ্রান্ত হলাহল প্রস্তুত হইতেছে,—হে বঙ্গদেশের দুঃখী দরিদ্রগণ, তোমাদেরই জন্য; সুতরাং তোমরাও নিরাশ হইও না। ক্ষুধার সময় এক মুঠা অন্ন, পিপাসার সময় একবিন্দু জল, রোগের সময় এক-মাত্রা ঔষধ, দারুণ শীতের সময় একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র হয়ত তোমাদের জুটিবে না; কিন্তু তথাপি এই হলাহল পাইতে তোমাদের কোন কষ্টই হইবে না। ক্ষুধার সময় এক মুঠা ভাত খাইতে পাও আর নাই পাও,—খোলাভাঁটির প্রসাদে, আকণ্ঠ পুরিয়া এই হলাহল পান করিতে পাইবে। অতএব তোমাদের আজ কি আনন্দের দিন!

দেখ আমাদের কত দয়া! যেখানে হয়ত চারটী চাল মিলান কঠিন, আমরা তোমাদের জন্য সেখানেও এই খোলাভাঁটি বসাইয়াছি; তোমরা পেটে খাইতে পাও—আর নাই পাও, সুরাহলাহলের জন্য তোমাদিগকে কোন কষ্টই পাইতে হইবে না। নরকের দ্বার—সর্ব্বনাশের পথ দিবারাত্র তোমাদিগের জন্য খোলা রাখিয়াছি। যদি সহজে উচ্ছন্ন যাইতে ইচ্ছা থাকে তবে আর বিলম্ব না করিয়া আমাদের ক[illegible] এস;—এমন সহজ পথ আর নাই!

যে যাহা চাহিবে, সে তাহাই পাই[illegible] বালক! তোমার জন্য সুরা হল[illegible] রাখিয়াছি, একবার পান কর-[illegible] পারিবে না! যত পান করিবে,

পান করিতে ইচ্ছা হইবে; তোমার সুকুমার দেহ, অস্থিসার করিয়া দিব, ফুটন্ত ফুলের মত তোমার সুন্দর পবিত্র মুখ মলিন হইয়া পিশাচের আকৃতি ধরিবে। অল্প বয়সে যদি যমের বাড়ী যাইতে চাও, তাহা হইলে আমাদের কাছে এস,—এমন সহজ পথ আর নাই।

যদি শরীরের স্বাস্থ্য হারাইয়া চিরজীবন রোগগ্রস্থ হইয়া থাকিতে চাও, তবে আমাদের কাছে এস! বিলাত হইতে আনীত ব্রাণ্ডী নামক এক প্রকার রক্তবর্ণ পদার্থ তোমাকে পান করিতে দিব; তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই লিভার নামক পদার্থের আয়তন ক্রমে বাড়িতে থাকিবে, এবং সেই রক্তবর্ণ পদার্থ পানে, রক্তকাশী উপস্থিত হইয়া, তোমাকে ত্বরায় ভব যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবে। বুদ্ধিমান বলিয়া তোমার যদি দুর্নাম থাকে, তবে আমাদিগের সুরা হলাহল পান কর, দেখিবে অল্পদিনেই তোমার সে দুর্নাম ঘুচিবে। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে, বুদ্ধিলোপ পাইবে; পাগলা গারদে রাজার মত থাকিতে পাইবে। কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। আমরা ধনীকে দরিদ্র করি, দরিদ্রকে দুঃখ কষ্টে ডুবাইয়া দি; সৎপথে যাহারা চলিতেছে, তাহাদিগকে পাপ-পথে লইয়া যাই; আমাদিগের ক্ষমতা অসীম, যিনি পরমধাৰ্ম্মিক, এই সুরাহলাহল পান করাইয়া [illegible]হাকেও আমরা পাপে ডুবাইয়া দি। আমরা [illegible]রের সুখ শান্তি নষ্ট করিয়া চির অশান্তির [illegible]পণ করি। আমরা পিতাকে পুত্রহীন [illegible]র নিকট হইতে ভাইকে কাড়িয়া লই। [illegible] প্রতাপ! কত মাতাকে আমরা [illegible]ছি, কত পুত্র কন্যাকে পিতৃ- [illegible] পথের ভিখারী করিয়াছি; কত স্ত্রীকে পতিহীন করিয়া চিরদুঃখে ডুবাইয়া দিয়াছি! আমাদিগের কত ক্ষমতা যদি দেখিতে চাও, তবে একবার বাঙ্গালাদেশের দিকে চাহিয়া দেখ। কত শত পরিবার আমাদিগের কৃপায় উচ্ছন্ন গিয়াছে, এবং কত যাইতেছে একবার চাহিয়া দেখ! গভর্ণমেণ্টের কৃপায় বাঙ্গালাদেশের পল্লিতে পল্লিতে আমরা খোলাভাঁটি খুলিয়াছি; বালকদিগের—গরীব দুঃখীদিগেরও উচ্ছন্ন যাইবার পথ কত সহজ করিয়া দিয়াছি! তোমাদিগের আমরা কত উপকারী! এস তবে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলে এস;—নরকের দ্বার, সর্ব্বনাশের দ্বার তোমাদিগের জন্য খুলিয়া রাখিয়াছি; উচ্ছন্ন যাইবার এমন আর সহজ উপায় নাই। সুরাহলাহলের স্রোতে আমরা দেশকে একেবারে ডুবাইতে চাই; এই পূজার সময় দেশে সুরাস্রোত খুব বহিবে, এমন আশা আমাদিগের আছে। এই স্রোতে কি দেশ তবে এবার ডুবাইতে পারিব!

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। ভারত।

নূতন।

১। শরীর যদিও হয় পৃথিবী আকার,
কিন্তু কোথা নাহি স্থির আবাস আমার।
সংসারে সকলে মোরে অনাদর করে,
সম্মান যে জন করে তার মান বাড়ে।
অবহেলে যেইজন বামে দেয় স্থান,
আমার কারণে তার হয় অপমান।

অক্টোবর, ১৮৮৭।

ফুলের সাজি।

অষ্টম অধ্যায়।

বন্ধু সমাগম।

যখন দীননাথ ও তাহার দুহিতা মনোরমা বৃক্ষতলে বসিয়া আছে, দ্বারিকানাথ নামে দীননাথের পূর্ব্ব পরিচিত একজন কাঠুরিয়া বন্ধু তথায় উপস্থিত হইল। দীননাথ ও দ্বারিকানাথের মধ্যে অনেকদিন সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাহারা পরস্পরকে বিলক্ষণ জানিত। দ্বারিকানাথ প্রাতে কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইল। সে আসিয়াই দীননাথকে কহিল—ভাল ত ভাই, একি তুমি ও মনোরমা এখানে কেন? দূর হইতে আমি তোমার গলার স্বর শুনিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলাম এ কাহার স্বর; অমনি ছুটিয়া আসিলাম।

দীননাথ তাহার নিকট তখন আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা বর্ণন করিল। যতক্ষণ দীননাথ আপনাদের দুঃখের কথা বলিতেছিল সরলহৃদয় দ্বারিকানাথ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। দীননাথের কথা শেষ হইলে দ্বারিকানাথ কহিল—ভাই রাজপুরুষেরা নিরপরাধী তোমাকে এমন করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল! বুড়ো বয়সে তোমার প্রতি অকারণে এরূপ ব্যবহার করা বড় অন্যায় হইয়াছে।

দীননাথ কহিল—ভাই দ্বারক, সেজন্য দুঃখিত হইও না—পৃথিবীর সকল স্থানই ভগবানের—তাঁহার সূর্য্য, তাঁহার চন্দ্র সকল স্থানেই উদিত হইয়া মানবের মনে আনন্দ প্রদান করিতেছে ও সকলের বিবিধ উপকার করিতেছে। যেখানেই যাই—সর্ব্বত্র—সর্ব্বত্র তাঁহার রাজত্ব—সর্ব্বত্র তিনি বিদ্যমান—সর্ব্বত্র তাঁহার ভালবাসা—পরমেশ্বরই আমাদের গৃহ।

দ্বারিকানাথ আবার বলিল—তাইত কিরূপে তাহারা তোমার স্বভাব জানিয়াও তোমার প্রতি এরূপ কঠোর ও নির্দ্দয় আচরণ করিল। এক কাপড়ে তুমি কিরূপে বিদেশে যাইবে? হায়! হায়! তোমার দুঃখ দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়।

বিশ্বাসী দীননাথ কহিল—ভাই যিনি বৃ দিগকে ফলপুষ্প শোভিত করেন তিনি ঁ দিগকে বস্ত্র প্রদান করিবেন।

দ্বারিকানাথ বলিল—তোমার কাছে টাকা কি কিছু আছে?

দীননাথ বলিল—আমাদের নির্ম্মল বিবেক এবং আত্মাই আমাদের ধন। শুদ্ধ বিবেক ও আত্মার পরিবর্ত্তে যদি আজ আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিত—এমন কি যে প্রস্তরখানির উপর আমি বসিয়া আছি, এখানি যদি স্বর্ণ হইয়া আমাদের হইত তথাপিও আমরা দরিদ্র থাকিতাম। ধনী তিনি, যাঁহার শুদ্ধ বিবেক ও আত্মা আছে।

দ্বারিক কহিল—যাহা বলিলে তাহা সমুদায় ঠিক, কিন্তু বল দেখি তোমার নিকট কি একটী পয়সাও নাই?

দীননাথ উত্তর করিল—এই সাজিটী আমার সমুদায় সম্পত্তি! তুমি দেখ দেখি ইহার মূল্য কত?

দ্বারিকানাথ বলিল—আট আনার অধিক হইবে না, কিন্তু ইহাতে কি হইবে?

দীননাথ হাসিয়া বলিল—তবে আমাদের অন্নকষ্ট হইবে না—যদি আমার শরীরে ভগবান শক্তি ও স্বাস্থ্য দেন তাহা হইলে আমি বৎসরে এরূপ দুই শত সাজি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিতে পারিব। বৎসর এক শত মুদ্রা হইলে আমাদের দুজনের যথেষ্ট হইবে। আমার পিতা আমাকে যেমন বাগানের কাজ সুচারুরূপে শিখাইয়াছিলেন সেইরূপ সাজি নির্ম্মাণ কার্য্যও শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি এখন বুঝিতে পারিলাম আমার এই কাজ শিখিয়া কত ভাল হইয়াছে। যদি আমার পিতা আমার জন্য দুই হাজার টাকা [illegible]খিয়া যাইতেন তাহাও আমার আজ কোন [illegible] আসিত না, সমুদায় রাজভাণ্ডারে যাইত, [illegible] কর্ম্ম শিখিয়া আমার দুই হাজার মুদ্রা [illegible]পেক্ষা অধিক উপকার হইয়াছে। সুস্থ-[illegible]স্থদেহ লইয়া ধর্ম্মে মতি রাখিয়া সামান্য উপার্জ্জন করিলেও মানুষ পরম সুখী হইতে পারে সন্দেহ নাই।

দ্বারিকানাথ আহ্লাদ সহকারে বলিল—পরমেশ্বর ধন্য যে, তিনি তোমার এরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন। তোমার যে মত আমারও তাই।

কিন্তু ভাই তুমি কতদূরে যাইতে মানস করিয়াছ?

দীননাথ বলিল,—অনেক দূরে, এমন স্থানে যাইব যেখানে আমাদিগকে কেহ জানে না। পরমেশ্বর আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবেন।

দ্বারিকানাথ বলিল—ভাই এই শক্ত মোটা লাঠীগাছটী লও—ভাগ্যে আমি এই গাছটী সঙ্গে আনিয়াছিলাম—ভাই আর একটী কথা শুন, এই কটী টাকা লও—এই বলিয়া সে একটী টাকার গেঁজে বাহির করিয়া বলিল, আমি খাজনা দিবার জন্য এই কটী টাকা লইয়া যাইতেছিলাম বলিয়া এটা আমার সঙ্গে ছিল।—তোমার যদি ইহাতে কিছু সাহায্য হয় তাহা হইলে আমি সুখী হইব।

দীননাথ বলিল—ভাই দ্বারিক আমি আনন্দ মনে ও বন্ধুতার স্মরণার্থে তোমার এই লাঠী লইলাম। কিন্তু আমি টাকা লইতে পারিব না। ইহা খাজনার টাকা, ইহা আমি লইলে তুমি কিরূপে যথাসময়ে খাজনা দিতে সমর্থ হইবে? খাজনার দিন গত হইলে যদি খাজনা দিতে না পার তাহা হইলে রাজা তোমার সমুদায় ঘর বাড়ী নিলাম করিয়া লইবে।

কাঠুরিয়া দ্বারিকানাথ তখন হাসিতে হাসিতে কহিল—ভাই দীননাথ তোমার সে ভয় করিতে হইবে না। আমি খাজনা দিবার দিনের পূর্ব্বেই এই টাকার দুইগুণ টাকা পাইব। দুই বৎসর পূর্ব্বে একজন দুঃখী চাষার গরু মরিয়া যাওয়াতে সে আমার নিকট হইতে ২০৲ কুড়িটী টাকা ধার

নয়। আমি কখনও তাহার নিকট ঐ টাকা চাই নাই। কাল সকালে তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। সে আমায় দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল দ্বারিক দাদা ভগবানের ইচ্ছায় ধান বিক্রয় করিয়া এবার আমি দুই পয়সা পাইয়াছি। তোমার জন্যই আমার কিছু হই-য়াছে। তুমি আমার বিপদের সময়ে সাহায্য না করিলে আমার লাভ হওয়া দূরে থাকুক আমার কিছুই থাকিত না। দাদা, আগামী রবিবারে তোমার সেই টাকা কটী আমি তোমার বাড়ী দিয়া আসিব। আমি তাহার ভাল অব-স্থার কথা শুনিয়া বড় খুসী হইলাম। অতএব তোমায় যদি এই টাকা দি, তাহাতে আমার বিপদে পড়িতে হইবে না. টাকা কটী লও।

দীননাথ তাহার সৌজন্যতাগুণে এত মুগ্ধ হইল যে, সে আর দ্বারিকানাথের কথায় "না" বলিতে পারিল না।

তখন দীননাথ বলিল—আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মনে তোমার এই টাকা গ্রহণ করিলাম; তোমার মত উদার হৃদয় ও দয়ালু লোক দেখি নাই। ভগবান তোমার নিশ্চয়ই মঙ্গল করিবেন। এই বলিয়া—দীননাথ মনোরমার দিকে চাহিয়া কহিল—মনোরমে দেখ ভগবান আমাদের প্রতি কত প্রসন্ন—আমরা বিদেশ যাইবার অগ্রেই তিনি আমাদিগকে কেমন আশ্চর্য্য সাহায্য পাঠাইলেন; তিনিই আমাদের সহায়তার জন্য দ্বারিকানাথকে পাঠাইয়াছেন। এই লাঠী ও এই টাকা তাঁহারই প্রদত্ত। কত শীঘ্র তিনি আমাদের প্রার্থনাপূর্ণ করিলেন। ভগ্নোৎসাহ হইওনা, ভয় করিও না—ঈশ্বর যাহাদের সহায় তাহাদের আবার ভাবনা কি?

দ্বারিকানাথ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—তবে—দীননাথ, মা মনোরমা, আমি বিদায় হই। আমি চিরকাল তোমাদিগকে ভাল বলিয়া জানি, এখনও আমার সেই ভাব নষ্ট হয় নাই। "সাধু যাহার ইচ্ছা, হরি তাহার সহায়" তবে এস, তোমাদের ভয় নাই, তোমাদের কখনই এই দুঃখ চিরদিন রহিবে না। ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের এই দশা দূর করিবেন। তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন।

এই বলিয়া দ্বারিকানাথ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দীন-নাথকে আলিঙ্গন করিল। দীননাথও তাহাকে দুই হস্তদ্বারা ধারণ করিল—উভয়ের নেত্র জলে উভয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল—জগতে এইরূপ সদ্ভাব যেখানে, সেইখানেই স্বর্গ সুখ। এইভাবে কতক্ষণ গত হইলে দ্বারিকানাথ ধীরে ধীরে দীননাথকে পরিত্যাগ করিল—মনোরমাও দ্বারিকানাথকে নমস্কার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। দ্বারিকানাথ তখন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল; যতদূর দৃষ্টি চলে তাহারা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যখন আর দ্বারিকানাথকে দেখা গেল না, দীননাথ কন্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তরদিক ধরিয়া গমন করিল।

ক্রমশঃ।

ভারতের অসভ্যজাতি।

(১২৫ পৃষ্ঠার পর।)

থার পাঠক পাঠিকা! তোমরা প... শুনিয়াছ ছোটনাগপুর, ক... প্রভৃতির জঙ্গলময় পাহা... অসভ্যজাতি বাস করে; ঐ সকল ওরাঁও অর্থাৎ ধাঙ্গড়দিগের বৃত্তান্ত

হইয়াছে। আজ তোমাদিগকে কোল জাতির বিষয় কিছু বলিব। হাজারিবাগের নিকট রামগড়ের জঙ্গল, গঙ্গাপুর, সরগুজা, এবং সিংহভূম প্রভৃতি স্থানে অনেক কোল দেখিতে পাওয়া যায়। কোল মাত্রেই যে এক তাহা মনে করিও না, যেমন আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থদিগের মধ্যে নানা প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে, কোলদিগের মধ্যেও সেইরূপ। ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে যেমন রাঢ়, বারেন্দ্র. বৈদিক, কনোজিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার ব্রাহ্মণ, কোলদিগের মধ্যেও মুণ্ডা, লব্‌কা, ভুম্‌, চুয়াড় এবং ভুমিজ প্রভৃতি নানাপ্রকার কোল আছে। কোলেরা যে কোথা হইতে আসিয়া এই সকল প্রদেশে বাস করে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, কারণ এই জাতির শাখা প্রশাখা ভারতবর্ষের আরও অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কে বলিতে পারে এই জাতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে কোথায় বাস করিত? এই সকল প্রদেশে যখন কোল জাতিরা প্রথমে আসিয়া বাস করে তখন অবধি নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত জমিদারেরা তাহাদিগের উপর কতকটা আধিপত্য করিত, কিন্তু সে আধিপত্য অনেকটা কেবল নামেই, কাজে বড় কিছু করিতে পারিত না। বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্ব কালেও কোল জাতিকে অনেক সময়ে অনেক বার ঐ সকল অর্থ পিশাচ জমিদারদিগের নিগ্রহ [illegible] করিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার অত্যা-[illegible]রর যেমন একটা সীমা আছে, সহ্য করিবার [illegible]ও তেমনই সীমা আছে। কোল জাতি [illegible]যানুক্রমে অনেক সহ্য করিয়া আসি-[illegible] তাহারা জমিদারদিগের অত্যাচার [illegible]রিল না; সমস্ত কোল জাতি এক [illegible] হইয়া দাঁড়াইল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়। সখার পাঠক পাঠিকা! তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, জমিদার এমন কি অত্যাচার করিতে পারে—যাহাতে সমস্ত কোল জাতি ক্ষেপিয়া উঠে? তোমাদিগের এ প্রশ্ন নিতান্ত অসঙ্গত নয়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে এবং জমিদারদিগের মধ্যে কতক পরিমাণে শিক্ষা বিস্তারের গুণে আমাদিগের এ সকল দেশে প্রজাদিগের প্রতি আর তত অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অতি অল্পকাল—এমন কি ২০। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রজাদিগের প্রতি জমিদারেরা যে অত্যাচার করিত তাহার কথা আর কি বলিব! খাজনা আদায়ের নিমিত্ত জমিদারেরা প্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দুর্গন্ধময় অন্ধকার কুঠরিতে দুই তিন দিন অনাহারে কয়েদ করিয়া রাখিত। চৈত্র বৈশাখ মাসের রৌদ্রে মাথায় বোঝা চাপাইয়া সমস্ত দিন দাঁড় করাইয়া রাখিত, পাদুকাঘাত করিত, ধান খাইতে দিত এবং আরও কত যে নিষ্ঠুরাচরণ করিত তাহা আর কি বলিব। কখন কখন আবার প্রজাদের স্ত্রীলোক, বালকদিগের প্রতিও অত্যাচার করিত। এখন বুঝিতে পারিলে কোলেরা কি সাধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। একটি কথা, তোমরা মনে করিও না যে জমিদারদিগের মধ্যে একজনও ভাল লোক ছিলেন না; অনেকে এত ভাল ছিলেন যে, তাঁহারা প্রজাদিগকে আপন সন্তানের মত দেখিতেন।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিলেন জমিদারদিগের অত্যাচারই কোল বিদ্রোহের প্রধান কারণ; তখন নানা প্রকার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া সে বিদ্রোহ নিবারণ করিলেন। এখন আর কোলদিগের উপর জমিদারদিগের কোন ক্ষমতা নাই; গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে খাজনা আদায় হয়,

এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত হয়। কোলদিগকে অত্যাচারের হাত হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্যাদ্রি সাহেবেরাও যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহাদিগের শুভ অনুষ্ঠানের যথেষ্ট ফলও হইয়াছে।

ধাঙ্গড়, সাঁওতাল প্রভৃতি অন্য অন্য অসভ্য-জাতির মত কোলেরাও দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং কদাকার। কদাকার হইলেও কিন্তু ইহারা বেশ বলিষ্ঠ এবং কর্ম্মপটু। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলের মাথায় লম্বা লম্বা চুল, তবে পুরুষেরা মাথার কতকটা কামায় বলিয়া বিশ্রী দেখায়। কোল-দের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন তাহা-রাই ধুতি এবং দোপাটা পরিয়া থাকে, তাহা ভিন্ন কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই কৌপিন পরে। অসভ্য-দিগের মধ্যে যে বস্ত্র পরিধানের প্রথা নাই তাহার প্রধান কারণ বস্ত্র প্রস্তুত করার উপায় না থাকা। ক্রমে তাহারা যেমন উন্নত হই-তেছে, তেমনি বস্ত্রাদি বুনিতেও শিখিতেছে। তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ অলঙ্কার পরার সাধটা সভ্য অসভ্য সকল জাতিরই আছে, তবে না হয় সভ্য জাতিরা মূল্যবান অলঙ্কার পরেন আর অসভ্যেরা বহুমূল্য অলঙ্কার কোথা পাইবে? তাহারা গাছের পাতা, পাখীর পালক পরিয়া মনের সাধ মিটায়। কোলেরাও এ নিয়মের বাহিরে নয়। কোন উৎসব হইলে কোল রমণীরা ফুল ও পাতার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পরে এবং সচরাচর কাঁসার মাকড়ী এবং শঙ্খ এবং পুতির কণ্ঠমালা পরিয়া থাকে। তীর—ধনুক এবং টাঙ্গি কোলদিগের প্রধান অস্ত্র। তীর চালনায় ইহারা বড় পটু। আমাদিগের দেশে যেমন বালক বালিকারা পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতে পাঠশালায় কিম্বা স্কুলে শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়, কোল বালকেরা সেইরূপ অল্প বয়স হইতেই তীর চালনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে বেশ শিকারী হইয়া উঠে। আজ কাল কোলেরা বেশ চাষ করিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন করিতেছে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহারা যে কেবল শস্য উৎপন্ন করিতে শিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে তাহা নয়; গো, মেষ, মহিষ পুষিয়া ঘৃত, দুগ্ধের ব্যব-সাও আরম্ভ করিয়াছে। কোলেরা সর্ব্বভুক বলি-লেই হয়, এমন জন্তু কি পাখী নাই যাহা ইহারা খায় না। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তবে আহার সম্বন্ধে ইহাদের একটী আশ্চর্য্য কুসংস্কার আছে, আহার করিতে করিতে যদি মানুষের ছায়া আহারীয় পাত্রের উপর পড়ে তবে আর আহার করা হয় না, কিম্বা পানীয় পাত্র অন্য কেহ স্পর্শ করিলে সে পাত্রে আর জলপান করে না।

কোলেরা খুব আমোদ প্রিয়; কোন কোন পল্লিতে যাও দেখিবে নৃত্য, গীত অবিশ্রান্ত চলি-য়াছে, বালক বালিকারা পর্য্যন্ত এই নৃত্য গীতে যোগ দিতেছে। কাল নাই, অকাল নাই, কি সন্ধ্যা, কি সকাল আমোদের তরঙ্গ চলিয়াছে। এই প্রফুল্ল চিত্ততা যেমন কোলদের একটী গুণ তেমনি আর কয়েকটি মহৎ দোষে সমস্ত মাটি করিয়াছে। বলিষ্ঠকায় এবং কর্ম্মপটু হ[illegible] পুরুষেরা প্রায়ই অলস প্রকৃতি; [illegible] অধিকাংশ সাংসারিক কার্য্য ক[illegible] কোন উৎসব কিম্বা বিবাহ উপলক্ষে সুরাপান করে যে প্রায় সকলেই জ্ঞ[illegible] পড়ে। যতই কেন দোষ থাকুক [illegible] একটি মহৎ গুণ এই যে, ইহারা [illegible] সত্যপ্রিয়। এমন সময় ছিল, যখন

ডাকাতি এবং লুঠপাট করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তখনও কিন্তু কেহ মিথ্যা কথা কিম্বা প্রবঞ্চনার অভিযোগ ইহাদিগের বিরুদ্ধে করিতে পারে নাই। কোলদিগের যুবক যুবতীরা প্রায়ই মুক্তভাবে মিশিয়া থাকে; কোন যুবক যুবতীর মধ্যে ভালবাসা জন্মিলে এবং তাহাদিগের পিতা মাতা কিম্বা আত্মীয় বন্ধুর বিশেষ কোন আপত্তি না থাকিলে শীঘ্রই বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু যুবতীর পিতা মাতার সম্মতি লইবার পূর্ব্বে যুবককে কন্যার মূল্য স্বরূপ কিছু দিতে হয়। বিবাহ প্রণালী অতি সংক্ষেপ। সমস্ত ঠিক হইলে পর কন্যার পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুগণ কন্যাকে লইয়া পাত্রের বাড়ী যায়; পাত্র কন্যাকে বসিবার আসন দিয়া তাহার মস্তকে তৈল ঢালিয়া দেয় এবং ভাত, মাংস এবং আর আর আহারীয় দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত করে, কন্যা কিঞ্চিৎ আহার করিলেই বিবাহ হইয়া গেল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোলদিগের বিশ্বাস প্রায়ই ধাঙ্গড়দিগের মত, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সূর্য্যেতে সপ্রকাশ, চন্দ্র তাঁহার স্ত্রী এবং নক্ষত্রগণ তাঁহার কন্যা। কোলেরা কোন দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে না, কিন্তু উপদেবতাগণের প্রীতির নিমিত্ত ছাগ, মেষাদি বলি দিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

মুক্তি লাভ।

জগদীশ্বর প্রাণীগণের মঙ্গলের জন্য কখন কি ভাবে কাহাকে রক্ষা করেন বুঝা যায় না। কখনও বা কেহ তাঁহার উপাসনা করে এইজন্য শত্রু কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে কখনও বা কেহ তাঁহারই আশীর্ব্বাদে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে। এসকলই যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি বিধান করেন তাহা অবশ্য বলিতে হইবে।

সুইজরলণ্ডের ভডয় নামক এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের উপাসনা করিত এই তাহাদের অপরাধ। এই গুরুতর অপরাধ জন্য অন্যান্য দেশবাসী নাস্তিক সম্প্রদায়েরা ইহাদের উপর খড়্গহস্ত হইল; কিসে এই ধার্ম্মিক সম্প্রদায়কে বিনাশ করিতে পারে এইজন্য তাহারা সকলেই দলবদ্ধ হইল। এমন কি প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মগুরু পোপ পর্য্যন্তও তাহাদের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, নিরীহ, ধর্ম্মভীরু, ঈশ্বর ভক্ত ভডয় সম্প্রদায় আপন দেশ, ঘর, বাড়ী ছাড়িয়া এক পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানেও তাহাদের নিস্তার নাই। শত্রুগণ তাহাদের একেবারে নির্ব্বংশ করিবে এই অভিপ্রায়। যাহাতে এক প্রাণীও না বাঁচে, যাহাতে এক প্রাণীও ভুল ক্রমে ঈশ্বরের নাম না করে এইজন্য শত্রুরা সেই পর্ব্বতে গিয়াও ভডয়দের পীড়ন করিতে লাগিল। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে শত্রু পক্ষীয় প্রহরীরা ঘেরিয়া রহিল; রাত্রি হইলেই সকলকে মারিয়া, কাটিয়া, পোড়াইয়া ফেলিবে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা অনতিদূরে তাঁবু ফেলিয়া মদ খাইয়া আমোদে সময় কাটাইতে লাগিল, সকলেরই মুখে এক কথা এই যে, এবার দেখিব কেমনে "ঈশ্বর ইহাদের রক্ষা করেন।"

এদিকে ভডয় সম্প্রদায়স্থ যুবকগণ আসন্ন বিপদ উপস্থিত মনে করিয়া, মহিলা ও বালক দিগকে আরও পর্ব্বতের দূরতম স্থানে প্রেরণ করিবার জন্য তাহাদের দলস্থ বৃদ্ধদের উপর ভার দিল। এবং নিজেরা সকলকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। বারট্রাণ্ড্ নামে একটি অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাতার সঙ্গে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া পথ হারাইয়া গেল। মাতা পুত্রকে সঙ্গে না দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পর্ব্বতের গুহ্যতমস্থানে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে বালক পথ ভুলিয়া গিয়া যে কিছু বিপদাপন্ন হইয়াছে এরূপ মনে করা দূরে থাকুক, বরং সে নানাস্থানের নানাপ্রকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজের কষ্ট ভুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাইতে যাইতে অবশেষে রাত্রি হইল। রাত্রিতে দুই একটী নক্ষত্র মাত্র জ্বলিতেছে; এই ক্ষীণ আলোকে বারট্রাণ্ড্ হঠাৎ একটী "জয়ঢাক" দেখিতে পাইল; ঢাকের কাঠি ও সাম্‌নে ছিল। জয়ঢাক বাজাইলে শব্দ শুনিয়া তাহার সাহায্যার্থে লোক আসিতে পারে এই জন্যই জয়ঢাক বারট্রাণ্ড্ বাজাইল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে হঠাৎ জয়ঢাকের শব্দ শুনিয়া নাস্তিক শত্রুপক্ষের প্রহরীদের মধ্যে ভয় উপস্থিত হইল, তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া তাঁবুতে দৌড়িয়া গিয়া দলস্থ সকলের নিকট বলিল যে, "ভডয়গণ সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আসিতেছে, ঐ শুন তাহাদের জয়ঢাকের শব্দ শুনা যাইতেছে" এই বলিবামাত্র দলস্থ সকলেই জয়ঢাকের শব্দ শুনিতে পাইল।

সকলের মনে ভয় সঞ্চার হইল—যাহাদিগকে অপদার্থ মনে করিয়া একদণ্ড পরে পদে দলিয়া নিপীড়িত করিবে মনে করিয়াছিল তাহাদের সৈন্য সংগ্রহ করা, যুদ্ধ যাত্রা করা—একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, অচিন্তনীয় কাণ্ড মনে হওয়ায় ভয়ে নিস্তব্ধ হইল। নাস্তিকদল ঈশ্বর মানিত না বটে, কিন্তু এই হঠাৎ একটীমাত্র শব্দ শুনিয়া মনে করিল যে, ঈশ্বর নিজেই এই ভডয়দের যুদ্ধ যাত্রা করাইতেছেন; না হইলে কোথা হইতে এই অসহায় সম্প্রদায় এই নিভৃত স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিল? এমন সাহস হইলনা যে, সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করে। তাহাদের মধ্যে এক[illegible] বিপদ উপস্থিত হইল, সৈন্যাধ্যক্ষে[illegible] রহিল না, যে যেখানে ছিল [illegible] করিতে লাগিল। শত্রু তাম্বুর[illegible] উপস্থিত হইয়াছে টের পাইয়া এ[illegible] যুবকগণ যাহারা শত্রুদের হইতে [illegible] করিবার জন্য যথাসাধ্য আ[illegible] তাহারা সকলে একত্র হইয়া

সেই অগ্রসর হওয়া সেই "মুক্তিলাভ"। শত্রুগণ ইহাদের দেখিবামাত্র পলায়ন করিল। ভডয়-দের মুক্তিলাভ হইল।

শত্রুদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া ভডয়গণ নিজ দেশে গিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। এই সত্য ঘটনা যখন দেশময় প্রচারিত হইল তখন যাহারা ঘোর সাংসারিক তাহারাই এই ব্যাপারকে 'আকস্মিক ঘটনা' বলিয়া উল্লেখ করিলেন—কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী, ধর্ম্মভীরু তাহা-রাই বলিলেন যে, ঈশ্বর বালক বারট্রাণ্ড দ্বারাই এই কার্য্য উদ্ধার করাইলেন। পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা কি মনে কর?

রাখি-বন্ধন।

সেদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইয়া গিয়াছে। ভাই-য়ের প্রতি বোনের স্নেহ ভালবাসা দেখাই-বার এইটী একটী বিশেষ দিন। ভাই বোনে [illegible] ন বিবাদ থাকনা, এই দিনে সে সমস্ত [illegible]য় করিতে [illegible] বোনের আবার মিলন হয়; [illegible]রর যেমন [illegible]ন্দর! এই দিনে, ভাই—বোনের [illegible]ও [illegible]ন, বোন—ভাইয়ের দোষ ভুলিয়া [illegible]ষানু[illegible]নের ভালবাসা যেন এই দিনে [illegible] হইয়া উঠে। বোন এই দিনে, [illegible]ড় পরাইয়া, মনের মতন করিয়া [illegible]য়ের মঙ্গল কামনায়, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেন; এবং কত ভাল ভাল খাবার জিনিষ তৈয়ার করিয়া, ভাইকে খাওয়াইয়া কত সুখী হন। ভাইয়ের প্রতি এইদিন বোনের কত স্নেহ, কত আদর! আমাদিগের পাঠিকারাও বোধ হয় এই স্নেহ—এই আদর করিতে ত্রুটি করেন নাই; তাঁহারাও আপন আপন ভাই-দিগকে এই দিনে নূতন কাপড়ে সাজাইয়া, ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়া, ভাইকে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াইয়া, কত সুখী হইয়াছেন। এ বড় সুখের জিনিষ,—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ভাই বোনের স্নেহের বড় সুন্দর চিত্র। এই উপলক্ষে ভাইয়ের প্রতি বোনের কতখানি স্নেহ—কতখানি ভাল-বাসা, তাহাই দেখান হয়, ভাইও বোনের গভীর স্নেহ—গভীর ভালবাসা বুঝিতে পারেন।

আমাদের দেশে যেমন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, রাজপুত-নায় তেমনি একটী প্রথা চলিত আছে,—সেটীর নাম "রাখি-বন্ধন।" কোন সময় এবং কি প্রকারে এই প্রথাটী প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা জানা যায় না; কিন্তু আমাদিগের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ন্যায় এটীও একটী বড় সুন্দর প্রথা। বসন্তকালে রাখি-উৎসব হইয়া থাকে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সহিত ইহার একটু প্রভেদ আছে; ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে কেবল ভাইকে লইয়া সম্বন্ধ; কিন্তু রাখি-বন্ধন তাহা নহে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ভাইয়ের প্রতি বোনের যে স্নেহ ভালবাসা, তাহাই দেখান হয়; কিন্তু রাখি-বন্ধন শুধু তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলি-য়াছি, বসন্তকালে, এই উৎসব হইয়া থাকে। এই সময়ে রাজপুত মহিলাগণ, যাহাকে ইচ্ছা রাখি-বলয় পাঠাইয়া, ভ্রাতৃত্বে বরণ করেন। আবশ্যক হইলে অন্য সময়ও রাখি প্রেরণের রীতি আছে। যুদ্ধ বিগ্রহের সময়, অথবা অন্য কোন বিপদের সময় রাজপুত মহিলাগণ সহায্যের জন্য যাহার

নিকট ইচ্ছা রাখি প্রেরণ করিতেন; যাঁহার নিকট এই রাখি পাঠান হইত শত্রুতা থাকিলেও তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মভগ্নীর সাহায্যের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতেন। এই রাখি-বলয় প্রস্তুত করিবার বিশেষ কোন নিয়ম নাই; অবস্থানুসারে কেহ বা স্বর্ণ রত্নদ্বারা এই বলয় প্রস্তুত করিয়া থাকেন,—কেহ বা সামান্য পশমের ডোর, রাখি-বলয় স্বরূপ আপন আপন ধর্ম্মভ্রাতাদিগকে দিয়া থাকেন। সামান্য পশমের হইলেও সুখের যেন তুলনা নাই; ভাই বোনের এই রাখি-বলয় বড় সম্মানের জিনিষ। রাজপুতগণ এবং সেই সময়ের মুসলমান রাজা ও সম্রাটগণও, এই রাখি-বলয় পাইবার জন্য লালায়িত হইতেন, এবং ইহাকে উচ্চপদ অথবা সাম্রাজ্যের ন্যায় মনে করিতেন। যাঁহারা এই বলয় পাইতেন, তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। রাজপুতদিগের মধ্যে কেবল মহিলা এবং ধর্ম্মযাজকগণই এই বলয় বিতরণ করিতে পারিতেন। কখন কখনও রাজপুত কুমারীগণও এই বলয় প্রেরণ করেন। রাখি-বলয় দিয়া যাঁহার সহিত এই পবিত্র ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়, তিনি "ধর্ম্মভ্রাতা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি এবং বলয় পাইবামাত্র, ধর্ম্মভ্রাতা ধর্ম্মভগ্নীর মঙ্গলের জন্য, তাঁহাকে বিপদকালে রক্ষা করিবার জন্য, নিজ জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। রাজপুত নারীগণ এই বলয় প্রেরণ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা, এই পবিত্র ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে পারিতেন। মোগল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গির, সাজিহান, এবং আরঙ্গজীব পর্য্যন্তও এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। আরঙ্গজীব অত্যন্ত হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, রাজপুতদিগের প্রতি অত্যন্ত কঠোর অত্যাচার করিতেন; কিন্তু তিনিও পরম আহ্লাদের সহিত উদয়পুরের রাজমাতার নিকট হইতে রাখি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরঙ্গজীব তাঁহাকে যে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে রাজমাতাকে "ধার্ম্মিকা ভগিনী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এই প্রথার মধ্যে একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মভ্রাতা ধর্ম্মভগিনীর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেও, ধর্ম্মভগিনীর মুখ কখনও দেখিতে পান না। পূর্ব্বে দেখা সাক্ষাৎ থাকিলেও, এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার পর আর দেখা করিবার রীতি নাই। রাখি-বলয় প্রেরণের পর রাজপুত মহিলা আর ধর্ম্মভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন না; কিন্তু তবুও ইহার কি যে এক মোহিনি শক্তি, বড় বড় রাজা সম্রাটগণও ইহার জন্য লালায়িত হইতেন। যাহার সহিত সদ্ভাব আছে, এই রাখি-বলয় প্রেরণের পর সে সদ্ভাব আরও বাড়িত; যে শত্রু এই রাখি-বলয় প্রেরণের পর সে মিত্র হইত। বিপদের সময় রাজপুত মহিলাগণ শত্রুর নিকট এই বলয় পাঠাইতেন, এবং ইহার এমন শক্তি ছিল যে, যে ভয়ঙ্কর শত্রু সেও শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া, এই পবিত্র ভ্রাতাভগ্নীর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত; এবং ভগ্নীর মঙ্গলের জন্য, ভগ্নীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত।

রাখি-বলয়ের এ শক্তি সামান্য ন কিন্তু এ কি কেবল সেই বলয়ের—(পশমের একটী সামান্য ডোরের সামান্য পশমের ডোরের শক্তিতেই মিত্র হয়, এবং যে শত্রু ছিল (আবার জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতি

না; তাহা নহে। এ স্নেহের শক্তি! এ পশমের ডোরের শক্তি নহে;—স্নেহের ডোরের শক্তি—ভ্রাতা ভগ্নীর পবিত্র সম্বন্ধের শক্তি! "রাখি-বন্ধন" এর পরিবর্ত্তে যদি ইহার নাম "স্নেহ-বন্ধন" হইত, তাহা হইলেই উপযুক্ত হইত। যাহাদিগকে রাখি-বলয় দেওয়া হয়, তাহাদিগকে "রাখি-বন্ধন ভাই" বলিয়া থাকে; কিন্তু তাহা না বলিয়া "স্নেহ-বন্ধন ভাই" বলিলেই ঠিক হয়। স্নেহদ্বারা যে সকলকেই বশ করিতে পারা যায়; স্নেহদ্বারা যে শত্রুও মিত্র হয়, "রাখি-বন্ধন" তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। শত্রুতার পরিবর্ত্তে শত্রুতা করিও না, শত্রুতা বৃদ্ধি পাইবে। কঠিন কথার পরিবর্ত্তে কঠিন কথা বলিও না, প্রাণে অধিক ব্যথা পাইবে। যে শত্রুতা করিবে তাহাকে স্নেহ করিও, যে কঠিন কথা বলিবে, তাহাকে মিষ্ট কথা বলিও। একটী স্নেহের কথা—একটী মিষ্ট কথার অভাবে, কত সময় কত বিবাদ বিসম্বাদ হয়, কত মনোব্যথা, কত কষ্ট পাইতে হয়। অথচ একটী মিষ্ট কথা বলিতে আমাদের কিছুই আসে যায় না; আমাদের কিছুই খরচ হয় না;—কেবল একটী মুখের কথা; তাহাও আমরা অনেক সময় বলিতে চাই না। কত সময় কত জনকে আমরা কঠিন কথা বলিয়া কষ্ট দি! হৃদয়ের মধ্যে যে স্নেহ ভালবাসা আছে, তাহা হৃদয়ের মধ্যে রাখিবার [illegible] নহে—তাহা অন্যের জন্য। অন্যকে যত সেই [illegible]য় করি[illegible] ভালবাসা দিতে পারিবে, ততই নিজে [illegible]রর যেমন অন্যেও সুখী হইবে। অন্যের দুঃখ [illegible]ও [illegible]বার জন্যই মানুষের হৃদয়ে স্নেহ—[illegible] [illegible]য়াছে। অন্যের দুঃখ কষ্ট দূর করা, [illegible]হ বিতরণ করা অপেক্ষা সুখ আর [illegible] [illegible]বতীয়াতে যেমন ভাই বোনের স্নেহ এব[illegible] উঠে, রাখি-বন্ধনে যেমন ভাই বোনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তেমনি কেন রাখি বন্ধনের ন্যায় স্নেহ বন্ধন দিয়া তোমরা সকলকে ভাই বলিয়া গ্রহণ কর না? কত দুঃখী কত অনাথ অসহায় রহিয়াছে, তাহাদিগকে কেন তোমরা স্নেহ বিতরণ কর না? ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে বোনের স্নেহে ভাই বশীভূত হয়; রাখি-বন্ধনে শত্রুও বশীভূত হয়; কিন্তু স্নেহ-বন্ধনে সমস্ত পৃথিবী বশীভূত হয়। এই স্নেহ হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না; অন্যকে সুখী করিবার জন্য—অন্যের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য, অন্যের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য, কি তোমরা এই স্নেহ বিতরণ করিবে না?

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব।

অনেক খায় তোমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতে পড়িয়াছ যে, তিনি প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী করিতেন। তাহার পর কোন কারণ বশতঃ চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এ বহুদিনের কথা। এই সময়ে কি প্রকারে তিনি অজ্ঞাতসারে গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা বেশী লইয়া ছিলেন; এত বৎসর পর্য্যন্ত

এ বিষয় তিনি কিছুই জানিতেন না। কয়েক দিন হইল "ইণ্ডিয়ান মিরর" নামক দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার ঐ সময়ের হিসাব পরীক্ষা করিতে করিতে দেখেন যে, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৪০০০৲ —ি হাজার টাকা বেশী লইয়াছেন। যেই দেখিলেন অমনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট এই টাকা ফেরৎ দিবার জন্য চিঠি লিখিলেন। ডিরেক্টর সাহেব তাঁহার আপীসের খাতাপত্র, হিসাব পরীক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রের উত্তর দিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট কিছুই পাইবেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন; তাঁহার নিজের লিখিত জমা খরচে যখন দেনা রহিয়াছে, তিনি তাহা অবশ্যই শোধ করিবেন। পুনরায় ডিরেক্টর সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন যে, যখন তাঁহার জমা খরচে অতিরিক্ত টাকা জমা আছে তখন এই টাকা না শোধ করিলে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। ডিরেক্টর সাহেব বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া তবে এই টাকা গ্রহণ করেন।

উপরে যে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিলাম তাহা আমাদের অনেকেরই নিকট এখন সেকেলে গল্প বলিয়া বোধ হয়। পরের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া দুই পয়সা লইবার ইচ্ছাই যখন দেশের লোকের মধ্যে প্রবল তখন এরূপ ঘটনা যে অত্যাশ্চর্য্য, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সত্যের প্রতি আদর, অর্থাৎ যাহা সত্য তাহা করিতেই হইবে, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, এই যাহার আছে তিনিই মহৎ। অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বড় লোক হওয়া অতি নীচ লোকের কর্ম্ম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক সদ্‌গুণের কথা তোমরা সখায় পড়িয়াছ, এই আর একটী গুণের কথা প্রকাশ করিলাম।

পরদেশ-পাখী।

ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে পক্ষী-জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও শান্ত স্বভাব। পক্ষীরা হিংস্রক নহে; যদিও মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইগলপক্ষী ছোট ছোট ছেলেদিগকে নিজের বাসস্থানে লইয়া যায়, কিন্তু বোধ হয় ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ন্যায় মানুষের প্রাণ বিনাশ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা ব্যতীত পক্ষীজাতির বিরুদ্ধে অন্য কোন গুরুতর অভিযোগ নাই। বরং অনেক সময়ে আমরা তাহাদের সুমিষ্ট স্বর শুনিয়া এবং সুন্দর আকৃতি দেখিয়া আনন্দ লাভ করি, এবং মনে মনে ঈশ্বরকে শত শত ধ[illegible] প্রদান করি।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানারূপ সুন্দর [illegible] আছে। যেখানে অসভ্য লোকের বা[illegible] লোকেরা সৌন্দর্য্য কি জানে না, সেখ[illegible] শ্বর নানারূপ সুন্দর ও সুমিষ্ট-স্বরবিশি[illegible] করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা ঈ[illegible] দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ [illegible]

শিক্ষা করে নাই—সেখানেও তাঁহার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। যতই ভ্রমণকারী পণ্ডিতেরা নানা স্থানে গমন করিতেছেন ততই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় জানা যাইতেছে। এখনও পৃথিবীতে কতস্থান ইহাঁদের অজ্ঞাত রহিয়াছে—কালে [illegible] কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইবে কে [illegible]য় করিতে [illegible]?

[illegible]রর যেমন [illegible]ক, আমরা বলিতেছিলাম যে অসভ্য [illegible]ও [illegible] সুন্দর সুন্দর পাখী আছে। নিউ-[illegible]ষানু ও মলক্কাস্ দ্বীপে ও তৎনিকটবর্ত্তী [illegible]কার সুন্দর পাখী দেখিতে পাওয়া [illegible]র দেশে ময়ুর যেমন সুশোভিত ও [illegible] তদপেক্ষাও অধিক সুন্দর। ইহাদিগকে ইংরেজীতে Bird of Paradise বলে। আমরা ইহাকে বাঙ্গালায় "পরদেশ-পাখী" বলিব।* যখন ইউরোপীয় বণিকেরা সর্ব্বপ্রথমে লবঙ্গ ও জায়ফল প্রভৃতি সুস্বাদু এবং সুগন্ধি মশলার বাণিজ্যার্থে মলক্কাস্ দ্বীপে গমন করে তখন তাহারা ইহার শুষ্ক চর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হয় এবং ইহাকে "সূর্য্যলোক নিবাসী" এই আখ্যা প্রদান করে। তখন তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই পাখীর পালক ও পা নাই। ইহার পর একটী ওলন্দাজ পণ্ডিত লাটিন ভাষায় এসম্বন্ধে একটী

* সংস্কৃত ও বাঙ্গালা "পরদেশ" এবং ইংরাজী Paradise উভয় শব্দই একরূপ; উচ্চারণে যেমন সদৃশ, আদি অর্থেও সেইরূপ। অর্থ—স্বর্গ।

বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি ইহাদিগকে বর্ত্তমান নাম প্রদান করিয়াছেন। সেই হইতেই ইহারা "পরদেশ-পাখী" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত ৩৪ রকমের পরদেশ-পাখীর বিষয় জানা গিয়াছে; তন্মধ্যে কেবল এক প্রকারের চিত্র দেওয়া হইল। এই ৩৪ প্রকারের মধ্যে কাহারও শরীর প্রচুর ও মনোহর পালকে আবৃত; কাহারও বা ময়ূরের মত ২টী কাহারও বা ছয়টী চিত্রিত পালক এবং অন্য কাহারও বা তারের মত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ১২টী পালকগুচ্ছ বাহির হইয়াছে।

এই বহুসংখ্যক বিভাগের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহাদের আকার ১৭।১৮ ইঞ্চি লম্বা। ইহাদের শরীর, পাখা এবং লেজ গাঢ় পিঙ্গল বর্ণে শোভিত। মাথার উপরিভাগ এবং গলদেশ পীত বর্ণের পালকে আবৃত। এই সকল পালক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মসৃণ এবং মখমলের ন্যায় কোমল। নিম্ন ভাগের পালকগুলি খুব উজ্জ্বল ও সবুজ বর্ণ। ইহাদের শরীরের দুই পাশের পাখার নীচ হইতে দুইটী মনোহর পালক গুচ্ছ বহির্গত হয়। এই পালকগুচ্ছ লম্বায় প্রায় দুই ফিট হইয়া থাকে। ইহার রং সোণার ন্যায় উজ্জ্বল; পালকগুলি অতিশয় ঘন এবং কোমল। এইরূপ পালক গুচ্ছ কেবল বয়স্ক পুরুষ পাখীদিগের শরীরেই দৃষ্ট হয়। ছানাগুলির কিম্বা তাহাদের মাতার শরীরে এমন সুন্দর পালক নাই। এইখানে অমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্পূর্ণ অমিল। মানুষের মধ্যে যুবক যুবতীরাই বেশ ভূষা করিতে অধিক অনুরক্ত এবং বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরাই অলঙ্কারে সজ্জিত হইতে আরও বেশী ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চলেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেরূপ নহে। ইহা শুনিয়া অনেক অলঙ্কার প্রিয় পাঠিকারা লজ্জিত হইবেন সন্দেহ নাই।

আর আর পাখীদের ন্যায় ইহারাও পালক বদলাইয়া থাকে। তৃতীয়বার পরিবর্ত্তনের সময় এইরূপ সুন্দর পালকগুচ্ছ বহির্গত হয়। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে, কেবল সন্তানোৎপাদনের সময়েই এইরূপ সুন্দর পালক হইয়া থাকে; কিন্তু ওয়ালেস সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সে বিশ্বাস ভুল। কেবল মাত্র পরিবর্ত্তনের অল্প সময় ভিন্ন সমুদয় বৎসরই এই পালক গুচ্ছ শোভা পায়।

ইহারা খুব কর্ম্মক্ষম এবং পরিশ্রমী। এই শ্রেণীর পরদেশ-পাখী সর্ব্বদাই প্রায় ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহারা অনেকগুলি একত্রে বাস করে। ইহাদের স্বাভাবিক ডাক "ওয়াক্ ওয়াক্ ওয়াক্ অক্ অক্ অক্।" এই শব্দ শুনিয়া দ্বীপ বাসীরা ইহাদিগকে শীকার করিয়া থাকে। পুরুষ পাখী অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

পরদেশ পাখীর কিঞ্চিৎ পেটুকত্ব দোষ আছে; ফল এবং পোকাই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা ছোট ছোট ডুমুর খাইতে খুব ভাল বাসে।

অন্যান্য পাখী ও ইহাদের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয়। ইহাদের ডিম কখনও দেখা যায় নাই; ইহারা কিরূপে বাসা নির্ম্মাণ করে এবং কি ভাবেই বা সন্তান প্রসব করে ইহা এপর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে[illegible] নাই। অনেকের বিশ্বাস, ইহারা ডি[illegible] করে না।

যদিও গ্রীষ্ম প্রধান দেশ ইহা[illegible] শীতপ্রধান দেশেও ইহারা বাস ক[illegible] ওয়ালেস্ সাহেব যখন ইংলণ্ডে যা[illegible] পাখী তাঁহার সঙ্গে ছিল। ইহাদে[illegible] এক বৎসর এবং আর একটী দুই [illegible] ছিল। ওয়ালেস্ সাহেব বলেন [illegible]

প্রশস্ত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারে তবে শীত-প্রধান দেশেও ইহাদের দীর্ঘকাল বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে।

জোনাকীর বক্তৃতা।

১

সন্ধ্যাকালে সুমধুর স্বরে
পাখী এক, গাছের উপরে
বসিয়া করিছে গান, আনন্দেতে পূর্ণ প্রাণ;
ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন পাখী গিয়েছে ভুলিয়া
আছে সুধু গানেতে ডুবিয়া।

২

(কিন্তু হায় বিধির নিয়ম!
এভাবে কাটিবে কতক্ষণ ?)
করিতে করিতে গান, করে পাখী অনুমান
'সুধু গানে তৃপ্ত নহে উদর তাহার
াজন কিঞ্চিৎ আহার।'

৩

নাশ! এই রাত্রিকালে
হার এখন কোথা মেলে ?
পাখী "হায়! ভগবান একি দায়,
এ উদরজ্বালা করিলে সৃজন ?
। করি খাদ্য অন্বেষণ ?"

৪

গান তার থেমে গেল হায়!
সকাতরে চারিদিকে চায়
অবশেষে থাকি থাকি, সবিস্ময়ে দেখে পাখী
কি যেন পাতার মাঝে করে ঝলমল
বুঝিল সে "জোনাকীর দল।"

৫

মনে ভাবে "ধন্য ভগবান!
হলো আজ ক্ষুধার নির্ব্বাণ।"
জোনাকীরা মনে মনে, বিষম প্রমাদ গণে;
সাহসে করিয়া ভর তবে একজন
পক্ষী প্রতি বলিল তখন—

৬

"সবে মোরা ঈশ্বর সন্তান
ছোট বড় সকলি সমান
তাঁহারি আদেশ ভরে, তুমি সুমধুর স্বরে,
গান করি তুষিতেছ সবাকার প্রাণ
আমরাও আলো করি দান।

৭

"তবে কেন বল অকারণে
আমাদের বধিবে পরাণে ?
এ আঁধার রাত্রি কালে, পরস্পরে যদি মিলে
তুমি সুখে গান কর, আমি অলো ধরি,
কি সুন্দর হইবে শর্ব্বরী!"

৮

পরামর্শে সায় হলো তার
অন্য কোথা মিলিল আহার।
এই ভাবে পরস্পরে, মিলে সবে কাজ করে,
কি সুখের হয় তবে পৃথিবী মণ্ডল!
থাকে না বিরোধ কোলাহল।

আলেয়া।

নেক দিনের কথা। মামার বাড়ীতে এক দিন সন্ধ্যার সময় দুই একটী ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে নদীর ধারে বসিয়া আছি; কুল্ কুল্ করিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে তাহাই শুনিতেছি
আকাশে একটী একটী করিয়া তারা
উঠিতেছে, আর একটী একটী ফু
লইতেছি; আর— তখন বয়স অল্প.
চিন্তা ছিল না, দুঃখ ছিল না, শো
প্রাণ খুলিয়া কত কি গল্প ক
না হইলেও কথা বলিতেছি,
বার হো হো করিয়া খুব হা
সময় দেখিলাম, নদীর অ
আগুন জ্বলিয়া উঠিল, বি
গেল; আবার জ্বলিয়
গেল, এমনিতর ৩।৪
যেখানে এই প্রকা
স্থানটা একটু ভিজে
পরে দেখিলাম সে
এবং সেই সমস্ত
লাগিল। দেখি
তার আগের দি
শুনিয়া ছিলাম
লাগিল। গল্প
ভাবিলাম আ
যাইতে পারি,
যাইব না। ে
জন বলিল, "
আলেয়া।" ে

বটে, কি
প্রবোধ দি
চুপ্ চুপ্ কি
ফিরিয়া চা
আ
পা

য়া থাকে।
ত আলেয়া
ভয় পায়।
হূর্ত্তও এক
কি দেড়
য়।

বলে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর পদার্থ গুলিকে বশীভূত করিয়া, কেমন করিয়া নিজের কাজে লাগাই-তেছে,—ভয়ঙ্কর জিনিষ গুলিকে খেলার জিনিষ করিয়া তুলিয়াছে। বিজ্ঞানের সে সকল রহস্য, অবসর মতে তোমাদিগকেও উপহার দিতে বাসনা রহিল।

ঁধা।
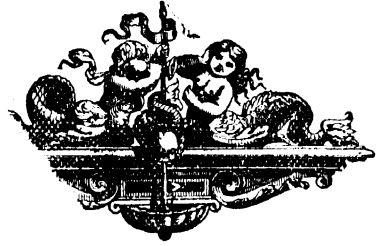
ঁধার উত্তর।

কোথা নাই,
ন ত পাই।
নিরাকার।
হ বিচার।

বড়াই

,

র।
র
ামার?
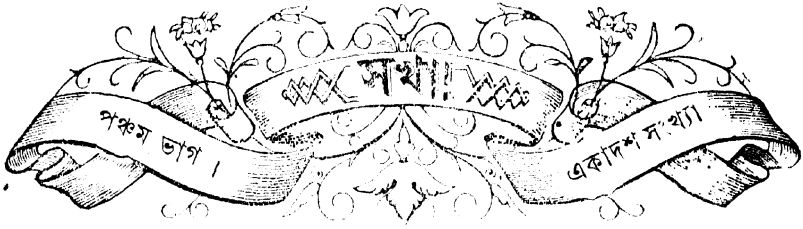
নভেম্বর, ১৮৮৭।

গ্রান্‌ভিল সার্প।

ঠিক একটী অতি সামান্য ঘটনায় কত সময় কত মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়, পর পৃষ্ঠার চিত্রটী তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই প্রকার সামান্য ঘটনা হয়ত প্রতিদিনই আমাদের চক্ষে পড়িতেছে; আমরা কিন্তু তাহা দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু এক এক জন এমন লোক আছেন, যাঁহাদিগের হৃদয় এই সকল এক একটী অতি সামান্য ঘটনায় অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠে:—এক একটী অতি সামান্য ঘটনায় তাঁহাদিগের জীবনে কত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, কত মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। জগতে যত বড় বড় কাজ, তাহা ইহাঁদিগের দ্বারাই হইয়াছে। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই আবার সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। অনেকের বিশ্বাস যাহার ধন সম্পত্তি নাই, সহায় সম্পদ নাই, উচ্চপদ নাই, তাহার দ্বারা কোন বড় কাজ হইতে পারে না। এই সংস্কার অনেকের উন্নতির পথের বিঘ্ন। আমরা দেখিয়াছি, জগতের অনেক মহৎ কাজের সূত্রপাত সামান্য অবস্থার লোকদিগের দ্বারাই হইয়াছে। আজ আমরা যাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিব, তাঁহার জীবন ইহারই একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহাত্মা গ্রান্‌ভিল সার্প সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, কি এক মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, আমরা আজ তাহাই দেখাইব।

গ্রান্‌ভিল সার্প ধনীর সন্তান ছিলেন না। তাঁহার পিতামহ এবং পিতা উভয়েই ধর্ম্ম যাজক ছিলেন। ইহাঁদিগের ধন সম্পত্তি ছিল না; কিন্তু চরিত্র, ধর্ম্মভাব, দয়া, পরোপকার প্রভৃতির জন্য ইহাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। সার্প টাকা কড়ি না পাইলেও, পিতা পিতামহের এই সকল সদ্‌গুণের—এই সকল অমূল্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে উপযুক্তরূপ লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই; সুতরাং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে অতি সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। যে দাসত্ব প্রথা উন্মূলিত করিয়া, ক্লার্কসন্, উইলবারফোর্স, বাক্সটন্, ক্রহাম প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, দরিদ্র সন্তান সার্পই তাঁহাদিগের পথ প্রদর্শক। ... সার্প সেই সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত থা... মহৎ কার্য্যের প্রথম সূত্রপাত করেন।

সার্প পনের বৎসর বয়সের সময় ... ব্যবসায়ীর নিকট শিক্ষা নবিশ নিযুক্ত ... পর একটা কাপড়ের কলে কিছুদিন ... কিন্তু সে কাজ ভাল না লাগায় অল্প... পরিত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টের ...

কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সামান্য কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সার্প কি প্রকারে এমন একটা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ে অসাধারণ সহিষ্ণুতা ছিল। একদিন ...ক্তির সহিত সার্পের তর্ক হয়, তাহাতে সেই ..., যে গ্রীক ভাষা না জানাতে তিনি ... কোনও কোন অংশ ঠিক বুঝিতে ...। সার্প আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; ...ন্তু গ্রীক ভাষা শিখিবার জন্য মনস্থ ... এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রীক ...আয়ত্ত করিয়া লইলেন। একজন ...ত তাঁহার এই প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক হওয়াতে, দুরূহ হিব্রু ভাষা তাহাতে শিখিতে হয়।

সার্পের জীবনী পড়িলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের উপর প্রেম, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত অধিক ছিল। এবং ইহা ছিল বলিয়াই তিনি অতি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও এত বড় কাজের অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছিলেন। ১৭৬৫ সালে একটী ঘটনা হয়; দাসত্ব প্রথার ইতিহাসে সেইটী বিশেষ দিন। গ্রান্‌ভিল সার্পের ভ্রাতা উইলিয়ম সার্প অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন; তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিনা ব্যয়ে দরিদ্রদিগকে চিকিৎসা করিতেন। সার্প একদিন দেখিলেন যে, একজন লোক লাঠির

উপর ভর করিয়া কোনমতে সেই চিকিৎসালয়ের দিকে যাইতেছে। রোগে তাহার শরীর শীর্ণ হইয়াছে, চলিবার শক্তি নাই, দৃষ্টিশক্তিও এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। ইহার রোগজীর্ণ শরীর, ইহার মলিন মুখ এবং দুরবস্থা দেখিয়া সার্প হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন। এই হতভাগ্যের ক্লেশ ও যন্ত্রণা দেখিয়া সার্প আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে উইলিয়মের চিকিৎসালয়ে লইয়া গেলেন, এবং অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। সার্প বলিলেন যে, সে ব্যক্তির নাম জোনাথান ষ্ট্রং; জোনাথান আফ্রিকা দেশবাসী। একজন উকীল তাহাকে ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া আসিয়াছে। কঠিন পরিশ্রম, অনাহার এবং তাহার প্রভুর অত্যাচারে, সে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন কার্য্য করিবার শক্তি ছিল, ততদিন প্রভুর বাড়ীতেই ছিল; এখন কর্ম্ম করিতে অক্ষম দেখিয়া তাহার প্রভু তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। জোনাথান পথের ভিখারী হইয়াছে; তাহার মাথা রাখিবার স্থানটী নাই। কিন্তু কঠিনহৃদয় মানুষ এই অসময়ে তাহাকে পথের ভিখারী করিলেও, ঈশ্বর তাহার উপায় করিলেন। সার্প তাঁহার ভ্রাতার চিকিৎসালয়ে তাহাকে আশ্রয় দিয়া, যত্নের সহিত তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। উভয় ভ্রাতার যত্নে জোনাথান ক্রমে রোগমুক্ত হইতে লাগিল; এবং অল্পকাল মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। সার্প কিছুদিন তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া পরে একজন ডাক্তারের বাড়ীতে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। জোনাথান স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া সুখে দিনপাত করিতে লাগিল। জোনাথান এই কার্য্যে প্রায় দুই বৎসর নিযুক্ত ছিল; কিন্তু তাহার সে সুখ অধিক দিন রহিল না। একদিন পূর্ব্ব প্রভু দেখিলেন যে, জোনাথান রোগমুক্ত হইয়াছে; এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। জোনাথান এখন কর্ম্মক্ষম হইয়াছে দেখিয়া,তিনি তাহাকে পুনর্ব্বার পাইবার জন্য উৎসুক হইলেন; এবং যে ডাক্তারের গৃহে জোনাথান নিযুক্ত ছিল, তাঁহার নিকট এই বলিয়া ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলেন যে, তিনি জোনাথানকে যদি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিবেন। জোনাথান তাঁহার ক্রীতদাস, সুতরাং তাঁহারই সম্পত্তি, তাহাতে আর কাহারও অধিকার নাই। জোনাথানের প্রভু তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। জোনাথান মহা সঙ্কটে পড়িল। স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া সে সুখে দিন কাটাইতেছিল; আবার সেই অত্যাচার সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যে পড়িতে হইবে, এই চিন্তায় তাহার হৃদয় শুকাইয়া গেল। একদিন জোনাথানের পূর্ব্ব প্রভু পুলিশের সাহায্যে তাহাকে হস্তগত করিয়া, ইংলণ্ড হইতে অন্য কোন স্থানে পাঠাইয়া দিবার জন্য গোপনে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; জোনাথান চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া সে এক উপায় স্থির করিল; জোনাথান গ্রানভিল সার্পের দয়া বিস্মৃত হয় নাই।

গ্রান্‌ভিল সার্পের দয়ায়ই যে ত
রক্ষা হইয়াছিল, এবং তাঁহার অনুগ্র
স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া সুখে দি
ছিল, তাহা জীবনে সে কখনও ভু
সে জানিত সার্প অতিশয় দয়ালু—
অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য
ব্যস্ত। জোনাথান তাঁহাকে এই

জানাইবার জন্য, এক পত্র লিখিল। সার্প পত্র পাইয়াই, অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারিল না; কারারক্ষক সমস্তই অস্বীকার করিল। সার্পের ইহাতে অত্যন্ত সন্দেহ হইল; তখন তিনি নিজেই কারাধ্যক্ষের নিকট গেলেন। কারাধ্যক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিতে বাধ্য হইলেন। সার্প দেখিলেন কারাগারের মধ্যে জোনাথান পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। জোনাথানের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সার্পের হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষদিগের অনুমতি ভিন্ন ঐ ব্যক্তিকে যেন কাহারও হাতে না দেওয়া হয়; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ যাইয়া, যাহারা রাজাজ্ঞা ব্যতীত জোনাথানকে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদিগের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রীতিমত মোকদ্দমা চলিল, এবং অবশেষে জোনাথান মুক্তিলাভ করিল। সার্প উৎফুল্ল হৃদয়ে, দর্পের সহিত জোনাথানের হাত ধরিয়া বিচারালয় হইতে বাহির হইলেন, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতেও সাহস করিল না।

কিন্তু এ ব্যাপার এই খানেই শেষ হয় নাই। জোনাথানের প্রভু তাহাকে পাইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং এই জন্য রাজদ্বারে [illegible]ক্রয় বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু গ্রান্‌ভিল [illegible]ত ভীত হইলেন না। যতই নূতন [illegible] উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই যেন [illegible]হ, তাঁহার তেজ বাড়িতে লাগিল। [illegible] উচ্ছেদের জন্য তিনি যে সংকল্প [illegible] কিছুতেই তাঁহাকে তাহা হইতে [illegible] পারিল না।

[illegible]এই সময়ের অবস্থা একবার চিন্তা করিলে, সার্পের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। No slave can breathe in England ;—ইংলণ্ডে ক্রীতদাস থাকিতে পারিবে না, যে মুহূর্ত্তে একজন ক্রীতদাস ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বাধীন হইবে; এ সকল কেবল কথার কথা ছিল। বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং পদস্থ ব্যক্তিরাও এই ঘৃণিত দাসব্যবসায় অনুমোদন করিতেন। যাঁহারা আইনজ্ঞ তাঁহারাও ইহার পোষকতা করিতেন। তখন রীতিমত দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত; পলাতক দাসদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিলে, তাহার জন্য পুরস্কার দানের কথা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত; এক কথায় মানুষকে পশুর ন্যায় দেখা হইত—পশুর ন্যায় মানুষকে লইয়া ব্যবসা করা হইত। এই হতভাগ্য দাসদিগের প্রতি যে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইত, কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার ইহাদিগের প্রতি হইত, তাহা ভাবিলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। দাস প্রভুগণ ইহাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করিতেন না; ইহাদিগেরও যে রক্ত মাংসের শরীর—ইহদিগেরও যে দুঃখ কষ্ট বোধ করিবার শক্তি আছে, তাহা তাঁহারা মনে করিতেন না; যতদিন কার্য্য করিবার শক্তি থাকিত, ততদিন প্রভুর গৃহে ইহারা স্থান পাইত; যখন রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত, তখন প্রভু গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেন; হতভাগারা বিনা চিকিৎসায় অনাহারে পথে পথে ফিরিয়া, অবশেষে জীবন হারাইত। সমস্ত ইংলণ্ডের লোক তখন এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের পোষকতা করিত। দাসদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য, সার্পকে একাকী সমস্ত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল;—যাঁহাদিগের ধন সম্পদ আছে, বুদ্ধি বিদ্যা আছে, উচ্চপদ আছে, তাঁহারা কেহই এ

কার্য্যে প্রথমে সার্পের সহায় হন নাই। বরং তাঁহারা সার্পের বিপক্ষে ছিলেন; গ্রান্‌ভিল্ সামান্য কেরাণী হইয়াও, একাকী ইহাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন; ইহা কি সামান্য সাহসের কথা?

• সার্প আত্মরক্ষার জন্য যে সমস্ত আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ লইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সার্পকে একার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিলেন। এক জন ক্রীত দাস ইংলণ্ডে আসিলেই যে স্বাধীন হইল, এ বিষয়ে তাঁহারা ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্প আর উপায় না দেখিয়া নিজেই আইন পড়িতে সংকল্প করিলেন। এবং ক্রমাগত দুই বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার জন্য সার্প দিনের মধ্যে বেশী সময় দিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাকে এই দুই বৎসরকাল আইন পড়িবার জন্য খুব অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। এই দুরূহ কার্য্যে তাঁহাকে উপদেশ বা সাহায্য করে, এমন এক জন লোকও ছিল না। দুই বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের পর তাঁহার চেষ্টার ফল ফলিল। সার্প ইংলণ্ডের আইন তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন; কোথাও দাস ব্যবসায়ের পরিপোষক কথা পান নাই। বরং ইংলণ্ডে দাস প্রথা চলিতে পারে না, ইহারই প্রমাণ পাইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, যে কার্য্যের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল দেখিয়া তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "ঈশ্বর ধন্য হউন, আমি ইংলণ্ডের আইন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম দাস ব্যবসায়ের পারিপোষক কথা ইহার কোন স্থানেই নাই।" সার্প অনুসন্ধান করিয়া যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অল্পদিন পরেই তাহা পুস্তকাকারে হাতে লিখিয়া সেই সময়ের বড় বড় আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট পাঠাইলেন। ১৭৬৯ সালে তাহা মুদ্রিত হয়; যখন মুদ্রিত হয় নাই, সার্প হাতে লিখিয়াই বিতরণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় অর্থাভাবই তাহার কারণ। ইহাদ্বারা আশ্চর্য্য ফল ফলিল;—ইংলণ্ডের লোকের এত দিনের মত ইহাদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইল। জোনাথানের প্রভু আর মোকদ্দমা করিতে সাহস করিলেন না; এবং অবশেষে মোকদ্দমা উপস্থিত না করার দরুণ তিন গুণ খরচ দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। জোনাথান দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া চিরজীবনের জন্য স্বাধীনতা পাইল।

কিন্তু এপর্য্যন্তও বিচারালয় হইতে এই দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে একটী স্থির মীমাংসা হয় নাই। সার্প দেখিলেন বিচারালয় হইতে ইহার একটা স্থির মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। এমন সময়ে জেম্‌স সমারসেট নামক আর এক জন ক্রীত দাসকে লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। তখনকার ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি লর্ড মান্‌স্‌ফিল্ড গ্রানভিল্ সার্পের মত ও পরামর্শ লইয়া এই মোকদ্দমায়ই দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন, সংকল্প করিলেন। ২৪ শে জানুয়ারী হইতে ২২ শে জুন পর্য্যন্ত, ছয় মা[illegible] মোকদ্দমা চলিল। মোকদ্দমার [illegible] এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক। অবশে[illegible] লর্ড মান্‌স্‌ফিল্ড এই মোকদ্দমার [illegible] এই মোকদ্দমা উপলক্ষে যে রায় [illegible] তিনি স্পষ্টই প্রকাশ করিলেন যে ইংলণ্ডে কখনই থাকিতে পারে [illegible] ণ্ডের আইনের দ্বারা ইহা কখন

যায় না। এই রায় প্রকাশিত হইলে সার্প লিখিতেছেন; "লর্ড মান্স্ফিল্ডের বিচারে এত দিন পরে আজ ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে ইংলণ্ডে দাস থাকিতে পারে না, যে মুহূর্ত্তে এক জন ক্রীত দাস ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বাধীনতা লাভ করিবে।" জেমস্ সমারসেট মুক্তি পাইল; সেই দিন হইতে দাসত্ব প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল; সার্পের ঐকান্তিক যত্ন এবং জীবন ব্যাপী চেষ্টার ফল ফলিল; এত দিনে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

সার্প এপর্য্যন্তও পূর্ব্বের সেই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার উপনিবেশ গুলির সহিত অন্যায় যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন দেখিয়া সার্প কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। গভর্ণমেণ্ট এপ্রকার অন্যায়—এপ্রকার অধর্ম্মের কার্য্যে লিপ্ত হইলেন দেখিয়া সে কার্য্যের সহিত আর কোন মতে সংস্রব রাখিতে পারিলেন না। এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি একবারে পথের ভিখারী হইলেন; কারণ দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তিনি এক বারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যায় অধর্ম্মের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা অনাহারে দিনপাত করা তিনি শ্রেয় মনে করিলেন।

ক্রমে গ্রান্‌ভিল সার্পের বয়স অধিক হইল; ...ক্ষ কার্য্যের বিরাম নাই। দয়া ও ...প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে খুব অধিক ...ক নিরস্ত থাকিতে পারেন? ইংলণ্ডে ...বিকের কার্য্য করিবার জন্য বল-...দিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত; পার্লি-...তে ইহার বিরুদ্ধে নিয়ম হয়, সার্প ...কান্তিক যত্ন করিতে লাগিলেন; ...একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিলেন।

১৭৮৭ সালে নিগ্রো দাসত্ব উঠাইয়া দিবার জন্য এক সভা স্থাপন করিলেন। ব্রিটিশ এবং ফরেন বাইবেল সোসাইটীর সভার প্রথম সভাপতি হন। ১৮১৩ সালে পোপের অত্যাচার হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য এক সভা হয়, সার্প অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে যোগ দেন। কিন্তু সার্পের জীবনের প্রধান কার্য্য দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধন। ক্লার্কস্‌ন্, উইলবার ফোর্স, ব্রুহাম প্রভৃতি তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিয়াছিলেন; তাঁহারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহারা এই ঘৃণিত দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের চেষ্টায় ১৮০৭ সালে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে দাস ব্যবসায় বে-আইনী বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের যত দাস মুক্তি লাভ করিল। এ সকল সার্পেরই চেষ্টার ফল। ক্রমে সার্পের শেষদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল—তিনিও সংসার হইতে বিদায় লইলেন। ১৮১৩ সালে ১৬ই জুন বেলা চারিটার সময় তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, ধীরে ধীরে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, সেই নিদ্রাই তাঁহার চিরনিদ্রা হইল! রোগ যন্ত্রণা বা অন্য কোন শারীরিক ক্লেশ তাঁহাকে পাইতে হয় নাই। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি পরোপকার ব্রতে নিযুক্ত ছিলেন। গ্রান্‌ভিল সার্পের জীবনী আমরা শেষ করিলাম। সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও জগতে কত মহৎ কার্য্য করিতে পারা যায়, ইহাঁর জীবন তাহার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(প্রাপ্ত।)

বালক বালিকাদের হাসিমুখ।

তোমরা সকলেই আমাদের প্রিয় ভাই ভগিণী! তোমাদের মুখে সর্ব্বদা হাসি দেখিতে আমাদের বড়ই সাধ। তোমরা সুখে থাকিলেই তোমাদের হাসিমুখ আমরা দেখিতে পাইতে পারি এবং আমরাও সুখী হইতে পারি। বাড়ীর ছেলে মেয়েদের আনন্দ দেখিলে বাড়ীর সকলেরই আনন্দ হয়, সকলেরই কষ্ট দূরে যায়। তাই বলি প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! সুখে থাকিবার জন্য তোমাদের চেষ্টা করা উচিত। এইটুকু পড়িয়াই বুঝি কেহ মনে করিতেছ তবে সর্ব্বদাই বৃথা আমোদে কাটাইবে, খেলা করিবে, তবেই সুখী হইতে পারিবে। বাস্তবিকই কি তাহা হইলে সুখে থাকা যায়? একদিন সুধু আমোদে ও খেলায় কাটাইয়া দেখিও কেমন বোধ হয়। নিশ্চয়ই আমোদের সময় চলিয়া গেলে মনটা ভাল লাগিবে না, মনে হইবে সময়-গুলি ভাল গেল না। কেহ হয়ত ভাবিতেছ "টাকা না হইলে সুখী হওয়া যায় না, আমাদের টাকা নাই আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব?" তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি বাস্তবিকই কি তাই? তবে কত ধনীদের দেখিতে পাওয়া যায় যে, কত সময় গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, সর্ব্বদাই মনে দুশ্চিন্তা। অনেক সময় কৃষকদের দেখিয়া বলে "উহারাই সুখী"। তবে আর ধনে সুখ কোথায়? কিন্তু তোমরাই ভাবিয়া দেখত কোন্ দিনটা তোমাদের বেশ ভাল গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যেদিন স্কুলে বেশ পড়া দিতে পারিয়াছ যেদিন মাষ্টার মহাশয়ের প্রত্যেক প্রশ্নের ভাল উত্তর দিতে পারিয়াছ—যেদিন সমপাঠীদের সঙ্গে কিম্বা বাড়ীর কোন ছেলেপিলের সঙ্গে ঝগড়া কর নাই, সেই দিনটাই তুমি সুখে কাটাইয়াছ বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু যে দিন তোমার পড়া প্রস্তুত হয় নাই সে দিনকার কথা ভাবিয়া দেখত? সেদিন একেবারেই তোমার স্কুলে যাইতে ইচ্ছা হয় নাই—পিতা মাতার ভয়ে যাইতে হইলেও কত ভয়ে ভয়ে গিয়াছ—এবং স্কুলে যাইয়াও স্থির থাকিতে পার নাই—ভয়ে ভয়ে তখন তাড়াতাড়ি একবার পড়াটা দেখিবার চেষ্টা করিয়াছ—সময় অল্প এবং অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত দেখিয়াছ তাই পড়া কিছুই প্রস্তুত করিতে পার নাই—শিক্ষক মহাশয় আসিয়া মন্দ বলিয়াছেন, মনে কষ্টও পাইয়াছ। আবার দেখ যে দিন কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছ সে দিনটাও ভাল যায় নাই। যতক্ষণ রাগ ছিল ততক্ষণ কেবল প্রতিশোধ লইবার জন্যই ব্যস্ত ছিলে তাই মনটা একটুও স্থির ছিল না—আবার রাগ থামিয়া গেলে রাগ করিয়াছ বলিয়া মনে বড় কষ্ট পাইয়াছ। তবেই দেখিলে তোমাদের যাহা যাহা করা উচিত ও আবশ্যক তাহা যত অধিক যেদিন করিয়াছ সেইদিনই তুমি তত অধিক সুখী হইয়াছ। তাই বলি, প্রত্যহ স্কুলে[illegible] ভাল করিয়া প্রস্তুত করিও, সক[illegible] ব্যবহার করিও, বাড়ী আসিয়া [illegible] করিও না, কিন্তু ভাল জিনিষ [illegible] ছেলেটীর মত কেবল নিজে রাখি[illegible] ভাই ভগিনীদের ভাগ করিয়া [illegible] মিথ্যা কথা বলিও না, বৈকালবেলা[illegible] কিম্বা খেলা করিও—তবেই দে[illegible]

শরীর কেমন ভাল থাকে। তাহা হইলেই দেখিবে সকলে তোমাদের কত ভাল বাসিবে। এইরূপে দিনটি কাটাইলে রাত্রিতে শুইতে যাইবার সময় আপনা আপনিই তোমার মন কেমন ভাল লাগিবে—মনে হইবে 'দিনটা কেমন ভাল গেল।' তবেই তোমাদের হাসিমুখ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইব—এবং সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি ফুলগুলিকে যে দেখে সেই যেমন আদর করে তোমাদেরও আমরা তেমন করিব। ঈশ্বর করুণ সর্ব্বদা তোমাদের মুখে সরল হাসি ফুটিয়া থাকুক।

ঠগী।

ছেলেবেলা দিদিমার কাছে বর্গীর হাঙ্গামা এবং ঠগীদিগের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতাম। এই সকল গল্প—বিশেষতঃ ঠগীদিগের সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তাহাতে মনের মধ্যে কেমন একটা ভারি ভয় এবং বিস্ময়ের উদয় হইত। ঠগীদিগের বিষয় ভাল করিয়া ... জন্য আমার একটা ভারি কৌতূহল ... দিগের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ... ম্যান প্রভৃতির গ্রন্থ পড়িলে কৌতূ- ... পরিতৃপ্ত হয়। আমার ন্যায় সখার ... দিগের মধ্যেও কাহারও কাহারও ... জানিবার জন্য কৌতূহল থাকিতে ... রা সংক্ষেপে ঠগীদিগের বিবরণ ... হল নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগ;—এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ঠগীদিগের ভীষণ অত্যাচার এবং প্রবল প্রতাপ ছিল। আজ ইংরাজ রাজত্বের প্রভাবে দস্যুভয় প্রভৃতি একপ্রকার নাই বলিলেই হয়, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের এ প্রকার অবস্থা ছিল না। দস্যুর অত্যাচারে, বর্গীর হাঙ্গামায় এবং ঠগীদিগের ষড়যন্ত্রে দেশের লোক সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত। বর্গী ও ঠগীর নামে লোক কাঁপিয়া উঠিত। বর্গীর অত্যাচারে কত গ্রাম, জনপদ উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ঠগীর ষড়যন্ত্রে কত সহস্র সহস্র লোক জীবন হারাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বে পথ ঘাট সকল এখনকার মত বিস্তৃত ও নিরাপদ ছিল না; বিদেশে যাতায়াত করিবার সুবিধা ছিল না, রেলের গাড়ীও ছিল না; অন্য কোন প্রকারের গাড়ী চলিতে পারে এমন পথও বেশী ছিল না। যে সকল পথ ছিল, তাহা প্রায়ই নিবিড় বন, দুর্গম পর্ব্বত বা জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে; সুতরাং সে সকল বন পথ যে কতদূর ভয় ও বিপদ জনক তাহা সহজেই বুঝা যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ বিদেশে যাইবার সময় বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিত। এখন রেলের গাড়ী হইয়াছে ছয় মাসের পথ এখন আমরা ছয় দিনে যাইতেছি, বিপদ ভয় আশঙ্কা কিছুই নাই। কিন্তু শুনিয়াছি সে কালে লোকে গয়া কাশী যাইতে হইলে বাড়ী হইতে চির বিদায় লইয়া বাহির হইত। গৃহে ফিরিবার আশা আর কেহ করিত না। দস্যুভয় বিশেষতঃ এই ঠগীদিগের ভয় তখন অত্যন্ত অধিক ছিল। নগর, গ্রাম, রাস্তা, ঘাট—এমন স্থান ছিল না, যেথানে ইহাদিগের সমাগম ছিল না। কর্ণেল স্লীম্যান বলেন

হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং কচ্ছ হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্রই ঠগীর প্রাদুর্ভাব ছিল; বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, রাজপুতনায় এবং বাঙ্গলা ও বেহারে ইহাদিগের প্রতাপ অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কেবল স্থলপথে, এবং বাঙ্গালায় স্থল ও জল উভয় স্থানেই ঠগীর ভয় ছিল। প্রতিদিন অনুমান চারি পাঁচ শত লোক ইহাদিগের হাতে জীবন হারাইত। দেশীয় রাজা বা মুসলমান সম্রাটগণ কেহই এই নৃশংস নরঘাতকদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। এমনও জানা যায় যে, কেহ কেহ ইহাদিগকে শাসন করা দূরে থাক, প্রশ্রয় দিতেন। আকবর দিল্লী ও আগ্রার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি ঠগী ধরিয়া প্রাণ দণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইহাদিগের অত্যাচার কিছুই কমে নাই। অবশেষে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সুশাসনে ঠগী সম্প্রদায় এক প্রকার নির্ম্মূল হইয়াছে।

ঠগী সম্প্রদায়ের একটী রীতিমত নিয়মবদ্ধ সমাজ ছিল; এই সমাজের কার্য্য প্রণালী নানাবিধ নিয়ম দ্বারা চালিত হইত। অনেকে অনুমান করেন ভারতে এই নরঘাতক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই; ভারতবর্ষের অপর পার্শ্বস্থ দেশ হইতে ইহারা ভারতে আসিয়াছে। নর হত্যা করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করাই এই সম্প্রদায়ের জীবনের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু লোকের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য ইহারা সাধারণ প্রজার ন্যায় জমীজমা লইয়া চাষবাসও করিত; কিন্তু সে একটা উপলক্ষ মাত্র। ইহাতে তাহাদিগকে হঠাৎ কেহ কিছু বলিতে বা সন্দেহ করিতে পারিত না। আবার এই নৃশংস কার্য্য যে ইহারা কেবল উদরান্নের জন্য করিত তাহাও নহে; ইহাকে তাহারা ধর্ম্মকার্য্য এবং দেবীর আদেশ বলিয়া জানিত। যে কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সহিত যোগ থাকে, তাহা নির্ম্মূল করা বা দমন করা সহজ নয়, তাই ঠগীদিগের প্রতাপ এত বাড়িয়াছিল। ইহাদিগের উপাস্য দেবী করালবদনী কালী। এক এক দলে এক শতেরও অধিক, এবং কখনও কখনও চারি পাঁচ শত লোকও থাকিত; হিন্দু মুসলমান সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই ইহাতে থাকিত, এবং হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় ঠগই কালীর পূজা করিত; মুসলমান ঠগেরা অসঙ্কুচিত চিত্তে কালীর পূজা করিত এবং কালীকে ভক্তি করিত। ঠগী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা কালীর আদেশেই এই কার্য্য করিতেছে;—এবং এই ঘোর নৃশংস কার্য্যে দেবী তাহাদিগের সহায়। এক এক দলে এক শত হইতে তিন চারি শত পর্য্যন্ত লোক থাকিত। এই সকল দলের এক এক জন অধিপতি ছিল; দলের লোকেরা এই দলাধিপতির আজ্ঞানুসারে চলিত। সমস্ত দলের লোক একত্রে কখনও বাহির হইত না এবং প্রকাশ্যে কখনও দস্যুবৃত্তি বা লুণ্ঠন করিত না। কেহ কোন প্রকার সন্দেহ না করিতে পারে এই জন্য ইহারা ৬। ৭ জন, কি ৪। ৫ জন করিয়া এক একটী দল বাঁধিত, এবং স্বতন্ত্র ভাবে পথে চলিত। এক দলের সহিত যে আর এক দলের পরিচয় আছে, তাহা কেহ বুঝিতেও পারিত না। ইহারা এপ্রকার ভান করিত যে পরস্পরকে যেন কখনও দেখে নাই। ইহারা পথিকদিগের সঙ্গ লইত। ক্লান্ত পথিক, একাকী দুর্গম জন পথ চলিতেছে, এমন সময় সঙ্গী পাইলে তাহার কত আ[illegible] হয়! হতভাগ্য পথিকেরা সহ[illegible] ইহাদিগের আশ্রয় লইত এবং

কিন্তু অচিরেই এই নৃসংশদিগের হস্তে প্রাণ হারাইত।

বৎসরের মধ্যে সকল সময়েই ইহারা এ কার্য্যে লিপ্ত থাকিত না। বৎসরের মধ্যে একটা নির্দ্ধারিত সময়ে, শুভদিনে শুভক্ষণে আরাধ্যা দেবী কালীর পূজা দিয়া, দলপতির অধীনে গৃহ হইতে বহির্গত হয়। ধর্ম্মের নামে ইহারা কি ভয়ঙ্কর নৃশংস কার্য্যই করিত! বিদেশে বাহির হইবার পূর্ব্বে দৈবজ্ঞ ডাকিয়া, যাত্রার দিক এবং যাত্রার সময় স্থির করাইয়া লইয়া, রীতিমত চাউল পয়সা প্রভৃতি দক্ষিণা দিয়া দৈবজ্ঞকে বিদায় করিত। গণনা শেষ হইলে দলপতি ডানহাতে একটী জলপূর্ণ ঘটী এবং একখানি সাদা রুমালে, হলুদ, একটী তাম্র মুদ্রা, একটী রৌপ্য মুদ্রা এবং উৎসর্গ কুঠার বাঁধিয়া, বাম হাতে করিয়া বুকের উপর রাখিয়া, গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন সুবিধাজনক স্থানের উদ্দেশে চলিতে থাকে, দলের আর সকলেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে। উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, দৈবজ্ঞ কথিত দিকে মুখ ফিরাইয়া, এক মনে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া, দলপতি কালীর নিকটে মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে, এবং যে দিক এবং যে সময় তাহারা স্থির করিয়াছে, তাহা কালীর অনুমোদিত কি না, তাহা জানিবার জন্য প্রার্থনা করে। [illegible]দেশ যাহা বুঝিতে পারে, সেই অনু[illegible] কার্য্য করিয়া থাকে। শুভচিহ্ন [illegible]রা কথনও যাত্রা করে না। ছুতার, [illegible]া, ফকির, খঞ্জ প্রভৃতি দেখিলে [illegible] যাত্রাকালে ভিন্ন গ্রামের শব [illegible] হইতে চিল শ্বেতবর্ণ বিষ্ঠা [illegible] বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে [illegible]লে, অত্যন্ত শুভ ফল লাভ হয়। দলপতির হাতের জলপূর্ণ ঘটী পড়িয়া গেলে অত্যন্ত অমঙ্গল আশঙ্কা করে, ইহাতে সেই বৎসরই দলপতির মৃত্যু এবং সমস্ত দল ধরা পড়িবে এমন আশঙ্কা করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

দুঃখিণীর দুঃখের কথা।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে—নগরের অনতিদূরে একটী বৃদ্ধা রমণী বাস করিতেন। একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ; তাহার সম্মুখস্থ ছোট বারাণ্ডায় বসিয়া প্রত্যহ সকালে বিকালে তাঁহাকে সুতা কাটিতে দেখা যাইত। সংসারে বৃদ্ধার কেহ ছিল না। আপনার ভরণ পোষণের ভার আপনাকেই বহন করিতে হইত। একটী প্রতিবেশী ভদ্রলোক দয়া করিয়া, এই ক্ষুদ্র কুটীরে তাঁহাকে বাস করিতে বলিয়াছিল ; কিন্তু পরের উপর নির্ভর করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না; সামান্য কার্য্য হইতে যে যৎসামান্য আয় হইত তাহারই কিছু কুটীরের ভাড়া স্বরূপ দিতেন। ভদ্রলোকটী নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্তেও তাহা গ্রহণ না করিয়া পারিতেন না।

আর্থিক কষ্টই বৃদ্ধার একমাত্র কষ্ট নহে। তাঁহার একখানি পা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং অতি কষ্টে চলা ফেরা করিতে হইত। বাম হাত খানিও প্রায় সেইরূপ; কিন্তু সুতা কাটার ব্যাঘাত হইত না। এই দুঃখপূর্ণ জীবনের ইতিহাস অতিশয় কষ্টজনক। কিন্তু এত দুঃখেও বিধবা কখনও আপনার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যান নাই; পরের দাসত্ব করা—পরের উপর নির্ভর করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। আর এক কথা—আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যাহারা সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে—স্বামী ও পুত্রশোকে অস্থির হয়—তাহারা দেবতার প্রতি অনর্থক দোষারোপ করে। কিন্তু ইহাঁর মুখ হইতে কখনও সে বিষয়ে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইষ্ট দেবতার পূজা করিতেন এবং শত দুঃখ কষ্ট হইলেও পরের গলগ্রহ হইতে ইচ্ছা করিতেন না।

আমরা অনেক সময়ে আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী মনে করি। মনে ভাবি এমন কষ্ট আর কাহারও নাই—এত দুঃখ যন্ত্রণা সংসারে আর কেহই ভোগ করে না। কিন্তু একথা কি ঠিক? যে আপনার ও আপনার পরিবারের সুখ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে না এবং পরের সুখ দুঃখের প্রতিও দৃষ্টি করিতে অবসর পায় সে কখনও একথা বলিতে পারে না। সংসারে কত শত দুঃখী ও হতভাগ্য আছে যাহারা আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী ও গরিবের অবস্থাকেও স্বর্গ সুখ বলিয়া মনে করে। কত লোক হয়তো এমন দুঃখ ও কষ্ট পাইতেছে যাহা আমরা কখন কল্পনাও করিতে পারি না।

এই বৃদ্ধা রমণীর জীবন তাহার এক দৃষ্টান্তস্থল। ইনি এক কৃষকের কন্যা। অল্প বয়সেই কোন সৈনিকের সঙ্গে ইহাঁর বিবাহ হয়। এই সৈনিক আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করেন এবং ক্রমে আপনার চারি পুত্রকে সৈন্যদলে প্রবেশ করান। যখন স্বামী ও পুত্রগণ যুদ্ধে গমন করিত এই রমণীও তাহাদের সহিত যাইতেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আহত হইলে নিজ হাতে শুশ্রূষা করিতেন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্বামী ও পুত্রগণের সঙ্গে এক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। সে যুদ্ধে বিপক্ষেরা জয়লাভ করে। এই রমণী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে একটু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন; যখন একটী আহত সৈনিককে তাহার সঙ্গীরা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন তিনি আপনার স্বামী ও পুত্রগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা শুনিলেন তাহা অতিশয় কষ্টকর। তাহারা বলিল "আপনার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত সকলেই পতিত হইয়াছে।" আর কেহ হইলে সেই খানে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িত কিন্তু ইনি তাহা করিলেন না। কেহ এখনও বাঁচিয়া আছে কি না—শুশ্রূষা দ্বারা এখনও কাহাকে বাঁচাইতে পারেন কি না দেখিতে চলিলেন।

এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ নাই। সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। কেবল মৃত ও আহত দিগের দেহ সে[illegible] আছে। লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়া [illegible] আপনার পুত্র ও স্বামীর উদ্দে[illegible] প্রথমেই দেখিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। এবং এখন[illegible] আছে। তিনি পুত্রের নিকটে [illegible] দেখিতেছেন এবং কি উপায়ে তা[illegible] করিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলে[illegible]

কিন্তু হায়! এত দুঃখের মধ্যে এ সুখ টুকুও তাঁহার ভাগ্যে স্থায়ী হইল না। হঠাৎ দেখিলেন বিপক্ষের এক দল অশ্বারোহী বেগে সেই দিকে আসিতেছে। তখন তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া আপনার শরীর দ্বারা আহত পুত্রকে আগুলিয়া রাখিলেন। অশ্বারোহীগণ দ্রুতপদে তাহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। এই আঘাতে তাঁহার একখানা হাত ও পা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গেল এবং শরীরের অসংখ্য ক্ষত হইতে রক্তধারা পড়িতে লাগিল। মাতা, আহত সন্তান বুকে করিয়া জ্ঞান-শূন্যা হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহার পরিচিত সৈনিকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং শিবিরে আনয়ন করে। তাহার পর ইনি হাসপাতালে থাকিয়া সুস্থ হন। নিয়ম আছে যে, সৈনিকদিগের বিধবা ও নিরাশ্রয় পরিবার গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পায়। কিন্তু ইহাঁর প্রতি গভর্ণমেণ্ট প্রসন্ন হইলেন না। ইনি বিরক্ত হইয়া আপনার বাসভূমিতে আসিলেন এবং পূর্ব্ব কথিত প্রকারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আছে কি না আর সে বিষয়ে খোঁজ

...ক্ক...

...বার বৎসর অতীত হইয়াছে। এক-...বিধবা বারাণ্ডায় বসিয়া সূতা ...ন সময়ে একটী খোড়া ভিক্ষুক ...র বারাণ্ডার নিকট আসিল। ...শোচনীয় অবস্থা, অপরিষ্কার ও ...অনাহারে মুখ যেন কালিমাখা ...য়ে বৃদ্ধার দয়া হইল। তাহাকে বারাণ্ডায় উঠিয়া বসিতে বলিয়া নিজের রাত্রির আহারের জন্য যাহা রাখিয়াছিলেন তাহা আনিয়া দিলেন। সৈনিক তাহা আহার করিল এবং বৃদ্ধার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে পাগলের ন্যায় "মা" বলিয়া বৃদ্ধার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং কান্দিতে লাগিল।

জীবনের শেষ অবস্থায় দুঃখিনী জননীর হতভাগ্য সন্তান ফিরিয়া আসিল। যাহা কোন দিন আশা করেন নাই বৃদ্ধা আজ সেই সুখ লাভ করিলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।
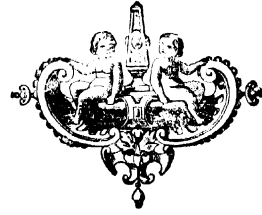
সংগ্রহ।

সেদিন আমেরিকার এক স্থানে একটী আশ্চর্য্য উল্কা পতিত হইয়াছে। উল্কা পিণ্ডটী এখন ডাক্তার সেয়ারস্‌এর নিকট আছে। একদিন রাত্রি আটটার সময় ডাক্তার সেয়ারস্ একজন রোগীর বাড়ী হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় এই উল্কাটী পতিত হয়। তিনি দেখিলেন, যে দীর্ঘপ্রস্থে চারি ইঞ্চি পরিমাণ একটী গর্ত্ত হইতে ভয়ঙ্কর ধূম উঠিতেছে। তিনি তৎ-

ক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া, সাবল দিয়া সেই স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাঁচ ফিট মাটির নীচে উল্কাটী দেখিতে পাইলেন। সচরাচর উল্কার আঁকার যে প্রকার থাকে, এটী সে প্রকার নয়। উল্কাটী সম্পূর্ণ গোলাকার, ইস্পাতের ন্যায় রং এবং মসৃণ। উল্কাটীর গায়ে, নানা প্রকার আকৃতি চিত্রিত আছে, এবং অনেক লেখাও আছে; কিন্তু কি ভাষায় লেখা তাহা জানা যায় নাই। কি ধাতুতে নির্ম্মিত তাহাও জানা যায় নাই—এক প্রকার নূতন ধাতু।

* * *

যে কাগজে সখা ছাপাইয়া প্রতিমাসে আমরা গ্রাহকদিগকে দিতেছি, বিজ্ঞানের উন্নতিতে এই কাগজে যে কত প্রকার জিনিষ তৈয়ার হইতেছে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সম্প্রতি কাগজের এক প্রকার বোতল তৈয়ার হইয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই তাহা এদেশে আসিবে। দরজা জানালায় লাগাইবার জন্য কাগজের সার্সি তৈয়ার হইয়াছে; এই সার্সি কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, অথচ কাচের মত এত সহজেই ভাঙ্গিবে না বার্লিন নগরে একটী কাগজের ধর্ম্ম মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা জানি কাগজে জল লাগিলেই, তাহা ছিঁড়িয়া যায়; কিন্তু বিজ্ঞান তাহারও পথ করিয়াছে; কাগজের ছোট জাহাজও প্রস্তুত হইয়াছে। আমেরিকায় কাগজের দ্বারা রেল গাড়ীর চাকা তৈয়ার করা হইয়াছে। এই বড় বড় কাজ ছাড়া, খুব সূক্ষ্ম কাজও হইয়াছে; ড্রেস্‌ডেন নগরে একজন ঘড়ীওয়ালা, কাগজের ঘড়ী (watch) প্রস্তুত করিয়াছে। আর বাকি কি? বুদ্ধিতে সব হয়।

* * *

প্রথমে একটা জিনিষ যে বাহির করে, তাহারই বাহাদুরী। খবরের কাগজ ত এখন দেশ ছাইয়াছে, তোমরা ঘরে বসিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খবর পাইতেছ; কিন্তু প্রথমে যাহার মাথায় এই খবরের কাগজ বাহির করিবার চিন্তা উঠিয়াছিল, সে ব্যক্তি সামান্য নয়। এই খবরের কাগজ প্রথমে একজন ফরাসী ডাক্তার বাহির করেন। তিনি দেখিলেন যে, যেখানে গিয়া তিনি কোন নূতন সংবাদ বা নূতন খবর বলেন, সেখানেই লোকে তাহা আগ্রহ করিয়া শুনে। ইহাতেই খবরের কাগজ বাহির করিবার চিন্তা তাঁহার মনে উঠে; এবং সেই হইতেই খবরের কাগজের প্রথম সৃষ্টি হয়।

* * *

ব্রহ্মদেশে অমরাপুর নগরে "বো" নামে একটী বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষটী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। খৃষ্টের জন্মের ২৮৮ বৎসর পূর্ব্বে এটী জন্মায়; সুতরাং এখন ইহার ২১৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছে। এই দুই হাজার বৎসরে, এই পৃথিবীতে কত কি ঘটনা, কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে!

* * *

শিক্ষা দিলে নীচ জন্তুদিগের দ্বারাও কত কাজ করাইয়া লওয়া যায়। কুকুরের দ্বারা গৃহস্থের কত কাজ হয়, তাহা আমরা প্রত্যহই দেখিয়া থাকি। একজন সাহেব মানুষের পরিবর্ত্তে বান্দরের দ্বারা পাখা টানাইতেন। যুদ্ধ প্রভৃতি
পায়রা দূতের কাজ করে, যেখানে
পাঠাইবার সুবিধা নাই, এমন সক
পত্র লইয়া যায়। আবার এ
আশ্চর্য্য উড়িবার শক্তি আছে
ওহিও প্রদেশের ডেটন নগরে
ফিয়া পর্য্যন্ত, তিনটী পায়রা সম
ছিল, ডেটন হইতে ফিলেড্যা
মাইল। আর একটা পায়রা

ঘণ্টায় উড়িয়া গিয়াছিল,—ঘণ্টায় ৪২ মাইলেরও অধিক। নিউইয়র্কের কয়েকটী পায়রা ২৩৭ মিনিটে ২৪৫ মাইল গিয়াছিল, মিনিটে এক মাইলেরও বেশী। আমরা রেল গাড়ীতে চড়িয়া মনে করি খুব দ্রুত চলিতেছি; কিন্তু ইহার কাছে কোথায় রেলের গতি! যদি পায়রার মত পাখা থাকিত, আর উড়িতে পারিতাম, তবে কোথায় কোথায় উড়িয়া যাইতাম!

পলাতক পাখী।

(১)

প্রাণের পাখীটি মোর
স্নেহের পিঞ্জর ছাড়ি,
[illegible]গাথায় গিয়েছে চলে
[illegible]ার না আসিল ফিরি!

(২)

[illegible]াদি দিবা নিশি
[illegible] ডাকি "আয় আয়"
[illegible]নি কোথায় গিয়ে
[illegible]ল সে রয়েছে হায়!

(৩)

সারাদিন আধ আধ
"মা""মা" বলে ডেকে ডেকে,
রেখে গেছে প্রাণে মোর
কতই মমতা মেখে।

(৪)

আগে যদি জানিতাম
পালাবে এমনি করে;
এত কি যতনে স্নেহে
পুষিতাম তবে তারে?

(১)

সেদিন সন্ধ্যার বেলা
পিঞ্জরে দেখিনু তায়—
ছুটে ছুটে চারি দিকে
যেন সে প'লাতে চায়।

(২)

কতই খাবার এনে
দিলেম আদর করে
খে'লো না "নলিনী" * কিছু
একধারে গেল স'রে।

(৩)

"নলিনী" "নলিনী" বলে
ডাকিলাম কত বার;
"মা'' বলে তেমনি করে
সাড়া নাহি দিল আর!

* পাখীর আদরের নাম। এই নামে ডাকা হইত।

(৪)

জাগিনু নিশীথ কালে
পাখা শব্দ শুনি তার,
গিয়ে দেখি পাখী নাই
রয়েছে পিঞ্জর ছার!

(১)

বড়ই সাধের ছিলি
"নলিনী" পাখীটি মোর
কেমনে চলিয়ে গেলি?
কি কঠিন প্রাণ তোর!

(২)

রয়েছিস কোথা এবে
এসব মমতা ছেড়ে?
কে রেখেছে নলিনীরে!
এমন যতন করে?

(৩)

অথবা বনের পাখী
পুনরায় গিয়ে বনে
অনন্ত আকাশে উড়ি
গাইছ আপন মনে?

(৪)

এত স্নেহ ভালবাসা
পেয়েছিলি যার ঠাঁই
কিছু তার—নলিনীরে!—
কিছুই কি মনে নাই?

সাজি।

আমাদের পাড়ায় এক ঠান্‌দিদি ছিলেন। খোষামোদ রোগটা তাঁর বড় প্রবল ছিল। সত্য বলিয়া হউক, মিথ্যা বলিয়া হউক, যে প্রকারে হউক, অন্যকে খুসী করাই যেন তাঁর দৈনিক কাজ ছিল। আমাদর উপর তাঁর অনুগ্রহটা একটু বেশী ছিল,—আমাদিগকে তিনি একটু বেশী খোসামোদ করিতেন। তিনি দিন কত কোথায় গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, আমাদের বাড়ীতে একটা খোকা হইয়াছে, অমনি তাড়াতাড়ি করিয়া খোকা দেখিতে আসিলেন; তাড়াতাড়ি খোকার বিছানার কাছে যাইয়া,—না দেখিয়াই, বলিয়া উঠিলেন, "আহা যেন কার্ত্তিকটী।" খোকা কিন্তু সে বিছানায় ছিলওনা, আমাদের মিনি বেরাল খোকার স্থান অধিকার করিয়া শুইয়াছিল। ঠান্‌দিদির কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসির গোলে মিনি লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল; ঠানদিদি অপ্রস্তত। অধিক খোসামোদ করিতে... এমনি হয়।

* * *

এখন খুব বড় বড় কলারওয়া... ফ্যাসান উঠিয়াছে। আমাদের... সকলের উপর টেকা দিয়াছেন,... কাণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কোন হ... নাকি তাঁর কলারের পেছনদিকে

পন দিবার জন্য তাঁর কাছে পত্র লিখিয়াছিল। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া অপেক্ষা ইহাতে অধিক কাজ হইত।

* * *

বুল্ সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন—পেটের দায়ে। রেলওয়ে কোম্পানির বড় সাহেবের কাছে উমেদারী করিয়া মোটা মাহিনায় একটী বড় ষ্টেশনে ষ্টেশনমাষ্টারী পাইলেন। লেখা পড়া বিদ্যা বুদ্ধিতে বুল্ হস্তিমূর্খ। ষ্টেশনে লাল আলো দেখান হয় সকলেই জান। বুল্ সাহেব যাইয়াই শুনিলেন তেল নাই; তৎক্ষণাৎ হেড আফিসে টেলিগ্রাফ করিলেন যে, অবিলম্বে লাল তেল পাঠাইয়া দেয়।

* * *

আমাদের খোকা একজন তোত্‌লাকে কথা বলিতে দেখিয়া তার বোন্‌কে বলিতেছিল, "দেখ দিদি আজ একটা লোক এসেছিল, সে এখনও কথা বল্‌তে শেখেনি অথচ কি বল্‌বার জন্য সে বেচারী কত চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো।" খোকা কখনও তোত্‌লা দেখেনি।

* * *

এক ব্যক্তি খুব টেরা ছিল; সে সময় দেখবার জন্য নিজের পকেট থেকে ঘড়ী বাহির করিতে [illegible] ...শর একজনের পকেট থেকে ঘড়ী [illegible] বেচারী বড় টেরা ছিল, অন্য [illegible] বোধ হয় তার ছিল না। কিন্তু [illegible] ুনিল না, জরিমানা দিয়া শেষে [illegible]

* * *

[illegible] র শিক্ষক ছাত্রদিগকে গাধার [illegible]। ছেলেরা বড় অন্যমনস্ক; শিক্ষক বলিলেন "দেখ তোমরা যদি আমার দিকে মনোযোগের সহিত না তাকাও তবে গাধার বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞানই হইবে না।"

* * *

এক ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দেন যে,—যে ব্যক্তি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, তাহাকে আমি দশ সহস্র টাকা দিব। অবিলম্বে একজন লোক উপস্থিত হইয়া বলিল মহাশয়, আমি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, অতএব আপনার প্রতিশ্রুত দশ সহস্র টাকা আমাকে দান করুন। বিজ্ঞাপনদাতা বলিলেন—বাপু, তুমি যদি নিজের অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হও তবে কেন এই দশ সহস্র টাকার জন্য আসিয়াছ!

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। "ম"।

২। (মেঘ)।

নূতন।

আপনার কিছু নাই পরের ভূষণে।
চিরদিন শোভা পাই জানে সর্ব্বজনে॥
তবুও সকলে মোরে সমাদর করে।
দেখিতে না পারি আমি শোভি যার তরে॥
পাষাণ হৃদয় মোর, তবু কবিগণ।
দেখিলে আমাকে হয় ভাবেতে মগন॥
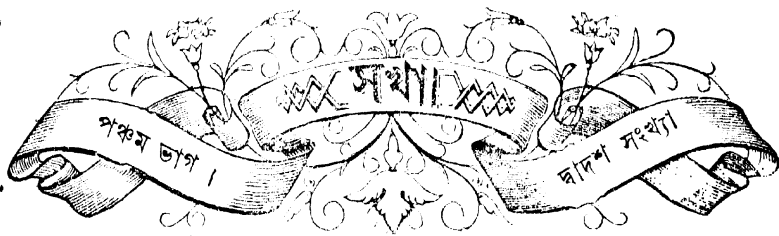
ডিসেম্বর, ১৮৮৭।

ঠগী।

ঠগদিগের মধ্যে কয়েকটী পদবিভাগ ছিল। সর্ব্ব প্রধান পদ "সুবাদার।" এক একটী সুবাদারের অধীনে পাঁচ সাতটী দল থাকিত। যে সে লোকে সুবাদার হইতে পারিত না। সুবাদার হইতে হইলে ভদ্রলোকের মত দেখিতে হওয়া চাই, শরীরে বল থাকা চাই, ধীর বুদ্ধি, তর্ক করিবার শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এবং খুব বিচক্ষণতা থাকা চাই। পুলিশ কর্ম্মচারী প্রভৃতির সহিত আলাপ থাকা চাই। এক জন বিশিষ্ট ধনী এবং ভদ্র ব্যক্তি বলিয়া লোকে জানে, এমন লোকেই কেবল সুবাদার হইতে পারিত। সুবাদারের পর "জমাদার"; জমাদারেরও সুবাদারের মত অনেকগুলি গুণ থাকা চাই। জমাদারের পর বক্‌শী।" যাহারা হত্যা কার্য্যে খুব পারদর্শী হইয়াছে তাহারাই কেবল বক্‌শী হইতে পারে। তার পর গুপ্তচর, গণক, গোরখননকারী; এবং সমাধি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নির্দ্দিষ্ট থাকিত। এই সকল লোক লইয়া এক একটী দল গঠিত হইত। এক এক কার্য্যের জন্য এক এক দল লোক নিযুক্ত থাকিত; ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঠগীদিগের কি প্রকার নিয়মবদ্ধ সমাজ ছিল। ঠগের সন্তানেরাই প্রায় ঠগ হইত; কিন্তু ঠগেরা পোষ্য পুত্র লইয়াও তাহাদিগকে এই নৃশংস ব্যবসা শিক্ষা দিত। দশ বার বৎসর বয়সেই বালকদিগকে এই নৃশংস কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিত। প্রথম তাহাদিগকে নরহত্যার কথা কিছুই জানিতে দেওয়া হইত না। এক জন বিজ্ঞ ঠগের নিকট প্রথমে এই সুকুমারমতি বালকদিগকে শিক্ষানবিশ রাখা হইত। প্রথমে খেলার দ্রব্য, ভাল ভাল খাবার দ্রব্য, এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি দিয়া, নানা প্রকারে তাহাকে ভুলাইয়া রাখা হইত। বালকের সেই সময় যাহা কিছু আবশ্যক, এই ব্যক্তির নিকটেই পাইত। চৌদ্দ পোনের বৎসর বয়সের সময় এই ভয়ানক কার্য্যের এক একটু তাহাকে দেখাইতে আরম্ভ করিত। ক্রমে অভ্যাসে এই সকল নৃশংস কার্য্যে বালকের কোমল হৃদয়ে আর ব্যথা লাগিত না; ক্রমে এই সকল
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়া
ক্রমে নিজেই হত্যা করিবার জন্য ত
প্রবৃত্তি জন্মিত। তখন গুরুর অ
অন্যান্য ঠগদিগের সহায়তায় কো
বধ করিয়া, গুরুকে প্রণামী
ভোজ দিত। গুরুও শিষ্যকে
ব্যবসা অবলম্বন করিতে অনুমতি
ঠগেরা কি প্রকারে হত্যাকা

এক্ষণে তাহাই আমরা সংক্ষেপে বলিব। হত্যা- অতিশয় ভয়ানক, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। ...প মানুষকে কি প্রকারে এ প্রকার ...র ন্যায় হত্যা করে, তাহা চিন্তা ... প্রথমে কোন প্রকার অস্ত্র দ্বারা ...ম বহির্ভূত। প্রাণ না গেলে ...হার করে না, বা পথিকের ...র এই হত্যা কার্য্য সম্পন্ন করি- ...। রুমাল, ফাঁসযুক্ত দড়ি, ও চাদর আমরা গতবারে উল্লেখ করি- য়াছি যে, এক এক দলে প্রায় তিন চারি শত ঠগ থাকিত। যখন ইহারা বাহির হইত তখন ছোট ছোট দল করিয়া বাহির হইত। পথিক দেখিলেই ইহারা তাহাদিগের সঙ্গ লইত এবং আপনাদিগকেও পথিক বলিয়া পরিচয় দিত; পথ চলিতে চলিতে পথিকেরা কোথায় যাইবে, কোথা হইতে আসিতেছে, কথায় কথায় এই সমস্ত জানিয়া লইত। ইহারা একার্য্যে এমন চতুর ছিল যে, অনেক সময় পথিকদিগের টাকা কড়ির বিষয়ও ইহারা জানিয়া লইত। এমন ভাবে,

এমন চতুরতার সহিত ইহারা কথাবার্ত্তা বলিত, যে কেহ কোন সন্দেহই করিতে পারিত না। অবশেষে সুবিধা বুঝিয়া ইহারা হত্যার আয়োজন করিত। কোন বিপদজনক স্থানে ইহারা হত্যা করিত না। ইহাদিগের অনেকগুলি সাংকেতিক কথা আছে, অন্য লোক থাকিলে ইহারা সেই সকল সাংকেতিক কথা ব্যবহার করিত। হত্যারও সাংকেতিক কথা ছিল। এই সংকেত করিবামাত্র হতভাগ্য পথিকের পাশের একজন ঠগ তাহাকে একটু অন্যমনস্ক দেখিলেই, গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিত, এবং আর একজন সেই ফাঁসের একদিক ধরিয়া ক্রমশঃ টানিতে থাকিত। এইরূপে দুই দিক হইতে দুই জনে টানাতে, পথিকের মুখ মাটির দিকে ঝুকিয়া পড়িত এবং এই অবসরে আর একজন পিছন দিক হইতে আসিয়া সেই হতভাগ্যের দুই পা ধরিয়া টানিত, তাহাতে সেই হতভাগ্য পথিক তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া যাইত, এবং আর এক জন সেই সময় তাহার পিঠের উপর বসিয়া, ফাঁস জোরে টানিয়া ধরিয়া কার্য্য শেষ করিত। তখন মৃত পথিকের কাছে যাহা পাইত, সে সমস্ত সংগ্রহ করিত। হত্যা করিয়া ইহারা মৃতদেহ কখনই যেখানে সেখানে ফেলিয়া যাইত না। মৃতদেহ সমাধিস্থ করা দেবী ভবানীর আজ্ঞা এবং ইহারা জানিত যে এই প্রকারে মৃত দেহ যদি যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে তবে সহজে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা; এইজন্য মৃতদেহ গোর দিয়া রাখা ইহাদিগের একটী নিয়ম ছিল। এই গোর গোলাকার ও চতুষ্কোণ হইত। হত্যার পর মৃতদেহ কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইত। গোর দিবার স্থান প্রায় হত্যা করিবার পূর্ব্বেই স্থির থাকিত; এই স্থানে লইয়া গিয়া ইহারা মৃতদেহ সমাধি করিত। এই সময়ে ইহারা অস্ত্রের ব্যবহার করিত, এই অস্ত্র, একখানি মন্ত্রে উৎসর্গীকৃত কুঠার। ইহাদ্বারা মৃতদেহটার হস্তপদ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেহটার সহিত গোর দিত। গোরও এই অস্ত্রের দ্বারা খনন করিত। মৃতদেহ গোর দিয়া, তাহার উপর মাটি চাপা দিত, এবং লোকের কোন প্রকার সন্দেহ না হ[illegible] এইজন্য গোরের উপর ঘাস বসাইয়া দিত। এক একটী গোরে একটীর অধিকও দেহ সমাধি করিত। গোর দিবার পূর্ব্বে যদি সেই স্থানে অন্য কোন লোক উপস্থিত হইত, তাহা হইলে ইহারা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া লোককে প্রতারিত করিত। অনেক সময় মৃত দেহটী একখানি বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া গোর খনন করিতে আরম্ভ করিত, এবং কেহ কেহ খুব ক্রন্দন করিতে থাকিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাহাদিগের পরিবারের কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। অনেক সময় মৃতদেহ একেবারে গোপন করিয়া বস্ত্রের কানাত করিয়া তাহার মধ্যে সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, কানাতের মধ্যে তাহাদিগের পরিবারেরা আছে। কোন কোন সময়ে ঠগদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ব্যারামের ভান করিয়া মাটিতে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে আরম্ভ করিত; অন্য লোকে তাহার য[illegible] দেখিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলে, তখ[illegible] শেষ করিত। ঠগেরা যাহার সঙ্গ লই[illegible] সহজে ছাড়িত না। আবশ্যক হইলে [illegible] পর্য্যন্ত সঙ্গ লইয়া চলিত। প[illegible] হত্যা করিত। অনেক সরাই এই নৃশংস কার্য্য হইত। এই অধিকারীদিগের সহিত ঠগদি[illegible] বস্ত থাকিত। পথিকেরা এই সব আশ্রয় লইত। হতভাগ্য পা[illegible]

মনে যখন নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে, এমন সময় এই নিষ্ঠুর ঠগেরা ইহাদিগকে হত্যা করিয়া সেই সরাইয়ের মধ্যেই পুতিয়া, উপরের মাটী পিটিয়া সমান করিয়া রাখিত কেহ কোন সন্দেহ করিতে পারিত না। সন্ন্যাসী এবং ফকীরদিগের নিকট হইতেও ইহারা অনেক সাহায্য পাইত। এদেশে বনের মধ্যে এবং নির্জ্জন স্থানে অনেক মঠধারী সন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকে। পথিকেরা নিশ্চিন্তমনে ইহাদিগের আশ্রয় লইয়া থাকে। কিন্তু এই সন্ন্যাসী ও ফকীরদিগের মধ্যে কতকগুলি অসৎ প্রকৃতির লোক আছে; তাহারা বাহিরে ধর্ম্মের ভান করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়া থাকে। ঠগেরা এই সকল অসৎ প্রকৃতির সন্ন্যাসী ও ফকীরদিগের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইত। ইহারা ছোট খাট বাগান প্রস্তুত করিয়া সুস্বাদু ফলের গাছে পূর্ণ করিয়া রাখিত। শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকেরা উপস্থিত হইলে ইহারা যত্নের সহিত তাহাদিগকে আশ্রয় দিত। হতভাগ্যেরা মিষ্ট কথায় এবং ইহাদিগের ব্যবহারে ভুলিয়া, কথায় বার্ত্তায় সমস্ত কথাই ইহাদিগের কাছে খুলিয়া বলিত। কিন্তু সেই সন্ন্যাসী ফকীর বেশধারী অসৎ লোকেরা অবসর [illegible] সংকেত দ্বারা ঠগদিগকে আহ্বান করিত। [illegible] আসিয়া হতভাগ্যদিগের প্রাণবিনাশ [illegible] [illegible]নক সময় স্ত্রীলোকের সাহায্যে এই [illegible]কার্য্য সমাধা করিত। একজন সুন্দরী [illegible]থের ধারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, [illegible]কজন পথিক উপস্থিত হইলে, [illegible]হমনে একটু দয়া উপস্থিত হয়। [illegible]াহাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে [illegible] স্ত্রীলোকটী তখন একটা যায়গার — যে সে সেই স্থানে যাইবে, পথে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়াছে, স্ত্রীলোক একাকী কেমন করিয়া যাইব, এইজন্য কাঁদিতেছি। এপ্রকার অবস্থায় পথিকের মনে স্বভাবতই একটু দয়া উপস্থিত হয়, এবং না বুঝিয়া ঠগদিগের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া হয়ত তাহাকে রাখিয়া আসিতে যাইয়া এই নৃশংসদিগের হস্তে শেষে প্রাণ হারায়।

অসন্তুষ্ট কাঠবিড়াল।
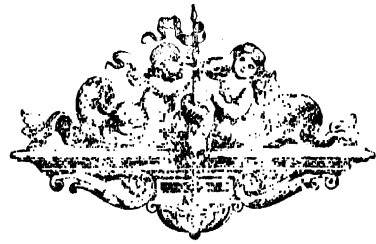
তোমরা সকলেই মুঙ্গের কোথায় জান, মুঙ্গেরের অতি নিকটে মধুবন নামে একটী রমণীয় স্থান আছে, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থানটি আরও রমণীয় ছি[illegible] তখন সেখানে শাল, তামাল, প্রভৃতি [illegible] জাতীয় বড় বড় গাছ এবং কত প্রকারের [illegible] গুল্ম দেখিতে পাওয়া যাইত; কত শত শত প্রকারের বনফুলে বনটি সর্ব্বদা আলো হইয়া রহিত, এবং নানা বর্ণের নানা প্রকার প্রজাপতি দিনের বেলায় ফুলের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত। ময়ুর, বন্যকুক্কুট, তিতির, বটের প্রভৃতি ভূচর পক্ষীগণ মনের সুখে বিচরণ করিত; কোকিল পাপিয়া, শ্যামা, দইয়াল প্রভৃতি গায়ক পক্ষী

গাছের ডালে, লতার আড়ালে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গান করিত। লেপার্ড (Leopard) হায়েনা (Hyena) ভল্লুক, বনবিড়াল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু রাত্রে ইতস্ততঃ আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে রাত্রের গভীরতা এবং নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া চীৎকার করিত; ঐ শব্দ খরকপুর পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিকটস্থ সমস্ত সাঁওতাল পল্লিতে ফিরিয়া আসিত, এবং তাহা শুনিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলে "ভয় কি বাছা কা'ল সকালে দুষ্ট বাঘটাকে মেরে এনে দিব" বলিয়া সাহসী পিতা মাতারা ছেলে, মেয়েদিগকে সান্ত্বনা করিত। মধুবনের নিকটেই একটী ক্ষুদ্র হ্রদ আছে, এই হ্রদে নানা দেশ হইতে নানা প্রকার জলচর পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া একত্রিত হইত, এবং শীত ও বসন্ত কাল এইখানে থাকিয়া আবার গ্রীষ্ম কালের প্রারম্ভেই তাহারা দেশ বিদেশে চলিয়া যাইত।

সেই মধুবন এখনও আছে কিন্তু তাহার আর সে শোভা নাই। এখনও অনেক গাছ আছে কিন্তু তত বড়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ আর নাই, লতা, গুল্ম আছে কিন্তু সে রমণীয়তা নাই; বনফুল আর প্রায় ফোটে না, ঝাঁকে ঝাঁকে আর নীল প্রজাপতিগণ খেলিয়া বেড়ায় না; ময়ূরের নৃত্য আর সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না, গায়ক পাখীরা আর ডা'লে বসিয়া মনের সুখে গান করে না। হিংস্র জন্তুরাও এখন আর পূর্ব্বের মত রাত্রে ঘুরিয়া বেড়ায় না। নিকটে সেই হ্রদ আছে, কিন্তু হাজার হাজার জলচর পক্ষীদের সেখানে জমা হইতে আর দেখা যায় না। সখার পাঠক পাঠিকা! তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার মধুবন এমন শ্রীভ্রষ্ট কেন হইল। দেশে সভ্যতা বিস্তার এবং মানুষের অর্থ পীপাসাই মধুবনের দুর্দ্দশার কারণ। প্রথমে যখন এই দেশ দিয়া রেলের পথ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় তখন ঐ বনের বড় বড় গাছগুলি কাটিয়া রাস্তার কাজে লাগান হয়; যেখানে কখনও মানুষ প্রবেশ করিত না, সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা মানুষের গোলমাল, গাছ কাটা আর গাছ পড়ার শব্দ,—গরিব বনচারীরা কেমন করিয়াইবা থাকে? গতিক মন্দ দেখিয়া তাহারা কে কোথায় পলায়ন করিল। বড় বড় গাছ পড়াতে এবং তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করাতে লতা গুল্ম ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন ফুলের চারাগুলি মারা যাইতে আরম্ভ হইল; ফুল না পাইয়া প্রজাপতিরাও আসা বন্ধ করিল। এদিকে রাস্তা প্রস্তুত হইলে রেলগাড়ী চলা আরম্ভ হইল, মধুবনের অতি নিকট দিয়াই রেলের রাস্তা, প্রথম ট্রেণ যেনা সন্ সন্, ঝন্ ঝন্ করিয়া আসিতে আরম্ভ হইল; গাছ কাটা এবং গাছ পড়ার গোলমাল সহ্য করিয়াও যে সকল জন্তু বনের এদিকে ওদিকে লুকাইয়া ছিল তাহারা এবার মহা বিপদে পড়িল; এদিকে ট্রেণ যত নিকটে আসিতে লাগিল ততই পোঁ পোঁ শব্দ হইতে লাগিল, সেই কর্ণভেদী পোঁ পোঁ শব্দে বন্য জন্তু সকল দিশাহারা হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। যাক্, আমরা কি কথা বলিতে গিয়া কি আনিয়া ফেলিয়াছি! এই মধুবনে একটী ক্ষুদ্র কাঠবিড়াল বাস করিত; এমন স্থানে সে যে পরম সুখে থাকিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ইচ্ছামত এ গাছ ও গা[illegible] বেড়াই[illegible] ক্ষুধা হইলে আহারের [illegible] অভাব ছিল না। তার[illegible] এইরূপে সুখে স্বচ্ছ[illegible]

বিড়ালের মনে কেমন এক প্রধান অশান্তি জন্মিল; কাঠবিড়ালের যে গাছে বাসা ছিল সে গাছটি হ্রদের দিকে; সে বাসায় বসিয়া বসিয়া হ্রদের জলচর পক্ষীদিগকে দেখিত এবং মনে মনে ভাবিত ঐ পাখীরা কত সুখী, উহারা ইচ্ছামত কেমন এদেশ ওদেশ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে পারে, আর আমাকে এই বনের মধ্যেই ... সময় কাটাইতে হয়! না, এরূপ অবস্থা আমার পক্ষে অসহ্য! অবশেষে কাঠবিড়া... মনে মনে স্থির করিল যে সেও ঐ পাখীদিগের মত বিদেশে যাইবে। সেই বনে একটী ইন্দুর ছিল সে কাঠবিড়ালের অত্যন্ত বন্ধু; কাঠবিড়াল গিয়া বন্ধুকে তাহার বিদেশ গমনের ইচ্ছা ... াইবামাত্র ইন্দুর বন্ধু অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কাঠবিড়াল বন্ধুর সাধু ইচ্ছার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল, বিদেশ যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল।

সে রাত্রি আর কাঠবিড়ালের নিদ্রা হইল না, পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে কাঠবিড়াল যাত্রা করিল। দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক আর সাংসারিক কোন বিষয়ের জ্ঞান না থাকাতেই হউক কাঠবিড়ালের বিদেশ যাত্রার কোন একটা উদ্দেশ্য ছিল না; পক্ষীরা উড়িয়া এদেশ ওদেশ যায় আমি কেন যাইব না, উদ্দেশ্যর মধ্যে এইমাত্র। ক্ষমতা থাকা না থাকার বিষয় যে সে একবারে ভাবেনি তাহাও নয়। সে ভাবিয়াছিল পাখীদের যেমন ডানা আছে উড়িয়া যাইতে পারে, তাহার তেমনই চঞ্চল পা আছে, সে দ্রুত চলিতে পারে; ...হা হউক ...জন প্রফুল্লচিত্তে যাত্রা করিয়া ...ম্মনে ...াইতে কখন বা চঞ্চল ...হাকে এবং মাঠের পর মাঠ, ... স্ত্রীলোকটী... পার হইয়া এক ... যে সে সেই স্থা...

ক্ষুদ্র পাহাড়ের নিকটে উপস্থিত হইল। সে এই ক্ষুদ্র পাহাড়টির নিকট উপস্থিত তখন বেলা প্রায় দশটা। ইন্দুর বন্ধুর পরা... সঙ্গে যাহা কিছু খাবার আনিয়াছিল ... বসিয়া আহার করিয়া কাঠবিড়াল আব... ...িতে আরম্ভ করিল। সমতল ভূমিতে যত দ্রুত ...দে উল্লাসের সহিত চলিয়া আসিয়াছিল এবার পাহাড়ে উঠিবার সময় তত দ্রুত উঠিতে পারিল না, কিন্তু তাই বলিয়া সে ছাড়িবার পাত্র নয়। সে ক্রমাগত উঠিতে লাগিল এবং কিছুকাল পরেই পাহাড়ের উপরে উঠিল। পাহাড়ের উপরে উঠিয়া পশ্চাৎদিকে তাকাইবামাত্র মধুবন দেখিতে পাইল, যে গাছে তাহার বাসা ছিল সে গাছটিও দেখিতে পাইল। আপনার বাসা, মধুবনের সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সমস্ত মনে হওয়ায় তাহার মন কেমন করিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা অতি ক্ষণকালের নিমিত্ত। কাঠবিড়াল আবার চলি... আরম্ভ করিল। কত বন, কত জঙ্গল পার হইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু এবার আর তেমন দ্রুতপদে চলিতে পারিল না, পরে বেলা আন্দাজ সাড়ে চারিটার সময় অপেক্ষাকৃত একটী বৃহদাকার পাহাড়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এই পাহাড় পার হইতে পারিলেই কাঠবিড়াল বিদেশে পৌঁছে। সঙ্গে যাহা কিছু খাবার ছিল তাহা দশটার সময় আহার করিয়াছে আর কিছু সঙ্গে নাই, এখানে কিছু পাওয়াও যায় না যে খাইয়া সে ক্ষুধা নিবারণ করে; কাজে কাজেই ক্ষুধা লইয়াই সে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। কাঠবিড়াল ক্রমাগত উঠে কিন্তু পথ আর ফুরায় না, সে উঠিতে যথেষ্ট চেষ্টা করে কিন্তু ... আর উঠে না, অবশেষে অনেক কষ্টে খানিকটা উঠিয়া মনে করিল ঐ যে স্থান দেখা যাইতেছে ঐখানে